ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৸০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৪ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র-সূচী

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৪ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৸০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৪ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

চিত্র-সূচী

ভারতী

৪১শ বর্ষ]　　　কার্ত্তিক, ১৩২৪　　　[৭ম সংখ্যা

এবারের আগমনী

শরতের সে সোনার আলো কই গো কোথা আজ !
কোথায় বা সেই কিরণ-জালা
নীলের গায়ে, বকের মালা,
কাশের ঝালর ঝুলিয়ে-দেওয়া নদীতীরের সাজ ?
পথের পঙ্ক ঘুচিয়ে দিয়ে,
ধানে সোণার ঢেউ তুলিয়ে
ফুরফুরে সে শীতল সমীর পিছিয়ে কেন আজ,
ভরা-নদীর জলে কোথা মৃদঙ্গ আওয়াজ ?

মহামায়ার আগমনী, সাজবে মাঠ বন,
নাইত জানা, কোথায় পড়ে সে রাঙা-চরণ !
কমল সে তাই সরোবরে
শতদলে সলিল ভরে,
তাইতে তৃণ বিছায় পথে কোমল আস্তরণ,
ব্যজন করে স্নানে শুচি ব্যাকুল সমীরণ !

আয়োজন সে নাই গো কেন আজকে বঙ্গভূমে ?
আকাশ যেন ধূসর মেঘে মগ্ন চিতা-ধূমে !
হাহা করে' বইছে হাওয়া,
চোখের জলে কানন ছাওয়া,
কমল-মুখে নাই যে হাসি, নেতিয়ে আছে ঘুমে,
আলোর চোখে মিলায় আলো, পাংশু মরণ-ঘুমে !

নির্ব্বাসনে কাঁদে ছেলে শূন্য গৃহদ্বার,
শত শত মায়ের প্রাণে, শুধুই হাহাকার !
তাইতে মহামায়ির মনে,
নাইরে পুলক আগমনে,
লুটিয়ে কাঁদে পথের পরে শিউলী-ফুলের সার
আগমনী গায়না বাঁশী, কাঁদছে সুরে তার
বিসর্জ্জনের বিদায়-ব্যথা,
অশ্রুভরা শোকের কথা,
মায়েরি-কোল-হারা-ছেলের বেদনা অপার,
পর্ব্বদিনের জ্বলেনি দীপ, ভুবন অন্ধকার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শিল্পশিক্ষা *

কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আগে বা পরে কিছু বলিতে হয়। মন্ত্র পড়ার এই প্রথাটা সকল দেশেই চলিত দেখা যায়। সর্ব্বদেশের সনাতন এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করিতে পারি—এমন সাহস আমার নাই। অতএব এ-ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে আমাকেও দু'এক কথা বলিতে হইবে।—কি বলিব ? নূতন কিছুই নয়। যুগে যুগে যাঁরা অবতার হন তাঁরাই নূতন কথা বলেন—আমরা সেই সনাতন উপদেশেরই ধূয়া ধরি মাত্র। আজও সেই পুরাতন কথাই এস্থলে একটু-ব্যাখ্যা করিব।

আমরা সকলেই জানি—এ জীবনটা দুদিনের, ক্ষণভঙ্গুর,—নশ্বর—

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান রহে বহু পরিমাণ
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।

কিন্তু এই সত্যেরই পাশাপাশি একই সঙ্গে আর একটি মাহাত্ম্যময় মহাসত্য যে

---

* ... শিল্পাশ্রমে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে পঠিত।

গাঁথা রহিয়াছে তাহা কি? না এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেও বিরাজিত দেখিতে পাই একটি ভূমা সার্থকতা। জীবন দুদিনে নষ্ট হয় কিন্তু এই সার্থকতা অমর ভাবে বংশানুক্রমে মানব জাতিকে অমর করিয়া তোলে। এই জন্যই ইয়োরপের যুদ্ধে আজ স্বদেশী বিদেশীর মধ্যে প্রাণদানের এত আগ্রহ এত উৎসাহের বন্যা ছুটিয়াছে।

কিন্তু সার্থকতা এই কথাটা খুব একটা বড় কথা; শুনিলেই মনে কেমন একটা হতাশা জাগে, কি করিয়া ক্ষুদ্র আমি এ জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিব! অথচ হতাশ হইবার কারণ ইহাতে নাই।—প্রকৃত পক্ষে, বড় ছোটরই সমষ্টি মাত্র, অণু-পরমাণুতেই এই প্রকাণ্ড জগৎ। আমরা যদি কেবল মাত্র ছোট্ট মুহূর্ত্তগুলিকেই ধরিতে শিখি তাহা হইলেই আমাদের জীবন অতি সহজে সার্থক হইয়া ওঠে। এই মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহারেই কবি ভাবজগতের বিজ্ঞানবিদ বহির্জগতের রাজা হইতে সক্ষম। ইয়োরপের লোকে মুহূর্ত্তকে বাঁধিতে জানেন তাই যে কার্য্যে তাঁহারা অসিদ্ধ থাকিয়া যান তাহাতেও তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নষ্ট হয় না। ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাদের পথ অনুসরণে সেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই শিক্ষার খুবই অভাব।—সম্ভবতঃ এই কারণেই আমাদের এমন অধঃপতন হইয়াছে। অবশ্য স্বীকার করি—আমাদের দেশের জলবায়ু আলস্যসঞ্চারী, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে চেষ্টা থাকিলে আমরা কি এই প্রতিকূল আবহাওয়াকেই আমাদের অনুকূলে আনিতে পারি না? শীত কি ইংরাজকে বাঁধিয়াছে না ইংরাজ শীতকে বশ করিয়াছেন? শীতদেশের মানুষ যাঁহারা তাঁহারা কি এদেশে আসিয়া আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দেন? এমন কি, গরমি কালেও তাঁহাদের টেনিস খেলাটি বাদ যায় না, আর দুপুরের রৌদ্রেও মাঠে ফুটবল ক্রিকেট প্রভৃতিতে তাঁহারা মাতিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা মনে করেন, নানাকারণে,—প্রধানতঃ শরীর-রক্ষার জন্য এরকম ব্যায়ামের প্রয়োজন। জাপান ইহারও উর্দ্ধে উঠিয়াছে; জাপানীরা খাঁদা নাক—উচ্চ করিতে সচেষ্ট। জাপানীরা নাকি বলিয়াছে যে একশতাব্দির মধ্যে দেশে আর একটিও খাঁদানাক দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহাকেই বলি মানুষ!

আমাদেরও মানুষ হইতে হইলে অন্ততঃ আলস্যটাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এখন কি আমরা কাজ করিনা বা সারাদিনই আলস্যের স্রোতে গা ঢালিয়া চলি? না তাহা নহে। তবে যে কাজটুক না করিলে ঠিক চলেনা, প্রাণধারণের জন্য যেটুক দরকার সেই কাজই আমরা করি। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অসাধারণ এ স্থলে অবশ্য আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগকে বর্জ্জন বিধির মধ্যেই ধরিয়া লইতে হইবে কিন্তু সাধারণত সকলেরই এবং সকল কাজের মধ্যেই কেমন একটা তৎপরতার অভাব, কেমন একটা নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হইতে পারে—ইহা গীতা কথিত নির্লিপ্ত ভাব, পরজন্মের রাস্তা ইহাতে সাফ্ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহজন্মে ইহাতে মঙ্গল নাই ইহা নিশ্চয়।

কৃষকগণ তাহাদের বাপ-পিতামহের চালে মাঠের কাজ করিয়া যায়—তাহা ছাড়া বেশীকিছু উন্নতির আশা রাখেনা। কুলি মজুর বোঝা উঠাইয়া পয়সাটি হাতে পাইলেই নিশ্চিন্ত, তাহার উপর আর একটি সামান্য কাজ করিতে বলিলে তাহারা মনে করে তাহার পক্ষে সেটা অকর্ম্ম। এমন কি একজন মেথরকে তাহার নিয়মিত কাজ ছাড়া যদি একখানা কোদাল ধরিতে বল বা জানালা দরজাগুলো সাফ করিতে বল—ত সে বলিবে—তাহা করিলে তাহার জাত যাইবে। একজন মেম এই বলিয়া আমার নিকট দুঃখ করিতেছিলেন ;—শুনিয়া হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারি না। ঘরের দাসী বাঁদি হইতে গৃহিনীগণ পর্য্যন্ত সকলেই নিজের নিজের বাঁধা কাজটুকু শেষ করিয়া—আহারান্তে দিবানিদ্রার পর কেহ বা পা ছড়াইয়া বসিয়া কেহ বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া যতক্ষণ গল্পের আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন ততক্ষণ কোন কাজের চিন্তাতে মন দিলেও কাজ হইত। এইরূপে আমরা কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়া কিন্তু নিজেকেই ফাঁকি দিই। উক্তরূপ গল্পের বেশীটাই পরচর্চ্চা—এবং অনর্থ-উৎপাদক। ইংরাজ যে এ সম্বন্ধে দেবর্ষি মহর্ষি তা নন; কোন দেশেই কেবল নিজেকে লইয়া বা নিজের কথা লইয়া সংসার চলে না। তবে তফাৎ এই যে তাঁহারা কাজ ভুলিয়া কথা কহেন না। এখন এই যুদ্ধের সময় ইয়োরপের মেয়েরা যেরূপ কাজ করেন—শুনিলে অবাক হইতে হয়। কৃষিকার্য্য হইতে গুলিবারুদ প্রভৃতি প্রস্তুতের ভারও তাঁহাদের উপর। নহিলে এ যুদ্ধ চলিতেই পারিত না। এ দেশের ইংরাজ মেয়েরাও সারাদিন অসম্ভব রকম কাজ করেন। বড় বড় ইংরাজের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা মুখে গল্প করিতেছেন কিন্তু হাতে সৈনিকদের জন্য সেলাই চলিতেছে।

ইংরাজদের কাছে আমরা বাহিরের চালচলন অনেক শিখিতেছি কিন্তু যে সকল গুণে তাহারা এত বড় একটা জাতি, তাহাদের সেই গুণগুলি শিক্ষা করাই কি আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত নহে? আমরা এখন চাহিতেছি রাজনৈতিক উচ্চাধিকার, আমরা চাহি স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু এ কার্য্যে যোগ্য হইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া কি আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন নহে? সে বিষয়ে আমরা কি করিতেছি? এখন গৃহিণীর কেবল রন্ধন-কার্য্যেই নিযুক্ত হইলে চলিবে না—এখনকার উপযোগী নানাকার্য্যে তাঁহাকে সুদক্ষ হইতে হইবে। সেই দক্ষতা লাভের প্রধান মন্ত্র মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার। সেই মন্ত্রেই প্রথম আমাদের উত্তমরূপে দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। লেখা-পড়া এবং শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষা মুহূর্ত্ত ধরিবার প্রধান উপায়। এবং ইহাতে নারীমাত্রেরই অন্তর্নিহিত শক্তি উন্মেষিত হইয়া ওঠে। সুশিক্ষা পাইলে তাঁহারা নিজের এবং দেশের অনেক কাজ করিতে পারেন।

দুঃখিনী বিধবাগণ চিরদিনই আমাদের দেশে আত্মীয়ের গলগ্রহ। করুণহৃদয় বিদ্যাসাগর তাই পুনর্ব্বিবাহ ব্যবস্থাদানে তাহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উদার হৃদয় মনীষি লোকের বহু চেষ্টাসত্বেও বিধবা

বিবাহ আমাদের দেশে আজও সহজ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল না। তবে কি দুঃখভোগ ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। শিক্ষা লাভে তাহাদের জীবন সার্থক হইয়া উঠিবে। যখনি কোন বিধবার মুখের দিকে চাইয়াছি চিরদিনই এই কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই ইচ্ছার কি কোনই ফল হয় নাই? সে কথা বিশদরূপে বলিবার স্থান ইহা নহে তবে এইটুক বলিতে পারি—যে ভগবান কোন শুভ ইচ্ছাকে নিষ্ফল করেন না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিরণ্ময়ী দেবী দুএকটি বিধবাকে লইয়া যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে সেই আশ্রম এখন অনেকগুলি বিধবার শিক্ষা ও আশ্রয় স্থান। এ পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত বিধবা সেখান হইতে শিখিয়া অন্যত্র শিক্ষাদানে এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। আর ২৫।৩০ জন অনাথা নারী নিয়মিতভাবে এখানে এখন লেখাপড়া এবং শিল্প শিক্ষা করে। কিন্তু একটি শিল্পাশ্রম বা একটি বিধবাশ্রমে দেশের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। সহরে গ্রামে যত্র তত্র যেমন বহু নারীবিদ্যালয়ের প্রয়োজন সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষারও আয়োজন হওয়া উচিত। এবং এ চেষ্টা যাঁহারাই করেন তাঁহারাই আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন।

কেবল বিধবা বা অনাথা নারী কেন সাধারণ নারী মাত্রেরই পক্ষে এই অর্থকরী শিল্প-শিক্ষা হিতকর। আজকাল আগের মত অল্প ব্যয়ে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থনারী ঘরের দরকারী পিরাণ চাপকান জ্যাকেট কামিজ নিজে প্রস্তুত করিতে পারিলে দরজির খরচ কতটা বাঁচিয়া যায়। মুসলমান কন্যাগণ গৃহের অন্তরালে থাকিয়া সূচিকার্য্য করিয়া অনেকে সংসার প্রতিপালন করে। ধনীঘরণীর শিল্পশিক্ষা ব্যয়-সঙ্কোচ জন্য তেমন নহে, কিন্তু কোনরূপ কলাবিদ্যা ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে মনোবৃত্তি কত স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহা ব্যতীত স্বহস্তপ্রস্তুত শিল্প পরোপকারে দান করিয়া আনন্দ এবং প্রশংসা উভয়ই এক সঙ্গে তিনি লাভ করিতে পারিবেন। শুনিতে পাই এক সময়ে ভারতনারী শিল্প-কলায় সাতিশয় সুনিপুণা ছিলেন। ভারতের অন্যদেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়েরা বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কাঁথা প্রভৃতি নানারূপ সূক্ষ্ম শিল্প রচনায় এখনো সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এ সকল কাজে, সময় ও পরিশ্রম যত লাগে, তদনুরূপ লাভ হয়না।—তাই এখন কাটা শিল্পই প্রধানভাবে অর্থকরী। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কাটা কাপড়ের ব্যবহার ছিল না সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে এত জাতের মধ্যেও দরজি জাত নাই। কিন্তু এখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে দরজির কাজও আমাদের শিখিতে হইবে। কাট ছাঁটের সেলাই ব্যতীত যে সকল আবশ্যকীয় সূক্ষ্ম চারু-শিল্পের বেশী ব্যবহার আছে,—তাহার বিক্রয়েও লাভ হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রসাদে একরূপ শিল্প বিক্রয়েরও সুবিধা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট গৃহশিল্পের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইংরাজিতে একটি প্রবাদ

আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান তাহারই সহায় হন। কথাটা বড় সত্য। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণেও আমাদের দক্ষতা থাকা চাই। অতএব এ-রকম নারী শিল্পাশ্রম যতই স্থাপিত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল এবং যাঁহারা নারীশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করেন তাঁহারাই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। এই শিল্পাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাত্রী মজুমদার মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী এই আশ্রমের মঙ্গলকল্পে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, শুনিলে তাঁহাদের প্রতি হৃদয় শ্রদ্ধানত হইয়া উঠে। ভগবান সিদ্ধিদাতা যে তাঁহাদের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হৃদয়ের রক্ত দিয়া যে মঙ্গল-ব্রত গ্রহণ করা যায় তাহার পরিণাম ব্যর্থ হইবার নহে ইহা আমার বহু অভিজ্ঞতার ফল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ইন্দু

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী, সদা-হাস্যমুখই,ভায়া-আমার মূর্ত্তিমান আনন্দের মতো,—পণ্টুনের পুলিশ থেকে জাহাজের যাত্রী, সারেং, খালাসি সকলের কাছে প্রিয়; কেবল অবিন ডাকে তাঁকে প্রিয়া বলে!

কবে কোন্ সূত্রে ভায়া যে আমার ষ্টীমারের ‘শুশুক-সভা’ বা ডল্ফিন্-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট অবিনের কাছ থেকে এই সম্মানের উপাধিটা লাভ করেছিলেন তা আমার মতো একজন নতুন শুশুকের জানা সম্ভব নয়; কেন না ষ্টীমারের ডেকে সবেমাত্র একটি শীতকাল কাটিয়ে আমি প্রথম বসন্তে পা দিয়েছি, সুতরাং শুশুক-সভার বাই-ল অনুসারে আমার এখনো দুধে-দাঁত ওঠেনি,—আসল বয়েস আমার যতই হোক না।

এখনকার নিয়ম অনুসারে ক্রমান্বয়ে চার-পাঁচটা বছর, দিন আট-প্রহর, ষড়ঋতুর সবকটাতে জল-বাতাস আলো-অন্ধকারে খেয়া দিয়ে, চল্লিশের ঘাট পেরিয়ে, উনপঞ্চাশের বাতাসে পাল তুলে পঞ্চাশের পারে—যেখানে চিরবসন্তের কুঞ্জতীরে পাপিয়া পিয়া পিয়া বলে দিন-রাত ডাক্‌ছে সেখানে আমার তরী নিরাপদে এনে ভেড়াতে হবে তবে যদি পিয়ার খবর পাই! আমার বয়েস সবে ছেচল্লিস সুতরাং উনপঞ্চাশে সুবাতাসের সঙ্গে পিয়ার খবরও আমার পেতে এখনো দেরি আছে—যদি না ইতিমধ্যে হঠাৎ ভালো-মন্দ একটা-কিছু ঘটে যায়। এমন দু-এক সময় ঘটে যে খবর না চাইতে খবরটা এসে জোর করে কানে ঢোকে, যেমন মেঘ না চাইতে জল, এবং খালি জল চাইতে যেমন জল-খাবারের থালা—যেটা বলব সে কাহিনীটা এমনি-করেই আমার কাছে পৌঁছল।

হচ্ছিল সেদিন লাঠি-ভাঙার মাম্‌লা। অবিন আজ কদ্দিন ধরে লাঠি ভাঙবার চেষ্টায় ফিরছে—কারু পিঠে নয় বটে কিন্তু

লাঠি-বংশ তাতে করেও যে রক্ষে পাবে এমন আশা কিছুমাত্র নেই। আমরা সবাই লাঠি আনা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল ভায়া-আমার তাঁর নিজের লাঠি আঁকড়ে রয়েছেন! তিনি অবিনকে লাঠি ভাঙতে উস্কে দেবার মূল সুতরাং তাঁর লাঠি যে চিরদিন অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান থাকবে সেটা আশা করা অন্য লোক হলে যেতোনা,কিন্তু তিনি অবিনের প্রিয়-উপাধির পাত্র, সেইজন্যই যদি তাঁর লাঠিটাও বেঁচে যায়। সমস্ত জাহাজের মধ্যে এখন দুটিমাত্র লাঠি। এক, ভায়ার হাতের ঘোড়ার কাটা পা দেওয়া আবলুসের ছড়ি, আর অবিনের হাতের বাঁশীর উপরে মিনের কাজ-করা আধা-পাখী আধা-মানুষ একটি কিন্নরী-বসানো হিমালয়ের দেবদারু যষ্টি।

এই দুই লাঠিতে যেদিন ঠোকাঠুকি বাধ্‌লো, সেদিন জলে-বাতাসে মেঘেতে-আলোতে কোনো বিবাদ ছিল না। এমন-কি ওস্তাদী রাগরাগিনী আজ বাদী-বিবাদী সব সুরগুলো নিয়ে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিল। একটা আরাম আর শান্তির মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে উত্তরের হাওয়া কেটে। জলের ঢেউগুলোতে কিছুমাত্র চঞ্চলতা নেই; যেন ঘুমন্ত বুকের নিশ্বাসের মতো আস্তে উঠছে পড়ছে। সূর্য্যাস্তের দিকে কোনো রঙের খেলা নেই। স্বর্ণ-চাঁপার মতো একটি স্থির দীপ্তি সমস্ত পশ্চিম আলো করে রয়েছে। তারি উপরে তীরের গাছ যেন কালি দিয়ে আঁকা দেখছি। ভরা-পালের নৌকো যেমন, আজকের সন্ধ্যায় সমস্ত পৃথিবী তেমনি যেন চম্পাই রঙের প্রকাণ্ড পালখানি তুলে রাত্রির মুখে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে চলেছে নিঃসাড়ায়। প্রাতঃসন্ধ্যার অরুণোদয়ের তপ্তকাঞ্চনের সঙ্গে কতটা হীম মেশালে সায়ংসন্ধ্যার এই চাঁপাফুলি আলোর রংটি পাওয়া যায়। এটা যখন আমি বিশ্বকর্ম্মার কাছ থেকে মনের নোট্‌বুকে টুকে নিচ্ছি—থার্ড ক্লাসের একখানা বেঞ্চির কোণে বসে, সেই সময় ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে 'করেন-কি! করেন-কি'! রব উঠলো! কেউ জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কি-না দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি অবিন তার হাঁটুর চাড়া দিয়ে তার নিজের লাঠিখানা ধনুকের মতো বেঁকিয়েছে; তার মুখ গোলাপফুলের মতো রাঙা; আর-একটু হলেই লাঠিখানা দু-টুকরো হয়ে গঙ্গা পাবে। ভায়াই যে আজকের ধনুক-ভঙ্গের নাটের গুরু এবং তাঁর লাঠিটা বাঁচাতে তিনি অবিনকে আপনার লাঠি ভাঙতেই যে উস্কে দিয়েছেন এটা বুঝলুম। অবিনের লাঠিটা এত সুন্দর যে সেটাকে ভেঙে-ফেলা আর একটা মানুষের ঘাড়-মটুকে জলে ফেলে-দেওয়ায় আমার কোনো তফাৎ মনে হল না। মানুষের সৃষ্টিকে নষ্ট করাও যা ভগবানের সৃষ্টিকে আঘাত দেওয়াও তাই,—একই পাপ আমি মনে করি। অবিনের লাঠির মাথায় সেই কিন্নরীর বাঁশীর সাতটা সুর যেন একটা কান্না নিয়ে আমাকে মিনতি করতে লাগল—'বাঁচাও বাঁচাও'। আমার বুকের মাঝে কেমন করতে লাগলো কিন্তু মুখ দিয়ে আমার একটি কথাও বার হল না। দেখলেম লাঠিটা ক্রমে বেঁকছে। লাঠি এতটা যে নুইতে পারে তা আমি ধারণাই করতে

পারি-নি! পাহাড়ের রস টেনে বেড়েছিল সেই সরু দেবদারুর ডাল! অবিন সমস্ত জোর দিয়েও তাকে ভাঙতে পারলে না। লাঠিখানা বেঁকে সাপের মতো তার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তখন আমি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে অবিনের হাত ধরতেই অবিন একটা নিশ্বাস ফেলে লাঠিখানা ছেড়ে দিলে। দেখলেম সেই নিশ্বাসের সঙ্গে অবিনের মুখ কাগজের মতো পাঙাস হয়ে গেল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে অবিন আমার দিকে চেয়ে দেখলে। তার পর আমাকে সেই লাঠিটা দিয়ে বল্লে—"নাও তোমাকে দিলুম।"

লাঠিটা আমার কাছে শিল্প-হিসাবে খুব মূল্যবান সুতরাং সেটাকে সহজে বখশিস্ নিতে আমার লজ্জা হল। কিন্তু দিয়ে একবার ফিরে নেওয়া অবিনের কুষ্টিতে লেখেনি সুতরাং অন্তত তখনকার মতো হাস্যমুখে লাঠিটা আমায় নিতে হল। তাছাড়া লাঠিটাকে এখন কিছুদিন অবিন এবং তার প্রিয়া—আমার ভায়াটির কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে সবদিকেই মঙ্গল, এটাও সেই লাঠিটা খুসির সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়ে বখশিষ নেবার আর-একটা কারণও বটে। কাজেই লাঠিটা সেদিন আমার হাতে-হাতে আমার বাড়িতেই এল। তাড়াতাড়ি এককোণে সেটাকে রেখে আমি গায়ের কোট ছেড়ে রাখব এমন সময় বাত্তির আলোয় লাঠির গায়ে একটি বিদ্যুতের রেখার মতো একটা নাম ঝল্‌কে উঠলো—'ইন্দু'। তিল তিল হীরের আলো দিয়ে সেই নাম লেখা। লাঠিটা বাইরে ফেলে রাখতে আমার আর সাহস হলনা; আমি সেটাকে আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখলুম। সঙ্গে নিয়ে খেলুম, সঙ্গে নিয়ে শুলুম। অবিন লাঠিটাকে কি-ভাবে দেখতো তা জানিনে কিন্তু তার ইন্দু বা ইন্দুমতী অথবা ইন্দুমুখীর লাঠিটা আমার যেন বৃদ্ধস্য তরুণীর মতো—চলিত কথায় অন্ধের নড়ি—হয়ে উঠলো। পাছে তাকে হারাই, পাছে সুড়ঙ্গ কেটে চোর আমার কোলের কাছ থেকে তাকে চুরি করে পালায় এই ভাবনাতে আমার খেয়ে সুখ ছিল না, শুয়ে ঘুম ছিল না।

ক-দিন পরে অবিনের সঙ্গে যখন দেখা, তখন প্রথমে আমার ভয় হল অবিন বুঝি-বা লাঠিটা ফিরিয়ে নেয়, যদিও অবিনের কোনো দিন এমন স্বভাব নয় বেশ জানতেম। সেদিন আমি লাঠিটা খুব জোর করে মুঠোর ভিতরে যে রাখলুম তা বলতেই হবে। সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, গঙ্গার একটা মনোরম শোভার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলেছে। পশ্চিমতীরে দেখতে পাচ্ছি সাহেব-মিস্ত্রীর বানানো রাজাদের একটা পুরানো বাগান-বাড়ি; পূব পারে দেখছি—প্রকাণ্ড একটি মন্দির—ঘাটের ধারেই; পূর্ণিমার চাঁদ জলের উপর দিয়ে একটি আলোর পথ আমাদের জাহাজ থেকে এই ঘাটের কোল পর্য্যন্ত রচনা করেছে। আর এই আলোর পথের ধারটিতে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অবিন—পূর্ণিমার চাঁদের দিকটিতে চেয়ে। অবিনকে আমি কতবার এমন-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর আমার হাতের মুঠোর হীরের বিন্দু দিয়ে লেখা নামটার

মিল দেখে মনটা আমার নড়ে উঠলো। আমার মনে হতে লাগলো অবিন হয় তো ওই আকাশের চাঁদের মধ্যে তার ইন্দুমতী বা ইন্দুমুখীকে দেখতে পাচ্ছে। হয় তো এই চাঁদের আলোর ঝক্‌ঝকে তারগুলির মধ্যে দিয়ে সে তার অনেক দিনের হারানো ইন্দুর কাছে বহু দূর-পথে—বহুদিনের পথে প্রাণের আকুতি বিরহী যক্ষের মতো সারা জীবন ধরে পাঠাচ্ছে—প্রতি পূর্ণিমায়। হয় তো পূর্ব্বজন্মে অবিনের এ-জন্মের ইন্দু ছিল অলকার তন্বী শ্যামা ইন্দুরেখা কিন্নরী। হয় তো সেখানে কোনো নাগেশ্বর চাঁপার কুঞ্জবনে অবিনে তাতে প্রথম দেখা; তার পর প্রণয়-স্বপ্নের মাঝখানে দুজনের সহসা বিচ্ছেদ এবং আকাশ থেকে খসে-পড়া দুটি তারার মতো, পৃথিবীতে তাদের ঝরে পড়া! এখানে এসে স্বপ্নটা আমার যেন আট্‌কে গেল। ওই আহিরিটোলার গলিতে যে অলকার কিন্নরী ইন্দুরেখা ইন্দুবালা চক্রবর্ত্তী, ইন্দুমুখী খাঁ, ইন্দুমতী মুন্‌সী কিম্বা আরো-কোনো একটা নাম নিয়ে অবিনের ঘরে গৃহিণীপণা করতে করতে অথবা অবিনের সঙ্গে কোর্টসিপ্‌ চালাতে চালাতে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে হঠাৎ মারা পড়ল—অবিনকে তার শেষ-দান এই লাঠিটা দিয়ে—এটুকু মন আমার কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না। আমি ফাঁপরে পড়ে অবিনের দিকে চেয়ে দেখলেম সে আমার দিকে চেয়ে মিট্‌মিট্‌ করে হাস্‌ছে। আমি লাঠিটা সজোরে ঠুকে বলে উঠলেম—"এ হতেই পারে না।"

অবিন আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্লে—"কি হতে পারে না হে আর্টিষ্ট!"

আমি উত্তর কল্লেম—"আকাশের চাঁদের ভূতলে পতন! ইন্দুরেখা কিন্নরীর তোমার আহিরীটোলায় গৃহিণীপণা!"

অবিন গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়িটা দেখিয়ে বল্লে—"ইন্দুরেখা ও-পাড়ার ইন্দুভূষণ হলে কি তোমার আপত্তি আছে?"

"কিছু না।"—বলে আমি লাঠিটা ইন্দুভূষণ যাঁকে দিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে দিলেম। কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্তু ইন্দুরেখার সোনার কাঠিটা আমারি মুঠোয় রয়ে গেল;—হাতের মুঠোয় নয়—মনের মুঠোতে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তৃতীয় অঙ্ক

রাত্রি	কুকুর
বিড়াল	চিনি
তিলতিল	নক্ষত্রগণ
মিতিল	জানোয়ারগণ
রুটী	বৃক্ষগণ

প্রথম দৃশ্য

রাত্রির আবাস

চতুষ্কোণবিশিষ্ট এক সুবৃহৎ কক্ষ। কক্ষাভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণের; এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত। স্থানটি অতিশয় গম্ভীর। একটী ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। এক উচ্চ আসনে

কালোরঙের জবড়জং পোষাক পরিয়া রাত্রি বসিয়া আছে। রাত্রি দেখিতে অতিশয় বৃদ্ধা। তাহার এক পাশে একটী নগ্ন ছেলে শুইয়া আছে; ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে হাসিতেছে। অপর দিকে আর-একটী ছেলে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া; তাহার আপাদমস্তক আবৃত।

বিড়াল প্রবেশ করিল।

রাত্রি। কে যায় ওখানে?

বিড়াল। (অত্যন্ত পরিশ্রান্তভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে) আমি গো, মা-জননী! বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

রাত্রি। কি হয়েছে বাছা তোর?... তোকে এমন রোগা শুক্‌নো দেখছি কেন? সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা—ব্যাপার কি?... বৃষ্টিতে আর বরফে ছুটোছুটি করছিলি বুঝি?

বিড়াল। না মা, সে সব কিছু নয়!...এ ভারি গোপনীয় কথা—আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত!...আমি মা, কোন রকমে পালিয়ে এসেছি, তোমাকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, কিছুই হয়ত করা যাবে না।

রাত্রি। কেন? কি হয়েছে?

বিড়াল। সেই যে গো, কাঠুরের ছেলেটা, নাম তার তিলতিল; সে একটা ভূতুড়ে হীরে পেয়েছে। এখন সে তোমার কাছে আসছে নীলপাখী আদায় কর্ত্তে।

রাত্রি। এখনও ত আদায় কর্ত্তে পারেনি, তবে অত ভয় কিসের?

বিড়াল। কিন্তু শীগ্‌গিরই আদায় করবে, যদি না তাকে ভয় দেখিয়ে আটকাতে পার। সব কথা বলি, শোন। আলো আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মানুষের পক্ষ নিয়েছে। সে তার পাশে থেকে তাকে পথ দেখাচ্ছে। তারা টের পেয়েছে যে, নীলপাখী তোমার এখানেই লুকানো আছে। সেইটীই ত আসল, কারণ দিনের আলোয় সে বেঁচে থাকে; অন্য জায়গায় যা আছে, তা কেবল জ্যোৎস্নার আলোয় বেঁচে থাকে, চোখে রোদ লাগলেই মরে যায়। আলো জানে যে তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবার তার এক্তার নেই। সেইজন্য সে তিলতিল আর তার বোন মিতিলকে পাঠাচ্ছে। তুমি ত আর মানুষকে আটকাতে পার্ব্বে না। সে এসে তোমার দরজা খুলে সমস্ত গুপ্ত সন্ধি জেনে নেবে। আমি ভেবেই পাচ্ছিনে, অদৃষ্টে কি আছে! যদি সত্যি সত্যি সে নীলপাখী হাতে পায়, তবে আর আমাদের সর্ব্বনাশের বাকী থাকবে কি?

রাত্রি। তাইত বাছা, তাইত! এক দণ্ডও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পেলুম না। মানুষকে আমি এ ক'বছর ধরে বুঝতে পারলুম না। তার মতলব কি? সে কি চায়? সব সে আয়ত্ত কর্ত্তে চায় না কি? আমার গোপনীয় তত্ত্বগুলির ত বারো-আনা সে দখল করে বসেছে। আমার ভূত-প্রেতগুলো সব পালিয়েছে। ভয়-বিভীষিকা ত তার দৌরাত্ম্যে ঘর থেকে বেরুতে চায় না। আধি-ব্যাধিগুলো রোগে ভুগচে—মানুষ তাদের এমনি জব্দ করে ছেড়েছে।

বিড়াল। জানি মা, সব জানি। এখন সময় বড়ই খারাপ। আমাদের একাই মানুষের সঙ্গে লড়তে হবে। ওই যে আওয়াজ পাচ্ছি, তারা সব আসছে। এখন

কেবল একটী মাত্র উপায় আছে। ওরা হল ছেলেমানুষ। আমরা সব এমন ভয় ওদের দেখাব যে পিছন দিকের বড় দরজাটা খুলতে না ওদের সাহস হয়। কারণ সেইটেই হল নীলপাখীর আড্ডা।

রাত্রি। (বাহিরের দিকে কান পাতিয়া) আওয়াজ পাচ্ছি। ওরা কি অনেক লোক আসছে ?

বিড়াল। না, বেশী লোক তেমন নেই। রুটী আর চিনি আমাদের পক্ষে। জল বেচারীর অসুখ করেছে, সে আসতে পারে নি। আগুনও এল না, কেমনা আলো তার কুটুম। কেবল কুকুরটাই হল ওদের পক্ষে। তাকে কিন্তু কোনরকমে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

ভীতচিত্তে তিলতিল, মিতিল, রুটী, চিনি এবং কুকুর প্রবেশ করিল।

বিড়াল। (ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া) এই দিকে হুজুর, এই দিকে। আমি রাত্রি ঠাকরুণকে সব বলেছি; তিনি তোমায় দেখবার জন্ত ভারি উৎসুক। কিন্তু তাঁকে মাফ করবেন। তাঁর শরীর কিছু খারাপ বলে এগিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি।

তিলতিল। (রাত্রির প্রতি) সুপ্রভাত!

রাত্রি। (ক্ষুব্ধ হইয়া) কি! অপমান করতে এসেছ তুমি! সুপ্রভাত! তোমার বলা উচিত ছিল, 'সুরাত্রি'!

তিলতিল। (লজ্জিত হইয়া) আমায় মাফ করবেন—আমি তা জানতুম না। (রাত্রির দুইটি ছেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ও দুটী বুঝি আপনার ছেলে ?

রাত্রি। হ্যাঁ। এটীর নাম নিদ্রা।

তিলতিল। ও অত মোটা কেন ?

রাত্রি। ও বেশ আরামে ঘুমোয় কি না, তাই!

তিলতিল। আর ওটীর নাম কি? ও অমন করে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে কেন? কোন অসুখ করেছে নাকি ?

রাত্রি। ওটী নিদ্রার বোন, ওর নাম না বলাই ভাল।

তিলতিল। কেন ?

রাত্রি। ওর নামটা শুনতে ভাল লাগবে না।...তা থাক্, আমরা এখন অন্য কথা কই, এসো, কাজের কথা।... বেড়ালের মুখে শুনলুম, তুমি নাকি নীলপাখীর সন্ধানে এসেছ ?

তিলতিল। হ্যাঁ; সেটা কোথায়, দয়া করে বলবেন কি?

রাত্রি। দেখ বাছা, আমি কিছুই জানি না।...আমার এখানে সে নেই...আমি তাকে চোখেও দেখিনি কখনো।

তিলতিল। আলো যে বলেছে সে এখানেই আছে...আপনি দয়া করে চাবিগুলো দেবেন কি ?

রাত্রি। কিন্তু বাছা, তোমার জানা উচিত ছিল যে যারা প্রথম এখানে আসে তাদের কখনই আমি চাবি ছেড়ে দিই না।... প্রকৃতির গোপনীয় জিনিষগুলি আমার কাছে গচ্ছিত আছে; সেগুলি কারো হাতে তুলে দিতে নিষেধ। তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে তা কোনমতেই দিতে পারি না।

তিলতিল। আপনার কোন অধিকার নেই অস্বীকার করবার...মানুষ চাইবামাত্রই

আপনি সব ছেড়ে দিতে বাধ্য।...আমি এ সব কথা ভাল জানি।

রাত্রি। কে তোমায় বলেছে?

তিলতিল। আলো।

রাত্রি। আলো! সব তাতেই আলো!...কি সাহসে সে এ-সব কাজে হাত দেয়?

কুকুর। হুজুর, হুকুম হয়ত আমি জবরদস্তিতে বার করে নি।

তিলতিল। চুপ কর্ হতভাগা; অভদ্র কোথাকার!...(রাত্রির প্রতি) আসুন, দয়া করে আমায় চাবিগুলি দিন।

রাত্রি। চাবি ত চাইচ। তোমার কাছে এমন-কোন নিশানা আছে কি?

তিলতিল। (টুপিতে হাত দিয়া) এই দেখুন হীরে।

রাত্রি। আচ্ছা, তাহলে এই নাও চাবি। ঐ হল-ঘর খোল গিয়ে···কিছু খারাপ টারাপ হয় ত তুমি জান...আমি সেজন্য দায়ী নই।

রুটী। (উদ্বিগ্ন হইয়া) কেন, কোন বিপদ-টিপদ ঘটবে না কি?

রাত্রি। তা আর বলতে?...অন্ধকার বড় বড় সব গর্ত্তের দরজা যখন খুলে যাবে, তখন যে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, আমি তা বুঝতে পারছি না। হলের চারদিকে লোহার তৈরি, পিতলের তৈরি বড় বড় ঘর আছে; তার ভিতর যত রাজ্যের আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দারিদ্র্য, প্লেগ-মড়ক, আর যত সব বিভীষিকা, আপদ-বিপদ কয়েদ হয়ে রয়েছে। আমি নিয়তি দেবীর সাহায্যে কি কষ্টেই যে তাদের কয়েদ করেছি, তা আমিই জানি। এখন আমি তাদের শাসনে রেখেছি। তোমরা দেখেছ ত তাদের মধ্যে একটা যখন ছাড়া পায়, তখন পৃথিবীতে গিয়ে কি ভয়ানক কাণ্ডই বাধিয়ে দেয়!

রুটী। রাত্রি ঠাক্‌রুণ, আমি বুড়ো হয়ে গেলুম এই ছেলে দুটীর হেপাজত করে; এদের আপদ-বিপদের কথা আমাকেই আগে ভাবতে হয়। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

রাত্রি। স্বচ্ছন্দে।

রুটী। যদি কোন হাঙ্গামই বাধে, তবে পালিয়ে যাবার পথটা কোন্ দিকে?

রাত্রি। এখান থেকে পালাবার পথ নেই।

তিলতিল। (চাবি হাতে অগ্রসর হইয়া) এই দরজাটাই আগে খোলা যাক্। ...এর ভিতর কি আছে?

রাত্রি। বোধ হয় এটা ভূতের ঘর। একবার এর দরজা আমি খুলেছিলুম, সেই সময় গোটাকতক বেরিয়ে পড়েছিল।

তিলতিল। আমি খুলে দেখি। (রুটীর প্রতি) খাঁচা ঠিক আছে ত?

রুটী। (ভয়ে তার দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) আমি ভয় পেয়েছি ভেবো না, তবে বলছি কি যে দরজাটা না খুলে ফুটোর ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে ভাল হত না?

তিলতিল। তোমার পরামর্শ আমি শুনতে চাই না।

মিতিল। (কাঁদিতে সুরু করিল) আমার বড্ড ভয় করছে...চিনি কোথায় গেল...আমায় বাড়ী নিয়ে চলুক।

চিনি। এই যে হেথায় আমি, এই যে। কেঁদো না।

তিলতিল। ব্যস্, ঢের হয়েছে।

চাবি ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিল। অমনি পাঁচ ছয়টা ভূত নিমেষে বাহির হইয়া হলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রুটী হাঁউমাঁউ করিয়া খাঁচা ফেলিয়া হলের পিছনে গিয়া লুকাইল। ভূতগুলোকে ধরিবার জন্য রাত্রি তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল।

রাত্রি। তিলতিল, শিগ্‌গির দরজা বন্ধ কর, শিগ্‌গির, নইলে সবগুলোই পালিয়ে যাবে, শেষে একটাও ধরা যাবে না।

রাত্রি অনেকক্ষণ ভূতগুলোর পশ্চাতে ছুটিয়া সাপের-মুখওয়ালা চাবুকের সাহায্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া আনিতে লাগিল।

তোমরা আমায় সাহায্য কর, শিগ্‌গির এস।

তিলতিল। টাইলো, দাঁড়িয়ে দেখছ কি, শিগ্‌গির যাও, ওঁকে সাহায্য কর।

কুকুর। (লাফাইয়া চীৎকার করিয়া) হাঁ, হাঁ, এই যে!

তিলতিল। রুটী কোথায় গেল, ও রুটী!

রুটী। (হলের পিছন হইতে সভয়ে) এই যে আমি এখানে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি, ওরা পালাতে পারবে না।

ইত্যবসরে একটা ভূত সেইদিকে গিয়া পড়ায় রুটী ভয়ানক চীৎকার করিয়া পলাইয়া আসিল।

রাত্রি। (তিনটা ভূতের ঘাড় ধরিয়া আনিতেছিল) চল্ এইদিকে। তিলতিল, দরজাটা একটু ফাঁক কর ত। (ধাক্কা দিয়া ভূতগুলোকে ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল। কুকুর আরও তিনটাকে তাড়াইয়া আনিয়া ঘরে পুরিয়া ফেলিল। তিলতিল তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইয়া দিল)

তিলতিল। (অন্য এক দরজার নিকট গিয়া) এর মধ্যে কি আছে?

রাত্রি। তা শুনে আর কি হবে? দেখলেই ত ব্যাপার! নীলপাখী এখানে নেই, আমি আগেই ত বলেছি। দরজা খুলতে চাও, সে তোমার ইচ্ছে। এর ভিতর কিন্তু জ্বর, কাশি এরা সব থাকে।

তিলতিল। (তালা খুলিতে খুলিতে) এবার আমি খুব সাবধান হব!

রাত্রি। এদের বেলায় তা দরকার হবে না। বেচারীরা অতি নিরীহ চুপচাপ পড়ে থাকে! এতটুকু মুখও ওদের নেই। মানুষ এখন ওদের ওপর কি জুলুমটাই না করছে···দরজা খুলে ফেলো, দেখতে পাবে।

তিলতিল। (দরজা একেবারে ফাঁক করিয়া খুলিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না) এরা ত কৈ বাইরে বেরুচ্ছে না?...

রাত্রি। আমি ত বলেছি, এরা ভারি নিরীহ।..ডাক্তারদের অত্যাচারে বেচারীরা একেবারে নিঝুম মেরে গেছে। একবার ভিতরে ঢুকে দেখে এসো, ওদের অবস্থাটা।

তিলতিল। (ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আসিল) এর ভিতর ত কৈ নীলপাখী নেই। ওরা সকলেই বড্ড

কাঁদিল বোধ হল; কেউ একবার মাথাও তুলে না।

এই সময় একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া হলের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল। তার সর্ব্বাঙ্গ গরম কোটে ঢাকা, মাথায় একটী তুলার টুপি।

ঐ দেখ একটা পালাচ্ছে...কে ও?

রাত্রি। ও হল সর্দ্দি-কাশি। অন্য সকলের চেয়ে ওর দুর্দ্দশা কিছু কম। ওর স্বাস্থ্যও মন্দ নয়।...ওহে ও সর্দ্দি-কাশি, তুমি পালাচ্চ কোথায়? এদিকে এস। এখনও সময় হয় নি।...শীতের এখনও ঢের দেরি।

সর্দ্দি-কাশি হাঁচিয়া, কাশিয়া নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। তিলতিল তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তিলতিল। (অন্য একটার কাছে গিয়া) এইটে এবার দেখা যাক্। এর ভিতরে কি আছে?

রাত্রি। সাবধান! এখানে যুদ্ধরা সব থাকে। এরা যেমন বলবান, তেমনি ভয়ানক। ভগবান জানেন, এদের একটা যখন ছাড়া পায়, তখন কি বিভ্রাটই না ঘটে। সৌভাগ্যের বিষয়, এরা যেমন মোটা তেমনি ভারি, সহজে নড়তে পারে না। তা'হলেও আমাদের খুব সাবধানে থাকা দরকার। তুমি একটুখানি ফাঁক করে চক্ষের নিমেষে ভিতরটা দেখে নিও; আমরাও অমনি সঙ্গে সঙ্গে দরজা চেপে ধরব।

তিলতিল অতি সন্তর্পণে দ্বার একটুমাত্র ফাঁক করিয়া ভিতরে উঁকি মারিল, এবং তৎক্ষণাৎ দরজা চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

শিগ্‌গির এস, শিগগির। যত জোরে পার, সকলে মিলে চেপে ধর। ওরা দল বেঁধে এদিকে আসছে। এই যে ধাক্কা মারছে।

রাত্রি। এসো সকলে।...প্রাণপণে চেপে ধর। রুটী, কোথায় গেলে তুমি...ওখানে কি করছ...খুব জোরে...খুব জোরে...হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। ব্যস্‌রে, কি জোর... এখন সব সরে গেছে।...তিলতিল, ওদের দেখেছ ত?

তিলতিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি, কি ভয়ঙ্কর বদ্‌খত্ চেহারা,...ওদের কাছে নীলপাখী আছে বলে ত বোধ হয় না।

রাত্রি। ওদের কাছে থাকতেই পারে না। থাকলেও ওরা তাকে খেয়ে ফেলেছে। কেমন, এবার ত মন মেনেছে?... কোথাও ত পাওয়া গেল না...এখন কি করবে বল?

তিলতিল। আমি আরও দেখব। আলো আমাকে প্রত্যেক জায়গা খুঁজতে বলে দিয়েছে।

রাত্রি। তা ত বলবেই...বাড়ীতে বসে বসে অমন সবাই বলতে পারে।

তিলতিল। (অন্য এক দরজায় গিয়া) আচ্ছা, আমরা এইটে খুলব...এটাও কি ভয়ানক না কি?

রাত্রি। না, এতে ভয়ের কিছু নেই। এর ভিতরে আমার নিজের অনেক রকমের সুগন্ধি জিনিষ আছে—অনেকগুলি আলোর রশ্মি আর এমন কতকগুলি নক্ষত্র আছে যারা এ পর্য্যন্ত আকাশে দেখা দেয় নি।... তা ছাড়া চমৎকার চমৎকার প্রজাপতি সব, সোণালি রঙের মৌমাছি, ঢলঢলে শিশির-

বিন্দু, নাইটিংগেল পাখীর গান, এই রকম আরও সব সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে।

তিলতিল প্রশস্তভাবে দরজা খুলিয়া দিল। নক্ষত্র-গুলি সুন্দরী কুমারীর বেশে বিচিত্র বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া ঝকঝকে ঘোমটা টানিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সুগন্ধি এবং শিশির-বিন্দু গিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল এবং নাইটিংগেলের সুললিত সঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল।

মিতিল। কেমন সুন্দর মেয়েগুলি!

তিলতিল। আহা, কি সুন্দর ওরা নাচ্‌ছে!

মিতিল। সুগন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে!

তিলতিল। সুন্দর গান!

রাত্রি। (হাততালি দিয়া) ব্যস্‌, আর না।...ওগো নক্ষত্র-কুমারীরা, এবার তোমরা ঘরে ফিরে এস। এখন তোমাদের নাচবার সময় নয়...আকাশ পরিষ্কার নয়... ভয়ঙ্কর মেঘ করে রয়েছে।...শিগ্‌গির ঘরে যাও, নইলে আমি রোদ্দুরকে ডাকব।

নক্ষত্র, শিশিরবিন্দু প্রভৃতি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই সঙ্গে নাইটিংগেলের গানও থামিয়া গেল।

তিলতিল। (পিছনের একটা দরজায়) এই যে একটা বড় দরজা...এইটে এবার খোলা যাক্‌।

রাত্রি। (সহসা গম্ভীর হইয়া) এটা খুলো না; খবরদার!

তিলতিল। কেন?

রাত্রি। এটা খোলবার যো নেই!...

তিলতিল। তা হলে এইখানেই নীল পাখী লুকোনো আছে, নিশ্চয়ই! আলো আমাকে এই রকমই বলেছিল।

রাত্রি। (বাৎসল্যের স্বরে) দেখ বাছা, আমার কথা শোন; তুমি আমার ছেলের মত। তোমার জন্যে যা করেছি, আর কারও জন্যে আমি কখনও সে-রকম করিনি। আমার নিজের লুকোনো জিনিষ সব তোমায় দেখিয়েছি।...তোমাকে ছেলের মত ভালবেসেছি বলেই এতটা করেছি। এখন আমার কথা শোন...আর এগিয়ো না...এখন বাড়ী যাও...ও দরজাটা খোলো না।

তিলতিল। (আবেগ-ভরে) কেন? কি জন্য খুলব না?

রাত্রি। কারণ, আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি মারা যাও। যারা-যারা এ দরজা খুলেছে—একটু ফাঁক করে দেখেছে, তারা কেউ আর জ্যান্ত ফেরে নি—তাদের কাকেও দিনের আর আলো দেখতে হয় নি।...তাই বলছি, ও দরজা খুলো না। তবে যদি আমার কথা না শুনে নেহাত খুলতে চাও, তবে একটু থাম, আমাকে নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যেতে দাও... তার পর তুমি যা ভাল বোঝ, কর।

মিতিল কাঁদিয়া উঠিল, ভয়ে তার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। সে সেখান হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য তিলতিলকে ধরিয়া টানিতে লাগিল।

রুটী। (ভয়ে তার চোখ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল) দোহাই হুজুর, খুলো না। আমি তোমার পায়ে ধরছি... আমাদের দয়া কর।...রাত্রি ঠাক্‌রুণ ঠিক কথাই বলেছেন।

বিড়াল। হুজুর, আমাদের সকলকে কি মেরে ফেলতে চান?

তিলতিল। দরজা আমি খুলবই।

মিতিল। আমি খুলতে দেব না... কিছুতে না।

তিলতিল। চিনি কোথায় গেল!... দেখ চিনি, তুমি আর রুটী মিতিলের হাত ধরে এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি দরজা খুলতে যাচ্ছি।

রাত্রি। পালাও সব এখান থেকে... প্রাণে বাঁচতে চাও ত পালাও!

(নিজে পলাইয়া গেল)

রুটী। থাম, থাম; একটু থাম; আমাদের পালিয়ে যেতে দাও!

(হলের অপর প্রান্তে গিয়া সকলে থামের আড়ালে লুকাইল)

কুকুর। আমি থাকব, আমি থাকব; ...আমার ভয় করে নি, আমার ভয় করে নি, আমি থাকব, আমি থাকব!

তিলতিল। (কুকুরের গায়ে হাত চাপড়াইয়া) বেশ টাইলো, বেশ!...একটা চুমো দাও!...তুমি আর আমি, দুজনে!... কি বল!...এবার দরজা খুলি?

তালায় গায়ে চাবি লাগাইবা মাত্র হলের অপর প্রান্ত হইতে ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি উঠিল। দরজা খুলিতে না খুলিতেই একটী মনোহর উদ্যান প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে বিচিত্র আলোকমালা, উজ্জ্বল গ্রহ তারকা ঝল্‌মল্ করিতেছে দেখা গেল। আর দেখা গেল, অসংখ্য নীলপাখী —সেগুলি চমৎকার নীল। উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপরে তাহারা অবিশ্রাম উড়িয়া বেড়াইতেছিল। স্থানটী অপূর্ব্ব নীলবর্ণে উদ্ভাসিত।

তিলতিল। (বিস্মিত ও চমকিত হইয়া দেখিতে লাগিল) ওহো, কি আশ্চর্য্য! (পলাতকগণের প্রতি) শিগ্‌গির এস, শিগ্‌গির এস,...এইখানেই তারা আছে! ...এই যে নীলপাখী!...এই যে নীলপাখী! হাজার হাজার রয়েছে!...মিতিল, শিগ্‌গির এস!...টাইলো কোথায়!...এস, আমাকে সাহায্য কর।...শিগ্‌গির এস!...(পাখীগুলোর উপর গিয়া পড়িল) হাতে করে ধরা যাবে। ...এরা পালায় না! ভয় পায় না!... (রাত্রি এবং বিড়াল ব্যতীত সকলে সেখানে উপস্থিত হইল) ঐ দেখ, কত রয়েছে!... ওরা চাঁদের আলো খাচ্ছে!...ঝাঁকে ঝাঁকে এত উড়ে বেড়াচ্ছে যে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না!...মিতিল, কোথায় তুমি!... টাইলো, ওদের কামড়ো না যেন!...আস্তে আস্তে ধর!

মিতিল। আমি সাতটা ধরেছি...আঃ, ভারি ঝটপট্ করছে...ধরে রাখতে পারছি না।

তিলতিল। আমিও এত বেশী ধরেছি যে সামলাতে পারছি না!...ঐ একটা পালিয়ে গেল!...টাইলো অনেকগুলো ধরেছে! এরা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে—আকাশে নিয়ে তুলবে...শিগ্‌গির পালাই চল! আলো-বেচারী বসে রয়েছে...দেখে কত খুসী হবে...চল, পালাই চল!...এই পথে! এই পথে!

পাখীগুলোকে লইয়া তাহারা বাগান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। রুটী ও চিনি তাহাদের সহিত মিলিত হইল। সকলে হল হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল রাত্রি এবং বিড়াল বাগানে ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে দেখিতে লাগিল।

রাত্রি। আমার পাখীটাকে তারা ধরতে পারেনি।

বিড়াল। হাঃ, হাঃ, কি মজা!...ওই যে সেটা চাঁদের আলোয় বসে রয়েছে... অত উঁচুতে নাগাল পায়নি।

*   *   *

দৃশ্যান্তর

আলো ভিতরে প্রবেশ করিল। তিলতিল, মিতিল এবং টাইলো সর্ব্বাঙ্গে পাখীগুলাকে ঝুলাইয়া ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পাখীগুলা সব চেতনা-হীন বলিয়া মনে হইল। তাহাদের মাথা লট্‌কাইয়া পড়িয়াছে—ডানা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহারা ঝট্‌পট্ করিতেছে না; কেবল নির্জীব দেহগুলাই ঝুলিতেছে।

আলো। কেমন! পাখীটাকে ধরেছ ত?

তিলতিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে!...এই দেখ না!...হাজার হাজার ছিল!...এই দেখ না!..(আলো-কে দিতে গেল, কিন্তু দেখিল, মরিয়া গিয়াছে) কি আশ্চর্য্য! মরে গেছে যে!...তাই ত!...কি করে মলো! ...মিতিল, টাইলো, তোমাদের গুলোই গেছে?

(রাগ করিয়া মরা পাখীগুলাকে মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিল)

ভারি বিশ্রী!...মলো কি করে!

(হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

আলো। (আদর করিয়া তিলতিলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেঁদো না বাছা, কেঁদো না।...যেটা দিনের আলোয় বেঁচে থাকে, সেটাকে তুমি ধরতে পারনি। সেটা আর কোথাও গেছে। ..আমরা আবার তাকে খুঁজে বার করব।

কুকুর। (মরা পাখীগুলোকে আগ্রহের সহিত দেখিয়া) এগুলো খেতে কি বেশ লাগে?

সকলে একসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বৃহৎ অরণ্য। রাত্রিকাল। আকাশে চাঁদ; অরণ্যাভ্যন্তরে বহুবিধ প্রাচীন বৃক্ষ রাজি; যথা—ওক, বীচ, দেবদারু, ঝাউ, এল্‌ম্, সাইপ্রেস, লেবুগাছ, বাদামগাছ, ইত্যাদি।

(বিড়াল প্রবেশ করিল)

বিড়াল। ওগো গাছেরা, তোমাদের সকলকে নমস্কার!

বৃক্ষগণ। (পত্রের মর্‌মর্ শব্দ করিয়া) নমস্কার!

বিড়াল। আজ আমাদের বড় শুভ-দিন!...এমন দিন আর হবে না!... আমাদের শত্রু আসছে। তোমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিয়ে তোমাদের হাতেই সে আজ নিজেকে সঁপে দেবে। শত্রু কে, জান ত? সে হল ঐ কাঠুরের ছেলে তিলতিল।...কাঠুরে তোমাদের যে কি অনিষ্ট করেছে, তা বোধ হয় আর বলতে হবে না।...ছেলেটা নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম থেকে তোমরা এটাকে লুকিয়ে রেখেছ...মানুষই কেবল এর সন্ধান জানে।...(বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্ শব্দ) এ্যাঁ, কি বলছ? কে তুমি! ঝাউ-গাছ?...হ্যাঁ, তার কাছে এক টুকরো হীরে আছে, তা দিয়ে সে অল্প সময়ের জন্যে আমাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে পারে,

আর নীলপাখীটাকে জোর করে আদায় কর্ত্তে পারে; কিন্তু তা হলে কি হবে, জান? আমাদের সকলকে চিরকালের জন্তে মানুষের তাঁবেদার হয়ে থাকতে হবে। (বৃক্ষপত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) ও কে কথা কইছে? ওক্! ভাল আছ ত? (ওক্ পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এঁ্যা, আজও তোমার সর্দ্দি সারে নি?...বারোমাস যে রকম ঠাণ্ডা ঘাস জড়িয়ে থাক!...আচ্ছা, নীলপাখীটা তোমার কাছেই আছে ত!..(পত্রের মর্‌-মর্‌ শব্দ)...হঁ্যা, হঁ্যা, সে কথা আর বলতে! ছোঁড়াকে মেরে ফেলতেই হবে... এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? (পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) এঁ্যা, কি বলছ?...ঠিক বুঝতে পারছি না,...ও, আচ্ছা...তার ছোট বোন? সেটাকেও মেরে ফেলতে হবে...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হঁ্যা, কুকুরটাও সঙ্গে আছে বটে...তাকে ত মারবার কোন উপায় দেখি না...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) কি বলছ?...ঘুষ দিয়ে?...অসম্ভব.. চেষ্টার ত্রুটী করি নি...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) আর কে কে আছে? আগুন, চিনি, জল আর রুটী।...সকলেই আমাদের দিকে, কেবল রুটীকে একটু সন্দেহ হয়।... আলো শুধু একা মানুষের পক্ষে; কিন্তু সে আসবে না।...আমি তিলতিলকে বুঝিয়েছি যে আলো যেমনি ঘুমোবে অমনি যেন তারা লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ...এমন সুযোগ কি আর হয়?...(পত্রের মর্‌মর্‌ শব্দ) হঁ্যা, হঁ্যা, ঠিক কথা, জানোয়ারদের খবর দিতে হবে বৈকি।... আচ্ছা, তা হলে তাকে এক্ষুনি নাগরা পিটে জানোয়ারদের খবর দিতে বল...বাহবা! ঠিক হয়েছে...এদিকে যে এরাও এসে পড়ল!

খরগোসের নাগরার শব্দ শুনা গেল। তিল-তিল, মিতিল এবং কুকুর প্রবেশ করিল।

তিলতিল। এই কি সেই জায়গা?

বিড়াল। (অতিশয় নম্রতা এবং আগ্রহ ভরে অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই যে প্রভু এসেছ!...আজ কি সুন্দর, কি চমৎকার তোমায় দেখাচ্ছে!...তোমার আসবার খবর আগেই আমি ওদের দিতে গেলুম। ...খবর ভাল।...আজ রাত্রেই আমরা নীলপাখীটাকে হাত করতে পারব।... দেশের প্রধান প্রধান জানোয়ারদের জড় করবার জন্য আমি খরগোসকে নাগরা পিটতে বলে দিয়েছি...ওই যে জানোয়ারদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে...ওই যে গাছতলায় সব একে একে জড় হচ্ছে...কিন্তু ওরা একেবারে তোমাদের কাছে আসবে না... একটু লাজুক কি না! (নানাপ্রকার জানোয়ারের আওয়াজ শুনা যাইতে লাগিল, গরু, শুয়ার, গাধা, ঘোড়া, ইত্যাদির। বিড়াল তিলতিলকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গেল) দেখ, কুকুরকে কিন্তু আনা ঠিক হয় নি...সকলের সঙ্গেই ওর ঝগড়া...গাছেদের সঙ্গেও ওর বনে না...আমার ভয় হয়, ও হতেই বুঝি-বা সব পণ্ড হয়ে যায়!

তিলতিল। ওকে ফেলে রেখে আসতে পারি নি।...(কুকুরের প্রতি সরোষে) দূর হ হতভাগা! সকলের সঙ্গেই ঝগড়া!

কুকুর। কে? আমি!...কেন?... আমি কি অপরাধ কল্লুম?

তিলতিল। দূর হ বলছি...তোকে আমরা এখানে চাই না...যা, দূর হয়ে যা!

কুকুর। আমি মুখটী বুজে থাকব—একটীও কথা কব না।...তারা আমায় দেখতে পাবে না...আমায় মাফ কর...তাড়িয়ে দিও না...

বিড়াল। (তিলতিলের প্রতি চুপে চুপে) ওকে কি এই রকমে প্রশ্রয় দিতে চাও!...ভারি অবাধ্য ত!...দাও না ঘা কতক বসিয়ে...অসহ্য করে তুল্লে!

তিলতিল। (কুকুরকে প্রহার করিল) এইবার বোধ হয় আমার কথা শুনবি!

কুকুর। (যন্ত্রণায়) ঔঃ! ঔঃ! ঔঃ!...

তিলতিল। কি বলিস্ এখন!

কুকুর। তুমি আমায় মারলে; এবার আমি তোমার মুখে চুম খাব...

তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

তিলতিল। আচ্ছা, ঢের হয়েছে, এবার যাও এখান থেকে!

মিতিল। না, না; কেন ও যাবে? আমি ওকে যেতে দেব না; ও কাছে না থাকলে আমার বড্ড ভয় করে।

কুকুর। (আহ্লাদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চুম্বনে চুম্বনে মিতিলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল) এই ত কথার মত কথা!...কি সুন্দর তুমি!...কি চমৎকার তুমি!...আর একটা চুমু দাও, আর একটা,

বিড়াল। আহাম্মক কোথাকার!...আচ্ছা, দেখা যাবে তখন!...আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।...হীরেটী ঘুরিয়ে ফেল।

তিলতিল। কোথায় আমি দাঁড়াব!

বিড়াল। এই চাঁদের আলোয়...তা হলে ভাল রকম দেখা যাবে; এইবার আস্তে আস্তে ঘুরোও।

তিলতিল হীরকটী ঘুরাইয়া দিল। বৃক্ষ সকলের ডালপালা হিস্ হিস্ শব্দে নড়িয়া উঠিল। পুরাতন এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ফাঁক হইয়া গিয়া প্রত্যেকের ভিতর হইতে আত্মা বাহির হইতে লাগিল। বৃক্ষের চেহারা-অনুযায়ী তাহাদের আত্মাগুলিও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিল। কেহ বা হাত-পা ছড়াইয়া আলস্য ভাঙিয়া গুঁড়ির ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল—যেন কতকাল ধরিয়া সব ঘুমাইতেছিল। কেহ কেহ বা উৎসাহভরে লাফাইয়া বাহির হইতে লাগিল। সকলে আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ঝাউগাছ। (সর্ব্বপ্রথম অগ্রবর্ত্তী হইয়া এবং প্রাণপণে চীৎকার করিয়া) মানুষ? ...এই ছোট্ট মানুষ!. আমরা এদের সঙ্গে কথা কইব!...আমাদের মুখ ফুটেছে; নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেছে!... এরা কোত্থেকে এসেছে! কে এরা!...কি করে?

(লেবু গাছের প্রতি; সে চুরুট টানিতে টানিতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।)

খুড়ো, এদের চেন কি?

লেবুগাছ। এদের কখনও দেখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।

ঝাউগাছ। নিশ্চয় তুমি দেখেছ!...তুমি সব মানুষকেই চেনো; তুমি তাদের ঘরের উপর সর্ব্বদা ঝুলে থাকো।

ভাল করিয়া দেখিয়া) না ; আমি ঠিক বলছি, এদের চিনি না।…এরা এখনও ভারি ছেলে মানুষ। আমি চিনি শুধু প্রণয়ীদের, যারা চাঁদের আলোয় আমার কাছে আসে। আর চিনি মাতালদের, যারা আমার তলায় বসে সরাব খায়।

বাদামগাছ। (চসমাখানা ভাল করিয়া চোখে লাগাইয়া) কে এরা ?…বড্ড গরিব ? …পাড়া-গাঁ থেকে এসেছে বোধ হয়!

ঝাউগাছ। তোমার কথা যদি বলতে হয়, তুমি ত বড় বড় সহরের রাস্তা ছাড়া আর কোথাও বড় একটা দেখা দাও না!

উইলো। ও ভাই, ওরা জ্বালানি কাঠের জন্যে আবার আমার হাত পা কাটতে এসেছে!

ঝাউগাছ। চুপ্‌, চুপ্‌; ওক্ আসছে; সে তার প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। আজ ত ওকে বড়ই অসুস্থ দেখছি!… ক্রমশ বুড়ো হয়ে পড়ছে কি না!… আচ্ছা, ওর বয়স কত হতে পারে?… কেউ কেউ বলে, ওর বয়স নাকি চার হাজার বছর।…আমার কিন্তু মনে হয়, অত নয়… সব কথা আজ সে নিজেই খুলে বলবে।

ওক্ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিল। সে অতিশয় বৃদ্ধ। একখানি সবুজ আঙরাখায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; মস্তকে লতার মুকুট; সাদা ধবধবে দাড়ি বাতাসে উড়িতেছিল। সে অন্ধ। একগাছি শক্ত লাঠির উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁটিতেছিল। একটী ছোট ওক্ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছিল। নীলপাখীটি তাহার কাঁধের উপর বসিয়া ছিল। সে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমুদয় বৃক্ষ সারবন্দী দাঁড়াইল এবং তাহাকে সসম্ভ্রমে অভি-

তিলতিল। এই যে, এর কাছে নীল-পাখী…শিগগির, শিগ্‌গির ওটা আমায় দাও।

বৃক্ষসকল। চুপ কর!

বিড়াল। টুপি খোলো, বৃদ্ধ সম্রাট ওক্ উপস্থিত!

ওক্। কে গা তুমি ?

তিলতিল। মশাই, আমি তিলতিল।… নীলপাখীটি কখন্ আমায় দেবেন ?

ওক্। তিলতিল ? কাঠুরের ছেলে ?

তিলতিল। হ্যাঁ মশাই।

ওক্। তোমার বাবা আমাদের কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করেছে, জান ? কেবল আমার বংশেরই কতজনকে মেরেছে, দেখ। আমার ছ'-শ' ছেলে, পাঁচশ খুড়ো-খুড়ী আর তাদের ছেলে মেয়ে বারো-শ', চার-শ' জন বউ, আর বার হাজার নাতি-নাত্‌নিকে সে মেরে ফেলেছে।

তিলতিল। মশাই, আমি তার কিছুই জানি নে। তিনি বোধ হয় ইচ্ছে করে মারেন নি।

ওক্। তুমি কি জন্যে এখানে এসেছ ? আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিজন্য আমাদের বাইরে এনেছ ?

তিলতিল। আপনাদের বিরক্ত করেছি বলে মাফ চাইছি‥ বেড়াল বল্লে, নীলপাখীর সন্ধান আপনারা বলে দেবেন।

ওক্। হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি নীলপাখী খুঁজে বেড়াচ্ছ, তার মানে প্রত্যেক জিনিসের গুপ্ত রহস্যটুকু।…তা হলে সব রকম সুখ হাতে আসবে, আর মানুষ আমাদের দাসত্বটাকে আরও কঠোর করে তুলবে।

বেরীলুনের ছোট মেয়েটীর ভারি অসুখ, তারই জন্য এটী দরকার।

ওক্। (চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল) ভাল!···জানোয়ারদের অভিপ্রায় এখনও শুনিনি···কোথায় তারা!···এতে আমাদের যেমন স্বার্থ, তাদেরও তেমনি। ···আমরা অর্থাৎ শুধু গাছেরা মিলে একটা সিদ্ধান্ত করলেই চলবে না, তাদেরও মতামত নিতে হবে।

দেবদারু। খরগোসের সঙ্গে জানোয়াররা-সব আসছে; এই যে তারা। ঘোড়া, ষাঁড়, ভেড়া, নেকড়ে, শুয়ার, ছাগল, গাধা আর ভাল্লুক একে একে সব এইদিকে আসছে।

জানোয়ারগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবদারু প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল এবং তাহারা আসিয়া একে একে গাছতলায় বসিল। কেবল ছাগল এদিক ওদিক-ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং শুয়ার গাছের গোড়ায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া মাটি খুড়িতে লাগিল।

ওক্। সকলেই হাজির?

খরগোস। মুরগী তার ডিম ছেড়ে আসতে পারবে না; সজারু বাড়ীতে নেই; হরিণের শিঙে ভয়ঙ্কর ব্যথা, সে আসতে পারে নি; শেয়ালের জ্বর, সে ডাক্তারের চিঠি দিয়েছে—এই সে চিঠি; হাঁস আমার কথা বুঝতেই পারলে না; আর মোরগ ত চটেই লাল, সে গস্‌গসিয়ে চলে গেল।

ওক্। এদের অনুপস্থিতির জন্যে আমরা দুঃখিত।···যাই হোক্ এতেই আমাদের সভার কাজ চলবে।···দেখ ভাই সব, আমরা কি জন্যে আজ জড়ো হয়েছি, তা জান বোধ হয়? এই যে ছেলেটী—ও নীলপাখীকে নিতে এসেছে; ইচ্ছে কল্লেই সেটী নিতে পারে। কিন্তু তা হলে যে গুপ্ত রহস্যটুকু আমরা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে লুকিয়ে এসেছি, সেটুকু হাতছাড়া হয়ে যাবে।··মানুষকে চেনো ত? একবার এটী পেলে আমাদের দুর্দ্দশার আর আর অন্ত থাকবে না। সেজন্যে আমি বলি যে আর ইতস্তত করা উচিত নয়··· আর এক মুহূর্ত্ত দেরি না করে ছেলেটাকে থাবড়ে দি, এস।

তিলতিল। ও কি বলছে?

কুকুর। (ওক্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য তার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল)

এইও বুড়ো, পাজী ব্যাটা! আমার দাঁত দেখেছিস?

বীচ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) ওক্‌কে অপমান করছে, দেখ।

ওক্। কে ওটা, কুকুর!···দাও ওকে তাড়িয়ে...বিশ্বাসঘাতকের স্থান এখানে নেই...

বিড়াল। (একান্তে, তিলতিলের প্রতি) কুকুরকে তাড়িয়ে দাও..ওদের কথার উল্টো মানে করছে...আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি···কোন ভয় নেই.. কুকুরকে কিন্তু তাড়িয়ে দাও!

তিলতিল। যা বলছি এখান থেকে!

কুকুর। হুজুর, হুকুম দিলে এই বেতো, বুড়ো ভিখিরি ব্যাটার পা দুটো খুব কসে আঁচড়ে দি; ভারি মজাই হবে এখন!

তিলতিল। চুপ কর্ পাজী!...তুই বেরো এখান থেকে!

কুকুর। আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

...তোমার যখন দরকার হবে আমি আসব।

বিড়াল। (একান্তে তিলতিলের প্রতি) একে বেঁধে রাখাই ভাল, কি জানি কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে...শেষে গাছেরাও সব চটে যাবে আর সব পণ্ড হবে।

তিলতিল। বাঁধব কি করে?...শেকল ত আনিনি...

বিড়াল। সেজন্যে ভাবনা নেই, এই যে আইভি রয়েছে... খুব শক্ত করে সে বেঁধে ফেলবে।

কুকুর। (গর্জ্জিয়া উঠিয়া) ও, এতক্ষণে বুঝতে পারলুম; বেড়াল হল যত নষ্টের গোড়া!...ওকে আমি দেখছি।...হ্যাঁরে, কি ফিস্ ফিস্ করে কচ্ছিস তুই!...ওরে বেইমান, ওরে নচ্ছার, ওরে পাজী!...ভৌঃ, ভৌঃ ভৌঃ!

বিড়াল। দেখ্‌ছ, আমাকে অপমান করছে।

তিলতিল। বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুল্লে!...আইভি, তুমি ওকে আচ্ছা করে বেঁধে রাখ ত!

আইভি। (ভয়ে ভয়ে কুকুরের নিকট গিয়া) কামড়াবে না ত?

কুকুর। (গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে) না, বরং তার উল্টো...একটু থাম...আচ্ছা,... তুমি আমার সঙ্গে চল।

তিলতিল। (ছড়ি উঠাইয়া) টাইলো!

কুকুর। (তিলতিলের পায়ের নিকট শুইয়া ল্যাজ নাড়িতে লাগিল) হুকুম করুন, আমায় কি করতে হবে?

তিলতিল। সটান শুয়ে পড়...আইভি তোমায় বাঁধবে...তুমি চুপটী করে থাক, নইলে—

কুকুর। (মুখ বুজিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং আইভি তাহাকে বাঁধিতে লাগিল) বাঁধ, বাঁধ, যেমন করে ইচ্ছে, বাঁধ।...দেখ হুজুর, আমার নখগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে, নিশ্বাস চেপে ধরছে!

তিলতিল। আমি কিছু জানি না... যেমন তোর নষ্টামি চুপ করে থাক্... নড়িস্ নি...বড্ড বাড় বাড়িয়েছিস্ তুই!

কুকুর। তুমি আগাগোড়া ভুল বুঝেছ ...বেড়াল নেমকহারামি করেছে...ওরা তোমায় মেরে ফেলবে...হুঁসিয়ার হও... এই দেখ, মুখ বাঁধছে...আমি কথা কইতে পারছি না!

আইভি। কোথায় একে রাখব...খুব শক্ত বাঁধন দিয়েছি...কথা কইবারও যোটী রাখিনি।

ওক্। আমার একটা বড় শিকড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও—একেবারে পিছন দিকে ওর বিচার পরে করা যাবে... আচ্ছা, এবার হয়েছে ত?...এখন কাজের কথা বলি...মানুষের অত্যাচার আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে রয়েছে...আমি যে কি ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করেছি, সে আমিই জানি।...এই প্রথম, আজ আমরা মানুষের বিচার করতে বসেছি; সেও আমাদের ক্ষমতা বুঝতে পারবে।...যে অনিষ্ট সে আমাদের করেছে, যে রকম নিষ্ঠুরতা সে এদ্দিন দেখিয়েছে, তাতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমাদের কারও এতটুকু আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সমুদয় বৃক্ষ ও জানোয়ার। না, না, না; কিছুতেই নয়!...ফাঁসি দাও, মেরে ফেল... ভয়ানক অত্যাচার!...ঘোর অবিচার! আর সহ্য হয় না!...টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল...মেরে ফেল...আর দেরি না···এই দণ্ডে...এইখানেই—

তিলতিল। (বিড়ালের প্রতি) এরা অমন করছে কেন? চটেছে না কি?

বিড়াল। ভয় নেই...একটু বিরক্ত হয়েছে বটে, কেননা বসন্ত ঋতু আসতে এখনও দেরি...তা হোক্; ভয় নেই... আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

ওক্। তাহলে আমরা ঠিক করে ফেলি এস, কি উপায়ে হত্যা করা যাবে। কোন্‌টা সব চেয়ে সোজা, সব চেয়ে নিরাপদ এবং কি উপায় করলে বেশী দাগ-টাগ থাক্‌বে না, যাতে শেষে ধরা না পড়ি।

তিলতিল। এরা কি করছে সব?··· ...কিসের এত গণ্ডগোল? আমি ত আর পারিনা!···ওর কাছেই নীলপাখী রয়েছে, দিয়ে ফেল্লেই ত চুকে যায়!

ষাঁড়। সব চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে পেঠের নীচে আমার শিঙের একটী গুঁতো দেওয়া!...বল ত আমি—

ওক্। কে ও কথা কইচে!...

বিড়াল। ষাঁড়।

বীচ। আমার সব চেয়ে উঁচু ডাল আমি দিতে পারি ওদের ফাঁসে ঝোলাবার জন্তে।

আইভি। ফাঁসি লাগাবার জন্তে খুব ভাল দড়ি আমি দিতে পারি।

দেবদারু। কফিনের জন্তে আমি চারখানা তক্তা দিতে পারি।

উইলো। সব চেয়ে সোজা উপায় আমার মনে হয় নদীতে চুবিয়ে মারা... আমি তার ভার নিতে পারি।

লেবুগাছ। (নম্রস্বরে) থাম, থাম; একেবারে অতদূর করাটা কি সত্যি সত্যি দরকার?...ওরা এখনও বড্ড ছোট্ট। আমি বলি, ওদের কয়েদ করে রাখ, যাতে কোন অনিষ্ট না করতে পারে। আমি বরং চারদিক ঘিরে ওদের কয়েদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ওক্। কে ও? লেবুগাছের মিষ্টি আওয়াজ পাচ্ছি না?

দেবদারু। হ্যাঁ, সেই।

ওক্। তা হলে দেখছি, জানোয়ারদের মত আমাদের মধ্যেও ধর্ম্মদ্রোহী আছে... আজ থেকে তবে ফলের গাছকেও রাজদ্রোহী বলে ধরা গেল। ফলের গাছ ত আর সত্যি সত্যি গাছ নয়!

শুয়ার। আমি বলি, ছোট্ট মেয়েটাকে আগে খেয়ে ফেলা যাক্। আহা! কি মোলায়েমই লাগবে!

তিলতিল। কি বলছে ওটা?

বিড়াল। কি জানি, ওরা কিসের গণ্ডগোল করছে! গতিক বড় ভাল দেখছি না।

ওক্। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে প্রথম মানুষকে আক্রমণ করবে? কে প্রথমে এগুবে?

দেবদারু। এ সম্মান আপনারই প্রাপ্য, আপনি হলেন রাজা—আমাদের মধ্যে প্রধান।

ওক্। কে ও, দেবদারু! ভায়া, এখন

আমি বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি...চোখদুটী অন্ধ ...হাতে আর সে জোর নেই...সেদিন কি আর আমার আছে!...তুমিই বরং এ সম্মান গ্রহণ কর; তুমি চির-সবুজ, উঁচু মাথা, অনেক গাছের জন্ম তুমি দেখেছ! আমার অক্ষমতায় এ সম্মান তোমারই প্রাপ্য... তুমিই অগ্রসর হও।

দেবদারু। ধন্যবাদ; কিন্তু কফিনের জন্যে তক্তা জোগাবার সম্মান যখন আমার রয়েইছে তখন এর উপর আবার একটা ভার নিতে গেলে অন্য গাছদের উপর অবিচার করা হয়; এতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সেইজন্যে আমি বলছি যে বীচকেই বরং এ সম্মান দেওয়া হোক! আমাদের পরে প্রাচীনত্বে এবং বংশ-মর্য্যাদায় সেই-ই এ সম্মানের অধিকারী।

বীচ। তোমরা জানই ত উইপোকায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝাঁঝরা করে ফেলেছে; ডালগুলো সব ফোঁফরা—জোর নেই। কিন্তু এল্‌ম্‌ আর সাইপ্রেস্‌ বেশ শক্ত আর বলবান।

এল্‌ম্‌। এ সম্মান আমি আহ্লাদের সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না—কাল রাত্রে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল একেবারে মুচড়ে গেছে।

সাইপ্রেস্‌। আমায় যদি বল ত আমি প্রস্তুত! কিন্তু আমিও ভায়া দেবদারুর মত বেশী অধিকার নিতে ইচ্ছুক নই। গোরের ব্যবস্থা আমাকেই কত্তে হয়; তা ছাড়া কবরের উপর অশ্রুপাত করবার আবার আর-একটা কেন?...ঝাউকে বরং জিজ্ঞাসা কর।

ঝাউগাছ। আমাকে? সত্যি বলছ নাকি?...কেন, জান না কি যে কচি ছেলের হাড়ের চেয়েও আমার কাঠ নরম? তাছাড়া আমার অবস্থা এখন বড় সাংঘাতিক। আমি জ্বরে কাঁপ্‌ছি—আমার পাতাগুলো দেখছ না!...ভোর হবার আগেই আমার ভয়ঙ্কর সর্দ্দি ধরবে।

ওক্‌। (সক্রোধে) দেখছি, তোমরা মানুষকে দস্তুরমত ভয় কর।...দুটো ছোট ছেলে—একরত্তি, কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই তাদের হাতে, তারাও তোমাদের বশ করলে? তাদের দেখেও ভয়ে কেউ এগুতে পারছ না?...ঢের হয়েছে...আমি একাই যাব; এ সুযোগ ত ছাড়া যায় না।.. আমি বুড়ো হয়েছি—সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না—হাঁটতে আরি না—চোখে দেখতে পাই না—কিন্তু তাতে কি যায়-আসে!...আমি আমার চিরশত্রুর বিরুদ্ধে একাই যাব...কোথায় সে?

লাঠি উচাইয়া তিলতিলের দিকে অগ্রসর হইল।

তিলতিল। (পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া) কি?...বুড়োটা বুঝি লাঠি নিয়ে আমাকে মারতে আসছে?

বৃক্ষসকল। (ছোরা দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বৃদ্ধ ওক্‌কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। ছুরি বার করেছে!...সাবধান!...ছুরি বার করেছে!

ওক্‌। (আস্ফালন করিয়া) যেতে দাও আমায়!...ছুরিই হোক বা কুড়ালিই

কেন আমায় ?...এঁ্যা, কি বলতে চাও তোমরা ?...(লাঠি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) আচ্ছা, তাই হোক্,...ধিক্ আমাদের... জানোয়ারদেরই বলুন আমাদের রক্ষা করতে !

ষাঁড়। বেশ কথা !...দেখ, আমি কি করি ? শিঙের এক গুঁতোতেই ঠিক করে দেব !

মিতিল ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তিলতিল। ভয় কিসের ? ..আমার পিছনে থাক...ছুরি রয়েছে, ভয় কি !

ভেড়া। ছোট ছেলেটার দেখছি ভারি সাহস !

তিলতিল। তোমরা তা হলে সকলেই আমার বিপক্ষে ?

শুয়ার। ভগবানের নাম কর ; তোমার মরণ উপস্থিত !...কিন্তু ছোট মেয়েটাকে অমন করে লুকিয়ে রেখো না... আমি তাকে চোখে চোখে রাখতে চাই... আগে আমি ওটাকে খাব।

তিলতিল। (ভেড়ার প্রতি) তোমার আমি কি করেছি !

ভেড়া। না, কিছুই করনি...কেবল আমার ছোট ভাইটী, বোন তুটী, কাকা-কাকী, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমাকে তোমরা সবাই করে খেয়েছ !...থাম, দেখাচ্ছি তোমায় মজা। যখন মাটীতে চিৎপাত হয়ে পড়বে, তখন দেখবে যে আমারও দাঁত আছে !

গাধা। আর আমারও খুর আছে !

ঘোড়া। (উদ্ধতভাবে পা আছড়াইয়া) দেখ্, আমি তোর কি দশা করি ! এক লাথিতে মাটীতে ফেলে দাঁত দিয়ে তোকে ফেঁড়ে ফেলব !...(তিলতিলের দিকে দৌড়িয়া গেল, তিলতিল ছোরা উঁচাইয়া দাঁড়াইল, হঠাৎ ঘোড়াটা ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল) এ কিন্তু ভারি বিশ্রী !...ও আবার ছোরা দেখায় যে !...এ রকমটা কিন্তু ঠিক নয় !

ভেড়া। ছোট্ট ছেলেটার ত ভারি সাহস !

শুয়ার। (ভল্লুক ও নেকড়ের প্রতি) দেখ ভাই, তিন জনে মিলে ওদের খাল করি, এস। ..আমি পিছন থেকে তোমাদের সাহায্য করব। ছেলেটাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে তিন জনে ভাগ করে খাব।

নেকড়ে। সামনে গিয়ে তোমরা ওকে ভয় দেখাও, আমি পিছন থেকে লাফ দি। (তিলতিলের গায়ে লাফাইয়া পড়িল, তিলতিল পড়িয়া গেল)

তিলতিল। পাষণ্ড !...(এক হাঁটুতে উঁচু হইয়া প্রাণপণে ছুরি চালাইতে লাগিল এবং মিতিলকে কোনও রকমে বুকের নীচে ঢাকিয়া রাখিল। জানোয়ার এবং বৃক্ষসকল একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে জখম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিলতিল প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল) টাইলো, কোথায় তুমি ? শিগ্‌গির এস ! সাহায্য কর !... টাইলেট্ কোথা গেল !...টাইলেট্, টাইলেট্ !

বিড়াল। (এক পা তুলিয়া ধরিয়া) আমার চলবার শক্তি নেই, পা'টা গেছে —একেবারে মুচড়ে গেছে !

তিলতিল। (ছুরি চালাইতে লাগিল এবং প্রাণপণ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল) টাইলো, সাহায্য কর—আমি একা পারছি না !...ওরা অনেক...ভাল্লুক, শুয়ার, নেকড়ে, গাধা, দেবদারু, ঝাউ সব একসঙ্গে জুটেছে...শিগ্‌গির এস...টাইলো, শিগ্‌গির এস

টাইলো বাঁধন ছিঁড়িয়া এক লাফে আসিয়া তিলতিলের সম্মুখীন হইল এবং জানোয়ারগুলাকে ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করিল।

কুকুর। এই যে আমি এসেছি...আর ভয় নেই!...এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার দাঁতের কত জোর!...এই যে ভাল্লুক, এই যে শুয়ার, এই যে ষাঁড়,...কেমন, আর লড়বে?...এই যে গাছের দল,...এবার তোমাদেরও ঠিক করছি, দাঁড়াও!

তিলতিল। আমি আর উঠতে পারছি না...সাইপ্রেস্ আমার মাথায় খুব এক ঘা মেরেছে।

কুকুর। ঔঃ, ঔঃ! উইলো আমার পা জখম করে দিলে।

তিলতিল। ওরা আবার আসছে, ওই দেখ, নেকড়ে সকলের আগে রয়েছে!

কুকুর। থাম, ওকে এবার আচ্ছা করে দেখিয়ে দি!

নেকড়ে। (কুকুরের প্রতি) বোকা, তোমার এই কাজ!...তুমি ত আমাদের ভাই!...তোমার কি মনে নেই যে তিল-তিলের বাপ তোমার সাত-সাতটা ছেলেকে ঠেঙিয়ে মেরেছিল!

কুকুর। বেশ করেছিল!...সেগুলো তোমারই মত দেখতে হয়েছিল কিনা, তাই মেরেছিল!

জানোয়ার ও বৃক্ষগণ। অধার্ম্মিক!... বিশ্বাসঘাতক!...আহাম্মক! ওকে ছেড়ে দে!...ওটা ত মরে গেছে!...এখনও বলছি, আমাদের দলে আয়!

কুকুর। কখ্খন না!...প্রাণ থাকতে নয়!...তোমরা সকলে এক দিকে, আমি একা অন্যদিকে!...ভগবান আছেন, ধর্ম্ম আছেন, ভয় কি!...তিলতিল সাবধান, ভাল্লুক তেড়ে আসছে!...ষাঁড়টাও আসছে! ...আমি লাফিয়ে ওর টুঁটি ধরব!...উঃ-হুঃহুঃ, গাধা ব্যাটা এক ঘা লাথি মেরেছে রে!...দুটো দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে! উঃ!

তিলতিল। টাইলো, আমার দফা রফা!...উঃহুঃহুঃ এল্‌ম্ আমার মাথায় আর এক ঘা খুব মেরেছে...এই দেখ, রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে!

কুকুর। আহা, হা! এস, এস, আমি বেশ করে চেটে দি; এখনি সেরে যাবে! ...তুমি আমার পিছনে থাক, ভয় নেই! ...আবার ওরা আসছে!...এবার আমাদের প্রাণপণে রুখে দাঁড়াতে হবে!

তিলতিল। (মাটীতে শুইয়া পড়িয়া) নাঃ...আর আমি দাঁড়াতে পারছি না!

কুকুর। (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ওই তারা আসছে...ওই তাদের আওয়াজ পাচ্ছি ...গন্ধ পাচ্ছি!

তিলতিল। কোথায়!...কে আসছে!

কুকুর। আর ভয় নেই! আলো আসছে!...সে আমাদের খুঁজে পেয়েছে! ...ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার প্রভু বেঁচে গেলেন...ঐ দেখ গাছগুলো, জানোয়ারগুলো সব পিছু হঠ্‌ছে...ওরা ভয় পেয়েছে!

তিলতিল। আলো, আলো! শিগ্‌গির এস, শিগগির এস!...ওরা বিদ্রোহী হয়েছে...আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে!

আলো প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিবামাত্র বনভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল—ভোর হইল।

আলো। কি এ!...ব্যাপার কি!...

কিন্তু বাছা, তুমি করছ কি—জান না?... হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, এখনি সব নিস্তব্ধ, অসাড় হয়ে যাবে।

তিলতিল হীরকখণ্ড ঘুরাইবামাত্র বৃক্ষ সকলের আত্মা গিয়া গুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। জানোয়ারদের আত্মাও অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কতকগুলি নিরীহ ষাড়, ভেড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতি দূরে চরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বনভূমি নীরব, নিস্তব্ধ হইল। তিলতিল বিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

তিলতিল। কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল সব!...কি হয়েছিল ওদের? ওরা···

আলো। না, ওরা সর্ব্বদাই এই রকম দুর্দ্দান্ত; কিন্তু আমরা তা জানতে পারি না, কেননা দেখতে পাই না।·· আমি প্রথমেই তোমায় বলেছিলুম যে আমি যখন না থাকব তখন ওদের জাগালেই বিপদ ঘটবে!

তিলতিল। (ছুরি মুছিতে মুছিতে) টাইলোই বাঁচিয়ে দিলে, আর এই ছুরিখানা ..আমার ধারণাই ছিল না যে ওরা এত-বড় দুর্দ্দান্ত!

আলো। এখন বোঝো সমস্ত জগতের বিপক্ষে মানুষ একাই সব।

কুকুর। প্রিয় দেবতা, তোমার ভারি লেগেছে!

তিলতিল। তেমন নয়...মিতিলকে কিন্তু তারা ছুঁতেও পারেনি!...টাইলো, তোমার কিন্তু বড্ড লেগেছে...তোমার মুখময় রক্ত, পা ভেঙ্গে গেছে! আহা!

কুকুর। ও কিছু নয়!...সকাল হলেই সেরে যাবে। লড়াইটা কিন্তু ভারি জবর চলেছিল!

বিড়াল। (পিছনের একটা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া নেংচাইতে নেংচাইতে) কি লড়াই-ই বেধেছিল!··উঃ! ষাঁড়টা আমার পেটে এমন এক গুঁতো মেরেছিল... দাগ টের পাওয়া যাচ্ছেনা বটে, কিন্তু বড্ড বেদনা।...ওক্ আমার পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

কুকুর। সত্যি?...কোন্ পা-টা!·· হ্যাঁরে, কোন্ পা-টা!

মিতিল। আহা বেচারা!...বড্ড লেগেছে! ...কোথায় ছিলে তুমি, একবারও ত তোমায় দেখিনি!

বিড়াল। (ভণ্ডামির সহিত) আর মা, সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন? শুয়ারটা তোমায় খেতে আসছিল, আমি তাকে তাড়া করতে গিয়েই না খাল হয়ে পড়লুম! আর বুড়ো ওক্ অমনি বাগ পেয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে—আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কুকুর। (সরোষে দাঁত কড়্মড়্ করিয়া) আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই...ওরে নেমক্হারাম, বুঝলি? ·· আয় দেখি তুই আমার সঙ্গে।

বিড়াল। (মিতিলের প্রতি) দেখ না মা, আমায় অপমান করছে...মারবে বলে শাসাচ্ছে।

মিতিল। (কুকুরের প্রতি) আহা, না, না, ছেড়ে দে ওকে; ওরে এই পাজা, হতভাগা!

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সৌভ্রাত্র

(Tennyson Turner হইতে)

কন্‌কনে শীত মাঘের বিষম রাত
  হয়ে গেছে মাঠে ধান-কাটা সব সারা,
নিজ নিজ ধান করেছে খামার-জাৎ
  এখন কেবল বাকী আছে শুধু মাড়া।
সহসা জাগিয়া বড় ভাই সেই রাতে
  ভাবিল "যে ধান পেয়েছে ভাইটি মোর,
হয়ত তাহার বছর যাবেনা তাতে"
  যাইল খামারে রাত্রি না হতে ভোর।

উঠে ধীরে ধীরে কম্বল গায় মুড়ে
  বোঝা-ছয় ধান খামার হইতে লয়ে'
চুপেচুপে গিয়ে দাদার ধানের কুঁড়ে
  দিয়ে এলো ভাই মাথায় করিয়া বয়ে।
আপন আপন খামারে যাইয়া প্রাতে
  গুণে দেখে বোঝা যেমন তেমনি রয়,
ভাবে দোঁহে তবে স্বপন দেখিল রাতে!
  বারবার গোণে বেড়ে যায় বিস্ময়।

কন্‌কনে জাড়ে চোরের মতন গিয়া
  খামার হইতে লয়ে ধান বোঝা-ছয়,
গোপনে ভায়ের খামারে আসিল দিয়া
  ভায়ের স্নেহটি এমনি গোপনে বয়।
ঠিক সেই রাতে জেগে উঠে ছোট ভাই
  ভাবিল—"দাদার সংসার চলা ভার,
ঐ ক'টি ধান—অন্য উপায় নাই—
  ছেলেপুলে লয়ে কেমনে চলিবে তার?"

বৃদ্ধ মোড়ল এ-কথা শুনিল যবে
  চোখ দিয়ে তার দরদর ধারা বয়,
কহিল "বাপু হে, এমনি হয় ভবে
  দুটী হৃদি প্রেমে সমান যখন রয়।"
দুইজনে ডাকি কহে বুড়া তারপর
  "একই গৃহে রও আজি হতে দুই ভাই
আজি হতে হোক্ তোমাদের কুঁড়ে-ঘর
  গ্রামবাসীদের দেবতা-পূজার ঠাঁই।"

শ্রীকালিদাস রায়।

ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

য়ুরোপীয় মতামতের প্রভাবে ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমি দেখাইয়াছি, এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এই পরিবর্ত্তনের ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না।

এক্ষণে, এই উভয় জাতির সামাজিক সম্বন্ধ এবং তাহার পর উহাদের রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া দেখিব।

১

প্রথমে সামাজিক সম্বন্ধ।

ভারতীয় সমাজ ও ইংরেজ সমাজ—এই উভয়ের মধ্যে দুইপ্রকার প্রতিকূলতা আছে। একপ্রকার প্রতিকূলতা,—জাতি হইতে, আব্‌হাওয়া হইতে, ইতিহাস হইতে সমুৎপন্ন : উহা হইতে, একদিকে যেরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে, আইন সম্বন্ধে, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পার্থক্য, সেইরূপ আর এক দিকে, রাষ্ট্রসংক্রান্ত সমাজসংক্রান্ত, পরিবারসংক্রান্ত ধারণা ও সংস্কার সম্বন্ধেও পার্থক্য ঘটিয়াছে। অন্য প্রকার প্রতিকূলতার হেতু—সভ্যতার অসমান উন্নতি ; এমন কি য়ুরোপেও,—অতীতের প্রতি যাহারা আসক্ত, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কল্পনা অনুসারে যাহারা বর্ত্তমানকে সংশোধন করিতে চাহে—এই উভয়ের মধ্যে স্বভাবতই একটু মন-কষাকষি হয় না কি ?

* *
*

নিরক্ষর সরল লোকের মনে, ইংরেজের রীতিনীতি কিরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে, M. Kipling তাঁহার দুই নভেলে বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

"পুরোহিত বর্জ্জিত বিবাহ" নামক নভেলে, একজন ইংরেজ সৈনিকপুরুষের সহিত এক মুসলমান-যুবতীর অবৈধ যৌন-মিলনের বর্ণনা আছে।

আমীরা মেম্‌-লোকদিগকে ঘৃণা করে। এই বলিষ্ঠ সাহসী মেম্‌-লোকদিগকে সায়াহ্নে গাড়ী করিয়া সে যাইতে দেখিয়াছে ; উহাদের মাতৃভাব খুবই কম (ধাত্রী ও আয়া শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে) ; উহারা পতিব্রতা নহে, স্বামীর উপর উহাদের ভালবাসা নাই (সর্ব্বদাই বাহিরে থাকে, আপনার সাজসজ্জা, আপনার সুখ লইয়াই ব্যাপৃত)।

—"শোন বলি, আমি মরে গেলে, তুমি কি করবে " বল দেখি ? তুমি আবার তোমাদের সেই সাহসী সাদামুখ মেম্‌-লোকদের কাছে ফিরে যাবে ? সকলেই ত আপনার লোকের কাছে আবার ফিরে যায়।

—সব সময়ে না।

—স্ত্রীলোকরা যায় না বটে, কিন্তু পুরুষেরা চিরকালই যায়। শীঘ্রই হোক্‌, দুদিন পরেই হোক্‌, তুমি আপনার লোকের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। এজন্মে আমার পক্ষে সবই সমান ; কিন্তু পরজন্মে, তুমি আমা হতে ভিন্ন স্বর্গে যাবে, সে স্বর্গের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই...এ কথা কি সত্যি, সাদামুখ বড় বড় মেম্‌-লোক, আমরা যে পরিমাণে জীবন যাপন করি, তার তিনগুণ বেশী জীবন যাপন করে ? একথা কি সত্যি, তারা বুড়ো বয়সেও বিয়ে করে ?

—তারা অন্যদের মতোই করে, বিয়ের যোগ্য বয়স হলেই বিয়ে করে।

—তা আমি জানি, ওরা ২৫ বৎসর বয়সে বিয়ে করে। সে কথা সত্যি।

—হাঁ।

—ইয়া আল্লা ! ২৫ বৎসর বয়সে ! নিতান্ত বাধ্য না হলে তোমাদের কোন পুরুষ মানুষই ১৮ বৎসর বয়সের মেয়েকে বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু ২৫ বৎসর বয়সে আমি ত একেবারেই বুড়ী হয়ে পড়ব। কিন্তু এই

মেম-লোকেরা চির-যুবতী; আমি ওদের দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি নে!

—ওরা তোমার কি-করেছে?

—আমি জানিনে। হয় তো এই পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন রমণী আছে যার বয়স আমা অপেক্ষা দশ বৎসর বেশী। আর আমি যখন বুড়ী থুথ্‌বুরে হয়ে পড়ব, তখন তুমি সেই রমণীকে ভাল বাস্‌বে। এটা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত নয়। তাদেরও একদিন মরণ আছে (১)।"

Lispeth। একজন প্রটেস্‌টাণ্ট মিশানারী সস্ত্রীক আসিয়া পঞ্জাবে বাসস্থাপন করেন। তিনি একটি পাহাড়ী মেয়েকে কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে "ব্যাপ্‌টাইজ্‌" করিয়া তাহার নাম রাখেন—Lispeth। মেয়েটি ক্রমে বড় হইয়া উঠিল; অমন সুন্দরী মেয়ে প্রায় দেখা যাইত না। পাঁচফুট দশ ইঞ্চ দীর্ঘ, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ফ্যাকাশে রং, বড় বড় চোখ্‌। খুব সাদাসিধে, খুব দয়ালু, খুব গর্ব্বিত। একদিন সে দেখিতে পাইল,—এক প্রাণীতত্ত্ববিৎ ইংরেজ, একটা প্রজাপতিকে অনুধাবন করিতে করিতে, খাদে পড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, বাড়ী আসিল। তাহাদের বাড়ী সেখান হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। বাড়ীতে পৌঁছিয়া পাদ্রিসাহেবকে বলিল:—এই দেখুন আমার "বর" এনেছি, একে আরাম করে তুলুন, তারপর আমরা বিয়ে করব। পাদ্রি ও তাঁহার গৃহিনী, সাধ্যানুসারে ঐ ইংরেজের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সারিয়া উঠিলে তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল, লিস্‌পেথ তাহাকে ভাল বাসে ও তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে; মুখের সাম্‌নে একেবারে "না" বলিতে না পারিয়া, সে সম্মতির ভাণ করিল; এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে বলিয়া, দূরদেশে চলিয়া

(১) আমীরার একটি পুত্র সন্তান হইল (তার নাম "তোতা")। অতি সুন্দর ছেলে; হাত-পাগুলা কচি কচি কিন্তু বেশ সুগোল; গায়ের রং অস্তগামী সূর্য্যের মতো সোনালী। শিশুটি ক্রমে দুরন্ত আহ্লাদে ছেলে হইয়া দাঁড়াইল, সে ঘরের বেড়ালের উপর, তোতাপাখীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার করিত; তার বৃদ্ধা ধাত্রী, তার আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বদাই তার নিকট "কেঁচো" হইয়া থাকিত। একদিন তোতা জ্বরে আক্রান্ত হইল; ভাবনা চিন্তায় হীনবল হইয়া তাহার মাতা অবশেষে কলেরা-রোগে মারা গেল। তাহার সেই য়ুরোপীয় ছেলে বাঁচিয়া গেল। বলিষ্ঠ জাতি হইতে প্রসূত এই ছেলে রোগ হইতে, রোগের কষ্ট হইতে মুক্ত হইল। আমীরার শেষ-কথাগুলি অতি সুন্দর, কিন্তু উহা হিন্দু রমণীর মতোও নয়, মুসলমানীর মতোও নয়, উহার ভিতর অনেকটা "আর্টিষ্টের" রচনা, "আর্টিষ্টের" মনোভাব প্রকাশ পায়। "আমার কিছুই রেখো না। এক গাছি চুলও না। শেষে সে চুলগাছিও পুড়িয়ে ফেলতে তোমাকে সে বাধ্য করবে। আর সেই আগুনের জ্বালায় আমিও জ্বলব। আর একটু হেঁট্‌ হও—আরও একটু। এইটুকু শুধু মনে রেখো, আমি তোমারি ছিলাম, আমার গর্ভের একটি সন্তান তোমাকে আমি দিয়েছি। কাল তুমি একজন সাদা-মুখ রমণীকে বিবাহ করবে, কিন্তু প্রথম প্রসূত সন্তানের আনন্দ তুমি তার কাছ থেকে পাবে না। তোমার পুত্র জন্মিলে আমার কথা মনে কোরো, তোমার সেই পুত্র তোমার নামই ধারণ করবে। আমি তার বালাই নিয়ে মরি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন কোন ঈশ্বর নেই যিনি···তুমি, প্রাণেশ্বর...(without benifit of clergy in Lelife's Hand cap)

গেল। মনে করিল, কালক্রমে লিস্‌পেথ সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। যেমন বলা তেমনি কাজ। ইংরেজ প্রস্থান করিল। দুই মাস, তিনমাস চলিয়া গেল। প্রতিদিন প্রাতে লিস্‌পেথ পথের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে সে অধীর হইয়া উঠিল। তখন পাদ্রি-গৃহিনী তাহাকে সত্য কথাটা বলিল। লিস্‌পেথ বলিয়া উঠিল "এই রকম করে তোমরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। সব খৃষ্টানেরাই মিথ্যাবাদী"। সে তাহার য়ুরোপীয় পোষাক খুলিয়া ফেলিল, এবং নিজের পাহাড়ী কাপড় পরিয়া তাহার নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল। আবার স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, এক পাহাড়ী ছোক্‌রাকে সে বিবাহ করিল। ছোঁড়াটা তাহাকে প্রহার করিত, কিন্তু লিস্‌পেথ তবু তাহাকে ভাল বাসিত: আর যাই হোক্ সে মিথ্যা কথা কহিতে জানিত না (২)।

* *
*

য়ুরোপীয় আচার-ব্যবহার দেখিয়া শুধু যে সাধারণ লোকে বিস্মিত হয় তাহা নহে, শিক্ষিত ভারতবাসীরাও উহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারে না। মালাবারীর "ইংরেজি জীবনযাত্রার উপর ভারতীয় দৃষ্টি" নামক গ্রন্থে, লণ্ডনের এই বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা আমরা দেখতে পাই:—

"রাস্তায় সমস্ত লোকই বে-দম্ ছুটাছুটি করিতেছে। তাহার কারণ—গ্রন্থিবাত, অভ্যাস বা প্রয়োজন। অবশ্য, এই ব্যস্ততা ও ক্ষণিক উত্তেজনার মধ্যে, অনেকেরই পক্ষে, এই তীব্র শীতল বায়ুই সুখের বা কাজকর্ম্মের উদ্দীপনাস্বরূপ। আমার ভারি আমোদ বোধ হয় যখন দেখি, মেয়ে পুরুষ সবাই বোচকা-বুচকি লইয়া রেল-কর্ম্মচারীদের মুখের সাম্‌নে ছাতা আস্ফালন করিয়া, ষ্টেশনে পাগলের মতো ছুটিয়া আসিতেছে। একটি "গিন্নী-বান্নি" স্ত্রীলোক, যে সময়ে ট্রেন ছাড়িবে, ছাড়িবার বাঁশী দিয়াছে, ঠিক্ সেই শেষ-মুহূর্ত্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে..."

প্রকৃত এসিয়াবাসীর ন্যায় মালাবারী আরও এই কথা বলেন:—"এই উন্মত্ত জীবন-চাঞ্চল্যের মধ্যে, এই সব লোকেরা কথা কহিবারও অবকাশ পায় না; অস্পষ্ট উচ্চারিত কতকগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দমাত্র, একটা পূরাবাক্য প্রায় শুনা যায় না। রাস্তায় এমন একটি লোকও দেখা যায় না, যার চলন-ভঙ্গীতে বা ভাষায় একটু গাম্ভীর্য্য আছে। তুমি যদি সরিয়া না যাও, তোমাকে রূঢ় ভাবে এক ঠেলা দিবে, তোমার পানে একবার চাহিয়াও দেখিবে না। কেহ কেহ ক্ষমা চাহে; কিন্তু তোমার মনে হইবে—অপরাধ ত করিয়াছে, তাহার উপর আবার অপমান (৩)।" এই চিত্রের সহিত মালাবারী-প্রণীত গ্রন্থে আর কতকগুলি কঠোর পৃষ্ঠা যোগ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে ম্যালাবারী য়ুরোপীয় সমাজের মাত্‌লামি, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত পাপাচারকে চাব্‌কাইয়াছেন।

---

(২) Lispeth—Plain tales of the hills.

(৩) (Malabari, "The Indian eye on English life" P. 30)

অপক্ষপাত লেখক,—তিনি যেমন দোষ দেখাইয়াছেন, তেমনি অনেক গুণও স্বীকার করিয়াছেন।

ইংরেজের গৃহ ও শিক্ষার প্রশংসা করিয়া তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"ইংরেজদের মধ্যে, গার্হস্থ্য জীবনে সাম্য-নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সাম্য অর্থে, মতের স্বাধীনতা ও অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন। স্বামী ও স্ত্রী,—ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে উল্টা মত পোষণ করিতে পারে; গৃহে কিন্তু উহারা এক-প্রাণ। উহারা পরস্পরের বিশ্বস্ত সঙ্গী; পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ, একান্ত অনুগত, সেবা-নিরত; উভয়েই সাধারণ ভাণ্ডারের জন্য সুখ সঞ্চয় করিয়া আনে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যেও সেই রূপ মধুর সম্বন্ধ। সন্তানদিগের মনে কোন ঢাকাঢাকি ভাব নাই, পিতামাতার মনেও কোন সন্দিগ্ধতা নাই। মা ও মেয়ে যেন দুই ভগিনী এবং বাপ ও ছেলে যেন দুই ভাই,—তাহাদের ব্যবহারে এইরূপ মনে হয়। পিতা মাতা সন্তানের উপর নিজের প্রভুত্ব জারি করে না, সন্তানেরাও স্বকীয় স্বাধী-নতার অপব্যবহার করে না। যখন কোলের শিশু, তখন হইতেই পুত্রকন্যারা হৃদয়ের শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা লাভ করে; তাহার কিছু কাল পরে, মানসিক শিক্ষাও আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা-পদ্ধতিটা কি-স্বাভাবিক! শিক্ষা দিবার প্রণালীটাও কি-প্রীতিকর! এই শিক্ষা ক্লান্তিজনক নহে, এই শিক্ষা "গিলাইয়া দেওয়া" শিক্ষা নহে"......

মালাবারী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—ভারত-বাসীরা ইংরেজ-প্রভুর দোষগুলা না লইয়া শুধু গুণগুলি গ্রহণ করিতে পারেন না কি? কিন্তু তখনি আবার তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবাসী শিক্ষালাভ করে, তাহাদের মধ্যে ইহার বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"আমি অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়াছি—কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংলণ্ডের কালেজে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া, শেষে খিটখিটে-মেজাজ ও তিতিবিরক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসে। উহার কারণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না, যে ব্যক্তি সমস্ত অবস্থা জানে সে সহজেই বুঝিতে পারিবে। ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ সঙ্গীদের সহিত সমানভাবে মিশিতে পারে না। নিজের বাড়ীতে অল্প বয়সে সে যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে এইরূপ ভাবে মিশিবার জন্য সে প্রস্তুত হয় নাই। একটা বিষয়ে তার বড়ই অভাব আছে। যে খেলাধূলা ইংরেজি কালেজে, চরিত্রগঠনের ও বন্ধুতার প্রধান উপাদান, সেইসব খেলাধূলায় সে খুবই পশ্চাদ্-বর্ত্তী। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ সহপাঠী, কয়েক সপ্তাহ তাহার মুরুব্বি হইতে পারে, কিন্তু তবু সে যেন তাহাকে কাঁধের বোঝা বলিয়া অনুভব করে; কেননা, ভারতীয় শিক্ষার্থী, ইংরেজ ছাত্রের অভ্যাস ও মর্ম্ম-ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কিছুদিন ইংরেজ সহপাঠীরা ভারতীয় ছাত্রের ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া শেষে উহাকে ছাড়িয়া দেয়—উহার সঙ্গে তাহারা কোন সংস্রব রাখে না। তখন সেই বিদেশী ছাত্র একলা হইয়া পড়ে। কখন কখন কালেজের

কিংবা পাড়ার যে সব ছেলে খুব নিকৃষ্ট-স্বভাব তাহারাই উহার মুরুব্বি হইয়া দাঁড়ায়। সে তখন তামাক খাইতে শেখে, মদ খাইতে শেখে, জুয়া খেলিতে শেখে, বাজি রাখিতে শেখে, এবং নানা প্রকার বদখেয়ালীতে টাকা উড়াইয়া দেয়। "কামরা ভাড়া করিয়া" জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তখন সে বাধ্য হয়। কিন্তু তথাপি নীচ রকমের বিবিধ অপব্যয় হইতে সে নিস্তার পায় না। সে রোগগ্রস্ত হয়, ঋণগ্রস্ত হয়, শেষে কালেজের উপাধি লইয়া কিংবা বিনা উপাধিতেই দেশে প্রত্যাগত হয়। সে ইংরেজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কতকগুলা ভুল ধারণা সঙ্গে করিয়া আনে। তাহার প্রধান কারণ, অল্প বয়সে গৃহের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা তাহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার উর্দ্ধে সে কিছুতেই উঠিতে পারে না। যত দিন এই দুই জাতির গার্হস্থ্য জীবনে পার্থক্য থাকিবে, ততদিন অনেক স্থলে এইরূপই চলিবে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়ার আলো

বিশ

যমুনার কথা

পিসিমার চিঠি পড়ে ছুঁড়িটার উপরে হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলুম। বটে, আমার দাদাটিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথা খাবার চেষ্টা? ও ডাইনি, রও, আগে একবার বাপের বাড়ী যাই, তারপর আঁশবঁটি দিয়ে নাক কেটে নেব! আমি শ্রীমতী যমুনা,—ম্যাজিষ্ট্রেট যার স্বামী—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখনো জলজ্যান্ত বেঁচে আছি, আমি থাকতে এতবড় বুকের পাটা? উঁহু, সেটি হচ্ছে না!

আর দাদাই-বা কেমন মানুষ বাপু! মেয়ে হোলে এতদিনে নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করতে হোত, মুখ-সাবাসি করে' 'বিয়ে করব না বিয়ে করব-না' বলে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থেকে, শেষটা কিনা কোথাকার কোন্-এক বুড়ো-ধাড়ী বিধবাকে দেখে একদম্ মন-হারিয়ে ফেলা! মন কি আলগা-ট্যাঁকের সিকি-দুআনী, যে, বলা নেই কওয়া নেই—যেখানে-সেখানে বে-টপকা ফস্ করে' অমনি হারিয়ে ফেললেই হোল! বাবা, বাবা, পুরুষের পায়ে নমস্কার!

এমনসময় হাকিমী সেরে জুতো মস্-মসিয়ে স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখে বললেন, "কার চিঠি পড়া হচ্ছে?"

—"তোমার চিঠি নয়।"

—"সে ত বুঝছিই – কিন্তু লিখেছে কে?"

—"সে কথা ক্রমপ্রকাশ্য। হে ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাক, আগে পুচ্ছ ত্যাগ করে' ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, তারপর ধীরে-সুস্থে সব শুনবেন।"

—"যমুনা, তুমি না হিন্দুললনা! স্বামীকে দাঁড়কাক বলা? অ্যাঃ!"

—"হিন্দুললনার পক্ষে কি সত্যকথা বলাও নিষেধ?"

—"তাবলে স্বামীর সঙ্গে নেহাৎ দাঁড়-কাকটার তুলনা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত কোকিল বললেও বলতে পারতে ত?"

—"হুঁ, পারতুম। কিন্তু কোকিলকে কেউ-কখনো ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করতে দেখে-নি, তাই তুমি কালো হলেও কোকিল নও!"

—"বটে! তোমরা,—রমণীরা হোচ্ছ থিয়েটারের কনসার্ট-বাজনার মতন; সে বাজনা না-থাকলে মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করে, কিন্তু থাক্‌লে প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক্ ছাড়তে থাকে। জান যমুনা, তোমার কথায় আমি ক্রমেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি!"

—"ক্রুদ্ধ যদি হও প্রিয়তম, তবে দিন বুঝে আর-একদিন হয়ো! আজ তুমি ক্রুদ্ধ হলে আমার কার্য্যোদ্ধার হবে কি-করে'? সুতরাং দায়ে পড়ে তোমার কাছে আমি মাফ চাইছি। কেমন, হোলো ত? যাও, এখন ধড়া-চূড়ো ছাড়গে!"

স্বামীকে জলখাবার দিয়ে, পাখার হাওয়া করতে-করতে আমি বললুম, "কালকে আমি দিনকতকের জন্যে বাপের বাড়ীতে যাব, তোমার মত্ কি?"

স্বামীর হাতের রসগোল্লা হাতেই রইল—চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, "অ্যাঁ, বাপের বাড়ী! এই একান্ত দুরন্ত বসন্তকালে আমার প্রাণান্ত করে' তুমি বাপের বাড়ী প্রস্থান করতে চাও? অসম্ভব!"

—"মাফ করতে হোল, মহাশয়ের আপত্তিকে আমি বেদবাক্য বলে মাথা পেতে নিতে পারলুম না।"

—"যমুনা, আমার মত্ উদার হলেও অন্তঃপুরে আমি Suffragetteএর আন্দোলন সহ্য করব না।"

—"তা না করতে পার, কিন্তু এই চিঠিখানা দয়া করে' পড়তে পারবে ত?"—বলে আমি পিসিমার পত্রখানা তাঁর হাতে দিলুম।

পত্রে পিসিমা লিখেছিলেন, দাদা নাকি কোথাকার এক অজানা ঘরে বিধবা বিবাহ করতে চান, কারুর কথা শুনছেন না, আমি যেন পত্র পেয়েই দেরি না করে' বাপের বাড়ী চলে যাই।

চিঠিখানা পড়েই স্বামী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। টেবিলে জোরে একটা ঘুসি মেরে বলে উঠলেন, "হুর্‌রে, হুর্‌রে! সাবাস মোহন, সাবাস! তোমার এতটা সৎসাহস হয়েছে—তুমি বিধবা-বিবাহ করতে চাও! সাধু, সাধু!"

আমি মুখভার করে' বললুম, "মরে যাই আর-কি! আমার দাদা বিধবাকে বিয়ে করবেন বলে হুজুরের অতটা খুসি হবার কারণ কি?"

—"খুসি হব না—বল কি? কুসংস্কারের জন্যে দেশে বিধবাদের কষ্ট কত, জানত! এ কুসংস্কারের হাত এড়াতে পেরেছে বলে মোহন আমার শ্রদ্ধার পাত্র! আর, তুমিই-

বা কি-রকমের মানুষ যমুনা? তুমি মুখে বল, বিধবাদের বিয়ে-দেওয়া উচিত, আর আজ তোমার ভাই বিধবা-বিবাহ করতে চেয়েছে শুনেই পিছিয়ে দাঁড়াচ্ছ বড় যে?"

—"বা বুদ্ধি! পিছিয়ে দাঁড়াব না? যার ঘর জানিনা, কুল জানিনা, স্বভাব জানিনা, তাকে বুঝি ধাঁ-করে' বিয়ে করে' ফেললেই হোল?"

—"সে-সব না-জেনেই কি আর মোহন বিয়ে করতে চেয়েছে?"

—"পুরুষকে বিশ্বাস করি না। স্ত্রীলোক দেখলেই তাদের জিভ দিয়ে জল ঝরতে থাকে, তাদের মাথা ঘুরে যায়। তখন তারা না পারে এমন কাজই নেই।"

—"যমুনা, পুরুষের পক্ষ থেকে আমি প্রতিবাদ করে' বলছি, তোমার এ বিশ্বাস ভ্রান্ত।"

—"প্রমাণ?"

—"আমি। অকস্মাৎ একদল স্ত্রীলোকের মাঝখানে গিয়ে পড়লে আমি আর মাথা তুলে চাইতে পারি না। জিভে জল আসা চুলোয় যাক্, উল্টে জিভ শুকিয়ে আসে!"

—"মশায়ের মত রূপে-গুণে-সেরা স্ত্রী সকলের ভাগ্যে সুলভ নয়! তুমি যে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখ, সে খালি আমার গুণে!—বুঝলে সখা, আমার গুণে!"

—"তোমার গুণ কি আমার গুণ সেটা আমি বলব না; কারণ, তোমার মত আত্মপ্রশংসা করে' আমি পাপসঞ্চয় করতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু, আর-একটা কথা বলি, শোন। স্ত্রীলোক যখন বক্তৃতা দেয়, একসঙ্গে তখন সে দুটি পাপ করে:—প্রথম, সে পৃথিবীতে রাবিশের স্তূপ বাড়ায়;—দ্বিতীয়, সে তার সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য নষ্ট করে! অতএব প্রিয়তমে, সাবধান—সাবধান!"

—"তোমার স্ত্রী-চরিত্রের ব্যাখ্যা এখন থামাও গো থামাও। আমার বক্তৃতা যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে এখন আমার বাপের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে—"

—"হ্যাঁ, আমি তোমাকে বাপের বাড়ী যেতে দিতে পারি বটে, কিন্তু এক সর্ত্তে।"

—"সর্ত্তটা কি, শুনি!"

—"মোহনের বিবাহে তুমি বাধা দিতে পারবে না।"

—"যদি দাদার যোগ্য ঘর হয়, দাদার যোগ্য বউ হয় তাহলে আমি কোন আপত্তি করব না।"

—"হ্যাঁ, তোমার এ-কথা সঙ্গত বটে। আচ্ছা, তোমার কলকাতায় যাবার আরজি মঞ্জুর হোল।"

* * *

কলকাতায় এসে পিসিমার মুখে সমস্ত শুনলুম। পিসিমা যেমন ভাবে বর্ণনা করলেন, তাতে বোঝা গেল, মেয়েটি পেত্নীর মত কুৎসিত ও অতিশয় বেহায়া, সে একেবারেই গৃহস্থের বউ হবার উপযুক্ত নয়, দাদাকে সে ওষুধ খাইয়ে গুণ করেছে। আরো যে-সব কথা শুনলুম, তাতে মেয়েটার উপরে আমার ঘৃণা ও রাগের মাত্রা বাড়ল বৈ, কম্‌ল না। পিসিমাকে বললুম, তাকে একবার ডাকিয়ে আনিয়ে বুঝানো যাক যে, তার মত

বিধবাকে বিয়ে করা আমার দাদার পক্ষে অসম্ভব।

সেদিন দুপুরবেলায় আমাদের বাড়ীতে মেয়ে-সভা যখন বেশ জমকে উঠেছে, মেয়েটিকে তখন ডেকে আনা হোল।

ভেবেছিলুম, হাড়কুৎসিত হদ্দবেহায়া একটা বুড়ো-ধাড়ী মেয়েকে দেখব। ওমা, তার বদলে এ কী! এ যে লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে-পড়া, বনফুলের মত সুন্দর ছোট্টখাট্ট একটি মোমের পুতুল! মনে হোল, যেন ভাল আঁকিয়ের তুলিতে আঁকা একটি দেবীর মূর্ত্তি জীয়ন্ত হয়ে পট ছেড়ে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াল! এমন চমৎকার তার রং, এমন গোলগাল তার গড়ন-পিটন যে, দেখলেই তাকে ভালবাসতে সাধ যায়। আমি আর চোখ ফিরাতে পারলুম না—অবাক হয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম।

ইতিমধ্যে পিসিমা আর তাঁর পাড়া-বেড়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা মেয়েটিকে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিতে লাগল। মেয়েটিকে দেখে আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম যে, কিছু বলবার অবকাশ পাইনি। তারপর যখন দেখলুম, এই সরল, লজ্জাশীলা, ভাল-মানুষ মেয়েটিকে খপ্পরে পেয়ে পাড়ার রঙ্গিনীরা সবাই মিলে যা-খুসি অপমান করতে মেতে উঠেছে, আর মেয়েটি একটিও কথা না-বলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাপুস চোখে কাঁদছে, তখন তার জন্যে আমারও প্রাণ কেঁদে উঠল।

আমি তার পক্ষ নিয়ে সবাইকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিলুম। এরা সকলে জানত যে, আমি মুখ ছোটালে কারুর মান বজায় থাকবে না। কাজে-কাজেই তারা চুপচাপ হয়ে গেল। মেয়েটিকে আমি তখন আবার তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলুম।

কিন্তু মন তবু বোঝ মানল না। আহা, এই সবে-বাপ-হারা অভাগী মেয়েটিকে আজ আমার জন্যেই এত লাঞ্ছনা আর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে হোল—এই ভেবে-ভেবে তার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট্ করতে লাগল। দাদার কাণে যদি এ-সব কথা ওঠে তাহলে তিনিই-বা কি মনে করবেন! শুনলুম, মেয়েটির বাড়ীতে এখন পুরুষ আর কেউ নেই, দাদাই তাকে দেখেন-শোনেন। আমি আর থাকতে পারলুম না—বাগান দিয়ে তার বাড়ীতে গেলুম।

গিয়ে সে কী দেখলুম!

মেয়েটি মাটিতে লুটিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে আর ভাঙ্গাগলায় মরণকে ডাকছে! উঃ, কি নির্দ্দয় আমি!

নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতে আমি তার পাশটিতে গিয়ে বসলুম। নিজের দুঃখে সে এমনি বিভোর হয়ে ছিল যে, মোটেই আমার সাড়া পেলে না! তার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, "ছি ভাই, এমন করে' মরণকে কি ডাকতে আছে?"

সে চমকে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল; সজল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

তখনো তার চোখ ছাপিয়ে গাল বয়ে টস্‌টস্ করে' জল ঝরছে দেখে আমি নিজের

আঁচলে তার চোখ মুছে দিলুম। বললুম, "লক্ষ্মীটি, আর কেঁদ না!"

সে বাধো-বাধো গলায় বললে, "আপনি—আপনি কে?"

—"আমি মোহনবাবুর বোন। কেমন, এখন চিনতে পারলে ত?"

আমার পরিচয় শুনে আবার সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ল।

আমি হেসে বললুম, "ভয় নেই বোন, ভয় নেই। আমি বাড়ী বয়ে তোমার সঙ্গে কোঁদল করতে আসি-নি। আমি এসেছি মাফ চাইতে!"

সে হেঁটমুখে খানিকটা চুপচাপ রইল। তারপর খুব আস্তে-আস্তে বললে, "কেন, আপনি কি করেছেন যে, মাফ চাইছেন? বরং আমিই আপনাদের কাছে দোষী।"

—"তুমি কিসে দোষী বোন!"

সে অভিমানে ফুলে-ফুলে বললে, "দোষী নই! আমার আপন বলতে তিন কুলে কেউ নেই, আমি গরীবের মেয়ে তায় বিধবা, আমি কি না আপনাদের নির্ম্মল বংশে কালি দিতে চাই! আমার কথায় বিশ্বাস করুন, তে-রাত্রি না পোয়াতে-পোয়াতে এ আপদ বাড়ী ছেড়ে যেদিকে দু-চোখ যায়, চলে যাবে—আপনাদের আর ভাবতে হবে না!"

মনে-মনে প্রমাদ গুণে আমি বললুম, "ভাই, আমাদের মাফ করো। পিসিমা-বুড়ী চিরকালই অমনি যা-তা বকেন, আর পাড়ার লোকেরা ত এমনি ঘোট পাকাতে পারলেই বাঁচে। ওদের কথায় তুমি কাণ

আমি কোথাও যেতে দেব না—তুমি আমাদের বউ হবে—আমাদের সংসার আলো করে' থাকবে।"

—"ওগো না, আমি চিরদুঃখী, আমার দুঃখের জীবন সংসারে কারুর কাজে লাগবে না! আমার জন্যে সমাজে কেন আপনারা মাথা হেঁট করবেন,—আমি কোথাকার কে!"

আমি আর থাকতে পারলুম না,—দুহাতে জোর করে' তাকে বুকে টেনে নিয়ে সুর করে বললুম,—

"তুমি আমার সোহাগ-পাখী আমি তোমার পিঞ্জর!"

ছাড়া পেলে তবে ত উড়ে পালাবে? কিন্তু আমরা তোমায় ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না, এমনি-করে' বুকে বেঁধে রাখব!"

আমার বুকে মাথা রেখে সে আবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তার মুখখানি তুলে ধরে বললুম, "তোর নামটি কি ভাই?"

—"সরমা।"

—"আর আমার নাম যমুনা। তা ন্যাখ্ ভাই সরম, তোর এই রাঙা ঠোঁটে আমার একটি চুমু খাবার ভারি লোভ হচ্ছে—তোর এ ঠোঁটদুখানি এখনো ত কেউ মৌরসী-পাট্টা করে' নেয়-নি? আমি চুমু খেলে সেটা বেআইনি হবে না ত? আমি ভাই হাকিমের গিন্নী—সব কাজেই আইন বাঁচিয়ে চলি!"

সেই জল-ভরা চোখেই সরমা ফিক্-করে' হেসে ফেললে; তার হাসি দেখে বুঝলুম, আমারই জিৎ! আমি আদর করে' তার

—"আমাকে আর আপনি বলে ডাকিস নি! তা-বলে তুই-তোকারিটাও যেন করিস নি,—আমি একে তোর চেয়ে বয়সে বড়, তায় শীগ্‌গির তোর ননদ হব!"

—"আপনি বড়—"

—"ফের আপনি। আমার কথা অমান্য করলে এখনি থেকে ননদ-নাড়া সুরু করে' দেব কিন্তু!"

—"তুমি ভারি দুষ্টু, ভাই, আমাকে খালি-খালি হাসিয়ে দিচ্ছ!"

—"হেসে-নে ভাই হেসে-নে, হাসতে পায় ক-জন? কান্না-ভরা সংসারে এক-একটি হাসির দাম লাখ টাকা রে লাখ টাকা!"

—"তুমি কে ভাই, একদিনেই যেন কত-জন্মের আপনার লোকের মত কথা কইছ!"

—"তোর রূপ দেখলে যে জগৎ ভুলে যায়—আমি কোন্ ছার! তোকে দেখেও যে তোকে আপন করতে চাইবে না, সে কি মানুষ?"

—"তোমার পায়ে পড়ি দিদি, খালি-খালি এমন-করে' আর লজ্জা দিও না।"

—"সরমা, আমার দাদাকে তারিফ করি—তাঁর নজর খুব উঁচু বটে! তাই ত আশ্চর্য্য হয়েছিলুম, যে মানুষ বিয়ের নামে জ্বলে উঠত, সে হঠাৎ এমন বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠল কেন! এতক্ষণে সব বোঝা গেল; দাদা ত পুরুষমানুষ, তোকে দেখে আমারই মাথা ঘুরে গেছে!"

—"যাও, আবার!"

—"আচ্ছা ও-কথা আর বলব না। কিন্তু অন্য-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

—"কি?"

—"লুকোবি নে, ঠিক জবাব দিবি?"

—"কথাটাই আগে শুনি!"

—"সরমা, দাদাকে তোর মনে ধরেছে? তাঁকে তুই ভালবাসিস?"

সরমার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল।

—"কথা কচ্ছিস না যে! বল্ না—লজ্জা কি?"

—"দিদি, দিদি—"

—"থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না, তোর চোখ দেখেই সব বুঝেছি!"

একুশ

মোহনের কথা

মুরারিবাবুর স্বর্গারোহণের পর ছ-মাস কেটে গেল; সরমা পিতার অভাব এখনো ভুলতে পারে-নি বটে, কিন্তু শোকের প্রথম ধাক্কাটা সে সামলে নিয়েছে।

এর-মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে যমুনা এসে দিনকতক এখানে ছিল। পিসিমার মুখে শুনেছিলুম, আমার বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে যমুনাকে তিনি চিঠি লিখে আসতে বলেছেন। আমার এই ছোট বোনটিকে আমি যেমন ভালবাসি, তার দুষ্ট জিভকে তেমনি ডরিয়ে চলি। যদিও তার ভয়ে আমি সরমাকে ত্যাগ করতুম না, তবু, সে এসে আবার কি নতুন হাঙ্গাম বাধিয়ে বসে, তাই ভেবে আমার মন একটু উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যে প্রথম যেদিন সে এখানে আসে,

সেদিন তার কাছ থেকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আমি যখন খেতে বসলুম, যমুনা এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলে। বললে, "কি দাদা, বিয়ে করে' বৌকে বাড়ী আনতে-না-আনতেই মায়ের পেটের বোনকে পর করতে চাও নাকি?"

যমুনার ইনিয়ে-বিনিয়ে ভূমিকা শুনেই বুঝলুম, সে আমাকে নাস্তানাবুদ না-করে' ছাড়বে না। নরম হলে পাছে সে বাগে পেয়ে বসে সেই ভয়ে একেবারে চড়া মেজাজে কড়াগলায় বললুম, "কেন, হয়েছে কি?"

যমুনা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "না, না, হবে আর-কি! তবে কি না, কাল থেকে তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়-নি, তাই বলছিলুম! কাল ছিলে কোথা?"

—"যেখানে থাকি না, তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

—"ওমা, তুমি যে দেখছি গোড়া থেকেই যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি সুরু করলে! এতদিন পরে শ্বশুরবাড়ী থেকে এলুম, ভুলেও একবার জিজ্ঞেস করলে না, কেমন আছি!"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, "কিছু মনে করিস্ নি, আজ আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

—"ভাল নেই! কি হয়েছে দাদা?"

"না, না, এমন-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেছে!"

—"মাথা ধরেছে? চল, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে থাকবে চল, আমি তোমার মাথা টিপে দেব-অখন।"

—"না রে না, বেশী মাথা ধরে-নি, তোকে ভাবতে হবে না, যা!"

—"এই বললে বড্ড মাথা ধরেছে, আবার বলছ বেশী ধরে-নি! দাদা তোমার হোল কি?"

আমি বুঝলুম, দুষ্টু যমুনা আমাকে কিছু বলতে চায়—তার এ মাথা-টেপবার আগ্রহ ছলমাত্র। কি আর করি, সে যখন ধরেছে তখন অমনি-অমনি ছেড়ে দেবে না—সুতরাং খাওয়া শেষ করে' বাড়ীর ভিতরেই আসতে হোল।

যমুনা আমার পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে বললে, "দাদা, তোমারও মাথা ধরে-নি, আমাকেও মাথা টিপে দিতে হবে না, এ আমি খুব জানি! কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বল দেখি?"

আমি চটে বললুম, "তুই কি ভাবছিস, তোর ভয়ে?"

—"সে কি কথা! তুমি হলে পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক; তুমি হলে দাদা, আমি বোন; তুমি হলে বড়, আমি ছোট; আমাকে ভয়! ওঃ, অসম্ভব—অসম্ভব!"

—"থাম্, থাম্, অত পাকা কথা বলে আর ঠাট্টা করতে হবে না!"

—"আচ্ছা, আর পাকা কথা বলব না। দাদা, তুমি নাকি বিয়ে করবে?"

—"হুঁ।"

—"বিধবা-বিবাহ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হয়েছে তা?"

—"তোমার বউকে আমি দেখেছি।"

—"বেশ করেছিস্।"

—"সরমার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে।"

যমুনা কি বলতে চায়? কিছু বুঝতে না-পেরে আমি চুপ করে' রইলুম।

যমুনাও খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "দাদা, সরমাকে যত শীঘ্র পার, বিবাহ কর। পাড়ায় যে-রকম সব কথা রটেছে, তাতে যত দিন যাবে ততই গোল বাড়বে। এতে সরমার মনে কষ্ট হতে পারে। তার জন্যে তুমি এক-ঘরে হবে—এই ভাবনায় এখনি তার মন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। গোলমাল বেশী পাকিয়ে উঠলে সে হয়ত তোমাকে বিবাহ করবে না। তোমার কোন ভয় নেই দাদা, পাড়ার লোকের চোখ-রাঙ্গানিতে তুমি ভয় পেও না, ওরা তোমার কিছুই করতে পারবে না।"

যমুনা যে আমার সহায় হবে, এটা আমি কল্পনাও করি-নি। আমি ভেবেছিলুম, তার মনও সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সঙ্কীর্ণ, অনুদার। বিলাতফেরৎ স্বামীর সংসারে গিয়ে তার চরিত্র যে এমনভাবে বদলে গিয়েছে, এ আমি জানতুম না।

আমি বললুম, "বোন, পাড়ার লোককে আমি একটুও ডরাই না!"

—"কিন্তু সমাজে তোমাকে নিয়ে গণ্ড-গোল হোলে, তোমার ভালোর জন্যে সরমা হয়ত আর বিবাহ করতে চাইবে না। আমি আজকে নানা কথাপ্রসঙ্গে সরমার মন বেশ করে' জেনে এসেছি, তাই এ কথা বলছি। এ বিয়েতে তুমি দেরি কোরো না দাদা, সরমার মত স্ত্রী তুমি আর-কোথাও পাবে না!"

যমুনা কিছুদিন আমাদের বাড়ীখানি সরল হাসির তরল স্রোত ভাসিয়ে আবার স্বামীর কাছে চলে গেল। এই ক-দিনেই সরমাকে সে একেবারে নিজের করে' নিয়েছিল। তার অজচ্ছল হাসির ফোয়ারায় সরমার শোকার্ত্ত প্রাণও সরস হয়ে, তার বিমর্ষ মুখখানিও হাসির আভাসে মধুর হয়ে উঠেছিল। রোজ দুপুরবেলায় তারা দুজনে বসে-বসে গল্পগুজব করত; যমুনার মিনতি এড়াতে না পেরে সরমাকে এস্রাজ বাজাতে হোত, কোন-কোনদিন তার বাজনার সঙ্গে যমুনাও গুন্‌গুন্ করে' গান গাইত। তার নিসঙ্গ জীবনে এমন-একজন সঙ্গী পেয়ে সরমাও যেন বর্ত্তে গিয়েছিল।

যমুনা চলে যাবার পর একদিন সরমার কাছে গেলুম। সরমাকে নীচে না দেখতে পেয়ে ছাদের উপরে উঠলুম।

সূর্য্য তখন আকাশের রঙ্গের স্রোতে ডুব দিয়ে তলিয়ে গেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত নীলপট সোনার আভায় ক্রমেই সোনালি হয়ে উঠছে; তারই উপরে নরপ্রাণের বিচিত্র-অনন্ত আশার মত গোধূলির রঙ্গিন মেঘমালা ছবির পর ছবি আঁকছে আর মুছছে, আঁকছে আর মুছছে। সেইদিকে অপলক চোখে চেয়ে সরমা চুপটি করে' দাঁড়িয়ে আছে।

আমার পায়ের শব্দ তার কাণে গেল। সে ফিরে দাঁড়াল।

আমি বললুম, "সরমা, এখানে একলাটি যে?"

সরমা ম্লান হেসে বললে, "আপনার বোন দুদিনের জন্যে এসে আমার প্রাণটিকে

বন্দী করে' তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তাঁর জন্যে আমার মন-কেমন করছে!"

—"এমন একলা থাকলে মন যে আরো খারাপ হয়ে যাবে।"

—"দোক্‌লা হই কি-করে' মোহনবাবু, আমার আর কে আছে?"—বলে সরমা মাথা হেঁট করলে। প্রথম বসন্তের একটা দমকা বাতাস এসে সরমার ছোট্ট কপালখানির উপরে একরাশ কোঁকড়াচুল নাচিয়ে তার মাথার কাপড়খানি খসিয়ে দিয়ে গেল।

সরমা মাথার কাপড় তুলে দিতে গেল। আমি বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্, প্রকৃতির দূতকে বাধা দিও না! আজকে এ দুরন্ত বাতাস কারুকে রূপ ঢেকে রাখতে দেবে না, যতই মাথায় কাপড় দাও—সে দুষ্টুমি করে' ফের খুলে দেবেই দেবে। সরমা, আর আমাকেই-বা তোমার লজ্জা কি!"

—"বাতাসের সঙ্গেসঙ্গে মানুষরাও যদি অধীর হয়ে ওঠে, তাহলে লজ্জাবেচারীর দোষ আর কি বলুন!"

—"রূপ যখন অধীরতা আনে, লজ্জা তখন বড় কঠোর, সরমা! রূপ যখন চায় ফুটতে, লজ্জা তখন চায় ঢাকতে; অধীরতাকে দোষ দিচ্ছ, কিন্তু এতে যে অধীরতা আরো বেড়ে ওঠে! আর, প্রকাশেই ত সৌন্দর্য্য! মাথার উপরে ঐ যে বিরাট আকাশ, আবরণকে সরিয়ে রেখেছে বলেই সে এত সুন্দর। আবার দেখ, ঝরণার নাচ তখনই মধুর হয়ে ওঠে পাহাড়ের অন্ধকার-গুহার আবরণ তার লীলাকে যখন আর আড়ালে রাখতে পারে না!"

—"মোহনবাবু, আপনি অনায়াসেই কবি হোতে পারবেন।"

—"সরমা, সময়-বিশেষে মানুষমাত্রই কবি। চাঁদের আলো, ভোরের রোদ, ফুলের হাসি, পাখীর গান, বসন্তের বাতাস আর রূপের মোহ,—এরা অবোধ শিশুকেও কবি করে' তোলে,—তুমি-আমি কোন্ ছার! তবে কেউ এদের সাড়া শুধু অনুভব করে, আর কেউ সেই অনুভূতিকে ভাষায়, ছন্দে, সুরে প্রকাশ করতে পারে, এই যা তফাৎ।"

—"থাক্, মোহনবাবু, বাক্য-নবাবদের সঙ্গে—আমি সামান্য নারী—পেরে উঠব না। আমি হার মানছি। ভবিষ্যতে আপনি অনুগ্রহ করে' পদ্য ছেড়ে গদ্যে কথাবার্ত্তা কইলে সুখী হব!"

সরমা স্তব্ধ হোল। আমিও স্তব্ধ হয়ে মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলুম, তার এলানো খোঁপার তলায় মধুর ভঙ্গিতে হেলানো শুভ্র-নধর ঘাড়খানির উপরে, গোধূলির স্বর্ণকর কেমন চুম্বন-মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

আমি একটু ইতস্তত করে' তারপর বললুম, "সরমা, আর কতদিন তুমি এমন একলা থাক্‌বে?"

সরমা নীরবে তার সুডৌল হাতদুখানি তুলে কপালের দু-পাশ থেকে চূর্ণকুন্তলগুলি সরিয়ে দিতে লাগল।

—"বিশেষ, এ-ভাবে আমরা আর বেশী দিন মেশামিশি করলে লোকের কুৎসাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আর বাস্তবিক, এটা ভালও দেখায় না।"

সরমা খুব মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু

মোহনবাবু, আপনি বিবাহ করলেও ত লোকের কাণাকাণি বন্ধ হবে না!"

—"হ্যাঁ, কিছুদিন কাণাকাণি করবে বটে। কিন্তু নিষ্কর্ম্মার কাণাকাণি আর কুৎসিত কুৎসার মধ্যে অনেকটা তফাৎ আছে।"

সরমা কাতরভাবে বললে, "আমাকে নিয়ে আপনি সুখী হতে পারবেন না—"

—"সরমা, আজ এতদিন পরেও কি কথা বলছ! আমার ভবিষ্যতের অন্ধকারকে তুমি সূর্য্যের মত উজ্জ্বল করে' তুলেছ, তুমি—"

—"মোহনবাবু, ভেবে দেখুন আমার জন্যে আপনাকে সমাজের কি কঠোর অত্যাচার সহ্য করতে হবে। দুঃখ সয়ে-সয়ে বুক আমার পাষাণ হয়ে গেছে; আপনাকে না পেলেও সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু চিরসুখী আপনি, আমার জন্যে আপনি কি-করে' এত দুঃখ সইবেন বলুন!"

—"তোমাকে জীবনের সঙ্গী করতে পারলে আমার আবার দুঃখ? সরমা, আজও তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না, এই দুঃখটাই আমাকে সব-চেয়ে বেশী কাতর করে' তুলেছে।"

—"জানিনা মোহনবাবু, কেন আমার মনে হচ্ছে যে, কি-একটা মহাবিপদ যেন হাঁ-করে' আমাকে গিলতে আসছে—যেন শীঘ্রই কি-এক অমঙ্গল এসে বাজের মতন আমাদের মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়বে!"

—"তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না, সরমা!"

—"মোহনবাবু, এ কী বলছেন!"

—"সরমা, এই আমার শেষ কথা। তুমি আমাকে বিবাহ করবে?"

সরমা দু-হাতে মুখ ঢেকে বললে, "এর জবাব ত অনেকদিনই আপনাকে দিয়েছি! আবার নতুন করে' ও-কথা কেন তুলছেন?"

—"তাহলে বিবাহের দিন স্থির করি?"

সরমা চুপ। তার বুক নিশ্বাসে-নিশ্বাসে উঠতে নামতে লাগল।"

—"কথা কও, কথা কও!"

—"মোহনবাবু!"

—"না—বল, দিনস্থির করব, কি, করব না!"

—"করুন।"

—"সরমা, তুমি বাঁচালে, আমাকে বাঁচালে! অমন করে' মুখ ঢেকে থেক না—খোলো, খোলো, মুখ খোলো!"—এই বলে আমি তার কম্পমান হাতদুখানি নিজের দুহাতের ভিতরে জোর করে' টেনে নিলুম।

সরমার সমস্ত মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে—যেমন রাঙ্গা গোলাপফুল। তার কপালের এলমেল চুলগুলি ঘামে একেবারে ভিজে গেছে, তার ঠোঁটের উপরে চিবুকের উপরেও ছোটছোট শিশিরের ফোঁটার মত ঘর্ম্ম-বিন্দু!

সরমা অবসন্ন হয়ে ছাদের উপরে আমার দিকে পিছন ফিরে বসে পড়ল।

আমি যেন কেমন আত্মহারা হয়ে গেলুম। সরমা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না;—আমি ধীরে-ধীরে—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও—তার উপরে ঝুঁকে পড়লুম, তারপর তার সেই নীল-ধমনি-আঁকা মোমের মত নরম, দুধের মত সাদা গলাটির উপরে

চুম্বন করবার জন্যে আবেগভরে মুখ নামালুম, —কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তেই সরমা আবার মুখ ফেরালে, চকিতে আমিও আপনাকে সামলে নিয়ে সরে এলুম,—মনে পড়ল, আমাদের এখনো বিবাহ হয়-নি!

* * *

বিবাহের সমস্তই ঠিক হয়ে গেছে। আর সাত দিন! তারপর, সরমা আমার!

আজ সকালে পিসিমা আমাদের সকলকার কথা ঠেলে তাঁর শ্বশুর-সম্পর্কের কোন্-এক আত্মীয়ের বাড়ী চলে গেলেন; সেখান থেকে তিনি নাকি কাশী যাবেন,—এ বাড়ী আর মাড়াবেন না, আমাদের মুখ আর দেখবেন না!

আত্মীয়-কুটুম্বদের কেউই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না—আমিও সেজন্যে কারুকে কাকুতি-মিনতি করলুম না। যাঁরা ভেবেছিলেন আমি তাঁদের কাছে নীচু হব, আমার এই অভাবিত উপেক্ষার ভাব দেখে তাঁরা মনে-মনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত হয়ে গিয়েছিলেন। আপনার লোকের মধ্যে এল খালি যমুনা। সে একাই একশো, তার কলহাস্যেই আমার বাড়ীখানি আসন্ন উৎসবানন্দে ভরপূর হয়ে উঠল।

আমার ভগ্নীপতিও আমাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলেন যে, আমার এই সৎসাহসে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন এবং বিবাহের উপঢৌকন নিয়ে তিনি যে যথা-সময়ে নববধূ দর্শন করতে আসবেন, পত্রে এ-কথাও বিশেষ জোরের সহিত লিখতে ভোলেন-নি।

কিন্তু, ভবিষ্যতের সৌভাগ্য-স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে আমি যখন নিখিল বিশ্বকে একটা আনন্দের রঙ্গভূমি বলে মনে করছিলুম, অকস্মাৎ দুর্ভাগ্য এসে ঠিক সেই সময়েই আমার জীবনে যে রাবণের চিতা জেলে দেবে,—এ ত আমি ঘুনাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারি-নি! ওঃ, সে কি নিষ্ঠুর আঘাত—অদৃষ্টের সে কী কঠোর পরিহাস! তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ছিল,—মরতে পারলে ত একেবারে সমস্ত ফুরিয়ে যেত—এমন পলে-পলে, তিলে-তিলে মরণ ত আমাকে গ্রাস করতে পারত না; সেইদিন থেকে বুঝেছি, একগাছি সরু সূতায় ভারি পাথরের মত মানুষের সমস্ত আশা-ভরসা দুলছে, যে-কোন পলকে সে সূতো ছিঁড়ে যেতে পারে—মুহূর্ত্তের হের-ফেরে সুখে-সরস তোমার জীবন দুঃখে-বিরস এবং নিস্ফল হয়ে যেতে পারে!

যাক্,... ... ঘটনাটা কি-করে' ঘটল, এখন তাই বলি।

বাগানের যেখানে মর্ম্মর-নির্ঝরের সহস্র-ধারা, ভোরের তরুণ রবিকর পান করবার জন্যেই যেন চপল পুলকে ঝলকে-ঝলকে উপরে উছলে উঠছে, সেইখানে সরমা আর যমুনা দুজনে হাত-ধরাধরি করে' দাঁড়িয়েছিল।

আমি দুতলার ঘরে জানলার ধারে টেবিলের সুমুখে বসে ডায়েরি লিখছিলুম, তাদের দেখতে পেয়ে লেখা বন্ধ করলুম। তারা দুজনে নিজেদের কথাতেই মেতেছিল, আমাকে দেখতে পেলে না।

হঠাৎ যমুনার কি খেয়াল হোল,—সে

সরমাকে সেইখানে বসিয়ে রেখে বাগানের অন্যদিকে চলে গেল। সরমা একলাটি ফোয়ারার জলাধারের উপরে ঝুঁকে—বোধ হয়—লালমাছের খেলা দেখতে লাগল।

খানিক পরে যমুনা হাসতে-হাসতে ফিরে এল—আঁচল-ভরা একরাশ ফুল নিয়ে।

উপর থেকে তাদের অস্পষ্ট স্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলুম।

যমুনার আঁচলে ফুল দেখে সরমা বললে, "অত ফুল কি হবে?"

—"ফুলে ফুলে আজ তোকে ফুলরাণী সাজাব।"

সরমা ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললে, "না।"

—"কেন, না কেন শুনি?"

—"উঁহু, সে হবে না। পাগলের মত খাম্‌কা ফুলের সাজ পরতে যাব কেন?"

—"তোর যে বিয়ে লা ছুঁড়ি!"

—"তোমার দাদারও ত বিয়ে! অতই যদি সাধ, যাও না, তাঁকেই সাজিয়ে এস!"

—"দাদার ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে না। দুদিন পরে দাদাকে তুই হাত-ভরে ফুল নিয়ে প্রাণ-ভরে সাজাস্। আজ ত আমি তোকে সাজাই।"

—"না ভাই, না!"

যমুনা, সরমার গালে আদর করে' ঠোনা মেরে বললে, "ইস্, না বললেই শুনব কিনা! নে, নে, লক্ষ্মীটির মত চুপ করে' বোস্। দুদিন বাদে যে তোর ননদ হবে, তাকে চটাস্-নে!"

অগত্যা যমুনার কথায় সরমাকে রাজি হোতে হোল। ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে বসে যমুনা নিপুণ হাতে সরমাকে ফুলের গয়না পরাতে লাগল। সরমার মাথায়, কুন্তলে, শ্রবণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুতে, আঙ্গুলে, কটিতে ও চরণে—যেখানে যে ফুল সাজে, সেখানে ঠিক সেই ফুলের মানানসৈ গয়না পরিয়ে, যমুনা একটু তফাতে সরে গিয়ে ঘাড়-বেঁকিয়ে দাঁড়াল,—তাকে কেমন দেখাচ্ছে, তাই দেখতে! বাস্তবিক, টাটকা ফুলের গহনায় সরমার স্বভাব-সুন্দর রূপের শিখা যেন আরো উস্‌কে উঠল,—তার পানে তাকাতে গেলেও চোখ যেন ঝল্‌সে যায়!

এমন সময় চাকরটা এসে ঘরে ঢুকল। তাকে কতগুলো জিনিষ কিনতে বাজারে পাঠিয়েছিলুম, সেইগুলো কিনে সে একটা মোড়কে বেঁধে এনেছিল। মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে সুতো ছিঁড়ে আমি মোড়কটা খুলতে বসলুম। একখানা খবরের কাগজ দিয়ে দোকানী জিনিষগুলো মুড়ে দিয়েছিল। আচমকা কাগজখানার এক জায়গায় চোখ পড়ে গেল। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা ছিল:—

৫০৲ টাকা পুরস্কার!

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন মজুমদার তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবীকে সঙ্গে লইয়া কোথায়

নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন। মুরারিবাবুর বয়ক্রম প্রায় চতুঃষষ্টি বর্ষ, বর্ণ গৌর, আকৃতি হ্রস্ব, মুখে শ্মশ্রুগুম্ফ আছে। তাঁহার বামগণ্ডে একটি রক্তবর্ণ গোলাকার জড়ুলের চিহ্ন আছে। তিনি এস্রাজ ও বেহালা বাজাইতে নিপুণ। যিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় মুরারিবাবুর জামাতার নিকটে তাঁহার সন্ধান প্রদান করিবেন, তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চৌধুরী
নং—শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি একবার, দুবার, তিনবার রুদ্ধশ্বাসে পড়লুম,—পড়তে-পড়তে চোখের সুমুখ থেকে পৃথিবীটা যেন ক্রমে-ক্রমে সরে যেতে লাগল, দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এল, মাথাটা ঘুরে গেল—তারপর টল্‌তে-টল্‌তে মাটির উপরে আমি মূর্চ্ছিতের মত পড়ে গেলুম।... ...

সেই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলুম, জানিনা; যখন ধুঁকতে-ধুঁকতে কোনরকমে দেহটাকে টেনে তুললুম, তখন আমার প্রাণের ভিতরটা যে কেমন করছিল, তা সুধু ভগবান জানেন, ভগবান জানেন!

এ সত্য, না স্বপ্ন? আমি হঠাৎ পাগল হয়ে যাইনি ত?—কাগজখানা আবার তুলে ধরলুম, আবার তার আগাগোড়া পড়লুম। না, কোন সন্দেহ নেই—সমস্তই মিলে যাচ্ছে, মুরারিবাবুর বয়স, চেহারা, তাঁর গালের জড়ুলের দাগ, তাঁর মেয়ের নাম, জামাইয়ের নাম—সমস্ত, সমস্ত! হা ভগবান, অভাগার এ কী করলে!

কিন্তু, কিন্তু,—সরমার স্বামী ত বেঁচে নেই,—মরা মানুষ কি-করে' ফিরে এল! অনেক ভেবেও কিছু বুঝতে পারলুম না, এ দুর্ব্বোধ রহস্যের মধ্য থেকে কেবল এই ভয়ানক সত্যটা বারংবার জেগে উঠতে লাগল যে, আমার সর্ব্বস্ব আজ হারিয়ে গেল—জন্মের মত, জন্মের মত!

বাগান থেকে সরমা আর যমুনার মৃদু হাস্য-কলরব ভেসে এল—আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সে হাসি শুনে হা হা করে' উঠল। ওরে যমুনা, তুই-না সরমার দেহখানি ফুলের গহনায় পুষ্পদেবীর মত সাজিয়ে দিয়েছিস্! কার এ পুষ্পদেবী? এ যে পরের প্রতিমা, একে যে বিসর্জ্জন করতে হবে!

বিসর্জ্জন করতে হবে, বিসর্জ্জন? সরমা আর আমার নয়? এ কি সম্ভব? না, না,—এ হোতে পারে না, এ হোতে দেব না! এমন-করে' আমি আত্মহত্যা করতে পারব না! সমাজ, সংসার, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম,—চুলোয় যাক! এ-সব মিছে, এ-সব খালি মানুষের স্বাধীনতাকে বাধা দেবার জন্যে! এ মিথ্যাকে আমি মানব না, এ বাধা ভেঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়ব—দুর্দ্দান্ত, উন্মত্ত অশ্বের মত! দেখি, কে আমার কি করতে পারে!... ... ...

বিবাহের আর বিলম্ব নেই! সরমার স্বামী যখন এতদিন তার খোঁজ পায়-নি, তখন এর-মধ্যেও পাবে না! আমিও সরমাকে কিছু বলব না,—না, একবর্ণও না! আগে বিবাহ হয়ে যাক্—তারপর যা হবার, হবে! সরমার স্বামী জানতে

পারলেও কোন ভয় নেই, আমার কাছ থেকে তখন ত আর সে স্ত্রী বলে সরমাকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না!... ...

আর জানতেই-বা দেব কেন? বিবাহের পরে সরমাকে নিয়ে আমি দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব! দূর-বিদেশে, সহর ছেড়ে সবুজ বনের ভিতরে, আঁকাবাঁকা নদীর ধারে, ছায়া-করা পাহাড়ের আড়ালে, লতা-পাতার কুটির গড়ব,—কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, সুধু আমরা দুটি প্রাণী সেই বিজনে-নিভৃতে কাননের বিচিত্র মর্ম্মর-প্রলাপ, পাখীর স্বাধীন গান, ঝরণার অশ্রান্ত তান শুনতে-শুনতে কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখি হয়ে প্রেমের গুঞ্জনে দিনের পর দিন কাটাব—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন!... ... মাথার পরে নীলপদ্মের রং-মাখানো অনন্ত আকাশ, চরণতলে কোমল দুর্ব্বাদলের শ্যামলোচ্ছ্বাস, বনে-বনে চঞ্চল আলো-আঁধারের অবিরাম লুকোচুরি, গাছে-গাছে ফুলে-ফুলে বাতাসের স্নিগ্ধমধুর শ্বাস,—ওঃ, সে কী জীবন!... ... ...

কিন্তু, এ-সব আমি কি ভাবছি?... না, না, সে কি হয়? ঐ দেবতার নির্ম্মাল্যের মত নির্ম্মল সরমাকে আমি কি আমার পাপস্পর্শে কলঙ্কিত করতে পারি? প্রেমে যেখানে কপটতা, সেখানে শান্তি কোথায়? মনে অশান্তি, মুখে প্রেম? সে যে আরো অসহ্য! না,—মিছা এ লুকোচুরি, মিছা এ আত্মবঞ্চনা,—যতই যন্ত্রণা হোক্, সত্যের আদেশ আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিদায়ে

আসিয়াছ! তবু ভাল—এও দয়া তব;
তবু ত বিদায়কালে দুটি কথা কব
হৃদয়-বন্ধুর সনে জনমের শোধ;
শুধু ক্ষমা করো যদি দৃষ্টি করে রোধ
এ বিদায়-বিহ্বলতা; রুদ্ধকণ্ঠ ক্ষীণ
বেদনার বাষ্পে যদি বিলম্বিত দীন
বাণীবিনিময়কালে হয়ে পড়ে ভুলে'—
শেষভিক্ষা অপরাধ লইওনা তুলে'।
এ নিমেষ হবে শেষ—কতক্ষণ আর—
সময় হ'ল যে বন্ধু বিদায় নেবার!

এই সে প্রথম পত্র, বিজয়ার রাতে,
আশীর্ব্বাদছলে যাহা দিয়েছিলে হাতে
ত্রস্ত কবরীতে গুঁজে'—নিশীথ-শয়নে
যে বিষ করিনু পান প্রাণান্ত গোপনে।
বিস্ময়ে রহস্যে হর্ষে স্পন্দমান হিয়া
সঙ্কোচে শঙ্কায় যারে রেখেছে পুষিয়া
গোপন বক্ষের তলে বেদনার মত—
কত দীর্ঘ দিনমান, দীর্ঘ রাত্রি কত।
কে জানে সে আশীর্ব্বাদ অভিশাপে ভরা—
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ফিরে'-ফিরে' মরা!

হে চপল—শেষ তবে করে' লহ খেলা;
চুকাইয়া লহ ঋণ এ অন্তিম বেলা।

নিরুত্তর মূঢ় ভক্তে যে আঘাত ফিরে'
দিয়াছ দেবতা মোর—সে শায়কটিরে—

তারেও ফিরায়ে লহ—সাঙ্গ তার কাজ—
মরমের রক্তমাখা—ফিরে' লহ আজ।
সেদিন কি মনে আছে? স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
দোলপর্ব্বদিনে সেই তেতলার ঘরে
কারে খুঁজিবার ছলে কারে পেয়ে একা
কহিলে কম্পিত কণ্ঠে—'তোমারি সে দেখা
চাহিয়া এসেছি শুধু'—কররক্তফাগ
পরশিল চরণের অলক্তক রাগ।
শিহরি গেনু যে মরি—অজ্ঞাত হরষে,
লিপি সাথে ঐ তব বিদ্যুৎ পরশে!

একান্ত যাচনা সেই ঠেলিতে কি পারি?
ধরা পড়িলাম বন্ধু—সে দোষ আমারি!
সেদিনও ত বজ্র দিয়া বাঁধিয়া হৃদয়
ফিরাইতে পারিতাম! আজি মনে হয়
কেন তাহা করি নাই—কেন মিছা ভুলে'
মসীমাখা মৃত্যুবাণ হাতে নিনু তুলে'।
রাজা যে কাঙালদ্বারে সাজিল ভিখারী
হাত পাতি—রিক্ত কি তা' ফিরাইতে পারি!
বুঝিলাম মরিলাম—তবু নিরুপায়—
সে আগ্রহ আকুলতা ফিরান' কি যায়?
মরিলাম—একছত্র 'আমিও তোমারি'
নিমেষের দুর্ব্বলতা—এত দণ্ড তারি!
এ জনমে ফিরিবে না—ফিরেনা সে আর—
সেই মোর এক শাস্তি সেই পুরস্কার।
হায় বন্ধু, তারপর—আরো যাহা বাকী—
এই ফিরাইয়া লহ—করে কর রাখি'—
সেই ব্যথাভরা দৃষ্টি আজো মনে হয়,
মোর চিরজনমের চরম বিস্ময়—
'কভু ভুলিব না তোমা'—সে 'কভু' কি আছে?
অভাগীর ভাগ্য সাথে সেও মজিয়াছে!

তার পর—তার পর—দেখি তুমি আজ
ভিখারীর স্বপ্নস্বর্গ—তুমি রাজ-রাজ
কাঙালের কল্পসৃষ্টি—এই চিত্ততীরে
দাহ রাখি দীপ্তিটুকু মিলায়েছে ধীরে।
সেই ভাল—সেই সত্য—হায়রে বিশ্বাস,
ইন্দ্রধনু পরিবে সে ধরণীর ফাঁস?

তবু যে পাইনু দেখা আজি শেষবার
এই মুহূর্ত্তের লাগি—সেও সে আমার
স্বপ্নভাগ্য—দরিদ্রের পরশ-মাণিক
দাঁড়াও আঁখির আগে দাঁড়াও খানিক
মন ত যায় না দেখা—দিনু যা দিবার—
ফিরাব কেমনে যাহা নহে ফিরাবার!
এ যে দরিদ্রের স্মৃতি—এ নহে ধনীর
ক্ষণিক চিত্তের দীপ্তি খেয়াল-খনির!
মোর সেই এক ছত্র—অপরাধ ফিরে'
দাও, এই শেষ ভিক্ষা আজি দুঃখিনীরে।
সেই মোর একছত্র কলঙ্কের কালী—
শুধিব কালিমা তারি হৃদি-রক্ত ঢালি।
কোন কথা আর কিছু নাহি কহিবার—
সময় হয়েছে শেষ বিদায় নেবার।

তবু শেষ-আশা প্রিয়, যদি কোন দিন
চিত্তে মেঘ করে' আসে স্নেহার্ত্ত নবীন
আজি শ্রাবণের মত—পূর্ণ কূলে-কূলে
সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ব্ব স্মৃতিফুলে'
উঠে সে পালের মত মরমের তলে,
জানিও একটি চিত্ত ছায়া-অন্তরালে
রবে চির-নির্নিমেষ ঐ মুখ চাহি'—
এই সে অন্তিম সাধ—অন্য সাধ নাহি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

স্মরণ

যুধিষ্ঠির যে বলেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত হচ্ছে তবু আমরা মৃত্যুকে প্রত্যয় করিনে, এইটিই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ বড় সত্যকথা। মহামারী আমরা দেখি, প্রতিবেশীর গৃহে মৃত্যুদূত এসে যখন তার সর্ব্বস্ব সম্বল আত্মসাৎ করে তখন যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে চারিদিক কাতর হয়ে ওঠে, তাও আমরা শুনতে পাই, তবুও মৃত্যুর যে কি ভীষণতা তা আমরা জানিনে। যতক্ষণ এ মৃত্যু-অভিজ্ঞতা নিজের জীবনে এসে না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ এর যথার্থ স্বরূপবোধ আমাদের জন্মায় না। মৃত্যুর অস্তিত্ব আমরা জানি, মানুষ মরে এ-কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু মৃত্যু যতক্ষণ আমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব হরণ করে', না পলায়ন করে, ততক্ষণ তার পরিচয় হয় না, তার বেদনার অনুভূতি আমরা লাভ করি-নে। সুখের সংসার বেশ চলছিল, আশা আমাদের বর্ত্তমানকে নানাবর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করে', উজ্জ্বল করে', সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত করে' দিয়েছিল ; আজ যা হচ্ছে কালও তাই হবে, কিম্বা তার চেয়ে আরো সুখকর কিছু ঘটনা ঘটবে এ প্রত্যয় মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে এমন কল্পনাও মনের কোথাও স্থানলাভ করবার সুযোগ পায়-নি। আমরা বড় নিশ্চিন্ত হয়েই ছিলাম, এমন সময় বজ্রবেদনা বহন করে' মৃত্যু যখন তার করাল মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখীন হয়, সুখের সংসার ভেঙেচুরে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, আশার নিত্যনবীন সৌন্দর্য্য অন্ধকারে বিলীন হয়, আনন্দসঙ্গীত স্তম্ভিত হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, জীবন একেবারে নিঃসম্বল হয়, তখনি বুঝি মৃত্যু কি ভয়ানক ! সে বেদনার প্রথম অভিঘাত এমনি প্রচণ্ড যে অনেক সময় বোধ-শক্তিই হারিয়ে ফেলি, অভাব যে কতবড় হল তা আমরা ধারণা করতেই পারি-নে। তারপর, যখন চেতনা আসে, তখন মনে হয়, এতবড় অবিচার কেন হল ? মন বিদ্রোহী হয়, স্নেহ সহানুভূতি সান্ত্বনা সবই তার কাছে বিরূপ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, বিশ্বের উজ্জ্বল শোভা, সুনিয়মিত আহ্নিক যাত্রা তার কাছে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়। তার সঙ্গে যেন সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ বিছিন্ন হয়ে যায়, কিছুই আর তাকে আনন্দ দিতে পারেনা। সে বড় একা হয়ে পড়ে, সুদূরে, অন্ধকারে নির্জ্জনতায় থাক্‌তেই তার ভাল লাগে। বিশ্ব তখন তার কাছে যেন থেকেও থাকে না। একান্ত নিঃসঙ্গ হবার, শোকের মধ্যে এই যে প্রেরণা, বেদনাহতের এই যে স্বাতন্ত্র্য, অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের কামনা, এর মধ্যে বড় একটি মঙ্গল-ইচ্ছা নিহিত থাকে, আমরা প্রথমে সে কথা বুঝতে পারি-নে। যাঁরা ফোটোগ্রাফী (Photographv) করেন, তাঁরা জানেন ছবির ছায়াপাত আলোকেই হয়ে থাকে, কিন্তু আভাসে যা থাকে তাকে সম্পূর্ণ ও পরিণত করতে হলে,

অন্ধকারেই তাকে রাখতে হয়। শোকের দিনে নির্জ্জনতায় যখন আমরা থাকি তখনই আপনার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সুযোগ হয়। যে বাণী বারবার মনের দ্বারে এসে ফিরে গিয়েছে, যে মঙ্গল-জ্যোতিঃ বাহিরের বিক্ষিপ্ত কিরণে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হতে অবসর পায়-নি, সেই বারতা শ্রবণের, সেই আলোক দর্শনের সুযোগ ঘটে। মন যা নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, আমরা দেখতে পাই সে সকল ক্ষণিক ও ক্ষণভঙ্গুরে আর চলেনা। যাকে এতবড় করে' রেখে-ছিলাম, যে আমার সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আড়াল করে' ছিল, যার বাড়া আমার আর কিছুই ছিলনা, সেই যখন চলে গেল, সংসারের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে পড়ল, তখন, মনের নূতন জীবনের জন্যে, এমন কিছু আবশ্যক হয়, যার অভাববোধ এতদিন তার অন্তরে ছিলনা, সদ্যজাগ্রত অন্তরের বুভুক্ষা আর তুচ্ছতা নিয়ে, ক্ষণিক দিয়ে মেটেনা, সে আপনার মধ্যেই সেই আনন্দ-উৎসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যার সুধার ধারা দিনে দিনে তাকে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে। নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের আভাস পায়!

নিঃসঙ্গের মধ্য হতেই সে তার চিরসঙ্গীর পরিচয়ের সুযোগলাভ করে। যে সান্ত্বনা, অপরের স্নেহ-প্রীতিতে সম্পূর্ণরূপে এতদিন সে পায়-নি, কারো কথার মধ্যে যে পরম বাণী সে শুনেও বোঝে-নি, যখন সেই অমৃতবাণী আপনার মনের কাছেই শোনে, তখনি যে চরিতার্থ হয়ে যায়। যে বিধানে তার বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিধাতার নিকট হতেই সে সান্ত্বনার দান গ্রহণ করে। মা যখন সন্তানকে শাসন করেন, ব্যথা দেন, তাঁর কোলের কাছটিতে না পেলে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে না কাঁদলে ত সে বেদনা দূর হয় না, চোখের জল তিনিই মুছিয়ে দেন, তবেই ত শান্তি আসে! যে দুঃখ একদিন বড় অবিচার বলে বোধ হয়েছিল, আবার জানিনা কেমন করে' তারি মধ্যে তরুণ আনন্দের জন্ম হয়, বর্ষাধৌত নীলাম্বরে সূর্য্যালোকের মত, বিশ্বের শ্রী নির্ম্মলতর বলে মনে হয়—বর্ষার অভিষিক্ত মৃদু ধরণীর মত মনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের শুভ অবসর আসে। আমরা পরিপূর্ণ মনে বলতে সক্ষম হই, "তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

মেটারলিঙ্কের (Materlinck) নীলপাখী (Blue Bird) বলে' নাটিকাতে পড়ে-ছিলাম, একবার খৃষ্ট-জন্মোৎসবের পূর্ব্ব রাত্রিতে দুটি ভাই বোন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে তারা দেখলে, যেন কোন অপূর্ব্ব লোকে গিয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর স্থানে বেড়াচ্ছে, দেখলে কত নবজাত আত্মা সেখানে অতিথি, আবার কতজনে আমাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্যে নৌকায় আরোহী। এম্নি সময় ঘুরতে ঘুরতে একটি জায়গায় একটি কুটীরের সম্মুখে এসে, সেখানি তাদের বড়ই পরিচিত বলে মনে হল, দুয়ারের পাশে বুড়ো কুকুর পাহারা দিচ্ছে, ঘরের দাওয়ায় তাদেরি জানা-শোনা বিড়ালটি বসে বসে ঝিমচ্ছে—গৃহসজ্জা চিরপরিচিত! তারা বলে উঠল, এই যে দেখছি ঠাকুর-মা আর দাদামশায়ের ঘর—

তারা অম্নি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, দেখলে তাদের দাদামহাশয় আর ঠাকুরমা যেমনটি ছিলেন অবিকল তাই আছেন, তারা তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে বল্লে, দাদা-মশায়, ঠাকু'মা—তোমরা তো তবে মরে যাও-নি, তোমরা যে ঠিক তেম্নিই আছ!—তাঁরা বল্লেন, তোমরা যখন আমাদের মনে করে' রেখেছ, তখন তো আমরা মরি-নি, তোমরা ভুলে গেলেই আমরা আর থাকি-নে, তোমরা যদি মনে করে' রাখ তাহলে ত আমরা চিরদিন অমর হয়েই থাক্‌ব!

যাঁরা চলে গিয়েছেন—তাঁরা আমাদের এই শ্রদ্ধার স্মরণের মধ্যে চিরদিন অ-মৃত। আমরা ত তাঁদের হারাই-নি বরং অন্তরের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে পেয়েছি—তাঁদের ত্রুটি, ভ্রান্তি, গ্লানি, কিছুই আর আমাদের মনে নেই—যা-কিছু সুন্দর, পুণ্যময় তাই অম্লান শোভায় চিরন্তন হয়ে আমাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করছে। আমাদের স্নেহের স্মরণে নিরন্তর সঞ্জীবিত হয়ে চিরঞ্জীবি হলেন, শুধু কি এবারকার মত! এ-সব স্মৃতি যে আমাদের আত্মার সম্বল, তারি মত অক্ষয় ও অবিনাশী—তাঁরা আমাদের যুগ-যুগান্তের জন্ম-জন্মের সঙ্গী হয়েই রইলেন!

যে বিশ্বজননীর স্নেহক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে', তাঁরি আদেশে জীবনের অভিনয় সাঙ্গ করে' তাঁরা বিদায় নিয়েছেন, তাঁরি চিরপ্রসারিত অনন্তের আনন্দ-ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মা উন্নততর, পুণ্যতর, শ্রেষ্ঠতর সদ্গতি লাভ করুক, এই আমাদের আজিকার একাগ্র প্রার্থনা—চিরদিন তাঁহাদের জন্য যেন,—মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ॥ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্ত-মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধু মান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবোভবন্তু নঃ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভুতগত ব্যাপার!

(খেয়ালি নক্সা)

ছেলেবেলা হইতে আমার ভারি ভূতের ভয়। সায়াহ্নে এম-এ পাশ করিয়াছি তবু ভূতের ভয় ছাড়ে নাই। বলিতে লজ্জা করে, এই বুড়ো-বয়সে এখনও রাত্রের অন্ধকারে একা থাকিলে গা-ছম্‌ছম্ বুক-টিপ্‌টিপ্ প্রভৃতি যতগুলো ভয়াত্মক ব্যাধি আছে সবগুলো একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করে।

হয়ত এই ভূতের ভয় বয়স এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইত, কিন্তু কাল করিয়াছে ঐ বিলাতের ভূতুড়ে-সভা—সাই-কিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি! এখন ত দেখিতেছি বিলাতে হেন নামজাদা লোক নাই যিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন। যাঁহাদের জ্ঞানের একটু টুকরামাত্র লইয়া

বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছি, যখন দেখি তাঁহারাও আমার দলে তখন আমার ভূতের ভয় যে আরো সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে আশ্চর্য্য কি!

আমার বিশ্বাস, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, পৃথিবীর সকল-লোকের মনেই ভিতরে-ভিতরে সমান ভূতের ভয় আছে। কেহ মুখ-ফুটিয়া কবুল করে, কেহ লজ্জায় বলিতে না পারিয়া দম-ফাটিয়া মরে। যাহা হোক, এখন ভূতুড়ে-সভার দৌলতে বিজ্ঞানের কাপড় পরাইয়া ভূতের ভয়টাকে সভ্যসমাজে বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে। তাহাতে ভূত-ভয়ের লজ্জা হইতে সভ্য-মানুষ পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিবে। ভয়কে গোপনে চাপিয়া রাখা শরীর এবং মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক।

জয় হোক সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটির! যদি তাঁদের সাহসের পরোয়ানা না পাইতাম তাহা হইলে আজ যে-সব কথা বলিতে বসিয়াছি তাহা কি এত লোকের সামনে এমন অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম! আমার ত এ অতি নগণ্য ব্যাপার, এর চেয়ে আরো কত আজগুবি ভূতুড়ে কাণ্ড, বিলাতের ভৌতিক সভার সভ্যেরা কাগজে-কলমে জাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

ভূতের ভয় জীবনে অনেকবার পাইয়াছি কিন্তু সেবারের মতন তেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কাহারো অদৃষ্টে কখনো ঘটিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সে-কথা মনে করিতে এখনো গা ছম্‌ছম্‌ করে। যাঁহাদের ভূতের ভয় প্রবল, গোড়া হইতে বলিয়া রাখি, তাঁহারা কানে আঙুল দিন। কারণ এই গল্প

হইয়া যদি কাহারো হার্ট-ডিসিস্‌ হয় তজ্জন্য আমি দায়ী হইতে পারিব না। বুড়ো মারিয়া শেষে খুনের দায়ে পড়িবার ভয় আমার নাই। আমার ভয়, পাছে তাঁহারা ভূত হইয়া কোনো ঘোর নিশীথে আমার সহিত রসিকতা করিতে আসেন!

যাক এখন আসল কথা। সে-বৎসর পূজার ছুটিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাড়ি হইতে এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। সঙ্গে ছিল আমার বাল্যবন্ধু শ্রীশ। ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি শ্রীশ লোকটার আশ্চর্য্য সাহস। তাহার প্রাণে ভূতের ভয় একেবারে নাই। সে বলে রাত্রের অন্ধকারে সে একলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দিব্য ছাদে বেড়াইতে পারে; ঘোর নিশীথে অশথ কিম্বা বেল-গাছের তলা দিয়া যাইতে তার এতটুকু গা ছম্‌ছম্‌ করে না; পোড়ো-বাড়ির সাম্‌নে দিয়া সে বেশ গট্‌ গট্‌ করিয়া চলিয়া যায়। এবং এমন-কি সে ভূত কখনো দেখে নাই এ-কথা দিবা-দ্বিপ্রহরে সকলের সমক্ষে চীৎকার করিয়া বলিতে এতটুকু সঙ্কোচ করেনা।

ভূত লইয়া তাহার সহিত আমার অনেকবার তর্ক হইয়াছে। সে বলে ভূত থাকিতে পারে কিন্তু তাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, যেহেতু ঘাড় মটকাইতে হইলে যে হাতের দরকার তাহা তাহাদের নাই; এবং তাহারা ঘাড়ে চাপিলে ক্ষতি কি, যখন তাহাদের দেহের কোনো ভারই নাই। আমার মত কিন্তু অন্য-রকম। আমি বলি, ভয় যদি না থাকে তবে ভূতও

রাখা একটা জঘন্য কুসংস্কারমাত্র। মোট কথা শ্রীশের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ হয় নাই। কারণ শ্রীশের যুক্তিতর্কে আমার ভূতের ভয় এক তিল কমে নাই এবং আমার ভৌতিক গবেষণার দ্বারা তাহার মনে এতটুকু ভূতের ভয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি নাই। সে আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি রুদ্ধ আক্রোশে মনে-মনে বলিতাম, রোসোনা, বাছাধন একদিন টের পাইবেন! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত দিন চলিয়া গেল তবু ঐ বাছাধন এখনো কিছুই টের পাইলেন না। ভূতের মধ্যেও কাপুরুষ আছে না কি! কোনো সাহসী ভূত শ্রীশকে এখনো সায়েস্তা করিল না দেখিয়া, চুপি-চুপি বলি, আমার মন এক-এক সময় ভূতের অস্তিত্বসম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ী হইয়া উঠে। মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম, আজ রাত্রে অদৃষ্টে কি আছে জানিনা!

আমি অবাক হইয়া ভাবি শ্রীশ আমার মতো সায়ান্সে নয়, সাহিত্যে এম-এ, তবু সে ভূতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল কেমন করিয়া! সাহিত্যে ত ভুতুড়ে ব্যাপারের অন্ত নাই! সে বলে ছেলেবেলায় তার একটু-একটু ভূতের ভয় ছিল, বড় হইয়া ছুটিয়া গেছে। আমার মনে হয় বড় হইয়া তার সেই ভয় আরো সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। হ্যামলেট পড়া তার একেবারে বৃথা হইয়াছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া শ্রীশের সঙ্গে বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম। নূতন দেশের নূতন-নূতন দৃশ্যে ভূতের কথা যে একবারও মনে উঠিবার অবকাশ পায় নাই তাহা নহে। কারণ শ্রীশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে সখ আছে। তার চর্চ্চা করিতে সে ছাড়ে নাই। সেও ত একরকম ভূতেরই কথা। কারণ তারা ত কেউ জ্যান্ত নয়, তারা অতীতের কবর হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া মানুষের মনের দ্বারে সাক্ষাৎ দিতে আসে। শ্রীশ এক-এক জায়গায় যায় আর সেখানকার ইতিহাস আবৃত্তি করিতে সুরু করে। অমনি সাত-আট শত বৎসরের পূর্ব্বেকার দৃশ্যাবলী আমার মানস-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া উঠে অর্থাৎ আমি দিন-দুপুরে ভূত দেখিতে থাকি।

কাশীর সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া এক প্রাচীন সহর বাহির করা হইয়াছে। দেখিয়া আমার মনে হইল একটি ছোট-খাটো সহর-ভূত কবর ঠেলিয়া উঁকি মারিতেছে। তার অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম যেন কারা সব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ-কেহ সবেমাত্র মাটি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, আবার কাহারা যেন মাঠির ভিতর হইতে বাহির হইবার জন্য সজোরে ঠেলা মারিতেছে। সবই অপরিচিত মূর্ত্তি! দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আবার ভয়ও করিতে থাকে। মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া-বসন-পরা মেয়ে-পুরুষ দলে-দলে চলিয়াছে—সকলকার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, সংযত দৃষ্টি, সংহত আচরণ! হাতে হাতে সব ভিক্ষাপাত্র। ছোট ছোট কুটুরীর মধ্যে বসিয়া কাহারা সব মালা ঘুরাইতেছে, শাস্ত্র পড়িতেছে, গান গাহিতেছে।

একস্থানে বুদ্ধদেব তাঁর প্রকাণ্ড দেহ

কত দিন পরে আজ তাঁহার দেহের উপর সকালবেলাকার সূর্য্যের আভা আসিয়া লাগিয়াছে তবু তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। কত যুগ চলিয়া গেল, কত লয়-বিলয় ঘটিয়া গেল, মাটি পাথর হইয়া গেল, পাথর ভাঙিয়া ধুলা গুঁড়া হইয়া গেল, তাঁহার নিজের দেহ পাথর হইয়া গেল তবু তাঁর জাগিবার সময় হয় নাই। সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সামনে দাঁড়াইয়া আমার কেমন ভয় হইতে লাগিল, যদি এখনি ইহা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়! আশে পাশে দেখিলাম আরো কত দেব-দেবী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের এমন ভাবভঙ্গী যে কখন যে তাঁহাদের খেয়াল হইবে আর জাগিয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন তার ঠিক নাই। চতুর্দ্দিকে যা দেখিতেছি এরা সবাই যদি একসঙ্গে মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া কলরব করিতে থাকে তাহা হইলে আমরা দুটি ক্ষুদ্র দর্শক এঁদের মধ্যে যে কোথায় হারাইয়া যাইব কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না। হয়ত এদের সঙ্গে আবার মাটি-চাপা পড়িয়া কত কাল আমাদের এইখানে থাকিতে হইবে! আমার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিতে লাগিল। আমি শ্রীশকে টানিয়া লইয়া পালাইয়া আসিলাম।

তার পর আগ্রার দুর্গ। শ্রীশ তার ইতিহাস মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিল। এক-একটা স্থান দেখায় আর তার আনুষঙ্গিক গল্প বলিতে থাকে, অমনি সহস্র সহস্র সাহাজাদা, নবাব-জাদা মাথায় তাজ, হাতে গজদন্তের ছড়ি, পায়ে লপেটা পরিয়া হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসে। হাজার-হাজার বেগম সাহাজাদী ও তাহাদের সখীরা ওড়না উড়াইয়া সামনে দিয়া চলিয়া যায় * * ঐ অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে কি যেন একটা গুপ্ত মন্ত্রণা চলিয়াছে, তার ফিস্‌ফাস্ ফুস্‌ফাস্ শব্দ ভূতের নিশ্বাসের মতো গায়ে আসিয়া লাগিল * * * যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে * * হঠাৎ একটা বিকট-আকৃতি লোক একখানা ধারালো চক্‌চকে ছোরা-হাতে সামনে দিয়া চলিয়া গেল * * একটা ক্ষুদ্র ঘরের জানলার ধারে এক পরম রূপসী হতাশ মনে আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছে * * হঠাৎ সে চ্যুতপুষ্পের মতো ঢলিয়া পড়িল, তার সর্ব্বাঙ্গের সোনালী আভা একেবারে নীল হইয়া গেল * * নর্ত্তকীদের পায়ের ঘুঙুরের ঝুম্‌ঝুম্ আওয়াজের সঙ্গে, মদের পেয়ালার ঠুন্‌ঠান্, সারেঙের ছড়ির মিঠা টানের একটা জটলা কানে আসিয়া লাগিল * * আতর-গোলাপের গন্ধের সঙ্গে মদের গন্ধের একটা হল্‌কা নাকের সামনে দিয়া চকিতের মধ্যে বহিয়া গেল * * হাসির একটা তুফান * * আবার একটা মর্ম্মভেদী করুণ দীর্ঘশ্বাসের ঝড় * * ঐ না কার নেশায় বিহ্বল জড়িত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন * * ও কি, ও কার অশ্রুরুদ্ধ করুণ আর্ত্তনাদ * *

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ। সারেঙের তার খুব উঁচু পর্দ্দায় উঠিয়া যেন ছিঁড়িয়া গেল। অমনি গান বন্ধ, ঘুঙুরের আওয়াজ স্তব্ধ * * গুপ্তকক্ষের কপাট সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল * * বেগম-মহলের জানলায় জানলায়

শত শত জ্বলজ্বলে আঁখি ক্ষণেকের জন্য একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল-দৃষ্টি হানিয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িল * * ঘরে ঘরে জানলা-কপাট বন্ধ। বাদশাহ, বেগম, তাঁহাদের পুত্রকন্যা, কিঙ্কর-কিঙ্করী কে যে কোথায় গেল আর সন্ধান মিলিল না * * একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি-ধোঁয়ায় সমস্ত ছাইয়া গেল। তখন চারিদিক কেবল কালো কষ্টি পাথরের মতন অন্ধকার। সেই অন্ধকার-পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় ময়ূরসিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখর মাটির উপর ভাঙিয়া পড়িল, সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীরে বড়-বড় ফাট ধরিল, হীরেজহরৎ মণিমাণিক্য এবং সমস্ত আসবাবপত্র যেন একটা প্রকাণ্ড হামান-দিস্তায় পড়িয়া গুঁড়া হইতে লাগিল —তারই ধূলায় চারিদিকের অন্ধকার আরো ঘনাইয়া আসিল। * * * *

আমি চোখে অন্ধকার দেখিয়া প্রায় মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশের কণ্ঠ শুনিলাম। সে বলিয়া উঠিল—"তুমি অমন করে শূন্য-দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ ?"

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলাম—"চল, চল, এখান থেকে পালাই !"

সে বলিল—"কেন !"

আমি বলিলাম—"ভূতের এই উৎপাতে মানুষ এখানে টিকতে পারে !"

শ্রীশ বলিল—"এই দিন-দুপুরে তুমি ভূত দেখলে কোথায় !"

আমি বলিলাম—"কোথায় নয় !—চারিদিকে কেবল মামদো ভূত গিসগিস করছে। এখানকার মাটি থেকে দেয়াল কড়িকাঠ পর্য্যন্ত সব ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে ! এ কি আর সেই আসল জিনিস আছে ?"

শ্রীশ হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"হাসচ বটে, কিন্তু জাননা, এ সব বাদশাহী ভূত ! এদের খেয়ালের কথা বলা যায় না।—আমাদের নিয়ে এমন রসিকতা করতে পারে যে—"

শ্রীশ আমার কথায় কান না দিয়া একজন গাইডের সঙ্গে কি-একটা তর্ক জুড়িয়া দিল। আমি উস্‌খুস্ করিতেছি দেখিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল —"খবরদার, এ দুর্গ থেকে একলা বেরোবার চেষ্টা কোরো না—এমন গোলকধাঁধার মধ্যে গিয়ে পড়বে যে আর পথ খুঁজে পাবে না।"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চন্‌চন্ করিয়া মাথায় উঠিল। আমার হাত-পা একেবারে অবশ হইয়া আসিল। * * আমি প্রাণপণশক্তিতে দৌড় দিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ দেখি একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক অন্ধকার। সাম্‌নের দিকে চলিলে পথ পাই, কিন্তু ফিরিতে গেলেই দেখি পিছনের পথ কালো পাথরের দেয়ালে বন্ধ। সর্ব্বনাশ ! কি করি, সামনে চলিতে লাগিলাম—কিন্তু পথ ফুরায় না, চলিতে-চলিতে পা অসাড় হইয়া গেল, বসিয়া পড়িলাম, যেমন বসা অমনি সাম্‌নে একটা পাথরের দেয়াল পড়িল। হাত বাড়াইয়া দেখি সামনে দেয়াল, পিছনে দেয়াল, পাশে দেয়াল,

মাথার উপর দেয়াল ;—দেয়ালগুলো ক্রমেই কাছ-ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল ;—ঘাড় উঁচু করিলে মাথায় ঠেকে, পাশ ফিরিলে গায়ে ঠেকে। এ কি আমার জীবন্ত সমাধি হইল নাকি! * * * * *

বাড়ি ফিরিয়া বৈকালিক জলযোগের পর শ্রীশ বলিল—"চল তাজ দেখিতে যাই!"

আম বলিলাম –"না!"

শ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—"সে কি!"

আমি জোর করিয়া বলিলাম—"না, আমি যাবো না!"

সে বলিল—"তবে চল ইৎমৎদৌল্লা!"

আমি বলিলাম—"না!"

—"সেকেন্দ্রা?"

—"না!"

—"তবে চল যমুনার ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি!"

আমি এ-কথার কোনো উত্তরই দিলাম না।

অগত্যা শ্রীশ একলা বাহির হইয়া গেল। আগ্রা দেখা শেষ করিয়া আসিয়া বলিল—"এবার কোথায় যাবে?"

আমি বলিলাম—"বাড়ি!"

সে বলিল—"দুর্ পাগল! বাড়ি যাবে কি! চল দিল্লী যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"দিল্লী দুর্গ!"

আমি বলিলাম—"তবে আমি নাই!"

—"আচ্ছা বেশ, দুর্গ না দেখ, জুম্মা আছে, কুতুব-মিনার আছে হুমায়ুন-কবর আছে।"

আমি কবরের নামেই বলিয়া উঠিলাম—"না না, সে-সব হবেনা।"

এমনিতর তর্ক করিতে করিতে ট্রেনের সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ-রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"তবে কোথায় যেতে চাও ঠিক করে বল!"

আমি বলিলাম—"দেশ-দেখার সখ আমার মিটেছে; এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল।"

শ্রীশ খানিকক্ষণ গোঁ হইয়া রহিল। চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল—"তবে চল জয়পুর যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"শুনেছি সহরটি দেখতে খুব ভালো।"

—"প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ সে সহর মরে ভূত হয়ে নেই ত?"

—"না হে না।"

—"নবাবদের হানা বাড়ি?"

"আরে না না, সে সব নেই। তোমার পক্ষে খুব safe place।"

আমি বলিলাম—"ঠিক বলছ?"

শ্রীশ আমার গায়ে হাত দিয়া শপথ করিল।

ট্রেন ছাড়িবার অল্পমাত্র বাকি, আর হাঁ-না করিবার বেশি সময় নাই, শ্রীশের কথার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমি রাজি হইয়া গেলাম।

গাড়ি ছাড়িলে আমার হঠাৎ মনে পড়িল অম্বরের কথা। আমি বলিলাম—"শ্রীশ, রাস্কেল, মিথ্যেবাদী! জয়পুর তোমার safe place?"

শ্রীশ অবাক হইয়া বলিল—"কেন?"

—"কেন? অম্বরের প্রাসাদ!—সেটা কি? সেটা ত একটা আস্ত ভূতুড়ে বাড়ি!"

শ্রীশ বলিল—"তোমার ভয় নেই, সেখানে তোমায় নিয়ে যাবোনা—জয়পুর সহর থেকে সে অনেক দূর!"

জয়পুর ষ্টেসনে যখন ট্রেণ আসিয়া থামিল তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইতেছি কুলি বলিল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমরা বলিলাম—"সহরে!"

সে বলিল—"সহরের ফটক বন্ধ, ঢোকবার যো নাই!"

শ্রীশ ও আমি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। শ্রীশ বলিল—"তবে চল ওয়েটিং রুম!"

ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্র নামাইয়া সবেমাত্র বসিয়াছি, ষ্টেসন মাষ্টার আসিয়া বলিল—"এখানে আপনাদের থাকতে দিতে পারি না। রাত্রে আর ট্রেণ নেই—এখনি ষ্টেসন বন্ধ করে আমরা সব চলে যাবো!"

শ্রীশ বলিল—"তা যান না। আমাদের বিরক্ত করেন কেন?"

ষ্টেসন মাষ্টার বলিল—"আপনাদের এখানে থাকতে দেব না।"

শ্রীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সে কি রকম কথা! আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, জানেন!"

ষ্টেসন মাষ্টার বলিল—"তা জানি। কিন্তু আপনাদের safetyর জন্যে আমি responsible হ'তে পারব না।"

শ্রীশ বলিল—"আমরা কি booked luggage যে আমরা আপনার safe custodyতে থাকবার দাবী করছি!"

সে বলিল—"ও! ব্যাপারটা আপনারা জানেন না দেখচি। সপ্তাহখানেক হল এই ওয়েটিং রুমে একটা খুন হয়ে গেছে। একটি passenger এসে রাত্রে এইখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি খুন হন, তাঁর identification হয়নি—কারণ তাঁর মাথা পাওয়া যায়নি।"

শ্রীশ বলিল—"আশা করি, তাঁর মাথা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে বলে আপনি সন্দেহ করছেন না।"

ষ্টেশন মাষ্টার একটু হাসিয়া বলিল—"সে সন্দেহ করছিনা বটে কিন্তু আপনাদের নিজের মাথা যথাস্থানে থাকে কিনা এই সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠছে।"

শ্রীশ বলিল—"তাহ'লে কি আপনার এই প্রস্তাব যে আমাদের মাথা-দুটো আপনার Iron safeএ আপাতত গচ্ছিত রাখা হোক।"

মাষ্টার বলিল—"ঠাট্টা রাখুন মশায়, ব্যাপার বড় serious।"

শ্রীশ বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যান, আমাদের মাথার জন্যে আপনার মাথাব্যাথার কোনো দরকার নেই।"

—"তা হ'ল মশায়, আমার ঘাড়ে কোনো দায় রইল না!"

শ্রীশ নিজের মাথায় হাত দিয়া বলিল—"আমাদের মাথার দায় আমাদের ঘাড়েই আছে, আপনার ঘাড়ে নিশ্চয় নেই—এ ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন।"

—"যা ভালো বোঝেন করুন। মোট কথা রাত্রে খুব সাবধানে থাকবেন।"

শ্রীশ মাথা নত করিয়া বলিল—"ধন্যবাদ।"

শ্রীশ ও ষ্টেশন মাষ্টারের কথোপকথনে "মাথা" কথাটা বার বার আমার কানে আসিয়া লাগিয়া আমার মাথার ভিতর কেমন যেন একটা জটলা পাকাইয়া তুলিল। যে কথাই ভাবিতে যাই তার মধ্যে যেমন করিয়াই হোক 'মাথা' কথাটা ঢুকিয়া পড়ে।

শ্রীশ বলিল—"রাত্রি অনেক হয়েছে, নাও কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়।"

আমি ভয়ানক শীতকাতুরে। গায়ে আমার প্রকাণ্ড একটা ওভার-কোট ছিল, তবু আমার ভিতরের হাড়শুদ্ধ কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—"জামা কাপড় আমি ছাড়ছিনা, এই সবশুদ্ধ শুয়ে পড়ব।"

শ্রীশ ওভারকোটটা খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল—"বাবা! ঐ গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে তুমি ঘুমবে কেমন করে?"

তারপর শ্রীশ আর দ্বিরুক্তি করিল না। যেমন বিছানায় পড়া অমনি ঘুম। আমি দুবার শ্রীশ শ্রীশ করিয়া ডাক দিলাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমি তখন গায়ের কম্বলটা মাথা অবধি মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সমস্ত শরীরটা গরম হইয়া উঠিয়া বেশ-একটু আরাম করিতে লাগিল। চোখে তন্দ্রার আবেশ আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি জানিনা, হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল কম্বলটা দেখি মাথা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। দূরে একটা কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জলিতেছিল বটে কিন্তু তার চিমনির উপরকার ধোঁয়া ও ধূলা ছাঁকিয়া যে আলো বাহির হইতেছিল তাহা অত্যন্ত ঘোলাটে। চারিদিক হইতে ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো সেই জমাট অন্ধকারের গায়ে সামান্য একটু আভা ফেলিতেছিল মাত্র, তার গভীরতা ভেদ করিতে পারিতেছিলনা,—তার কঠিন গায়ে লাগিয়া আলোর তীরগুলো প্রতিহত হইয়া যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়িতেছিল।

শ্রীশকে ঠিক দেখিতে পাইতেছিলাম না,—কোথায় সে শুইয়া আছে তারই একটা আন্দাজ পাইতেছিলাম মাত্র। আমাদের জিনিসপত্রগুলো কালো-কালো ছোটো-ছোটো ঢিবির মতন চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল। কোথায় এক-জায়গায় আমাদের একটা পুঁটুলী হইতে একটু সাদা কাপড়ের অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল যেন ঐ অন্ধকারটা তার সাদা দাঁতের পাটি বাহির করিয়া ভ্রূকুটি করিতেছে। আমার মাথাটা বোঁ করিয়া উঠিল। চোখে অন্ধকার দেখিলাম। তাড়াতাড়ি কম্বলটা মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভয়ঙ্কর গরম বোধ হইতে লাগিল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। মাথা অবধি কম্বলমুড়ি অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি সেটা টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। দেখি চারিদিকে অন্ধকারের খেলা জমিয়া উঠিয়াছে।

পাতলা। কোথাও পাথরের মতন কঠিন ভারি, কোথাও মেঘপুঞ্জের মতো হাল্কা ফুরফুরে। কোনোজায়গা কালির মত মিশ-কালো, কোনো জায়গা ছাইয়ের মত ফিকে—পাঁশুটে। চারিদিকে কেবল কালো রঙের নানা স্তর—নানা বৈচিত্র্য। ঘরের মধ্যে যে-সব জিনিস ছড়ানো আছে, সেগুলোকে আর জিনিস বলিয়া মনে হয় না, সেগুলো যেন অন্ধকারের সব কাচ্চা-বাচ্চা। উপরে কড়ি-কাঠের দিকে চাহিয়া দেখি যে কয়েকটা অন্ধকার-জীব বিছানা পাতিয়া ছেলেপুলে লইয়া শুইয়া আছে। দেয়ালের দিকে দেখি তার গায়ে বড়-ছোটো নানা-রকমের সব নির্জীব পোকামাকড় লাগিয়া আছে। এ যেন অন্ধকারের রাজত্ব—এখানে যেন রক্তমাংসের কোনো সম্পর্ক নাই। * * *

হঠাৎ দেখি চেয়ারের উপর একটা লোক অলসভাবে বসিয়া আছে—তার হাত-দুটো চেয়ারের দুপাশে ন্যাতার মতো ঝুলিতেছে। একবার মনে হইল বুঝি শ্রীশ চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি ডাকিলাম—শ্রীশ! কোনো উত্তর পাইলাম না। কেমন সন্দেহ হইল। খুব ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি—এ কি লোকটার মাথা নাই যে! কাঁধ অবধি শরীরটা গিয়া—ব্যস, সেইখানেই একেবারে শেষ হইয়া গেছে। আমার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—আমি তাড়াতাড়ি কম্বলটা মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম। * * *

মনে হইল লোকটা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন আমার দিকে আসিতেছে। আমার সমস্ত শরীর গুটাইয়া একেবারে কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া কে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। সে নিশ্বাসের বাতাস কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! কম্বল ফুঁড়িয়া আমার ভিতরের হাড় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপাইতে লাগিল। লোকটা সাপের নিশ্বাসের মতো হিস্ হিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার মাথা কৈ? —আমার মাথা!" * * *

মনে হইল যেন একখানা হাত আমার মাথাটাকে পরীক্ষা করিতেছে—এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গলা হইতে কোনো স্বর বাহির হইল না। এমন অসাড় হইয়া গেলাম যে বোধ হইল যেন আমার বুকের কাঁপুনি পর্য্যন্ত থামিয়া গেছে। তখন আড়ষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলাম দুখানা হাত কেবল চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে আর একটা অস্ফুট শব্দ উঠিতেছে—মাথা কৈ? মাথা কৈ? * * *

ঢং ঢং শব্দে সমস্ত দিক কাঁপাইয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্বল ফুঁড়িয়া একটা আলোর রেখা আমার চোখের পাতায় আসিয়া লাগিল। ওয়েটিং রুমের বাহিরে একটা কলরব উঠিয়াছে। শ্রীশ আমার নাম ধরিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে—"ওঠ, ওঠ, বেলা হল।"

আমি কম্বল হইতে এতটুকু মুখ বাহির করিয়া চাহিলাম। ঘরের দরজা জানলা তখনো বন্ধ, ভোরের অল্পমাত্র আলো দেখা দিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দেখিলাম শ্রীশ চেয়ারখানার সামনে দাঁড়াইয়া

আছে। তার দিকে চাহিতেই মনে হইল রাত্রের সেই কন্ধকাটা লোকটা যেন শ্রীশের গায়ের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। আমি চোখ বুজিয়া ফেলিলাম। তার পর দেখি শ্রীশ ওভারকোট আঁটিয়া আমার ঘুম ভাঙাইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। * * *

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

বাদশাহ আকবরের নিরক্ষরতা

কিছুদিন হইতে, বাদশাহ আকবর নিরক্ষর ছিলেন কিনা—এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এ-বিষয়ে একরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আবহমান কাল হইতে আমাদের দেশেও প্রচলিত কথা এই যে আকবর নিরক্ষর ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ফার্সিভাষাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা-মহাশয় তাঁহার পুস্তকে চিরাচরিত এই অপবাদ দুরীকরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু, এই বিষয়ে গভীর গবেষণা-প্রসূত অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও আমাদের ঠিক মনে হয় না যে, তিনি এই বিষয়টী প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি এই বিষয়ে কিছু কিছু বিরুদ্ধ প্রমাণ শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংগ্রহ করিয়া কুমার নরেন্দ্রনাথের প্রমাণাবলী ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু, আমার মনে হয়, বিচারযোগ্য এই ঘটনা-সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়ে বহু ফার্সী ও আরবী-গ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগ করিলেও গৃহসন্নিকটস্থ বিবেচনাযোগ্য ও একহিসাবে অভ্রান্ত একটী প্রমাণের সাহায্যগ্রহণ করেন নাই। আমরা কুমার নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই প্রমাণটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

বাঁকিপুর খুদাবক্স লাইব্রেরীর ফার্সি ও আরবী পাণ্ডুলিপি সমূহের কথা বঙ্গীয় পাঠকগণ অনবগত নহেন। এই পাঠাগারের দুইখানি পুস্তকের কথা এই প্রসঙ্গে সমধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিওয়ান-ই-হাফিজ্—এখানি সিরাজ শহরের সুবিখ্যাত কবি হাফিজের ভাবপ্রধান গীতিকবিতা সমষ্টির পুঁথি। এই পুঁথি-(বা হস্তলিখিত পুস্তক) খানি পাঠাগারের একটী অমূল্য রত্ন। হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীর বাদশাহদ্বয়ের সাক্ষর, অর্থবোধাত্মক চিহ্ন ও কথা প্রভৃতিদ্বারা অনেক পৃষ্ঠা সুশোভিত। এই পুস্তকখানি যে হুমায়ুন ও তাঁহার পরবর্ত্তী বাদশাহগণের "সঙ্গের সঙ্গী" ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হাতের লেখা থাকিলেও, আকবরের সাক্ষর বা হস্তলিপি দৃষ্ট হয় না। পুঁথিখানি-সম্বন্ধে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

মুসলমানগণ কুরাণ ও হাফিজের কবিতা-দৃষ্টে অনেকসময় অদৃষ্টের ফলাফল বিচার করিতেন। রোমক ও আরবজাতির

হয়। বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষভাগে মানসিংহ যখন চক্রান্ত করিয়া সেলিমের সিংহাসনাধিরোহণের অন্তরায় হইতেছিলেন, তখন সেলিম এই পুঁথিখানি খুলিয়া নিজ অদৃষ্টের ফলাফল বিচার করিয়াছিলেন। শাহজাহান পুত্র দারাশুকোও এই পুঁথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং হুমায়ুন হইতে দারাশুকো পর্য্যন্ত সকলেই এই পুস্তকখানি যে ("Heir-loom") কুলক্রমাগত পুস্তকরূপে ব্যবহার করিতেন তাহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পুঁথিতেও আকবরের কোন সাক্ষর বা লিপি নাই।



বাদশাহ আকবর

মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল! যদিও অদৃষ্টের ফলাফল বিচার অনেক মুসলমান দুষণীয় মনে করেন, তথাপি এরূপ বিচারে ব্রতী লোকের সংখ্যাও কম ছিলনা। বিভিন্ন প্রকারে এই ফলাফল নির্দ্ধারিত হইত। পুস্তকখানি খুলিয়া প্রথমে যে কবিতার প্রতি চোখ পড়িত তাহার মর্ম্ম হইতেই আরব্ধ বা অভীষ্ট কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে কি বিফল-মনোরথ হইতে হইবে তাহা প্রণিধান করা হইত। হাফিজের এই পুঁথিখানি এইজন্য বাদশাহ হুমায়ুন ব্যবহার করিতেন এবং আবশ্যকমত পার্শ্বে (মার্জ্জিনে) মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। জাহাঙ্গীরেরও বহুমন্তব্য এই পুঁথিখানির অনেকস্থানে দৃষ্ট

দ্বিতীয় আর একখানি পুঁথির অলোচনা করা যাউক। ইহা "দিওয়ান-ই-মির্জা কামরান"। এই বহুমূল্যবান ও অদ্বিতীয় পুঁথিখানির স্বত্বাধিকারী ছিলেন হুমায়ুন-ভ্রাতা কামরান। ইহাতে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সাক্ষর এবং আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের দরবারস্থ অনেক ওমরাহ ও কর্ম্মচারীদের সাক্ষর ও মোহর রহিয়াছে। কামরানের জীবদ্দশায়ই এই পুঁথিখানি যে লিখিত হইয়াছিল গ্রন্থমধ্যে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক পৃষ্ঠায় রহিয়াছে (ইহার প্রতিলিপি



জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের হস্তাক্ষর

আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম), "ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান। এই দিওয়ান আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের খুল্লতাত মির্জা কামরানের। ইহা আমার হস্তাক্ষর। নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর শাহ আকবর। রাজত্বের বিংশ বৎসর, হিজিরা ১০৩৪।"

ইহা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের হস্তাক্ষর।

ঐ পৃষ্ঠায়ই বাদশাহ শাহজাহান-লিখিত নিম্নোক্ত মন্তব্য ও সাক্ষর দৃষ্ট হয়—

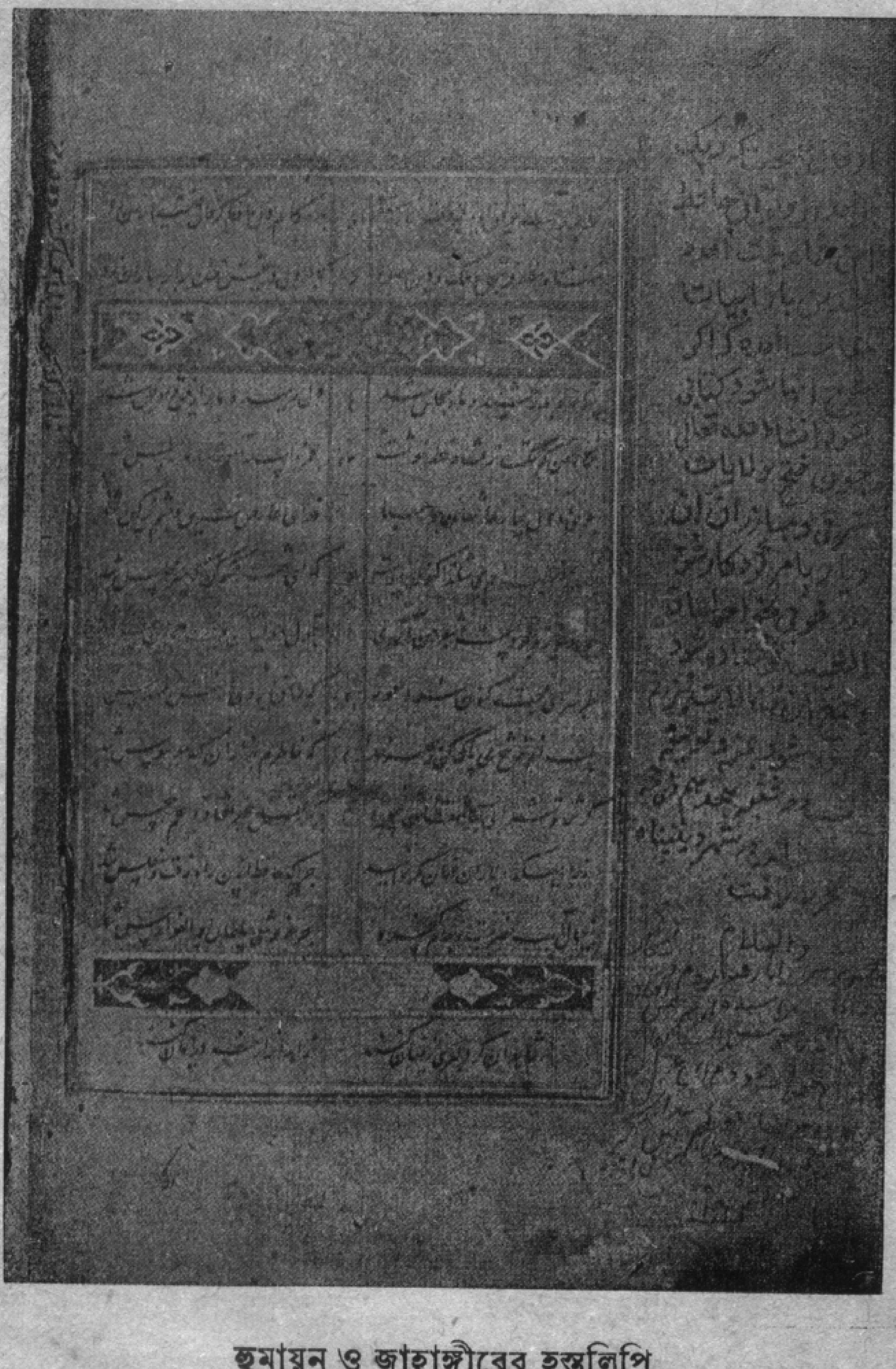
"ভগবানকে ধন্যবাদ যিনি এই দাসের নিকট এই পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন। আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর বাদশাহের পুত্র শাহজাহান।"

এস্থলে উল্লিখিত হইতে পারে যে ১০২৫ হিজিরায় (১৬১৬ খৃষ্টাব্দে) জাহাঙ্গীর প্রিয় পুত্র সুলতান খুর্‌রমকে শাহ খুর্‌রম উপাধিতে ভূষিত করিয়া, দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রেরণ করেন। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পরে রাজকুমার খুর্‌রম বুর্হানপুর হইতে মাণ্ডুতে অবস্থিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করেন (হিজিরা ১০২৬=খৃষ্টাব্দ ১৬১৭) এবং দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ রাজ-কুমারকে শাহজাহান উপাধিভূষিত করেন। খুর্‌রমই যে তখন বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা দিওয়ান্-ই-হাফিজের পূর্ব্বোল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে জাহাঙ্গীর যে নিম্নোক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয়ঃ—

"বৃহস্পতিবার, আমার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে মান্দুদুর্গে সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চদশ

মাস ও একাদশ দিবসের অধিককাল আমরা পৃথক ছিলাম। নমস্কার ও চুম্বন আচার প্রতিপালিত হইলে আমি পুত্রকে অলিন্দের উপরে আহ্বান করিলাম এবং অত্যধিক স্নেহ ও আগ্রহাতিশয্যে আমি তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিলাম। তাঁহার যতই সম্মান ও দৈন্যের জ্যোতি বৃদ্ধি পাইতেছিল, আমারও অনুগ্রহ ও স্নেহ তদ্রূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং আমার সন্নিকটে উপবেশনার্থ তাঁহাকে আদেশ করিলাম।"

অপর যে চিত্রখানি আমরা হাফিজ হইতে প্রদান করিলাম তাহাতে বাদশাহ হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের স্বহস্ত-লিখিত মন্তব্য ও সাক্ষর আছে। আমরা বাদশাহদ্বয়ের চিত্রোল্লিখিত লিপির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি। প্রথমাংশ হুমায়ুন-বাদশাহের—"হাফিজের দিওয়ান অনুসন্ধান



হুমায়ুন ও জাহাঙ্গীরের হস্তলিপি

করিয়া আমি এতগুলি শুভদায়ক চিহ্ন পাইলাম যে এগুলি বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিতে হইলে একখানি পুস্তক হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় পূর্ব্বাঞ্চল ও ঐ প্রদেশস্থ সৈন্যসকল বশীভূত হইলে উপহার প্রদান করা যাইবে এবং এইসকল চিহ্ন ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও আদেশে একত্রীভূত করা হইবে। ৯৬২ হিজিরা।" দ্বিতীয়াংশ জাহাঙ্গীরের লেখা—উহার মর্ম্ম এইরূপঃ—"আমি রাণার সহিত যুদ্ধার্থ আজমীর গিয়াছিলাম। মৃগয়া-কালে হীরকের কবচ আমার মস্তক হইতে পতিত হয়। আমি দিওয়ান অনুসন্ধান করি এবং তৎপর দিবস কবচটী প্রাপ্ত হই—আকবর-বাদশাহের পুত্র নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর-কর্ত্তৃক ১০২৪ হিজিরায় লিখিত।"

এই চিত্রখানি কিছু অস্পষ্ট এবং জাহাঙ্গীরের লিপি অধিকতর অস্পষ্ট।

হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান—এই তিনজন বাদশাহের হস্তলিপি পাওয়া যাইতেছে। যে দুইখানি পুস্তকের কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, সে দুইখানিই যে আকবরের সময়েও ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার কোনটীতেই আকবরের লেখা পাওয়া যাইতেছে না। খুদাবক্স লাইব্রেরীর অন্য কোন পুঁথিতেও এ-পর্য্যন্ত আকবরের লেখা বা সাক্ষর পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, আকবর নিরক্ষর ছিলেন। ভারত-ইতিহাসে অবশ্য এরূপ নিরক্ষরতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

অন্ধকার

ক

জমিদার ভুবন-চৌধুরীর পুত্র নগেন সেদিন একটু বেশী রাতে বাড়ী ফিরিল! তাহার মাথার চুল উস্কখুস্ক, জামার বোতাম-গুলো খোলা, পা-দুটো টলমল, কাপড়-চোপড় এলমেল—পিছনের কাছা বেপরোয়ারূপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া সামনের কোঁচাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে!

বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জাগিয়া আছে শুধু নূতন ব্রাহ্মণী। গিন্নিমার হুকুম, নগেনকে না-খাওয়াইয়া সে যেন ঘুমাইয়া না-পড়ে। তাহার নাম রাইমণি, বয়সটি কাঁচা।

নগেন এখানে-ওখানে ঠোকর খাইতে-খাইতে দালানে আসিয়া, দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল; কোনমতে এড়াইয়া-এড়াইয়া বলিল, "খাবার কোথা?"

খাবারের থালা হাতে-করিয়া রাইমণি আস্তে-আস্তে দালানের ভিতরে ঢুকিল। তাহার মুখে ঘোমটা, ভাব-ভঙ্গী সঙ্কুচিত।

রাইমণি আসা-পর্য্যন্ত নগেনের পিপাসী চোখ শিকারীর দৃষ্টির মত তাহার পিছনে-

পিছনে ঘুরিতেছে। কিন্তু রাইমণি এমনি সাবধানী যে, নগেন কিছুতেই তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই! তবে, তাহার সুডৌল গড়ন ও নিটোল হাত-দুখানি দেখিয়াই সে বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল, যে, এত সুশ্রী যার দেহ, তার মুখ কখনই বিশ্রী নহে!

নগেন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিল, রাইমণি জলছড়া দিয়া খাবারের থালাখানি মেঝের উপরে রাখিল; তারপর আসনখানি বিছাইয়া ও জলের গেলাসটি আগাইয়া দিয়া এককোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

এমন নিঝুম রাতে রাইমণিকে এতটা কাছে নগেন আর-কখনো পায় নাই! তাহার মনে এর আগে একটু-যে ইতস্তত ছিল, আজ নেশার রঙ্গে সেটুকুও ঢাকিয়া গিয়াছে।

রাইমণির দিকে বাঁকা-চোখে একবার চাহিয়া, নগেন আসনের উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল; অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার নাকের ডগাটা তখন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছে!

খানদুয়েক লুচি খাইয়া নগেন বলিল, "একটু নুন দিয়ে যাও ত!"

রাইমণি কুণ্ঠিতভাবে নগেনের সামনে আসিয়া, হেঁট হইয়া থালায় নুন দিতে গেল।

নগেন দেখিল, পাতলা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির ডাগর চোখদুটির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে! এবং সেইসঙ্গে মাথা-ঘষা মশলার একটা মিশ্র ও মিষ্ট গন্ধ আসিয়া নগেনের মাতাল প্রাণকে পাগল করিয়া তুলিল,—সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—হঠাৎ সুমুখদিকে ঝুঁকিয়া এক টান্ মারিয়া রাইমণির মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিল!

"ওগো মাগো!"—বলিয়া রাইমণি বিদ্যুতাহতের মত ঘরের মেঝেতে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

নগেন বলিল, "চুপ, চুপ—চেঁচিও না, সবাই শুন্‌তে পাবে!"

ঠিক পাশের ঘরেই থাকিতেন, গৃহিণী; সেদিন অসময়ে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। রাইমণির আর্ত্তস্বর তাঁহার কাণে ভেজিল। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, রাইমণি দু-হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝের উপরে পড়িয়া আছে আর নগেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া থালার সামনে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই গুণধর পুত্রটির স্বভাব-চরিত্রের কথা তিনি বেশ ভালোরকমেই জানিতেন, সুতরাং ব্যাপারটা বুঝিতে গৃহিণীর বিলম্ব হইল না। অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে তিনি ডাকিলেন, "নগা!"

নগেন একেবারে কেঁচো! একটিও কথা না বলিয়া সেখান হইতে সে সুড়্‌সুড়্ করিয়া উঠিয়া গেল।

গৃহিণী, রাইমণির গায়ে হাত দিয়া আস্তে-আস্তে ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ওঠ মা, ওঠ! নগার যে এতটা সাহস হবে, আমি তা জানতুম না। জানলে, তার সামনে কি তোমাকে একলা বেরুতে দিতুম?"

খ

সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন দুপুরবেলায় রাইমণি, গিন্নীর মাথার পাকচুল তুলিয়া দিতেছিল। এই ব্রাহ্মণ-কন্যাটিকে পাইয়া

গিন্নী যেন বর্ত্তিয়া গিয়াছেন; রাইমণি তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করে, মেয়ের মত যত্ন করে; রান্নাবান্না ও গেরস্থালীর কাজে সে এতটা নিপুণা, যে তাহার হাতে সংসারের সব ভার সঁপিয়া গিন্নী যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন।

গিন্নী বলিলেন, "বামুন-মেয়ে, কাল মা তোমাকে একটু সকাল-সকাল উঠতে হবে।"

রাইমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা?"

—"কাল আমাদের গুরুঠাকুর আসবেন। তাঁর জন্তে আলাদা হেঁসেল কেঁড়ে রান্নাবান্না সেরে, তবে আমাদের হাঁড়ি চড়্‌বে। সকাল সকাল উনুনে আগুন না-দিলে ওদিকে অনেক বেলা হয়ে যাবে কি না!"

রাইমণি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

খানিক পরে গিন্নী আবার বলিলেন, "হ্যাঁ মা, রোজই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব করব ভাবি, তা পোড়া মন এমনি বেভুল যে, রোজই কেমন ভুলে যাই।"

রাইমণি বলিল, "কি কথা মা?"

—"শুনেছি, তোমার স্বামী আছেন। কিন্তু এতদিন এখানে রইলে, কৈ, একখানা চিঠি লিখেও তিনি ত তোমার খোঁজ-খবর নিলেন না!"

চুল বাছিতে-বাছিতে রাইমণি হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তাহার সরল হাসি-হাসি মুখখানি চকিতে যেন একটা কালো ছায়ায় অন্ধকার হইয়া গেল।

গিন্নী তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলেন না; তাই সহজভাবেই আবার বলিলেন, "চুপ করে রৈলে কেন? বল না!"

রাইমণি জোর-করিয়া কথা কহিল; বলিল, "জানি না!"

—"এখানকার ঠিকানা তোমার স্বামী জানেন ত?"

—"না। আমি যে এখানে আছি, তাও তিনি জানেন না।"

গিন্নী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি! তোমার স্বামী জানেন না?"

রাইমণি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল; কোন কথা না বলিয়া চুপ-করিয়া সে বসিয়া রহিল।

গিন্নী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বামুন-মেয়ে, স্বামীর সঙ্গে কি ঝগড়া করে' তুমি এখানে এসেছ?"

রাইমণি কুণ্ঠিতস্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

—"তবে?"

—"তিনি আমাকে নিতে চান না!"

গিন্নী যেন আকাশ থেকে পড়িলেন। বলিলেন, "অ্যাঁ! তোমাকে নিতে চায় না! তোমার এত রূপ, এত গুণ,—তোমাকে নিতে চায় না, কেমন লোক সে?"

রাইমণি পুতুলের মত বোবা ও স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী যদি পিছন ফিরিয়া না থাকিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, রাইমণির বড়বড় চোখ ধীরে-ধীরে জলে ভরিয়া উঠিতেছে!

গিন্নী আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিলেন, হঠাৎ কর্ত্তা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন; তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া, সেখান হইতে পলাইয়া, রাইমণি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!

গ

রাইমণি কিন্তু বুঝিল, এমন লুকোচুরি আর বেশীদিন চলিবে না, তাহার সব কথা একদিন-না-একদিন বাহির হইয়া পড়িবেই!

তার স্বামী? হ্যাঁ, তিনি আছেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে থাকিয়াও তিনি আজ বহুদূরে, বহুদূরে! এ ব্যবধান তাহার নিজের পাপে ঘটে নাই—নিষ্ঠুর নিয়তি আজ তাহার জীবন-দেবতাকে জোর-করিয়া ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে,—তাহার কাকুতি, তাহার অশ্রু, তাহার বেদনা-ব্যাকুলতা এ চিরবিচ্ছেদকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই! আজ তাহার এ দেহ যেন জীবনহীন যন্ত্রচালিত শবের মত; এ শব কবে কোন্ বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে বৈতরণীর খরস্রোতে পড়িয়া পরপারে গিয়া ঠেকিবে—ভগবান জানেন—মনে মনে সে এখন শুধু সেই কামনাই করিতেছে! সে জানে, এমন মরিয়া বাঁচিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ-সীমায় গিয়াও মানুষ যে মন থেকে আশার ছবি মুছিতে পারে না! নিরাশার মরুভূমির মাঝে পথহারা হইয়াও রাইমণি আজও তাই এই মরণভরা জীবনকে কোনক্রমে কায়-ক্লেশে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

তাহার স্বামী ছিলেন স্নেহময়, প্রেমময়, সহৃদয়। সেও তাহার স্বামীকে ভালবাসিত সমস্ত জীবন-যৌবন ঢালিয়া। স্বামী বিনা আর কারুকে সে চিনিত না, জানিত না। চরিত্রে সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে সেও কিছু খাটো ছিল না; কিন্তু যে-আমাদের ধর্ম্ম সীতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে আকাশে তুলিয়াছে, সেই-আমাদেরই সমাজ তাঁহাকে আবার পাতালে পাঠাইতে যখন ইতস্তত করে নাই, তখন তুচ্ছ রাইমণির সুখের মেঘে আগুণ লাগিবে না কেন?... ... .. রাইমণির সজল নেত্রের সম্মুখে সমাজের সিংহদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার বুকফাটা কান্নায় এখন দেবতার আসন টলিলেও, সমাজপতির হৃদয় গলিবে না!

রাইমণি কাঁদিতেছে—কাঁদুক; এমন কত রাইমণির নিষ্ফল অশ্রু সমাজের পায়ে নিয়ত ঝরঝর ঝরিতেছে, কে তার খবর রাখে?

ঘ

ভুবন-চৌধুরীর বাড়ীতে আজ সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অনেকদিন পরে গুরুদেব আজ এখানে পায়ের ধূলা দিয়াছেন।

পুরু পশমের আসনে গুরুদেব তাঁহার নধর-নিটোল দেহটি লইয়া রীতিমত জাঁকিয়া বসিয়াছেন। গুরুর সে গুরুভার হৃষ্টপুষ্ট দেহখানিতে ব্রহ্মচর্য্যের কোন লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহার বোঁটাওয়ালা বেলের মত ন্যাড়া মাথায় দিব্য আধ-হাত টিকি, তেল-চক্‌চকে কপালে ফোঁটা, খ্যাঁদা নাকে তিলক, গলায় কণ্ঠীর মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি ও পরোনে পট্টবস্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বের গুরুতর মাল-মশলার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই।

সকলের আগে বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া গুরুদেবের পা ধরিয়া মাটিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার পরে গৃহিণী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পালা।

তারপর, মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া রাইমণি আসিয়া সলজ্জভাবে প্রণাম করিল।

গুরুদেবের চক্ষুদুটি এতক্ষণ ভাবভরে ঢুলুঢুলু করিতেছিল; পরের প্রণাম লইয়া-লইয়া তাঁহার শ্রীচরণকমল-দুটি এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিল যে, এতগুলো কৃষ্ণের জীব আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া এত যে টানাটানি করিয়া গেল, সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না; কিন্তু, ঘোমটার ভিতর হইতে রাইমণির মুখ দেখিবা-মাত্র তাঁহার ঘুমন্ত দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল।

তাকিয়া ছাড়িয়া, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া, কর্ত্তার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ভুবন, এ মেয়েটি কে?"

কর্ত্তা বলিলেন, "এ মেয়েটি আমার বাড়ীতে রাঁধে।"

—"কৈ, গ্যালবারে যখন এসেছিলুম, তখন ত মেয়েটিকে দেখি-নি!"

—"ও সবে মাসতিনেক এখানে আছে।"

—"মাস তি-নে-ক! তবে কি"—বলিতে বলিতে থামিয়া পড়িয়া, গুরুদেব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাইমণির দিকে চাহিলেন।

রাইমণি তখন অত্যন্ত জড়োসড়ো হইয়া আস্তেআস্তে চলিয়া যাইতেছিল—গুরুদেবকে দেখিয়া সেও যেন কেমন থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া গুরুদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?"

—"রাইমণি!"

—"রাইমণি! ও কি তড়া-আঁটপুর গাঁ থেকে এসেছে?"

গিন্না একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকুর, আপনি জানলেন কি করে'?"

সে কথার কোন জবাব না-দিয়া, গুরুদেব হতাশভাবে তাকিয়ার উপরে আড়্ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভুবন, এখানে আর আমার দেবতার ভোগ হোতে পারে না—তোমার জাত্ গিয়েছে!"

গাঁয়ের সমাজপতি ভুবন-চৌধুরী,—যিনি কত লোককে একঘরে করিয়া 'পত্-পত্ রবে' হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছেন, যাঁহার ভয়ে ছেলে-ছোক্‌রার দল চোরের মত আটঘাট না বাঁধিয়া শ্রী-শ্রী রামপক্ষীর বিখ্যাত মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না, যাঁহার একটু ইঙ্গিতেই ধোপা-নাপিতের অভাবে অনেক অভাগার কাপড় হইয়াছে কয়লার মত ময়লা এবং দাড়ী-গোঁফ হইয়াছে যাত্রা-থিয়েটারের মুনি-ঋষিদের মত নাভিচুম্বনোন্মত,—তাঁহারই এত যত্নে বাঁচানো পৈতৃক জাতিটি খাম্‌কা মারা গিয়াছে? গুরুদেব বলেন কি! 'মেঘনাদ-বধে'র রাবণ যখন ভগ্নদূতের মুখে "নিশার স্বপনসম বারতা' শুনিয়াছিলেন, তখন তিনিও বোধকরি আমাদের ভুবন-চৌধুরীর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইবার সুযোগ পান নাই! কর্ত্তা বসিয়াছিলেন, লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রভু, এ কি নিদারুণ কথা! আমার জাত্ গিয়েছে? অ্যাঁ! অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ, তোমার জাত্ গিয়েছে! এতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

—"রাইমণি কি বামুনের মেয়ে নয়?"

—"হ্যাঁ, সে বামুনের মেয়ে।"

ভুবন-চৌধুরী ভুরু কুঁচকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে কি ও কুলত্যাগ করেছে ?"

—"না।"

তাইত! ভুবন-চৌধুরী অতিশয় ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন! তিনি জানিলেন না শুনিলেন না—অথচ তাঁহার এত সাধের জাতিটি কোন্ ফাঁকে স্রেফ্ কর্পূরের মত উবিয়া গেল! অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা তিনি হাল ছাড়িয়া হতাশভাবে বলিলেন, "তবে ?"

হরিনামের ঝুলির ভিতরে ঘন-ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে গুরুদেব বলিলেন, "শোন বলি। রাইমণির স্বামী আমারই শিষ্য। ওর স্বভাব-চরিত্র খুব ভালো—কারুর দিকে উঁচুনজরে চাইতে ওকে কেউ দেখে-নি। কিন্তু গতজন্মে ও কি পাপ করেছিল জানি না, এ-জন্মে তাই বুঝি তারই শাস্তিভোগ করছে। হরি হে, তোমারি কৃপা!"

ভুবন-চৌধুরী গুরুদেবের এ গোলক-ধাঁধার ভিতরে কিছুতেই ঢুকিতে পারিলেন না, শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে হাঁ-করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব আবার বলিলেন, "মাস-চারেক হোল, একদিন রাত্রে রাইমণিদের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা যাবার সময়ে রাইমণিকেও ধরে নিয়ে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তার চীৎকার আর কান্না শুনেও ডাকাতের ভয়ে কোন উপায়ই করতে পারলে না। পরে পুলিস এসে রাইমণিকে খুঁজে বার করলে। গ্রামের বাইরে একটা জঙ্গলের ভিতরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল।"

সকলে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ভুবন-চৌধুরীর দিকে চাহিয়া গুরুদেব আবার বলিতে লাগিলেন, "পুলিস-তদারকের পর জনকতক ডাকাত ধরা পড়ল—তাদের কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কিন্তু ডাকাত ধরা পড়লে কি হবে—তাদের সংস্পর্শে রাইমণি যে অমূল্য রত্ন হারাল, সে ত আর ফিরে পাবার নয়! স্বামীর পা ধরে সে অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কান্নাকাটি করলে; বললে সে নিষ্পাপ। ভগবান জানেন, সে কথা সত্য কি মিথ্যা! কিন্তু মানুষের মনের সন্দেহ ত চাপা দেওয়া যায় না। এর জন্যে সীতাকেও অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ওর স্বামীও ওকে আর ঘরে ঠাঁই দিতে পারলে না।"

ভুবন-চৌধুরী বিহ্বলভাবে গুরুদেবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "ও মাগী নিজের জাত-খুইয়ে কুল-মজিয়ে শেষটা কিনা আমাকে মজাতে এল! আমার কি উপায় হবে প্রভু, আমার কি উপায় হবে ?"

গুরুদেব বলিলেন, "ওকে কি তুমি জানতে না ?"

—"জানলে কি ওকে ঘরে ঠাঁই দিতুম—ধুলোপায়েই বিদেয় করতুম! যত নষ্টের গোড়া নাপ্তিনী-মাগী, সেইই জেনে-শুনে ওকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে। ছি, ছি, এ কথা প্রচার হোলে সমাজে আর মুখ দেখাব কেমন করে' ?"

গুরুদেব তাঁহার গ্যাস-ভরা বেলুনের

মত ফোলা, মোটাসোটা ভুঁড়িটির উপরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই। এ তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ। তবে, প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আর রাইমণিকেও এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।"

ঙ

ঘরের মেঝেতে রাইমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে,—তাহার দুইগাল দিয়া ঝর ঝর অশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কে তার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিল; চমকিয়া, মুখ তুলিয়া সে দেখিল, ঠিক তার সামনেই নগেন—সন্ধ্যার তরল আঁধারে তাহার চোখদুটো গিরগিটির চোখের মত জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! ভয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাইমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

নগেন চাপা-গলায় বলিল, "চেঁচিও না—চেঁচিও না! আমি যা বলতে এসেছি, শোন।"

ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া, রাইমণি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

নগেন বলিল, "দেখ, সমাজে কেউ তোমাকে ঠাঁই দেবে না—যেখানে যাবে সেখান থেকেই তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সমাজ তোমাকে না-চাইলেও আমি তোমাকে ফেলতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, আমি তোমাকে রাজরাণীর মত রাখব—তোমার কোন অভাব থাকবে না। তোমার ধর্ম্ম ত গিয়েছেই, তবে তুমিই-বা কেন ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে মিছে পরের লাঞ্ছনা সহ্য করবে?"

রাইমণি যেমন ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, হ্যাঁ না কিছুই বলিল না।

নগেন বুঝিল, মৌনই সম্মতির লক্ষণ। সে আস্তেআস্তে বলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি রাইমণি! এত ভালবাসি, যে বলবার নয়। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব। আজ শেষরাতে খিড়কীর দরজায় আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,—তোমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। তুমি কিছু ভেব না, তুমি যা চাইবে তাই পাবে—বাড়ী-ঘর, কাপড়-গয়না, দাসী-বাঁদী! জান ত টাকা আমার হাতের ধুলো।"

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। নগেন ব্যস্তভাবে বলিল, "ঐ কে আসছে—আমি চল্লুম। মনে রেখ—শেষরাতে খিড়কীর দরজায়।"—বলিয়াই, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রাইমণি সেখানে বিবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল ... ... সেদিন সে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ আর জ্বলিল না।

চ

নিঝুম রাত্রি। আকাশ জুড়িয়া দুধের ধারার মত জ্যোৎস্নার রূপের ঢেউ চল্‌কাইয়া উঠিয়াছে, ভাঙ্গামেঘের ধারেধারে চাঁদের হাসি আলোক-পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চৌধুরী-বাড়ীর দরজা খুলিয়া এই নীরব নিশীথে এক রমণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে-ধীরে একাকিনী চলিতে লাগিল।

ঘুমের কোলে শুইয়া গ্রামখানি নিসাড় হইয়া আছে। তাহারি মাঝখান দিয়া নানা পদচিহ্ন-লেখা আঁকাবাঁকা পথের রেখাটি স্বপ্নের ছবির মত চলিয়া গিয়াছে,—কখনো আলোকে জাগিয়া, কখনো ছায়ায় মিলাইয়া।

রমণী সেই পথ ধরিয়া চলিল—চন্দ্রালোকে সেই শুভ্রবসনা রহস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গেঁয়ো কুকুরগুলো ভয় পাইয়া পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাঠের ধারে পথের শেষ।—রমণী কিন্তু থামিল না, সেই ধুধু মাঠের ভিতর দিয়াই সে স্বপ্নাবিষ্ট অন্ধের মত সমান অগ্রসর হইতে লাগিল;—দূরে জলাভূমিতে ভৌতিক ব্যাপারের মত আলেয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; আরো-দূরে শ্মশানের চিতার মত কি-একটা আগুন দাউদাউ জ্বলিতেছে;—তার কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে যেন মরণকে একটুও ডরায় না!

চাঁদ যখন পাণ্ডুমুখে পশ্চিমে নামিতেছে, মাঠ তখন শেষ হইল। সামনেই গভীর অরণ্য, তার মধ্যে পথ নাই আলো নাই শব্দ নাই; শুধু কষ্টিপাথরের চেয়েও কালো, একটা বিরাট নিস্পন্দ জমাট অন্ধকার, এক অনন্তদেহ পিশাচের মত বিশ্বকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন হাঁ-করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে!

হঠাৎ কোন্ দূর কুঞ্জবনে পাপিয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকের থম্‌থমে স্তব্ধতার মধ্যে পাপিয়ার আকস্মিক গান শুনিয়া রমণীও থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এতবড় দীর্ঘপথে এই প্রথম সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, চাঁদের অন্তিমহাসি প্রান্তরের শ্যামলতার উপরে তখনো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে... ... বিদায়ের মলিন হাসি!... ... ...

রমণীর বুক ঠেলিয়া একটি চাপা নিশ্বাস উঠিল—সে যেন চুপেচুপে অস্ফুট হাহাকার!... ... ...

তারপর, সেই চাঁদের আলো, পাপিয়ার গান পিছনে রাখিয়া, রমণী সুমুখপানে অগ্রসর হইল;—চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া বিপুল অন্ধকার তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে... ... ... মৃত্যুর মত!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের নিয়ম

আমরা পূর্ব্বে (১) বংশানুক্রমের মূল অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলী সন্তানে সংক্রামিত হয় মোটামুটি তাহা বলিয়াছি, ও কিরূপে জীব হইতে জীবান্তরে সেই সংক্রমণক্রিয়া সাধিত হয়, তাহারও কতকটা আভাস দিয়াছি। কিন্তু সৃষ্টিধারায় যে আর-একটি প্রবল শক্তি কাজ করিতেছে তাহার কথা বিশেষ কিছু বলি নাই। সে প্রবল শক্তির নাম 'পরিবর্ত্তন' (Variation)।

(১) বংশানুক্রমের গোড়ার কথা—ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২৪।

ইহাই জীবজগতে বৈষম্যকে আনয়ন করিতেছে,—তাহার অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। বংশানুক্রম যেমন প্রত্যেক জীবজাতি (Genus) ও জীববর্ণের (Species) মধ্যে, সাদৃশ বা সাধর্ম্ম্যকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, পরিবর্ত্তন (Variation) তেমনই উহাদের বৈষম্যকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। বংশানুক্রম না থাকিলে যেমন জীবজাতি ও জীববর্ণসমূহের মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম্ম থাকিত না, পরিবর্ত্তন না থাকিলে তেমনই এই নানা বিচিত্র জীবজাতি ও জীববর্ণাদির বিকাশ ঘটিত না। দার্শনিকের ভাষায় একটি গতিশক্তি (Dynamic), অপরটি স্থিতিশক্তি (Static); একটি সৃষ্টিকে রূপ হইতে নব-নব রূপান্তরে লইয়া যাইতেছে, অপরটি সেই সকল বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্রতার মধ্যে মিলন-রজ্জুর বন্ধন টানিয়া রাখিতেছে।

কেবল যে বিভিন্ন জীবজাতি বা জীববর্ণের মধ্যেই এই বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, এক এক জীবজাতি ও জীববর্ণের অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যেও এই সাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও এই বৈষম্য বেশ স্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। একই জাতি একই বংশ একই পিতামাতার কোনো-দুই সন্তানের মধ্যেই স্বভাব, প্রকৃতি, আকৃতি, গঠন একরূপ নয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে সেই সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালেই একটা সাধর্ম্ম্যও বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়;—সকল বৈষম্যকে ছাপাইয়া সাদৃশ্যের রূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহাই বংশানুক্রমের ধারা। এই বংশানুক্রমিক গুণাবলী কি নিয়মে আত্মপ্রকাশ করে, আজ সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। পরিবর্ত্তনের কথা বারান্তরে হইবে।

এই বংশানুক্রমিক গুণাবলী নানা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়। স্থূলভাবে বলিয়াছি যে, পিতা ও মাতা এই উভয়ের গুণ সন্তানে একত্র মিলিত হয় ও সেই সম্মিলিত গুণ হইতেই সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এই পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তাহারা কিভাবে পরস্পরের উপর কার্য্য করে, একে অন্যকে ছাড়াইয়া পৃথক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে কি না অথবা পরস্পরে মিলিয়া নূতন কোনো মূর্ত্তি গ্রহণ করে কি. না,—এই সকল রহস্যের ভিতর একটু তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেরূপে এই বংশানুক্রমিক গুণ সন্তানে প্রকাশ পায়, নানা বৈজ্ঞানিক তাহা নানা নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক-এক জন এক-এক রকম শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন। আমরা অত সব গণ্ডগোলের মধ্যে যাইব না। সকল বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ, নামকরণ প্রভৃতি ঘাঁটিয়া মোটামুটি তিনটি স্থূল নিয়ম দাঁড় করানো যাইতে পারে। এই তিনটি স্থূল নিয়মের নাম দেওয়া যায় মিশ্রক্রম (Blended Inheritance), একান্ত ক্রম (Exclusive Inheritance) ও অমিশ্র ক্রম (Particulate Inheritance)।

১। মিশ্রক্রম (Blended Inheritance)—কখনও কখনও দেখা যায় যে পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যায় ও সেইরূপ মিশ্রিত ভাব সন্তানে প্রকাশ পায়। মাতার নীলকেশ ও পিতার কৃষ্ণকেশ মিলিয়া-মিশিয়া সন্তানে উভয়ের মাঝামাঝি একরূপ নীলকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। সন্তানের মুখখানি স্থিরভাবে থাকিলে হয়ত তাহাতে মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, আবার মুখ-খানি ঘুরাইলে পিতার সৌসাদৃশ্য জাগিয়া উঠে। কয়েকটি সঙ্করবর্ণের উদ্ভিদের মধ্যেও পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিতৃমাতৃগুণের মিশ্রণের মধ্যেও আবার নানা তারতম্য আছে। অনেক সময়ে তাহারা প্রায় সম-পরিমাণে মিশিয়া যায়। তখন সন্তানের গুণের মধ্যে পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই বেশ লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় আবার পিতার গুণ বা মাতার গুণ একটু অধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠে। তখন সন্তান হয়ত একটু বেশীভাবে পিতা বা মাতার অনুরূপ হয়।

২। একান্ত ক্রম (Exclusive Inheritance)—যখন পিতৃগুণ বা মাতৃগুণ এইরূপে খুব বেশী-পরিমাণে সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে বলা যায় 'একান্তক্রম'। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া, কোনো অজ্ঞাতকারণে না মিশিয়া, একে অন্যকে ছাড়াইয়া উঠে। তখন হয় পিতৃগুণ কিম্বা মাতৃগুণ সন্তানের উপর একান্ত আধিপত্য বিস্তার করে,—অপরটির চিহ্ন পর্য্যন্ত হয়ত দেখা যায় না। পিতা বা মাতার কোনো কোনো বিশেষগুণই একরূপ-স্থলে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু কখনো কখনো সন্তানের গুণাবলীর মধ্যে পিতৃগুণ বা মাতৃগুণের আধিপত্য এত বেশী প্রকাশ পায়, যে মোটের উপর সন্তানের মধ্যে পিতা বা মাতার প্রতিকৃতিই আত্যন্তিকভাবে ফুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায়, কোন্ গুণগুলিতে পিতার আধিপত্য দেখা যায়, আর কোন্ গুণগুলিতেই বা মাতার আধিপত্য লক্ষিত হয়, তাহার সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোনো সূত্র আবিষ্কার করা যায় নাই। তবে কোনো কোনো গুণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু ইঙ্গিত করা যায় মাত্র। যথা বিলাতের অবস্থার আলোচনা করিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে সাধারণতঃ পিতার শারীরিক দৈর্ঘ্য মাতার শারীরিক দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সন্তানের উপর বেশী কাজ করে, অর্থাৎ শারীরিক দৈর্ঘ্য হিসাবে সন্তান মাতা অপেক্ষা পিতার অনুরূপই বেশী হয়। আমাদের দেশের কোনো উৎসাহী পণ্ডিত যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তবে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

এই একান্তক্রম সম্বন্ধে কতকগুলি লোকবিশ্বাস বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। যথা, সন্তানের বাহ্য আকৃতির উপর পিতার প্রভাব বেশী, আর স্বভাব ও প্রকৃতির উপর মাতার প্রভাব বেশী হইয়া থাকে। পশুপালকদের মধ্যেও মোটামুটি এইরূপ ধরণের বিশ্বাস দেখা যায়। কিন্তু এসকল বিষয়েই কোনো সাধারণ নিয়ম গড়িবার মত মালমসলা আবিষ্কৃত হয় নাই। লোকের বিশ্বাস যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে যার পর নাই সাবধান হইয়া

অনেকসময় দেখা যায় যে পুত্র অবিকল পিতার অনুরূপ আর কন্যা মাতার অনুরূপ হয়; কখনো-বা পুত্র মাতার অনুরূপ, আর কন্যা পিতার অনুরূপ হয়। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এ-সম্বন্ধেও ঠিক করিয়া কোনো নিয়ম বাঁধা নিরাপদ নহে।

৩। অমিশ্র ক্রম :—অনেক স্থলে আবার পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ পরস্পর মিশিয়া যায় না বা একে অন্যকে ছাড়াইয়াও উঠে না। পিতৃগুণ ও মাতৃগুণ উভয়েই অমিশ্রভাবে সন্তানের অঙ্গবিশেষে দেখা দেয়। পিতা ও মাতা উভয়ের গুণই এত স্পষ্ট ও পৃথকভাবে দেখা দেয় যে তাহাকে মিশ্রণ বলা চলে না। কৃষ্ণবর্ণ পিতা ও ফিকে রঙের মাতার সংযোগে জাত কোনো-কোনো অশ্বশাবকের দেহে উভয়-প্রকার রংই পৃথকরূপে দেখা দেয়! কার্ল পিয়ার্সন বলেন যে চোখের রং প্রায়ই একান্তক্রমে (exclusively) প্রকাশ পায়। কিন্তু হাজার-করা দুইএকটি দৃষ্টান্ত এমনও দেখা যায় যে, সন্তানের দুই চোখের একটির রং পিতার মত আর-একটির মাতার মত; কিম্বা একই চোখে দুইরকম রঙের ছাপই থাকে। একটি বিলাতী sheep-dogএর এক চোখ পিতার মত, আর-একটি চোখ মাতার মত দেখা গিয়াছিল। এ সকলই অমিশ্র-ক্রমের দৃষ্টান্ত।

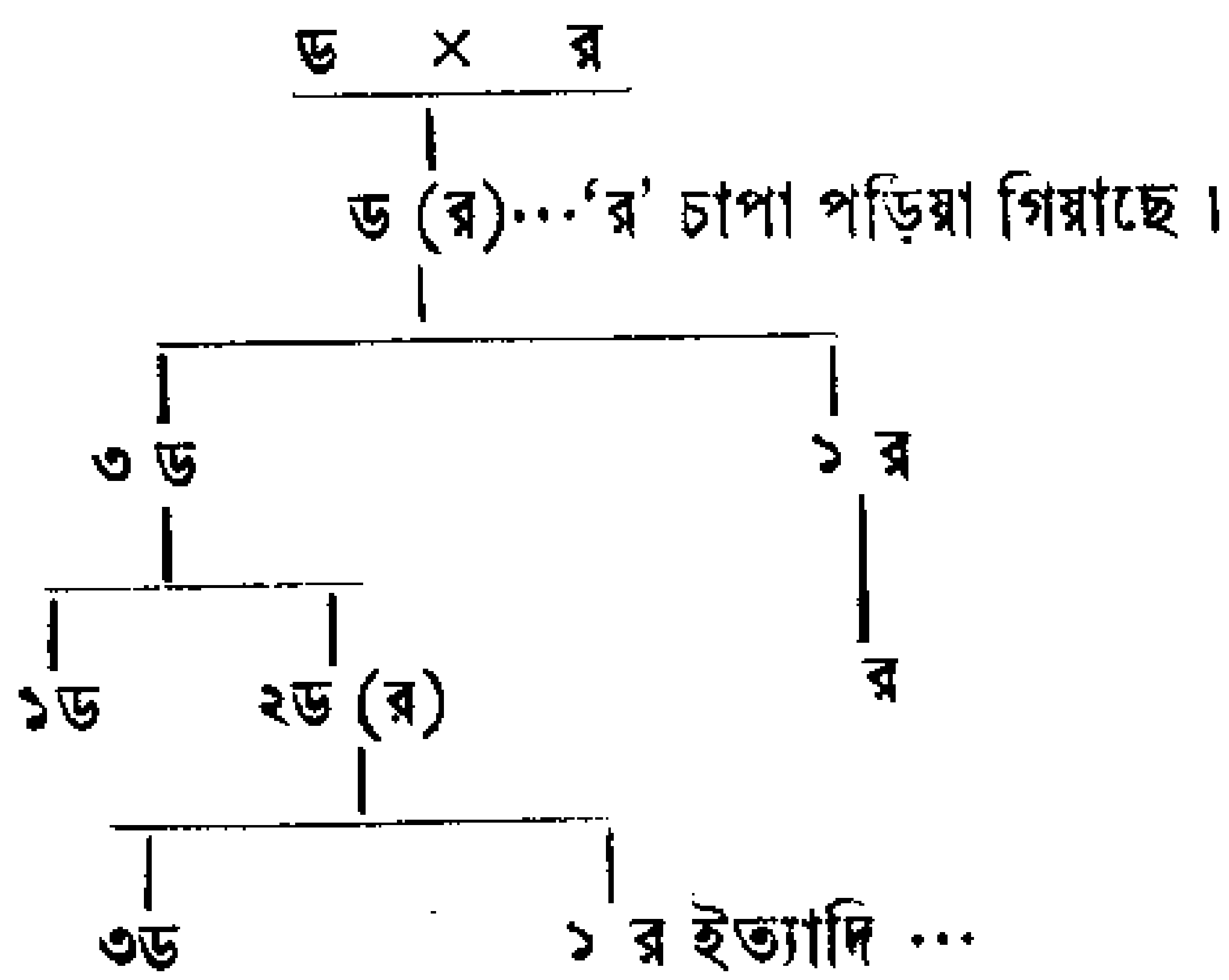
কিন্তু উপরে যে তিনটি নিয়মের কথা বলা হইল, তাহা শুধু কতক-গুলি ঘটনার বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ মাত্র। বংশানুক্রম যে নানা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায় তাহার সবগুলি ঠিক ঠিক ইহাদের মধ্যে ধরা পড়ে না অথবা তাহার অন্তর্নিহিত রহস্য কি তাহাও বুঝা যায় না। এখন কথা হইতেছে এই যে এমন কি কোনো নিয়ম হইতে পারে না, যাহা পিতৃগুণ ও মাতৃগুণের সংযোগ-রহস্য ও তাহাদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে?—সমস্ত বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের প্রণালীগুলিকে একটা বড় নিয়মের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে পারে?—একটা সাধারণ সূত্রের মধ্য দিয়া সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারকে বুঝাইয়া দেয়? এইরূপ চেষ্টা যে না-হইয়াছে তাহাও নহে। মেণ্ডেলের বিখ্যাত নিয়মই (Mendel's Law) এইরূপ একটা বৃহৎ চেষ্টা।

মেণ্ডেলের নিয়ম বিস্তৃতভাবে আলোচনার স্থান এ নহে। আপাতত সে সম্বন্ধে কেবল কয়েকটি স্থূলকথা বলিব। মেণ্ডেলের কতকগুলি পরীক্ষার ফলে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, পিতৃমাতৃগুণগুলি মূলগুণ (unit characters); আর ইহাদের আশ্রয়স্থান তদনুরূপ 'অণু'ও (Representative Particles) আছে। এই মূলগুণ-গুলি পরস্পর স্বাধীন-স্বতন্ত্র, কাহারও সঙ্গে কেহ মিশ খায় না। ইহাদের মধ্যে আবার কতকগুলি (dominant) সক্রিয় আর কতকগুলি (recessive) নিষ্ক্রিয়। যদি এরূপ দুইটি বিভিন্ন বর্ণের (varieties) যৌন-সংযোগ করা যায়—যাহাদের একটিতে সক্রিয় গুণ ও অপরটিতে নিষ্ক্রিয় গুণ আছে, তবে তাহার ফলে যে সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাতে শুধু সক্রিয় গুণই দেখা দিবে, নিষ্ক্রিয় গুণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া

নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, শুধু চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। কেননা সেই সঙ্করবর্ণের পরস্পরের মধ্যে যদি আবার যৌন-সংযোগ করা যায়, তবে ৩ঃ১ এই অনুপাতে সক্রিয়-গুণ ও নিষ্ক্রিয়-গুণ দেখা দিবে। অর্থাৎ একভাগ বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয়-গুণের পুনরাবির্ভাব হইবে, আর তিনভাগ সক্রিয়-গুণ হইবে। এই সক্রিয়-গুণযুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার যৌনসংযোগ করিলে, ১ঃ২ এই অনুপাতে বিশুদ্ধ সক্রিয় ও সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইবে। পুনশ্চ এই সঙ্কর বর্ণের মধ্যে যৌনসংযোগ করিলে আবার ৩ঃ১ এই অনুপাতে পূর্ব্বের ন্যায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণের প্রকাশ হইবে। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে :—

ড = সক্রিয়-গুণ

র = নিষ্ক্রিয়-গুণ



পূর্ব্বোক্ত ও আরও-কয়েকটি অনুরূপ পরীক্ষা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য পাওয়া যাইতে পারে :—

(১) মূলগুণগুলি পরস্পর স্বাধীন-স্বতন্ত্র, —তাহারা কাহারও সঙ্গে কেহ মিশ খায় না।

(২) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় গুণযুক্ত দুইটি বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে প্রথমত সক্রিয় গুণ আধিপত্য বিস্তার করিলেও নিষ্ক্রিয় গুণ লোপ পায় না, চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র,—সুযোগ পাইলেই আবার দেখা দেয়।

(৩) যে দুই পিতা-মাতার সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে যে গুণ না-থাকে, সন্তানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। যদি পিতামাতার মধ্যে একজনের কোনো গুণ থাকে, তবে সন্তানে সেই গুণ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। আর যদি পিতামাতার দুই জনেরই কোনো গুণ থাকে, তবে সন্তানে তাহা বিশিষ্ট ও পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

মোটের উপর মেণ্ডলের মতে এই দাঁড়ায় যে, মূলগুণগুলি স্বাধীন-স্বতন্ত্র বস্তু। পিতামাতার মধ্যে যদি কোনো মূলগুণ না থাকে, সন্তানে তাহার বিকাশ হইতেই পারে না। সন্তানে যে সব গুণের বিকাশ হয় সেগুলি পিতামাতার গুণগুলিরই সাজানো-গোছানো অবস্থা—প্রকারান্তর মাত্র। পিতা-মাতার কোনো গুণ সন্তানে না বর্ত্তিলে মনে করিতে হইবে, তাহা কোন কারণ বশত কিছুকালের জন্য কেবল চাপা পড়িয়া গিয়াছে; সময় ও সুবিধামত কোনো কালে কোনো অধস্তন পুরুষে আবার তাহার বিকাশ হইতেও পারে।

একটু অভিনিবেশ করিলেই দেখা যায় যে, মেণ্ডলের এই মতবাদ প্রাকৃত-বিজ্ঞানের পরমাণুবাদেরই (Atomistic Theory) হুবহু প্রতিকৃতি। মেণ্ডেলের মূলগুণগুলি (unit characters) পরমাণুরই মত।

তাহারা স্বাধীন-স্বতন্ত্র; তাহাদের বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই। উহারাই পরস্পরে মিলিয়া জীবজগতকে নব নব রূপে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

বংশানুক্রম-তত্ত্বের অন্যতম প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ গ্যাল্টনও (Galton) বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের একটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। তাহাকে বলা হয় Galton's Law of Ancestral Inheritance। গ্যাল্টনের এই নিয়ম সংখ্যা-সংগ্রহের (statistics) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বহু পূর্ব্বপুরুষের নানারূপ গুণের হিসাব ধরিয়া তাহার একটা গড়পড়তা কসিবার চেষ্টা। গ্যাল্টনের নিময়টি এইরূপ:—পিতামাতা গড়ে সন্তানের অর্দ্ধেকগুণ যোগাইয়া থাকে, —পিতা এক-চতুর্থাংশ, মাতা এক-চতুর্থাংশ; পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহী এই চারিজনে মিলিয়া সন্তানের গুণের এক-চতুর্থাংশ যোগাইয়া থাকে;—প্রত্যেকে গড়ে $\frac{১}{১৬}$; ইত্যাদি। গণিতশাস্ত্রের সূত্রের মধ্যে ফেলিলে নিয়মটা এইরূপ দাঁড়ায়:—

$$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{১৬}\ \dots\ \dots = ১$$

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গ্যাল্টনের এই নিয়মের সঙ্গে মেণ্ডেলের পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মের বিরোধ আছে। কিন্তু সেটা বুঝিবার ভ্রম মাত্র। মেণ্ডেলের নিয়ম, কয়েকটি বিশেষ অবস্থাকে লইয়া পরীক্ষার ফল; আর গ্যাল্টনের নিয়ম বহু বহু পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলীর সংখ্যা-সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা গড়পড়তা কসিবার প্রয়াস। আসল কথা, বংশানুক্রমিক গুণবিকাশের ব্যাপারটাকে দুইদিক হইতে দুইজনে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। :কালে এই উভয়-নিয়মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এরূপ আশা বোধ হয় অসম্ভব নহে। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

শেষ-গোধূলি

আজ গোধূলির শেষ-হাওয়াতে সকল মুকুল যায় ঝরে',
পারের পাখী গায় অ-পারের গান;
দূর বেদনার রক্তজবা ফুটেছে মোর বুক ভরে'
গুম্‌রে ওঠে পুরাণো সেই প্রাণ।
মেঘের দেশে মিলিয়ে গেল অস্ত চাঁদের আব্‌ছায়া,
আমার রাতি অতল অন্ধকার,
জোয়ার এসে মিল্‌ল যুগল অশ্রু-নদী ক্ষীণ-কায়া,
বেলায় বেলায় প্রতিধ্বনি তা'র।

---

* প্রধানতঃ Thomson's "Heredity" অবলম্বনে লিখিত।

কে এল আজ পান্থশালে ? বল্‌তে চাহে শেষ কথা—
স্বপ্নসম চপল দুটি চোখ।
নিবেছে হায় পথের আলো, নিশীথভরা স্তব্ধতা,
ওগো তুমি কোন্ বিদেশের লোক ?
চিনি চিনি হে অতিথি, দখিণ হাওয়ায় যাও ভেসে,
আমার ঘরে নাই তো এবে ঠাঁই ;—
এসেছ আজ অসময়ে, ফুরিয়ে-যাওয়ার সবশেষে,
হারিয়েছি যা আর কি ফিরে পাই !
সাগর-ঢেউএর চাপা আওয়াজ আস্‌ছে ঝাউএর বনচ্ছায়
একলা আমি শুন্‌ছি দিবারাত ;—
লক্ষ যুগের মৃত্যু-ফেনা যাত্রা করে শেষ-খেলায় ;
বন্ধু আমার কর্‌ছে যাতায়াত।
রাত্রি এসে বন্দী করে আমার জীবন-স্বপ্নকে,
গরল-ফুলে এলায় দেহ-মন—
শুকিয়ে গেছে তরুণ কলি আমার মানস-চম্পকে,
মৃত্যু দেছে ফাল্গুনী চুম্বন।
আজ হৃদয়ের শব্দ-শেখর টল্‌ছে গভীর রূপ-শোভায়,
দীর্ঘ যতি পড়্‌ল জীবন-গীতে ;
বিরহী ওই লুকিয়ে থেকে ছায়া-পথের বীণ্ বাজায়,
কাঁপ্‌ছে পরাণ তারার কাঁপুনিতে !

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মল্লারের সুর

(গল্প)

তার নাম লক্ষ্মীমণি। সে অন্ধ। রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়ায়।

চিরদিন তার এ অবস্থা ছিলনা। তার রূপ-যৌবন, ধন-দৌলত সবই ছিল। আজ যারা তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ-ফিরিয়ে চলে যায়, এমন দিন ছিল যখন সে তার বিলাসিতার প্রাসাদ-শিখরে বসে তাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করত। হাসি, গান আর তার সঙ্গে শতশত পুরুষের তোষামোদ উপভোগ করেই তার সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কেটে যেত। আজ তার কণ্ঠস্বর বিকৃত, কিন্তু এই কণ্ঠই বিচিত্র সুরের লীলায়

যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তখন মনে হ'ত যেন রাগ-রাগিণী মূর্ত্তি ধরে শ্রোতাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝি আকাশে-বাতাসে এমন সুর নেই যা তার গলার সুরে ধরা না দিয়েছে। কিন্তু আজ? আজ কোথায় সে সুর? প্রাণের বীণার তার ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেছে,—তাতে আর কোনো সুরই বার হয় না একটা লজ্জা-ভরা ভিক্ষার কর্কশ ভাঙা সুর ছাড়া।

কেমন করে এমন হ'ল? ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু তাই থেকে তার ভাগ্যে এত-বড় একটা প্রলয় ঘটে গেল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা।

সে দিন আকাশে খুব ঘটা করে বর্ষার উৎসব লেগেছিল। তারই মৃদঙ্গের বোল্, বর্ষণের সুর আর নুপুর-নিক্কনের তাল পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে এখানেও একটা ছোটখাট উৎসব জমিয়ে তুলে ছিল।

এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীমণির মজলিসে একটা জলসা চলছিল। লক্ষ্মী ধরেছিল মল্লারের করুণ সুর। শ্রোতা ছিল যারা তারা যে খুব রসিক সে কথা কথা বলা যায় না—কিন্তু সুরের সেই কান্নার মত কাঁপুনি তাদের নিসাড় হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে যে তোল-পাড় আরম্ভ করলে তাতে তাদের সমস্ত অন্তরটা কেমন-একটা অজানা ব্যথায় গলে পড়তে লাগল—যেন সেখানেও একটা বর্ষণ সুরু হয়েছে। লক্ষ্মী গাইছিল যে-করুণ সুরে তার করুণতা তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরেছিল।

যখন ভিতর-বাহির চারিদিকে কান্নার মত একটা করুণ সুরে ভরে উঠেছে, যখন এই করুণতার সুর লক্ষ্মীমণির সেই ঘরে আর ধরেনা তখন হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে কে প্রবেশ করলে। মনে হ'ল যেন বাইরের ব্যাকুল ঝড় পাগলের মত ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। যে এল রুক্ষ তার কেশ, রুক্ষ তার বেশ, কে যেন তার শুষ্ক দেহ, মলিন বসনের উপর জল ও কাদার চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ দেখে মনে হ'ল এ যেন কোনো আগন্তুক নয়, ঘরে-বাইরে আজ যে করুণ সুরের স্রোত চলেছে তাই থেকেই যেন এই মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে—এমনি করুণ তার দৃষ্টি। সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সে বলে উঠল—"আমার ছেলে? আমার ছেলে কৈ?"

শুনে মনে হ'ল এ যেন কথা নয়, কান্না!

গান থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তার করুণ রেশ সমস্ত ঘরের মধ্যে, শ্রোতাদের সমস্ত মনের মধ্যে তখনও ঘুলিয়ে উঠছিল। মনে হ'ল সেই রেশের সঙ্গে বৃদ্ধের গলা যেন একসুরে বাঁধা। শ্রোতাদের মধ্যে তারই ঝন্‌ঝনা বেজে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার বললে—"আমার ছেলে কোথায় গেল!"

কেউ কোন উত্তর করতে পারলে না—চুপ করে রইল।

লক্ষ্মীমণি বললে,—"কে তোমার ছেলে?"

বৃদ্ধ বললে—"বিপিন।"

বলেই সে আর্ত্তনাদ করে উঠল—

তার সেই আর্ত্তনাদের সুরে সকলের মনে হল যেন একটা সর্ব্বনাশ সত্যই ঘনিয়ে এসেছে। বাইরে আকাশের বিদ্যুতের কাঁপুনি, মেঘের ঝন্‌ঝনা যেন সজোরে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ বলতে লাগল—"আজ দুদিন সে বাড়ী যায় নি। কি করেছে সে জান? আফিসের টাকা ভেঙেছে। পুলিশ আজ সমস্ত দিন ধরে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করেছে—তারা বলে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার উপর কি অত্যাচার করেছে দেখবে?"—বলে সে চাদরখানা খুলে শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাতে লাগল। রক্ত তখনো ঝুঁজিয়ে পড়ছে।

সেইদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্মীর মুখ থেকে বেরিয়ে উঠল—"আহা।" অমনি সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠল—"আহা!"

লক্ষ্মীমণি বললে—"কি করলে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাও? তোমার ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আচ্ছা, আমি রাজি আছি।"

বৃদ্ধ বললে—"না না, তাতে কোনো ফল হবে না। টাকাগুলো তুমি ফিরিয়ে দাও, আমি আফিসের লোকদের হাতে-পায়ে ধরে যেমন-করে পারি মিটিয়ে নেব।"

লক্ষ্মীমণি আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"টাকা! কোন্ টাকা ফিরিয়ে দেব?"

বৃদ্ধ বললে, "যে টাকা সে তোমায় এনে দিয়েছে। সে ত তোমার জন্যেই চুরি করেছে, তার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মারা গেলেও তার মাথার টনক নড়ে না।"

লক্ষ্মীমণি বললে—"আপনি ভুল করছেন, টাকা সে আমায় দেয়নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে, নইলে সে চুরি করবে কেন? সে ত আগে এমন ছিল না, যেদিন থেকে তোমার কুহকে পড়েছে, সেদিন থেকেই তার মতিগতি বিগড়েছে।"

তার কুহকে পড়ে অনেকের মতিগতি বিগড়েছে লক্ষ্মীমণি সে কথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেনা কিন্তু এ চুরির টাকা তার তহবিলে যে আসেনি এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তাই সে মাথা-নেড়ে চীৎকার করে বলে উঠল—"না না, আমি বলছি টাকা সে আমায় দেয় নি।"

বৃদ্ধ বললে—"নিশ্চয়ই দিয়েছে। জানি তোমরা অনেক চাতুরী জান। এ বুড়োর সঙ্গে কেন চাতুরী খেলছ? নগদ টাকা না দিয়ে থাকে তোমার গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, দাও সেগুলো ফিরিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি দাও।"—বলে বৃদ্ধ তার পা জড়িয়ে ধরলে।

লক্ষ্মী পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু পিছনে সরে গেল। তার নিজের পাওয়া সেই মাল্লারের সুর তখনো তার মনের দ্বারে আঘাত দিয়ে দিয়ে ফিরছিল; মনের বাঁধকে আলগা করে দিয়ে তাকে কেমন যেন সব ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বৃদ্ধের চোখের জল দেখে তার চোখের পাতা ভিজে এল্। সে বলে উঠল—"কত টাকা?"

বৃদ্ধ একটা আশার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"আট হাজার টাকা।"

আট হাজার! লক্ষ্মীমণির মনে হতে লাগল একটা বুড়ো বামুন একটু চোখের জল

ফেলে এতগুলো টাকা নিয়ে যাবে? সে হবে না। সে বলে উঠল, "না না, অত টাকা হবে না—তুমি যাও।"

ঝড়ের ঝাপটে শুকনো গাছ যেমন ভেঙে পড়ে বুড়ো ঠিক তেমনি করে ভেঙে পড়ল। সেই সময় আসর থেকে একজন উঠে বৃদ্ধকে হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দরজা অবধি যাবার আগেই লক্ষ্মী বলে উঠল,—"না না, কেন ওকে টানাটানি করছ! দাঁড়াও।" এই বলে দেরাজের টানাটা খুলে একখানা নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বললে—"এই নিন।"

বৃদ্ধ হাত পেতে তার কাছ থেকে নোটখানা নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"এতে কি হবে? দাও, দাও, আরো কি আছে দাও, আর দেরি কোরোনা। হতভাগা দুদিন বাড়ী যায়নি, তার বাড়ীতে যে কি কাণ্ড চলছে তা সে একবার ভাবেও না। আজ দুদিন আমরা সবাই একরকম অনাহারে কাটিয়েছি, তার ছোট ছোট মেয়ে-ছেলেগুলো ক্ষিধের জ্বালায় সকাল থেকে কেঁদে কেঁদে আধমরা হয়ে পড়েছে, এ সব না হয় সহ্য হবে কিন্তু হতভাগার যদি জেল হয় তাহলে যে কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো না খেতে পেয়ে মারা যাবে—ওর স্ত্রীকে যে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।"

রাস্তায় দাঁড়াতে হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতে বহুকালবিস্মৃত একদিন সন্ধ্যে-বেলাকার একটি ছবি লক্ষ্মীর চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশের সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে এসে সেদিনকার সন্ধ্যা তার চোখের সামনে

গান-ভরা পৃথিবী সেদিন তার চোখে কী বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল! কী ভয়ঙ্কর অসহায়তা, কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না তাকে লড়াই করতে হয়েছিল!—বিদ্রোহী মন যে-পথে যাবার বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল সেই মনকে কী নিষ্ঠুর শাসন করে, কি-রকম ক্ষতবিক্ষত করে তাকে ফেরাতে হয়েছিল!—সে ব্যথা সে আজও ভুলতে পারেনি। তার গোপন হৃদয়ের পরতে পরতে অদৃশ্য লিপিতে যে কাহিনী লেখা ছিল অতীত আজ বর্ত্তমানের মূর্ত্তি ধরে সেগুলোকে তার মনের সামনে আজ স্পষ্টতর করে ফুটিয়ে তুলতে লাগল—সে কি ভীষণ যন্ত্রণা!

ছুটে গিয়ে লক্ষ্মী আলমারির দরজা খুলে গয়নার বাক্সটা এনে বৃদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে বললে,—"যাও, নিয়ে যাও, আর একমিনিটও দেরি কোরোনা, তাহলে হয়ত তোমার পুত্র-বধূকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। যাও, যাও—কী ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে আছ!"

বৃদ্ধ বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে একবার গয়না-গুলোর দিকে আর-একবার তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে লক্ষ্মী দুহাত দিয়ে ঠেলে তাকে একেবারে ঘরের বার করে দিলে।

তার মাথা তখনও ঘুরছিল; মনে হতে লাগল গয়নাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রক্তও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, বর্ষণ তখন থেমে গেছে;—আকাশ যেন তার সমস্ত

ঝিমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মী রিক্ততার একটা ব্যাকুলতায় আত্মহারা হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

তারপর পিছনের বারান্দা থেকে একজন ছোকরার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে লক্ষ্মী বললে—"চুরির টাকা কোথায় রেখেছিস বল্। শিগ্গির বল্। সে টাকা আমায় এক্ষুনি এনে দে। আমার সর্ব্বস্ব আজ তোর জন্যে বিলিয়ে দিয়েছি, জানিস্!"

বিপিন বললে, "জানি। কিন্তু কেন দিলি? —টাকা আমার নেই।"

লক্ষ্মী বললে,—"কোথায় গেল টাকা?"

"কি হবে তা শুনে? সে টাকা ত আর ফিরে পাবিনি।"

"তবে তুই কাউকে দিয়েছিস্?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে দিলি? বল্, শিগ্গির বল্, কে তোর পেয়ারের লোক আছে!"

"আমি বলবনা। শুন্লে তুই রাগ করবি।"

"না না তুই বল্!"

বিপিন জড়িতকণ্ঠে বললে,—"টাকা আমি কামিনীকে দিয়েছি—"

"—কামিনী—কামিনী! চোর কোথা-কার, পাজি, মদমায়েস, বেরো এখান থেকে, বেরো!"

বিপিন লক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, "রাগ করিসনে ভাই!"

লক্ষ্মী সজোরে তার হাত ছিটকে ফেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল; বললে—"চোরকে আমি ঘরে ঠাঁই দিইনে—বেরো, তুই, চোর!"

বিপিন উত্তেজিত হয়ে বললে—"চোর চোর করিসনি বলছি!"

লক্ষ্মীমণি একটা অট্টহাস্য করে বলে উঠল,—"ওরে আমার সাধুরে! তুই চোর না ত কি!"

বিপিন আর সামলাতে পারলে না,—সামনে থেকে একটা ঘটি তুলে নিয়ে লক্ষ্মীমণির গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। সেই ঘটি তার মুখের উপর এসে লাগল—সে ঘুরে পড়ল—তার দুটো চোখ আর মুখের খানিকটা একেবারে থেঁতলে গেলে।

বিপিন তাকে একা ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

প্রভাতে ও রাত্রে

কাল সকালে হঠাৎ আঁখি মেলি
তোমায় যদি না পাই এ মোর ঘরে;—
হিরণ তব আঁচোল বেড়ায় খেলি
উদাস উদার নীল আকাশের পরে;
নাইকো রবি তোমার ও মুখ ছবি
রোদের মতো ছড়ায় প্রেমের আলো,—
পরশে তার মধুর লাগে সবি—
সবাই যেন বাসছে সবে ভালো;
ফুটছে ফুলে তোমার প্রাণের বাস,
ছুটছে হাওয়া মধুর তোমার শ্বাস;

অবাক্ আমি হবইনাকো মোটে
সহজ সবই হতেই এযে পারে !
মুকুল যদি ফুলের মাঝে ফোটে
অবাক্ হয়ে কেইবা দেখে তারে ?
জাগছে প্রেমে বিকাশ-অসীমতা
নইলে যে তার মিটবেনাকো ব্যথা ।

নিশীথ রাতে হঠাৎ জেগে উঠি
দেখিই যদি পাশের পানে চেয়ে
চন্দ্র তারা তোমার মাঝেই ফুটি
সব নিশুতি তোমায় আছে ছেয়ে ;
ঘুমের ঘোরে তোমার যে হাতখানি
শিথিল ভাবে ছড়িয়ে আমার দেহে
নিশীথিনীর স্তব্ধ গভীর বাণী
ঘেরা বিপুল আরাম বিরাম স্নেহে ;
এলানো ওই আকুল কেশের ছায়া
জাগায় ভুবনভরা স্বপন মায়া ;
তুমি যদি নিশীথ-রাণীর রূপে
জেগেই উঠ কখন চুপেচুপে
তিলেক লাগি অবাক হবনারে—
হবার কথা হোতেই এযে পারে ।
নিশীথ প্রাণের স্তব্ধ বিরামখানি
তোমার মাঝে আছেই আছে জানি ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী ।

আর্টে অধিকারী-ভেদ

ললিত-কলায় যাঁহারা অনুরাগী, তাঁহারা যেন বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের এই উক্তিটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন :—I, at any rate shall never be able to join a party which has the majority on its side. Bjornson says, "The majority is always right"; and as a practical politician he is bound, I suppose, to say so. I, on the contrary, of necessity say, "The minority is always right."

কলা-জগতের সর্ব্বত্র, ইবসেনের ঐ দামী কথাগুলির সার্থকতা অক্ষরে-অক্ষরে খাটিয়া যায়। সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিভার অবতার, তাঁহাদের অনেকেই কেবল বাছা বাছা জনকতক রসিকের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারেন ;—সকলকার মনোহরণ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ! এ-কথার জলন্ত প্রমাণ যিনি চান, তিনি যেন কোন সাধারণ পুস্তকালয়ে যান। সে-সব জায়গায় রোজ যদি ষোলজন লোক বই লইতে আসে, তবে তাহাদের মধ্যে পনেরোজন লোক লইবে বটতলার দার্শনিক ঔপন্যাসিক প্রভৃতির লেখা চমকদার বই ; রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপন্যাসের দিকে তাহারা ভুলিয়াও ফিরিয়া চাহিবে না।

গানের আসরে ভাল গাইয়ের গলায় সরু কাজ বা উঁচুদরের রাগরাগিণীর আলাপ কেহ বুঝিবেও না—শুনিবেও না ; কিন্তু সেই-খানেই যদি অন্য-কোন লোক একটা হাল্‌কা সুরের চটুল গান ধরে, তবে ঘনঘন বাহবার চোটে প্রাণ ও কাণ একেবারে আন্‌চান্ ও যান যান করিতে থাকিবে !



ভেলাসকুয়েজের একখানি ছবি

শিল্পক্ষেত্রেও ঠিক এমনি কারখানা। Millais বা Velasquezএর আঁকা ছবি দেখিতে লোকে ততটা ভালবাসে না—যতটা ভালবাসে Whistler বা Murilloর আঁকা ছবি দেখিতে। জনসাধারণ Rodin ও Manetকে ফেলিয়া Bouguereau ও Canovaকে লইয়াই মাতামাতি করিতে চায় বেশী। প্যারীর Sainte Chapelle দেখিয়া লোকে তেমন অভিভূত হয় না, রোমের St. Peter দেখিয়া যেমন হয়।

য়ুরোপের উচ্চশিক্ষিত জনসাধারণের অবস্থাও যদি এমনি শোচনীয় হয়, তবে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের শিল্প-রসবোধের মাত্রা যে কতটা অল্প, তাহা কল্পনা করাও শক্ত! তাই শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের মোহন তুলির লিখনকে ঠোঁট বেঁকাইয়া এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া, যখন কোন সবজান্তা কষ্ট-ক্রিটিক আর্টস্কুলের দ্বিতীয়বার্ষিক ছাত্রের আঁকা রঙ্গচঙ্গে পটের তারিফ করিয়া পরম বিজ্ঞতার (এবং চরম মূর্খতার) পরিচয় দিয়া বসেন, তখন আমরা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই না; কারণ, এ-দেশী ক্রিটিকের বুদ্ধির দৌড় এমনি বিষম সুদীর্ঘ হওয়াই ত স্বাভাবিক!

* *
*



কৃষ্ণ ও রাধা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

অবশ্য, 'অধিকাংশ' (Majority) যে সব-সময়েই ভ্রান্ত, এটাও জোর-করিয়া বলিবার মত জোর আমাদের নাই। কারণ, সময়ে-সময়ে দেখা গিয়াছে যে, 'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশ' (Minority) এক জায়গায় আসিয়া মিলিয়া এ-ওর সঙ্গে 'সেক্‌-হ্যাণ্ড' করিয়াছে! তাজমহল দেখিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক-অরসিক, সাধারণ-অসাধারণ সকলেই শতমুখে তারিফ সুরু করিবে। ভাস্কর্য্যে গ্রীকশিল্পীর গড়া Venus of Melos এবং চিত্রে র‍্যাফেলের আঁকা Sistine Modona দুই দলেরই প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিম্‌সের গির্জ্জার পশ্চিমদিকের কলানৈপুণ্য দেখিয়া সুধু শিল্পরসিক মুগ্ধ হন না; যাহারা শিল্পের গূঢ় রসের স্বাদ পায় নাই, এখানে আসিয়া তাহারাও মুগ্ধপ্রাণে লুব্ধদৃষ্টিতে সেই অপূর্ব্ব কারুসৃষ্টির ছায়াতলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এখানে কঠিন পাথরের উপরে মানবপ্রাণের ভাবের কমল এমনি শত-দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, গত সাতশো বছর ধরিয়া হাজার-হাজার লুণ্ঠনপ্রিয় ধ্বংসোন্মুখ ও যুদ্ধপাগল দস্যুর দল বারেবারে ইহার সুমুখ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রিম্‌সের স্বর্গমাধুরী তাহাদের পাষাণ প্রাণকেও পেলব করিয়া তুলিয়াছে,—তাহাদের উদ্যত নিষ্ঠুর হস্ত হইতেও রক্তাক্ত অস্ত্র খসাইয়া দিয়াছে! হায়, সেই সাতশত বৎসরের পৈশাচিকতার চাপা আগুন যে আজ বিংশশতাব্দীর পরিপূর্ণ সভ্যতার যুগে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া রিম্‌সের জন্য চিতারচনা করিবে, প্রতীচ্যের বর্ত্তমান রক্তপাথার দেখিবার আগে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল? রিম্‌সের সে অপূর্ব্ব সুষমা আর নাই; বিংশশতাব্দীর নব-কুরুক্ষেত্রে সভ্যতার মহাঝড়ে তাহা বোঁটা-ছেঁড়া ফুলের মত পথের ধূলায় ঝরিয়া পড়িয়াছে!

এ সকল ক্ষেত্রে 'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশ' একত্রে মিলিত হইলেও, এই দু-দলের মিলনের হেতু কিন্তু এক নয়। 'অধিকাংশ' এখানে যে কারণে শিল্পসৃষ্টিকে প্রশংসা করে, 'অল্পাংশ' সে কারণকে স্বীকার করে না। সাধারণ লোকেরা শিল্পের নিন্দা-প্রশংসা করে ভাবপ্রবণতার দিক হইতে; কিন্তু, যাঁহারা সমঝদার, তাঁহারা সত্যের নিকষে কষিয়া শিল্পকে পরখ করিয়া দেখেন। যে-সব কলাবিদের কার্য্য একসঙ্গে ভাবপ্রবণ 'অধিকাংশ' এবং সত্যসন্ধানী 'অল্পাংশ'কে আকর্ষণ করিতে পারে, সেই সকল শিল্পী



চন্দ্রালোকে (প্রাচীন চিত্র)

সাধারণ-অসাধারণ সব সমাজেই কল্‌কে পাইয়া থাকেন। যেমন, র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তি। স্নেহময়ী জননীর কোলে তাঁহার প্রাণপুতলী সন্তানের খেলা—ছবির এই বিষয়টি সর্ব্ব-সাধারণকে যে খুব সহজেই অভিভূত করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ছবিতে র‍্যাফেলের যে হাতের কায়দা, তুলির টান, রেখা-রঙের লীলা আছে এবং সর্ব্বোপরি ইহার মধ্যে শিল্পীর যে সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যানুভূতি ও ভাবের প্রেরণা আছে, তাহা সাধারণের চোখ এড়াইয়া কেবল সমঝদারের চোখেই ধরা পড়ে—এবং সমঝদারের কাছে মাতৃমূর্ত্তির যে এত আদর তাহার আসল কারণ হইতেছে র‍্যাফেলের ঐ কলাকুশলতা এবং ধ্রুবদর্শন। "চন্দ্রালোকে" ও "কৃষ্ণ" নামে আমরা দুখানি ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি এখানে দিলাম, এ-দুখানিও দু-দলের দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে—কেননা, এ



নট কৃষ্ণ (প্রাচীন চিত্র)

ছবি-দুখানির বিষয়ও যেমন জনপ্রিয়, অঙ্কন-পটুতাও তেমনি চমৎকার।

* *
*

বিষয় ধরিয়া শিল্প-বিচার করে বলিয়াই জনসাধারণ আসল-নকল চিনিতে পারে না। শিল্পজগতে এমন কয়েকখানি ছবি আছে, সমঝদারেরা যে-গুলিকে র‍্যাফেলের "মাতৃ-মূর্ত্তি"র চেয়েও ভালো বলিয়া জানেন। কিন্তু সে-সব ছবির বিষয় সাধারণের চোখে চমক লাগাইতে পারে না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সকলের পরিচয়লাভের সুযোগও ঘটে না। Giorgioneএর Castelfranco Madonna নামে ছবিখানি শিল্পীসমাজে অত্যন্ত বিখ্যাত। কলাজগতে এমন ছবি দুর্লভ, সমালোচকরা যাহাকে নিখুঁত বলিয়া মানিয়া নেন, Giorgioneএর অঙ্কিত এই ম্যাডোনা-মূর্ত্তিটি উক্ত দুর্লভ গুণের অধিকারী। এই ছবিখানির অঙ্কনকাল পাঁচ শতাব্দীরও আগে—কিন্তু এতকালের মধ্যে খুব কম লোকের কাছেই ইহার আদর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব কম লোকের মুখেই ইহার



মাতৃমূর্ত্তি
(Castelfranco Madonna.)

নাম শোনা যাইবে। সমঝদার ইহার গুণ যদি না-বুঝিতেন, এ ছবিখানি তাহাহইলে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইত।

সমঝদারেরা সকলদিক ভাবিয়া-বুঝিয়া দোষগুণ বিচার করিয়া একবার যাহাকে ভালো বলিয়া গ্রহণ করেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেলেও আর তাহাকে ত্যাগ করেন না। কিন্তু জনসাধারণকে এমন-ধারা বিশ্বাস করা চলে না; তাহাদের নিন্দা-প্রশংসা বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ নয় বলিয়া, তাহারা আজ যাহাকে মাথায় চড়ায়, কাল তাহাকে পথে বসায়! ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই। একসময়ে Bernini, Canova ও Tharwaldsen সর্ব্ব-সাধারণের প্রিয় ছিলেন; আর-একসময়ে Carlo Dolci, Guido Reni ও Domenichino প্রভৃতি শিল্পীকে সকলেই খুব পছন্দ করিত; কিন্তু জনসাধারণের মন লক্ষ্মীর মত চঞ্চল বলিয়া ঐ-সকল শিল্পীর জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। এইজন্য, যতই আপাতমধুর হউক, জনসাধারণের প্রশংসাকে কোন শিল্পীই যেন সত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। সাধারণের মন রাখিতে গিয়া, এদেশে অত বই লিখিয়াও রাজকৃষ্ণ রায় সাহিত্য-সমাজে নিজের জন্য একটুখানি জায়গা করিয়া লইতেও পারিলেন না!

সাধারণের শিল্পবিচারে আর-একটি মস্ত খুঁৎ আছে। তাহারা আসল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে না। তাহারা ভাবে, দেখিতে যাহা সুন্দর, তাহার মধ্যেই বুঝি সৌন্দর্য্য পাওয়া যায়! কিন্তু তা ত নয়! Beauty হচ্ছে এক জিনিষ আর Prettiness হচ্ছে আর এক জিনিষ—রূপা ও কাঁসা যেমন আলাদা জিনিষ,—এ দুটিও তেমনি!

সৌন্দর্য্য আছে কেবল সত্যের মধ্যে; তাইত কবি বলিয়াছেন 'সৌন্দর্য্য হচ্ছে সত্য, সত্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য'! যে কলাবিদ সত্যকে পাইয়াছেন, কেবল তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই সৌন্দর্য্য তাহার সিংহাসন পাতিয়াছে।

ফ্লোরেন্সের প্রথম যে চিত্রকর অমরতার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার নাম Giotto,—১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কি রেখা-পাতে আর কি বর্ণপাতে,—Giottoর চেয়ে বড় অনেক শিল্পী জগতে নাম কিনিয়াছেন। কিন্তু অনেকদিকে অসম্পূর্ণ হইলেও, Giotto সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; তাই তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীতে সৌন্দর্য্যের যে স্বরূপ-দর্শন হয়, রেখা ও রঙ্গে ওস্তাদ অনেক নামজাদা আঁকিয়ের ছবিতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। Bouguereau একজন একেলে পটুয়া; দেখিতে সুন্দর এবং রেখারঙ্গে নিখুঁত হয় বলিয়া বাজারে তাঁহার আঁকা ছবিগুলির নাম-ডাক যথেষ্ট। তাঁহার সুনামের আর-একটি কারণ, জনসাধারণের ভাবপ্রবণতাকে জাগাইয়া তুলিতে তিনি একজন মস্ত-ওস্তাদ। তাঁহার অঙ্কিত নানা চিত্রের মধ্যে The Virgin as Consoler নামে শোকের ছবিখানি অনেকের কাছেই পরিচিত এবং কিছুদিন আগে "সাহিত্য" পত্রে এই পটের একখানি প্রতিলিপিও বাহির হইয়া গিয়াছে। সুন্দর-সুন্দর মূর্ত্তি আঁকিয়া রঙ্গের বাহার দেখাইয়া তিনি বোকা লোকের চোখে চটক লাগাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এত-করিয়াও সত্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার

হয় নাই; তাই তাঁহার চিত্রাবলীতে চোখভুলানো রূপ থাকিলেও মনভুলানো সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রেখাবর্ণ-পাত-কৌশলে Giotto তাঁহার চেয়ে ঢের খাটো; তথাপি সমালোচকরা Bouguereau-এর উপরে Giottoর আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? কেননা, Bouguereau যে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পান নাই, Giottoর ছবিতে সেই সৌন্দর্য্যের শিখা জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

* *
*

অনুশীলন না করিলে শিল্পবোধ হওয়া অসম্ভব। সাধারণের মধ্যে সাধারণত এই অনুশীলনের একান্ত অভাব দেখা যায়; তাই তাহাদের রুচির উপর নির্ভর করা চলে না। কেন চলেনা, একটি দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ধূ-ধূ মাঠ—নির্জ্জন, স্তব্ধ, উদাস। তার মাঝখানে কোন্‌কালের একটি পুরানো বাড়ী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার ছাদ গিয়াছে, দরজা-জানলা খসিয়াছে, শ্রী-ছাঁদ সমস্ত ঘুচিয়াছে, থাকিবার মধ্যে আছে সুধু এখানে-ওখানে দু-একটা বুনো-গাছে-ভরা শেওলা-মাখা নড়্‌বোড়ে ফাট-ধরা প্রাচীর!

খানিক-কালো খানিক-আলো লইয়া প্রথম-সন্ধ্যা যখন দিবস-রজনীর মিলন-রেখায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে একটা রহস্যপূর্ণ ভাব জাগিয়া উঠে।

এমনসময় যদি কোন সাধারণ লোক এ-পথে আসিয়া পড়ে, তবে সে এ ভাঙ্গা বাড়ীটা দেখিয়াও একটিবার থমকিয়া দাঁড়াইবে না—বরং আসন্ন অন্ধকারের ভয়ে আরো-তাড়াতাড়ি সুদূরের লোকালয়ের উদ্দেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু যাঁহার চোখের মত চোখ আছে, যিনি কলাবিদ্‌ বা কলারসজ্ঞ, এখানে আসিয়া পড়িলে ঐ লোকটির মত তিনিও এমন একটি দৃশ্য দেখার সুযোগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন না; এখানে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ চোখে, বিভোর প্রাণে তিনি দেখিবেন, এই স্তম্ভিত, গম্ভীর সন্ধ্যাআকাশের তলায়, এই বিজন, নিভৃত ও প্রান্তহীন প্রান্তরে, এই পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কেমন-একটা অদৃশ্য জীবনের আভাস ও বিষণ্ণ ভাবের ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছে! ঐ লতাগুল্মশৈবালে চিত্রিত, নতোন্নত ভগ্ন প্রাচীরগুলিও কি-এক মোহন সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব-সুন্দর, হাসি ও অশ্রুর মত আলো-ছায়ার চঞ্চল লীলায় বিচিত্র! সময় বিশেষে জড়ের মধ্যেও প্রাণের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, রসজ্ঞের হৃদয় এখানে আসিয়া তাহা একান্তভাবে অনুভব করিবে।

'অধিকাংশ' ও 'অল্পাংশে'র মধ্যে এই জায়গাতেই তফাৎ; প্রতিদিন আমরা যে-সকল দৃশ্য দেখি, যে-সকল বস্তুর সংস্পর্শে আসি, জনসাধারণ সেগুলিকে তলাইয়া দেখিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করে না; কিন্তু রসিকরা সেই সকল নিত্যদৃষ্ট দৃশ্য ও বস্তুর মধ্য হইতেই নূতন ভাব, নূতন রূপ ও নূতন রসের সন্ধান পাইয়া থাকেন।

রসিকের এই-যে গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রসগ্রাহিতা, সাধারণের তাহা নাই। তাই দলে ভারি হইলেও 'অধিকাংশ' কখনো 'অল্পাংশ'কে ঠেলিয়া যথার্থ উন্নত সমাজে ঢুকিতে পারে না; 'অধিকাংশ'র মতই চিরকাল সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে। এবং এইজন্যই আর্টের মধ্যে জনপ্রিয়তার (Popularity) কোন মূল্য নাই। এমন-কি, যে আর্টিষ্টের সৃষ্টি বেশী-লোকের পছন্দ-সৈ, তিনি যে খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট নন, কিছুমাত্র চিন্তা না-করিয়া অনেকসময়ে সে কথাটাও ফস্-করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়।

শিল্পরসজ্ঞগণ তাই মনে করেন, আর্টিষ্টের পক্ষে জনপ্রিয়তার মত মারাত্মক শত্রু আর-কিছু নাই। আর্টিষ্টের হৃদয়ে যখন সর্ব্বজনপ্রিয় হইবার বাসনা জাগে, তাঁহার আর্ট তখন দেখিতে 'আহামরি' সুন্দর হইলেও হইতে পারে—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মাকাল ফলের মত ব্যর্থ!

এমনি সকলদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আর্ট হইতে যাঁহারা আভিজাত্য উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের বুদ্ধির গোড়ায় কিঞ্চিৎ গলদ আছে! কারণ, আর্টে এখনো সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হয় নাই। য়ুরোপে জনসাধারণের রুচি, শিক্ষা ও রসবোধ এখানকার চেয়ে ঢের বেশী ধারাল, উন্নত ও প্রশস্ত; তবুও সেখানকার কবি, শিল্পী আর সমালোচকরা জনসাধারণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অরসিকতার জন্য প্রকাশ্যে 'হা-হতোস্মি' করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের দেশে—যেখানে শিক্ষা এখনো শৈশবে, পাঠকের মন এখনো কাঁচা—সেখানে আর্টে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলিতে যাওয়াই মস্ত-একটা হাসির ব্যাপার। এদেশে আর্টকে যদি সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হয়, তবে বাঙ্গলা মাসিকের গল্পের ও ডিটেকটিভ উপন্যাসের অপরূপ ছবি ছাড়া আর কোন-রকম চিত্র আঁকা চলিতেই পারে না; সাহিত্যেও তাহাহইলে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিবর্ত্তে চলিবে বটতলার জনপ্রিয় সাহিত্য (যার ধুয়া হইতেছে—"একটি পয়সা খরচ করে, অবাক কাণ্ড দেখুন পড়ে") এবং সঙ্গীতে শুনিব বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর উচ্চাঙ্গের আলাপের পরিবর্ত্তে থিয়েটারের নাকী-সুরের অপূর্ব্ব বিলাপ! সাধারণ-তন্ত্রের হাঁড়িকাঠে আর্টকে পুরিয়া ফেলিলে বেচারীর মাথাটি বাঁচানো দায় হইয়া উঠিবে—আর্টকে যাঁহারা রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা যেন সাধারণ-তন্ত্রের কথা ভুলিয়াও মুখে না-আনেন; কেননা, সুধু বাঙ্গলাদেশে কেন—পৃথিবীতেও এখনো সে শুভদিন আসিতে অনেক—অনেক দেরি আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

গান

একদা তুমি, প্রিয়ে,
আমারি এ
তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে
গেছ ভুলে !
সেথা যে বহে নদী
নিরবধি
সে ভোলে নি,
তারি যে স্রোতে আঁকা
বাঁকা বাঁকা
তব বেণী ;
তোমারি পদরেখা
আছে লেখা
তারি কূলে
আজি কি সবি ফাঁকি ?
সে কথা কি
গেছ ভুলে ?

গেঁথেছ যে রাগিণী
একাকিনী
দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে
কেঁপে কেঁপে
তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে
ফুল মালা
তাহারি পরশন-
হরষণ
সুধা ঢালা ;
ফাগুন আজো যে যে
খুঁজে ফেরে
চাঁপাফুলে
আজি কি সবি ফাঁকি ?
সে কথা কি
গেছ ভুলে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

স্বামী-স্ত্রী

ভাদ্রের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুপ্তের "স্বামী-স্ত্রী" প্রবন্ধে গোটাকতক স্পষ্ট কথা কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলা হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। যে-সব কথা আমরা অনেকেই মনে মনে আলোচনা করি কিম্বা দু-পাঁচজন সঙ্গীর সঙ্গতে প্রকাশ করিয়া ফেলি, অথচ সমাজের কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস পাই না, বরদাবাবু আমাদের মনের সঙ্কোচের যবনিকার আড়াল হইতে সেই কথাগুলিকেই টানিয়া আনিয়া, বাংলার পাঠক-সভায় হাজির করিয়াছেন।

লেখক বলেন যে, মেয়েদের শৈশব হইতে যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের “গোটা মনুষ্যত্বই বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত” হয়। তাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার একটিমাত্র লক্ষ্য এই যে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে পতিব্রতা গৃহধর্ম্মচারিণী স্ত্রী হইতে হইবে—তাদের উপর এর চেয়ে সমাজের কোন বড় দাবী নাই। তাঁর পর দাম্পত্য সম্বন্ধে “নৈতিক দায়িত্ব” নিঃশেষে স্ত্রীর উপর চাপানো হয় বলিয়া একপক্ষে যেমন ফরমাসী সীতাসাবিত্রীর মত স্ত্রী তৈরি করার চেষ্টা দেখা যায়, অন্যপক্ষে তেমি সত্যবান বা নলরাজার মত স্বামী তৈরি করার চেষ্টা মোটেই দেখা যায় না। অথচ স্বামীর মনুষ্যত্ব না থাকিলে স্ত্রীর পাতিব্রত্য জিনিসটা যে স্বাভাবিক হয় না, এ-কথাটা আমাদের সমাজ ভুলিয়া বসিয়া আছে।

বঙ্কিম বাবুর “বিষবৃক্ষের” নায়ক নগেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী সূর্য্যমুখী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যমুখী তাঁর “কেবল স্ত্রী”মাত্র ছিলেননা, তিনি “সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী”—এ সবই ছিলেন। কিন্তু লেখক বলেন যে, সূর্য্যমুখীর মধ্যে “কেবল স্ত্রী”র প্রাধান্য যদি না থাকিত, তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যদি অমন বিচিত্র হইবার সুযোগ পাইত, “তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হবার অবসর পেতোনা।” তিনি মনে করেন যে, নগেন্দ্রনাথ-গোবিন্দলালের গৃহিণীরা যদি

গোলমাল কিছুই হইত না। অর্থাৎ আমাদের দেশের স্ত্রীদের স্বামী হইতে “স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে নাই” বলিয়াই “স্বামীকে ভালো করবার স্পর্দ্ধা তাঁরা মনেও আনেন না”। তিনি লিখিয়াছেন, “গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটক “গৃহলক্ষ্মীতে” এমনও দেখেছি পতি-প্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অনুরোধ কর্চ্ছেন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক বিল্বমঙ্গলে অতিথিপরায়ণ “বণিক” নিজস্ত্রীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অতিথির তুষ্টিসাধনে অনুরোধ করেছেন—স্বাধ্বী স্বামীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে তাতেও সম্মত!”

সুতরাং লেখকের প্রধান অভিযোগ এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীর মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না এবং তার আত্ম-বোধ জাগ্রত হয় না বলিয়াই “স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি, একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠেনা। আমাদের চোখে যে মিলন খুব প্রগাঢ় ব'লে বোধ হয়, সেখানেও বুদ্ধিবৈষম্যের একটা চোরাফাঁক লুকানো থাকে!...বঙ্কিমবাবু... নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজাগুঁজি জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সাম্‌নে ধরেছেন। রবিবাবুও “ঘরে-বাইরে”তে ঠিক্ তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে।”

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার দরুণ এবং অন্যান্য নানা কারণে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বোধটা সুপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কতগুলো অভ্যস্ত সংস্কারের দ্বারাই

নিয়ন্ত্রিত হয়—এটা যে প্রায় বারোআনা মেয়েদের জীবন সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা বোধহয় নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের আসল সমস্যাটা এইখানে যে,—যদি উভয়ের ব্যক্তিত্বটাই বেশ পরিস্ফুট না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে প্রেমের স্বাধীন আদান প্রদান হইতেই পারে না। স্বামীর মধ্যে ব্যক্তিত্বটা স্ফুট আর স্ত্রীর মধ্যে সে পদার্থটা একবারেই সুপ্ত হইলে, সে স্ত্রীকে কোন স্বামীই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিতে পারে না এবং শ্রদ্ধা না থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খাঁটি প্রেমও জন্মে না। কাজেই স্ত্রী তখন স্বামীর ভয়ে এবং শাসনে চলে—সংসারের ব্যাপারে তার বিশেষ কোন কর্ত্তৃত্বই থাকে না। যত দিন পর্য্যন্ত তার রূপযৌবন থাকে, ততদিন সে স্বামীর অনুগ্রহভাগিনী হয়, রূপ না থাকিলে বা যৌবন গত হইলে স্বামীর সংসারে, স্বামীর চোখে, কোন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন স্ত্রীরই যথেষ্ট মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম থাকে বলিয়া মনে করিনা।

তবে ছেলে মেয়ের "মা" হিসাবে একটা বড় পদ স্ত্রীলোকের থাকে সত্য—সেই একটা দিক্ হইতে স্বামীর উপর তার জোরও থাকে, দখলও থাকে। স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ হয় না, মা হিসাবে তাদের স্বামীর সঙ্গে একরকমের একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। প্রধানতঃ এই কারণেই আমাদের পরিবারতন্ত্রে স্ত্রীর চেয়ে মায়ের আসন বড়। এই জন্যই যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সন্তানবতী ও বয়স্কা না হয়, ততদিন স্বামীর সঙ্গে তার সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে দেখাশোনায় পর্য্যন্ত লজ্জার কথা—অন্যলোকের সামনে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হইলে দুজনেই এমনিভাব ধারণ করে যেন কেউই কাউকে চেনেনা! স্ত্রী যে গৃহের দীপ্তি, সে মনুর হিসাবে কেবল "প্রজনার্থং" কিনা। সেইজন্য রাত্রির নির্জ্জনতা ভিন্ন, দিনের আলোয় অন্য নানা বিষয়ে, নানা ভাবে, নানা রসে, নানা সামাজিক সূত্রে, স্ত্রীর পক্ষে পতিসঙ্গটা সনাতন দেশাচারের ব্যবস্থা সযত্নে খেদাইয়া রাখিয়াছিল। এ কালের হাওয়ায় সেই সনাতন ব্যবস্থার সবই ওলোটপালোট্ হইয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তার সংস্কারের জড় এখনো মরে নাই।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে মনের সম্বন্ধ, আত্মার সম্বন্ধ এবং দুজনের স্বাধীন আদান-প্রদানের যোগেই যে তাদের সংসার-রচনা সুন্দর ও সফল হইয়া উঠিতে পারে, এ বোধ যেমন খুব অল্প স্বামীরই আছে, তেমি খুব অল্প স্ত্রীরও আছে। এ বোধ স্বামীদের মধ্যে জাগ্রত করিবার একমাত্র উপায় স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটানো। এবং স্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর উপায় ছেলেবেলা হইতে তাদের মনকে প্রশস্ত শিক্ষা ও সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ করিয়া তোলা এবং পরিণত বয়সে বিবাহ দিবার সময়ে কিছু পরিমাণে তাদের স্বাধীন নির্ব্বাচনের সুযোগ দেওয়া। ইহা না করিলে, স্ত্রীলোকের status সমাজে চিরদিনই নগণ্য থাকিবে এবং যে সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা হীন, সে সমাজ কোন দিনই উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইতে পারিবেনা, এটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মতই বলা যাইতে পারে।

সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন আমাদের সামাজিক অনুশাসন "একচোখো" বলিয়া তাহা নৈতিক অপরাধের জন্য স্ত্রীকে দণ্ড দেয় আর পুরুষকে রেহাই দেয়—সেদিক্ হইতে অভিযোগের কোন জোর নাই। যে স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই, সে স্ত্রী অন্যায় শাসনের দণ্ডটাকে যে আপনিই মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। যে জাতটার মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ফোটে নাই, যে জাত কোনো দিক্ হইতেই বিশ্বমানবকে দান করিবার মত কোনো সম্পদ্ অর্জ্জন করিল না, সে যে দাসত্বের শৃঙ্খল আপনিই আপনার গলায় পরিল! পৃথিবীতে যে স্বভাবতই দাস, তাকে প্রবলের শাসন ও শোষণ হইতে রক্ষা করিবে কে?

অথচ এ কথাও একেবারেই বলা চলে না যে, স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জিনিসটা পুরোপুরি ফুটিলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা "সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি বা নিবিড় মিলন" দেখা দিবেই! স্বামী যতক্ষণ প্রভু এবং স্ত্রী অধীনা, ততক্ষণ সংসারে যে একটা তামসিক শান্তির চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মধ্যে ব্যক্তিত্ব যেখানে স্ফুট, সেখানে সব ক্ষেত্রে তেমনতর শান্তির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত নাও হইতে পারে। ইউরোপে স্বামী-স্ত্রী যেখানে পরস্পরকে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন করিয়া লয়, সেখানে হয়ত বারোআনা ক্ষেত্রেই তাদের সম্বন্ধ "নিবিড় মিলনের" সম্বন্ধ হয় না। যে অনুরাগে পরস্পরকে এক সময়ে বাঁধিয়াছিল, কিছুকাল পরে হয়ত দেখা যায় যে, সে গভীরও নয়। পরস্পরের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল ঢের বেশি।

সুতরাং বরদা বাবুর অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সকল দিক্ হইতেই স্বাধীন আদান প্রদানের সম্বন্ধ হইলে এবং স্ত্রী কেবল "স্ত্রী" না হইয়া বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথের ভাষায়, বিচিত্র সম্বন্ধের রসে স্বামীর সহিত তার সম্বন্ধটি রসাইয়া লইলেই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনটা নিবিড় হইতে পারে—তবে আমি বলিব যে, এ সব সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর মিলন স্থায়ী না হইতেও পারে। সূর্য্যমুখী বা ভ্রমর "কেবল স্ত্রী" ছিল বলিয়াই যে তাদের স্বামীর সঙ্গে তাদের মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই, তারা "উগ্রচণ্ডা ক্ষেমঙ্করী" হইলেই যে কোন 'গোলমাল' উঠিত না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কোন উগ্রচণ্ডা বা ক্ষেমঙ্করীর সাধ্য নাই যে, স্বামীর মন বিগড়াইলে তাকে ভালো পথে টানিয়া আনে।

মানুষের sex-affinity বা মিথুন-সম্বন্ধের রহস্য এত বিচিত্র যে, পরস্পরকে ভালবাসিয়া নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিবার সুদীর্ঘ কাল পরেও হঠাৎ এক সময়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আবিষ্কার করে যে, তারা পরস্পরের যথার্থ মিথুন নয়—নিয়ত কাছে বাস করিয়াও তারা পরস্পর হইতে অত্যন্ত দূরে। গ্যয়টে তাঁর "Elective Affinities" উপন্যাসে মিথুন-সম্বন্ধের এই রহস্যকেই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি যে প্রেম যথার্থ প্রেম, তাকেও একবার ভাঙচুরের ভিতর

করিয়া পাওয়া যায়—বঙ্কিমবাবু তাঁর 'বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে' পুরুষের পক্ষে ত ইহাই দেখাইয়াছেন—কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে দেখান্ নাই। রবিবাবু 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে পুরুষ ও স্ত্রী দুজনের পক্ষেই তাহা দেখাইয়াছেন। স্ত্রীর দিক্ হইতে এটা দেখানো এ দেশে নূতন বলিয়াই আমাদের সমাজে ঐ উপন্যাসের বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গ্যয়টে 'এফিনিটির' ইতিহাসকে যতদূর পর্য্যন্ত খুলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত ইঁহারা কেহই যান্ নাই। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের "এফিনিটি"কে পাইল না এবং অবশেষে স্বামী অন্য নারীতে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষে সেই "এফিনিটি" আবিষ্কার করিল,—গ্যয়টে এফিনিটির ইতিহাসকে এতদূর পর্য্যন্ত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক এ সকল বিষয়ে সংস্কারমুক্ত হইয়া আলোচনা করিতে গেলে, এই সমস্ত সমস্যাই সমাজে ও সাহিত্যে ক্রমশ দেখা দিতে পারে, এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল।

সুতরাং স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হইলে সমাজে মোটের উপর শান্তির চেয়ে অশান্তির সম্ভাবনা বেশি। বস্তুত সেই অশান্তির সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লয়। কেননা, অশান্তিকে ঘুচাইবার একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা, মানুষকে অন্ধ তামসিক সংস্কারের গারদে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে যে নানা

সাহিত্যে যে ক্রমশ ক্রমশ সে সকল গোলমালের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ যে আমাদের দেশে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা অল্পে অল্পে ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে। যাঁরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্মৃতির ও আচারের কুলোর বাতাস দিয়া এ ধোঁয়াটাকে নিবাইবার চেষ্টা করিবেন, তাঁরা ধোঁয়াটাকে ক্রমশ আগুনে পরিণত করিয়া তুলিতেই সাহায্য করিবেন। 'গৃহস্থ', 'উপাসনা' প্রভৃতি কতগুলি কাগজে সেই চেষ্টা সুরু হইয়াছে। ইহাতে আমরা ত খুসিই আছি, কারণ জানি যে ব্যক্তিত্ব একবার জ্বলিবার উপক্রম করিলে তাকে কেউই নিবাইতে পারে না। নহিলে পোপেদের শাসনে ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাকে আগুনের মুখে ধরিয়া পোড়াইবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা সেই পাবক হইতেই পূত হইয়া নূতন বিক্রমে জ্বলিয়া উঠিল কেন? অতএব, মাভৈঃ।

বঙ্গে আত্মহত্যা

আশ্বিনের "প্রবাসীতে" সম্পাদক মহাশয় তাঁর "বিবিধ প্রসঙ্গে" বঙ্গে আত্মহত্যা সম্বন্ধে বাংলার পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"বাংলা দেশের ১৯১৬ সালের যে স্বাস্থ্য-রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, ঐ বৎসর ১৩০৩ জন পুরুষ এবং ২০০৭ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাংলা দেশে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিছু কম; প্রতি এক হাজার পুরুষে

আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিন্তু আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যার দেড় গুণেরও অধিক।" তিনি দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা সহরেও স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার হার পুরুষদের চারি গুণেরও বেশি। বাংলার আত্মহত্যার অনুপাতের সঙ্গে বিহার-উড়িষ্যা ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের আত্মহত্যার অনুপাতের তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলা দেশেই "আত্মহত্যার প্রবৃত্তি প্রবলতম", যদিচ অন্যান্য প্রদেশেও পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক বেশি আত্মহত্যা করিয়া থাকে। তার পর ঐ তিন প্রদেশের মধ্যেই বাঙালীর মেয়েদের ভিতরেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি সব চেয়ে বেশি দেখা যায়।

অথচ পাশ্চাত্য দেশের একজন বিশেষজ্ঞ-ব্যক্তির উক্তি উদ্ধার করিয়া সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্যদেশে পুরুষেরা স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালী মেয়েদের দুঃখ সব চেয়ে বেশি এবং তাদের শরীর ও মনের বল কম বলিয়া বাংলাদেশে আত্মহত্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাঙালীর মেয়েরা বেশি গল্প পড়ে বলিয়া বেশি আত্মহত্যা করে, এ সম্ভাবনা-টাকে সম্পাদক একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি গল্প পড়ে, কৈ তারা তো বেশি আত্মহত্যা করে না? তার পর লেখাপড়াজানা মেয়েরাই যে আত্মহত্যা করে তারও কোন প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের কিন্তু তারা যে এত আত্মহত্যা করে তাহা দেখা যায় না। সুতরাং বেশি গল্প পড়াটা আত্মহত্যার কারণ নয়।

গল্প পড়াটা আত্মহত্যার আসল কারণ এবং মুখ্য কারণ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে একথা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমের যে স্বাধীন সংস্কারমুক্ত, উদার ও উচ্চ আদর্শ টা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজের মধ্যে ত তার স্থান হয় নাই। সেই কারণে এই নূতন সাহিত্যের অরুণোদয়ে স্ত্রীলোকের মনের চারিদিক্ হইতে যখন সংস্কারের কুয়াসাটা কাটিয়া যায়, তার মন যখন জাগে, তখন তার বাইরের সংসারের সমস্ত কৃত্রিম বিধি-নিষেধের তর্জ্জনী তাকে এক পাও অগ্রসর হইতে দেয় না। তার জীবনের সংকীর্ণ ক্ষেত্রের চারিদিকে চিরাগত সংস্কারের কালো পর্দ্দাগুলি নীরন্ধ্রভাবে টানিয়া দেওয়া হয়। এমনি করিয়া সে সাহিত্যে যে-জীবনটার কল্পরূপ দেখিয়া মনে মনে তাকে বরণ করিয়া লয়, সমাজের জীবনের বাস্তবরূপের সঙ্গে তার বৈষম্যটা এতই ভয়ঙ্কর যে, তার ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, তার আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, তার অনুভূতির সঙ্গে সংস্কারের একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়া যায়। অথচ সে বিরোধের কোন কূলকিনারা পাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা, পুরুষের সমস্যার সমাধান তার নিজের হাতে, কিন্তু মেয়েদের তো তা নয়। এই

মেয়ে নিপীড়িত হইয়া যে আত্মহত্যা করে, তার অনেকগুলি নিদর্শন আমি প্রত্যক্ষ ভাবেই পাইয়াছি।

আমাদের সমাজে মেয়েদের যত দুঃখ যত অপমান এমন আর কোন সভ্য দেশের কোন সমাজে নাই। যে দেশের বারো আনা লোকের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক বাহিরে আসিলে বা পর পুরুষের সঙ্গে মিশিলেই তার সতীত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে বাধ্য, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে সে দেশের লোক অপমানিত করিয়াছে, কেননা স্ত্রীজাতির প্রতি এত বড় অশ্রদ্ধার কথা কোন সভ্য সমাজের লোকের কল্পনায় উদয় হওয়াও অসম্ভব।

আমরা পুরুষ, আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চাই, সমাজে প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র চাই, রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিকার চাই—কত বিচিত্র আয়োজন এবং কত প্রতি-যোগিতার নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতে তবে আমাদের ব্যক্তিত্বের একটু আধটু জীবন-স্পন্দন দেখা দিলেও দিতে পারে! কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মেয়েদের ব্যক্তিত্ব পদার্থটা সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কেননা, বিধাতা তাকে মন ও আত্মা বিবর্জ্জিত করিয়াই গড়িয়াছেন।

প্রথমতঃ তার জন্মটাই পিতামাতার পক্ষে একটা "দায়"। তারপর তার দশ এগার বছর পার হইতে না হইতেই সে "অরক্ষণীয়া" হইয়া পড়ে; তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া বিবাহের বাজারে তার ভাগ্য পরীক্ষা হয়। তারপর একদিন মাথার চুল হইতে পায়ের নখ

লইয়া রণবাদ্য বাজাইয়া যে বীর ব্যক্তিটি তাকে ঘরে লইয়া যান্ তিনিই তখন হইতে তার ভাগ্যবিধাতা। দৈবাৎ তাঁর সুনজরে যদি সে পড়িল ত ভাল, নহিলে—কপালে করাঘাত এবং ক্রন্দন! কিন্তু কুনজরেই পড়ুক আর সুনজরেই পড়ুক, সে অন্যের যে ক্রীড়নক সেই ক্রীড়নকই থাকিয়া যায়। তার চিত্তের ক্ষেত্র ঐ অন্তঃপুর—তার স্বামী পুত্র কন্যা, তার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়, ইষ্টকুটুম্ব প্রভৃতির মধ্যেই তার সমস্ত কর্ত্তব্য বিভক্ত।

পুরুষের পক্ষে চাই সমস্ত জগৎটা, আর মেয়েদের পক্ষে ঐ পারিবারিক ক্ষেত্রটুকুই পর্য্যাপ্ত। অথচ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নাকি বলে যে, পুরুষের সহধর্ম্মিণী স্ত্রী, সেই তার বড় পদ। পুরুষ আর স্ত্রীর মনের মধ্যে এতবড় একটা অসামঞ্জস্য যে সমাজ পাকা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, সে সমাজে স্ত্রীলোকের নানাদিকেই দুঃখ ও অপমান অনিবার্য্য। মুক্তির অভাবই সব চেয়ে বড় দুঃখ, বন্ধনের বেদনাই সব চেয়ে বড় বেদনা।

আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহে যে সকল পুরুষকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইতেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অকর্ম্মণ্য জীবনের দুঃসহ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে স্ত্রীলোকেরা যে তাদের চেয়ে সহস্রগুণে বেশি নজরবন্দী, তারা যে চিরকালের মত interned, এবং তাদের বন্ধনের বেদনা যে কত নিবিড়,

যখন তারা কেউ কেউ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আত্মহত্যা করে, তখন আমরা উপহাস করিয়া বলি,

"পাঁচকোটী লোকের মধ্যে পাঁচটী নারী যদি আত্মহত্যা করিল, অমনই চীৎকার আর চীৎকার কিন্তু প্রতিবৎসর শতশত নরনারী ধর্ম্ম ও নীতির পথ ছাড়িয়া জীবন্মৃত হইতেছে, সে দিকে কয় জনের লক্ষ্য আছে ?"—(গৃহস্থ)

হাঁ, যে কারণে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই তাদের মধ্যে ভ্রষ্টা নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই। দুই রোগের ভিন্ন লক্ষণ হইলেও তাদের মূল কারণ এক। মূল কারণ—ব্যক্তিত্ববিহীন, সংস্কারশৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ জীবনের গ্লানি ও দুঃখ এবং সেই হেতু শরীর ও মনের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা। মেয়েদের শরীরের স্বাস্থ্য যেমন নানা রোগের দ্বারা জীর্ণ হইতেছে, তাদের মনের স্বাস্থ্যও না থাকায় সেখানে নৈতিক দুর্ব্বলতা সহজেই দেখা দিতে পারে। সে সম্বন্ধে statistics সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি-মাত্রকেই অনুরোধ করি। দমন নীতির দ্বারা কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কোনদিনই ভাল ফল হয় নাই, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিবে।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

আশ্বিনের "ভারতবর্ষে" 'শ্রী'স্বাক্ষরিত কোন লেখক, বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধঘটিত যে সকল সমস্যা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতেছে, তাহা "নূতন ধরণের", কিন্তু "অস্বাভাবিক নয়" বরং "শ্রাবনীয়," ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক নিজে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র ভক্ত হইলেও ঐ উপন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত এবং শ্রদ্ধাভাজন একজন গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত উদ্ধার করিয়াছেন। সেই পণ্ডিত মহাশয় মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির মনস্তত্ত্বে কিছুমাত্র ভুল নাই, কিন্তু "যা সম্ভব নয় সেটাকে রবিবাবু সত্যই স্বাভাবিক করে তুলেছেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস যে চোখের বালির "দর্শন" ভারতবর্ষে চলিবে না, কেননা "যৌবনের উষ্ণ শোণিতের আধিক্যে এই সব দর্শনের জন্ম হয়।" পণ্ডিত মহাশয়ের মতে "নৌকাডুবির মধ্যে হিন্দু দর্শনই এক পবিত্র কবিত্বের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে" —"কোন ইউরোপিয়ান্ বা আমেরিকানের সাধ্য নয় অমন পবিত্র উপন্যাস লেখে"। যে কমলা রমেশকে তার স্বামী বলিয়া জানিত, যে মুহূর্ত্তে সে টের পাইল যে রমেশ তার স্বামী নয়, সে মুহূর্ত্তে তার প্রতি তার মনের কিছুমাত্র অনুরাগ রহিল না, ইহাই পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্চর্য্য লাগিয়াছে এবং ইহাকেই তিনি 'হিন্দুদর্শন' নাম দিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

লেখক বলেন কবি তাঁর সৃজনের "impulse" হইতে উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং —

"সেখানে সমালোচনার মাপকাঠি বা দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিকতা আনিয়া বুঝাপড়ার কি প্রয়োজন?... সাহিত্যের আদর্শ হচ্চে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করা সেই হিসাবে চোখের বালি উপন্যাসকে মন্দ বলিবার ত কোন কারণ দেখিনা।...একজন হিন্দু ঘরের



হতাশের খেদ

"ও মিস্‌-এডুকেশন ! তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলুম
তবু তুমি আমার হলেনা !"

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত।

বিধবা বাল্যেই স্বামী সম্পর্ক রহিত হইয়া যৌবনে তাহার আচার-বিচার পূজা-পদ্ধতি দূরে রাখিয়া সহজে একজন গুণবান্ পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইতে পারে, তাহাকে সত্যই প্রেম দিতে পারে, তাহা যে একটা মস্ত পাপও নয়, এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের symbol...যে ঘটনা, যে দৃশ্য এখানে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম দেশে symbol হইতে পারিত না।...খাঁটি মনস্তত্ত্বের উপন্যাস বাংলায় তিনিই প্রথমে লিখেছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত তাঁহার লেখার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে, এই ধরণের উপন্যাস লেখার হিসাবে তাঁহার স্থান কত উচ্চে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহার নায়ক নায়িকা প্রভৃতির মনোভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি হটিয়া যান্না, অস্বাভাবিক একটা কিছু করিয়া বসেন না—পাঠকেরই মাঝে মাঝে হিসাব রাখিতে হয়! এমনি সূক্ষ্ম পরিচয় তাঁর স্বভাবের সঙ্গে। 'চোখের বালি'কে প্রশংসা হয় না দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, অথবা নিন্দা করা দেখে আমার দুঃখ হয়।"

অবশ্য লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন যে, গল্পউপন্যাসকে সামাজিক আদর্শের মাপ-কাঠির দ্বারা বিচার করা উচিত নয়—মানব-প্রকৃতির সত্য ও স্বাভাবিক সৃষ্টি হইলেই গল্পউপন্যাসকে আমরা আদর করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁর পণ্ডিত মহাশয় যখন উপন্যাসের পবিত্রতা ও হিন্দুদর্শনের দোহাই পাড়িয়াছেন, তখন তাঁকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে এই তথাকথিত পবিত্রতার আদর্শ ও হিন্দুদর্শনের ছড়াছড়িটা দেখিতে পাওয়া যায় কি? মহাভারতের মধ্যে যতগুলি বৈধ ও অবৈধ প্রণয়-কাহিনী আছে, সেগুলি তাঁর হিন্দুদর্শনের কোটায় নিশ্চয়ই পড়ে না, অথচ হিন্দুর পঞ্চম বেদ মহাভারতকে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য না বলিয়া কোন উপায় নাই। কালিদাসের "শকুন্তলা" গোপন প্রণয়েরই কাহিনী—তাতে পবিত্রতার ভড়ং নাই। এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহের ব্যবস্থাটা সেকালের "বোহিমিয়ান্" অথচ বৈধ ব্যবস্থাই ছিল। তারপর কৃষ্ণ-লীলার ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়া যে সব রসসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলিকে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিলে, তাদের মধ্যে হিন্দুদর্শন ও পবিত্রতা যে কি পরিমাণে বজায় থাকে, তাহা খোলসা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না।

সাহিত্য সর্ব্বত্রই সাহিত্য। হিন্দু সাহিত্যে বা হিন্দুত্বের সাহিত্যে যদি এমন কোন অদ্ভুত পদার্থ থাকে যার উদ্ভব হিন্দুর দেশ ছাড়া আর কোথাও ঘটিতে পারে না, তবে সেইখানেই সে পদার্থ টা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেননা, যাহা সত্য তাহা বিশ্বব্যাপী, তার সর্ব্বত্র প্রকাশ। মানুষের মন সাহিত্য-কলায় দর্শনে ও বিজ্ঞানে আপন জ্ঞানের আপন অনুভূতির পরম সত্যকে, কৌলিক, দৈশিক প্রভৃতি সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছে বলিয়াই সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, কলা, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ও সারূপ্যই আমরা দেখিতে পাই। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যে হিন্দু আধ্যাত্মিকতার আভাস যদি পাওয়া যায়, তবে এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর কল্পনা করার আবশ্যকতা থাকে কি যে,

পুনর্জ্জন্ম মানিলে, ইহা বলা যায় যে, "আমাদেরি কোন পূর্ব্বপুরুষ মৃত্যুর পর ইউরোপে গিয়া ওয়ার্ডসোয়ার্থরূপে জন্ম গ্রহণ করেন" ? * কিম্বা এই কথা বলিয়া আস্ফালন করার কোন মানে আছে কি যে, "ওয়ার্ডসোয়ার্থও হিন্দু"। হিন্দুত্বের আদর্শ বিশ্ব আদর্শ নয়, ইহা মনে করিলেই এই সকল হাস্যকর কথা বলা সম্ভব হয়। পৃথিবীতে সব জাতিই বিশ্বমানবের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ মাত্র, মূলে সবাই এক—এইটেই সত্য এবং এই সত্য আছে বলিয়াই এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভাবের আদান প্রদান চিরকাল চলিতেছে এবং চিরকালই চলিবে।

স্বামী

নারায়ণের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "স্বামী" গল্পটা বাংলার মাসিক সাহিত্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য গল্প।

গল্পের প্লট্‌টা এই :—

সৌদামিনীর একবছর বয়সে তার বাপের মৃত্যু হইলে তার মা তাকে লইয়া নিজের ভাইয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লন্। তার মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক—বেশি বয়স পর্য্যন্ত ভাগ্নীকে বিবাহ না দিয়া তিনি তাকে লেখাপড়া শিখাইলেন। গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদারের ছেলে নরেন কলিকাতায় বি,এ, পড়িত; সে সৌদামিনীর মামার সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করিতে আসিত—মামা নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে নরেনের তর্কবিতর্ক বাধাইয়া দিতেন। ক্রমে পড়াশুনা খেলা ধুলা হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়া দুজনেরি মন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু সামাজিক বাধা থাকায় তাদের মধ্যে বিবাহ যে হইতে পারিবে না তাহা দুজনেই জানিত। ইতিমধ্যে অন্য এক জায়গা হইতে সৌদামিনীর সম্বন্ধ আসিল। তার মামা প্রথমটাতে আপত্তি করিলেও পাত্র নিজে দেখিয়া আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া গেলেন। বিবাহ হইয়া গেল। সৌদামিনীর মন রহিল নরেনে আসক্ত—স্বামীর ঘরে গিয়া স্বামীর সহিত এক শয্যায় শুইতে তার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার স্বামীও কোন বিষয়ে তাকে কোন দিন কিছুমাত্র বাধা দিলেন না। সৌদামিনীর সৎ শাশুড়ী তার স্বামীর প্রতি কিছু যত্ন করিতেন না; তার মেজ দেওর এক পয়সাও সংসারে সাহায্য করিতেন না, অথচ বাড়ী-শুদ্ধ লোকের সমস্ত যত্ন ও আদর তিনি একলাই পাইতেন। স্বামীর প্রতি সৌদামিনীর ভালবাসা না থাকিলেও তাঁর প্রতি বাড়ীর এই অবহেলায় তার গা জ্বলিত এবং ক্রমে তার শাশুড়ির সঙ্গে ইহা লইয়া তার খিটিমিটি চলিতে লাগিল।

সৌদামিনীর স্বামী খাঁটি বৈষ্ণব। তিনি স্ত্রীর প্রতি যত্ন করিতেন, স্ত্রীর সেবাও করিতেন—অথচ তার কাছে কোন দাবী করিতেন না। কাহারও কাছে তাঁর কোন দাবী ছিলনা।

শাশুড়ীর সঙ্গে বৌয়ের হাঙ্গামার খবর ক্রমে সৌদামিনীর স্বামীর কাণেও উঠিল এবং সৌদামিনীর সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিলে, সে ভগবান মানে না হঠাৎ এইকথা তার মুখে শুনিয়া তার স্বামী অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শুধু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে তাকে নিষেধ করিলেন। তাঁর সেই প্রথম নিষেধ-বাক্যে আহত হইয়া সৌদামিনী বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে চাহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন।

এমন সময় তাদের বাড়ীতে হঠাৎ নরেন আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেনের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সৌদামিনী

* গৃহস্থ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩২৪।

দেখা না করিলেও নরেন কোন সুযোগে তার সঙ্গে দেখা করিল। নরেন তার দাসী মুক্তকে হাত করিয়া লইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে, সৌদামিনী এখনো তাকে ভোলে নাই, তাই সে তাকে পাইবার আশায় তার স্বামীর গৃহেই আসিয়াছিল।

তার শাশুড়ী আড়ি পাতিয়া তাদের রহস্যালাপ কতকটা শুনিয়াছিলেন। তারপর বাড়ীসুদ্ধ লোকের মুখ অন্ধকার হইল। শুধু তার স্বামীর মুখ পূর্ব্বে যেমন প্রসন্ন ছিল, পরেও তেমনিই প্রসন্ন রহিল।

নরেন মুক্ত'র হাত দিয়া পলায়নের প্রস্তাব করিয়া তাকে চিঠি পাঠাইল। সে চিঠি পড়িয়া সৌদামিনী সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে স্বামীর কাপড় ধোবাকে দিতে গিয়া তার নিজের নামের একটা চিঠি পড়িয়া সে জানিতে পারিল যে তার বাপের বাড়ী পুড়িয়া গেছে। স্বামী তাকে সেই চিঠি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করিল না। তার মনে হইল পাছে অর্থ সাহায্য করিতে হয়, সেই ভয়ে তার স্বামী তার নিকট হইতে চিঠিখানি গোপন করিয়াছেন। স্বামী-স্ত্রীতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল।

সেই রাত্রে নরেনের সঙ্গে সৌদামিনী স্বামীর ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কলিকাতায় বৌবাজারের একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া নরেন তাকে সেইখানে রাখিল।

কিন্তু নরেনের সঙ্গে বাহির হইবার পর মুহূর্ত্তেই সে বুঝিল তার সমস্ত মন কখন্ তার অলক্ষিতে তার স্বামীর অনুরাগে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেন তার মুখে স্বামীপ্রীতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত মুষড়াইয়া গেল, সে তাকে বারবার বুঝাইল যে এখন সে ফিরিতে চাহিলেও তার স্বামী তাকে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু সৌদামিনীর মনে অটল বিশ্বাস ছিল যে, তার স্বামী তাকে মার্জ্জনা করিবেনই।

মুক্ত'র কাছে সৌদামিনী শুনিল যে, তার স্বামী তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানেন। তিনি সেই বাড়ীতেই দেখা দিলেন। তিনি শুধু বলিলেন, "তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না। আমি জানি তুমি আমারই আছ। বাড়ী চল।"

গল্পটা এইজন্য ভাল লাগিল যে, এ গল্পে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের কোথাও কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শেষ-কালটাতে মিলনটা যে সত্যসত্যই ঘটিয়া উঠিল, তাহা কোন সামাজিক সংস্কারের তাড়নায় ঘটে নাই। সমস্ত গল্পটার ভিতর-কার অভিব্যক্তি হইতেই গল্পের পরিণামটা অতি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখক গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত সৌদামিনীকে কোথাও কৃত্রিম সতী বানাইবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। সে নরেনকে ভালবাসিয়াছে, বিবাহের পরেও তাকে ভোলে নাই এবং স্বামীর ঘর ছাড়িয়া তার সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু তার স্বামী যে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাকে একদিনের জন্য শাসন করেন নাই কিম্বা তার উপর কোন প্রভুত্ব খাটাইবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি যে ধৈর্য্যের সঙ্গে তাকে ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া তার ভালবাসা পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াই রহিয়াছেন, ইহাতেই তিনি ভিতরে ভিতরে তাঁর স্ত্রীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী সে খবর টের পায় নাই। যেদিন সে ঝগড়া করিয়া স্বামীর ঘর ছাড়িয়া গেল, সেদিন নরেনের সঙ্গে তার জীবন কাটাইবার অভিপ্রায়ে সে ঘর ছাড়ে নাই—সে ঘর ত্যাগ করিয়া-ছিল অভিমানে। কিন্তু বাহির হইয়া পড়িতেই তার সমস্ত লজ্জা একেবারে অনাবৃত মূর্ত্তিতে তার সাম্‌নে আসিয়া দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে তার স্বামীর ধৈর্য্য-শীল প্রতীক্ষাপরায়ণ প্রেমে সে যে কতটা অভিভূত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিল।

অবশ্য তার স্বামী তাকে গ্রহণ করিলেন; অথচ এমনটি যে এদেশে ঘটে তাহা মনে করিবার কারণ নাই! সাহিত্যের মস্ত ভরসা এই যে, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'। সুতরাং ঔপন্যাসিকের কল্পনায় যাহা সত্য,তাহা বাস্তব সত্যের চেয়ে সত্যতর।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

বন্ধ ঘরের ঘুল্‌ঘুলিতে

বন্ধ ঘরে দ্বন্দ্ব বুকে
আঁক্‌ড়ে শিলা একটি টেরে
শিকলি পায়ে শিকলি গলে
অন্ধকারে তলিয়ে কে রে!
হাতকড়ি সে মাংস কেটে
কাম্‌ড়ে এঁটে বস্‌ছে হাড়ে,
গুম্‌-ঘরেরি ঘুল্‌ঘুলিতে
চাম্‌চিকেতে পাখ্‌না নাড়ে।
ঘুল্‌ঘুলিতে এক্‌টু আলো
তাও যে ঢাকে কাল্‌-পেঁচাতে,
প্রাণ্‌-পরতে একটু আশা
ফুঁপিয়ে মরে—নেই চেঁচাতে।
ফুঁপিয়ে মরে গুমরে একা
স্বপ্নে কভু ডুক্‌রে ওঠে
চট্‌কা-ভাঙা ঝাপ্‌সা চোখে
স্বপ্ন-ভীতি-চিহ্ন ফোটে।
মন্‌-মরা জীয়ন্তে-মরা
তুই মরিয়া কষ্টে যে রে,
আফ্‌শোষে কি শুষ্‌ছে হিয়া?—
চক্ষু জলে আস্‌ছে ভেরে?
মর্দ্দ ওরে! হ'স্‌নে ঢিলে
কান্না গিলে ফেল্‌তে শেখো,
পাঁজরা যদি পুড়্‌তে থাকে
পুড়িয়ে তাকে আঙ্‌রা রেখো।
আঙ্‌রা রেখো আঙ্‌রা রেখো
তপ্ত রাঙা দীপ্তি-ভরা,
নেই আশা?—কে বল্‌তে পারে?—
জাগ্‌বে শিখা হাস্‌বে ধরা।
ভর্সা রাখো চাঙ্গা থাকো
শক্ত সাজা তুচ্ছ করে'
জন্মেছ মানুষ হ'য়ে যে
চল্‌বে না তা' ভুল্‌লে পরে।
দণ্ড সে মান্‌দণ্ড কভু
নয় মানুষের,—ভুল কোরো না,
নয় কোতোয়াল সেই জহুরী
কষ্‌বে যে জন তপ্ত সোনা।
কু-গ্রহ কু-দৃষ্টি হানে,—
দুঃখ দেহে,—দুঃখ মনে,
তাই বলে' কে হস্ত জুড়ে
বস্‌বে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে!
নির্য্যাতনে নেই যাতনা
শাস্তি যবে নির্ব্বিচারে;
ভাগ্য ভগবান চেয়ে ভাই
হয় না বলী,—শঙ্কা কারে?
কাইমী না রে দুঃখ-দশা;
কাইমী কিবা নয়কো পাকা—
বর্ত্তমানে গর্ত্ত খুঁজে
ব্যর্থ হ'য়ে বর্ত্তে' থাকা।

আজ্‌কে ওরে মৌন! তোরে
অন্ধকারে অন্ধ করে
চৌচাপটে চাপ্‌তে থাকে
বুকটাকে জগদ্দল্ পাথরে।
আজ্‌কে যেন দুনিয়া ফাঁকা
নেইক কিছু নেইক কেহ
তৃষ্ণা-খরা শুষ্ক ধরা
নেইক প্রীতি নেইক স্নেহ।
আজ্‌কে যেন লুপ্ত হাসি
দৃষ্টি ঘোলা ক্লান্ত চোখে,
হয় তো সবি বদ্‌লে যাবে,—
রাত পোহালে,—দিব্যালোকে।
ইচ্ছা-মহাশক্তি সাথে
যুক্ত হবি একনিমেষে,
আত্মঘাতী জল্পনা সে
মূর্চ্ছা যাবে অট্ট হেসে।
প্রাণ দিয়ে যে চাইতে পারে
দৃপ্ত দৃঢ় চিত্তবেগে
প্রাণ পূরে নিশ্চয় পাবে সে,
ঝর্‌বে সুধা বজ্র-মেঘে।
অন্ধকারে আস্‌বে রবি—
তার কপালে—আস্‌বে ত্বরা;—
ঘুল্‌ঘুলিতে গলিয়ে দেবে
খাম্‌খানি খোশ্‌-খবর-ভরা।
জাগ্‌ছে হিয়া,...জাগ্‌বে আলো,...
জাগ্‌ছে ভাষা,...জাগ্‌ছে আশা,...
গুম্‌ঘরেরি ঘুল্‌ঘুলিতে
বুল্‌বুলিতে বাঁধ্‌ছে বাসা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমালোচনা

খাদ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু আই, এস, ও, এম, বি, এফ, সি এস প্রণীত। কলিকাতা, কলেজ প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা পাড়িয়া বিচক্ষণ গ্রন্থকার খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'খাদ্য কাহাকে বলে'? তাহার উত্তরে লেখক বুঝাইয়াছেন, যাহা আমরা খাই এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন ও শক্তি সঞ্চয় হয় তাহাই যথার্থ খাদ্য; "আমরা যাহা কিছু খাই", তাহাই খাদ্য নহে। তার পর তিনি বলিয়াছেন, "এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর-পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন, দুগ্ধ, চিনি, সুপক্ব ফল ইত্যাদি। অপরগুলি রন্ধনাদি কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত না হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, যথা,—ডাল, চাল, ময়দা, মৎস্য, মাংস তরকারী ইত্যাদি।" "খাদ্যের প্রয়োজন—শরীরের পুষ্টি-সাধন ও বল-বিধানের জন্য। আমরা যে কোন কাজই করি না কেন, শরীর তাহাতেই ক্ষয় পায়। চলাফেরা, উঠা-বসা, দৌড়ান ব্যায়াম প্রভৃতিতে দেহস্থিত মাংসপেশী আকুঞ্চন-প্রসারণের জন্য ক্ষয় পায়—এবং পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যে মস্তিষ্কাদি শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় হয়। শরীর রক্ষা করিতে হইলে শরীরের সেই ক্ষয় পূরণ করা যেমন প্রয়োজন, শারীরিক শক্তি সঞ্চয় ও সে শক্তির বৃদ্ধিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। এজন্য এমন খাদ্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা ক্ষয় পূরণে ও শক্তি-বর্দ্ধনে সাহায্য করে। গ্রন্থকার অত্যন্ত সহজ ভাষায় বিশদভাবে পরিপাক-যন্ত্র, পরিপাক-

ক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণাগুণের আলোচনা করিয়াছেন; এমন কি খাদ্যের পরিমাণ অবধি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। অল্প-ভোজন, অতিভোজন এবং কু-ভোজনে কত দোষ, তাহাও তিনি বুঝাইয়াছেন; বয়স এবং অবস্থাভেদে খাদ্যের পরিমাণ ও সময়-নির্দ্ধারণেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহারও তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই— কি ভাবে চলা উচিত, বলিয়া দিয়াছেন। উপবাস সম্বন্ধে এখন নানা মুনির নানা মত। গ্রন্থকার বলেন, উপবাসের উপকারিতা বিলক্ষণ। তাঁহার মতে, "মানুষ যদি আজীবন পরিমিত-ভোজী হয়, শরীর পোষণের জন্ম যে পরিমাণ যে জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন তাহা যদি নিক্তির ওজনে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার উপবাস করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য-গ্রহণই আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ দেহপুষ্টির জন্ম গৃহীত হয় না, উহা অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া বিকার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থ (toxins) উৎপাদন করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্ত-স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগের স্বাভাবিক শক্তির অপচয়, দৌর্ব্বল্য এবং ক্রিয়ার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। শিরঃপীড়া, যকৃতের রোগ, অজীর্ণ, উদরাময়, পেট-বেদনা, বমন, জ্বর, উদরাধ্মান প্রভৃতি নানা রোগের একটি কারণ— অন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের বিকার। এরূপ অবস্থায় পুনরায় খাদ্য গ্রহণ করিলে উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থ সমূহ শরীরের মধ্যে আরও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুতরাং পূর্ব্বকথিত রোগগুলির লক্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অন্ত্রশূল, মূত্রশূল, বহুমূত্র প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ দেহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। খাদ্যের এই অতিরিক্তাংশ ও তদুৎপন্ন বিষাক্ত দ্রব্য নাশ করিবার একমাত্র উপায় উপবাস। "আমিষ ও নিরামিষ ভোজন" সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন, "কোনটিই অতিরিক্ত মাত্রায় হওয়া উচিত নহে। যেমন মাংস অধিক পরিমাণে খাইলে নানাবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভাত, ডাল, রুটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি পদার্থ অধিক খাইলে নানাবিধ অজীর্ণ রোগ ও বহুমূত্র রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।" এ-সমস্ত আলোচনার পর গ্রন্থকার খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন প্রত্যেক স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তিরই তাহা পাঠ করা উচিত। গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে কতিপয় সাধারণ রোগে পথ্যের ব্যবস্থা এবং সে পথ্যাদির প্রস্তুত-প্রকরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানা দিক দিয়া এ গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থকারের মতগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত; একটিও বাজে কথা ইহাতে নাই। বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আমরা এই অতি-প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম; স্বাস্থ্যহীন বাঙ্গালা দেশে এ গ্রন্থের আরো বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৩৫০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের মূল্য দেড়টাকা মাত্র। কিন্তু এই দেড় টাকা মাত্র ব্যয়ে যে ডাক্তার ও ঔষধ-খরচ বাবদ অন্ততঃ দেড়শত টাকার অপব্যয় কমিবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুষ্প। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ রায় অর্জ্জুন প্রণীত। প্রকাশক, ম্যানেজার পরিদর্শক শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট পরিদর্শক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। ভাষা-ভাব নিতান্তই এলো-মেলো; রচনাও অক্ষম, বিশেষত্বহীন।

Rambling Thoughts. By Munindra. P. Sarvadhikari, Printed and Published by Manikchandra Ghose at the Lila Printing Works. Calcutta. 1916. এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



—"পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত

ভারতী

৪১শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ [৮ম সংখ্যা

পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার

আজকাল পল্লীগ্রামের কথা লইয়া বেশ একটু নাড়াচাড়া চলিতেছে। সহরের মাসিক পত্রিকাগুলিতেও পল্লীবার্ত্তা সাদরে স্থান পাইতেছে। যাঁহারা কদাচিৎ স্বগ্রামে গমন করিতেন, তাঁহারাও এখন মধ্যে মধ্যে দেশে আসিয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের আলোচনায় যোগদান করিতে আর সেরূপ উদাসীন নহেন। কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতিরও অভাব নাই। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন দেশীয় কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই পল্লীবাসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অভাব-অভিযোগের কথা অবগত হইতেছেন। কিছুদিন হইল কেবল পল্লীগ্রামের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে সার্কেল্ অফিসার নামক এক শ্রেণীর নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা নামে চৌকিদারী কার্য্য-পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত হইলেও পঞ্চায়েত ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যে রাস্তাঘাটের উন্নতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জঙ্গল ও আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ, নূতন পাঠশালা স্থাপন ও পুরাতন পাঠশালাগুলির উন্নতি-বিধান, দুঃস্থ কৃষকগণের সাহায্যার্থ যৌথ-ঋণদান-সমিতির প্রতিষ্ঠা, কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে কীটাদি হইতে ফসল-রক্ষা প্রভৃতি নানা জন-হিতকর কার্য্যে অবহিত হইতেছেন। ম্যালেরিয়ার প্রতিকার-কল্পে সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গ্রাম বিশেষের অবস্থা-অনুসারে জঙ্গল ও ড্রেন প্রভৃতি কাটাইয়া যাহাতে ম্যালেরিয়া এবং মশকের হাত হইতে গ্রামবাসীগণ উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে উৎসাহ ও অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। কোথাও বা ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত Beneficazione প্রথায় বন্যার জলে পল্লীর বিষাক্ত আবর্জ্জনাদি ধুইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে; কোথাও বা চতুষ্পার্শ্বস্থিত জঙ্গলাদি সাফ করিয়া গৃহস্থের প্রাঙ্গনে নির্ম্মল বায়ু-চলাচলের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। অবশ্য সর্ব্বত্র সমানভাবে কাজ হইতেছে না এবং এই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের ফলে সরকারী বেসরকারী সকল অনুষ্ঠানেই কিঞ্চিৎ ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে, কিন্তু গ্রামগুলি যাহাতে আধুনিক স্বাস্থ্যনীতির-অনুমোদিত প্রথায় শিক্ষিত সমাজের বাসোপযোগী হইয়া উঠে, বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা চারিদিকেই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাঁহারা পশ্চিম বঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন জেলায় ম্যালেরিয়ার সংহার মূর্ত্তি স্বচক্ষে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের চরে অবস্থিত অটুট স্বাস্থ্য ও নবীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামগুলি দেখিয়া তাঁহারা হয়ত এই সকল পল্লীর প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। একবার নদীয়ার বড়-জাগুলি, সুবর্ণপুর প্রভৃতি স্থান স্বচক্ষে দেখিলে পল্লীর বৈষয়িক পরিবর্ত্তনের কথা বুঝিতে পারা যায়—স্বতঃই মনে হয়, পল্লীর বৈষয়িক উন্নতিই পল্লী-সংস্কারের মূল ভিত্তি।

ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক যাহাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয়, প্রকৃত বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীর সহিত পরিচয়-লাভের সুযোগ তাহাদের যথেষ্টই ঘটিয়া থাকে। এই সকল বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আশা-ভরসার সহিত সহরবাসী শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিৎ যোগ বা সামঞ্জস্য না থাকিলে কেন যে সম্পূর্ণ জাতীয়ত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী স্যর মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়া, মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম সমষ্টি গ্রাম হইতেই উন্নতির চেষ্টা আরব্ধ হওয়া উচিত, ইহা অনুভব করিয়া মহীশূরে এক নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। সহরে আমরা উন্নতি-মার্গে খুব দ্রুত চলিয়াছি বটে কিন্তু মফঃস্বলে আমাদের গতি একেবারেই শম্বুকের মত। দেশের ভদ্র-শ্রেণী গ্রামত্যাগী হইয়া প্রায়ই এখন সহরে আশ্রয় লইতেছেন। একে জীবন-সংগ্রামের দারুণ চাপ, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়ার উপদ্রব। গ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসক মিলে না, ছেলেদের ভালরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না, জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের সহিতও অনেক সময় সামান্য বৈষয়িক বা সামাজিক ব্যাপার লইয়া ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাই এখন অনেক শিক্ষিত বাঙালীই গড়ে প্রায় ৫০।৬০৲ টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ীভাবেই সহরে আশ্রয় লইতেছেন; ইহাতে পল্লী ও শিক্ষিত সমাজ এ উভয়েরই যে কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিবার নহে। এ মাহিনায় আর গ্রামে গিয়া দোল-দুর্গোৎসব করা চলে না, বিপুল যৌথ পরিবারেরও প্রতিপালন হয় না; কোনরূপে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি লইয়াই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। পৈতৃক গৃহাদি সংস্কারও অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের উদাহরণ দেখিয়া দেশের অশিক্ষিত লোকেরা নানা হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে

বা সাহায্য করিতে শিখিবে, তাঁহারাই যদি দেশত্যাগী হইয়া গ্রামের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখেন, কিম্বা দেশে থাকিয়াও উপকার করা দূরে থাকুক নানারূপ মামলা-মকর্দ্দমা ও কলহ-বিবাদে পল্লী-জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে শুধু দুইচারি-জন পরহিতব্রত ব্যক্তি ও গবর্ণমেণ্টের পরি-দর্শনকারী কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম কিছুতেই নন্দন কাননে পরিণত হইতে পারে না। এই ত গেল ভদ্রলোকদিগের কথা। এখনও বঙ্গদেশে কৃষক ও শ্রমজীবিগণ আপনাদের বাসস্থান ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া সহরে আসিতে সুরু করে নাই। রেল-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা হওয়ায় সময় সময় বাঙ্গালী 'মুনিষ' মজুরেরা ধান-কাটা, মাটি কাটা প্রভৃতি কাজের চেষ্টায় এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানী কুলিগণের ন্যায় তাহারা দীর্ঘকাল বাড়ী ছাড়িয়া বা সপরিবারে স্থায়ীভাবে কর্ম্মস্থানে আসিয়া বাস করিতে প্রস্তুত নহে। কলিকাতার অনতিদূরে ভাগীরথী-তীরে ও পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের পার্শ্বভাগে যে-সকল পাট-কল দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির সন্নিকটস্থ জঘন্য কুলি-নিবাস সমূহের অবস্থা দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয় বুঝি বা কল-কারখানা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য Slumএর ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও দুর্নীতি-সঙ্কুল কুপল্লীসমূহের সৃষ্টি হইয়া পড়ে! বিলাতে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক, তাই শ্রমজীবী-গণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা অনেক মহানুভব ইংরাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া থাকে। কুলিদিগের বাসস্থানের অবস্থা দেখিয়া অধ্যাপক গেডিজ (Prof. Geddes) ঘুণীর কুম্ভকারগণের দ্বারা কুলি-লাইন ও কৃষক কুটীরের ক্ষুদ্র আদর্শ বা "মডেল" (model) তৈয়ারির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সভ্যতার আলোক-সংস্পর্শে আসিয়া কুলি লাইনে বাস করা অপেক্ষা তাহাদিগের পল্লীকুটীরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণগৃহে বাস যে কত গুণে ভাল, তাহা এই 'মডেল'গুলি দেখিলেই শিক্ষিত সমাজ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বেও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভারত-বাসীগণের দৃষ্টি সহরের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ভারতীয় অর্থ-নীতির জন্মদাতা ৺মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "The progress of ruralization in modern India means its *rustication.*" অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রতিযোগি-তার ফলে যদি দেশের শিল্পী ও কারিকরেরা সহর ছাড়িয়া পল্লীতে গিয়া আশ্রয় লয় তাহা হইলে সে গতি অবনতির পথে চলি-য়াছে, বুঝিতে হইবে—তাহা হইলে লোকের কর্ম্ম-কুশলতা, বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাবলম্বন-শক্তি সমস্তই লোপ পাইতে থাকিবে। প্রতি-যোগিতায় অপারগ হইয়া শিল্পীগণ কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিলে তাহা দোষের কথা, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার স্রোত স্বতঃই পল্লীমুখী হইলে তাহাতে আনন্দ বৈ দুঃখের কারণ দেখি না। (১)

---

(১) এ সম্বন্ধে মতভেদ কিন্তু এখনও মিটিয়া যায় নাই। ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

আমরা এখন দায়ে ঠেকিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে পল্লীর উন্নতি না হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন বৈষয়িক উন্নতি একবারেই অসম্ভব। ধরিতে গেলে পল্লীর ধনোৎপাদন-সামর্থ্যই আমাদের দেশে অর্থনীতির প্রধান কথা। পল্লীগ্রামগুলির ধনোৎপাদন-শক্তি যদি উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে প্রায়শঃ পল্লীসমষ্টি-গঠিত এই বিশাল ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িবে।

পল্লীতে বাস করিতে হইলেই যে কৃষি-কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ এখনও বঙ্গদেশের অনেক গণ্ডগ্রামে শিল্পী ও কারুজীবীর সংখ্যা বড় কম নয়। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী থাকা আবশ্যক এ কথা এখন প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। মহীশূরের স্যর্ মোক্ষগুণ্ডমও ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়াছেন, গ্রামের প্রতি ৫০-জন লোক-পিছু তাঁত চালান, বাসন তৈয়ারি, বা চামড়া কষ করার ন্যায় একটি করিয়া শিল্প বা কারবার প্রচলিত থাকা একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদেশের কয়েকটি গ্রাম্য শিল্পের কথা ধরা যাক। মুর্শিদাবাদে ও মৃজাপুরে রেশমীবস্ত্র ও শঙ্খবলয় যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। নদীয়ার ডাঁইহাট মাটিয়ারি কাঁসার বাসনের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সকল কারবারে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কেহ কেহ বেশ দুইপয়সা সঞ্চয়ও করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত 'লাহা' বা গালা প্রস্তুত (lac industry) এবং তাহা হইতে খেলনা চুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ, চিনি ও গুড়ের ব্যবসায়, তসর ও এণ্ডি উৎপাদন, শোলা ও ডাকের সাজের কাজ (tinsel industry), পাটি ও চাটাই তৈয়ার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায় পল্লীগ্রামে চলিতে পারে এবং চলিতেছেও। মধুমক্ষিকা পালন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই কিন্তু আধুনিক প্রথায় মক্ষিকা-বাস নির্ম্মাণ করিয়া কিরূপে মধু সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা কীটতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সেদিন রামমোহন লাইব্রেরিতে বক্তৃতা-কালে ভালরূপেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন পল্লী-শিল্প ও কারবারের কথা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নব-প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থে (২) বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার পুস্তকের প্রথমাংশ হস্ত-শিল্পের কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি কি আধুনিক উপায় অবলম্বনে এই সকল গৃহশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা

মত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "... there was a tendency for a larger and larger proportion of the people to become rural. Of recent years however there has become discernible a tendency working in the opposite direction and towns are once more beginning to take their proper place as centres of thought, culture and industry in the life of the naticn. (Indian Economics. p. 28)

(২) Foundations of Indian Economics. Longman's 1916—9 shillings (Rs. 9) PP. XXVI 515.

যাইতে পারে, তাহা পল্লীর হিত-কামী চিন্তা-শীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

কল-কারখানার জন্মস্থান ইউরোপেও গৃহ-শিল্প একবারে লোপ পায় নাই। বস্তুতঃ দেখা যায় যে কল-কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ্রেণীর উটজ শিল্পেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবুর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে ইউরোপে একক কারিকরের সংখ্যা কমিয়াছে বটে কিন্তু ১ হইতে ৫ বা ৬ হইতে ৫০ জন শ্রমজীবী লইয়া যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার-খানা চালানো হয়, তাহার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শুধু জর্ম্মনিতে এইরূপ একক শ্রমজীবী ও ছোট কারখানার কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নের অঙ্কগুলি হইতেই সহজে উপলব্ধি হইবে।

	১৮৮১ খৃঃঅঃ	১৮৯৫ খৃঃঅঃ	১৯০৭ খৃঃঅঃ
একক শ্রমজীবী— ...	১,৪৩০,০০০	১,২৩৭,০০০	৯৯৫০০০
১ হইতে ৫ জন লইয়া ছোট কারখানায়— ...	৭৪৬,০০০	৭৫৩,০০০	৮৭৫,০০০
৬ হইতে ৫০ জন লইয়া ছোট কারখানায়— ...	৮৫০০০	১৩৯০০০	১৮৭,০০০

নিছক হস্তশিল্প ত আছেই, তাহার উপর অল্পব্যয়সাধ্য গ্যাস ও অয়েল এঞ্জিনের আবিষ্কারের সহিত, এই সকল ছোট কারখানা ইউরোপের পল্লীতে সহজেই স্থান পাইয়াছে। শুধু জর্ম্মনি বলিয়া নহে, ফরাসী দেশে ও সুইজারলণ্ডে খেলনা নির্ম্মাণ, লেস্ তৈয়ারী, কাটা কাপড় প্রস্তুত প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর গৃহ-শিল্পের 'উত্ত-রোত্তর' শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ফরাসী দেশে কাটা কাপড় ত পল্লীগ্রামেই অধিকাংশ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কলিকাতার উপকণ্ঠবাসী মেটিয়া-বুরুজের দরজীরাও নিজগৃহে পোষাক প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার ব্যবসায়ীগণকে সরবরাহ করে। পল্লীগ্রামে তুন্নবায় শিল্প (Tailoring) শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর কাটা কাপড় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রস্তুত হইয়া ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন যদি ভালরূপে করা হয় তাহা হইলে বেলডাঙ্গার ব্লাউস বা কান্ত নগরের ফ্রক্ ফরাসডাঙ্গার ধুতির ন্যায় কেন যে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে না, তাহা ত বুঝিতে পারি না। সুতরাং পল্লীতে বাস করিতে গেলে ক্রমহ্রাসমান্ উৎপাদিকা শক্তির (law of diminishing returns) নিয়মান্তর্গত কেবল যে কৃষিকার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে, এমন নয়।

কলের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে গৃহ-শিল্প একেবারে বিনাশ পাইতে পারে না, তাহা দেশী কলের বস্ত্রের তুলনায় তাঁতের বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনা করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। ১৯০৫-৬ সালে ১৫০ ¼ লক্ষ পৌণ্ড (পৌণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের পরিমিত ওজন) দেশীয় কলে নির্ম্মিত

১৯০৮-৯ সালে উহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া যথা-ক্রমে ১৮৩০¾ লক্ষ, ১৮৭০¾ লক্ষ ও ২১৭০½ লক্ষ পৌণ্ড পরিণত হয়। এই কয় বৎসরে তাঁত নির্ম্মিত বস্ত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি নিম্নলিখিত পাদটীকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবেঃ—(Vide p. 152-3 R. K. Mukherji's Foundations of Indian Economics)

১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯
২৫২০	২৬৮০½	২৫৬০½	২৫৭০½
লক্ষ পৌণ্ড	লক্ষ পৌণ্ড	লক্ষ পৌণ্ড	লক্ষ পৌণ্ড।

১৯০৯-১০ সালে তাঁতের বস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দর বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতের কাপড় যে পুনরায় অধিক পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে ও তাহার কাটতিও যে বাড়িয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় অন্যায় হইবে না। অবশ্য ইহা হইতে এ কথা বলা চলে না যে, ক্রমে তাঁতের কাপড় পুনরায় কলের কাপড়ের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে কাপড়ের কল, পাটের কল, লৌহ ইস্পাতের কারখানা প্রভৃতি কালে বাড়িবে বৈ কমিবে না; তবে অল্প মূলধন-সাধ্য এঞ্জিন প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমবায়-পৃষ্ঠপোষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানা পল্লীগ্রাম-সমূহেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া ক্রমশ সমধিক সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। (৩) কারখানা যতই বাড়িতে থাকে supplementary demand বা ন্যূনতা-পরিপূরক প্রয়োজনের জন্য ছোট শিল্পেরও যে ততই প্রয়োজন হয়, এ কথা ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝা যায়। ইউরোপে কল প্রতিষ্ঠার সহিত অনেক সরকারী হস্ত-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং কল বসিলে সকল হস্ত-শিল্পই যে লোপ পাইবে, এমন নহে। জাপান এখনও "ছোট কারখানার" দেশই রহিয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্র এখনও হস্তে নির্ম্মিত হইতেছে। বাঙলায় মটকার বস্ত্র বয়নও এইরূপ একটি কল-ভয়-বিহীন শিল্প বলিয়া মনে হয়। যে সকল রেশম কোয়া রেশম-কীট কর্ত্তৃক বিদীর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, মুর্শিদাবাদ চক্ ইশলামপুর প্রভৃতি স্থানে তাহা হইতেই সূত্র বাহির করিয়া মট্কা কাপড় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এরূপ কাটা Cocoon (কোয়া) কারখানার ব্যবহারে আসে না, কিন্তু গৃহ-শিল্পের কল্যাণে সেগুলিও কাজে লাগিয়া যায়। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে বহু স্থলে কাগজ প্রস্তুত হইত। মুর্শিদাবাদ জেলার পুরাতন সরকারী কাগজ-পত্রে দেখিয়াছি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের কালেক্টারগণ লালবাগের নিকটস্থিত চুনাখালির কাগজের জন্য মুর্শিদাবাদের কালেক্টার সাহেবকে মধ্যে মধ্যে তাগিদ দিতেন।

(৩) সমবায়-প্রথার উপর ছোট গ্রাম্য শিল্পশালাগুলির স্থায়িত্ব যে অনেকাংশেই নির্ভর করিতেছে সে কথা ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে জাপানী শিল্পের উন্নতির আরও দুইটি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা (১) কর্ম্মীগণের দক্ষতা ও (২) বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসাইয়া সংরক্ষণ-প্রয়াস (the protection given to them by the state through the system of high tariffs)

এখন চুনাখালি আম্রবাগিচার জন্যই প্রসিদ্ধ। খুঁজিয়া একজনও "কাগজী" পাওয়া যায় কি না সন্দেহ! অবশ্য খবরের কাগজ ও ছাপাখানার সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের প্রয়োজনও এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধু হাতে-তৈয়ারী কাগজে সমগ্র বঙ্গদেশের টান (demand) পূরণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় কিন্তু তাই বলিয়া হাতে-তৈয়ারী কাগজের যে কাট্‌তি হইবে না, এ কথা বলা চলে না। মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছি, প্রাচীন শ্রেণীর দোকানদারগণ এখনও দেশী কাগজ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে হিসাবের খাতা বাঁধিয়া হিসাব লেখেন। তাঁহারা বলেন, এ কাগজ কলের কাগজ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছিলাম এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণের দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত চিঠির কাগজ ও খাম অনেকেই ব্যবহার করিতেন; এমন কি পুরাতন "ভারতী"র কভারও সেই হরিদ্রাবর্ণের তুলোট কাগজের দিব্যশ্রীতে-ভূষিত হইত। বিলাতি হাতে-তৈয়ারী চিঠির কাগজ (hand-made stationary) আমাদের সৌখীন সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। বিলাতী প্রথার অনুকরণে জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহেরও hand-made paper edition (হস্ত-নির্ম্মিত কাগজের সংস্করণ) হয়ত অল্পদিন মধ্যেই আমাদের পুস্তক-প্রিয় ব্যক্তি-গণের নিকট আদর পাইবে। মোটকথা, আধুনিক প্রথায় আধুনিক রুচি-অনুযায়ী এরূপ কাগজ তৈয়ার করার ব্যবস্থা হইলে তাহার বাজার পাইতে বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ প্রকার হস্তশিল্প-সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য ব্যবসায় লাভজনক করিতে হইলে co-operative production বা সমবায় উৎপাদনের সহিত co-operative distribution সমবায় কাট্‌তি বা বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা আবশ্যক, নতুবা পাইকার শ্রেণীর (middle man) মধ্যতন্ত্রের লোকই লাভের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া ফেলিবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

পল্লী-উৎসব

(চিত্র)

সহুরে ছেলে সন্তোষ তার বোনের শ্বশুরবাড়ী বেলডাঙ্গা গ্রামে বারোয়ারী উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। আজ বেলডাঙ্গা-বাসী সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা;—একপ্রকার জ্ঞানশূন্য বলিলেই হয়। আজ গ্রামের জমিদার-পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া চৌকিদার-পুত্র পর্য্যন্ত সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়াছে। সকলেই বেশ শক্ত করিয়া "মালকোঁচা" আঁটিয়া কাপড় পরিয়াছে। কাহারও কাঁধে "তোয়ালে", কাহারও কাঁধে "গামছা," সকলে সেই ঢাকের বাজনার সঙ্গে উন্মাদের মত লাফাইতে লাফাইতে, ঠাকুর-বাড়ী হইতে

ঠাকুর আনিতে চলিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধ-সম্প্রদায়, কোন বিষয়ে চোখ-কাণ দিবেন না। পিতার সাক্ষাতে পুত্র মদ খাইলেও পিতা সেখান হইতে সরিয়া যাইবেন। আজ কেহই রিক্তহস্তে নাই; কাহারও হস্তে সদ্য-আহরিত বৃক্ষশাখা, কাহারও হস্তে তৈলপক্ক যষ্টি, কাহারও হস্তে-বা তিন-চারিটা পরিপূর্ণ মদের বোতল।

চারিজনের স্কন্ধে একখানি "চতুর্দ্দোলা"; তাহাতে ঠাকুর যাইবে। সকলেই আনন্দে চীৎকার করিতেছে। নেশার ঝোঁকে কেহই স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, সকলেরই পা টলিতেছে। সকলের চীৎকারে ও ঢাকের গর্জ্জনে এক তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন বলিষ্ঠ পল্লীবাসীর এই উন্মত্ততা দেখিয়া সন্তোষের মুখ শুকাইয়া আসিল। সন্তোষ নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" পড়িয়া মনে মনে তাহার যে ছবি আঁকিয়াছিল, আজ এই পল্লী-উৎসবের নিকট তাহার সে চিত্র ম্লান বলিয়া বোধ হইল।

ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কিছু-ক্ষণের জন্য "বাজনা" থামিল।

পুরোহিত-মহাশয় ঠাকুর লইয়া আসিয়া "চতুর্দ্দোলায়" চাপাইয়া দিলেন। ঠাকুর আসিবামাত্র সকলে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"বাবু আসছে," "বাবু আস্‌ছে" বলিয়া একটা মস্ত সাড়া পড়িয়া গেল। সন্তোষ প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না। তারপর দেখিতে পাইল, অদূরে একজন অতি সুন্দরকায় যুবক টলিতে টলিতে আসিতেছে। যুবকের সৌন্দর্য্যে কোথাও খুঁৎ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধব্‌-ধবে ফরসা রং; আকৃতি কিঞ্চিৎ কৃশ। ললাটের উপর কুঞ্চিত কেশদাম আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যুবককে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। যুবকের স্কন্ধে একখানি "তোয়ালে" আলুথালু পড়িয়া আছে। পশ্চাতে একজন দ্বারবান প্রকাণ্ড একগাছি যষ্টিস্কন্ধে ধীরে ধীরে আসিতেছে। "অমৃত" অত্যন্ত মাতাল হইয়াছে দেখিয়া, অমৃতর মা একজন দ্বারবানকে তাহার পশ্চাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অমৃত এই বেলডাঙ্গা গ্রামের জমীদার নসীরাম দত্তের একমাত্র পুত্র।

অদূরে অমৃতবাবুকে আসিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্য হইতে একজন ছুটিয়া গিয়া, অমৃতকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিল। তখন আবার একটা বিষম কোলাহল উঠিল।

অমৃতবাবু আসিয়া চীৎকার করিয়া হুকুম দিলেন, "এই, সব চুপ!" শব্দ অর্দ্ধ-উচ্চারিত হইবামাত্র সেই বিরাট কোলাহল—এমন-কি, শিশুদিগের ক্রন্দন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। সেই উত্তাল তরঙ্গ-কল্লোলবৎ জন-কলরব অমৃতবাবুর এক কথাতেই শান্তভাব ধারণ করিল।

অমৃতবাবু পুনরায় কহিলেন, "এই, সবাই শোনো,"—মত্ততাহেতু তাঁহার কথাটা জড়াইয়া বাহির হইল।

সন্তোষ ভাবিতে লাগিল, অমৃতবাবু

আসিয়া এ গোল বন্ধ করিয়া দিলেন, হয়ত আজ একত্রে এত লোক জড়ো হইয়াছে, এই সুযোগে একটা-কোনো সাধারণ লোক-হিতকর সৎকর্ম্মের প্রস্তাবনা হইবে। সন্তোষ খুব উৎসাহিত চিত্তে "লেক্‌চারে"র অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অমৃতবাবু কহিলেন, "দেখ, এখন সব চুপ, আমি যেই বল্‌বো অম্‌নি সবাই মিলে বাজাবি আর হৈহৈ করে নাচবি।" মুখের কথা খসাও যা, কাজেও তাই। সন্তোষ বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

ঠাকুরবাড়ী হইতে যে স্থানে গ্রাম্য দেবীকে আনিয়া পূজা করা হয়, সে স্থানটির নাম "পূজাতলা"। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে;—আর তাহার কিয়দ্দূরে বাঁধা ঘাটওয়ালা এক প্রকাণ্ড পুকুর। সেই বটগাছের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানটুকু খুবই বিস্তৃত ও পরিষ্কার। বর্ণিত "পূজা-তলায়" আজ বিস্তর লোক জমায়েৎ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে একটি করিয়া নিরীহ অজ-শিশু রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ। অসহায় ও বধ্য অজশিশু-গুলি লোকের চীৎকারে, প্রচণ্ড জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে, আর কামানের ন্যায় শব্দায়মান "বোমে"র আওয়াজে প্রায় মর'মর' হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিছুদূরে পৃথক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া জনকতক লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই গায়ে এক-একটা বোতাম-ছেঁড়া পকেট-ঝোলা গরম কাপড়ের ময়লা কোট; কাঁধে একখানি করিয়া ময়লা শত-ছিদ্র সুতার চাদর ও হাতে গাঁটতোলা পাকা বাঁশের লাঠি। তাহাদের লম্বা জুল্‌পি দিয়া তৈল ঝরিতেছে। ইহাদের নিকটে একটি বিপুল-শৃঙ্গ বিরাটকায় মহিষ বাঁধা রহিয়াছে। মহিষটির পৃষ্ঠদেশে সিন্দুর ও অন্যান্য কি-সব মাখানো হইয়াছে।

ইহারও কিছু-পূর্ব্বদিকে একটি চারা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কপালে সিন্দুর, হাতে দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। ইহাদের নিকটে একটি ক্ষুদ্রকায় শূকর-ছানা কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে।

ইহা ব্যতীত ছাগল ও ভেড়া যে কত আসিয়াছে ও আসিতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

পূজা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় গ্রামের শূদ্রসম্প্রদায়ের দা'ঠাকুর কেদার ভট্‌চাজ আপত্তি তুলিলেন, "রাইচরণ মণ্ডলের পাঁঠা আমি কিছুতেই উৎসর্গ করব না, কারণ সে আমার জমির জল কেটে নিয়েছে। ওকে জাতিচ্যুত করব তবে আমার নাম কেদার ঠাকুর।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাইচরণ মণ্ডল কাঁদকাঁদ স্বরে অমৃতবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু, আমার পাঁঠা তো বোধ হয় বলি হন্‌ না, তুমি যা হয় করুন আজ্ঞে।"

অমৃতবাবু বলিলেন, "ওহে রাইচরণ, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তুমি পাঁচটা টাকা জরিমানা দাও, আমি তোমার পাঁঠার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

এই কথা বলিবামাত্র রাইচরণ অমৃত-

বাবুর পদতলে পড়িয়া টাকা দিতে স্বীকার করিল এবং তাহার মানসিকের পাঁঠাটির ব্যবস্থা করিবার জন্য বারবার অনুনয় করিতে লাগিল। অমৃতবাবু তখনই কেদার ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া রাইচরণের পাঁঠা উৎসর্গ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। কেদার ঠাকুর অগত্যা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে রাইচরণের পাঁঠার কাণ ধরিয়া জলের ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরই এক নূতন বিপদ বাধিল। গ্রামের দুইপাড়ার ছোটলোকের মধ্যে কাহার পূজা আগে হইবে, তাহা লইয়া মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে সেই বচসা দাঙ্গায় পরিণত হইল। দুই পাড়াতেই ছোট লোক বিস্তর, প্রত্যেকেই বেতর মাতাল হইয়াছে। সকলেরই হাতে লাঠি। সুতরাং দাঙ্গার অঙ্গহানি হইবার পক্ষে কোনই সম্ভাবনা নাই। খুব জঁাকালো রকমেই দাঙ্গা আরম্ভ হইল।

সন্তোষ আর স্থির থাকিতে পারিল না;—ছুটিয়া গিয়া অমৃতবাবুকে বলিল, "অমৃতবাবু, আপনি বললে এক কথায় মিটে যাবে, দাঙ্গা মিটিয়ে দিন্, নয়ত এখনি একটা খুন হয়ে যাবে।"

অমৃতবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "মশাই, আপনারা সহরের লোক, আপনারা তো জানেন না, মেটালে চলবে কেন? একটু পাকাপাকি রকম হোক,নইলে—"কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দাঙ্গার মধ্য হইতে, বলিষ্ঠকায় পদতলে পড়িয়া বলিল, "বাবু, হুকুম দিন্।"

এই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা ছুটিতেছে;—পরিহিত বস্ত্রখানির প্রায় বারোআনা রকম রক্তে লাল-টকটকে হইয়া গিয়াছে;—মাথার একজায়গা কাটিয়া গিয়া, রক্তের ধারা কপাল বহিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

সন্তোষ ইহার পূর্ব্বে, এমন দৃশ্য কখনও চক্ষে দেখে নাই। "ডি, এল, রায়ের" নাটক দেখিবার সময় এক একবার "রক্ত" "রক্ত" বলিয়া চীৎকার শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভীষণ রক্তারক্তি যে কি, সে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। আজ চোখের সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুক কেমন ধড়ফড় করিতে লাগিল।

আজ রাত্রে বারুদ পোড়ান হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে "তুবড়ি", "বোম", "হাউই" "আকাশতারা" প্রভৃতি বাজিগুলিকে যথা-স্থানে রাখা হইতে ছিল। প্রতি বৎসরই এই বেলডাঙ্গায় বারোয়ারি পূজায় বারুদ পোড়ানো উপলক্ষে পুলিশ মোতায়েন থাকে। পুলিশ আর কেহ নয়,—গ্রামেরই নিতাই হাড়ি চৌকিদার, পলাশপুরের শ্যাম সামন্ত দফাদার, আর ঐ গ্রামেরই হরি মান্না কনষ্টেবল।

তাহারা পোষাক পরিয়া যন্ত্রতন্ত্র লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অমৃতবাবু যখন বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোরা কি অম্‌নি করে সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে

বয়ে দিগে যা না।" অমনি অবিলম্বে চৌকিদার, দফাদার ও কনষ্টেবল স্ব স্ব পোষাক ছাড়িয়া সকলের সঙ্গে বারুদ বহিতে সুরু করিল।

সন্তোষ এই সব দেখিতেছে এমন সময় একজন লোক সন্তোষের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবু, নাচ দেখবে?" বলিয়াই সে বিকট তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিল। সন্তোষ ত দেখিয়া অবাক! এই ব্যক্তিকেই যে কাল সে এক মজলিসে বেশ ভদ্রভাবে কথা কহিতে দেখিয়াছে; আর আজ মাতাল হইয়া সে "নাচ" দেখাইতে আসিয়াছে!

ক্ষণপরেই গ্রামের ধারে মাঠে, এক প্রশস্ত জায়গায় বাজি-পোড়ানো আরম্ভ হইল। বোমগুলি ব্যোম বিদীর্ণ করিতে করিতে যেন ভীষণ প্রাণের জ্বালায় ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এক-একটা তুবড়ি অগ্ন্যদগারী পর্ব্বতের ন্যায় অজস্র অগ্নিকণা তীব্র ফুৎকারে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা "আসমান-তারা" দিগন্তের কোলে প্রধাবিত হইয়া নিজের অন্তর-পোষিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গগুলিকে ছড়াইয়া দিয়া একটা ম্লান হাস্যের ক্ষীণ জ্যোতিতে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

এই সমস্ত দৃশ্যে সন্তোষ তন্ময় হইয়া ছিল; এমন সময় একটা চীৎকারে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল;—সে দেখিল, গ্রামের মাঠের দিকের একখানি কুঁড়েঘর ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সন্তোষের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইবামাত্র এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে সারা গ্রাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলেই "আন্ জল্" "ঢাল্ জল্" শব্দে চীৎকার করিয়া দৌড়িল। জনতার মধ্য হইতে জহর ডোম এক লম্ফে, সেই উত্তালতরঙ্গসমাকুল সমুদ্রবৎ লেলিহান-জিহ্ব অগ্নি-মধ্যে পতিত হইল এবং বিপুল বিক্রমে অগ্নিরাশিতে জল ঢালিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল অগ্নির বিক্রম অপেক্ষা জহরের বিক্রম অনেক বেশী। নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া সকলে জহরকে জল যোগাইতে লাগিল, জহর "মটকা" হইতে হুড়হুড় শব্দে জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন সকলে একসঙ্গে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

পরদিন সন্তোষ বাড়ী ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময় তার বোন নীহার বলিল, "দাদা, তুমি আজ যাবে বলছো বটে, কিন্তু আর একদিন থাকলে ভাল হত। কাল অমৃতবাবুর সখের দলের যাত্রা হবে।"

সন্তোষ কহিল, "সখের দল কেমন অভিনয় করে?"

নীহার বলিল, "অভিনয় করে মন্দ নয়, তবে বড় বেশী গোল করে। এমন-কি সময়ে সময়ে হাঁক-ডাঁকের চোটে পাল্লা ভেঙ্গে যায়।"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "বটে, তাহলে অভিনয় যত হোক আর না হোক মজা দেখবার জন্যে আমায় থাকতে হবে!"

অমৃতবাবুর বৈঠকখানাটি বেশ সুন্দর

সাজানো। ঘরের বাহিরে চারিধারে জাফরির বেড়া দেওয়া ফুলবাগান। বাগানটি বেশ মনোরম। ঘরের ভিতর একধারে তিনটি আলমারি পুস্তক-ভারে প্রপীড়িত। অন্যধারে সাত-আটটি কাঠের সিন্দুকে যাত্রার দলের সাজ-পোষাক। বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

সন্তোষ ধীরে ধীরে গিয়া বৈঠকখানায় উঠিল। ঘরের ভিতর অনেকগুলি লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সন্তোষকে আসিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। অমৃতবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সন্তোষের হাত ধরিয়া বলিলেন, "আসুন মশাই, আপনি যে আবার এই "ন চ্যাংড়ার" আড্ডায় পদার্পণ করবেন, এটা ভাবিনি।" সন্তোষ অমৃতবাবুর এই নিরহঙ্কার আলাপে বিশেষ তুষ্ট হইল। উভয়ে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে, সন্তোষ কহিল, "মশাই, আজ আমি যাচ্ছিলুম, তবে শুনলুম যে আপনাদের সখের যাত্রার দলের অভিনয় হবে, শুধু তাই শোনবার আগ্রহে আজকের দিনটা থেকে গেলুম। আর আমার ভগ্নীও তাই আজ যেতে দিলে না।"

অমৃতবাবু সহাস্য বদনে কহিলেন, "মশাই, আপনার ভগ্নী যে আমার দিদি হন্। দিদি আমার ভাইয়ের মনের কথা বুঝেই আপনাকে যেতে দেন্‌নি। আপনি তো কলকাতায় কত বড় বড় অভিনয় দেখেছেন, আর আজ এখানে আপনাকে এক নূতন অভিনয় দেখাব—"

সন্তোষ কহিল "আপনাদের এ সমিতি

অমৃতবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "মশাই! এ সমিতি-টমিতি কিছুই নয়, এর নাম হচ্ছে 'ন বিভ্রাটের সখের দল'।"

সন্তোষ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "সে আবার কি?"

অমৃতবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তবে শুনুন, সখের দলে স্বভাবত ন'টি করে বিভ্রাট ঘটে থাকে। প্রথমতঃ—গোঁপ-বিভ্রাট—অর্থাৎ কেউ স্ত্রী-লোকের ভূমিকা গ্রহণ করতে চায় না। দ্বিতীয়তঃ—"পার্ট-বিভ্রাট"—অর্থাৎ কেউই হনুমান কি রুগ্ন ব্যক্তির ভূমিকায় নামতে চায় না। তৃতীয়তঃ—"পোষাক বিভ্রাট"—অর্থাৎ সখের দল, কেউ কারও মাইনে খায় না, সকলেরই ইচ্ছা, নতুন পোষাক পরে অভিনয় করে;—বিশেষতঃ "টেল্' বা পৃষ্ঠ-আচ্ছাদনীর উপর অনেকেরই লুব্ধ দৃষ্টি। চতুর্থতঃ—"সম্বন্ধ-বিভ্রাট" অর্থাৎ কারও হয়ত সহোদর ভাই, তারা স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় "নাথ" "প্রিয়তম" ইত্যাদি সম্বোধনে রাজি নয়। পঞ্চমতঃ—"ভূমিকা-বিভ্রাট" অর্থাৎ যারা নাটকোক্ত যুদ্ধাদিতে জয়ী হবে, যেমন অর্জ্জুন, ভীম, রাম ইত্যাদি, সকলেরই সেই ভূমিকা নেবার ইচ্ছা। ষষ্ঠতঃ—"শ্রোতা-বিভ্রাট"।" গ্রামের দল শুনে কেউ শুনতে যাবে না, অনেককে খোসামোদ করে', সম্ভব হলে ধমক-ধামাক দিয়েও আসরে বসাতে হবে। সপ্তমতঃ—"মস্ত-বিভ্রাট"। কেউ বলবে আমি পেলুম না, আবার কেউ বা বমি করতে থাকবে। অষ্টমতঃ—"উচ্চপদ-বিভ্রাট"—দলের বাঁকী

ইচ্ছা প্রোগ্রামে “অমুক মাষ্টার” বলে যেন তার নাম ছাপানো হয়। নবমতঃ “হুঁকা-বিভ্রাট”—এর মধ্যে আবার দলাদলি আছে, কেউ তামাক খেতে পেলে না, আবার কেউ-বা চব্বিশ ঘণ্টাই হুঁকোয় মুখ থুব্‌ড়ে রইল। ফলে “হুঁকো” “হুঁকো” বলে এক তুমুল কোলাহল হয়ে যাত্রা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।” এই কথা বলিয়া অমৃতবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বারোয়ারিতলার আটচালাখানিকে যতদূর-সম্ভব সাজানো হইয়াছে। দুই-একটা গ্যাসের ঝাড় শ্বেত-বর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। আর কিছুক্ষণপরেই যাত্রা আরম্ভ হইবে। গৃহস্থেরা সকলে যে-যাহার গৃহকর্ম্ম তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছে। সন্তোষ সন্ধ্যার পর চা পান করিয়া নীহারকে বলিল, “আমরা সকলেই যাত্রা শুনতে যাবো, তাহলে ঘরে কে থাকবে?”

নীহার কহিল, “কে আবার থাকবে? এখানে সহরের মত চোরের ভয় নেই, তিনদিন বাড়ীতে না থাকলেও কেউ এক-গাছি কুটো নাড়বে না।”

সন্তোষ প্রথমে বারোয়ারি-তলায় গমন করিল। সন্তোষ যাইবামাত্র দলস্থ সকলে অতি সমাদর করিয়া তাহাকে আসরের মাঝে বসাইল। অনতিবিলম্বে একটি সুগন্ধ ধূমোদ্গারী বিরাটোদর হুঁকা আসিয়া সন্তোষের নিকটে খানিকটা জায়গা দখল করিল। সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল।

একধারে খানিকটা প্রশস্ত জায়গা চিক দিয়া ঘেরা। স্ত্রীলোকেরা একে একে আসিয়া তাহার মধ্যে জায়গা করিয়া লইল। অনতিবিলম্বে চিকের মধ্য হইতে শিশু-ক্রন্দন স্বকীয় মাতৃ-আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দুই-একজন লোক “ওগো, ছেলে থামাও না গো!” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে “আখড়াই” বাজনা আরম্ভ হইল।

অমৃতবাবু সন্তোষের নিকট আসিয়া বলিলেন, “মশাই, অভিনয় যে কেমন হবে তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন? শিশুর রোদনে যার প্রস্তাবনা, তার উপসংহারে বুঝি বুড়ো পর্য্যন্ত কাঁদবে!”

সন্তোষ উচ্চহাস্যে বলিল, “না, না, আমার বোধ হয় অভিনয় খুব ভালই হবে!”

অমৃতবাবু বলিলেন, “তবে আপনি বসুন, আমি ততক্ষণ বেশকারীর কার্য্য করিগে।”

গতকল্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া যাত্রা শুনিয়া, আজ সারাদিন ঘুমাইয়া, বৈকাল বেলা কতকগুলি লোক এক জায়গায় আসিয়া জড় হইল। অমৃতবাবু পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে নানারূপ খোসগল্প করিতেছে, এমন সময় ধীরে ধীরে সন্তোষ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমৃতবাবু সাদরে সন্তোষকে বসাইয়া বলিলেন, “মশাই, কাল কেমন কেলেঙ্কারি দেখলেন?”

সন্তোষ কহিল, “কেন, কেলেঙ্কারি কেন? অভিনয় তো মন্দ হয় নি। যে লোকটি “বয়স্য” সেজে ছিল, আর যে স্বর্গের

"দেববালা" সেজে নেচেছিল তারা ত দুজন বেশ পাকা লোক।"

অমৃতবাবু বলিলেন "সন্তোষবাবু, আপনি এখনও দু'-একদিন থাকবেন তো?"

সন্তোষ শশব্যস্তে বলিল, "দু'-একদিন কি মশাই! অনেক পূর্ব্বেই যেতুম, কেবল আপনার যাত্রার অভিনয় দেখবার জন্যেই রইলুম, আর দেরি করব না।"

অমৃতবাবু সন্তোষের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না, মশাই! আমার অনুরোধ, আর একদিন থাকুন, আমি নীহার-দিদিকে বলে দিচ্ছি, তিনি যেন কিছুতেই না ছাড়েন!"

সন্তোষ তাড়াতাড়ি অমৃতবাবুর হাত ছাড়াইয়া কহিলেন, "করেন কি মশাই!"

অমৃতবাবু বলিলেন, "কাল আমাদের বাড়ী ব্রাহ্মণ-ভোজন হবে, আপনাকে থাকতেই হবে। আপনার মত একজন বিচক্ষণ লোক থাকা চাই-ই চাই।"

বেলা তখন প্রায় তিনটা, চারিধারে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, মাটি তাতিয়া লাল হইয়াছে, নগ্নপদে মৃত্তিকা স্পর্শ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা হয়। এমন সময় ব্রাহ্মণদের ডাক পড়িল। ক্ষণপরে শ্যাম ভটচায্, রাখাল মুখুয্যে, প্রসন্ন সামন্ত, ভূতনাথ হালদার, কালিদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মাতব্বর-মাতব্বর ব্রাহ্মণবর্গ, যুবক-সম্প্রদায়, বালকমণ্ডলী, এবং অন্যূন চোদ্দবৎসরবয়স্কা বালিকা, প্রত্যেকেই এক একটি ঘটি হস্তে আসিতে আরম্ভ করিল।

সংখ্যায় প্রায় একশত আন্দাজ ব্রাহ্মণ হইল, তথাপি কুলান হয় না। সন্তোষ অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, ব্যাপার কি?"

অমৃতবাবু মুখে একখানা রুমাল জড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে ছিলেন; সন্তোষের কথায় ক্ষণেক থামিয়া বলিলেন, "আপনি একবার গিয়ে দেখে আসুন।"

ইত্যবসরে তিন-চারিজন গোয়ালা দধি ও ক্ষীরের বাঁকস্কন্ধে প্রবেশ করিল।

অমৃতবাবু আসিয়া বলিলেন, "সামন্ত-খুড়ো, রাখাল দা, আপনারা দই-ক্ষীরগুলো "কুৎ" করে নিন।"

সন্তোষ বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কুৎ" কাকে বলে?"

অমৃতবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওটা আন্দাজেরই নামান্তর।"

সন্তোষ বলিল, "কেন, আন্দাজ করবার দরকার কি? ওজন করে নিন না! এর পর জিনিষ ফুরোলে পাত্রগুলি ওজন করে "কড়তা" বাদ দিলেই চলবে।"

"নাহে ছোকরা! তুমি থামো, এখুনি সব হবে।"

সন্তোষ পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিল, বিস্মাট হুঁকাহস্তে সামন্ত খুড়া ও মুখুয্যে ঠাকুরের দল আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রাখাল মুখুয্যে একটি ক্ষীরের হাঁড়ি হাতে করিয়া বলিলেন, "কত হে?"

সুধাময় গোয়ালা কহিল, "আজ্ঞে এক মোন চার সের।"

রাখাল মুখুয্যে একটু হাসিয়া উচ্চ-

বেহারের বেটা, তোর আবার দাম-দস্তুর কি ? ব্যাটা পেসাদ পেয়ে যা।” তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “লেখ হে! বত্রিশ সের।”

সুধাময় হাত জোড় করিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, “মশাই, মারা যাব, দোহাই মশায়, গলায় পা দেবেন না।”

সুধার ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্তোষ কহিল, “রাখালবাবু, ওতে যদি না দেয়, তবে না হয়——”

প্রসন্ন সামন্ত গর্ব্বস্ফীত মুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “বাবু, সামন্তর কলম একপাই নড়-চড় হবে না।”

পরক্ষণেই আর একটি হাঁড়ি পূর্ব্বোক্ত প্রকার কান্নাকাটিতে “কুৎ” হইয়া গেল। এই প্রকারে অনেকগুলি হাঁড়ি ওজন হইল। সব-শেষে একটি হাঁড়ি কুতের সময় রাখাল মুখুয্যে বলিলেন, “সাড়ে বাইশ সের।”

সামন্ত বলিলেন, “না, স' একুশ সের।” ইহা লইয়া উভয়ে ভীষণ বচসা আরম্ভ হইল। ক্রমেই মাত্রা বাড়িতে লাগিল। শেষে উভয়েরই কল্পিত কথঞ্চিৎ-সভ্য মূর্ত্তির ভিতর হইতে নৈসর্গিক পল্লী-সুলভ স্বভাবমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল! বেছুট গালাগালি! তার পর সামন্ত খুড়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে কহিলেন, “তোকে যদি সমাজ থেকে রহিত কর্ত্তে না পারি, তবে আমার নাম প্রসন্ন সামন্ত নয়! তাহলে আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি * * * *।” এই বলিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে লাঠি ঠক-ঠক করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সন্তোষ তো একেবারে অবাক!

অমৃতবাবু বলিলেন, “যাক, যা হবার হয়ে গেল, এখন উপস্থিত যে ক'জন ব্রাহ্মণ আছে, তাদের খাইয়ে দেওয়া হোক।”

সন্তোষ দেখিল, এক ব্যক্তির পাশে একখানি পাতা অনর্থক পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি যেমন কুড়াইয়া লইতে যাইবে, অমনি তৎপার্শ্বস্থ ব্যক্তি বলিল, “মশাই, ওখানি “ক্রোড়পত্র”, ওখানি আর নিয়ে কাজ নেই।” ওদিকে লুচি আসিতে আরম্ভ হইল। প্রথমত একবার তীব্রবেগে বন্ধন-কার্য্য চলিতে লাগিল। অনেকেই বলিল, “আমি লুচি খাব না, অসুখ করেছে। কেবল ক্ষীর আর সন্দেশ খাব।” কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, প্রত্যেকেরই অসুখ বেশ আশ্চর্য্যরকম সারিয়া গিয়াছে! এক একটি ছোট ছোট ছেলে আসিয়াছে, তাহাদের “কড়তা” বাদ যায় না, প্রত্যেকেই এক একটি প্রকাণ্ড “খাইয়ে”!

সন্তোষদের কলেজে সুরেন নামে একটি ছাত্র পড়িত, সে প্রায় বার-তেরখানি লুচি খাইতে পারিত বলিয়া বন্ধু-মহলে খাইয়ে বলিয়া তাহার বেশ একটু পশার-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু এখন সন্তোষ দেখিল, এই সমাজের এক একটি বালকই সুরেনের পূজ্যপাদ পিতামহ!

ভোক্তা-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে রাম ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হে শশী ভায়া! এই সন্দেশটা তোমার কেমন লাগলো? বলতে পার এর দর কত?”

শশী বাঁড়ুয্যে বলিল, “আন্দাজ, সাড়ে সাতাশ টাকা।”

রাম ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞতার চালে বলিল, "নাহে, ছাব্বিশ টাকা সাত আনা।"

সন্তোষ তাড়াতাড়ি বলিল, "থাক্, আর আন্দাজে কাজ নেই, এখনি তো ফৌজদারী বাধবে? আপনারা একটা গল্প শুনুন,—'একজন লোহার মিস্ত্রীর কাছে এক ছাত্র কাজ শিখতে আসে। ছাত্রটি অতিরিক্ত মেধার গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কৃতবিদ্য হল, এমন-কি গুরুকেও ছাড়িয়ে উঠল। মিস্ত্রীর কিন্তু তা নিতান্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। একদিন ছাত্রটি এক নতুন ধরণের কল তৈরি করে সেটা নিয়ে বাজারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল;— সামনে গুরুজিকে দেখে প্রণাম করে বললে, "আমি, কেমন একটা নতুন কল তৈরি করেছি, দেখুন।"—কল দেখে মিস্ত্রির মুখ শুকোল; তখনি সে এক বুদ্ধি খাটিয়ে বললে, "দেখ ঐখানটা একটু বাঁকা হয়েছে, আচ্ছা, আমি সেরে দিচ্ছি।" এই বলে বাজার-করা গামছার ভিতর থেকে একটি "মুলা" বার করে লোহার গায়ে দুটো ঘা দিয়ে বললে, "এইবার নাও।" ছাত্রটি হেসে বললে, "মুলোটার পান আচ্ছা শক্ত ত?" গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। তার পর যথাসময়ে ভোজন শেষ হইল।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান ভুগোলের দিগদর্শন

ভূগোল এখন আর উপেক্ষণীয় ইস্কুলের পাঠ্য বিষয়মাত্র নহে, আধুনিক জীবন-সমস্যার অনেক কথাই এখন ভূগোলের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সভ্যতার বিকাশ ও পরিপুষ্টির অনেক তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহার গবেষণার জন্য এখন বহু সমিতি ও বিভাগ সভ্যদেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুধীগণ এ বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জীবনযাত্রার সহিত যে বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহার আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এ প্রবন্ধে ভূগোলের সহিত সভ্যতা-বিকাশের সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস দিব মাত্র।

বাণিজ্য-সর্ব্বস্ব ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে ভৌগোলিক সংস্থানই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সুদূর অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভৌগোলিক আবেষ্টনই (Environment) ইয়ুরোপীয় জাতির উন্নতির পথনির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে। ইয়ুরোপীয় উন্নতির প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখিতে পাই, ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতেই প্রধানতঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহার কারণ ক্ষণকাল

চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। যে সকল দেশ সাগরের উপকূলে বিস্তৃত ও সহজে সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশ-সকলের সহিত মিলিতে পারিত, সেই সকল দেশই সকল জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থা কি দেখিতে পাই! গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিবেষ্টিত, সমুদ্র আসিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে উহার স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীসের ন্যায় শতধা-বিভক্ত উপকূল ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী আর কোন ভূখণ্ডেরই নাই। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে যে অনুকূল, তাহা একটী সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। এই অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়াই গ্রীকৃগণ একদিন ইয়ুরোপীয় সভ্যতায় আদি প্রস্রবণ ছুটাইতে পারিয়াছিলেন। এবং সেই কারণেই গ্রীস ভূমণ্ডলমধ্যে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাণী, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কেন্দ্রভূমি হইতে পারিয়াছিল। গ্রীসের পর ইয়ুরোপে ইটালীর অভ্যুদয়। দেখিতে পাওয়া যায়, ইটালী ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত, এবং সেই কারণে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশসমূহের গমনাগমন-স্থল হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের অন্তঃপাতী জাতি সকলের মধ্যে সে একাধিপত্য করিতে পারিয়াছিল। ফিলিসিয়ায় বণিক্‌গণের একান্ত অধ্যবসায় সত্ত্বেও, উক্ত দেশের বাণিজ্য কিছুকালের জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেও, পরিশেষে রোমের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। কার্থেজও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা লইয়া লাটিন জাতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালের রোমকগণের শক্তির প্রাধান্য তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক তেজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নাই, দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্যের মূলেও প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সও আটলাণ্টিক ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত। স্পেন দেশও দুই সাগরের উপকূলবর্ত্তী হওয়ায় স্পেনিয়ার্ডগণ দুই সাগরে সহজে কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল এবং বণিগ্‌জাতিগণের মধ্যে কিছুদিনের জন্য আধিপত্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাগরের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় স্পেনকে ইউরোপের অন্যান্য অংশের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে হইয়াছিল, সুতরাং স্পেনের ভাগ্যে ফ্রান্সের মত অপেক্ষাকৃত মধ্যদেশবর্ত্তিতার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই।

এইবার জার্ম্মাণীর কথা ধরা যাউক। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতির সুবিধাবশতঃ জার্ম্মাণীর পক্ষে ইয়ুরোপীয় ভূখণ্ডের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পক্ষে সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক অন্তর-বিরোধ উহার ভৌগোলিক সংস্থিতির সুবিধাগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। পরে যখন জার্ম্মাণী ধীরে ধীরে সুগঠিত একটী মিলিত জাতিতে পরিণত হইল, তখন এই প্রাকৃতিক সুবিধাগুলি তাহার বিবিধ উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। বর্ত্তমান

জগতে তাই জার্ম্মাণী একটী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য।

এই সকল উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃতিক অবস্থা জাতিসমূহের উন্নতির প্রধান সহায়স্বরূপ হইয়া থাকে। উল্লিখিত সাধারণ তথ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া অবশ্য বিশেষ অনুসন্ধান-কার্য্যও চালিত হইতে পারে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কোন কোন জাতি কি কারণে উপনিবেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কি কারণেই বা অপর জাতিসমূহ উপনিবেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা ভৌগোলিক জ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই হইতে পারে না। গ্রীকগণ যে কারণে উপনিবেশ স্থাপনায় অতিমাত্র ব্যাপৃত হইতেন, তাহা ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। যখন ইউরোপীয় জাতিসমূহের উপনিবেশ স্থাপনকার্য্য ভূমধ্যসাগর ছাড়াইয়া বহির্দ্দেশে বিস্তৃত হইল, তখন ভূমধ্যসাগরের তীরবাসী কোন শক্তিই মহাসাগরে উপনিবেশকার্য্যতৎপর জাতিসমূহের সহিত তুল্যসামর্থ্যে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। ইটালী অবশ্য কখনও উপনিবেশ রচনা-কার্য্যে যোগদান করে নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ,—যথা, পোর্টুগাল, হলাণ্ড ও দেনমার্ক নৌবিষয়ক সমৃদ্ধিতে বলশালী থাকায় বহু ঔপনিবেশিক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিল। ঔপনিবেশিক রাজ্যবিস্তারে চরম দৃষ্টান্তস্থল অবশ্য ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি অবশ্য উপনিবেশে। চারিদিকে সাগর ও তীরে তীরে বড় বড় বাণিজ্যবন্দর থাকায় অথচ ইয়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইংলণ্ডের সম্মুখে যাবতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভৌগোলিক অনুকূল অবস্থায় লালিতপালিত হইয়া ইংরাজগণ আজ নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যের সাহায্যে জগৎ জুড়িয়া আত্মপ্রাধান্য বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অভাব ও প্রতিকার

(ক্রপটকিন হইতে)

অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেক সঙ্ঘের একটি করে' সাধারণ পাকশালা স্থাপন করা উচিত; প্রতি বাড়ীতে পৃথক রন্ধনের ব্যবস্থার চেয়ে তাতে খাদ্য, জ্বালানি সামগ্রী ও পরিশ্রম কিছু কম হবে এবং সময়ও কিছু বাঁচবে। এ ব্যবস্থা অনেক দেশে অনেকবার হয়েছে এবং সুফলও যে ফলে নি তা নয়; কিন্তু এটা আমরা জনসাধারণের উপর চাপাতে চাই না, তাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপরই এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে;

এ-সম্বন্ধে ভাল ব্যবস্থা যাই হোক, সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করে' নেবে,—কারণ কোন-রকমে তাদের স্বাধীনতার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। পরণের কাপড়, শয়নের ঘর ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্বন্ধে তারা ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করবে; অবশ্য, এটা যেন কেউ মনে না করেন যে, প্রত্যেকে নিজের জন্যে ভালটি বেছে নেবে। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় না, এবং এবার তাদের বেলাই যে ইতিহাস ভিন্ন পথে যাবে তাও আমরা বিশ্বাস করি না। বলাবাহুল্য, এটা মনে রাখা উচিত যে, অনভ্যস্ত পথে যাবার দরুণ যদি কারুর কিছু ভুলচুক হয় তবে সেজন্য সেই-ই দায়ী—যদিও সে ভুল শুধরাতে সে দেরি করবে না।

জনসাধারণের চিন্তার ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে, বাসগৃহসম্বন্ধে তাদের ধারণা একটা নির্দ্দিষ্ট মতে এসে পৌঁছেছে। এতদিন বাড়ীর মালিকই বাড়ীর স্বত্বাধিকারী বলে' রাজশক্তির কাছে সম্মান পেয়ে এসেছে, কিন্তু জনসাধারণ এখন সে-কথা আর মানতে চায় না। এ মতটা কেউ তাদের উপর জোর করে' চাপায়-নি—তাদের মন থেকেই এটা উঠেছে। কেউ তাদের বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব গৃহ-অধিকারকে বোঝায়। মালিক বাড়ী তৈরি করে-নি—ছুতারের দোকানে, ইটের ক্ষেতে, কারখানায় সামান্য মজুরীতে পরিশ্রম করে' অসংখ্য লোক বাড়ী গেঁথেছে, সাজিয়েছে, বাসযোগ্য করেছে। এর পিছনে যে মোটা টাকা খরচ হয়েছে সেটাও মালিকের শ্রমসঞ্জাত নয়—কর্ম্মী-সাধারণকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বঞ্চিত করে' এই টাকা সঞ্চিত হয়েছে; কাজেই মালিকের অধিকার যে কতটুকু তা সকলেই বুঝতে পেরেছে সে বাস করে বলেই বাড়ী তার, এ কথা গায়ের জোরে বলা যেতে পারে, কিন্তু সভ্য মানুষ গায়ের জোরে সব কাজ করে না, কারণ তাহলে তাকে আবার বর্ব্বরতায় ফিরে যেতে হবে।

গ্রাম ও সহরের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি করতে কত লোকের দৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগ খরচ হয়েছে, কিন্তু একজন বা একদল মাত্র লোক যে তার ফলভাগী হবে, এ কথাটা সভ্য মানুষের মুখে ভারি অদ্ভুত বলে মনে হয়; নিতান্ত অবিচার না করে' কেউ এর ছোট স্থানটুকু আত্মসাৎ করতে পারবে না। সহরের বড় বড় অট্টালিকা থাকতে কর্ম্মী-সম্প্রদায় এতদিন দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাময় কুটীরে বাস করেছে এবং তাদের সামান্য আয় থেকে অশনবসনহীনতার কষ্ট স্বীকার করে ও মালিককে কর যুগিয়েছে; আমাদের ঈপ্সিত পরিবর্ত্তনের ফলে এ অবিচারের মূলোচ্ছেদন হবে, নিশ্চয়। কার্য্যকরী-সমিতি বা থিওরীবাজ সাধারি দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না-রেখে জন-সাধারণের কাছে এ-কথা প্রচার করতে হবে এবং যখন সকলের মনে ধারণাটা বেশ বদ্ধমূল হয়ে উঠবে, তখন আমাদের কাজ বিনা-বাধায় সম্পূর্ণ হবে। যারা মালিকদের ক্ষতিপূরণের বা তৎসম্পর্কীয় কথা নিয়ে চীৎকার করবে তাদের কথায় কর্ণপাত করবার কোন দরকার দেখি না—

ক্ষতি যা করবার তারা তা করেছে, এবার তার শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন এই, কেমন করে' এই চিন্তাকে কাজে প্রকাশ করা যায়? আমরা বিশ্বাস করি জন-সাধারণের মানসিক ও দৈহিক শক্তির সাহায্যে এটিকে সম্পূর্ণ বাস্তব করে' তোলা যায়, তাছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর নির্ভর করলে ফল ত হবেই না বরং অপকারের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। এ বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ বিধি নির্দ্দেশ করব না বা কোন খুঁটিনাটির তর্ক তুলব না, কারণ কার্য্যক্ষেত্রে এর-চেয়ে সুন্দর ও সহজ নিয়মে অনেক বড় কাজ সাধিত হবে; আমরা কেবল একটা আভাস দিতে চাই।

খাদ্যসংগ্রহে স্বেচ্ছাসেবক দল যা করবেন, গৃহ-অধিকারসম্বন্ধে সেই একই কথা। তাঁদের তালিকায় সহরের সমস্ত বাড়ী ও প্রত্যেক বাড়ীর ঘরের সংখ্যা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের সংখ্যাও সংগৃহীত হবে। প্রতি পল্লীতে একটি করে' দল গঠিত হবে এবং প্রত্যেক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ থাকবে, তাহলে কাজটা সত্বর সম্পূর্ণ হবার যথেষ্ট সুবিধা হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেলে দেশের লোক নিজেদের দরকারমত ঘর দখল করবে—মারামারি না করে'ও শান্তি ও সদ্ভাবে কাজটি চলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, তাহলে ত সবাই ভাল ঘর বা বেশী জায়গা চাইবে!—না, জনসাধারণের মনের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন, ন্যায্য অধিকার ছাড়া তারা দেবার স্পর্দ্ধা তারা কোনদিন করে-নি—অসম্ভবের মোহে তারা কোনদিনই অন্ধ হয়-নি। তর্কবাগীশরা যাই বলুন, হঠাৎ যে ইতিহাসের ধারা বদলাবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমাদের মাথায় ত আসে না। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহঙ্কার বা আত্মসর্ব্বস্বতা যে নেই, এমন কথা আমরা বলি না; কিন্তু সে সবগুলো ফুটে উঠে—যখন সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের কথা সভা-সমিতির বৈঠকে গিয়ে পড়ে। যখন একটা দল জনসাধাররের কাজের ভার নেয়—দলের মধ্যে কে বড়, কার সম্মান বা ক্ষমতা বেশী এই নিয়ে তখন মারামারি চলে এবং এমন লোক কেউই নেই যে তখন আপনাকে ছোট করে' সবার পিছনে রাখতে চায়। এইরকমে ছোট-বড়র প্রভেদ; এই অসাম্যের জন্যেই রেষারেষি ও পরস্পরের প্রতি দোষারোপ চলে—দশের মধ্যে এককে বড় করলে সাধারণের মধ্যেও বিষম গোলযোগ উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি জনসাধারণের হাতে সমান অধিকার থাকে তবে হাজার দলে ভাগ করলেও তাদের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে উঠবে অথচ তর্ক ও মারামারির মধ্যে পড়ে কোন কাজই পণ্ড হবে না। জনসাধারণকে খুব কমই দেশের কাজে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে তারা এ-সব বিষয়ে বিশেষভাবে অভ্যস্ত—ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে; এবং সেই প্রমাণে আস্থা রেখে বর্ত্তমান বিদ্রোহে তাদের স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের উপর আমরা নির্ভর করছি।

পারেন না যে, আমাদের মধ্যে সামান্য অসাম্য, অবশ্যম্ভাবী অবিচার ও ব্যবস্থার ত্রুটী থাকবে না—কারণ, সমাজে এমন লোক বিরল নয় যারা দেশের সব চেয়ে মহৎ মুহূর্ত্তে স্বার্থপরতার বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়—অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। আমাদের উচিত হচ্ছে, ত্রুটী-পতন হবে কিনা ভাবার এবং সেই ভয়ে জবুথবু হয়ে বসে' থাকার চেয়ে কোমর বেঁধে যাতে সেইগুলো দূর করা যায় তার চেষ্টা করা। মানুষ নিজেই সম্পূর্ণ হবার অধিকার পায়-নি,—তবে চেষ্টা করবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত নয়।

মানব-জাতির অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের শিক্ষা ও সামাজিক মনস্তত্ত্বের উপদেশে আমরা বুঝেছি যে, যাদের জন্যে কিছু করতে হবে, বিশ্বাস করে' তাদের হাতে কাজের ভার দেওয়াটাই সব-চেয়ে নিরাপদ পথ। পুঁথি-পত্রে হিসাব যারা করে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হবারই কথা; কিন্তু জনসাধারণ নিজেরাই জানে, তাদের অভাব কোথায় এবং সেই অভাব মেটাবার উপায় কি? খাতার হিসাবে অনেক ত্রুটী আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা খুবই কম; বেশীর ভাগ নিজের কাজ পরে, করে'-দেওয়া ও নিজে-করার মধ্যে যা প্রভেদ, সেটা ত সকলেরই জানা আছে।

সহরের সব বাড়ী যে সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে' দিতে হবে এমন কোন কথা নেই—তার কোন দরকারও দেখি না! প্রথম প্রথম নানারকম অসুবিধা ঘটবে কিন্তু অধিকারচ্যুতি যারা প্রার্থনা করে এবং শান্তি ও স্বাধীনতা যাদের লক্ষ্য, সেই জনসাধারণের পক্ষে সেগুলো মোটেই গুরুতর হবে না। এতদিন ছুতার রাজমিস্ত্রী পরের দাসত্ব করেছে, এখন তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমাদের সাহায্য করবে। এবং শিক্ষিত লোকের সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পুরাণো সহরের জায়গায় আমরা নূতন নূতন সহর গড়ে তুলব—আগেকার বাসগৃহের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর করে' তাকে স্বাস্থ্যের ও সুখের মন্দিরে পরিণত করব।

এই গৃহ-অধিকার এবং বিনা-করে বস-বাস, সঙ্ঘ-স্থাপনের পথে আমাদের আর-একটু অগ্রসর করে' দেবে—এর ফলে একক বা স্বতন্ত্র সম্পত্তির মূলে যে কুঠারাঘাত হবে, তাতে সেটা আর টিঁকবে না। ধনী বিলাসীর গৃহের অধিকারচ্যুতির মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহের সমস্ত বীজ নিহিত—এর ফলের উপরে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—হয় আমরা সঙ্ঘস্থাপনের পথে সোজাসুজি এগিয়ে যাব, নয়ত শক্তিশালী অবিচারী একের বা দলের পায়ের তলায় পড়ে' দুঃসহ জীবনভার আরও দুঃসহ আরও অপমানজনক করে' তুলব।

এই বাসগৃহ-অধিকারের দিনেই জন-সাধারণ বুঝবে যে, ঈপ্সিত নবযুগ এসেছে, শক্তিশালী, মহাজন বা মালিকের জোয়ালের তলায় মাথা গলিয়ে তাদের আর পরিশ্রম করতে হবে না, সাম্যের মন্ত্র সত্য এবং আমাদের এই বিদ্রোহ অভিনয় মাত্র নয়।

আমাদের অধিকার-লাভের পথে বাধা

হচ্ছে মাঝারির দল, কারণ তারাই সমিতি গড়ে' এর বিপদ ও বাধার দীর্ঘ আলোচনা করবে এবং নানারকমে বিজ্ঞতা প্রকাশ করে' সকলের কাছে এই অধিকারচ্যুতিকে ঘৃণার জিনিষ করে' তুলবে। এই চোরা বালির চরই আমাদের স্বাধীনতা-জাহাজের পক্ষে ভয়ানক ও মারাত্মক, কিন্তু জন-সাধারণ যদি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে, নিজেদের হাতে কাজের ভার নেয়, তবে হাজার বিপদ আসুক—আমাদের ভাবনার কোন কারণই থাকবে না। অভাব-অসুবিধাকে আমরা ভয় করি না, যথার্থ বিপদের সম্ভাবনা সেদিকে নেই; আমরা ভয় করি কাপুরুষতাকে, সঙ্কীর্ণতাকে ও অন্ধসংস্কারপ্রিয়তাকে এবং এ-সবের পুরোহিত মাঝারি-দলকে;—কারণ, তারা অর্দ্ধেক মন নিয়ে কাজে যোগ দেয় এবং শেষে কাজ পণ্ড না করে' ছাড়ে না। আমরা চাই সাহস—অন্যায় দমন করবার, জড়ত্ব ভাঙ্গবার, যুগসঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করবার সাহসই আমাদের প্রধান অস্ত্র। জনসাধারণের চিন্তায় যখন সাহসের পরিচয় পেয়েছি, তখন কাজেও সাহসের অভাব হবে না, এই আমাদের বিশ্বাস।

তর্ক করা যাদের ব্যবসা, তারা গোড়া থেকেই বলবে, সহরের জন্যে তোমরা সুবন্দোবস্ত করছ কিন্তু পল্লীর দুঃখদারিদ্র্য নিয়ে ত কিছু আলোচনা করছ না—সহরের লোকেরা যত প্রাসাদ-অট্টালিকা দখল করে' সুখে থাকবে আর কৃষক ও মজুর তাদের অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে দুঃখভোগ

তার্কিকরা ভুলে যায় যে, পল্লীর চেয়ে সহরের ঘর-বাড়ীর অবস্থা বেশী শোচনীয়। এরা ভুলে যায় যে, সহরের লোকেরা এতদিন এই-সব অপরিষ্কার, দুর্গন্ধ এবং বদ্ধ ঘরের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরায় সপরিবারে বাস করেছে এবং তাদেরই রক্তশোষক ধনীর সুখসাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছে; এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচার দূর করাই আমাদের বিদ্রোহের প্রধান কর্ত্তব্য। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় সহর ও পল্লীর মধ্যে যা-কিছু প্রভেদ থাকবে, শীঘ্রই তা দূর হয়ে যাবে—যেদিন গ্রামের লোক বুঝবে তারা আর জমিদার, বণিক বা মূলধনী মহাজনের বা শাসন-তন্ত্রের ক্রীতদাস বা ভারবাহী পশুমাত্র নয়—তারা স্বাধীন, তারা মানুষ, সেদিন নিজেদের ঘর-বাড়ীর উন্নতি করতে তারা বিরত হবে না; এমন-কি, তর্কওয়ালাদের পরামর্শেও কোন আশঙ্কা না-করে' তারা কাজে লেগে যাবে।

আর-একটা তর্কও খুব মস্ত হয়ে উঠেছে। একজন হয়ত অনেক বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে' অর্থসঞ্চয় এবং সেই অর্থে মনের মত বাড়ী তৈরি করেছে —আমরা তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব কোন্ মুখে? এ-কথা শুনে অবশ্য আমাদেরই লজ্জা হয়, আমরা যারা সবায়ের সুখস্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করছি! আমরা বলি, যদি তার বাড়ী কেবল তার পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে সে সেখানেই থাকবে, কিন্তু যদি ঘর বেশী থাকে এবং যদি সে ভাড়া দেয় তবে আমরা ভাড়াটেকে

কর দিতে বারণ করব। যে যেখানেই থাক্, বিনা-করে, বিনা-বাধ্য-বাধকতায় থাকবে, তাগিদদার, মহাজন বা করসংগ্রাহকের মুখ-চেয়ে থাকবার দিন গেছে। সামাজিক পরিবর্ত্তন ও সজ্ঘস্থাপনের ফলে অনেক অন্যায় ও অত্যাচার জগতের বুক থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত হবে।

আমাদের এই পরিবর্ত্তন ও নূতন বন্দোবস্তের কথায় অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তাই তারা তাড়াতাড়ি একটা বন্দোবস্ত করতে চায়; তারা,—যারা এই নূতন ব্যবস্থার চাঞ্চল্যে আলস্যের তথা দাসত্বের আস্তানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, আগেকার কালে যখন অর্থলোভী, অত্যাচারী গৃহস্বামী নিজের ইচ্ছামত সকলকে ঘর-ছাড়া করত, তখন ত কেউ কোন প্রতিবাদ করে-নি—সে উদ্ধত অবিচার সে অপমানকে তারা কোন-দিন মনের কোণেও ঠাঁই দেয়-নি, অথচ আজ ভাইয়ের মিলনের দিনে বিবাদের অনৈক্যের মন্ত্রপাঠ করে'—তারাই আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে' তুলছে। কোন-কিছুর পরিবর্ত্তন হলেই প্রথম-প্রথম একটু গোলযোগ, সামান্য অসুবিধা হয়, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে না। অবশ্য শাসন-তন্ত্রের অধিকারে যখন গরীবের উপর অত্যাচার চলে তখন ধনীদলের মাথার চুলটি পর্য্যন্ত নড়ে না, কিন্তু যাদের উপর এতদিন শ্রাবণের ধারার মত অত্যাচার বর্ষিত হয়েছে, সভ্যতার পুরোহিত সেই কর্ম্মী-সাধারণের উন্নতির দিনে আমরা কারও মুখ চেয়ে তাদের সামান্য মাত্রও ক্ষতি করতে পারব না। একজনকে বড় করে' দশের উপর অত্যাচার করানো, আমাদের বিধি নয়—আমরা চাই সার্ব্বজনীন কল্যাণ; এবং সে কল্যাণ-সাধনের ভার সাধারণের হাতে।

আমাদের বিশ্বাস, ধনীজনের সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না—দরকার-মত ঘর রেখে বাহুল্য-স্থানটুকু ছেড়ে দিতে তারা কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না; কারণ, এখন থেকে নিজের হাতে সকলকে সব কাজ করতে হবে, সে হাজারজন দাসদাসী আর ত হুকুম তামিল করবার জন্যে জোড়হাতে অপেক্ষা করবে না! বড় বড় অট্টালিকায় তারা একলা থাকবে কি করে'? স্বাবলম্বী ও নিঃসঙ্গ জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গ নিশ্চয় তাদের কাছে মধুর লাগবে। দলের বা নিজের স্বার্থসাধন করতে মানুষ কিছু অন্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের বিদ্রোহ সফল হলে এবং নূতন বন্দোবস্তের ফলে সকলের মধ্যেই শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করবে।

ঘর-বাড়ী সহরবাসী সাধারণের অধিকার-ভুক্ত হলে, খাদ্য-বিতরণের সুবন্দোবস্তের পর বসনসংগ্রহের দিকে আমরা মন দেব। জনসাধারণের নামে সহরের সমস্ত কাপড়ের দোকান ও গুদামঘর অধিকার করাই এর একমাত্র উপায় এবং সঙ্ঘের সকলেই আবশ্যকমত সেখান থেকে বসন সংগ্রহ করবে। স্বেচ্ছাসেবকদল পূর্ব্বের মত তালিকা তৈরি করবেন, বিতরণের ভার নেবেন এবং যাতে কারুর কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। খাদ্য বিতরণে আমরা যে নিয়মে অগ্রসর হয়েছে

ছিলুম বসন-বিতরণেও আমরা সেই এক নিয়মে চলব অর্থাৎ যা বেশী থাকবে তা সবাইকে বিনাবাধায় ভোগ করতে দেওয়া হবে; কিন্তু যা-কিছু কম বা কম হবার সম্ভাবনা, তাই শুধু ভাগ করে' দেওয়া হবে। যতক্ষণ তৈরি জামা-কাপড় দোকানে পাওয়া যাবে ততক্ষণ সবাই তা নেবে, যদি অভাব হয় তবে দেশের স্বাধীন দরজি-দল শীঘ্রই সে অভাব পূরণ করবে—উন্নত যন্ত্র-পাতির সাহায্যে কম সময়ে ও কম পরি-শ্রমে সেটা বাস্তবিকই সম্ভব। আমরা কারও গা থেকে জামা-কাপড় কেড়ে নেবার বন্দোবস্ত করছি না; কিম্বা সহরের সমস্ত বস্ত্র এক জায়গায় জমিয়ে লটারী করে বিতরণ করতেও চাই না,—এ কথা মনে আসে শুধু তর্কওয়ালাদের। যার যা আছে তার তাই থাকবে, একটা কেন দশটা থাকলেও কেউ তা নিয়ে ঝগড়া করবে না—তা ছাড়া পরের অঙ্গশোভা নিয়ে নিজের অঙ্গ আবরণ করতে কেহই চাইবে না। দেশে জামা-কাপড়ের অভাব নেই; নতুন ছেড়ে পুরাণো নিয়ে টানা-টানি করবে কিসের জন্যে!

যারা আমাদের কাজে গোড়া থেকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে তারা বলবে—তাহলে ত সবাই কল্কাদার ভেলভেটের জামা আর রেশমী কাপড় চাইবে! আমরা এ-কথা বিশ্বাস করিনা—সকলেই কিছু রেশমী কাপড় আর মখমলের জামার ভক্ত নয়—বাবুয়ানি করবার সখও সকলের নেই। কাজের সুবিধামত সহজ অথচ সুন্দর পোষাকই অনেকের মনের মত। এখন যে পোষাক সমাজে চলছে তখনও যে সেই পোষাক চলবে, এমন কোন কথা নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিও বদলায়। রাষ্ট্রে ও সমাজে আমরা সহজ ও সরল বন্দোবস্তের জন্যে লড়ছি, অন্য বিষয়েও তেমনি সেইদিকে চেষ্টা করব এবং আশা করি, পরিবর্ত্তনের ফলে জীবনকে সরল, সহজ ও সুন্দর করবার জন্যে সকলেই চেষ্টা করবে।

বর্ত্তমানে সবাইকে মখমলের জামা বা রেশমী কাপড় না দিতে পারলেও সাধারণের মধ্যেও সেগুলি বাহুল্য বলেই বিবেচিত হবে। একদিন যা বিলাস-সামগ্রী বলে' বিবেচিত হয়েছে জন-সাধারণের চোখে, আর একদিন হয়ত তাইই সাধারণের ভোগের জিনিষ হয়ে উঠবে! প্রভেদ যখন কোথাও থাকবে না তখন একজন যা করবে, তা সাধারণের ভোগে লাগবে; কাজেই গোড়ায় যা ত্রুটী থাক্, ভবিষ্যতে তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আমাদের কথায় দু-একজন শিল্পপ্রিয় লোক কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন; তাঁরা বলছেন,—আমরা এই রকম করে' অগ্রসর হলে সব জিনিসই একরকম ও একরঙা হয়ে উঠবে এবং জীবনে ও শিল্পে যা-কিছু সুন্দর, তা বাদ পড়বে এবং ক্রমেই লোপ পাবে। কিন্তু আমরা তার প্রতিবাদ করছি। কারণ, এ-রকম হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, আমরা পরে দেখাতে চেষ্টা করব, লক্ষপতি না-হয়েও কেমন করে' শিল্পরুচির পরিতৃপ্তি সাধন করা যায়। অধিকন্তু, এতদিন যা দু-দশজনের অধিকারে ছিল তাকে আমরা

সর্ব্বসাধারণের কাছে হাজির করব—শিল্প-কলার তাতে উন্নতি বৈ অবনতি হবেনা।

রোগী বা দুর্ব্বল লোকদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ করে' আলোচনা করি-নি; তার কারণ সঙ্ঘকে তাই নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না—স্বতন্ত্র লোকের চেষ্টায় তাদের ব্যবস্থা হবে। যে-সব দেশে আগে এই সঙ্ঘের ব্যবস্থা ছিল এবং এখনও আছে, সেখানে এইরকমেই তাদের তত্ত্বাবধান করা হয়। অন্যলোকের পক্ষে যা বিলাসিতার উপকরণ, রোগীর পক্ষে তা বিশেষ আবশ্যক হলে তাকে সেইটি সংগ্রহ করে' দিতে কেউ সঙ্কোচ বোধ করবে না এবং দুর্ব্বলকে সাহায্য করতে কেউ যে পিছপাও হবেন, এমনও মনে করি না। ব্যক্তিগত কাপুরুষতা ও বীরত্বের মত সামাজিক কাপুরুষতা ও বীরত্বও দেখা যায়। আজ আমাদের সমাজে ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের পর এ-সব লোপ পাবে। তকমা-আঁটা আফিসের লোকের হাতে যে শক্তি কেবলমাত্র অত্যাচার ও অবিচারের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, বিদ্রোহের সময় মহানুভব লোকের হাতে সে শক্তি মহত্ত্বের ও কল্যাণসাধনের পথে আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিনের বীরত্বে ও স্বার্থত্যাগে আত্মসর্ব্বস্ব মনে-কৃপণ যে, সেও লজ্জিত হবে এবং এই মহত্ত্বের প্রশংসা করবে। আমাদের দলের মধ্যে এই ত্যাগের ও মহত্ত্বের আদর্শ চিরজাগরুক থাকবে, এমন আশা করি না; কিন্তু কাজের আরম্ভে এগুলি থাকলে ভিত্তিটা শক্ত হবে এবং কাজটাও সুন্দর হবে। ধ্বংসের অস্ত্র নিয়ে আমরা কাজ আরম্ভ করি-নি,—প্রতিশোধও আমরা নিতে চাই না; আমরা শুধু অন্যায়কে, কুৎসিতকে নষ্ট করতে চাই; অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রী ও সহানুভূতিকে আমাদের দরকার। দৈনিক অভাব সহজে মিটলে কারুর কোথাও বাধবে না এবং ত্যাগ না করেও পরস্পরে মৈত্রী রাখা কঠিন হবে না—বরং তাতে আমাদের উন্নতির সুবিধাই হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

অরোরা

অরোরার সঙ্গেও যে অবিনের পরিচয় ছিল সেটা আমি জানতেম না। সে কবিতা করে সুতরাং চাঁদের সঙ্গে তাকে কথা বলতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রামধনুকের ... অরোরার বাসা—সেখানেও যে তার গতি-বিধি এটা একেবারেই আমি ভাবি-নি!

কমলালেবুর মতো পৃথিবীর সব গোল ঠিক যেখানটিতে চাপা এবং যে রাজ্যটা

মণিমন্দিরে না-দিন না-রাত্রির দেশে একাকিনী অরোরা আলো বিতরণ করেন। লক্ষকোটী রামধনুকের শোভা এককোরে ঝালর বানিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে যে বাহার, বিনা বরের বাসরে অরোরার রূপ কতকটা সেই ধরণের। নব-নব সৌন্দর্য্যের, রঙের এবং আলোর সে যেন একটা ভরা জোয়ার বা চীনেভাষায় যাকে বলে 'টাইফুঁং'।

অরোরা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা আমার দূরে থেকে। জলজীয়ন্ত অরোরার বাসায় গিয়ে তার নির্ভুল পরিচয় এ-পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে-নি; কেননা সেদিন পর্য্যন্ত আমি সেই দলভুক্ত ছিলেম যে-দলের কাছে রামের ধনুক, অরোরার রঙ্গ-মঞ্চের রং এমনি আরো অনেকগুলো জিনিষ হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পটোল ঝিঙে ইত্যাদির মতো একবারে বর্জ্জনীয় ছিল। আমি তখন কি জানি যে তলে তলে আমার দলেও সব চলে? সেটা জানলে ও-দল থেকে নামকাটা সেফয়ের তো অবিনের বদলে এসে ভর্ত্তি হবার দরকার ছিল না।

যাই হোক, সেই অমাবস্যার রাত্রে তারার জুঁইফুলে সাজানো নীল আকাশের নীচে কলকাতার অন্ধকার গলিতে আমরা দুই বন্ধু যে অরোরার বন্ধ খিড়কি খোলা না পেয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান ও হতাশ হয়ে রাত সাড়ে-চারটেয় আহিরিটোলার ঘাটের রানায় বসে পয়লা এপ্রেলের সকালবেলার প্রতীক্ষা করে রইলেম সেটা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই বা সে লজ্জার কথাটা গোপন করতে দুটো মিথ্যে কথাও এখন আর আমার বলবার আবশ্যক হয় না,—অবিনের দলে মিশে এটা একটা সুবিধে আমি দেখছি।

অরোরার অভিসারে বেরিয়ে আর-কখনো অবিন এমন নিরাশ হয়েছিল কিনা বলতে পারিনে, তবে আমার সঙ্গ-দোষেই যে এরূপটা ঘটলো পয়লা এপ্রেলের ঠিক পূর্ব্বরাত্রে আমাকে সেটা জানাতে অবিন কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না এবং আমিও সেটা মেনে নিলেম, কেননা দল ছাড়বার পূর্ব্বে আমার আগের দলের যাঁরা বৃদ্ধ তাঁরা বিশেষ করে আমারি উপরে দীর্ঘনিশ্বাস ও হুঙ্কার-গুলো নিক্ষেপ করে, পিতৃপুরুষের সঞ্চয়টার সঙ্গে নিজের উপার্জ্জিত পয়সা রূপ গুণ ও যৌবন নিয়ে তাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনায়। ইংরেজীতে এপ্রেলের ওই সম্ভাষণটাই আমাকে দিয়েছিলেন—যদিও মাসটা ছিল অন্য।

খানিক বসে থেকে অবিন মরীচিকামুগ্ধ হরিণের মতো অন্ধকারে আর-একবার তার অরোরার সন্ধানে ঘুরে মরতে গেল অলিতে-গলিতে। আমি একা ঘাটে যেখানটিতে সকালের একটি তারার আলো অনেকদূর থেকে এসে অন্ধকার তীরের কাছে জলের উপরে নেমে দাঁড়িয়েছে সেইখানটিতে চুপ করে বসে রইলেম। ভোরের হাওয়ায় তখনো হিম মাখানো, নদীর মাঝে ময়লা কুয়াসা গতশীতের ছেঁড়া-কাঁথার একটা কোণের মতো এখনো ঝুলে রয়েছে। ঘাটের দুধারে বাঁধা সারি-সারি বোঝাই নৌকো জলের ধাক্কায় ঘুম-ভেঙে এক-একবার একটু নড়ে উঠে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা চিতা কিছুদূরে শ্মশানঘাটের

সমস্তটা এবং অন্ধকারের অনেকখানি আলোতে ভরে দিয়ে জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে। চলে যাবার সময়—জ্বলে ছাই হয়ে যাবার বেলায় মানুষ কতটা আলোই না দিয়ে যাচ্ছে! কি আলোর রথই না তাকে নিতে এসেছে—যে হয়তো জীবনের অন্ধকারেই কাটিয়ে গেল রাত্রিদিন!

অন্ধকারের মধ্যে এতখানি আগুনের একটা টান আছে। শিখাগুলো যেন হাত-নেড়ে আমায় ডাকতে লাগলো। মন আমার প্রদীপের চারিদিকে পতঙ্গের মতো কতক্ষণ ধরে ঐ আগুনটার দিকে ঘুরছিল, হঠাৎ একসময় অন্ধকারে একখানা হাত যেন বোধ হল আমার দুই চোখের উপর আস্তে আস্তে চেপে পড়ল। ঠাণ্ডা হাত,—চাঁপাফুল আর হেনার-গন্ধ-মাখানো আঙুলগুলি; পাতলা একখানি আঁচল, হাল্কা বাতাসের মতো উড়ে উড়ে আমার গালে পড়ছে, ঠোঁটের খুব কাছে চন্দনের গন্ধ-ভরা গরম একটা নিশ্বাস অনুভব করছি। আশ্চর্য্য এই যে, সে আমার চোখ টিপে থাকলেও আমি তার মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে রাত্রির মতো কালো আর তারি মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর! আমি একবার তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির উপরে হাত বুলিয়ে চুপি চুপি বল্লেম—'অরোরা'! পিছন থেকে অবিন গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে বল্লেম—"কিহে তুমি? অরোরা কোথা!" অবিন তার আঙুলটা দিয়ে শ্মশানের চিতা দেখিয়ে বল্লে—"শোনো বলি—"

সকালের হাওয়ায় কুয়াশার সাদা চাদর নাট্যশালার যবনিকার মতো আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। নদীর পশ্চিম পারে চিতার আগুন নিভে গেল। তারি শেষ-আভার মতো একটি সোনার রেখা নদীর পুব-পারের আকাশে ফুটে উঠল! অবিন তার কথা সুরু করে এমন সময় রামা বেহারা এসে খবর দিলে—"ডাক্তারবাবু আয়া।"

এত রাত্রে এখানে ডাক্তারবাবু কেন বুঝতে আমার সময় লাগলো। ঘুম ভাঙলে যেমন আমি ডাক্তারকে বল্লেম—"তুমি যে অসময়ে?" ডাক্তার হেসে বল্লেন—"আপনি আবার গল্পের খাতা নিয়ে বসেছেন? এ-রকম কল্লে আপনার অসুখ কিছুতে সারবে না। লেখা রাখুন, যান্ জাহাজে একটু বেড়িয়ে আসুন।"

লেখবার টেবিল এবং তার উপরে দেয়ালে ঝোলানো পাঁজির প্রকাণ্ড একটা এক এবং তার শিয়রে বড় বড় অক্ষরে এপ্রেল-টার দিকে আমার তখন দৃষ্টি পড়লো। আমি একবার ডাক্তারের দিকে, একবার নিজের দিকে চেয়ে সুবোধ ছেলের মতো গল্পের খাতা বন্ধ কল্লেম। ঘড়িতে তখন বেলা দুটো উনপঞ্চাশ।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নীলপাখী

তিলতিল	চিনি
মিতিল	জল
আলো	আগুন
কুকুর	নীলশিশুগণ
বিড়াল	সময়
রুটী	

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যবনিকার সম্মুখ

তিলতিল, মিতিল, আলো, কুকুর, বিড়াল, রুটী, আগুন, চিনি এবং জল প্রবেশ করিল।

আলো। পরী বেরীলুনের কাছে খবর পেলুম, নীলপাখী খুব-সম্ভব এইখানেই আছে।

তিলতিল। কোথায়?

আলো। এখানে, এই গোরস্থানে, ঐ পাঁচিলের মধ্যে।...যে সব লোক মরে গেছে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাকে গোরের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে।...কোন্‌টার মধ্যে আছে, খুঁজে বার করতে হবে।

তিলতিল। কি করে খুঁজবে?

আলো। সে খুব সহজ কাজ। গোরস্থানে গিয়ে তুমি হীরেটা ঘুরিয়ে দেবে। তাহলেই যারা বেরিয়ে আসবার, হুড় হুড় করে তারা বেরিয়ে পড়বে; আর যারা আসবে না, তাদেরও আমরা মাটীর নীচে দেখতে পাব।

তিলতিল। তারা ক্ষেপে উঠবে না ত?

আলো। না, সে ভয় নেই; তারা টেরই পাবে না, কি হচ্ছে।...তা ছাড়া, দুপুর রাত্রে তাদের অনেকেরই বেরুনো অভ্যাস কি না! কাজেই এতে তাদের তখন কোন অসুবিধা হবে না।

তিলতিল। এ কি! রুটী আর চিনি অমন ফ্যাকাসে মেরে গেল কেন? মুখে কথা নেই—

রুটী। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি মনে করছি এবার বাড়ী ফিরে যাই।

আলো। (একান্তে তিলতিলের প্রতি) ওদিকে মন দিয়ো না, ওরা মরা লোকের নাম শুনে ভয় পেয়েছে।

আগুন। আমি কিন্তু ভয় করি না!... মানুষ ম'লে আমি ত তাদের পুড়িয়ে থাকি।...এমন এক সময় ছিল যখন আমি ওদের সকলকেই পোড়াতুম।...তখন কত বেশী আমোদই না ছিল!

তিলতিল। টাইলো, অমন কাঁপছে কেন! সেও ভয় পেয়েছে নাকি!

কুকুর। আমি! কই না! আমার একটুও ভয় নেই; তুমি যদি নিয়ে যাও, তাহলে আমিও সঙ্গে যেতে রাজী।

তিলতিল। টাইলেটের কি কিছু বলবার নেই?

বিড়াল। (উদাসভাবে) আমি জানি, শেষে একটা কাণ্ড ঘটবে!

তিলতিল। (আলোর প্রতি) তুমিও আমাদের সঙ্গে আসবে ত?

আলো। না, আমি জিনিস আর জানোয়ারদের সঙ্গে গোরস্থানের বাইরে থাকব।...কারণ, মরাদের দেখে এদের কেউ-কেউ ভয়ে আধ-মরা হয়ে যাবে, আবার কেউ বা ভারি অস্থির হয় উঠবে।... মিতিলকে সঙ্গে নিয়ে তুমি একাই যাও।

তিলতিল। টাইলো কি আমাদের সঙ্গে থাকবে না!

কুকুর। হ্যাঁ, নিশ্চয়, আমি থাকব বৈকি! আমার ক্ষুদে দেবতাটির সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকব!

আলো। তা হতে পারে না।...পরীর হুকুম।...তা ছাড়া ভয় করবার কিছু নেই সেখানে।

কুকুর। আচ্ছা, আচ্ছা, না যেতে দাও ক্ষতি নেই।...তবে তারা যদি কোনরকম নষ্টামি করে, তাহলে কি করতে হবে শুনে রাখো! এই এমনি করে একবার শিস্ দিও।...আমিও অমনি সেই দণ্ডে হাজির হব।...জঙ্গলের কথা মনে আছে ত?

আলো। আচ্ছা, তবে এসো; আমি খুব কাছেই থাকব।...আমায় যে ভালবাসে, আমি তার খুব কাছে-কাছেই থাকি কিনা!

পরী ও অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, তিলতিল ও মিতিল দাঁড়াইয়া রহিল। যবনিকা সরিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোরস্থান

কাল—রাত্রি। গ্রাম্য গোরস্থানের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছিল। ছোট-বড় অসংখ্য কবর—ঘাসের ঢিপি, পাথরের চাপ, কাঠের ক্রুশ্ ইত্যাদি। তিলতিল ও মিতিল একটী প্রস্তর-স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান।

মিতিল। আমার ভয় করছে!

তিলতিল। (তার গাটাও ছম্-ছম্ করিতেছিল) আমার কিন্তু কখ্খনো ভয় করে না।

মিতিল। আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কি খুব পাজী হয়?

তিলতিল। না, পাজী কি করে হবে? তারা ত বেঁচে নেই!

মিতিল। তুমি কখনো মরা লোক দেখেছ!

তিলতিল। হাঁ, একবার দেখেছি, সে অনেকদিন আগে; তখন আমি খুব ছোট্ট ছিলুম।

মিতিল। কি রকম তারা দেখতে?

তিলতিল। একেবারে শাদা, একেবারে নিশ্চল আর ঠাণ্ডা, কোনরকম কথাবার্ত্তা কয় না। চোখের পলক অবধি কারো পড়ে না!

মিতিল। আচ্ছা, আমরা কি তাদের এখনি দেখতে পাব?

তিলতিল। পাব বৈকি! আলো ত তাই বল্লে।

মিতিল। কোথায় তারা!

তিলতিল। হয় ঐ ঘাসের নীচে, না-হয় ঐ সব বড় বড় পাথরের নীচে।

মিতিল। সারা বছর কি ওরা ওরই নীচে থাকে? দিন-রাত?

তিলতিল। হ্যাঁ।

মিতিল। (পাথরের চাপ দেখাইয়া)

ওগুলো কি তাদের ঘরে ঢোক্‌বার দরজা ?

তিলতিল। হাঁ।

মিতিল। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কি ওরা বাইরে বেরোয় ?

তিলতিল। ওরা কেবল রাত্রে বেরোয়।

মিতিল। কেন ?

তিলতিল। বাঃ, ওরা যে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকে।

মিতিল। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন বাইরে আসে ?

তিলতিল। না, বৃষ্টির সময় ঘরে থাকে।

মিতিল। তাহলে, ওদের ঘরগুলো বেশ আরামের ?

তিলতিল। হ্যাঁ, শুনেছি ভারি আঁটা-সাঁটা।

মিতিল। ওদের ছেলে-মেয়ে আছে ?

তিলতিল। আছে বৈকি, যারা সব মরে যায়—

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি খায় ?

তিলতিল। গাছের শেকড় খায়।

মিতিল। আমরা ওদের দেখতে পাব ত ?

তিলতিল। নিশ্চয়; হীরেটী ঘুরিয়ে দিলেই পাব।

মিতিল। আচ্ছা, ওরা কি বলবে!

তিলতিল। কিছুই বলবে না, ওরা কথা কয় না।

মিতিল। কেন কথা কয় না ?

তিলতিল। ওদের কাকেও কিছু বলবার নেই কিনা।

মিতিল। কেন, কিছু বলবার নেই ?

তিলতিল। যাঃ, তুই ভারি বোকা। তোর সঙ্গে আর বক্‌তে পারি না।

উভয়ে চুপ করিল

মিতিল। হীরেটী কখন ঘুরোবে ?

তিলতিল। আগে দুপুর রাত হোক্, না-হলে তাদের কষ্ট হবে যে।

মিতিল। কেন কষ্ট হবে ?

তিলতিল। কারণ দুপুর রাতই হল ওদের হাওয়া খেতে বেরুবার সময় কি না ?

মিতিল। দুপুর হতে আর কত দেরী ?

তিলতিল। গির্জ্জার ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ ?

মিতিল। হ্যাঁ, ওই যে ছোট কাঁটাটা—

তিলতিল। দুপুর বাজে-বাজে; ওই যে ঐ বাজছে, শুনছ ?

ঘড়িতে বারোটা বাজিল

মিতিল। আমি পালাই।

তিলতিল। এখন না। এবার হীরেটী ঘুরোই।

মিতিল। না, না; ঘুরিয়ো না। আমি আগে পালিয়ে যাই। আমার ভয় করছে ...বড্ড ভয় করছে।

তিলতিল। কোন ভয় নেই।

মিতিল। না, না, আমি মরা-লোক দেখতে পারব না। বড্ড ভয় করে, আমি দেখতে পারব না।

তিলতিল। আচ্ছা, ওদের দেখতে হবে না; চোখ বোজো।

মিতিল। (তিলতিলকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া) তিলতিল, ভাইটী আমার! আমার বড্ড ভয় করছে।

...আমি থাকতে পারব না—কিছুতেই না। ওই বোধ হয় ওরা সব বাইরে বেরুচ্ছে।

তিলতিল। অমন করে কেঁদো না। ভয় কি? এক মিনিটের বেশী ওরা বাইরে থাকবে না।

মিতিল। তুমিও ত কাঁপছ!...ওরে বাবারে!...না জানি, কি ভয়ঙ্কর ওদের চেহারা!

তিলতিল। সময় হয়ে গেছে, এইবার ঘুরুই।

তিলতিল হীরা ঘুরাইয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য চতুর্দ্দিক নিশ্চল নিস্তব্ধ হইল। তৎপরে ধীরে ধীরে কাঠের ক্রশ্‌গুলি নড়িয়া উঠিল। মাটীর ঢিপি ফাঁক হইয়া গেল, পাথরের চাপগুলা উঠিয়া পড়িল।

মিতিল। (তিলতিলের আড়ালে দাঁড়াইয়া) এবার সব বেরুচ্ছে, ওই দেখ, বেরুচ্ছে!

তৎপরে কবরগুলির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং অভ্যন্তর হইতে বাষ্পের ন্যায় তরল, শীর্ণ শুভ্র পুষ্পদল বিকশিত হইয়া উঠিল। পুষ্পগুলি ক্রমশ স্তবকে স্তবকে জমাট বাঁধিয়া অপূর্ব্ব সৌরভে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। গোরস্থানটী পরীস্থানের ন্যায় মনোরম এবং উদ্যান-শোভিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ আকাশে ঊষার উদয় হইল। শিশিরবিন্দু ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল, ফুল ফুটিল। মৃদু-মন্দ বাতাসে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পাখীর দল জাগিয়া গান ধরিয়া দিল। মধুমক্ষিকার দল গুঞ্জন করিতে লাগিল। তিলতিল ও মিতিল বিস্মিত চমকিত হইয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া কবর দেখিতে লাগিল।

মিতিল। (ঘাসের দিকে চাহিয়া) মরা-মানুষ সব কোথায়?

তিলতিল। মরা-মানুষ ত এখানে নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবিষ্যতের দেশ

নীলবর্ণ প্রাসাদের সুবৃহৎ দালানে অনেকগুলি শিশু অপেক্ষা করিতেছিল। ইহারা সকলেই জন্মগ্রহণ করিবে। হলের আসবাব ও সাজ-সজ্জা সমস্ত নীলরঙের। হলের সর্ব্বত্রই অসংখ্য শিশু জমায়েত হইয়াছিল। তাহাদের বর্ণ নীল এবং পরণের পোষাকও নীল। শিশুদের মধ্যে কেহ খেলা করিতেছিল, কেহ ছুটাছুটি করিতেছিল, কেহ-বা বসিয়া গল্প করিতেছিল। অনেকে ঘুমাইতেছিল এবং স্বপ্নও দেখিতেছিল। কেহ বা যন্ত্র-তন্ত্র লইয়া কাজে ব্যস্ত, কেহ ভবিষ্যতে কোন্ বিষয় আবিষ্কার করিবে তাহা লইয়া তন্ময় ছিল। কেহ ফল লইয়া, কেহ ফুল লইয়া তাহাদের ক্রমোন্নতির উপায়-উদ্ভাবনে ব্যগ্র ছিল।

তিলতিল, মিতিল এবং আলো পিছনের দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে চোরের মত প্রবেশ করিল। তাহাদের আগমনে নীলছেলেদের দলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া অপ্রত্যাশিত, নবাগত এই অতিথিদের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মিতিল। চিনি, বেরাল আর রুটী কোথায়?

আলো। তাদের এখানে ঢোকবার যো নেই; কারণ তাহলেই তারা ভবিষ্যত জানতে পারবে তখন আর কাউকে মানবেও না।

তিলতিল। আর কুকুরটা?

আলো। তাকেও জানতে দেওয়া ঠিক নয়, ভবিষ্যতে কি আছে।.. আমি তাদের সকলকে গির্জ্জার এক খিলেনের মধ্যে পূরে তালা বন্ধ করে রেখে এসেছি।

তিলতিল। আমরা তাহলে এখন এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছি!

আলো। ভবিষ্যতের রাজ্যে।...ঐ যে ছোট ছেলেগুলি দেখছ, ওরা এখনও পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি।...যে সব তথ্য মানুষের অজানা আছে, এই হীরের দৌলতে সে সব আমরা আজ দেখব।...খুব সম্ভব নীলপাখী এইখানেই আছে।

তিলতিল। এখানে যে পাখী আছে নিশ্চয়ই তা নীল, কারণ এখানকার সব জিনিষই ত দেখচি নীল রঙের।...(চারিদিকে চাহিয়া) আহা, কি চমৎকার! কি সুন্দর জায়গাটী!

আলো। ছেলেগুলি কেমন ছুটোছুটি করছে, দেখ!

তিলতিল। ওরা চটেছে নাকি!

আলো। না, চটবে কেন! দেখছ না, ওরা হাসছে।...ওরা কিন্তু ভারি অবাক হয়ে গেছে।

নীল শিশুগণ। (তাহাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছিল) দেখ দেখ, জ্যান্ত ছেলেরা এখানে এসেছে; ওই দেখ কেমন সব জ্যান্ত ছেলে!

তিলতিল। আমাদের ওরা জ্যান্ত ছেলে বলছে কেন!

আলো। তার মানে, ওরা নিজেরা এখন বেঁচে নেই কি না।

তিলতিল। ওরা তাহলে কি করছে!

আলো। ওদের জন্ম-সময়ের অপেক্ষা করছে।

তিলতিল। জন্ম-সময়ের?

আলো। হ্যাঁ; আমাদের পৃথিবীতে যে সব ছেলে জন্ম নেয়, তারা এই জায়গা থেকেই যায়।...প্রত্যেককে তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।...বাপ মা যখন ছেলে চান, তখন এই যে ডানদিকের দরজা দেখছ, এটা খুলে যায়, আর ওখান দিয়ে ছোট্ট ছেলেরা অমনি পৃথিবীতে নেমে পড়ে।

তিলতিল। ওরে বাস্‌রে! কত ছেলে, দেখ!

আলো। আরও অনেক আছে, আমরা সকলকে ত দেখতে পাচ্ছি না। এই হলটার মত এমন ত্রিশহাজার হল আছে, তার প্রত্যেকটীতে এই রকম ছেলে ভর্ত্তি।...সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কত দরকার, একবার বুঝে দেখ! ...কেউ তাদের গুণে শেষ করতে পারে না।

তিলতিল। আর ওই যে নীল লোকগুলো, ওরা কারা?

আলো। তা ঠিক বলতে পারি না।...বোধ হয় ওরা রক্ষী।...শুনেছি মানুষের পর ওরাই পৃথিবীতে জন্ম নেবে। ...কিন্তু ওদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বারণ আছে।

তিলতিল। কেন?

আলো। কারণ এটা হল পৃথিবীর গোপনীয় জিনিষ কি না!

তিলতিল। এই ছোট ছেলেদের সঙ্গে কথা কইতে পারি ত?

আলো। নিশ্চয়; তুমি ওদের সঙ্গে আলাপ কর।...ওই দেখ ওখানে একটী ছেলে রয়েছে, সব চেয়ে ওটি চমৎকার; তুমি ওরই সঙ্গে গিয়ে কথা কও।

তিলতিল। কি বলব?

আলো। যা তোমার খুসী; খেলার সাথীর সঙ্গে যেমন কথা কও।

তিলতিল। আচ্ছা; চুমু খাব, কোলাকুলি করব?

আলো। নিশ্চয়; ও ভারী খুসী হবে তাহলে।...কিন্তু এ রকম মুষড়ে থেকো না...আমি তোমায় একলা ছেড়ে দিচ্ছি, তাহলে বেশ মন খুলে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে।...আমি ওই লম্বা লোকটীর সঙ্গে আলাপ করি গে।

তিলতিল। (শিশুটীর কাছে গিয়া তার হাত ধরিয়া) কি ভাই, কেমন আছ!...(তাহার নীল পোষাক ধরিয়া) এটী কি?

শিশু। (গম্ভীরভাবে তিলতিলের টুপিতে হাত দিয়া) আর এটী?

তিলতিল। এটী? এটী আমার টুপী... তোমার টুপী নেই?

শিশু। না, ওতে কি হয়?

তিলতিল। মাথায় পরে...বৃষ্টির সময়, ঠাণ্ডার সময় খুব কাজে লাগে!

শিশু। 'ঠাণ্ডার সময়,'—এ কথার মানে কি?

তিলতিল। তা জান না? এই যখন কাঁপতে থাক আর দাঁতে দাঁত লেগে হি হি হি হি কর, আর যখন হাত দুটো বুকের উপর রেখে এমনি করে চলতে থাক।

সে তার দুইটা হাত সজোরে বুকের উপর কোণাকুণি ভাবে রাখিল।

শিশু। পৃথিবীটা তাহলে ভারী ঠাণ্ডা জায়গা?

তিলতিল। তা ঠিক নয়। তবে ঠাণ্ডা হয় মাঝে মাঝে; এই যখন শীতকাল আসে, সে সময় আগুন পাওয়া যায় না।

শিশু। আগুন পাওয়া যায় না কেন?

তিলতিল। পাওয়া যায়। তবে বড্ড তাতে খরচ হয় তখন; কাঠ কিনতে পয়সার দরকার যে।

শিশু। পয়সা কি?

তিলতিল। যা দিলে জিনিষ পাওয়া যায়।

শিশু। ওঃ!

তিলতিল। পৃথিবীতে কারো অনেক পয়সা, কারো বা মোটেই নেই।

শিশু। কেন নেই!

তিলতিল। যাদের নেই তারা বড়লোক নয়।...আচ্ছা, তুমি কি খুব বড় লোক? তোমার কত বয়স?

শিশু। আমি শীগ্‌গির জন্মাব।... আর ঠিক বার বচ্ছর পরে।...জন্ম নেওয়া কি খুব ভাল?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; সে ভারী মজার!

শিশু। কি করে তুমি জন্মেছিলে?

তিলতিল। সে আমার এখন মনে নেই; সে অনেকদিন আগে জন্মেছিলুম কি না!

শিশু। শুনেছি, পৃথিবী আর জ্যান্ত-মানুষ, এসব ভারী সুন্দর, ভারী চমৎকার!

তিলতিল। হাঁ, মন্দ নয়।...তার উপর সেখানে পাখী আছে, মেঠাই আছে, নানা-রকম খেলনা আছে।...কারো কারো এর সবগুলিই আছে, যাদের নেই তারা কিন্তু এ সব দেখতে পায়!

শিশু। মায়েরা নাকি ছেলেদের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে?...মাগুলি খুব ভাল; না?

তিলতিল। নিশ্চয়ই; পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের চেয়ে তারা ভাল! টাকাকড়ি, খাবার-দাবার সকলের চেয়ে ভাল! ঠাকুমারা শুদ্ধু...কিন্তু তারা বড্ড শীগ্‌গির মরে যায়!

শিশু। মরে যায়?...সে আবার কি?

তিলতিল। একদিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় যে চলে যায়—আর ফেরে না।

শিশু। কেন?

তিলতিল। কে জানে!...বোধ হয় তারা দুঃখু পায়।

শিশু। তোমার মরে গেছে?

তিলতিল। কে? ঠাকুমা?

শিশু। ঠাকুমা কি মা, আমি জানি না।

তিলতিল। এ দুজন কিন্তু এক লোক নয়!...ঠাকুমারাই আগে মরে...বড্ড দুঃখু হয় তাতে...আমার ঠাকুমা আমায় বড্ড ভাল বাসত।

শিশু। তোমার চোখে কি হল! ও কি? মুক্তো?

তিলতিল। না, মুক্তো কেন হবে!

শিশু। তবে?

তিলতিল। আবার!...খুব নীল আর চক্‌চকে, না?

শিশু। হাঁ, ওকে কি বলে?

তিলতিল। কাকে!

শিশু। ওই যে টস্ টস্ করে পড়ছে।

তিলতিল। ও কিছু নয়, একটু জল।

শিশু। চোখ্ থেকে পড়ে বুঝি?

তিলতিল। হাঁ, কখনো কখনো; যখন কান্না পায়।

শিশু। কান্না কি?

তিলতিল। আমি কিন্তু কাঁদছি না; কাঁদলে কিন্তু এই রকম জল পড়ে।

শিশু। সর্ব্বদাই সকলে কাঁদে নাকি?

তিলতিল। না, ছোট ছেলেরা কাঁদে না, ছোট মেয়েরা কিন্তু কাঁদে।...এখানে তোমরা কাঁদ না?

শিশু। না, কান্না কি তা জানি না।

তিলতিল। শীগ্‌গিরই শিখবে।...আচ্ছা, ঐ নীলরঙের বড় বড় দানা নিয়ে ও কি সব খেলছ?

শিশু। এগুলো!...আমি পৃথিবীতে গিয়ে যা আবিষ্কার করব তা তারই জন্য।

তিলতিল। কি আবিষ্কার?...তুমি কি কিছু আবিষ্কার করেছ নাকি?

শিশু। করেছি বৈ কি!...শোননি?...পৃথিবীতে যখন জন্মাব, তখন এমন কিছু আমায় আবিষ্কার করতে হবে, যা পেলে মানুষ সুখী হয়।

তিলতিল। ও গুলো খেতে কি খুব ভাল?

শিশু। না; তুমি দেখছি, কিছুই জান না!

তিলতিল। না।

শিশু। রোজ এর জন্য আমায় মেহনত করতে হয়...শেষ হয়ে এল আর কি!...তুমি দেখতে চাও?

তিলতিল। হাঁ।...কৈ, দেখাও!

শিশু। ওই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে...দুটো থামের মাঝখানে।

অন্য একটী শিশু। (তিলতিলের কাছে আসিয়া) আমারটা দেখবে?

তিলতিল। হঁা দেখি।

২য় শিশু। জীবনকে বাড়াবার তেত্রিশ রকমের ওষুধ...ওই যে নীল শিশিতে রয়েছে।

৩য় শিশু। (ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া) আমি তোমায় এমন একটা আলো দেখাব, যার খবর আজ পর্য্যন্ত কেউ জানে না!... (সে নিজেকে আলোকিত করিয়া এক বিচিত্র আলোক-রশ্মির সৃষ্টি করিল) কেমন, খুব চমৎকার নয়?—কি বল?

৪র্থ শিশু। (তিলতিলের হাত ধরিয়া টানিয়া) আমি একটা যন্ত্র তৈরী করেছি, দেখবে এস—সেটা পাখীর মত আকাশে ওড়ে, অথচ তার ডানা নেই।

৫ম শিশু। না, না, আমারটা আগে দেখবে চল, আমি চন্দ্রলোকে গুপ্তধনের আবিষ্কার করেছি।

নীল শিশুগণ। (তিলতিল ও মিতিলের চারিদিকে জড় হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল) না, না। আমার আগে!...আমার সব চেয়ে ভাল!...আমি যা আবিষ্কার করেছি, সে ভারী চমৎকার!...আমারটা চিনির তৈরী! ...ওরটা কিছুই নয়...ও আমার কাছ থেকে ভাব চুরি করেছে!

এই রকম গোলমালের মধ্যে নীল শিশুগণ তিলতিল ও মিতিলকে কারখানার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কারখানাটীও নীলবর্ণের। সেখানে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছিল। নীল ছেলেরা যে যাহার কাজে লাগিয়া গেল। সেই নক্সা এবং বই খুলিয়া তিলতিলকে দেখাইতে বসিল। কেহ বৃহদাকারের ফুল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফল আনিয়া হাজির করিল।

একটী শিশু। (প্রকাণ্ড আকারের ফুলের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছিল) আমার ফুলগুলি দেখছ?

তিলতিল। কি ওগুলো?

শিশু। দেখচ না? এগুলো সব ফুল!

তিলতিল। অসম্ভব! এ যে এক একটা টেবিলের মত বড়!

শিশু। কি চমৎকার গন্ধ!

তিলতিল। আশ্চর্য্য!

শিশু। আমি যখন পৃথিবীতে থাকব, তখন এগুলো এত বড়ই হবে।

তিলতিল। কতদিন লাগবে?

শিশু। তিপ্পান্ন বছর চার মাস ন দিন।

আর একটী শিশু এক গোছা আঙুর হাতে লইয়া উপস্থিত হইল। আঙুরগুলা নাশপাতির মত বড়।

শিশু। আমার হাতে এ কি ফল বল দেখি?

তিলতিল। এক থোবা নাশপাতি!

শিশু। নাশপাতি নয়, আঙুর!...আমি যখন তিরিশ বছরে পড়ব, এগুলো তখন এমনি ধারা হবে। আঙুরকে বড় করবার উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।...

আর একটী শিশু তরমুজের মত বড় এক ঝুড়ি আপেল লইয়া হাজির করিল।

শিশু। আবার এগুলি কি রকম বল ত!

তিলতিল। ও ত তরমুজ...

শিশু। না, না; এগুলো আপেল। আমি যখন পৃথিবীতে থাকব এগুলো তখন তখন এত বড়ই হবে। আমি তার উপায় বার করেছি।...তিনটী গ্রহের যিনি রাজা, আমি তার বাগানের মালী হব।

তিলতিল। তিনটী গ্রহের রাজা আবার কে?

শিশু। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি পৃথিবী, মঙ্গল আর চন্দ্রগ্রহে সুখশান্তি দেবেন...এখান থেকে তুমি তাঁকে দেখতে পার।

তিলতিল। কোথায় তিনি?

শিশু। থামের গোড়ায় ওই যে ঘুমুচ্ছে, ওই ছোট ছেলেটী।

তিলতিল। বাঁ দিকে?

শিশু। না, ডাইনে।...বাঁ দিকের ছেলেটী পৃথিবীতে কেবলই আনন্দ নিয়ে যাবে।

তিলতিল। কি করে?

শিশু। এমন সব নতুন ভাব নিয়ে যাবে, যা পেয়ে মানুষ আনন্দে ভোর হয়ে থাকবে।

তিলতিল। ওই যে মোটা-সোটা ছেলেটী নাকে আঙুল দিয়ে রয়েছে, ওটী কে?

শিশু। সূর্য্যের তেজ যখন কমে আসবে তখন ও এক রকম আগুন আবিষ্কার করবে, যাতে পৃথিবী গরম থাকবে।

তিলতিল। আর ওই যে দুটী ছেলে হাত-ধরাধরি করে রয়েছে, ঘন ঘন এ ওর চুমু খাচ্ছে, ওরা কারা?...ওরা কি ভাই বোন?

শিশু। না, ওরা ভারী মজার মানুষ!... ওরা হল প্রণয়ী আর প্রণয়িনী।

তিলতিল। সে আবার কি?

শিশু। আমিও ঠিক জানি না।...বুড়ো 'কাল' তামাসা করে ওদের ওই নামে ডাকেন। ওরা দুটীতে দিনরাত চোখোচোখি করে রয়েছে, ঘনঘন চুমু খাচ্ছে আর

তিলতিল। কেন?

শিশু। বোধ হয় ওরা এক সঙ্গে বেশী দিন থাকতে পাবে না।

থামের গোড়ায়, বেঞ্চের উপর, সিঁড়ির পাশে বিস্তর ছেলে গাদাগাদি হইয়া ঘুমাইতেছিল।

তিলতিল। ওই যে ওখানে ঘুমুচ্ছে, ওরা কারা?...ওরা কি কিছুই করে না?

শিশু। ওরা কিছু-না-কিছু ভাবছে।

তিলতিল। কি ভাবছে?

শিশু। তা এখন ওরা জানে না...কিন্তু পৃথিবীতে যাবার সময় কিছু না কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। খালি হাতে সেখানে যাবার যো নেই।

তিলতিল। কে বল্লে?

শিশু। "কাল"। সে ঠিক দরজার উপরটীতে দাঁড়িয়ে থাকে।...সে যখন দরজা খুলবে তুমি তাকে দেখতে পাবে...ভারী ক্যাসাদের লোক সে।

একটী ছেলে ভিড় ঠেলিয়া দৌড়িয়া আসিল।

শিশু। কেমন আছ তিলতিল?

তিলতিল। বা রে! এ আমার নাম জানলে কি করে?

ছেলেটী আসিয়া তিলতিল ও মিতিলকে আনন্দ ভরে চুম্বন করিল।

শিশু। কেমন আছ?...বেশ ভাল ত?...আর একটা চুমু দাও...মিতিল, তুমিও দাও।...তোমাদের নাম্ জানি, সে আর আশ্চয্যি কি? আমি শীগ্গিরই তোমাদের ভাই হয়ে জন্মাব।...এইমাত্র শুনলুম, তোমরা এসেছ। আমায় জন্মাতে হবে কি না, তাই নতুন নতুন ভাব সংগ্রহ করছিলুম।...মাকে

তিলতিল। কি? তুমি আমাদেরই বাড়ীতে আসবে না কি?

শিশু। নিশ্চয়, ঠিক এক বছর পরে।...আমি যখন ছোট্ট থাকব, তখন যেন আমায় ত্যক্ত করো না।...আগে থেকে তোমাদের চুমু খেতে পেলুম, এতে আমি ভারী খুসী।...মাকে বলো আমার জন্য দোলনা ঠিক করে রাখতে।...আমাদের বাড়ীটা বেশ আরামের, কি বল?

তিলতিল। মন্দ নয়!...আর মা আমাদের বড্ড ভাল।

শিশু। আচ্ছা, খাবার আছে?

তিলতিল। খাবারও আছে।...আমরা মাঝে মাঝে মেঠাই খেতে পাই। কি বল মিতিল?

মিতিল। হ্যাঁ, তা ঢের পাই; মা তৈরী করে দেন।

তিলতিল। তোমার এ থলির মধ্যে কি?...আমাদের জন্য কিছু নিয়ে যাচ্ছ বুঝি?

শিশু। আমি তিন রকম রোগ নিয়ে যাচ্ছি—হাম, কাশি আর জ্বর।

তিলতিল। ও! এই কেবল! তার পর কি করবে?

শিশু। তারপর?...তারপর তোমাদের ছেড়ে চলে আসব।

তিলতিল। ও রকম করে চলে আসাটা কিন্তু বড্ড খারাপ হবে।

শিশু। কি করব, বল!...নিজের ইচ্ছামত ত কিছু হতে পারে না।

এই সময় মণিময় স্তম্ভ ও দরজার মধ্য হইতে এক গম্ভীর স্বর শুনিতে পাওয়া গেল এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকে স্থানটী আলোকিত হইয়া উঠিল।

তিলতিল। ও কি?

শিশু। "কাল"। "কাল" আসছে...সে এই বার দরজা খুলবে।

নীল শিশুদের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা গেল; অনেকে যন্ত্রতন্ত্র ফেলিয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিল। যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহাদের অনেকে জাগিয়া বসিয়া দরজার দিকে চাহিয়া রহিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

আলো। (সে আসিয়া তিলতিলের সঙ্গে যোগ দিল) আমরা থামের আড়ালে লুকুই, এস...তাহলে "কাল" আমাদের দেখতে পাবে না!

তিলতিল। ও আওয়াজ কোত্থেকে আসচে?

শিশু। ভোর হচ্ছে...যে সব ছেলে পৃথিবীতে জন্ম নেবে, তারা এইবার পৃথিবীতে নেমে যাবে।

তিলতিল। কি করে নেমে যাবে? সিঁড়ি আছে না কি?

শিশু। দেখতে পাবে।..."কাল" এবার দোরের হুড়কো খুলচে।

তিলতিল। "কাল" কে?

শিশু। সে একজন বুড়ো...যে সব ছেলে যাবে, তাদের সে ডাকতে আসে।

তিলতিল। ভারী দুষ্টু, বুঝি?

শিশু। না; তবে সে কারো কোন ওজর-আপত্তি শোনে না।..যাদের যাবার পালা আসেনি, তারা যদি যেতে চায়, তবে সে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

তিলতিল। পৃথিবীতে যেতে কি খুব আনন্দ হয়?

শিশু। যেতে না পেলে খুব দুঃখ হয়, কিন্তু যাবার সময় হলেও আবার কষ্ট হয়। ...ঐ দেখ, ঐ দেখ, সে দরজা খুলচে।

মণিময় দ্বার আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। দূরবর্ত্তী সঙ্গীতের ন্যায় পৃথিবীর কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল। লাল এবং সবুজ আলোকে স্থানটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "কাল" আসিয়া চৌকাঠের উপর দণ্ডায়মান হইল। সে শীর্ণ, দীর্ঘকায় এবং বৃদ্ধ। তাহার শ্বেত শ্মশ্রু বাতাসে উড়িতেছিল। এক হাতে সুবৃহৎ কাঁচি, অপর হস্তে প্রহর-নিরূপণ যন্ত্র। দরজার ভিতর দিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট জাহাজ দেখা যাইতেছিল। জাহাজগুলি সাদা এবং সোনালি পাল তুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কাল। যাদের যাবার পালা তারা সব প্রস্তুত?

শিশুগণ। (ধাক্কাধাক্কি করিয়া অগ্রসর হইল) এই যে আমরা, এই যে আমরা!

কাল। থাম, এক একজন করে। আবার ভিড় করছ?...যাদের দরকার নেই তারাও এসে হাজির হয়েছ?...আমার চোখে ধূলো দিতে পারছ না।...(একজনকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া) তোমার পালা হয়নি...এখন যাও!...তুমিও এখন না... দশ বছর পরে এস।...উপস্থিত কেবল বারো জনের পালা...তার বেশী দরকার নেই। ...অ্যাঁ, কি বলছ?...ডাক্তার আরও বেশী যেতে চাও?...না, দরকার নেই...পৃথিবীতে বিস্তর জমা হয়েছে।...শিল্পীর দল কোথায়? ...কেবল একজনকে তারা চায়, সে খুব সাধু হবে।...তোমাদের মধ্যে সাধু কে?...তুমি? তোমাকে কিন্তু বোকা-বোকা ঠেকছে। এই তুমি এখানে অমন তাড়াহুড়ো করছ কেন?...আর তুমি সঙ্গে কি এনেছ? কিছুই না! তবে কি করে যাবে?...খালি হাতে যেতে পাবে না।...কিছু-না-কিছু নিয়ে এস।...ভয়ানক পাপ কিম্বা ভয়ানক অসুখ, যা হোক্ একটা...যা তোমার ইচ্ছা। ...আমার তাতে আপত্তি নেই!...কেবল একটা-কিছু চাই। ওকে অমন করে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?...ও যাবে না বলছে? ওর ত পালা এসেছে।...অবিচারের সঙ্গে ওকে লড়াই করতে হবে যে! ওকে যেতেই হবে।

শিশু। না, না, আমি যাব না।... আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই।...আমি... আমি এখানেই থাকব।

কাল। তা কি করে হতে পারে? যাবার পালা যখন এসেছে, তখন যেতেই হবে।...নাও, শীগ্‌গির এস...দেরী করতে পারি না।

অপর-একটী শিশু। মশাই আমায় যেতে দিন।...ও যেতে না চায়, আমি ওর বদলে যাব।..শুনলুম, আমার বাপ মা বুড়ো হয়েছেন...আমার জন্য তাঁরা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছেন।

কাল। না, বদলাবদলি চলবে না।... যার পালা, সে যাবে।...যাও, তোমরা সব ভিতরে যাও।...যারা যাবে না, তাদের বাইরে থাকবার কোন দরকার নেই।... এখন সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি, কিন্তু আবার যখন পালা আসবে, তখন ভয় পেয়ে নানা রকম ওজর দেখাবে।...ওই দেখ, চারজন কেমন থর-থর করে কাঁপছে।

একজন হঠাৎ পিছনে হটিয়া পড়িল।

ওকি!...তুমি অমন করে পালাচ্ছ কেন? ...কি হয়েছে?

শিশু। আমি বাক্সটা নিতে ভুলে গেছি, তার ভিতর দুটো পাপ আছে, পৃথিবীতে গিয়ে দুটোই আমায় গড়তে হবে।

অপর একজন। আমার ছোট পুঁটুলিটী ফেলে এসেছি...তার ভিতর যে সব ভাব আছে, তা দিয়ে মানুষকে সভ্য করে তুলতে হবে।

অন্য-একজন। আমি আমার নাশপাতির ঝুড়ি ফেলে এসেছি।

কাল। যাও, যাও; দৌড়ে নিয়ে এস। ...জাহাজ ছাড়-ছাড়।...ওই দেখ, মাস্তুলের ওপর পাল-ঝটপট কচ্ছে।...আর কেবল ৬১২ সেকেণ্ড বাকী।

একটী শিশু তার পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল,সে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

খবরদার, বলছি!...তুমি এখন নয়!... এই তিনবার তুমি পালাবার চেষ্টা করলে। ...এবার যদি তোমায় ধরি, আমার দিদি অনন্তর হাতে তোমায় সঁপে দেব। তা হলে কস্মিন্‌কালে আর তোমার জন্ম হবে না...তখন জব্দ হবে।... তোমরা সব গেলে কোথায়? সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও— সকলে হাজির হয়েছ ত?—আর এক জনকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল সে? ওই যে দেখছি ..ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।...কে?—প্রণয়ী বুঝি?... আর লুকোনো মিছে, এখন তোমার প্রণয়িনীর কাছে বিদায় নিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়।

দুটী ছেলে—যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে প্রণয়ী ও ও প্রণয়িনী বলা হইয়াছে—ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কালের পদতলে জানু পাতিয়া বসিল। নিরাশায় তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

প্রণয়ী। সময় মশাই, দয়া করুন; আমাকে থাকতে দিন।

প্রণয়িনী। আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে দিন।

কাল। অসম্ভব!...এখন কথা কবার সময় নেই।...কেবল ৩৯৪ সেকেণ্ড বাকী।

প্রণয়ী। আমার জন্মাবার ইচ্ছা নেই।

কাল। তোমার ইচ্ছাতে ত হবে না।

প্রণয়িনী। (সানুনয়ে) কাল মশাই, কি হবে? আমার যেতে যে এখনও অনেক দেরী!

প্রণয়ী। আমাকে তোমার আগেই যেতে হচ্ছে।

প্রণয়িনী। হায়, হায়; আর কখনও যে তোমায় দেখতে পাব না!

কাল। দেখ, এ সবের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। 'জীবনের' কাছে এ সব কথা পেশ কর। আমার উপর যেমন হুকুম আছে আমি সেই ভাবেই মানুষের মিলন বিচ্ছেদ ঘটাই।...(প্রণয়ীকে ধরিয়া) এস তুমি।

প্রণয়ী। (ধস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে) না, না; ছেড়ে দাও...না হয় ওকেও সঙ্গে দাও।

প্রণয়িনী। (প্রণয়ীকে জড়াইয়া ধরিয়া) একে ছেড়ে দাও,...আমার সঙ্গে থাকতে দাও।

কাল। থাম; অত চেঁচামেচি করো

না। এ ত আর মরতে যাচ্ছে না— জন্মাতে যাচ্ছে। (প্রণয়ীকে লইয়া গেল) চল, আর দেরী করতে পারি না।

প্রণয়িনী। (প্রণয়ীর দিকে হাত বাড়াইয়া) চিহ্ন, একটা চিহ্ন দিয়ে যাও! …বলে দাও কি করে তোমায় খুঁজে পাব।

প্রণয়ী। আমি সর্ব্বদা তোমাকে ভালবাসব!

প্রণয়িনী। আমি পৃথিবীতে গিয়ে চির-বিষাদিনী হয়ে থাকব, তাই দেখে তুমি আমায় খুঁজে নেবে।

সে মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

কাল। ব্যস্, এইবার হয়েছে।… এখন আর কেবল ৬৩ সেকেণ্ড বাকী।

গমনোদ্যত শিশুগুলি অন্যান্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

শিশুগণ। বিদায় পিয়ারী, বিদায় জিন্, সব জিনিস নিয়েছ ত?…আমার কল্পনাগুলি পৃথিবীতে প্রচার করো…আমার তরমুজের কথা মনে আছে ত?…কিছু ভুলে যাওনি? আমায় মাঝে মাঝে মনে করো।…তোমার নিজের কল্পনাগুলি যেন ভুলে যেও না; একটা জিনিষ নিয়ে বেশীদিন পড়ে থেকো না। আমায় তোমার খবর পাঠিয়ো। খবর পাঠাতে পারা যায় না শুনেছি…তবু চেষ্টা করো।…ভাল খবর থাকলে আমাদের বলো।…আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।—আমি সম্রাট হয়ে জন্মাব।

কাল। (চাবি উঠাইয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল) ব্যস্; আর না…জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।

জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। জাহাজস্থ শিশুগণের কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

ওই পৃথিবী! ওই পৃথিবী! ওই দেখা যাচ্ছে!…আহা, কি সুন্দর! কত বড়! কি চমৎকার!

তারপর দূরবর্ত্তী অতি ক্ষীণ আনন্দ-কোলাহল শুনিতে পাওয়া গেল!

তিলতিল। (আলোর প্রতি) ও কিসের গোলমাল? ও ত ছেলেদের গলা নয়।

আলো। যাদের ঘরে এই শিশুরা গিয়ে জন্ম নিলে মায়েরা সব গান করছে।

ইত্যবসরে কাল শেষবার হলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মণিময় দ্বার বন্ধ করিতে গেল। এইবার হঠাৎ তিলতিল, মিতিল এবং আলো তাহার নজরে পড়িল।

কাল। এ কি?…তোমরা কারা? কি করছ এখানে?…তোমরা ত নীল নও! এখানে তোমরা ঢুকলে কি করে!

সে দা উঠাইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া গেল।

আলো। (তিলতিলের প্রতি) কথা কয়ো না!…আমি নীলপাখী পেয়েছি… আমার বুকের মধ্যে লুকোনো আছে। পালাই চল! হীরেটা ঘুরিয়ে দাও, তাহলে ও আর আমাদের ধরতে পারবে না।

পিছন দিকের দরজা দিয়া তিলতিল, মিতিল এবং আলো পলাইয়া গেল।

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

আলেয়ার আলো

বাইশ

সরমার কথা

যমুনা-দিদিকে নিয়ে আর ত পারিনা! বাবারে বাবা, এমন দুষ্টু ত ভূভারতে আর-কখনো দেখি-নি!

আজ সারা সকালটা বসে-বসে ফুলের গয়না দিয়ে আমাকে তিনি সাজিয়েছেন। সুধু কি সাজানো? সেই সঙ্গে তাঁর ফষ্টি-নষ্টির জ্বালায় প্রাণ আমার পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে লাগল!

শেষটা তিনি বলেন কিনা, "চল্ ছুঁড়ি, তোকে তোর বরের কাছে ধরে নিয়ে যাই, তোর রূপ দেখিয়ে কিছু বখ্‌শীষ আদায় করব।"

আমার ত চক্ষু স্থির! তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, "ওমা, ওকি কথা দিদি! তাহলে আমি কি আর বাঁচব!"

ভঙ্গিভরে আমার গাল টিপে দিয়ে যমুনা-দিদি বললেন, "ঈশ্, ছুড়ির ঢং দেখে আর বাঁচিনা! বর বর করে যার মুখ দিয়ে লাল পড়ছে, তিনি বলেন কিনা বরের কাছে গেলে মরে যাব! ওলো, জানি লো জানি, আমাকে বোকা পুরুষ পাসনে যে, আমার চোখে ধূলো দিবি!"

—"দিদি, তোমার ও ডাগর চোখে আমি প্রাণ থাকতে ধূলো দিতে পারব না!"

—"উঁ, আমার কুটুস্ করে কাম্‌ড়ে—"

—"গর্ত্তের মধ্যে সেঁধুতেও জানি, দিদি!"

—"হুঁ, তুমি একটি মিট্‌মিটে ডাইনি, তা আবার জাননা! দাদাকে ক্ষেপিয়েও তোমার আশ মেটে-নি, আবার আমাকেও মজাবার ফিকির!"

—"জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামী যাঁর দোরে দিন-রাত ভ্যা-ভ্যা করেও মন পান না, তাঁকে আমি মজাব, আমার এমন কী সাধ্যি!"

—"সত্যি ভাই সরমা, তুই যদি পুরুষ হতিস্!—"

—"তাহলে তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করতে অত্যন্ত আপত্তি করতেন!"

—"আর আমার যদি বিয়ে না হোত—"

—"আমি যদি পুরুষ হতুম আর যমুনা-দিদির যদি বিয়ে না হোত, তাহলে—"

—"তাহলে, যমুনাদিদি তোর প্রেম-সাগরে পড়ে দস্তুরমত হাবুডুবু খেতেন।"

—"এযে অসমাপ্ত উপন্যাস! তাহলে তোমার দাদার অবস্থাটা কি হোত, কৈ, উপসংহারে সে কথাটা ত বললে না!"

—"উপন্যাস যখন শেষই হোলই না, তখন দাদার জন্যে আমার ভেবে মরবার দরকার কিলা ছুঁড়ি! তবে, পুরুষ হোতে পারি-নি বলে আমি যে আলিঙ্গন আর চুম্বন করতেও পারি-নি, এ ভুল তোর এখনি ভেঙ্গে দিচ্ছি!"—এই বলে যমুনাদিদি আমাকে

জড়িয়ে ধরে আমার মুখে একটি চুমু দিলেন। মাকে আর মনে পড়ে না, মায়ের পেটের কোন বোনও আমার নেই, পৃথিবীতে নারীর প্রতি নারীর স্নেহ-ভালবাসার স্বোয়াদ আমি কখনো পেয়েছি বলেও স্মরণ হয় না; কিন্তু এই কোমলপ্রাণা করুণারূপিণী মহিলাটির অগাধ হৃদয় যেন মায়ের স্নেহে, বোনের ভালবাসায় একেবারে পরিপূর্ণ; এঁর কাছে এলে আমি যেন সেই স্নেহ-প্রেমে বিভোর হয়ে গলে যাই! তাই আজ তিনি যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আমারও প্রাণটি যেন জুড়িয়ে গেল—সে অকপট আদরে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠল, তাঁর কাঁধের উপরে মাথাটি এলিয়ে আমি চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলুম।

যমুনাদিদি বললেন, "সরো, বেলা হোল, বাড়ী যা! তোর কচি মুখখানি রোদে রাঙ্গা হয়ে উঠেচে, তোকে কষ্ট দিচ্ছি দেখলে বোন, দাদা আবার মুখভার করতে পারেন!" এই বলে তিনি হাসতে-হাসতে চলে গেলেন।

আমিও আস্তে-আস্তে বাড়ীতে ফিরে এলুম।...

ঘরে ঢুকেই শুনলুম, সামনের বিয়ে-বাড়ীতে গায়ে-হলুদের শাঁখ বেজে উঠল।

আমারও জীবনে আবার অমনি দিন আসছে! সে কথা স্মরণ হবামাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! বিবাহ, বিবাহ ... ... দুটি প্রাণের চির-মিলন!

আমার যে আগে কখনো বিবাহ হয়েছিল, সে কথা মনে পড়ে কি, পড়ে না—সে যেন স্বপ্নের মত, সে যেন গতজন্মের কথা! সেবার প্রেমের কোন সাড়া পাইনি, এবার প্রেম এসে আগে আগে জীবন-বন্ধুকে পথ-দেখিয়ে আমার ঘরে ডেকে আনছে! অতীতের স্মৃতি, অতীতের ব্যথা, অতীতের আঁধারকে বর্ত্তমানের শান্তি, গান, আলো ধীরে-ধীরে হৃদয় থেকে মুছে দিচ্ছে! আমার প্রাণ এতদিন বুকের মাঝে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল, আজ আবার সে জেগে উঠছে! হে বন্ধু, হে সখা, কাছে এস, তোমার ব্যথাহারী হাত-দুখানির সুখ-স্পর্শে আমার নিরালা জীবনের তন্দ্রামোহ টুটে যাক্; হে আমার নবপ্রভাতের প্রথম সূর্য্য, তোমার আকাশব্যাপী কিরণের একটি কণা পেলেও আমার অন্তর পদ্মের মত আবার বিকসিত হয়ে উঠবে!

হঠাৎ সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দ শুনে আমি চমকে উঠলুম। কি করি, কোথা যাই—এখনো আমার গা-ময় যে ফুলের গয়না!

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে' দিতে ছুটে গেলুম,—কিন্তু তার আগেই তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দারুণ লজ্জায় মরমে মরে আমি পিছন ফিরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

মোহনবাবু খানিকক্ষণ একটিও কথা কইলেন না,—বোধহয় আমার বেহায়া-পনায় তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন! কিন্তু তিনি-ই বা কি-রকমের মানুষ গা! দেখছেন, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু নাছোড়বান্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! ধন্যি লোক যাহোক!

মোহনবাবু ডাকলেন, "সরমা!"

কী অস্বাভাবিক, ভয়ানক স্বর! সে তিক্ত—তীব্র স্বর আকস্মিক অভিশাপ-বাণীর মত আমার সর্ব্বাঙ্গকে যেন পাথরে পরিণত করে' দিলে। এমন স্বর আমি জীবনে কখনো শুনি-নি!

মোহনবাবু আবার তেমনি স্বরে বললেন, "সরমা! তোমার স্বামী জীবিত!"

তড়িতের মত তাঁর দিকে আমি ফিরে দাঁড়ালুম। আমার কোথায় গেল লজ্জা, কোথায় গেল নীরবতা,—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম, "কী, কি বললেন!"

—"তোমার স্বামী জীবিত!"

—"অ্যাঁ!"

—"হ্যাঁ। সরমা, আমি মরলুম!"

—"মোহনবাবু, মোহনবাবু!"

—"বিশ্বাস হচ্ছেনা তোমার? তুমি কি ভাবছ, নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজের মৃত্যু নিয়ে, নিজের সর্ব্বনাশ নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক করছি? তা নয় সরমা, তা নয়,—তোমার স্বামী জীবিত, কিন্তু আজ থেকে আমি মৃত। এই দেখ!"—বলেই তিনি থর্‌থর্ করে' কাঁপতে-কাঁপতে আমার হাতে একখানা খবরের কাগজ দিলেন।

কাগজখানা পড়্‌তে-পড়্‌তে আমার বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল! মুখ তুলে দেখলুম, ঘরের মধ্যে মোহনবাবু নেই!

আরসিতে চোখ পড়ল। তার ভিতরে আমার ফুলের গহনাপরা মূর্ত্তির ছায়া জেগে উঠেছে। কিন্তু আমার মুখ—আমার মুখ! নিজের মুখ যে আমি নিজেই চিনতে পারছি না! আরসিতে আমার ও মুখ যে মড়ার মত সাদা! আমি কি মরেছি?

পাগলের মত আমার গায়ের ফুল-গুলোকে দু-হাতে দলে, পিষে, ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে' ঘরময় ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিতে লাগলুম।

তেইশ

হরেন্দ্রের কথা

পাড়াগাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম।

কলকাতায় ফিরে দেখি, মোহন আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

চিঠিখানা এই।

"ভাই হরেন,

চিঠি পেয়ে যত-শীঘ্র পার, আমার কাছে আসবে। ভয়ানক বিপদে পড়েছি, তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শের দরকার। লিখে সে কথা জানাবার নয়। ইতি

হতভাগ্য মোহন।"

ব্যাপার কি? সপ্তাহখানেক মোটে কলকাতায় ছিলুম না, এরি-মধ্যে এমন কি বিপদ হোল যে, মোহন একেবারে আপনার নামের আগে হতভাগ্য বিশেষণ বসিয়ে দিয়েছে? এ আর কিছু নয়, নিশ্চয় প্রেমের ঝগড়া! আমি ভাবতুম, জগতে যে প্রেমের খেলা চলেছে, সে খেলায় রমণী চায় পুরস্কার, আর পুরুষ চায় শুধু একটু মজা! কিন্তু এই মজাতে মাতলে প্রেম যে এমন লোক-মজাতে পারে, এতটা ত জানতুম না!

যা-হোক, খাওয়া-দাওয়ার পর মোহনের বাড়ীতে গেলুম। মোহন তাহার ঘরের কোণে, শয্যার উপরে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল।

আমি বললুম, "কিহে মোহন, মদন-দেবতার সঙ্গে নারদ-ঠাকুরও তোমার উপরে কৃপাকটাক্ষ দান করেছেন নাকি ?"

মোহন আস্তে-আস্তে মুখ তুলে আমার দিকে নিরুত্তর হয়ে করুণ নয়নে চেয়ে রইল।

একি ! তার চোখে জল—কেঁদে কেঁদে তার মুখ যে ফুলে উঠেছে! আর তার চেহারা,—এই ক-দিনেই এ কী পরিবর্ত্তন ! মোহনের কেঁদে-রাঙ্গা চোখদুটো ভিতরে বসে গেছে, তার দৃষ্টি কি-রকম উদ্‌ভ্রান্ত, তার চুলগুলো রুক্ষ ও উস্কখুস্ক, তার দেহটাও শীর্ণবিশীর্ণ। দেখলে মনে হয়, তার যেন সাংঘাতিক একটা-কিছু অসুখ হয়েছে !

আমিও তাই ভেবে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ মোহন, তোমার কি অসুখ হয়েছে ?"

মোহন একটা বিশ্রী হাসি হেসে বললে, "অসুখ ? হুঁ, অসুখই বটে !... ...অসুখ !"

"মোহন, কি হয়েছে, বল ভাই !"

সে মুখে কিছু না-বলে আমার দিকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলে। দেখে মনে হোল, কোন খবরের কাগজ থেকে এটি কেটে নেওয়া। আমি কিছুই না বুঝে, ছাপার হরফে তাতে যেটুকু লেখা ছিল, সেটুকু পড়তে লাগলুম। পড়তে-পড়তে বুঝতে পারলুম, কেন মোহনের এমন দশা হয়েছে !

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব ? মরা মানুষ আবার ফিরে এসেছে ! অনেক ভেবেও কিছু ঠিক না করতে পেরে বললুম, "এটা পড়েও ত আমার সন্দেহ যাচ্ছে না ভাই !"

মোহন মুখ বিকৃত করে' বললে, "সন্দেহ ? কিসের সন্দেহ ? এই চিঠিখানা পড়, তাহলেই বুঝবে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। চিঠিখানা কাল মুরারিবাবুর নামে এসেছে। আমি পেয়েছি সরমার কাছ থেকে।"

পত্রখানা পড়লুম,

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনি শুনলে নিশ্চয় সুখী হবেন যে, আমি জীবিত আছি। ভগবানের দয়ায় ও আপনার আশীর্ব্বাদে আমি প্রাণে বেঁচে আছি। আপনার শান্তিপুরের প্রতিবেশী নবীনবাবুর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা পেয়ে এই পত্র লিখছি।

কাশীধামে গঙ্গায় ডুবে আমি মরেছি,—এ সংবাদ মিথ্যা। একখানা নৌকায় আমি আর আমার এক বন্ধু ছিলুম ; নৌকাডুবি হয়ে আমার বন্ধু মারা যান বটে, কিন্তু আমি বেঁচে গিয়েছিলুম।

আপনারা আমার সমস্তই জানেন, আপনাদের কাছে আর কিছু লুকোতে চাই না। তখন চারদিক থেকে পাওনাদারদের তাগাদায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। খুচরো খুচরো দেনা ত ছিলই—তার জন্যে আমি তত ভাবতুম না, কিন্তু আমার দুজন বড় পাওনাদারের হাত এড়াবার জন্যেই আমি নিজেই নিজের মৃত্যুসংবাদ রটনা

করেছিলুম। নৌকাডুবিতে এমন মৃত্যু ত হামেসাই হয়; সুতরাং আমার মৃত্যুতে কারুর অবিশ্বাস করবার কোন কারণ ছিল না।

এ ক-বছর আমি পশ্চিমে নানা জায়গায় চাকরি করে' বেড়িয়েছি। কিছু অর্থসঞ্চয়ও করেছি। যে পাওনাদারদের ভয়ে আমি দেশছাড়া হয়েছিলুম, এখন তারা বেঁচে নেই বলেই আবার দেশে ফিরেছি, নৈলে আরো-কতদিন যে আমাকে বিদেশে নাম-ধাম লুকিয়ে ঘুরে মরতে হোত, কে তা বলতে পারে?

কলকাতায় যখন আছি, তখন আমি আমার স্ত্রীকে কাছে এনে রাখা উচিত মনে করি। আশা করি এতে আপনার অমত্ হবে না। আমি আসছে পরশুদিন আপনাদের বাড়ীতে যাব। আপনার কন্যাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

আপনারা ভাল আছেন ত? আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনার জামাতা

সুরেন্দ্র।"

আমার পত্রপাঠ শেষ হোলে মোহন বললে, "তোমার আর কোন সন্দেহ আছে?"

মোহনের দুঃখে আমার প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছিল। একি অভাবিত ব্যাপার! একটা মানুষের জীবন যে পলকের পরিবর্ত্তনে এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, এ যে কল্পনার অতীত! এ দুর্ভাগ্যের কি সান্ত্বনা আছে? এ ধাক্কা মোহন কি সামলাতে পারবে?

কোনরকমে আত্মসংবরণ করে' বললুম, "এখন উপায়!"

মোহন হতাশভাবে বললে, "উপায় আর কি! সাঁতার না-জেনে যে গভীর জলে সাধ করে' তলিয়ে গেছে, ডুবে মরা ছাড়া তার অন্য গতি নেই!"

—"মোহন, সুরেন কি সরমাকে চিঠি-পত্র কিছু দিয়েছে?"

—"না।"

—"হুঁ, বেশ বোঝা যাচ্ছে সরমাকে সে এখনও ভালবাসে না।"

—"কি-করে' বুঝলে?"

—"সুরেন যখন ছদ্মনাম নিয়ে বিদেশে অজ্ঞাতবাস করছিল, তখনও সে সরমাকে কোন পত্রাদি দেয়-নি। সরমার প্রতি তার বিশ্বাস থাক্‌লে সে এতবড় একটা কর্ত্তব্য পালন করতে ভুলত না। তারপর দেখ, এতদিন পরে সে দেশে ফিরেছে, সরমার ঠিকানাও পেয়েছে। এ অবস্থায় অন্য কেউ হোলে কি করত? নিশ্চয়ই একেবারে স্ত্রীর সঙ্গে এসে দেখা করত! কিন্তু সুরেন তাও করে-নি, উল্টে স্ত্রীকে একখানা চিঠিও লেখে-নি,—এমন-কি, তার পিতাকে যে পত্র লিখেছে তাতে-পর্য্যন্ত সরমার নামগন্ধ নেই। মোহন, সরমাকে সুরেন ভালবাসে না, তার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।"

—"উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য আবার কি?"

—"আমার যতদূর বিশ্বাস, তাতে মনে হয়, সুরেন জানতে পেরেছে যে, মুরারি-বাবুর মৃত্যু হয়েছে আর তাঁর যা-কিছু সম্পত্তি ছিল সরমাই তা পেয়েছে। সে এই টাকা হস্তগত করতে চায়।"

—"কিন্তু দেখছ ত, সে মুরারিবাবুর নামেই চিঠি লিখেছে!"

—"এটা ছল মাত্র। মুরারিবাবু বেঁচে থাকলে সুরেন কথনই তাঁকে চিঠি লিখতে সাহস করত না। কেননা সে ভালরকমেই জানত যে, সে তাঁর মেয়ের উপরে অসৎ ব্যবহার করাতে তিনি তার প্রতি চটে আছেন। তার উপর এ পত্রে সে যে কত-বড় জুয়াচোর, সুরেন নিজমুখেই তা প্রকাশ করেছে। এ-অবস্থায় মুরারিবাবুর মত প্রকৃতির লোক যে তার হাতে নিজের মেয়েকে আবার ছেড়ে দেবেন, এ-রকম আশা করাটাই অন্যায়। আর-একটা কথা ভেবে দেখ। সুরেন যে তার স্ত্রীকে এখনো ভালবাসে না, এটা আমরা বুঝেছি। এমন ক্ষেত্রে সরমার ভার সে কেন সেধে নিতে চায়? নিশ্চয়ই কিছু প্রাপ্তির আশায়।"

—"সে যদি জানতই যে মুরারিবাবু বেঁচে নেই, তবে মুরারিবাবুর নামে মিছা-মিছি চিঠি লেখবার দরকার কি?"

—"পাছে সরমা সন্দেহ করে যে, তার টাকার লোভেই সুরেন তাকে নিয়ে যেতে চায়। মুরারিবাবুর নামে চিঠি লেখাতে সরমা ভাববে, 'স্বামী তাকে নিস্বার্থভাবেই গ্রহণ করছে—পিতা জীবিত থাকতে সে ত আর তাঁর সম্পত্তি পাবে না! স্বামী যখন জানেন না যে তার পিতা মৃত, তখন সরমার হাতে অর্থ আছে এটাও তিনি জানেন না।'—সরমার পক্ষে কি এমনি-ধারা চিন্তাই স্বাভাবিক নয়?"

—"হরেন, তাহলে সরমার কি উপায়?"

—"নিরুপায়। আমরা কিছুতেই তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারব না। কিসে কি হয়, বলা যায় না—সরমা হয়ত ভেবে বসবে, আমরা বুঝি কোন খারাপ মত্‌লোবে তার স্বামীর নামে নিন্দা রটাচ্ছি। স্বামীকে ভাল না বাস্‌লেও, আমাদের সে নীচ ভাবতে পারে। সুতরাং আমাদের চুপ করে থাকাই ভাল। আর, আমি যা বললুম, সেটা আন্দাজ মাত্র—হয়ত মিথ্যা!"

—"হরেন, হরেন, আমিও গেলুম ভাই, সরমাও গেল। ভগবান এ কী করলেন!"

—"শান্ত হও ভাই, শান্ত হও! ভগবানের দোষ দিচ্ছ, কিন্তু কতবড় বিপদ থেকে তুমি পরিত্রাণ পেলে সেটা একবারও ভেবে দেখেছ কি? তুমি খালি দুঃখের তাপ পেয়েছ, দুঃখের আগুন তোমাকে ছুঁতে-না-ছুঁতে নিবে গেল,—এ কি কম মুক্তি? সরমার সঙ্গে তোমার বিবাহের পর যদি এই সুরেন আত্মপ্রকাশ করত, তাহলে কি হোত বল দেখি!"

—"হয়ত সেটা খুব ভয়ানকই হোত, হ্যাঁ,—হয়ত কেন—নিশ্চয়ই! কিন্তু, কিন্তু ... ..." থেমে, দু-হাতে মুখ ঢেকে মোহন অবরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বললে, "কিন্তু, আমার এ কি হোল ভাই! হরেন, বন্ধু,—তুমি তখনকার কথা ভাবছ, কিন্তু আমার এখনকার কথাটা তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? এর চেয়ে ভয়ানক অবস্থা আমি যে কল্পনা করতেও পারছি না! যে অন্ধ, তার কাছে কিবা রাত কিবা দিন! আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত জীবন, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা বাসনা যে অদৃষ্টের একটি ফুৎকারে তাসের বাড়ীর মত ভেঙ্গে পড়ে গেল! এ প্রাণ নিয়ে আর কি

আমি সংসারে নূতন জীবন দেখতে পাব —আর কি আমি—আর কি আমি—না, না, এ অসহ্য, এ আঘাত আমাকে পাগল করে দেবে, আমার জীবনকে পশুর জীবন করে দেবে—আমাকে—দূর হোক্, যা হয় তা হবে, কেন আমি এত ভেবে মরছি! —দূর হোক্, দূর হোক্"—বলতে-বলতে মোহন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তারপর বুকে দু-হাত বেঁধে হেঁটমুখে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগল। খানিক পরে আমার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর আমার চোখের উপরে স্থিরদৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, "বলতে পার হরেন, আমার আত্ম-হত্যা করা উচিত কিনা?"

এতক্ষণ আমি দুঃখে নির্ব্বাক হয়ে তার ভাব-ভঙ্গী নিরীক্ষণ করছিলুম। মোহনের চরিত্র আমি জানি; তার মত ভাবপ্রবণ লোক অতি অল্পেই ভেঙ্গে পড়ে, মনের ঝোঁকে এমন-সব কার্য্য করে—যা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। সংসারের হেরফেরে এরাই কষ্ট ভোগ করে, জীবন-যুদ্ধে এরাই পদে-পদে পরাজিত হয়,—এরা কল্পনায় সাম্রাজ্য গঠন করতে পারে, কিন্তু বাস্তবজগতে যথার্থ সংসারী হোতে পারে না। মোহনের অবস্থা দেখে বাস্তবিকই আমার মনে অত্যন্ত আশঙ্কা হোল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফের বিছানার উপরে জোর করে' শুইয়ে দিলুম। ভর্ৎসনার স্বরে বললুম, "মোহন, তুমি না পুরুষ!"

মোহন ম্লানহাসি হেসে বললে, "পুরুষ হোলে প্রাণ কি পাথর দিয়ে গড়তে হয় ভাই?"

—"পুরুষ যখন সংসারে প্রভু হোতে চায়, তখন তাকে সবল হোতে হবে, সহ্য করতে হবে।"

—"আমি যে সহ্য করতে পারছি না ভাই! যার সর্ব্বস্ব গেল, তার সহ্য করবার অবলম্বন কোথায়?"—বলতে-বলতে সে আমার গলা-জড়িয়ে ধরে বালকের মত কাঁদতে লাগল!...

প্রেমের যখন মৃত্যু হয়—তখন আর শবের সৎকার হয় না—শব তখন বাড়ীর ভিতরেই মরে পড়ে থাকে! হতভাগ্য মোহনের এখন সেই অবস্থা হয়েছে,—তার জীবন এখন মরণেরই নামান্তর।

মোহনের অবস্থা দেখে আমার বারংবার মনে হোতে লাগল, না-জানি সরমা এখন কি করছে! কে তাকে সান্ত্বনা দেবে, সে অভাগী যে একাকী!

মোহন আর আমি বাইরের ঘরে বসে সুরেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। মোহন ত কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে রাজি নয়, —বলে, তাকে ছেড়ে সরমা চলে যাবে, এটা সে কিছুতেই সইতে পারবে না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে তাকে স্থির করেছি।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীর কাছে যাওয়া সম্বন্ধে সরমার কি মত্‌ তা জানো?"

মোহন উদাসভাবে বললে, "সরমার সঙ্গে এ ক-দিন আমার দেখা হয়-নি, আমি

দেখা করতে পারি-নি! তবে যমুনার মুখে শুনলুম, স্বামীর কাছে সে যেতে চায়।”

আমি বললুম, “হ্যাঁ, এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। এ ব্যাপারের পর এখানে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।”

কিন্তু কি ভয়ানক অবস্থা তার! স্বামীকে সে ভালবাসে না, তার স্বামীও তাকে ভালবাসে না। সে তার স্বামীর কাছে যাচ্ছে কর্ত্তব্যের জন্য; আর তার স্বামী তাকে গ্রহণ করছে—খুব সম্ভব—অর্থের জন্য! এ মিলন ত সুখের হবে না! মোহনের চেয়ে সরমার অবস্থা ঢের-বেশী শোচনীয়, এযে জীবন্তে সমাধি! নিয়তির এ কঠোর বিধান কি-করে’ সে সহ্য করবে!

এমনসময় একখানা গাড়ী সরমার বাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল। আমি তাড়া-তাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। মোহন কিন্তু নড়ল না, যেমন বসেছিল, তেমনি অটল হয়ে বসে রইল।

গাড়ীর ভিতর থেকে যে লোকটি বাইরে এল, তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। মাথায় বাবরি-কাটা চুলের বাহার, চোখে নীল রঙের চশমা, হাতে ছড়ী, কাপড়-চোপড়ে বেশ বাবুয়ানা আছে—চেহারাটি কালো হলেও কুশ্রী নয়।

আমাকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, “মশাই, এইটেই কি মুরারিবাবুর বাড়ী?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কাকে খুঁজছেন?”

—“মুরারিবাবুকে।”

মুরারিবাবু মারা গেছেন শুনে লোকটি কিছুমাত্র বিস্মিত বা দুঃখিত হোল না, যেন সে এ-কথাটা শুনবে বলে আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল। সে সুধু বললে “মারা গেছেন বুঝি?”

—“আপনার নাম সুরেনবাবু?”

সে আশ্চর্য্য হয়ে একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, “বাঃ! আমার নাম কি-করে জানলেন আপনি?”

—“আন্দাজে।”

—“এ ত ভারি সঠিক আন্দাজ! আপনার নাম কি?”

আমি নাম বললুম।

—“হরেনবাবু, মুরারিবাবুর বাড়ীতে এখন কে আছেন?”

—“তাঁর মেয়ে।”

—“একলা?”

“হ্যাঁ, একলা বটে, কিন্তু আমরাই এখন তাঁকে দেখি-শুনি।”

—“আপনারা!”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা—অর্থাৎ আমি আর আমার বন্ধু মোহন।”

“মোহন? যাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর বিবাহের—”বলতে-বলতে সুরেন হঠাৎ থেমে পড়ল।

—“সুরেনবাবু, আপনি ত দেখছি সমস্ত খবরই রাখেন!”

সুরেন বাধো-বাধো গলায় বললে, “আপনি নবীনবাবুকে চেনেন বোধ হয়? তাঁর মুখেই আমি এ-কথাটা শুনেছি।”

“নবীন? সে কি শান্তিপুরের সেই

—"হ্যাঁ, যাঁর সঙ্গে আপনার কিছু গোলমাল হয়েছিল।"

—"আপনি তাকে চিনলেন কি-করে?"

—"আমার বিজ্ঞাপন দেখে তিনি দয়া করে আমাকে মুরারিবাবুর খোঁজ দিতে এসেছিলেন।"

—"বটে! এ বিবাহের কথা-পর্য্যন্ত যখন সে জানে, তখন নবীনচন্দ্র অনুগ্রহ করে এখনো আমাদের খবরাখবর নেন দেখছি! আর সুরেনবাবু, এটাও বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, আপনি ত এত খবর রাখেন, অথচ মুরারিবাবুর মৃত্যুসংবাদ জানেন না!"

সুরেনের পাপী মন,—তাই ধরা পড়ে গেছে বুঝে সে চটেই লাল! চড়া গলায় বিরক্ত হয়ে সে বললে, "মশাই, আপনার কাছে জবাবদিহি করতে আমি আসি-নি, আমি এসেছি আমার স্ত্রীকে নিতে!"

—"চলুন, আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।"

—"মাফ করবেন মশাই, আপনার কোন সাহায্যে আপাতত আমার দরকার নেই"—এই বলে সুরেন নিজেই সরমার বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গেল।

—"মাফ করবেন মশাই, আপনিই যে যথার্থ সুরেনবাবু, সেটার প্রমাণ না পেলে আপনাকে আমি বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছি না"—এই বলে আমি তার পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

—"কী, আপনি আমায় বাধা দিতে সাহস করেন!"

—"আপনি অকারণে রাগ করবেন না। মুরারিবাবু যখন তাঁর কন্যার ভার আমাদের উপরে দিয়ে গেছেন, তখন বুঝে দেখুন, এটা আমার কর্ত্তব্য কি না!"

—"সরুন, সরুন বলছি!"

আমি অবহেলার হাসি হেসে অটল ভাবে বললুম, "মাফ করুন।"

সুরেন সবলে আমাকে ধাক্কা মেরে বললে, "আমাকে বাধা দেবার কোন অধিকার তোমার নেই।"

আমি শান্ত স্বরেই বললুম, "আমাকে ধাক্কা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।"

সুরেন মহা চটে আমাকে ঘুষি মারবার জন্যে হাত তুললে—কিন্তু আমাকে স্পর্শ করবার আগেই আমি চট্ করে' তার হাত-খানা ধরে ফেললুম।

সুরেন হাত-ছাড়িয়ে নেবার জন্যে বারকতক চেষ্টা করলে; কিন্তু অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তিতেও না-পেরে শেষটা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে-ফুলতে চেঁচিয়ে উঠল, "ছাড়ো হাত —নইলে—"

—"নইলে কি সুরেনবাবু? কাঁদবেন, না লোক ডাকবেন? দেখছেন ত, মুরারি-বাবু তাঁর কন্যার ভার দুর্ব্বল হস্তে সমর্পণ করে যান-নি! সুতরাং এখানে বলপ্রকাশ বৃথা,"—এই বলে আমি তার হাত ছেড়ে দিলুম।

—"তাহলে, আপনি আমাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না, কেমন?"

—"সুরেনবাবু, আপনি অবোধের মত কথা বলছেন কেন? আপনার স্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন এতে আমার আপত্তি করবার

কি শক্তি আছে? আমি কেবল কর্ত্তব্য-বোধেই আমার সন্দেহভঞ্জন করতে চাই।"

—"কিন্তু আমি থাকতে পরপুরুষের সামনে আমার স্ত্রীকে—"

—"চুপ, চুপ, অমন কথা মুখে আনবেন না! আপনার স্ত্রী আমার সহোদরা ভগ্নীর মত!"

এমনসময় সরমার ঝি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "দিদিমণি বললেন, জামাইবাবুকে ভিতরে যেতে!"

হঠাৎ উপরদিকে আমার দৃষ্টি গেল। দেখি, বারান্দার এককোণে অত্যন্ত বিবর্ণ ভাবহীন মুখে মলিনবসনা সরমা কাতর চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আমি তখনি মাথা হেঁট করে' পথ ছেড়ে সরে এলুম;—সুরেন গর্ব্বিত হাসি হাসতে-হাসতে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে, আমার মুখের উপরে সশব্দে সদর দরজাটা বন্ধ করে' দিলে।

সুরেন বুঝতে পেরেছে যে, আমি তার কপটতা ও মিথ্যাকথা ধরে ফেলেছি। পাছে সরমার কাছে গিয়ে সমস্ত প্রকাশ করে' দি, সেই ভয়েই তার আগে আমাকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে দিতে তার অত আপত্তি! সরমা যদি জানতে পারে, তার অর্থের উপরেই সুরেনের দৃষ্টি, তাহলে স্বামীর সঙ্গে যেতে সে নারাজ হোতে পারে, সুরেনের এও একটা মস্ত ভয়!

কিন্তু সরমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার মনে আশঙ্কা হচ্ছে! সরমার সঙ্গে মোহনের বিবাহের কথাটাও সুরেন টের পেয়েছে। একে সে সরমাকে প্রীতির চোখে দেখে না, তার উপরে এই ব্যাপার! সরমা কি অবস্থায় পড়ে' যে এই বিবাহে রাজি হয়েছিল সুরেন ত তা ভেবে দেখবে না। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে' সরমাকে বাক্য-যন্ত্রণা ত সহ্য করতে হবেই,—তাছাড়া আরো কত লাঞ্ছনাই যে তাকে সইতে হবে, তা সুধু ভগবানই জানেন! তার কপালে অনেক দুঃখ আছে, এ দুঃখ আর কেউ ঘুচাতে পারবে না। ঘটনা-চক্রের এ কী পরিবর্ত্তন,—দুটি তরুণ প্রাণের সকল পুলক-হাসির উপরে অশ্রু-সমাধি গড়ে ভবিতব্যতা আজ যে মূর্ত্তিতে তার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তা কি ভীষণ কি নির্ম্মম কি কঠোর!...সরমা এ জীবনে আর কি কখনো সুখের মুখ দেখবে?

ভারাক্রান্ত মনে ঘরের এককোণে বসে-বসে এই-সব কথা ভাবছি আর ভাবছি। মোহন জানলার কাছে টেবিলের সামনে মূক মূর্ত্তির মত যেমন বসেছিল, এখনো ঠিক তেমনিই বসে আছে। কী যে ভাবছে, সেই জানে!

হঠাৎ রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হোল। মোহনও চমকে উঠে মুখ তুলে রাস্তার দিকে চাইলে, আমিও দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এগিয়ে গেলুম।

সরমার গাড়ী! মোহনদের বাড়ী ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে—বুঝি জন্মের মত! মোহনের তখনকার চোখের ভাব যে দেখেছে জীবনে আর-কখনো তা ভুলতে পারবে না!

সরমা, গাড়ীর একটা খোলা জানলার কাছে বসে আছে।

মোহনও তাকে দেখতে পেলে, সরমার করুণ নয়নও মোহনকে দেখে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর, দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল,—নিষ্পলক নেত্রে, নিস্পন্দভাবে, নিস্তব্ধ হয়ে! তাদের ভিতরকার প্রাণ তখন যেন নয়ন দিয়ে জোর করে' বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

গাড়ী ক্রমেই দূরে, দূরে—আরো দূরে চলে যাচ্ছে।

মোহন আবেগভরে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর, সামনের দিকে যতটা পারে ঝুঁকে পড়ল!

গাড়ীখানা রাস্তার মোড়ের কাছে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোহন শূন্যপথের দিকে উদাসচোখে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হঠাৎ টেবিলের উপর ঘুরে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখলুম; সে অজ্ঞান হয়ে গেছে! ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতবাসী ও ভারতীয় ইংরেজ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

যে সকল সাধারণ কারণে ভারতবাসী ও ইংরেজ—এই দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনে বাধা হয় সেই সকল সাধারণ কারণ ছাড়া আর কতকগুলি বিশেষ-কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার। ভারতবাসীর নিকট বিদেশী মাত্রই ম্লেচ্ছ। যে সকল জিনিস বিদেশীরা স্পর্শ করে, তাহা কলুষিত হয়। উচ্চবর্ণের সিপাহীরা, ইংরেজ সেনানায়কের ছায়া-স্পৃষ্ট খাদ্য দূরে নিক্ষেপ করে। যে সকল য়ুরোপীয়, ভারতবাসীর অধিকার-সমর্থনে, ভারতবাসীর সাহায্যার্থে, সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও ভারতবাসীরা কখনই খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করে না। মাদ্রাজের হিন্দুরা ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা Hume সাহেবের সহিত একত্র আহার করিতে সম্মত হইবে,—ইহা একটা অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; যদিও Hume একজন নিরামিষাশী, প্রায় হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিলেও চলে। ইংরেজ মহিলাদিগকে তেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না এবং "আমীরা"র ন্যায় উচ্চবর্ণের ভারতবাসিনীরা, তাহাদিগের সহিত "মেম-লোকের" মতো ব্যবহার করে।

* *
*

পক্ষান্তরে ইংরেজের স্বভাব। প্রাচ্যেরা যেমন বাচাল, ইংরেজরা তেমনি নীরব; প্রাচ্যেরা যেমন সুনম্য ও ভদ্র, ইংরেজরা তেমনি রূঢ়; প্রাচ্যদিগের কল্পনাবৃত্তি ও অলস বাগ্মিতা যেরূপ প্রবল, ইংরেজের তেমনি খট্‌খটে তথ্যপ্রবণ প্রকৃতি। Cotton সাহেব তাঁর "জাত-ভাই"দিগের চরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"প্রগাঢ় আত্মসন্তোষ—ইহাই অ্যাংলো-সেক্‌সন চরিত্রের একটা বিশেষত্ব : ইংরেজ-চরিত্রের এই লক্ষণটা ইংলণ্ডে স্পষ্ট লক্ষিত হয়; কুশিক্ষাপ্রাপ্ত যে সকল ইংরেজ য়ুরোপ-মহাদেশে ভ্রমণ করে তাহারা ইহারই নিমিত্ত সেখানে অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়ে, এবং এই আত্মাভিমান ভারতে গিয়া শীঘ্রই বিকট আকার ধারণ করে। যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভারতে কাজ করে, তাহারাও এই মানবীয় দুর্ব্বলতা হইতে অব্যাহতি পায় না, তাহাদের এই দুর্ব্বলতা অধীনলোকের তোষামোদ ও দাসত্বে আরও বৃদ্ধি পায়। আমাদের প্রাচ্য প্রজাগণ তাহাদের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া প্রাচ্য প্রথা-অনুসারে, উপর-ওয়ালা প্রভুর প্রতি অতীব নীচ ধরণের স্তুতিবাদ করে! ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এইরূপ আচরণের প্রতি বাহ্যত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও, ভিতরে ভিতরে তুষ্ট হন, এবং ঐরূপ আচরণের একটু ব্যত্যয় দেখিলেই তাঁহাদের মেজাজ বিগড়াইয়া যায়।

কোন সিপাই যুক্তিসঙ্গত কারণে কথার অবাধ্য হইলে, কোন ইংরেজ রাজপুরুষ তাহাকে হয়তো চাবকাইয়া দিবেন; কোন রাজপুরুষ পুলিশের লোককে প্রহার করিবেন; আবার, রাস্তায় কোন দেশীয় সম্মানার্হ অশ্বারূঢ় জমিদার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে সেই রাজপুরুষ তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই অসৎ ব্যবহার করিবেন (১)।

ভারতবাসীর শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াও ইংরেজ স্বীয় ঔদ্ধত্য বজায় রাখেন, এবং ভারত-বাসীকে পোষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করেন।

মালাবারী বলেন :—

"কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, সেই বিষয়ের আমি উল্লেখ করিতেছি। এই সম্বন্ধ যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমরা সকলেই এক-মত। এই অবস্থাটা যাহাতে ঘটিয়া উঠে তজ্জন্য ভারতবাসীর সহিত রেষারেষি করিয়া ইংরেজরা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া থাকেন। কি সরকারী কি বে-সরকারী অধিকাংশ ইংরেজই দেশীয় লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত যে সহানুভূতি করেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সদাশয় বন্ধুদের মধ্যে কতকগুলি লোক যে বন্ধুত্বের একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেন (আমরা এসিয়াবাসী যে-বন্ধুত্ব অনুভব

(১) H. J. S. Cotton, New India (1885) P. 42.

করি সেই প্রকৃত বন্ধুত্ব তাঁহাদের নিকট আশা করাটা দূরাশা) সে বিষয়েও আমি সুনিশ্চিত। কেননা, আমার মনে হয়—যে-ইংরেজ সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা করেন, দোষানুসন্ধান করেন, তিনি যেমন অনিষ্ট করেন; যে-ইংরেজ আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করেন, তিনিও তেমনি অনিষ্ট করেন। কথাটা শুনিতে একটু অদ্ভুত হইলেও আমার মনে হয়, আমাদের হিত-চিন্তা কম করাও যেমন খারাপ, বেশী করাও আমাদের পক্ষে তেমনি খারাপ। আমরা যদি বাস্তবিকই যোগ্য হই, আমাদের সহিত ঠিক্ সমকক্ষভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা তোমরা আমাদিগকে বেশী কিছুই দিও না ;—তা, সে কথাতেই হোক্ বা অন্য প্রকারেই হোক্। স্কুলে, কলেজে, সরকারি কার্য্যক্ষেত্রে, তোমাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, যুঝাযুঝি করিয়া, আমাদের অধিকার আমরা অর্জ্জন করিব। আমরা চাই সমান বিচার—তা-ছাড়া বেশী কিছু নয়।"

এক্ষণে, ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

হাজার হাজার বৎসর হইতে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ, দরিদ্র, নিরীহ, উদাসীন ভারতের চাষা, যেমন অন্য সমস্ত বৈদেশিকদিগের শাসন সহ্য করিয়া আসিয়াছে, ইংরেজের শাসন তেমনি সহ্য করিতেছে; বরং আরো সহজে সহ্য করিতেছে। চাষার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল। সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খলা, শান্তি, ন্যায়বিচার; কোন ধর্ম্মঘটিত উৎপীড়ন নাই। আইনের বলে তাহারা ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছে এবং খাজনার হার পূর্ব্বাপেক্ষা কম। তা ছাড়া, অধিকাংশ রায়ৎ ইংরেজ-দিগকে কদাচিৎ দেখিতে পায়। ভারতের প্রায় ত্রিশকোটি লোকের মধ্যে, কেবল ১৬৮,০০০ য়ুরোপীয়; তন্মধ্যে ৬৪০০০ সৈনিক। একলক্ষ ও কয়েক সহস্র অ-সৈনিক য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তিন-চতুর্থ ভাগ সহরে বাস করে। অন্য য়ুরোপীয়গণ সরকারী কর্ম্মচারী বা ভূম্যধিকারী। ইংরেজ কর্ম্মচারী-গণ, বড় বড় পদ অধিকার করেন; অথবা তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ কাজের ভার প্রাপ্ত হন,—যথা টেলিগ্রাফ, পূর্ত্তকর্ম্ম, ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ ইত্যাদি। য়ুরোপীয়দের মধ্যে ভূম্যধিকারী খুবই কম; কাহারও কাহারও চা-র ক্ষেত আছে; তাঁহাদের কুলিরা হিমালয়ের অর্দ্ধসভ্য জাতিদিগের অন্তর্ভুক্ত; কেহ কেহ নীলের, কেহ কেহ পাটের, কেহ কেহ আফিমের চাষ করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে বাস করেন। এই একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজ ও রায়তের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও গুজরাটে ইংরেজ ভূম্যধিকারীর সংখ্যা খুবই কম, ভারতের অবশিষ্ট স্থানে ইংরেজ ভূম্যধিকারী একেবারেই নাই। ইংরেজ ভূম্যধিকারী, অধিক লাভের আশায় দেশীয় লোকের প্রতি কঠোর, এমন-কি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ভারতীয় জমিদার আরো-বেশী লুব্ধ, এবং তাঁহার বাহ্য ব্যবহার মিঠা হইলেও, নীচ জাতের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা অত্যন্ত বেশী, উৎপীড়নও খুব কঠোর।

খুব সাধারণভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজের শাসন-সম্বন্ধে রায়তরা উদাসীন। এই শাসনের ফলে, ব্রিটিশ-রাজ্য ছাড়িয়া রায়তেরা দলে-দলে দেশীয় রাজার রাজ্যে গমন করে না; দেশীয় রাজার রাজ্য হইতেও ব্রিটিশরাজ্যে আসে না!

* *
*

ইহার বিপরীতে, বড় বড় সহরে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অনিশ্চিত ও পরিবর্ত্তনশীল।

ভারতের সাধারণ লেখক ইংরেজকে যেরূপ ভয় ও সম্মানের চক্ষে দেখে, বিস্ময় ও ভক্তির চক্ষে দেখে, Kipling তাহার বেশ বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃদ্ধ 'ইমান্‌-দিন্‌' তাহার ছোট ছেলে মহম্মদ-দিনের জন্য একটা পোলো-খেলিবার গোলা ইংরেজ-মনিবের নিকট চাহিতেছে (২):—

"ধর্ম্মাবতারের কি এই গোলায় আর কোন দরকার আছে? হুজুরের হুকুম হয় তো এই গোলাটা আমার ছোট ছেলেকে দিই, গোলাটা দেখে তার বড় খেল্‌তে ইচ্ছে হয়েছে।"

Kipling বলেন,—"তার পর দিন, নিত্যনিয়মিত আমি যে সময়ে আফিস হইতে ফিরি, তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্বে আমি আফিস হইতে ফিরিয়া, খানা-কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখি, একটি ছোট শিশু—বেশ গোলগাল, একটা খাটো কামিজ পরিয়া আছে, তাহাতে তাহার মোটা পেটের অর্দ্ধেকটি মাত্র ঢাকিয়াছে…আমি প্রবেশ করিবামাত্র, সে চোখ্‌ মেলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম সে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি সেখান হইতে পলাইলাম,—একটা কান্নার চীৎকার আমার অনুসরণ করিতে লাগিল দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ইমান্‌-দিন, খানার কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্না। আমি ফিরিয়া আসিলাম। ছেলেটা কামিজটাকে রুমালের মত ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া ইমান্‌-দিন ছেলেকে ধম্‌কাইতে লাগিল:—"ছেলেটা বড় বদ্‌মাশ ও শেষে দেখ্‌ছি জেলে যাবে।"

"তোমার ছেলেকে বল, সাহেবের রাগ হয়-নি,—তাকে নিয়ে এসো!"

ইমান বলিল:—"ওর নাম মহম্মদ-দিন, ও বড় বদ্‌মাশ।"

আপনার বেকার অবস্থা অনুভব করিয়া ছেলেটা বাপের কোলে আবার ফিরিয়া আসিল এবং নির্ভীকভাবে বলিল: "সত্যি সাহেব, আমার নাম মহম্মদ দিন। কিন্তু আমি বদমাশ নই; আমি একজন মানুষ।"

'গুজ্‌রাট ও গুজরাটী' নামক গ্রন্থে একটা মজার দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন সায়াহ্নে, আয়ারলণ্ডদেশীয় এক সৈনিক, মাতাল হইয়া বোম্বায়ের এক নাপিতকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে!

হিন্দু নাপিত মনে মনে ভাবিল,—নালিস করব? নালিস্‌ করে' কি হবে?

---

(২) "The Story of Muhammad Din",—Plain Tales from the Hills.

নাপিতকে মারবার অধিকার গোরা-সেপায়ের নিশ্চয়ই আছে।

সে তাহার শাশুড়ীর কাছে গিয়া সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল, আর তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিল :—"গোরা-সেপাই তোমার উপর মারপীঠ করেছে, এই বলে তার নামে তুমি নালিস কর।" বৃদ্ধা সম্মত হইল : আমুলসংস্কারপন্থী জ্বলন্ত উৎসাহী একজন উকীল, বিদেশী উৎপীড়কদিগের রীতি-নীতি সম্বন্ধে খুব একচোট শুনাইয়া দিবার সুযোগ পাইল। আর যিনি বিচারক, তিনিও হিন্দু— তিনি তো ভয়েই সারা ; তিনি যদি একটুও ভুলচুক্ করেন তাহা হইলে সমস্ত ইংরেজ সংবাদপত্র তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিবে।

আদালতে এইরূপ বিচার চলিতেছে :—

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (নাপিতের শাশুড়ীর প্রতি) ঐখানে দাঁড়া, মাগি। সাহেব কি তোর উপর মারপীঠ করেছিল ?

রমণী। (আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) আপনি আমার মা-বাপ।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। বেত্ খাবি যদি আমার কথায় সোজা জবাব না দিস্। সাহেব তোকে মেরেছিল ?

রমণী। আমি গরীব বিধবা ; আমার স্বামী আপনার ক্ষৌরী করিত, মা-বাপ!

ম্যাজিষ্ট্রেট্। (রাগিয়া) পাহারাওয়ালা, ইধার আও। এখন আমার কথার জবাব দিবি কি না বল্। এই গোরা কি তোকে মেরেছিল ?

রমণী। মা-বাপ, আমার জামাইকে মারাও যা, আমাকে মারাও তা। একই কথা। (উকীল মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছে ; নাপিত শাশুড়ীর দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেছে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিতেছে, গোরা-সৈনিকের মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে) সমস্ত সহর এ-কথা জানে।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কোন্ কথা জানে ?

রমণী। আমি ভালো স্ত্রীলোক এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্। কিন্তু ও কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

রমণী। আমার লক্ষ্মীর বাবা হুজুরের ক্ষৌরী করত—এই কথা।

ম্যাজিষ্ট্রেট। (তিতি-বিরক্ত হইয়া উকীলের দিকে ফিরিয়া) দেখুন মিষ্টার রামরাশ, প্রতিবাদী আর কাউকে প্রহার করে থাক্‌বে।

উকীল। (এই কথার সূত্র ধরিয়া গোরার প্রতি) এই নাপিত ভদ্রলোকটির উপর তুমি কি মার্‌পিঠ্ করেছিলে ?

গোরা। তুমিই বলো-না যাদু!

উকীল। কথাগুলো একটু ওজন করে বোলো।

গোরা। আমি কথা ওজন করব কি-করে ?

উকীল। তুমি আমার সঙ্গে কথা-কাটা-কাটি করবার জন্য এখানে এসেছ ?

গোরা। তাই কি আপনি মনে করেন ?

উকীল। (খুব রাগিয়া) Hold out your tongue, sir—("hold your tongue" না বলিয়া)।

এই সুযোগ পাইয়া, গোরা সৈনিক খুব গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া, তাহার জিব্ বাহির করিল—(একটা বড় লাল লড়্‌বড়ে

জিনিস্ মুখ হইতে ঝুলিয়া পড়িল)। দর্শকেরা খুব হাসিতে লাগিল। উকীল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। নাপিত, কৃপা ও অবজ্ঞার ভাবে উকীলের দিকে তাকাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ হাসিয়া খুন। আপন মুখের ভিতর রেশমী রুমাল গুঁজিয়া দেওয়ায় দম্ আটকাইবার যোগাড় হইল।

মোকদ্দামা ডিস্মিস্ হইল। (Malabari, "Gujarat and the Gujaratis"—Scenes in a Mofussil Magistrate's Court).

"Indian Mirror" নামক এক হিন্দু সংবাদপত্রে, ইংরেজের সম্বন্ধে লোকের মনোভাব বেশ বিবৃত হইয়াছে :—

"সাধারণতঃ শাসয়িতৃজাতির উপর দেশীয় লোকের একটা বিদ্বেষ আছে বলিয়া দেশীয় লোকের প্রতি যে দোষারোপ করা হয়, তাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হইলেও, ইংরেজ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের আসক্তি ও অনুরাগ দেশীয় চরিত্রের একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ। ভারতের যে-কোন অংশেই ভ্রমণ কর না কেন, এমন একটি স্থানও দেখিতে পাইবে না যেখানে, ভালোই হোক মন্দই হোক, ইংরেজের হাতের ছাপ স্পষ্ট না দেখা যায়। যেমন একদিকে খারাপ ও প্রজাপীড়ক ইংরেজের নাম লোকেরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে, তেমনি আর এক দিকে ভালো ও উদারস্বভাব ইংরেজের নাম বংশপরম্পরাক্রমে লোকের স্মৃতিপটে তাজাভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে ;—ইহা দেশীয় লোকের চরিত্রগত ক্ষমা ও কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়। কাহারো প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করা দেশীয় লোকের স্বভাবই নহে! দেশীয় লোকের হৃদয় স্বভাবত দয়ালু; শাসয়িতৃজাতিভুক্ত কোন লোক এই দয়ার পাত্র হইলে, এই দয়ার মাত্রাটা বরং আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের নিকট সব সময়ে যে আমরা প্রতিদানের প্রত্যাশা করি তাহা নহে, আমরা পতিত প্রজার জাতি, আমরা কত বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট ঋণী,—এই মনোভাব হইতেই আমরা তাঁহাদের উপকার করিবার জন্য সমুৎসুক হই। তাঁরা যদি আমাদের অমিশ্র ভাল করিতেন, অর্থাৎ ভালোর সহিত কিছু কিছু মন্দ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বসিতাম ;—যাঁহারা আমাদের উপকার করিয়াছেন কিংবা উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের এমনই জলন্ত অনুরাগ।

ইংরেজ বলিয়াই আমরা ইংরেজের বিদ্বেষী, একথা নিতান্ত অমূলক। একথা খুবই সত্য, যেসকল য়ুরোপীয়, দেশীয় লোকদিগকে অবজ্ঞা করিবার, গালি দিবার, অবনত করিবার কোন সুযোগই ছাড়ে না, তাহাদিগকে দেশীয় লোকেরা বিদ্বেষ করে। কিন্তু এ কথাও খুব ঠিক্ যে, পাশ্চাত্য জাতির অন্তর্ভূত যেসকল লোক দেশীয় লোকের ভাল করে কিম্বা ভাল করিতে ইচ্ছা করে, তাঁহাদের প্রতি দেশীয় লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অপরিসীম।" (New India" গ্রন্থে উদ্ধৃত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝড়

(গল্প)

আমার বেশ মনে পড়ে, সে-ও এমনি ঝড়ের রাত—চারিধারে বাতাসের এমনি গর্জ্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি! পনেরো বছরের কথা,—তবু মনে হয়, যেন সে কালকের ঘটনা! সেই রাতটিকে যদি আজ আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও ফেরাতে পারতুম!

বাবা আমার মস্ত জমিদার। মানসম্ভ্রম, আদব-কায়দার দিকে পুরোদস্তুর তাঁর টান ছিল—আমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। সকলে বলত, হাঁ, বাপ্‌কা বেটী! মা বলতেন, বাবার অহঙ্কারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে হয়! মেয়েমানুষের পক্ষে ও জিনিষটা যে ভারী সর্ব্বনেশে!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝছি, আমার স্নেহময়ী মার সে কথাটুকু কত খাঁটি! মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে কেন অত তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে! কেন মা, তোমার এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটিকে তার সব অহঙ্কার সব গর্ব্ব চূর্ণ করবার মন্ত্রটুকু যাবার বেলায় শিখিয়ে দিয়ে গেলে না? তাহলে তাকে যে আজ বুকের মধ্যে এমন বেদনা নিয়ে--

সেই কথাই বলতে বসেছি। কোনখানে এতটুকু গোপনতা রাখব না! মানুষের কাছে আমি ত বিচার চাইতে আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া! রাখা-ঢাকার ফাঁকি ত আর নিজের মনের সঙ্গে চলে না।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার লক্ষ্মী মা হঠাৎ একদিন বাড়ীটায় কান্নার রোল তুলে বিদায় নিলেন। বাবা ছিলেন পুরুষ—তিনি সংসারী জীবের এই মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য জেনে মিথ্যা শোকের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন না। তিনি তাঁর জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম—পথ-ঘাট তৈরী, খাজনা-আদায়, বাকী বকেয়া উসুলের দরুণ বেয়াদব প্রজাকে শায়েস্তা-করণ প্রভৃতি—বেশ যথানিয়মেই করতে লাগলেন।

দেখে সকলে বললে, মার মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন, পরেও তেমনি তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধারাটি বেশ অবিচ্ছিন্নভাবেই বয়ে চলেছে। আচার-ব্যবহার বা ভাব-ভঙ্গীতে কোথাও এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না, যা থেকে বাহিরের লোকে কোনরকম বিচ্ছেদ বা অমঙ্গলের আভাষ পেতে পারে! বাড়ীর গুরু-পুরোহিত শাস্ত্র আওড়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এই ত স্থিরধী মুনির লক্ষণ! আর একদল লোক আড়ালে বলাবলি করেছিল, মানুষটাকে কি ভগবান এক ফোঁটা প্রাণও দেন-নি! এ কথাটা খুব অস্ফুটে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও আমার কাণে পৌঁছুতে কিছুমাত্র বাধা পায় নি।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা মেয়ে! বোধ হয়, নিজের সম্বন্ধে এর বেশী আর কোন কথা না বললেও চলে!

লেখাপড়া গান-বাজনা—এই সব নিয়ে বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলছিলুম। বাহিরে বিশ্বের পানে চেয়ে দেখবার অবসর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এল যে বয়স আমার পনেরো পার হতে চলেছে! বাড়ীতে এক বিধবা পিসি ছিলেন; তিনি বাবাকে শুনিয়ে বললেন, এ বয়সে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা কিছুতেই চলে না! ইহলোকে লোকলজ্জা ত আছেই তা ছাড়া পরলোকেও নাকি বিস্তর লাঞ্ছনা জমা হচ্ছে!

বাবা হেসে বললেন, নীরু এখনও ছেলেমানুষ। ওর যখন জমিদারী চালাবার মত বুদ্ধি হবে, তখন ওর বিয়ে দেব!

পিসি বললেন, শোনো কথা! মেয়ে মানুষ আবার জমিদারী চালাবে কি রকম? তার চেয়ে নয় তোমাদের ঐ লেখা-পড়া জানা শান্ত শিষ্ট সুন্দর একটি ছেলে দেখেই বিয়ে দাও; সেও তোমার বশে তোমারই ঘরে থাকবে—জমিদারীও বজায় রাখবে!

বাবা বললেন, বেশী নিরীহ লোক নীরুর সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসি বললেন, তা ঠিক! যে ধিঙ্গি মেয়ে!

পিসির মুখ গম্ভীর হল—বাবা চুপ করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

বিয়ে!

এক-গা গহনা পরে আধ হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে মাটীর পুতুলের মত জড়-ভরতটি হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা ত! পরের ইসারায় নড়া-চড়া খাওয়া-বসা শোয়া-দাঁড়ানো—সুখে হাসতে পাব না, দুঃখে বুক ভেঙ্গে গেলেও একফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার নেই—এই ত বাঙালীর বৌয়ের সুখের ছবি! কাজ নেই আমার অমন সোনার চাঁদ বরের আদরে ডুবে সংসার করা! যেমন আছি, আমি যেন এমনিই থাকি—এই গান-গল্প, খেলা-ধুলো, হাসিখুসি নিয়ে! কোন নতুন লোকের নতুন সঙ্গ-সুখের স্বাদ আমি চাই না!

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন এক দিন বাবা বললেন, চ' নীরু একবার পশ্চিম ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চল।

দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, নানান্ দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কাশীতে আস্তানা পাতলুম। তীর্থ বলে যে কাশীর উপর টান পড়ল, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। জানিনা, বাবা কোনদিন বিশ্বনাথ-দর্শনে গেছলেন কি না—তবে আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। দেবতাকে প্রণাম করতে যাব বলে যাইনি—এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি কেউ নাস্তিক বলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে মুখ ফেরান, তাহলে নিরুপায়। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি। আর বলেছি ত, কারো বিচারের প্রত্যাশী হয়ে আমি নিজের এ

কাহিনী আজ বলতে বসিনি। আমি গেছলুম, মন্দির দেখতে—শুধু সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার কৌতূহল নিয়ে।

এবং এই যে কাশীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা শিবত্ব-প্রাপ্তির লোভে নয়। বাবার এক বন্ধু জুটে গেলেন; ছেলেবেলায় কবে নাকি তু'জনে একসঙ্গে কল্‌কাতার কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন—ভাব ছিল—আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে তু'জনে এই কাশীতে দেখা। তাঁরই বন্ধুত্বের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীরু মা, এখানে আয়, কিছুদিন থেকে যাই।

ঘুরে ঘুরে আমিও একটু শ্রান্ত হয়েছিলুম, বললুম, বেশ!

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিশুবাবু। বিশুবাবু লোকটি ভারী অদ্ভুত ধরণের। আর্য্যামির গর্ব্বে এমনই তিনি আত্মহারা যে পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুকুর-বিড়ালের সামিল বলেই তিনি মনে করতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলত। বাবা যখন সাংসারিক স্বচ্ছলতা বা নানাবিধ আধিভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিশুবাবুর তর্কে আধ্যাত্মিক আগুন এমনি তীব্র তেজে জ্বলে উঠত যে তার দিকে বেশী এগিয়ে যাওয়া যে-কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল না। কারণ বিশুবাবুর তর্কে আগুন যতখানি জ্বলত, গালাগালের ধোঁয়া তার চেয়ে ঢের বেশী উঠত। সে ধোঁয়ায় তাঁর প্রতিপক্ষের চোখে জল বার করে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক আধদিন আড়াল থেকে তাঁর তর্ক-যুক্তি শুনতুম—কিন্তু কোনদিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বিশুবাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে মন আমার অশ্রদ্ধায় ভরে উঠত!

এই তর্কে এক-আধদিন আবার বিশুবাবুর ভাগ্নে তিনকড়ি খুব মৃদু-মন্দ ছন্দে সুর মেলাত। তবে তিনকড়ির বয়স ছিল কাঁচা, কাজেই আর্য্যবংশাবতংস এমন মাতুলের যুক্তি-ধারা সে বেচারা তেমন পরমানন্দে পান করতে পারত না। ফলে অনেক সময়েই ঘটত এই যে তর্কের গোড়ায় মাতুলকে অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ-বরাবর তিনকড়ি বাবার যুক্তির স্রোতে ভেসে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিত! তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা বাতুলের মত হয়ে উঠত! আমি নেপথ্যে বসে এদের কাণ্ড দেখে হেসে সারা হতুম!

একদিন এই তর্কের মুখে ভাগ্নের উপর চটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, তোমার মাথায় যদি এমন সব ম্লেচ্ছ ভাব তাল পাকাতে থাকে তাহলে তোমায় আমার কাছে বাস করতে দেওয়া ত নিরাপদ নয়।

এই আকস্মিক রসভঙ্গে তিনকড়ি একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাবা কোনমতে গোল থামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাঁধনটুকু অটুট রাখলেন।

এর পর কথায় কথায় বাবা একদিন বললেন, বুঝলি নীরু, এই বিশুটা পাগল। এদিকে ত আমাদের চাল-চলন তার পছন্দ হয় না—তবু বলে কি, জানিস,—বলে, ঐ তিন-

কড়ির সঙ্গে যদি তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই! তিনকড়িরও একটা হিল্লে হয়—তাছাড়া—

আমার কাণ দুটো গরম হয়ে উঠল। কি আশ্চর্য্য আজগুবি সাধ! স্পর্দ্ধাও কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে ঘাড়টা নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝছি, তিনকড়িকে বাড়ীতে রাখতে বিশুর আর তেমন ইচ্ছে নেই। ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে চাড় আছে—বিশু বলে, যা-হোক কোন উপায়ে রোজগার করতে লেগে যা!

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে গেলেন; আমিও তাই তাতে কোন রকম সায় বা সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন-কিছু দেখি না। লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়! বাহিরের চেহারা প্রভৃতি ভদ্রসমাজে চলবার মত—কিন্তু বড় গরিব সে! যাক্, কাজ কি আমার মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে!

এর পর একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন দুপুর থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। আমি তা গ্রাহ্য না করে চিরপ্রথামত বিকেলে বেড়াতে বেরুলুম।

কাশীতে স্ত্রীজাতির মস্ত একটা স্বাধীনতা আছে—এজন্য হে তীর্থ, তোমায় নমো নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে এখানে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে তাদের নারী-জন্ম কতকটা সার্থক করতে পায়!

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে অনেকগুলো গলিঘুঁজি পার হয়ে বেণীমাধবের ধ্বজায় এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস বইতে স্বরু হয়েছে। ধ্বজার উপর থেকে ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম। রামনগর থেকে অসি অবধি গঙ্গার উপর দিয়ে এপার-ওপার জুড়ে কে যেন মস্ত একটা স্বচ্ছ বালির দেওয়াল তুলে দিয়েছে! আমার হাতে একখানা রুমাল ছিল—দম্‌কা বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে যে কোথায় চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু-হু করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। তখন ভাবলুম, না, বাড়ী যাই। বেণীমাধব থেকে নেমে আবার গলি ভেঙ্গে একেবারে দশাশ্বমেধের কাছে এসে পৌঁছুলুম। মাথার উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে। দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে কি-রকম একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ উঠছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় ওপার থেকে অদ্ভুত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। আমি বাড়ীর দিকে চলতে লাগলুম। পথে না আছে একখানা একা, না গাড়ী! খানিক আসতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ঝরতে স্বরু হল! গায়ে যেন হাজার তীর ফুটছিল! আমি আরো জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও এদিকে আরো বেড়ে উঠল। আমার গা ছম-ছম

করতে লাগল। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃষ্টিতে আপনি পথে বেরিয়েছেন ?

পা কেমন থম্‌কে থেমে পড়ল। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি, তিনকড়ি ; মাথায় তার ছাতা।

কোন জবাব দিলুম না ; দরকার ছিল না। তিনকড়ি বললে, এই বৃষ্টি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাদটার নীচে দাঁড়াবেন, চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেব।

তবুও কোন কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথায় ধরলে। অমন ভীষণ মুহূর্ত্তেও আমার হাসি পেলে। কি নির্লজ্জ রূপ-যৌবন-লোলুপ পুরুষের এই সেধে সেবা দেবার প্রয়াস ! অভদ্র দাসত্ব-পনা ! কেউ ত তার এ সেবা চায় না ! হায়রে এই পুরুষই আবার শাস্ত্র লিখে স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব খাটাতে চায় ! জেনো, তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল দয়ার পাত্র বলেই স্ত্রীজাতি তোমাদের এই সব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোন দিন কোন কথাটি কয় না—ঘাড় পেতে সমস্ত সহ্য করে যায় ! একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্র ইঙ্গিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শাস্ত্র আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ !

হঠাৎ একটা খেয়াল হল। সামনেই দেখি, এক বড় গাছের নীচে খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট্ট আস্তানা। বোধ হয়, কোন্ সন্ন্যাসী কোন যোগের সুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন—এখন তাঁর সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেই টিনের ছাদ-দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালুম। যতখানি পারে তিনকড়ি আমায় বৃষ্টির জল আর ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় ছাতা ঘিরে আড়াল তুলে দাঁড়াল। ঝড়ের তখন কি সে প্রচণ্ড বেগ—বৃষ্টিরও কি জোর ! মাথার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ এক সময় তার খুঁটির মায়া ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হল। আমায় রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেল্‌লে। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল—তিনকড়ি শেষ টিনের ভার রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল।

ভাল গ্রহ ! তাড়াতাড়ি আমি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাতে তার বেশ জখম ! রক্ত পড়ছে ! আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃষ্টিতে-ভেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলুম। তিনকড়ি ধুঁকছিল।

আমি বললুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ী চলুন। পথে আরো ঢের বিপদ ঘটতে পারে ! দেখুন দেখি, আমার জন্য নিজেকে একেবারে এতখানি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন !

তিনকড়ি আমার পানে চাইলে—বড় করুণ সে দৃষ্টি ! সে দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝলুম তা নয়। সে দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দ্দমনীয় বিজয়-স্পৃহা জাগিয়ে তুললে। একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা হল।

দৃষ্টিতে করুণা মাখিয়ে তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে মেঘের এই চপল লীলা তার উপর এ কৌতুক! সে যে মারাত্মক ব্যাপার!

তিনকড়ি বোধ হয় আমার চোখে সে সময় এমন-কিছু দেখেছিল, যাতে তার সমস্ত সঙ্কোচ চট্ করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠল, আপনার যে গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ! এর জন্য আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হল না। আদরের প্রত্যাশায় পোষা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায় তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইল!

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন, বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে-চেপে আর-একবার ভাল করে জড়িয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আমি আপনাকে ভালবাসি, বড় ভালবাসি। জানি, পাবার নয়, তবু আমার মনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েছে। চলুন, বাড়ী যাই।

বলেই তাকে আর আর দ্বিতীয় কথাটি কবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তায় নেমে চলতে সুরু করলুম। তিনকড়িও আমার পাছু পাছু আসতে লাগল।

বাড়ী ফিরে চা খেয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরে বিছানায় এসে বসলুম। ধব্‌ধব্‌ করছে নরম বিছানা! সামনের টেবিলে বাতি জ্বলছিল; সেই বাতির আলোয় হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, আজ আমার মত সুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন! এমন ঐশ্বর্য্য আমার, এই বয়স, এমন রূপ! মানুষ এর বেশী কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মানুষের কামনা করবার মত বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়ল। মাতুলের ভিক্ষা-অন্নে লালিত, নিতান্তই সে কৃপার পাত্র! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই! আজ ঐ মামা বিশ্বনাথ যদি তাঁকে পথে বার করে দেয়—আজ—এই রাত্রে—এই ঝড়-বৃষ্টির পরে বাহিরের পথ-ঘাট যখন অত্যন্ত কদর্য্য বিশ্রী হয়ে আছে—তাহলে এই কদর্য্য পথে-ঘাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে!

সামনে প্রকাণ্ড আয়না ছিল—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে চেঁচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ মূর্ত্তি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে! বেচারা, বেচারা তিনকড়ি!

মন যখন এমনি গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে বলে উঠল,—এই ত রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বসে আছিস—কে এলরে তোর কুঞ্জ-দ্বারে, কে তার স্তুতিগান শোনাতে এল! আর এই তিনকড়ি—এ মানুষ।

মন আবার চোখ রাঙিয়ে উঠল, বললে, কি! আমি রাজার মেয়ে, আর ঐ তিনকড়ি

পথের ভিখিরী! সে আমায় পুজো করতে পারে, কিন্তু—

ভাবনার আর অন্ত রইল না। হু-হু করে যা-তা ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে!

কিসেরই যে ছাই-পাঁশ ভাবনা! হাসি পেলে! আমি শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কিন্তু সেই এক সুর কানের কাছে বাজতে লাগল, ভালবাসি, ভালবাসি, ওগো বড় ভালবাসি!

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন বোধ হল! জোর করে চাবুক মেরে তাকে সিধে করলুম। তারপর কারা দু'দলে মিলে মনের মধ্যে এক বিষম লড়াই বাধিয়ে দিলে! অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা যাই চল, বাবা, এখানে আর ভাল লাগছে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা আছে মা—

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা! ও আমায় বড্ড ধরেছে। লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হতে চায়, কিন্তু অর্থপিশাচ মামা তার জন্য আর একটা কাণাকড়িও খরচ করতে রাজী নয়। সে বলে, কাশী-হেন স্থান, যাত্রী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি তাতে রাজী নয়। সে বলে, তার মার যা গহনা-পত্র ছিল, সেগুলো দাও, তা বিক্রী করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে দেছে, বলে, গহনা আবার কি! তাই বেচারা আমায় এসে ধরেছে। কি বলিস্ মা?

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! আবার সেই তিনকড়ি! যার জন্য মনের সঙ্গে অহরহ এই যুদ্ধ চলেছে—যার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই, এমনি করে ভূতের মত সে সঙ্গ নেবে! না, কখনো না। কে তিনকড়ি—সে আমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা! না, সে কেউ নয়, কেউ নয়! হতভাগা, বেচারা, পথের এক সামান্য পথিক সে!

বাবা আবার বললেন, তাহলে কি বলিস্ মা?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে চাও না কি?

বাবা বললেন, তুই যা বলিস, তাই করি—

ইচ্ছা হল, বাবাকে বলি, আর ফ্যাসাদ জড়িয়ো না, বাবা! কিন্তু গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, বেশ, কিন্তু আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা হবে না, তা বলে রাখছি। কোথাকার কে, কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধ হয় মন্দ হবে না। ছেলে ভাল, তার মামার মত নয়। তবে হ্যাঁ, এক বাড়ীতে থাকা হয় না—কেন না, আমি আজ কোথায় থাকি, কাল কোথায় যাই, ঠিক নেই—তার চেয়ে ওকে মাসে মাসে বরং কিছু করে দেব, ও কলকাতায় গিয়ে মেসে থেকে পড়ুক। কেমন?

আমি বললুম, বেশ—তাহলে ওকে কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে আরো ক'দিন মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে তারপর কলকাতায় যাব'খন।

কোথায় যেন আমার বাধছিল। গা ছমছম করছিল। তিনকড়ির সঙ্গে আর না দেখা হয়! একটু ভয়ও হচ্ছিল। কিন্তু না, কিসের ভয়! আমি রাজার মেয়ে—তার উপর এই রূপ, এই বয়স! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের সুর তুলবে, আর অমনি আমি—না, না, কখনো না!

তার পর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠল। আমরা তখন কলকাতার বাড়ীতে। অজস্র ফুলের গন্ধে পাখীর গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমারোহ করে আমার হৃদয়-রাজ্যেশ্বর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্দীর রায় বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ যুবার হাতে বাবা আনন্দাশ্রু-চোখে আমায় সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো গান বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অসহ্য সুখের সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠল। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হল, মস্ত একজন সহায় পেলুম, বন্ধু পেলুম, স্বামী, স্বামী, স্বামী! মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখদুঃখ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে প্রাণ আমার কৃতার্থ হল। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ব্ব মায়া-কুঞ্জ আমার চোখের সামনে ধরে দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মত অজস্রভাবে অপরূপ শোভায় ফুটে উঠল।

কিন্তু হায়রে সে কতক্ষণের জন্য!

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের গহনা পরে মনের মধ্যে প্রেমের মণিদীপ জ্বেলে ফুলের বাগান সাজিয়ে বসেছিলুম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণ ভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাব! অস্থির পুলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল—এমন সময় আমার স্বামিদেবতা দেখা দিলেন। হায়, ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে নয়, শান্তি, আরাম, আশ্বাস-ভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয়—চোখ তাঁর জবাফুলের মত লাল, পা টলমল করছে, মুখে বিশ্রী গন্ধ, মদ খেয়ে মাতাল! নিমেষে যেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠল—তার দাপটে আমার প্রাণের মধ্যে সে দীপের আলো নিবে গেল—অত সাধের ফুলের রাশ ছিঁড়ে কোথায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল! সুন্দর মায়া-কুঞ্জ চোখের পলকে শ্মশানের মত বীভৎস হয়ে উঠল। অসহ্য জ্বালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাতিয়ে তুললে। ঘৃণায় আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে ফেললুম, মাথাটা দপ্-দপ্ করে উঠল। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিল, জোরে খুলে ফেললুম। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে যেন অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দিলে! দূর হতে কার বাঁশীর সাহানার সুর ভেসে আসছিল, আকাশে একরাশ নক্ষত্র—মনে হল, সবাই হাসছে, সবার মুখে তীব্র বিদ্রূপ! ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জ্বালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জ্বালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হত!

দেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁচলটা টেনে জড়ানো গলায় ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী—

এক ঝটকায় আঁচল টেনে নিয়ে সরে

দাঁড়ালুম। মাতাল অবাক হয়ে চেয়ে রইল—খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামী-সম্ভাষণ—এই প্রথম, এই শেষ!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছিল। বাড়ী এসে বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাব না বাবা। যদি আর আমায় সেখানে পাঠাও, আমি আত্মহত্যা করব।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এমনি আগুন জ্বলছিল যে তার ঝাঁজ অবধি আমার চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল। আমি বললুম, এক পাষণ্ড মাতাল—

কেঁদে ফেললুম। বাবারও চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি আমাকে বুকের মধ্যে তিনি টেনে নিলেন। বাবার মুখে একটিও কথা ফুটল না।

*

তার পর আবার সেই পুরোনো জীবন-ধারায় গা ঢেলে দিলুম। বাপে-মেয়েতে নানান্ দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে বেড়ানো!

দেবতার কাছ থেকে এত্তেলা এল, পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তাঁরা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জ্জি হয়, দাওগে।

তাঁরা আবার শাসালেন, আদালত আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো!

তারপর সব চুপচাপ।

*

কিন্তু এই নানান্ দেশে ঘুরে বেড়িয়ে, নর-নারীর এই বিপুল মেলায়—তাদের সুখের ঢেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক বিষম দোল দিয়ে যেত! পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, এ সব তেমনি আছে—তবে আমার প্রাণে তারা আর কোন সাড়া জাগায় না! বসন্ত তেমনি আসে, চাঁদ তেমনি আলোর ঢেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব নির্জ্জীব, সব জড়! কুয়াশায় আগাগোড়া কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে দিয়েছে। এক-একবার সেই কবেকার ঝড়ের রাত্রির কথা মনে পড়ত! সেই বেচারা তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনা-ভরা আবেদন! সে যেন একটা স্বপ্ন! মনকে চাবকে বললুম, খবরদার! তোর আপন তেজে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে—মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না তোর! ভেঙে যাস্ যদি, যা—কিন্তু মচকে পড়িস্ নে!

এমনি বিপুল দ্বন্দ্বে মনকে নিয়ে যখন অস্থির, তখন কোথা থেকে বুকে বাজ পড়ল। বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃশ্য লোকে চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ একা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়! আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য—রাজার ঐশ্বর্য্য!

দুদিন পরে আবার এক খবর এল; আমার স্বামী-দেবতা এক গণিকার গৃহে মজলিশ করছিলেন—শেষে এক সময়ে মদের

নেশায় ভালবাসার সীমা দেখাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন! মস্ত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল। বাঃ! আমার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত! চমৎকার!

শ্রান্ত মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ী ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতা-পত্র থেকে মহাল পর্য্যন্ত নিজে দেখে তদ্বির করতে লাগলুম। এক-এক সময় চোখের সামনে পড়ত, গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী ক্ষেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য্য আগুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শুধু খাটছে, খাটছে, খাটছে! তার স্ত্রী ছোট ছেলে-কাঁকালে করে থালায় ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এল। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্ট ছেলেটিকে একটু নাড়া-চাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ী চলে গেল, স্বামী ক্ষেতে খাটতে লাগল! কোথাও-বা স্বামী কাজে বেরুচ্ছে, আর তার তরুণী স্ত্রী লোক-চক্ষু বাঁচিয়ে ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে! অনাদি কালের সংসার তার সরল ধারাতেই বয়ে চলেছে।

দেখে মন আমার হু-হু করে উঠত!

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের ভীষণ যুদ্ধ! ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে ছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছিল।

বৃদ্ধ নায়েব মশায় এসে বললেন, উকিল বাবু এসেছেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহারগাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিল—কাল তাদের নামে নালিশ রুজু না করলে সব তামাদি হয়ে যাবে। তাই আর্জ্জী তৈরি করে আপনাকে তা বুঝিয়ে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেছেন!

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

নায়েব দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছিল—আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এষ্টেটের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সেই দেখছে।

উঠে একটা ইজি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে দাঁড়াল। নিষ্ফলতার তীব্র রোষে মন আমার মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠল। তার পর হাসিমুখে সহজ সুরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি বললে, এই আর্জ্জীগুলো এনেছি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়—

তিনকড়ি পড়তে লাগল। আমার কাণে তার কিছু গেল না। শুধু জাগছিল এক বিষম ঝড়ের হু-হু গর্জ্জন! আর তারি ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছিল অত্যন্ত কোমল সুরে এক করুণ আবেদন, ভালবাসি—আমি ভালবাসি, ওগো, বড় ভালবাসি!

কলের মতই কতকগুলো সই করলুম।

নায়েব মশায় আর্জীগুলো হাতে নিয়ে বললেন, আমি তাহলে তপসীলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

নায়েব মশায় চলে গেলেন।

তিনকড়িও চলে যাচ্ছিল; আমি বললুম, দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক আমার দুর-দুর করে উঠল। আমি বললুম, আর কোন কথা নেই তোমার?

—না।

—নিজের—কোন কথা নয়?

তিনকড়ি চুপ করে রইল।

আমি বললুম, এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট করে এসেছ! এই জল-ঝড়—কোন কথা নেই? একটা নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে, নির্ব্বাক,—মুখ তার মাটীর পানে!

খুব সাবধানে ছোট একটা নিশ্বাস চেপে আমি বললুম, বাড়ীর সব খবর ভাল? বৌ ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

—যাও।

তিনকড়ি চলে গেল। এই সেই তিনকড়ি! একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ড—বিয়ে করে পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করছে!

আর আমিই শুধু সেই কবেকার এক ঝড়কে বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি!

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর সে তেজ, সে গর্ব্ব! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখের জল আর কোনমতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ীর দোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে বাহিরে উদ্দাম ঝড় হা-হা করে গর্জ্জে ফিরতে লাগল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নৈসর্গিকী

তোমারে হেরিনু যবে, বিহগের গানে
যে ভূষাশিঞ্জনধ্বনি শুনিতাম কানে,
যে আঁখিনীলিমা আমি গগনে-গগনে
হেরিতাম সাঁঝে-ভোরে মদির স্বপনে,
যে ঘন কুন্তল-জাল হেরিতাম আমি
বরিষার গিরি-শৃঙ্গে-শৃঙ্গে দিবা যামি,
বসন্ত কাননে আর সায়াহ্ন-আকাশে
যে অধর রক্তিমার চুম্বন পিয়াসে
ঘুরিতাম অন্যমনা। ঢালিত শ্রবণে
যে ভাষা-মাধুরী আহা বীণা-বেণুস্বনে,
তোমা আজি গৃহে আনি তোমা পানে চাই
তার একে একে সবি কেবল মিলাই,
অবাক হইয়া শুধু ভাবি বসে ঘরে,
কেমনে মিলিছে সব অক্ষরে অক্ষরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

অভিনয়ের কথা

জাতীয় জীবন হইতে অভিনয়-কলাকে কিছুতেই ছাঁটিয়া ফেলা চলে না;—সভ্যতার সঙ্গে অভিনয়-কলার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ।

প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের যে কতটা-বেশী চর্চ্চা হইত, সংস্কৃত নাট্য ও কাব্য প্রভৃতিতে তাহার অগুন্তি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে নটের নাম শুনিলেই অনেকে এখন নাক বাঁকাইয়া মুখ ফেরান, সেই নট তখন সমাজের এমন প্রিয়পাত্র ছিলেন, যে দেব-দেব মহাদেবকেও হিন্দুরা নটেশ্বর নাম দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। সেকালে ভদ্রমহিলারাও যে অভিনয়ে যোগ দিতেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। পরযুগে সামাজিক প্রথার অদল-বদল ঘটাতে ভদ্রমহিলারা নাট্যশালা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; ফলে, গৃহলক্ষ্মীদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রঙ্গালয় হইতেও লক্ষ্মী-শ্রী অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু মহিলারা রঙ্গালয় ছাড়িলেও, দেশের লোকেরা অভিনয়ের নির্ম্মল আনন্দ ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। যাত্রা, কথকতা যতই ভাল হউক, তাহাদের ভিতরে অভিনয়ের সমস্ত মাধুর্য্যটুকু ফুটিতে পারে না। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট ও শিক্ষিত পুরুষ অভিনয়-কলাকে উন্নত ও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তখনকার অভিনয় যতই নির্দ্দোষ হউক, রমণীর ভূমিকা পুরুষে নেওয়াতে তাহাও ঠিক স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিল না। এইজন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী ভদ্রলোকের যত্নে ও পরিশ্রমে বাঙ্গলাদেশে নূতন যে রঙ্গালয় স্থাপিত হইল, তাহাতে স্ত্রীলোকের অভাব আর রহিল না। কিন্তু এই নূতন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া, ইহার সহিত অনেকেই সংস্রব রাখিতে চাহিলেন না।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল প্রভৃতি যে-সকল ভদ্রলোক, নব-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক অভিনয়-অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সুধু শিক্ষিত ও শক্তিধর ছিলেন, তাহা নহে;—অভিনয়কে তাঁহারা মনে-প্রাণে আর্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন। সেইজন্য বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রথম অবস্থাতেই আমরা অনেকগুলি ক্ষমতাবান অভিনেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। এখন রঙ্গালয়ে দর্শকের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ভাল অভিনেতার সংখ্যা সেই তুলনায় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ছাড়া এমন আর কাহাকেও দেখি না, আগেকার ভাল

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে যাঁহার নাম করিতে পারি। অবশ্য, এখনকার রঙ্গালয়ে জনকতক চলন-সৈ নট ও নটী আছেন, —তাঁহাদের অভিনয় তবু বসিয়া দেখা চলে; কিন্তু তা-ছাড়া অভিনেতার পোষাকে আর যে লোকগুলিকে তর্জ্জনগর্জ্জন এবং বিনাইয়া-বিনাইয়া ক্রন্দন করিতে শুনি, সারারাত চেয়ারের উপরে হাড়-গোড়-ভাঙ্গা দ'য়ের মত থাড়া বসিয়া-বসিয়া তাহাদের অভিনয় দেখার চেয়ে শ্মশানে-মশানে গিয়া হঠযোগ সাধন করা ঢের—ঢের বেশী সহজ। এতদিনে আমাদের রঙ্গালয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইবারই কথা। কিন্তু উন্নতি চুলায় যাক্, বাঙ্গলা রঙ্গালয় ক্রমেই অবনতির দিকে নামিতেছে। আমাদের মতে ইহার একমাত্র কারণ,—অভিনয় যে একটা আর্ট, রঙ্গালয়ের আধুনিক অভিনেতারা হয় তাহা জানেন না, নয়ত সে শক্ত আর্টকে দখল করিবার শক্তি তাঁহারা রাখেন না! কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে বয়াটে, নিষ্কর্ম্মা ও অপদার্থ লোকগুলি আছে, রঙ্গমঞ্চের উপরে এখন তাহাদিগকে প্রায়ই ভূতের নাচ নাচিতে দেখা যায়। যহিাদের অনাচার-শুষ্ক চেহারা



"দি মেরি ওয়াইভ্‌স্ অফ্ উইণ্ডসরে"
স্যর হার্বার্ট ট্রি, এলেন টেরি ও মিসেস কেণ্ডাল



হ্যামলেটের ভূমিকায় স্যর হেনার আরভিং

দেখিলেই আগা-পাশ-তলা জ্বলিয়া উঠে, নাটকের কথাগুলিকেই যাহারা শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদের অভিনয় সহ্য করার মত বড় শাস্তি নরকেও আছে কিনা, জানিনা।

* *
*

এ-দেশে, যাহাদের কোনদিকে কিছু হয় না, তাহারাই অভিনেতার কাজ গ্রহণ করে। বাঙ্গলায় সখের থিয়েটার যে কত আছে, গুনিয়া উঠা ভার;—কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গে শিক্ষিত সচ্চরিত্র লোকের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে-সব জায়গায় সাধারণত নির্দ্দোষ অভিনয়-কলার উপযুক্ত চর্চ্চা হয় না।

অভিনেতা হইতে হইলে কতটা অন্তর্দৃষ্টি, নরচরিত্রে কতটা অভিজ্ঞতা, কলাশাস্ত্রে কতটা জ্ঞান থাকা চাই! রঙ্গালয় ত

ছেলেখেলার আখ্‌ড়া নয়—সাহিত্যে, শিল্পে ও সঙ্গীতে যাহার ভাল-করিয়া রসবোধ হয় নাই, তাহার যদি অভিনেতা হইবার সাধ হয়, তবে সে সাধের সঙ্গে অনায়াসে 'কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগে'র তুলনা চলিতে পারে। বিলাতের আরভিংএর সমকালিক বিখ্যাত হাস্যরসের অভিনেতা পরলোকগত জে, এল, টুল বলিতেছেন: "I think an actor who loves his profession, sees more of the truly human side of the life than any other man, except in the case of painters like Wilkie, or a novelist such as Dickens; because it is our business to go



"জোয়ান অফ্ আর্কে"র ভূমিকায়
সারা বার্ণাড



"পঞ্চম হেনরি"র ভূমিকায়
স্যর এফ, আর, বেনসন

into the streets, into the slums, into markets and taverns, into society for our models."—ট্রুল আরও বলেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে তিনি মানুষের যে-সব বিশিষ্টতা, জীবনের যে-সব ছবি দেখাইয়াছেন, তাহার কোনটিই কপোল-কল্পিত নহে; পরন্তু, নিত্যদৃষ্ট সংসারে তিনি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে হুবহু তাহারই প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অভিনেতার কাজ যে কত শক্ত, ট্র্যাল তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাহার একটি গল্প বলিয়াছেন। রঙ্গালয়ে একদিন 'মহলা'র সময়ে একটি যুবক অভিনেতা তেমন ভাল ভাবে অভিনয় করিতে পারিল না। এই জন্য ম্যানেজার তাহার উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ট্র্যাল কিন্তু তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহদান করিলেন। ফলে, সে রাত্রে যুবকের অভিনয় মন্দ হইল না।

পরদিন ট্র্যাল বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই যুবকটি তাঁহার কাছে আসিয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল, "মশাই, আমার কালকের অভিনয় বড় খারাপ হয়েছিল। আশা করি, সেজন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না।"

ট্র্যাল মুখ তুলিয়া দেখিলেন, যুবকের দেহে শোকের পরিচ্ছদ!

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার যথাসাধ্য করেছ, তার বেশী আর কি করবে বল?"

যুবকটি তাঁহার পাশে খানিকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া, কেমন-যেন ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর ক্ষুণ্ণস্বরে চুপিচুপি তাঁহাকে বলিল, "আমার কি হয়েছে জানেন? গেল-পরশু আমার মা মারা গেছেন।"

—"শুনে বড় দুঃখিত হলুম।"

—"তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন!"

—এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে, গভীর সাধনা ভিন্ন কেহ-কখনো ভাল অভিনেতা হইতে পারে না। অভিনেতাকে আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়,—নিজের সুখের সময়ে তাঁহাকে পরের জন্য কাঁদিতে হয়, নিজের দুঃখের সময়ে তাঁহাকে পরের জন্য হাসিতে হয়।

বিখ্যাত অভিনেতা আরভিংএর জীবনে সাধনার যে দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইতেন, তখন একেবারে সেই ভূমিকার মধ্যে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যাইতেন। আরভিং কখনো ধরা-বাঁধা রীতির কোন ধার ধারিতেন না; যে-সব ভূমিকায় অন্যান্য অনেক অভিনেতা নাম কিনিয়াছেন, সেই-সব ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আরভিং যতদিন না তাহাতে নূতন আলোকপাত করিতে পারিতেন, ততদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন না। একজন একটি ভূমিকা কোন বিশেষ ভাবে অভিনয় করিয়াছে বলিয়া, আর-একজনকেও যে তাহারই নকল করিতে হইবে—এ নিয়মের কোন মূল্য নাই; কারণ, একের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অপরের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। বাঙ্গলা রঙ্গালয়ে পুরাতন ভূমিকায় যখনি কোন নূতন অভিনেতাকে দেখা যায়, তখনি বোঝা যায় অভিনেতার পক্ষে অনুকরণ কি সাংঘাতিক! আরভিংএর অভিনয়ে এই দোষ ছিল না বলিয়া, তাঁহার দ্বারা অভিনীত ছোটবড় সকল ভূমিকাই পুরাতন হইলেও নূতন সৌন্দর্য্যে এবং অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে সুন্দর ও চমকদার হইয়া উঠিত। কোন নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইলে, আপনাকে তাহার উপযুক্ত করিবার জন্য আরভিং এডিনবার্গের 'ক্যালটন হিলে' চলিয়া



'দি টেমিং অফ দি শ্রু' নাটকে মিঃ ম্যাথিসন ল্যাং ও
মিস হাটিন ব্রিটন।

যাইতেন। সে-সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে পাগল বলিয়া ভাবিত। অনেকদিন নির্জ্জন সাধনার পর তিনি যখন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আবির্ভূত হইতেন, তখন তাঁহার ভাবভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তার ধরন-ধারন অবিকল ভূমিকার উপযোগী হইয়া উঠিত। নট-জীবনের প্রথমেই আরভিং Uncle Dick's Darling নামক নাট্যে Chevenixএর ভূমিকায় ডিকেন্সকে এমনি অভিভূত করিয়াছিলেন যে, ডিকেন্স বলিয়াছিলেন, "এই যুবক একদিন মস্ত অভিনেতা হবে।"

কেবল আরভিং নন,—গ্যারিক, ম্যাক্রেডি, রবার্টসন, ট্রি, বেনসন, আলেকজান্দার, ম্যাথিসন ল্যাং, এলেন টেরি, মিসেস কেণ্ডাল ও সারা বার্নাড প্রভৃতি সমস্ত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী আপনাদের কঠোর সাধনার জোরেই পৃথিবীব্যাপী যশগৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

* *
*

বাঙ্গালী যে সাহেবের মতন ভাল অভিনেতা হইতে পারে, গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু-শেখর এবং কতক-পরিমাণে মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহার উপর, যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অভিনয় করানো হয়, সেই শ্রেণীর ভিতর হইতে যে তারাসুন্দরীর মত প্রতিভাশালিনী নটী আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, এটাও সকলের কল্পনার অতীত ছিল; বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের পক্ষে ইহাও একটা গৌরবের কথা। কিন্তু, কেবল এইটুকুতেই তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গলাদেশের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এমন নাটকের অভিনয় আমরা দেখি নাই বলিলেও চলে, যাহার ভৃত্য হইতে রাজা পর্য্যন্ত ছোট-বড় সমস্ত চরিত্রের ভূমিকাই ঠিক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে! তাহার উপরে, এ-দেশে দৃশ্যপট, নাচ-গান ও সাজ-গোছের অসংখ্য ক্রুটীও দর্শকের রসবোধকে অতি-মাত্রায় আহত করে; তাহাও অবহেলার বিষয় নয়। কারণ, এ-সব বিষয়ের দ্বারা অভিনেতারা পরোক্ষভাবে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন।

ইংরেজী থিয়েটারের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু বাঙ্গলাদেশেও আর্ট বজায় রাখিয়া কতটা সুন্দর অভিনয় হইতে পারে, যাঁহারা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে "বৈরাগ্যসাধন", "ফাল্গুনী", "বৈকুণ্ঠের খাতা", —এবং বিশেষ-করিয়া "ডাকঘরে"র অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশীয় রঙ্গমঞ্চ বলিতে যে বৈচিত্র্যহীন-ব্যাপারের স্মৃতি মনে পড়ে, ঠাকুরবাড়ীর এই সকল অভিনয়ে তাহার লেশমাত্র ছিল না। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অভিনেতাদের সেই ভাবহীন মোমের পুতুলের মত মুখ, বিকটস্বরে চীৎকার বা সানুনাসিক স্বরে ক্রন্দন, 'থিয়েটারী' ঢঙ্গে চলা-ফেরা, দর্শকদের দিকে চাহিয়া অভিনয়-করা, বেখাপ্পা পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বেমানান বিষয়ও এই বিচিত্র অভিনয়ে ছিল না বলিয়া এখানে আসিয়া রসিকের মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক, ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটি অভিনয়ে গভীর ভাব-প্রধান রসে রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ এবং হাস্যরসে অবনীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্বতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, জীবনে তাহা ভুলিবার নয়। 'ডাকঘরে' তরুণ বালক শ্রীমান আশামুকুল যে অভিনয়-কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের অনেক কথাকথিত প্রসিদ্ধ অভিনেতাও তেমন অভিনয় করিতে পারিলে ধন্য হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়ীর এই-সব অভিনয়ে যে রঙ্গমঞ্চগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহা অস্থায়ী বটে; কিন্তু এত সুন্দর, ভাবোপযোগী, রুচিসঙ্গত ও শিল্পরীতিসম্মত যে, তাহারা অনেক তথাকথিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চেরও আদর্শ



হ্যামলেটের ভূমিকায় মিঃ ফোর্ব্‌স্‌ রবার্টসন

হইতে পারে। বিশেষ, 'ডাকঘরে'র অভিনয়ে একটি ঘরের ভিতরে এতটুকু জায়গায় যে স্বপ্নের মত মনোরম ও রূপকথার রাজ্যের মত সুন্দর রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল, আমাদের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা যদি তাহা দেখিতেন, তবে তাঁহাদের চোখও ফুটিত আর শিক্ষালাভও হইত। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা, ক্ষমতা এবং কলাকুশলতা এখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের পেশাদার অভিনেতাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না; তথাপি, অভিনয় যে কত উঁচুদরের আর্ট, তাহাতে যে কিরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টির ও রসানুভূতির প্রয়োজন এবং অভিনেতারা যে মানুষের প্রাণের ভিতরকার সূক্ষ্ম ভাবের তন্ত্রীগুলিকে কেমন-করিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারেন, অন্তত এটুকু অনুভব করিলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষরা অনেকটা উপকৃত হইতেন।

* *
*

আমাদের রঙ্গালয়ের একটা মস্ত খুঁৎ এই, তাহাতে একেবারেই কালোপযোগী নূতনতার বৈচিত্র নাই। য়ুরোপে আজকাল অভিনয় এতটা সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ করিতে পারে যে, মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক্‌' ও আন্দ্রীভের 'দি ব্ল্যাক মাস্কার্‌স্‌' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ও

সেখানে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ে এ-সব নাটকের রস ঠিকমত ফুটাইয়া তোলা ভারি কঠিন; এমন-কি, ঐ-সকল নাটকের কোন-একখানি যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে বাঙ্গালী অভিনেতারা চোখে সর্ষেফুল দেখিয়া, একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবেন। টিনের মর্‌চে-ধরা তরবারি ঘুরাইয়া লম্ফঝম্প ও আকাশভেদী চীৎকারের দ্বারা রুদ্ররস প্রকাশ করা, মুখ-ভ্যাংচাইয়া অট্টস্বরে হাসিয়া হাস্যরস প্রকাশ করা এবং মৃতদেহের পাশে বসিয়া নাকী সুরে কাঁদিয়া করুণরস প্রকাশ করা, বর্ত্তমান যুগে আর চলিবে না। বিংশ-শতাব্দীর যুগধর্ম্মে মানুষের জীবন ক্রমেই ঘটনাশূন্য ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিতেছে; এখন আত্মার ভিতরে যে নানাভাবের অবিরাম ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে, বাহিরের জীবনে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আন্দ্রীভ তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "Is action, in the accepted sense of movements and visible achievements on the stage, necessary to the theatre?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন, "না, ইহার কোন দরকার নাই।" যেহেতু, "Modern life itself in its most tragic aspects tends to withdraw farther and farther from external activities and deeper and deeper into the recesses of the soul, into the silence and outward calm that characterises mental life."

অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য যখন মানব-জীবনের প্রতিরূপ-দেখানো, তখন বর্ত্তমানের যুগধর্ম্মে মানব-জীবনে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, অভিনেতাও তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারে না। য়ুরোপের রঙ্গালয়ে তাই এখন মানুষের বাহিরের খোলস ছাড়িয়া ভিতরকার প্রাণের গতি ও লীলা দেখানো হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'রাজা' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি, বর্ত্তমান কালের উপযোগী নাটক। এ-শ্রেণীর নাটক লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা-ভাষায় এক নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এই নূতন ধারাকে দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিবার সাধ্য বা সাহস বাঙ্গলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাই!

রঙ্গালয় জাতীয় জীবন-গঠনে সাহায্য করে। বেশীদিনের কথা নয়,—এই 'স্বদেশী'র যুগেও 'প্রতাপাদিত্য', 'সিরাজ-উদ্দৌলা', 'মীরকাশীম', 'ছত্রপতি' ও 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অভিনেতারা দেশময় যে প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আমরা তাহা ভুলি নাই। আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজ রঙ্গালয়ে যতটা সহজে সারা যায়, ততটা আর কোথাও নহে। রঙ্গালয়ে গেলে সাধারণ লোকের হৃদয় আপনা-আপনি উন্নত, ভাবুক ও রসগ্রাহী হইয়া উঠে। কবির কাব্য যাহারা পড়িয়া বুঝিতে পারে না, অনেক সময় অভিনয় দেখিয়া তাহারা সেটির ভিতরের কথাটি তলাইয়া বুঝিতে পারে,—এ-হিসাবে সাহিত্য-প্রচারের পক্ষেও রঙ্গালয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের

অধিকাংশ সঙ্গীতের সঙ্গেই সর্ব্বসাধারণের পরিচয় নাই; কিন্তু তাঁহার যে গানগুলি রঙ্গালয়ে গীত হইয়াছে, সেগুলি হাটে-ঘাটে-মাঠে, সব জায়গাতে, সব সমাজে চলিয়া গিয়াছে। কোন জাতিকে ভাল করিয়া জানিতে-বুঝিতে হইলে রঙ্গালয়ে যাওয়ার মত সহজ উপায় আর নাই। যে জাতির যেমন মতিগতি, যেমন আচার-ব্যবহার, যেমন সমাজ ও ধর্ম্ম, যেমন ভাষা ও সাহিত্য, এক রঙ্গালয়ের মধ্যে তাহার সমস্তটুকু মস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। রঙ্গালয়ের এমনি যে কত গুণ আছে, বলিয়া তাহা ফুরানো যায় না। কিন্তু এতবড় প্রশস্ত একটা ক্ষেত্র,—আবাদ করিলে যাহাতে সোনা ফলিত, তাহা যে অবহেলায়-অনাদরে পতিত জমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা।

যতদিন অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল প্রভৃতি প্রতিভাবান ও ক্ষমতাবান পুরুষের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গলার রঙ্গালয় চলিত, ততদিন অভিনয়ে তবু অনেকটা শ্রী-ছাঁদ ও পদার্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু, এখন অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্র মৃত; অমৃতলালও রঙ্গালয় হইতে অপসৃত; ফলে, রঙ্গমঞ্চে যে সঙের নাচ চলিতেছে, তাহার সহিত কোন সমঝদারের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। বাঙ্গলায় এখন কি এমন শক্তিমান কেহ নাই, আমূল সংস্কার দ্বারা যিনি রঙ্গালয়কে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লক্ষ্মীছাড়া

(গল্প)

বসন্তকাল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সমিকিনদের বাড়ীর কাছে নদীর ধারে এক গাছের তলায় বলদেইয়া বসিয়াছিল। বলদেইয়ার বয়স সতেরো বৎসর, মুখে গোঁফের রেখাটি দেখা দেয় নাই—সুন্দর মুখ। বলদেইয়ার মন আজ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। তিনটি ধারা বহিয়া এই অপ্রসন্নতার স্রোত ছুটিয়াছিল।

প্রথম ধারা,—কাল তাহার স্কুলের পরীক্ষা। দুইবার সে প্রোমোশন পায় নাই, এবার পাশ না হইলে স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিবে।

দ্বিতীয় ধারা,—সমিকিনদের বাড়ী এই ছুটি কাটাইতে আসিয়া তাহার মাথাটা যেন কাটা গিয়াছে। সমিকিনরা বড় লোক—সে গরীব বিধবার ছেলে। তাহার মনে হইত, সমিকিনরা তাহার মাকে ও তাহাকে নিতান্ত কৃপার চোখে দেখিয়া থাকে—আহা, গরীব অনাথ, আশ্রিত! তাহার উপর মার আজগুবি রকমের বড়মানুষির গল্প!

শুনিয়া রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। একবার সে সমিকিনদের বড় মেয়েকে মার এই গল্পে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিতেও দেখিয়াছিল। সেই দিনই রাত্রে বিছানায় শুইয়া মাকে সে কত করিয়া সাধিয়াছিল, চল মা—আমরা চলে যাই, এখানে আমার এগ্‌জামিনের পড়া হচ্ছে না। মা সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলে, দু'দিন আপনার-জনের কাছে একটু জিরুতে এসেছি, তাও তোমার প্রাণে সইছে না। অভিমানে বল্‌দেইয়া সে রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছিল—চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে নাই। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, একবার বাড়ী ফিরিলে হয়—জীবনে কখনো আর সে এই বড় লোক আত্মীয়দের চৌকাঠ মাড়াইবে না।

তৃতীয় ধারা,—এইটার কথা মনে হইলেই বলদেইয়ার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিত। বড় লজ্জার কথা এ! তাহার মনে হইত, সমিকিনের ভাইঝী আনাকে সে ভালবাসে। আনার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর—তবুও কেমন হাসি-হাসি তার মুখখানি, কেমন ডাগর চোখ, নিটোল গড়ন, আর রংটুকুও—যেন পাকা আপেলের মত। নিখুঁত সুন্দরী! একসঙ্গে সব ভোজনে বসিলে যখন গল্পে পরিহাসে আনা মৃদু হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিত, তখন বলদেইয়ার আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেও থাকিত না। সমস্ত নয়ন-মন দিয়া সে আনার রূপ-মাধুরী পান করিত। আনা যদি সহসা সে-সময় তাহার পানে চাহিত ত, বলদেইয়া লজ্জায় ঘাড় নামাইত। আনা চলা-ফেরা করিত, চারিধারের বাতাস এসেন্সের গন্ধে ভরিয়া উঠিত—সে বাতাস সে গন্ধের স্পর্শে বলদেইয়ার শরীরে রোমাঞ্চ হইত। একান্তে বই খুলিয়া বসিলে বইয়ের হরফ কোথায় উবিয়া যাইত—চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ফিরিত, শুধু আনার অপরূপ লাবণ্য-ভরা সুন্দর মূর্ত্তি!

আনার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিদেশে কি-একটা সহরে কাজ করে—শনিবার রাত্রে এখানে আসে—রবিবার থাকিয়া আবার সোমবার চলিয়া যায়! আনাকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে এই ইঞ্জিনিয়ারের উপর দারুণ ঘৃণায় বলদেইয়ার মন ভরিয়া উঠিত। ইঞ্জিনিয়ারটি কিন্তু কোনদিন বলদেইয়ার সঙ্গে কোন বিবাদ করে নাই; একটি রূঢ় কথাও কোনদিন বলে নাই; বরং সে মাঝে পিঙ্-পঙ্, ছিপ প্রভৃতি আনিয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিল। বেচারা ইঞ্জিনিয়ার!

আজ এই নিভৃতে গাছের তলায় বসিয়া পরীক্ষার কথা ভাবিতে ভাবিতে আনাকে দেখিবার অদম্য স্পৃহা বলদেইয়াকে মাতাইয়া তুলিল। বলদেইয়া নভেল পড়িয়াছে বিস্তর। প্রেম জিনিষটা কি, তাহার মর্ম্মও যে সে একেবারে না বুঝিত, এমন নয়। এই যে আনাকে দেখিবার এত সাধ, আনাকে দেখিতে এত ভালো লাগে, না দেখিতে পাইলে মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, অথচ দৈবাৎ আনা তাহার দিকে চাহিলে লজ্জায় সে মাথা তুলিতে পারে না—এক আনাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যে নানা ভাব মনের মধ্যে তাল পাকাইতে থাকে—এ কেন? কেন হয়? এ কি প্রেম? কে জানে! কিন্তু আনার

বয়স যে তাহার চেয়ে অনেক বেশী—তা-ছাড়া তার স্বামী আছে!

আজ এখন বসিয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, না, এ ত প্রেম নয়। সতেরো বৎসর বয়সের ছেলে ত্রিশ বৎসরের মেয়ের প্রেমে পড়ে—এমন কথা ত কোন দিন কোন উপন্যাসেও কেহ লেখে নাই! বিশেষ সে মেয়ের আবার বহুদিন বিবাহ হইয়া গেছে। এ তবে—এ—

হঠাৎ এমন সময় পাতার মধ্যে একটা খস্-খস্ শব্দ তাহার কানে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল, কে?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

বলদেইয়া সে স্বরে শিহরিয়া উঠিল! এ স্বর কাহার, সে জানে। এ স্বর যে তাহার হৃদয়-কুঞ্জে বুলবুলের গানের মত অহর্নিশি বিরাজ করিতেছে! কোন মতে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলদেইয়া মাথা তুলিয়া চাহিল।

সে আনা।

আনা কহিল, এখানে বসে কি হচ্ছে বলদেইয়া? কি ভাবছ! কল্পনা-রাজ্যে উধাও হয়েছ না কি? কবিতা লেখা ধরেছ! তবু জবাব নেই! আচ্ছা, দিন-রাত কি তুমি ভাবো, বল দেখি আমায়।

বলদেইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সব তাহার গোলমাল হইয়া গেল। কোনমতে সে আনার মুখের দিকে চাহিল। আনা সদ্য এই নদীতে স্নান সারিয়া আসিয়াছে। তাহার কাঁধে তোয়ালে—পিঠের উপর কোঁকড়া ঢেউ-তোলা চুলের রাশি থলো থলো ঝরিয়া পড়িয়াছে, ব্লাউসের উপরকার বোতামটা খোলা—কাঁধ ও গলা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, রঙ অমনি ধব্‌ধব্ করিতেছে—খোস্‌বু সাবানের গন্ধে চারিধার মাতোয়ারা। আনা যেন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে!

বলদেইয়ার মুখে কথা ফুটিল না—সে নির্ব্বাক স্তম্ভিত দৃষ্টিতে শুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, মুখে কোন কথাই নেই যে! না হয় কবিতাই লিখছ, তবু একজন স্ত্রীলোক সেধে কথা কচ্ছে, তা জবাব নেই! এটুকু ভব্যতারও ধার ধারো না? বলি, কি হচ্ছে বসে-বসে! কবিতা, না, দর্শন? এই ত তোমার দোষ! কথা নেই, কিছু না—খালি মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছ। কি—কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

বলদেইয়া আনার কাঁধে-ঝোলানো তোয়ালেটার পানেই চাহিয়া রহিল।

আনা কহিল, তবে দাঁড়িয়েই থাকো তুমি, কথা কয়ো না। এ কিন্তু প্রেমিকের লক্ষণ আগাগোড়াই দেখছি। বলি, কার প্রেমে পড়েছ, বল না বলদেইয়া—!

আনা একটু কাছ ঘেঁষিয়া আসিয়া বলদেইয়ার হাত ধরিল; বলিল, চুপি চুপি বল না আমায়। কাউকে বলব না আমি।

বলদেইয়ার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলদেইয়া কহিল, তোমায় ভালবাসি!

আমায়? আনা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, তা বেশ! আমার খুব সৌভাগ্য বলতে হবে, এখন—

বলদেইয়া হঠাৎ আনার হাতটা নিজের

দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি আমি তোমায় ভালবাসি! বলদেইয়ার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত জগৎ এক-নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহার মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীকে কে যেন ঐ রঙিন তোয়ালেটায় ঢাকিয়া দিয়াছে! সে বিহ্বল হইয়া পড়িল, তাহার চেতনাও লোপ পাইল।

যখন জ্ঞান হইল, তখনও সেই সাবানের গন্ধে বাতাস মাতাল হইয়া আছে। আনা নাই, শুধু একটা নিষ্ঠুর উচ্চ হাস্যরব ছুরির ফলার মত তাহার স্মৃতিকে বিঁধিয়া আছে।

সমস্ত ব্যাপারটাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ছি, ছি, এ সে কি করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় মনের অত্যন্ত নিভৃত গোপন বেদনাটুকুকে নিষ্ঠুর জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে!

সে ভাবিল, এ মুখ এখন বাড়ীতে সকলকে দেখাইব কি বলিয়া? আনা কি মনে করিল? নিশ্চয় সে ভাবিয়াছে, কি বর্ব্বর পশু এই বলদেইয়া! আনা হাসি-ভরা চোখে তাহার পানে দুই-একবার যা-ও একটু চাহিয়া দেখিত—এখন হইতে সে দৃষ্টির হাসিটুকু ত আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না! এই অপমানের পর আনা যে তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিবে—বিষ-দৃষ্টিতে দেখিবে!

সে ভাবিল, আর নয়—রাত্রি আটটায় একটা ট্রেন আছে, সেই ট্রেণেই চুপি চুপি সে বাড়ী পলাইবে।

২

সন্ধ্যার পর চোরের মত নিঃশব্দে বলদেইয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। আসিয়া ঘরে অন্ধকারে হাতড়াইয়া জামা, বই প্রভৃতি নিজের দ্রব্যগুলা সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া লইয়া যেমন সে বাহির হইবে—আনার স্বর কাণে গেল। শেষবার শুনিয়া লই—ভাবিয়া সে দ্বারে কাণ পাতিল। পাশের ঘরে আনা, সমিকিন-গৃহিণী, তাহার মা—প্রভৃতি সকলে গল্প করিতেছিল। আনা বলিতেছিল, ওর পাশের আশা তুমি ছেড়ে দাও, মাসিমা! ও বেশ প্রেমিক হয়ে উঠেছে। এই আজ আমারি হাত ধরে দিব্যি বললে কি না, আমায় ভালবাসে! শুনে আমি ত আর হেসে বাঁচি না!

ঘরে অমনি হাসির ঝড় বহিয়া গেল।

বলদেইয়ার কপাল ঘামিয়া উঠিল। কি এ বর্ব্বরতা! না হয় এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মনটাকে সে বশে রাখিতে পারে নাই—দৈবাৎ তাহার গোপন বেদনাটুকু প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছে—তাহার জন্য সহানুভূতি দূরে থাক, শুধু এই পরিহাস,—নিতান্তই ক্রূর মর্ম্মান্তিক পরিহাস! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। আর এ বাড়ীতে এক মুহূর্ত্তও নয়! অত্যন্ত সাবধানে সে বাহির হইতে গেল। কিন্তু পাটা কেমন করিয়া চৌকাঠে বাধিল; সশব্দে সে আছাড় খাইয়া পড়িল। মেয়েরা বলিয়া উঠিল, কি? তখনই শশব্যস্তে সব আসিয়া আলো জ্বালিয়া দেখে—বলদেইয়া।

আনা কহিল, এই অন্ধকারে এমন

করে ভূতের মত চলতে হয়! খুব লেগেছে? আহা, দেখ দেখি!

মা বলিল, সাধে বলি, ও ভূত!

সমিকিন-গৃহিণী বলিল, ও পুঁটুলি কিসের রে?

আনা স্বহস্তে পুঁটুলি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, এ কি! নিজের বইটই গুছিয়ে বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল, এই অন্ধকারে? কবিতা লিখতে সেই নদীর ধারে না কি?

আনার এ বিদ্রূপে বলদেইয়ার মনে হইল, এই দণ্ডে যদি তাহার মৃত্যু হইত! হায় নারী, তোমাকে ভালবাসিয়া সে এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে তাহার এ গভীর দুঃখে খোঁচা দিয়া এমন রূঢ় পরিহাস কর!

মা বলিল, কোথায় যাচ্ছিলি শুনি, এই রাত্রে?

বলদেইয়া কহিল, বাড়ী যাচ্ছিলুম। কাল আমার এগ্‌জামিন।

মা বলিল, সে ত কাল ভোরের গাড়ীতে গেলেও ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবে—তাই ত ঠিক আছে। হঠাৎ এই রাত্রেই কি এমন তাড়া পড়ে গেল যে—

বলদেইয়া বলিল, না, এই রাত্রের গাড়ীতেই আমার যাওয়া চাই।

আনা কহিল, মাসিমাকে তাহলে কাল সঙ্গে নিয়ে যাবে কে?

বলদেইয়ার রাগ হইল। আনা আবার হুল ফুটাইতে আসিয়াছে! একটু দুঃখও হইল,—আর-কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বেশ কড়া জবাব দিত। কিন্তু আনার প্রশ্নে কড়া জবাব মুখে আসিল না—একটু কোমল স্বরে সে কহিল, তা আমি জানি না।

মা কি ভাবিতেছিল—আনা তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, বেশ ত মাসিমা, তুমি তাহলে এখানেই থেকে যাও। পরে বলদেইয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমার এগ্‌জামিন হয়ে গেলে তুমিই এসে মাসিমাকে নিয়ে যেয়ো, বলদেইয়া। এসো মাসিমা, আমরা খেলিগে।

বলদেইয়া নিমেষ দৃষ্টিপাতে দেখিয়া লইল, আনার হাতে তাস। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল। মিথ্যা সে পলাইতে চায়—ইহাদের প্রাণে একটুও তাহাতে আঁচ লাগিবে না! ইহারা বেশ নিশ্চিন্ত চিত্তে আমোদ-আহ্লাদ লইয়াই মত্ত থাকিবে, আর সে—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর জগৎ, তার চেয়েও নিষ্ঠুর, হায়রে, এ জগতে নারীর প্রাণ!

বলদেইয়া আর তিলমাত্র সেখানে দাঁড়াইল না—সটান্ বাহির হইয়া পড়িল।

মা কহিল, ওরে কিছু খেয়ে যা—

না, তাহলে ট্রেন পাব না। ষ্টেশনেই আমি কিছু খাব'খন। পয়সা সঙ্গে আছে।

বলদেইয়া চলিয়া গেল।

৩

গ্রামের পথ। সন্ধ্যার পর এখানে সহরের মত নর-নারীর ভিড় জমিয়া উঠে না। লোকালয় ছাড়িয়া বলদেইয়া ক্রমে মাঠের ধারে রাস্তায় আসিল। ষ্টেশনে হাঁটিয়া যাইতে হইলে এইটাই ছিল সোজা রাস্তা। মাঠের মাঝে-মাঝে বড় গাছ—কোথাও-বা গরিবের কুটীর—তথা হইতে

আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে। দূরে থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ডাকিতেছে। বল্‌দেইয়ার প্রাণটা কেমন ছাৎ করিয়া উঠিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব ক্ষণে পলাইবার পক্ষে তাহার যতখানি উৎসাহ ছিল, পথে পা দিয়া সে উৎসাহ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিবার পর ফিরিবার দিকেই মনটা বিষম ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার উপর সকালে এগ্‌জামিন দিতে হইবে—এ কথাটা মনে পড়িতেই তাহার গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল। আর আনা! আহা, সেখানে থাকিলে আনাকে সে তবু চোখে দেখিতে পাইত। আবার কবে আনার সঙ্গে দেখা হইবে? দেখা হইবে কি না, তাই বা কে বলিতে পারে! আনা নাই ভালবাসুক, তবু সে ত তাহাকে চোখে দেখিয়াই সুখী!

হায়রে, সে যদি আরো বিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মাইত! তাহা হইলে আনাকে বিবাহ করিয়া জীবনটাকে ধন্য করিবার সম্ভাবনা মিলিত। কোথায় থাকিত তখন ঐ হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার? আনাকে ফেলিয়া কখনও সে বিদেশে চাকরি করিতে যাইত না। প্রতি সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া আনার হাত ধরিয়া এই আলো-আঁধার-ভরা স্বপ্ন-ঘেরা গ্রামের পথে বেড়িয়া বেড়াইত, দুইজনে সুখ-দুঃখের কত কথা কহিত—আর ঐ বেচারা ইঞ্জিনিয়ারটা হয়ত দূর হইতে তাহাদের এ মিলন দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যাইত! বেচারা ইঞ্জিনিয়ারের দুর্দ্দশা কল্পনা করিয়া বলদেইয়া সত্যই হাসিয়া ফেলিল।

স্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল। হায়রে, সবই শুধু জল্পনা এ। বেচারা সে এই রাত্রে পথ হাঁটিয়া ষ্টেশনে চলিয়াছে, কাল এগজামিন; আর ইঞ্জিনিয়ার ওদিকে সুখ-নিদ্রায় বিভোর—আনাও হয়ত স্বপ্নে ঐ ইঞ্জিনিয়ারটারই হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে!

সহসা সম্মুখে আলোর সারি তাহার চোখে পড়িল। এই ত ষ্টেশন! সহসা ভূত দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, বলদেইয়া তেমনি চমকাইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঐ ষ্টেশনে টিকিট কিনিয়া একবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেই—ব্যস্, কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! না, না, সে যাইবে না, আনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না! আবার সেই সমিকিনদের বাড়ীতেই ফিরিবে! সে-বাড়ী ছাড়িয়া আর-কোথাও যাওয়া তাহার হইতেই পারে না।

ষ্টেশনের বাহিরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়া বসিয়া পড়িল; ষ্টেশনে ঢুকিল না। তারপর ওধারে কখন্ যে ঘণ্টা পড়িল এবং সশব্দে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল, আবার যাত্রী উঠাইয়া-নামাইয়া বাঁশী বাজাইয়া হুস্ হুস্ শব্দে চলিয়া গেল, এ সব তাহার খেয়ালই হইল না! ট্রেন চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে হঠাৎ যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল, তখন হুঁস হইল। একটা কুলিকে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ট্রেন চলে গেছে?

কুলি কহিল, অনেকক্ষণ।

বলদেইয়ার মনে হইল, আঃ, খুব সে বাঁচিয়া গিয়াছে। বুকের উপর হইতে

একখানা ভারী পাথর সরিয়া গেল; বুকটা হাল্কা বোধ হইল। সে মহা-উল্লাসে উঠিয়া আবার সমিকিনদের গৃহে ফিরিল।

আনা, মা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তখনও তাস খেলিতেছে। হঠাৎ বলদেইয়াকে ফিরিতে দেখিয়া মা কহিল, কি রে, ফিরে এলি যে?

—ট্রেন ফেল হয়ে গেল।

আনা কহিল, যাক্ বাপু আপদ গেছে। এই রাত্রে ছেলেটা বেরিয়ে গেল, মনটা কেমন ভয়-ভয় কচ্ছিল। আর এই রাত্রেই যাবার অত কি তাড়া পড়েছিল! নাও, এখন কিছু খাও—খেয়ে শুয়ে পড়গে। কাল আবার ভোরে যাবার হাঙ্গাম আছে ত! মাসিমা, ওঠো বাপু, আর খেলে না! ছেলেটা হাঁটাহাঁটি করে সারা হয়েছে, ওকে কিছু খেতে দাওগে।

বলদেইয়ার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এই পথ হাঁটার অত কষ্ট আনার মুখের মিষ্ট কথায় ঘুচিয়া গেল। কোন মতে মুখে কিছু খাবার গুঁজিয়া একেবারে বিছানায় ঢুকিয়া সে মনের রাশ ছাড়িয়া দিল।

ভাবনার কি আর সীমা ছিল! আনার নানা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আনাকে নানাভাবে দেখিয়া তৃপ্তি যেন আর হয় না!

৪

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। বাহির হইতে মা ডাকিল, বলদেইয়া—বলদেইয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, নদীর ধারে গাছতলায় সে শুইয়া আছে—আর নদীতে আনা স্নান করিতে নামিয়াছে। বল্‌দেইয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে আনার পানে চাহিয়া—আনা হঠাৎ ডাকিল, বলদেইয়া। বল্‌দেইয়া চাহিয়া দেখিল। আনা কহিল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাসো বল্‌দেইয়া, তাহলে আমি এই জলে ডুবিয়া মরিব। বল্‌দেইয়া মুখে কৌতুকের হাসি হাসিয়া চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। আনা কহিল, ভালবাসিবে না? বল্‌দেইয়া তবু কোন কথা বলিল না। আনা কহিল, তবে এই দেখ, আমি ডুবিয়া মরি। বলিয়াই সে অগাধ জলে ভাসিয়া গেল। বল্‌দেইয়া সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, জলে ঝাঁপ দিতে যাইবে—ঠিক এমনি সময়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আবার কে ডাকিল, বল্‌দেইয়া, ও বল্‌দেইয়া শুনতে পাচ্ছিস্?

মা ডাকিতেছিল।

বলদেইয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

মা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, লিলির বড্ড অসুখ করেছে। এ ঘরে একটা ওষুধ আছে, তাই নিতে এসেছি আমি।

লিলি সমিকিনের ছোট মেয়ে।

বল্‌দেইয়া কহিল, কি অসুখ?

ও সেই পুরোনো ব্যাপার। নে, তুই ঘুমো—তোকে আবার কাল এগ্‌জামিন দিতে যেতে হবে।

মা শেল্‌ফ্ হইতে একটা শিশি পাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই আনার গলা শুনা গেলে বলদেইয়া শুইয়া পড়িল। বল্‌দেইয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—ঐ যে আনা। সে তবে নদীতে স্নান করিতে যায় নাই। আঃ! আনা তখনই

বলদেইয়ার ঘরে আসিয়া ডাকিল, বলদেইয়া ঘুমুচ্ছ নাকি ?

বলদেইয়ার মনে হইল, সে কি এখনো স্বপ্ন দেখিতেছে ? সে চোখ খুলিল না।

আনা আবার ডাকিল, বলদেইয়া—

না, এ ত স্বপ্ন নয়। বলদেইয়া ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আনা কহিল, মাসিমা অন্ধকারে একটা এসেন্সের শিশিই নিয়ে গেছে। তুমি উঠে দেখত, ঐ সেল্‌ফে মরফিন্ আছে। সেইটে চাই—লিলির সেই পায়ের যন্ত্রণাটা আবার বেড়েছে—কিছুতে ঘুমুতে পাচ্ছে না, বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির করে তুলেছে।

আনা বাতি লইয়া সেল্‌ফের কাছে আসিল। বলদেইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া শিশি পাড়িল; আনা আরো কাছে আসিয়া শিশির গায়ে আঁটা লেবেল লাগিল। বলিল, এইটেই ত ? দেখ দেখি।

আনার নিশ্বাস বল্‌দেইয়ার গায়ে লাগিল। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বুকের স্পন্দন যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তারপর আনা কহিল, আমি কাচের গ্লাস আনছি, তুমি তাতে দু ফোঁটা ঢেলে দাও দেখি।

আনা গ্লাস লইয়া আসিল। বল্‌দেইয়া ঔষধ ঢালিল, অনেকগুলা ফোঁটা পড়িল। আনা হাসিয়া কহিল, আচ্ছা এ যাহোক! দাও, আমায় দাও।

আনা শিশি কাড়িয়া ঔষধ ঢালিতে বসিল — বল্‌দেইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে আনার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌মন্ করিয়া উঠিল। সে ডাকিল, আনা

চমকিয়া আনা বল্‌দেইয়ার পানে চাহিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আনা কহিল, ও কি ? অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় বল্‌দেইয়া আবার ডাকিল, আনা—চোখ তাহার আচ্ছন্নের মত বুজিয়া আসিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আনা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল—ঔষধের শিশি রাখিয়া নিজের বুকে বলদেইয়ার মাথা রাখিয়া মুখে ধীরে ধীরে আনা হাত বুলাইয়া দিল; সম্মুখে গ্লাসে জল ছিল, চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে বলদেইয়া চোখ মেলিল! চোখ মেলিয়া আবার ডাকিল, আনা—

কি বলদেইয়া ?

—তুমি বড় সুন্দর, আনা। তোমায় আমি ভালবাসি। আনা তীব্র দৃষ্টিতে বলদেইয়ার পানে চাহিল। বল্‌দেইয়া আর কোন কথা কহিল না—পাগলের মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া শুধু আনার পানে চাহিয়া রহিল। আনা তীব্রকণ্ঠে ডাকিল, মাসিমা—

মা আসিয়া কহিল, কেন ? কি হয়েছে ? ...এ কি ?

আনা কহিল, ছেলের গোঁয়ার্ত্তুমির ফল। ঐ রাত্রে অত পথ না খেয়ে একলা হেঁটে যাওয়ার ফল! ওষুধটা পাড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে গেছল—যাক্, ভয় নেই, সামলেছে। তুমি ওকে একটু বাতাস কর দেখি। আমি লিলিকে ওষুধটা দিয়ে এখনই আসছি।

৫

সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বল্‌দেইয়া অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। নানা চিন্তার ভারে সে জর্জ্জরিত আকুল হইয়া উঠিল। নিজের উপর ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল। আনা—একজনের স্ত্রী সে, তাহাকে ভালবাসার কথা বলিয়া কতখানি তাহাকে সে অপমান করিয়াছে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রে এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সূর্য্যের অমল রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, লতায়-পাতায় সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে; পাখীর দল নানা ছন্দে গান ধরিয়াছে, চারিধারে জীবনের বিচিত্র কলরব ছুটিয়াছে। বল্‌দেইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নূতন আলোয় জগৎ আজ ভরিয়া গিয়াছে! কোন খানে এতটুকু কালিমা নাই, গ্লানি নাই, সমস্তই সুন্দর! সে আলোর স্পর্শে তাহার মনের ভিতরকার ঘন অন্ধকার মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। সূর্য্যের এই স্নিগ্ধ আলোয় দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবীতে এত আলো, কি এ নির্ম্মল উজ্জ্বল, মহিমাময়! এমন সজীব, সুদৃঢ় জীবন চারিধারে! গত রাত্রির কথা মনে পড়িলে অসহ্য অনুতাপে মন ভরিয়া গেল। এই নির্ম্মল সূর্য্য-কিরণে কি বিচিত্র মাধুরী, কি অপূর্ব্ব মহিমা!

মা আসিয়া বলিল, এত দেরী করে ওঠে! শীগগির খেয়ে নে। গাড়ী তৈরী। এখনি না বেরুলে ট্রেন ধরতে পারবি না।

খাওয়া শেষ করিয়া মা ও ছেলে আসিয়া গাড়ীতে বসিল। আনা ও তাহার স্বামী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইঞ্জিনিয়ার কাল রাত্রে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে কহিল, এগজামিন দিয়ে আবার এসো, বল্‌দেইয়া। আমি কিছুদিন ছুটি নিচ্ছি এবার, আনাকে নিয়ে এবার এক জায়গায় বেড়াতে যাব। ওর সাধ, তোমাকেও আমরা সঙ্গে নিই। সে বেশ হবে—ক'জনে খুব বেড়াব; আমরা দুজনে শীকার করতেও যাব'-খন।

আনা কহিল, বেশ মন স্থির করে এগজামিনটা দিয়ো বল্‌দেইয়া। এখন শরীর বেশ সুস্থ বোধ কচ্ছ ত?

বল্‌দেইয়া অবাক হইয়া গেল। কি সহজ সুর, আশ্চর্য্য ভঙ্গিমা, এই আনার। কাল সে তাহাকে অমনভাবে অপমান করিয়াছে—সে কথা আনা একটুও আর মনে রাখে নাই! অমন হাসিমুখে সুরে এতখানি স্নেহ ঢালিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছে! আনা, আনা, তুমি——? তাহার চোখে জল আসিল।

গাড়ীতে উঠিয়া মার পানে দৃষ্টি পড়িতেই কিন্তু রাগে সে একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল। মার দিব্য সুসজ্জিত বেশ—বড়লোক আত্মীয়দের বাড়ী হইতে চাহিয়া-লওয়া একটা শাল সগর্ব্বে মা গায়ে জড়াইয়াছে।

বলদেইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, মা—

মা কহিল, কি?

—তোমার লজ্জা হচ্ছে না? এই রকম সাজ-সজ্জা করে পথে বেরুতে? তুমি এই যে আগাগোড়া পোষাক পরেছ, এ তোমার নিজের নয়, ধার-করা ভিক্ষে-মেগে-নেওয়া—ছি!

মা রাগিয়া কহিল, তোর যে বড় মুখ হয়েছে, দেখছি!

—চোখ রাঙাচ্ছ কি মা? ঘৃণায় আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে যাচ্ছে। ফেলে দাও, ফেলে দাও তোমার ঐ ভিক্ষে-মাগা পচা শাল। ওর চেয়ে তুমি গরীব, তোমার সে ছেঁড়া কাপড়ে তোমায় রাণীর মত দেখায় যে!

মা বলিল, সকল-তাতে তুই কথা কস্‌নে, বলছি। থাম্। মাকে অপমান!

—অপমান! মান তোমার কিছু আছে, কিছু কি আর রেখেছ মা? এই বড়লোক আত্মীয়দের কাছে মিথ্যে বড়মানুষির গল্প করে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মনের অগোচর পাপ নেই। তুমি ভাব, তোমার ঐ গল্প তারা বিশ্বাস করত! না। ঘৃণায় তারা মুখ টিপে হাস্‌ত।

মা বলিল, আবার!

—তুমি শাল খুলবে না? বেশ, তোমার শাল মুড়ি দিয়ে তুমিই থাকো। কিন্তু আমার এ সহ্য হচ্ছে না। আমি তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে তাহলে যেতে পারব না। আমি কোচবাক্সে উঠে বসিগে।

মা বলিল, দেখ্, পাগলামি করিস্ নে। কোচম্যানটা কি মনে করবে?

—কি আবার মনে করবে! সে কি কিছু বোঝে না, ভাবো? সে ও শাল খুব চেনে—সে মুখ টিপে মুচকে হাসচে, বুঝছে, কাঙ্গালী কুটুম এসেছিল, আজ ঐ পচা পা-মোচা শালখানা বিদেয় পেয়ে বাড়ী ফিরছে!

বলদেইয়া সজোরে চলন্ত গাড়ীর দ্বার খুলিয়া পথে লাফাইয়া পড়িল। মা ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে শিহরিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোনরূপ চীৎকার করিল না। ব্যাপার দেখিয়া কোচম্যান গাড়ী থামাইল—বলদেইয়া কোচ বাক্সে উঠিয়া বসিল। বাহিরে কি চমৎকার হাওয়া! মার প্রাণও একটু আশ্বস্ত হইল—কোচম্যানটা কিছু বুঝিতে পারে নাই।

৬

সহরে এক বড় বাড়ীর দুইটা ঘর ভাড়া লইয়া মা-ও ছেলে থাকিত। আয় অল্প। সে আয়ে কোনমতে ঘরের ভাড়া ও ছেলের স্কুলের মাহিনা দিয়া যাহা থাকিত তাহাতে এই দুইটী প্রাণীর কোন রকমে চলিয়া যাইত। মার মনে সুখ ছিল না—কারণ, মা ছিল সৌখীন—বড়লোক আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখিয়া চালটাও তাহার বড়মানুষি রকমের দাঁড়াইয়াছিল। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে কোনদিন আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই, প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে খুঁটিনাটি লইয়া বিবাদ বাধিত। স্বামী বেচারা মনের সুখে চিরদিনই বঞ্চিত ছিল—মরিবার সময় তাই সে বেশ হাসিমুখেই মরিয়া ছিল।

বলদেইয়া বাড়ী ফিরিয়া ঘরে বসিয়া সেই সব কথা ভাবিতেছিল। ভবিষ্যৎ ত তাহার অন্ধকার! জীবনে এতটুকু স্ফূর্ত্তি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। এ-সব যাহাদের থাকে না, তাহারা তবু ভবিষ্যতের একটা আশা লইয়া কোনমতে দিন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার এমন একটু ক্ষীণ আশাও নাই

যার মুখ চাহিয়া এই নীরস লক্ষ্মীছাড়া দিনগুলা সে কাটাইয়া দিতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা দপ্-দপ্ করিয়া উঠিল। বলদেইয়া এগজামিন দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু স্কুলে গেল না। মাঠের ধারে ঘুরিয়া সে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ধারে আসিয়া বসিল। সামনে নানা বনফুলের গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া আছে, নানাবর্ণের প্রজাপতির দল উড়িয়া বেড়াইতেছে! কি স্বচ্ছন্দ, লঘু গতিটুকু! দূরে পাঁচ-ছয়জন ছেলে-মেয়ে খেলা করিতেছিল। ওধারে এক বেঞ্চে বসিয়া তরুণ প্রণয়ী-প্রণয়িনী প্রাণের কথা কহিতেছে! সকলেরই মনে কত সুখ, কত আনন্দ! বলদেইয়ার মনের-মধ্যকার অন্ধকারটুকু আরো নিবিড় হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর সে বাড়ী ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মা বন্ধুদের লইয়া গল্পগুজবে মত্ত; ছেলের পানে চাহিয়াও দেখিল না। মা বলিতেছিল, সমিকিনরা—ওঃ কত বড় মানুষ! অগাধ টাকা! মাদাম সমিকিন হল আমার মামাতো বোন—সে ব্যারণের মেয়ে—আমায় কি ছাড়তে চায়? বলে, এত ঘর-দোর—এইখানে থাকো। তোমার কি সে দারিদ্র্যে পোষায়! রঙ একেবারে কালি মেড়ে গেছে। এত দুঃখে-কষ্টে বাঁচবে কেন? তা ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটার জন্যই না শুধু—

বলদেইয়া হাঁকিল, মা—সে স্বরে মা চমকিয়া উঠিল।

মা বলিল, কি বলছিস্ রে?

—কেন ওসব আজগুবি রূপকথা নিয়ে তুমি আসর জমাচ্ছ! তুমি ত জানো, যা বলছ ও সব মিথ্যে—

মা জ্বলিয়া উঠিল। এত-বড় অপমান—এমন করিয়া অপ্রতিভ করা, তাও নিজের ছেলে হইয়া—! মা বলিল, কি মিথ্যে বলেছি—?

—ঐ সব ব্যারণ ফ্যারণ। তুমি যেমন অবস্থার লোক, তোমার তেমনি থাকাই ভাল। সেখানকার আদর-যত্ন! লজ্জা করে না সে কথা বলতে! বাঁদীর মত মোসাহেবের মত তাদের মন জুগিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে তোমার? তাহলে সেখানেই যাও। এখানে কেন! আমি তোমায় আমার সঙ্গে আসতে বলিনি ত এখানে!

মা রাগে কাঁপিতে লাগিল। বন্ধুর দল অবাক—কেহ-বা মুখের কষ্টে হাসি চাপিল।

বলদেইয়া আর মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না। বিষ! বিষ! চারিধারে শুধু বিষ! ধনের বিষ, গর্ব্বের বিষ! পৃথিবীটা বিষম বিষে বিষাইয়া উঠিয়াছে! কোথায় রে কোথায় সে ঠাঁই—যেখানকার নির্ম্মল নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবনের অমন প্রকাণ্ড সূচনা আজিকার প্রভাত-সূর্য্য, পাখীর গান, কর্ম্ম-কলরব বিচিত্র বর্ণে জাগাইয়া তুলিয়াছিল?

পাশের একটা ঘরে আসিয়া টেবিলের সম্মুখে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলদেইয়া বসিয়া পড়িল। কি বিশ্রী কদর্য্য এ জীবন—শুধুই এখানে গ্লানি ও পঙ্কিলতার দূষিত বাষ্প উঠিতেছে! অসহ্য!

মাথা তুলিয়া সে দেখে, অদূরে দেরাজের

মাথায় কি একটা পদার্থ মুখ বাড়াইয়া পড়িয়া আছে। কি ওটা? বলদেইয়া উঠিয়া সেটা হাতে লইল, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল—একটা পিস্তল। মুখে তাহার হাসি আসিল। সে পিস্তলের একটা ঘোড়া টানিল—আর একটা টানিল। শুধু আওয়াজ হইল, টিক্-টিক্! কি নিরীহ মিষ্ট সুর! তারপর একদৃষ্টে সেটার পানে সে চাহিয়া রহিল। জীবনে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও সে রিভলভার হাতে করে নাই।

বাহিরে কে শিষ দিতেছিল—সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন মৃদুকণ্ঠে গান ধরিয়াছিল। প্রেমের গান! বাঃ, ইহারা ত বেশ মনের সুখে আছে এখানে!

অলক্ষ্যে বলদেইয়া রিভলভারের আর একটা ট্রিগার টানিল—রিভলভারের মুখটা তাহার দিকেই ফেরানো ছিল। হঠাৎ সেটা চোখ রাঙাইয়া চাহিল, বলদেইয়ার মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা ধাক্কা লাগিল—চক্ষু মুদিয়া টেবিলের নীচে সে সজোরে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তে সে দেখিল, তাহার চোখের সম্মুখে তাহার পিতা—মাথায় সাদা টুপি, দুই হাত বাড়াইয়া তিনি বলদেইয়াকে কোলে ডাকিলেন। বলদেইয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িল—তারপর দুইজনেই এক গভীর অন্ধকারময় গহ্বরে কোথায় তলাইয়া গেল। চারিধার সব ঝাপ্‌সা আঁধার ......! *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধে যে আত্মকর্তৃত্ব-বাদ প্রচার করিয়াছেন, তার প্রতিবাদ হিসাবেই হোক বা অনুবাদ হিসাবেই হোক্ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ভাদ্রের "নারায়ণে" "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" লিখিয়াছেন। তিনি যত বড় মনীষীই হোন্ সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর মতকে চূড়ান্ত মত মনে করাটা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়, কেননা সকলেই জানেন যে এ সকল বিষয়ে নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার তরফে এক তরফা বিচার করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্র ও সমাজ-তন্ত্রতার তরফে সে বিচারের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেইজন্য বিপিনবাবু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই মেজাজ এত ঠাণ্ডা যে তাঁরা বাদ-প্রতি-

---

* আন্তন্ শেকভের গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে।

বাঘকে ডরান্। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম করার সংস্কার যে আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গেছে, এটাও তার একটা উদাহরণ। তাঁরা বলেন, তর্কের দ্বারা কি কোন কিছুর মীমাংসা হয়? "তর্কে বহুদূর"। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তর্ক-ভীরুতার এই যে সংস্কার, এর কারণ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের দেশে "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল" ইত্যাকার নৈয়ায়িক ঢেঁকির কচ্‌কচি হইয়া গেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা না থাকিলে বস্তুজ্ঞান একেবারে লোপ পায়, তখন অন্বীক্ষার (inferencc) জন্য উপযুক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। সে অবস্থায় তর্ক জিনিসটা কূটতর্ক হইয়া বিষম উৎপাত উপস্থিত করে। কিন্তু যে তর্ক-প্রণালী বিজ্ঞান-সম্মত, তাকে আশ্রয় না করিলে তত্ত্ব-বিচার হইবে কি উপায়ে? সেই প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-বিজ্ঞান রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক মানব-বিজ্ঞানগুলির উৎপত্তি হইয়াছে।

বিপিনবাবুর প্রবন্ধকে ঠিক্ প্রতিবাদ বলা যায় না, কারণ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মের" আসল বক্তব্য সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মতদ্বৈধ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মের ও আচার বদ্ধ সমাজের যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তার অনেক কথাই সত্য। গতানুগতিক ধর্ম্ম যেভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলে, তাহাতে ধর্ম্মাচরণ সম্ভব হইলেও, ধর্ম্মসাধন সম্ভব নয়; এ কথা শতমুখে স্বীকার করি।" সুতরাং বিপিন বাবুর লেখাটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ না বলিয়া অনুবাদ বা অনুবৃত্তি বলিলেই ঠিক্ হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মোট কথাটা ছিল এই যে, 'কর্ত্তার-ইচ্ছায়-কর্ম্ম' এই নীতি যে সমাজের চরম নীতি, সে সমাজে প্রতি ব্যক্তির আত্মকর্ত্তৃত্বের কোন স্থান থাকে না। সামাজিক ব্যাপারে যারা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব চালনা করিবার অধিকার পায় নাই, সহসা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্বের চর্চ্চায় সফল হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যদি আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার আমরা সত্যসত্যই চাই, তবে সামাজিক ব্যাপারে সে অধিকারকে সঙ্কুচিত করিলে চলিবে না।

এই শেষ কথাটুকু মানিতে বোধ হয় বিপিন বাবুর আপত্তি আছে। শুধু বিপিন বাবু কেন, অনেকেরই আপত্তি আছে। ইউরোপে, যে সকল জাতি রাষ্ট্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তারা যে ধর্ম্মে ও সমাজে সকল রকম অর্থহীন আনুগত্য ও আচার-বশ্যতাকে অস্বীকার করিয়া তবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইয়াছিল, ইতিহাসে এমন নজির মেলেনা। ধর্ম্মে শাস্ত্র ও চর্চ্চানুগত্য ইউরোপে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সমাজেও আচারবশ্য জাতি ইউরোপে এখনো বিরল নয়। বস্তুত রাষ্ট্র-ব্যাপারে আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করার দরুণই ইউরোপে ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যাপারেও অধীনতার নাগপাশবন্ধনগুলি খুলিয়া গিয়াছে—মানুষের অধিকারকে যে কোথাও সঙ্কুচিত করা চলিবে না, এ বোধ ইউরোপীয় জাতিদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গেছে। প্রটেস্ট্যান্ট ইংলণ্ডে,

এমন কি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বাদিগের নানা বিষয়ে অধিকার ছিল না—অবশেষে Catholic Emancipation Bill যে পার্লামেণ্টে পাস্ করা হয়, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন উদার ভাবের প্ররোচনায় হয় নাই। অধিকারকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করা দরকার, সেই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই ইংরেজেরা বিল্ পাস করেন। স্পেনের আরমাডা যে ইংরেজের কাছে হার মানিয়াছিল, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করিয়াছেন এই যে, স্পেনের হালে বুড়ী বসিয়াছিল। কিন্তু তারও আবার কারণ এই যে, স্পেনে তখনও প্রজাতন্ত্র কোন আকারেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যে জাতি রাষ্ট্র-ব্যাপারে একবার আত্মকর্ত্তৃত্ব-চালনার সুযোগ পাইয়াছে, সে ক্রমশ তার সমাজেও সে অধিকারের পথকে প্রশস্ত করিয়া তোলে, ইউরোপের ইতিহাস হইতে এই শিক্ষাই আমরা পাই।

কিন্তু এও যে একতরফা কথা। ইউরোপে রেনেসাঁসের নবযৌবনের দক্ষিণে বাতাসটা যদি এক সময়ে না বহিত, তবে তার মধ্যযুগীয় চর্চ্চ এবং সমাজের জরাজীর্ণ নানাবন্ধন-জর্জ্জর শাখায় শাখায় প্রাণের প্রবাহ আর কোন কালেই দেখা দিত না। ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে অধীনতাই ছিল মধ্যযুগের আদর্শ; অর্থাৎ পূরাদস্তর 'কর্ত্তার-ইচ্ছায়-কর্ম্ম'। সেই আদর্শের জায়গায় ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে অধিকার ও কর্ত্তৃত্বলাভের সুযোগকে প্রশস্ত করিবার আদর্শকে দাঁড় করাইবার জন্য শুধু রেনেসাঁসের মত

—রেফরমেশন Reformation ও ফ্রেঞ্চ রেভোলুশনের (French Revolution) মত প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিপ্লবেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। রেনেসাঁসে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্মেষ; রেফরমেশনে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ; ফ্রেঞ্চ রেভোলুশনে গণতন্ত্রতার প্রতিষ্ঠা। এই তিন আন্দোলনের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়—তিনের যোগেই ইউরোপ তার মধ্যযুগীয় বন্ধন-কারার শেষ প্রাচীরটাকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মের" মূল কথাটা এই যে, ইউরোপ তার মধ্যযুগের বন্ধন-দশার গণ্ডী কাটাইয়া বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার উন্মুক্ত রাজপথে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমরা এখনো, এই বিংশ শতাব্দীতেও, সেই মধ্যযুগীয় গণ্ডীর আবরণের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া আছি। অর্থাৎ আমরা এখনো দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীরই লোক।

বিপিনবাবু লিখিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের দেশের জনসাধারণে যে ভাবেই শাস্ত্রানুগত হইয়া চলুক না কেন, সাধকেরা কোনও দিন, তিনি যে শাস্ত্রানুগত্যের অনিষ্টকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন, সেভাবে শাস্ত্র মানিয়া চলেন নাই। যাঁরা এদেশে ধর্ম্মসাধন করেন, কেবল ধর্ম্মাচরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না, তাঁরা সর্ব্বদাই সত্য বস্তুকে ও তত্ত্ববস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন কেবল শাস্ত্র বা গুরুমুখে তার কথা শুনিয়া কোনও দিন তৃপ্ত রহেন নাই। * *

খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে সেই একই বাইবেল একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র হইয়া আছে। এই বাইবেলের অনেক টীকা-টিপ্পনি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তার এক পংক্তিও প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আর আমাদের দেশে যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ও সেই আত্ম-প্রত্যক্ষের অভিধানের সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় মধ্যে পূর্ব্বতন শাস্ত্রের সমান মর্য্যাদা ও অধিকার পাইয়াছে।

* * *

"ফলত রবীন্দ্রনাথ আমাদের শাস্ত্রকে যেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী রাজার বেশে সাজাইয়া সেদিন আসরে নামাইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে ভারতের শাস্ত্র কোন দিন সেরূপ ছিল না, কখনও সেরূপ নাই।

সাধকেরা কি ভাবে শাস্ত্র মানেন কিম্বা শাস্ত্র কি ভাবে মানা উচিত, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে" কোন আলোচনাই করেন নাই। মুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, বুদ্ধি বিচারকে বিসর্জ্জন দিয়া যে শাস্ত্রানুগত্য বা আচারবশ্যতা ভারতের অগণিত জনগণের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহারি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বিপিনবাবু যেভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্যকে মানিবার কথা বলিয়াছেন, আধুনিক যুগগুরু রাজা রামমোহন রায় সেই ভাবেই সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। "তহ্‌ফাতুল মোহাযেদীন"—প্রণেতা রামমোহন এবং "বেদান্ত গ্রন্থ" প্রকাশক রামমোহন একই রামমোহন নন্। ফরাসী বিপ্লবের মুখে রামমোহনের জন্ম; ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা; শাস্ত্র গুরু পুরোহিত প্রভৃতি সকল শাসনকে অস্বীকার করিবার ভিতর দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় অসাধারণ মনীষীকেও এক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তিনি অনুভব করিলেন যে, শুধু যুক্তিতেই (Reason) মানুষের মুক্তি নাই; যুগ যুগের মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাশির সঙ্গে প্রতি সাধকের স্বাধীন বুদ্ধির সামঞ্জস্য না ঘটিলে মানুষের মুক্তি যথার্থ মুক্তি হইবে না। মানুষের ধর্ম্ম ও সমাজের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবেই যে মানুষের বন্ধনের কারণ একথা সত্য নয়; কারণ তাদের মধ্যেও কোথাও না কোথাও মুক্তির ইঙ্গিত আছেই; সেই ইঙ্গিতগুলিকে বুদ্ধির সাহায্যে উদ্ধার করিলে তবেই আবার তাদের নূতন যুগধর্ম্মোপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা যায়। "বেদান্ত গ্রন্থে"র "অনুষ্ঠানে" রামমোহন তাই লিখিয়াছিলেন, "আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি।"

রামমোহন রায় যে শাস্ত্রপ্রামাণ্য মানিয়াও শাস্ত্রকে বুদ্ধির কষ্টি পাথরেই কষিয়া দেখিতেন তার প্রমাণ ঐ ভূমিকাতেই পাই। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে লোকের আপত্তি এই যে, "পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথাকরণ অতি অযোগ্য হয়"। রামমোহন রায় ইহার উত্তরে লেখেন

"ইহার সাধারণ উত্তর এই যে, কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু-জাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষ-গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে কারন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে।"

রামমোহন রায় আচারকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছিলেন; তিনি আচারকে লোকস্থিতির একটা উপায় বলিয়া মনে করিতেন মাত্র। "ধর্ম্মাধর্ম্ম এ সকল অন্তঃ-করণ-বৃত্তি হয়েন—সুতরাং আচারাদির পরমার্থ-সাধনের সহিত সম্বন্ধ নাই"। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্ম্মকে তার আচার হইতে মুক্ত করিয়া তবে তার বিশ্বভৌমিক স্বরূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করা যাইতে পারে, ইহাই রামমোহন রায় মনে করিতেন।

রামমোহন রায়ের ভাবে শাস্ত্রকে রবীন্দ্র-নাথ interpret করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র বিচারহীন শাস্ত্রানুগত্য বা আচার পালনকে নিন্দা করিয়াছেন। রামমোহন রায় তাঁর চেয়েও তীব্রতর ভাষায় এ সকলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। উপরে উদ্ধৃত তাঁর বাক্যই তার প্রমাণ।

অতএব বিপিনবাবু রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই, তাহা-দিগকে আসরে নামাইয়া আনিয়া যে বাদা-নুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র নাথের প্রবন্ধের বিশেষ কোন যোগ নাই।

বিপিনবাবুর বহুদিনকার মন-গড়া কতকগুলি সিদ্ধান্ত আছে; সেগুলি বস্তুতন্ত্র "বস্তুতন্ত্র" কিনা তার খোঁজ তিনি লইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রগুরু সব বাদ দিয়া নিজের "স্বাভিমত"কেই ধর্ম্মের প্রামাণ্য মনে করিয়াছিলেন—এ একটা তাঁর মন-গড়া সিদ্ধান্ত। তাঁর আর একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "মহর্ষির প্রভুতার প্রতিকূলে আপনার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেন" বলিয়াই মহর্ষি ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর দলের "স্বাধীনতার মর্য্যাদা" রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৎপ্রণীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতে বিপিন বাবুর এই সকল সিদ্ধান্তের খণ্ডন আছে। মহর্ষি "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের" প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে যে সকল সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, উপনিষদে তাহাদের অনুরূপ বাক্য যেখানে যেখানে যাহা যাহা পাইয়াছেন তাহাদিগকেই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রকে অস্বীকার করা হয় না। কেশব চন্দ্র প্রভৃতি নবীন দল প্রাচীনদলের "স্বাধীনতার মর্য্যাদা" রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত পড়িলে এ কথাটা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ রূপেই অবান্তর প্রসঙ্গে—অতএব এইখানেই এটাকে বন্ধ করা দরকার।

বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা

"নারায়ণে" শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ

প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

তিনি লিখিয়াছেন, "চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে সুর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাংলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা ত মনে করি, এইরূপে বাংলার ভবিষ্যকে আমরা খর্ব্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। * *

"এই নব যুগের পূর্ব্বে বাংলা কি ছিল, তার যথাযথ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডীদাসে, আর কি হইতে পারে তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডীদাস। তার ভাব তার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাতন্ত্র্যটুকু তাহারই পরিস্ফুরণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন এক প্রাদেশিকতা, একটা সঙ্কীর্ণতা, একটা "ঘরমুখো" প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উদার বহুতরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব।

"কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যেদিন বাঙ্গলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সেদিন তাহার সে পূর্ব্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা ও নূতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নূতন মূর্চ্ছনার অনুরূপ তাহার ভাষার নূতন সুর—নূতন ছন্দ। আর তারই ফল বিদ্যাসাগর—মধুসূদন। হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ, ভাষায় যে সব নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, তাহা সব টিঁকিবার নয়, টিঁকা উচিতও নয়। কিন্তু তাঁহারা বাংলা ভাষায় যে গুরুত্ব, যে একটা লাতিন প্রতিভা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাংলার চিরসম্পদ, তাহা শুধু অতীতের এক ক্ষণিক বিকৃতি নহে; পরন্তু মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস।

"ইংরাজী ভাষাতেও চসার ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—"The wells of English undefiled"—তাঁহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার, গৃহস্থালী ভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজ জাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপূর হইয়া উঠিল, তাহার কর্ম্মবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্ম্মবীর রোমকের ভাষা সে সহজেই আপন করিয়া লইল। আর তারই ফল সেক্সপীয়র মিল্‌তন। ... শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই—ইংরাজ যেমন সহজে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই।"

সুতরাং লেখকের মতে 'বঙ্গভাষার'ও যেমন স্থান আছে, 'বাংলা ভাষার'ও তেমনি স্থান আছে। লেখকের শেষ কথা এই যে "বাংলার হৃদয়ে এতখানি

উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়।"

আমার মনে হয় লেখক চলিত ভাষা ও সাধুভাষার মধ্যে যে ভেদ-রেখা টানিতেছেন, সে ভেদ-রেখা বস্তুত বর্ত্তমান নাই। প্রাচীন বাংলার ঠাট্ আছে বটে, কিন্তু চলিত ভাষা এবং তখনকার বাংলার চলিত ভাষায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মাঝে বিদ্যাসাগর—মধুসূদনের যুগে সংস্কৃত সাধু-ভাষার যে পালাটা চলিয়াছিল, তার দরুণ, এখনকার চল্‌তি ভাষাতেও সংস্কৃতের একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে। লেখক ঠিকই লিখিয়াছেন, "থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিত-পন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক্ না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া।" কিন্তু সে প্রভেদটাকে তিনি যতখানি তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তাকে ততটা তুচ্ছ করিবার হেতু নাই। যে ভাষাকে চলিতে হইবে, তাকে অনাবশ্যক ভারমুক্ত হইতেই হইবে। বাংলার ক্রিয়া-পদের মত এমন জবরজঙ্গ জিনিস বাংলা ভাষায় আর কিছুই নাই। কথিত ভাষায় সেইজন্য স্বভাবের নিয়মে তার ভারগুলি আপনিই লাঘব হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কবিতাতেও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদেরই ব্যবহার দেখিতে পাই। শুধু গদ্যে তার প্রচলন নাই—প্রচলন যদি হয়, তবে তাহাতে ভাষাটা হাল্কা ঝর্‌ঝরে হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি?

চল্‌তি ভাষার ক্রিয়াপদের আরও সুবিধা আছে। বাংলা ভাষায় accent নাই—এজন্য বাংলা গদ্যই পড়ি বা পদ্যই পড়ি, সমস্তই কেমন sing song গানের সুরের মত করিয়া পড়িতে হয়। চল্‌তি ভাষার ক্রিয়াপদ হসন্তবহুল বলিয়া তবু ভাষাটাকে একটু ধ্বন্যাত্মক করিয়া তোলে। ভাষার মধ্যে ছন্দোরক্ষার জন্য ঐ রকম ক্রিয়াপদের প্রচলন আধুনিক কবি ও লেখকগণ বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকেন।

তারপর লেখক ভাষা ও ভঙ্গিমা এই দুইটা জিনিসকে যেন কতকটা এক করিয়া মিশাইয়া দেখিতেছেন। ভঙ্গিমা বা style কোন ভাষার ঠাটের অপেক্ষা রাখে না বলিয়াই বোধ হয়। Style এর নির্ভর প্রতিভার উপর; প্রতিভাই ষ্টাইল সৃষ্টি করে। নূতন ষ্টাইল্ যখন কোন ভাষায় দেখা দেয় তখন সে ভাষাও অপূর্ব্বতর হইয়া উঠে। তখন সে যে কোথা হইতে তার উপকরণ সংগ্রহ করে সে হিসাব রাখা শক্ত হয়। কিন্তু এই সকল বিচিত্র ভঙ্গিমার দ্বারাই ভাষার স্বরূপের নির্ণয় হয় না। শেক্‌স্‌পীয়র মিল্‌টন্ যেমন চশারী ভাষাকে ছাড়াইয়া গেছেন, আধুনিক ইংরেজি তেম্‌নি শেক্‌স্‌পীয়ারী ইংরাজীকে ছাড়াইয়া গেছে। অথচ তা বলিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের ষ্টাইলের বিশেষত্ব ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। তাহা আপনার প্রয়োজনে আপনি কালে কালে পরিণত হইতে থাকে—তার প্রয়োজন মানে সমস্ত জাতীয় মনের বিচিত্র প্রকাশের প্রয়োজন। শেক্‌স্‌পীয়ারী ভাষায় এখনকার কালের ইংরেজ-মন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে

না বলিয়াই সে ভাষার এখন কোন লেখকই রচনা করিতে প্রস্তুত নন্।

বাংলা ভাষাও তেমনি বাঙালীর মনের বিচিত্র প্রকাশের অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সেজন্য এ ভাষাকেও racy হইতে হইবে, ইহার বাহুল্যগুলি ক্রমশঃ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ইহাকে বেগশালী করিতে হইবে। যাঁরা চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী, তাঁরা ভাষাকে কোন একটি বিশেষ ভঙ্গিমা বা style এ আবদ্ধ রাখিতে চান্ না। তাঁরা সংস্কৃত কেন, ইংরাজীও বাদ দিতে চান্ না। তাঁরা চান্ ভাষাটাকে ভারমুক্ত করিতে, ছন্দোময় করিতে, শক্তিশালী করিতে। বীরবলের style ও ঘরে-বাইরের style এক নয়। খেয়ার style ও ক্ষণিকার style এক নয়; তেম্‌নি খেয়ার style ও বলাকার style ও এক নয়। Style যত ইচ্ছা বিচিত্র হোক্, তাতে চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতীদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

হিতবাণী। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। 'দৈনিক চন্দ্রিকা' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। 'নানা পুস্তক' ও 'নানা মুখ' হইতে লেখক যে সকল হিতবাণী 'আহরণ করিতে' পারিয়াছেন—তাহাই "হিতবাণী রূপে প্রকাশিত হইল।"

মধুপর্ক। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এ খানি ছোট গল্পের বই; গুরুদাস লাইব্রেরীর আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একবিংশ গ্রন্থ। প্রকাশক মহাশয় সুলভে সৎগ্রন্থ-প্রকাশের এই যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই তিনি ধন্যবাদ-ভাজন। এ গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে—সবগুলিই সুন্দর। তবে "উন্মাদ" "কুসুম" ও "অশ্রু" এ তিনটি গল্প বঙ্গসাহিত্যে সম্পদ স্বরূপ—ছোট গল্পের আর্ট এগুলিতে পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়াছে। "ডাকাত" হাস্যরসে পরিপূর্ণ। "নিয়তিতে" লেখক মানব-জীবনের করুণ বেদনাটুকু সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখকের ভাষায় ছন্দ আছে, সুর আছে; রচনা-ভঙ্গীতে প্রাণ আছে এবং তাহা সংযত। ব্যঙ্গেও লেখকের শক্তি বেশ। রোমান্সটুকুও তাঁহার হাতে খোলে ভাল। ছোট-গল্প-রচনায় হেমেন্দ্র বাবু যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, 'মধুপর্ক' সে খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে



কাঞ্চনজঙ্ঘা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ভারতী

৪১শ বর্ষ]　　　পৌষ, ১৩২৪　　　[৯ম সংখ্যা

তিপ্‌রা বা তিপারা জাতি

নেপালের কিরান্তি জাতি কিরাতশ্রেণী-ভুক্ত, তিপারাগণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। য়ুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আরাকানের মুরুং জাতি যে শ্রেণীর অন্তর্গত ইহারাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। ত্রিপুরারাজ্যে ও ত্রিপুরাজেলার বাহিরে কেবল চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই জাতিকে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিপুরারাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ৯৪,০৭৫। ইহাদের ⅘ অংশ ত্রিপুরারাজ্যে বাস করে; অবশিষ্ট ⅕ ভাগ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও ত্রিপুরাজেলায় আছে। তিপারাগণ ত্রিপুরারাজ্যের আদিম অধিবাসী। ইহারা 'পুরাণ তিপারা', 'দেশী তিপারা' ও 'জমাতিয়া' এই তিনভাগে বিভক্ত। 'নওয়াতিয়া' ও 'রিয়াং' নামে ইহাদের আরও দুইটী বিভাগ আছে, কিন্তু তাহারা আসল তিপারা নয়। নওয়াতিয়াগণ চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। রিয়াংগণ কুকিবংশ-সম্ভূত, ইহারা পূর্ব্বে তিপারারাজগণের পালকী-বেহারার কাজ করিত। ত্রিপুরারাজ্যে তিপারাজাতির মধ্যে ৪৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৪৫,২৬৩ গুলি স্ত্রীলোক তিপারা বা মুরুং ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। বিগত পনর বৎসরের মধ্যে তিপ্‌রা ভাষাভাষী জনসংখ্যা শতকরা ২৪ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুরাণ তিপারাগণ তিপারাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের নিম্নে দেশী তিপারার স্থান। তারপর জমাতিয়ার স্থান। অতঃপর নওয়াতিয়া ও রিয়াংএর স্থান।

পুরাণ তিপারাগণ নিম্নলিখিত এগারটী 'হদা' বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—

১। বাছাল—প্রবাদ আছে যে, ইহারা পূর্ব্বে ত্রিপুরারাজ্যের অধিপতি ছিল। ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরারাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। বাছালগণ পূর্ব্বে সুবার অধীনে 'হস্তী-খেদার' কার্য্য করিত। এক্ষণে ইহাদের উপর নিম্নোক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে:—

(ক) রাজদরবারে ইহাদিগকে রৌপ্য-নির্ম্মিত 'পান' ও 'পাঞ্জা' বহন করিতে হয়। ত্রিপুরেশ্বর যখন মিছিল লইয়া কোথাও গমন করেন, তখনও বাছালদিগকে ঐ কার্য্য করিতে হয়। 'পান' ও 'পাঞ্জা' রাজকীয় সুলতানতের অঙ্গ।

(খ) রাজপরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহারা মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়া সৎকার করিয়া থাকে।

(গ) রাজবাড়ীতে পার্ব্বত্যপদ্ধতি-ক্রমে কোন পূজার অনুষ্ঠান হইলে, বংশ-গুচ্ছ দিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং পূজার মণ্ডপ প্রস্তুত-করণ ইহাদের কার্য্য। পূজায় ইহারা জলও যোগাইয়া থাকে।

(ঘ) ত্রিপুরারাজ্যে বিবাহকালে বিবাহ-বেদির চারিপাশে পত্রশাখাসংযুক্ত বংশ পুতিয়া দিবার প্রথা আছে। রাজপরি-বারস্থ কাহারও বিবাহে এই কার্য্যে বাছালদিগেরই অধিকার।

(ঙ) প্রতি বর্ষে বিজয়ার পরদিবস অসম * ভোজন নামক অপর্য্যাপ্ত মদ্যপানাদি-ক্রিয়ার একটী অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য বাছালদিগকে বংশনির্ম্মিত দীপাধার প্রস্তুত করিতে হয়। এই উপ-লক্ষে যে সকল নওয়াতিয়া তিপারা † নিমন্ত্রিত হয়, তাহাদিগের আহারের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়া স্থানটীকে ঘিরিতে হয়। ‡ এ কার্য্যও বাছালদিগকে করিতে হয়।

২। সিউক—'সিউক' শব্দের অর্থ শিকারী। ইহারা রাজপরিবারের আহারের জন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা রাজদরবারের উপাধি বিতরণকালে চন্দনের পাত্র ধারণ করিয়া থাকে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ উপলক্ষে মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য ইহারা পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সধবা (এয়ো) আনয়ন করে, পাত্রীর 'পাট' ধরে এবং পাত্রীর পক্ষের "জলভরা"র কার্য্য করিয়া থাকে। কুয়াই-তুইয়াদিগের সহিত ইহাদিগকে চন্দ্রাতপ দিয়া বিবাহ-বেদি সাজাইতে হয়।

৩। কুয়াই-তুইয়া—পানসুপারি-বাহক কুয়াইতুইয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ছয়টী প্রধান কার্য্য।

(ক) দরবারে উপাধি-বিতরণকালে ফুলের মালা গাঁথা।

(খ) সিংহাসন-ঘরে প্রত্যহ ধূপধুনা দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ পূজোপলক্ষে রাজসিংহাসন ধৌত করা।

(গ) পূজার প্রসাদ বাঁটিয়া দেওয়া।

* অসম=অপর্য্যাপ্ত। তিপারাগণ এই শব্দ বহুপ্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে। অছম্, হসম্, হছম, হসন, হছন ইত্যাদি ইহার বিকৃত উচ্চারণ।

† ইহারা স্থানীয় ভাষায় 'কাতাল' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

‡ চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা জায়গাকে তিপারাগণ 'বিতল' বলিয়া থাকে।

(ঘ) পূজার সময় মহারাজের এবং ঠাকুর-লোকদিগের বসিবার জন্য উপযুক্ত স্থানাদির বন্দোবস্ত করা।

(ঙ) বিবাহের সময় পাত্রের এবং পাত্রপক্ষের 'জলভরা'র কার্য্য করা।

(চ) সিউকদিগের সহিত বিবাহ-বেদি সজ্জিত করা।

৪। দৈত্যসিং বা দুইসিং—ইহারা রাজকীয় ধ্বজা বা নিশান বহন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধকালে ইহারা শ্বেত-বর্ণের নিশান বহন করিত। এক্ষণে কেবল দরবারে, মিছিলে এবং পূজার সময় শ্বেত নিশান বহন করিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহারা পূজার কাঠাম তৈয়ারি করিয়া থাকে এবং অসমভোজনের সময় মাংসও কুটিয়া থাকে।

৫। হুজুরিয়া }
৬। ছিলটিয়া } —ইহারা মূলতঃ একই হদার দুইটী বাজু বা শাখা। হুজুরে অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া 'হুজুরিয়া' এই আখ্যায় ইহারা আখ্যাত হয়। ইহাদিগকে উপস্থিতমত বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। রাজপ্রাসাদ হইতে বিভিন্ন দেবালয়ে বা পূজার স্থানে বলির এবং ভোগের দ্রব্যাদি ইহাদিগকে বহন করিতে হয়।

৭। আপাইয়া—এই শব্দের অর্থ 'মৎস্যক্রেতা'। ইহারা পূর্ব্বে রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ মৎস্যাদি ক্রয় করিত। এখন ইহাদিগকে রাজবাড়ীর জ্বালানি কাঠ যোগাইতে হয়।

৮। ছত্রতুইয়া বা ছককতুইয়া—এই শব্দের অর্থ ছত্রবাহক। ইহারা রাজদরবারের সময় চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মাহী-মুরত, ছত্র, আরেঙ্গী প্রভৃতি সুলতানত বহন করিয়া থাকে।

৯। গালিম—ইহারা পূজক। কের, খার্চী প্রভৃতি পূজায় ইহারা পৌরো-হিত্য করিয়া থাকে।

১০। সুবে নারাণ—পূজা এবং অসমভোজন উপলক্ষে মাছ কোটা ইহাদের কার্য্য।

১১। সেনা—পূর্ব্বোক্ত দশটী সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কেহ অগম্যাগমন করে (অর্থাৎ মাস্‌তুতো ভগিনী, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কন্যা, পিতৃব্যকন্যা প্রভৃতিকে বিবাহ করে) তাহা হইলে তাহাকে ত্রিপুরে-শ্বরের আদেশ লইয়া কুল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অপরাধী 'সেনা' নামে অভিহিত হয়। তবে তাহার পুত্রাদি স্বজাতিকে ভোজ দিয়া পুনরায় আপনাদের 'দফা'-ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা অসমভোজনের সময় চুল্লি প্রস্তুত করে, রন্ধনের বাসনাদি ধৌত করে, এবং ঠাকুর-লোকদিগের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে। অসম-ভোজনের আহার্য্য প্রস্তুত হইলে, ইহারা দামামা বাজাইয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সেনাগণ খার্চী-পূজার সময় ঢোল বাজাইয়া থাকে।

উল্লিখিত একাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইত না; কিন্তু অধুনা দৈত্যসিং, কুয়াইতুইয়া, ছত্রতিয়া ও হুজুরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ হইয়া থাকে। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল আন্তর্গণিক বিবাহ হইতে

আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি ইহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আহারাদি প্রচলিত নাই, কিন্তু এরূপ আহারের দ্বারা কাহারও জাতিনাশ হয় না।

তিপ্‌রাজাতি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, ইহারা প্রায়শঃ সবল শরীর; ইহাদের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ গুম্ফ-শ্মশ্রুবিহীন, বাহু ও পদযুগল কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক রকমের স্থূল। বর্ণ ঈষৎ গৌর, নাসিকা কিছু চাপা। তিপ্‌রাজাতি সাধারণতঃ অন্যান্য পর্ব্বতীয় জাতির মত দুর্দ্দান্ত নহে। তবে শ্রেণী-ভেদে প্রকৃতিগত সাধারণ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে রিয়াং শ্রেণীর তিপ্‌রাগণ অপেক্ষাকৃত উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন। পূর্ব্বে জমাতীয়াগণের উগ্রস্বভাব থাকিলেও বর্ত্তমানকালে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তিপ্‌রা ও নওয়াতীয়াগণই ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ও মধুর স্বভাব। সকল শ্রেণীর তিপ্‌রাই সাহসী, অকপট এবং পরদুঃখ-কাতর। কোন প্রকারের দুষ্প্রবৃত্তি প্রায়ই তিপ্‌রাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ইহারা স্বাবলম্বনশীল ও একতাসম্পন্ন।

বাসস্থান—তিপ্‌রাগণ পর্ব্বতোপরি বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ তিপ্‌রা বাঁশ দিয়া দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিতলে বাস ও নিম্নতলে পালিত পশু-পক্ষী রক্ষা করে। কেহ কেহ বা একতল গৃহেও বাস করিয়া থাকে। ইহাদের গৃহের ছাদগুলি সাধারণতঃ ছনের দ্বারা আবৃত থাকে। এক এক বাড়ীতে অনেক পরিবার বাস করে। বাটীর অধিবাসিবৃন্দের সাধারণ অপরাধ এবং সামাজিক বিবাদের বিচার ও মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া বুদ্ধিমান্ মুরুব্বি বা মাতব্বর ব্যক্তি থাকে। ইহাদিগকে তিপ্‌রাগণ "চৌধুরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সমস্ত তিপ্‌রাদের সাধারণ উপাধি "ত্রিপুরা"। ইহাদের মধ্যে যাহারা ত্রিপুরেশ্বরের সন্তোষপ্রদ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করে, রাজানুগ্রহে তাহারা প্রথমে 'বড়ুয়া' উপাধি, পরে ক্রমশঃ 'সেনাপতি' 'কবরা' ও 'ঠাকুর' উপাধি পাইয়া থাকে। এইরূপ বিভাগের নাম 'হদা'।

কৃষিকার্য্য—তিপ্‌রাগণ জুমক্ষেত্রে নানাবিধ শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সমান ভাবে কার্য্য করে। বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া জুমের জন্য নিরূপিত স্থানের বৃক্ষাদি জঙ্গল পৌষ ও মাঘ মাসে কাটিয়া ফেলে; পরে সূর্য্যোত্তাপে তত্রত্য তৃণলতাদি শুষ্ক হইলে চৈত্রমাসে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে।

বৈশাখ মাসে সেই স্থানকে বীজবপনোপযোগী করিয়া ধান্য, কার্পাস, তিল ও নানাজাতীয় তরকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহারা জুম পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে ইহাদের ধান কাটা হয়। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহারা তিল, কার্পাস উঠাইয়া থাকে। জুমে প্রত্যেক শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যথাসময়ে ঐ শস্য পরিপক্ক হইলে তিপ্‌রাগণ নিজেদের আবশ্যক অনুসারে রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করে।

'খঁজর পা', 'মিলকবাঁটা' ও 'বাঁটা' নামক মসলাবিশেষ তিপ্রাদিগের জুমে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দুই একজন রাজাত্মীয় ও রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় তিপ্রাদিগের মধ্যেও হল-কর্ষণ দ্বারা চাষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা যে প্রণালীতে চাষ করে ইহারা তাহারই অনুসরণ করিতেছে। ইহাদিগের চাষে ধান্য, পাট, সরিষা, বেগুণ, লঙ্কা, তামাক, ইক্ষু, আলু, ধনিয়া, পিঁয়াজ, মাস, মুগ, অড়হর কলাই, তিল, কার্পাস, কচু, আদা, হরিদ্রা, ভুট্টা, (তিপ্রা-নাম 'মগদানা') তরমুজ, তিক্তকরলা, চিনরা নামক ফুটি, কাঁকুড়ের মত একপ্রকার ফল, দরমফাই নামক একপ্রকার অম্লাস্বাদ ফল, চালকুমড়া, মিষ্টকুমড়া, ও ডেঙ্গর ডাঁটা ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভাষা—তিপ্রাদিগের স্বতন্ত্র একটা ভাষা আছে, কিন্তু ইহাদের ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ বা স্বতন্ত্র কোন অক্ষর নাই।

বিবাহ—তিপ্রাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ 'হিকনানানী' ও 'কাইজগনানী' এই দুই প্রকারের বিবাহপ্রথা প্রচলিত। তবে বিধবা-বিবাহ ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণও ইহাদিগের মধ্যে হইয়া থাকে; সুতরাং চারিপ্রকারে ইহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এই জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

হিক্‌নানানী বিবাহ—বরকন্যার পরস্পর অনুরাগবশতঃ এই বিবাহ তাহাদিগের স্বেচ্ছায় হইয়া থাকে। ইহাতে কোনরূপ ঘটকের প্রয়োজন হয় না কিংবা মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয় না। সমর্থ হইলে সামাজিকগণকে বর বা কন্যাপক্ষ হইতে একটী ভোজ দেওয়া হয়।

কাইজগ্‌নানী বিবাহ - বাঙ্গালী-দিগের ন্যায় অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিবাহে মনোনীত বা নিরূপিত কন্যার পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্ব্বে বর একবৎসর কাল অবস্থান করে, এবং কন্যার পিতা বা অভিভাবকের সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি এই সময়ের মধ্যে বরের কর্ম্মকুশলতা ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে কন্যার অভিভাবক তাহাকে কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করে, পক্ষান্তরে বর ও কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করে, তাহা হইলে বিবাহ না হইলে পাত্রের এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্যের জন্য কন্যাপক্ষ তাহাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া থাকে। আর বিবাহ হইলে, তিপ্রাদিগের পুরোহিত (ওঝাই) 'রামপ্রা' বা 'লাম্প্রা' নামক দেবতার পূজা করে। এই পূজাতে দুইটী বাঁশ পুতিয়া তাহার উপরে একটী বাঁশ রাখে ও দুইটী বাঁশের চোঙ্গ উপরিস্থিত বাঁশের উপর সংস্থাপন করিয়া তাহার একটীতে মদ্য ও অপরটীতে জল রাখে; এবং মোরগ বা হাঁস প্রভৃতি বলি দিয়া পূজা হইলে ওঝাই বাঁশের চোঙ্গায় রক্ষিত জল বরকন্যার মস্তকে দেয়। ইহাই কাইজগ্‌নানী বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য্য। ইহার পর কন্যা বরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া কন্যার মাতার প্রদত্ত একপাত্র সুরার অৰ্দ্ধেক স্বয়ং পান করিয়া অপরাংশ বরের হস্তে দেয়। বর সেই উচ্ছিষ্ট মদ পান

করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। সামাজিক-দিগকে মদ্যাদি উপচারে ভোজপ্রদানও এই বিবাহের একটী অঙ্গ।

যদি কন্যার পিত্রালয়ে বরের বর্ষব্যাপী অবস্থান সময়ে উভয়ের প্রেম হয় এবং সেই প্রেমের পরিণামে বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যার সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলেও এক বৎসর পরে বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহাতে 'লাম্‌প্রা' দেবতার পূজা হইবে না। আনুষঙ্গিক অপর অনুষ্ঠানগুলিও রহিত থাকিবে। কেবলমাত্র কন্যার আনীত জলের ছিটা বর কন্যার মস্তকে প্রদান করিয়া তাহার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া দিবে। এইরূপ হইলে ওঝাইএর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে বর অন্যত্র প্রস্থান করে, এবং দুই দিন ও একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

বিধবার বিবাহ ও পরিত্যক্তার পত্যন্তর গ্রহণে উল্লিখিত উভয় প্রকার বিবাহের কোন ব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয় না।

তিপ্‌রাদিগের মধ্যে সামর্থ্যানুসারে একজন তিন চারিটা বিবাহ করিতে পারে। আবশ্যক বোধ করিলে ২।৪ জন অবিবাহিত স্ত্রীলোকও ঘরে রাখিতে পারে। এই রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে সন্তান জন্মিলে তিপ্‌রাগণ পুত্র কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে উৎপন্ন সন্তানগুলি বিষয়ের অতি সামান্য অংশ পাইয়া থাকে। এইরূপ রক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে তিপ্‌রাগণ 'কতই' বলিয়া থাকে।

ধর্ম্ম—তিপ্‌রাদিগের মধ্যে প্রধানতঃ চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইহারা ইহাদিগের পূজার সময় তিপ্‌রা ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

তিপ্‌রাগণ যে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করিয়া থাকে সেগুলি অষ্টধাতুর ১৪টী মুণ্ড মাত্র।

তিপ্‌রাগণ চতুর্দ্দশ দেবতার নাম এইরূপ বলিয়া থাকে।

হরোমা হরিমা বাণী কুমারোগণপাবিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চতুর্দ্দশঃ॥

(শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, বিরিঞ্চি, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, প্রদ্যুম্ন ও হিমাদ্রি)

এই চৌদ্দটী দেবতার পূজা হইলে পর তিপ্‌রাগণ আর একটী লৌহময় মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। ঐ মূর্ত্তির এক হস্তে ঢাল, অপর হস্তে তরবারি। ইহার নাম 'বুড়াদেবতা'।

প্রতিদিন চৌদ্দ দেবতার পূজা হয় না। প্রত্যহ দুর্গা, শিব ও বিষ্ণু এই তিন দেবতার স্নান ও পূজা হইয়া থাকে। পূজার কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রাতঃ-কালে প্রায় নয়টার সময় তিন দেবতাকে বাল্যভোগ দিতে হয়। বাল্যভোগে চাল, কলা, চিনি, সন্দেশ, ঘৃত, সুপারি, পান ও দুধ দিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন দেবতার ভোগের সঙ্গে চণ্ডীদেবীর একটী ভোগ দিতে হয়। এই ভোগে একটী কলা, একটী সন্দেশ, এক পোয়া চাল ও একটু ঘৃত দিবার নিয়ম। অতঃপর চণ্ডীপাঠ। তারপর একটী ছাগ (পাঁঠা) বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরে চৌদ্দ দেবতার তিন দেবতার রাজভোগ। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জন, ছাগমাংস, ও তিনটী ডিম্ব আবশ্যক।

অপরাহ্নে—আরতি।

নবমীর দিন দুইটী ছাগ এবং শুক্লাষ্টমীর দিন একটী ছাগ বলি দেওয়া হয়, এবং একটী খাসী অন্যত্র কাটিয়া তাহা দ্বারা ভোগ হয়। পূজাতে রোহিত মৎস্য (শোলমাছ) দেওয়ারও রীতি আছে।

চৌদ্দ দেবতার পূজার জন্য তিপ্রাদের একটী বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। পূজার জন্য একজন প্রাচীন পূজক থাকে। ইহাকে তাহারা 'চন্তাই' নামে অভিহিত করে। চন্তাইএর আদেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চন্তাই প্রধান ~~প্রধান~~ পূজার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চন্তাইএর প্রতিনিধিকে ইহারা 'নারাণ' বা 'নারায়ণ' আখ্যায় অভিহিত করে।

চন্তাইএর অধীন দেওড়াই বা গালিম নিত্য পূজা সম্পাদন করে ও বলি দিয়া থাকে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য গালিমগণ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা—

১। খাবংতিনাই—ইনি মহাদেবের সেবক।

২। খসক্ বা খজক্— দেবতাদিগকে যখন নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হয়, তখন ইনি দেবতার অগ্রে 'উই উই' শব্দ করিতে করিতে গমন করেন। খার্চিপূজার অধিবাসের দিন স্নান হয়।

৩। শিংকল খাইনাই—ইনি দেবতার তরবারিধারণকারী সিপাহী।

৪। দাক্লোক্তিনাই—বড় খড়্গধারী সিপাহী।

৫। খামকল খাইনাই—ঢোলবাদ্যকর।

৬। তকজাংখা খাইনাই—খাঁচা বাহক (খাঁচার ভিতরে সাতটী পারাবত থাকে)।

৭। বলক্লোকনানাই বা বল্কলতিনাই—মশালধারী।

৮। লাইকলোক খলনাই—ইনি পাতা বিছাইয়া দেওয়াইবার কার্য্য করেন।

৯। মুড়িতাম নাই—শানাই বাদক।

১০। মুড়ি—ইনি খড়্গে ধার বা শান দিয়া দেন।

১১। মুদি—ইনি খড়্গে শান দিবার আদেশ দেন।

তিপ্রাদিগের উপাস্য দেবতা।

১। মহাদেব ও মাদেবী (পার্ব্বতী)

—প্রধানতঃ তিপ্রাজাতি ইঁহাদেরই উপাসক। ইঁহাদের পূজা প্রাতঃকালেই হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও পারাবতের আবশ্যক।

২। লাম্প্রা দেবতা যুগল, (আকাশ ও সমুদ্র) (লাম্প্রাওয়াথক)

বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে এই দেবতাযুগলের পূজা হইয়া থাকে। রোগশান্তির জন্যও ইঁহাদের পূজা হয়। ওঝাইগণ পূজার সময় ইঁহাদিগকে 'বিখাটা' ও 'আখাটা' এই দুই বিশেষ নামে অভিহিত

করে। 'লাম্‌প্রা' পূজায় হাঁস ও পারাবত চাই।

৩। সাঙ্গবংমা (হিমালয়)—চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে প্রায়শঃই ইঁহার ও লাম্‌প্রার পূজা হয়। অন্য দেবগণের পূজা কদাচিৎ হইয়া থাকে। পূজায় হাঁস ও পাঁঠা দিতে হয়।

৪। তুইমা (গঙ্গা)—কেহ রোগাক্রান্ত হইলে তাহার আরোগ্য কামনায় সন্নিহিত নদীতে ওঝাই কর্ত্তৃক তুইমার পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা দ্বারা নিরূপিত হয় যে, রোগীকে কোন্ দেবতা আক্রমণ করিয়াছেন। পরে রোগশান্তির জন্য পুনর্ব্বার নিরূপিত দেবতার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'কালাক্ষিরাজ'। ইহা ভিন্ন অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ ভাবে তুইমার পূজা হয়। পূজায় হাঁস ও পাঁঠার ব্যবস্থা।

৫। মালুইমা—ধান্যের দেবতা, ধান্য প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কামনায় এই দেবতার পূজা হয়। পূজায় মোরগ দিবার নিয়ম। এই দেবতাকে ওঝাইগণ 'লক্ষ্মী' বলিয়া থাকে।

৬। খুলুমা (কার্পাসের দেবতা) কার্পাস উৎপত্তির কামনায় ইঁহার পূজা হয়। এই দেবতার প্রকৃত নাম 'ধনসরী'; (ধান্যেশ্বরী) পুজায় মোরগ ব্যবস্থা।

৭। বুড়াছ—রোগের উপশম কামনায় ইঁহার পূজা হয়। এই পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা। ওঝাইগণ এই দেবতাকে 'কিসিনাক্রা' বলে।

৮।৯। বনিরাও ও তুমনাইরাও। দুই ভাই বুড়াছাএর পুত্র। বনিরাও সাধারণ নাম, ওঝাইদের নাম 'কলকতু', 'ক্লকতুদা'। 'তুমনাইরাও' সাধারণ নাম, ওঝাইদিগের প্রদত্ত নাম 'জমতুবুদ্ধ'। পূজায় হাঁস, পাঁঠা ও মোরগের ব্যবস্থা।

১০। বুরইরক—সাত ভগিনী। ৬টী বিবাহিতা, ১টী কনিষ্ঠা অবিবাহিতা। এই অবিবাহিতা ভগিনী মানব লইয়া ক্রীড়া করেন। ইঁহারা ডাকিনী যোগিনী বা সাতবোন-পরী নামে বিখ্যাত।

১১।১২। গরাইয়া ও কালাইয়া দুই ভাই। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বিশেষ সমারোহের সহিত ইঁহাদিগের পূজা হয়। এই সময়ে তিপ্‌রাগণ ৩।৪ দিন মদ্যপানে উন্মত্ত থাকে। এই পূজায় মোরগ আবশ্যক। ওঝাইগণ গরাইয়া দেবতাকে 'বিনাইগৃ্ঘ' বলে।

এতদ্ভিন্ন ইহারা হাঁস ও পাঁঠা বলি দিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী', ভদ্রকালী, রক্ষাকালী ও ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করে। মোরগ বলি দিয়া 'লক্‌ত্রাই বড়মুড়া'র পূজা হয়। মোরগ ও শূকর দিয়া 'বিসরী'র পূজা হয়, 'যমপীড়া,' 'কাইপীড়া,' ও 'দরখা' নামক দেবতার পূজাও হইয়া থাকে।

ইহারা সত্যনারায়ণ, ত্রিনাথ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) ও শনির পূজা করিয়া থাকে। এই ওঝাইগণ বংশানুক্রমে ইহাদিগের পৌরোহিত্য করে। প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে তিপ্‌রাগণ বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান করে। ত্রিপুরেশ্বরের 'কের' পূজা শেষ হইলে 'পাহাড়ীয়া'রা 'কের' পূজা

করে। এই পূজার সময় পিষ্টকাদি খাইবার নিয়ম আছে।

মৃত্যু।—ত্রিপুরাজাতীয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ শবদেহ শ্মশানে আনিয়া তাহার পায়ের কাছে একটা মোরগ মারিয়া কিছু চাউলের সহিত রাখিয়া দেয়; পরে দাহকার্য্য সম্পাদন করে। সাধারণতঃ বাঁশ ও বেতের চারিটা 'ঘুঘু' তৈয়ারী করিয়া মৃতের চরণতলে রাখিয়া দেওয়া হয়। শবদাহ করিয়া ইহারা শ্মশান পরিষ্কার করে। পরে একটা তুলসী, একটা আলো, কিছু অন্ন এবং একটা মোরগ বা পারাবত সেইস্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়।

সেই চিতাস্থানে আত্মীয়গণ ক্রমাগত ৭ দিন পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির প্রীতিকামনায় একটা মোরগ মারিয়া রাখে ও কিছু চাউল দিয়া যায়। ৭ দিন পরে চিতাভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে চিতাভস্ম রক্ষা করে এবং বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় অস্থি রাখিয়া দেয়। চিতাভস্মের উপর একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মৃতব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্রাদি সেই কুটীর মধ্যে সযত্নে রক্ষা করে। অস্থি যেখানে পুঁতিয়া রাখে সেখানে প্রাতঃকালে জল ও রাত্রিতে দীপ দেয়। এক বৎসরের মধ্যে অস্থি গঙ্গায় দিঁয়া আসে। যাহাদের সুবিধা না হয় তাহারা অন্যলোকের সহিত অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। অষ্টাহে অথবা ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিরামিষ ভোজন করে। অশৌচের সময় তিপ্‌রারা 'ধড়া' নামক একটী ছোট নূতন বস্ত্র গলায় বাঁধিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহাদের এরূপ রীতি ছিল না। শ্রাদ্ধের সময় ইহারা সাধ্যমত গাই-বাছুর ঘটী বাটী ইত্যাদি দান করিয়া থাকে।

ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মালা ধারণ করিয়া থাকে। যাহাদের মালা আছে তাহারা মাংস খায় না। মৎস্যমাত্র খাইতে পারে। ইহাদিগের গুরু আছে, তাহার নাম 'অধিকারী'। এই অধিকারীদিগের বাস নুরনগর পরগণার প্রন্তর্গত মেহারী গ্রামে।

উৎসব।—চৈত্রমাসে ইহাদিগের একটা উৎসব হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, কের পূজা, সরস্বতী পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধে ইহারা উৎসব করিয়া থাকে। 'বিমায়গ্‌বে' পূজার সময় মাত্র ইহারা নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্যকালে ছোট ছেলেরাই নাচিয়া থাকে।

ব্রত।—বাঙ্গালীদিগের ন্যায় তিপ্‌রাগণ 'একাদশী' 'জন্মাষ্টমী' 'শিবচতুর্দ্দশী' ও 'রবিব্রত' করিয়া থাকে। একাদশীর দিন বিধবারা রাত্রিতে মাত্র খায়, দিনে কিছুই আহার করে না।

ইহাদিগের স্ত্রীলোকগণ তামাক ও মদ খাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পান ও দোক্‌তা খুব বেশী খাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবাগণ মৎস্যাদি ভোজন করিলে নিন্দার্হ হয় না।

অলঙ্কার।

কর্ণভূষণ—১। ওয়াকুম (কর্ণের নিম্ন দিকে), ২। তৈয়া (কর্ণের উপর দিকে), ৩। তেজী (ঝুমকা)।

নাকের গহনা—১। কৈলি।

কণ্ঠাভরণ—১। রাংবতাং, ২। হাসলি, ৩। কাঁটি, ৪। মালা (রামকলাগাছের দানা লইয়া প্রস্তুত)।

হস্তাভরণ—১। কাসর (ইহা পিতল বা রূপার তৈরী), ২। চুড়ি (শাঁখার), ৩। ইয়াসিতাম (অঙ্গুরীয়)।

পায়ের গহনা—১। খাড়ু (রূপার)

খেলা—সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে পুরুষে তাস এবং স্ত্রীলোকে তাস ও সিকুই খেলিয়া থাকে। ছেলেরা লাট্টু খেলে। লাট্টুকে ইহারা চোর বলে। ইহারা চোর-চোর খেলে, ইহাদিগের ভাষায় তাহার নাম 'বুমার বুমা'। এতদ্ভিন্ন 'ঘুটি', (মারবেল) 'জিং' (এক-প্রকার দমের খেলা) পাঁই (১৬ ঘরের খেলা) 'হারি' (জলক্রীড়া) 'বুমাকত', 'ডুধু' বালক-গণ খেলিয়া থাকে। *

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নীলপাখী

তিলতিল	আগুন
মিতিল	কুকুর
আলো	বিড়াল
রুটী	বাপ
চিনি	মা
জল	বারলিংগট…প্রতিবেশিনী
	বারলিংগটের কন্যা

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিদায়-গ্রহণ

একটী প্রাচীর—তাহাতে একটী ক্ষুদ্র দ্বার। ভোর হইতেছিল।

তিলতিল, মিতিল, আলো, রুটী, জল, চিনি, এবং আগুন প্রবেশ করিল।

আলো। এখন আমরা কোথায়, বুঝতে পাচ্ছ কি?

তিলতিল। না ত।

আলো। এই পাঁচিল আর ওই ছোট্ট দরজা, দেখ দেখি চেয়ে—

তিলতিল। ঐ লাল পাঁচিল আর সবুজ দরজা?

আলো। হ্যাঁ; ও দেখে কিছুই মনে পড়ছে না?

তিলতিল। আমার যেন মনে হচ্ছে যে সময় আমাদের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল—

আলো। মানুষগুলো কি বন্ধ হয়ে যায়, যখন তারা স্বপ্ন দেখে। তখন নিজেদের হাতকেও তারা চিনতে পারে না।

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় কোন কোন বিষয়ে বঙ্গদেশের ও ত্রিপুরার 'আদমশুমারি প্রভৃতি [illegible]

তিলতিল। কে স্বপ্ন দেখছে, আমি?

আলো। তুমি কি আমি, কে জানে? ...দেখ, এই পাঁচিলের মধ্যে যে বাড়ী আছে, তা তুমি জন্মে অবধি কতবার যে দেখেছ—

তিলতিল। জন্মে অবধি কতবার দেখেছি?

আলো। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছ।...এটা সেই বাড়ী, যেখান থেকে আমরা একদিন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলুম... ঠিক একবচ্ছর আগে।

তিলতিল। একবছর আগে! তাহলে···

আলো। থাম, থাম; ভাঁটার মত চোখ বার করে দেখছ কি?...এটা তোমার নিজেরই ঘর যে—তোমার বাপ-মা এই বাড়ীতেই আছেন।

তিলতিল। অ্যাঁ! তাই না কি!... সত্যিই ত!···এই যে ছোট দরজা!...বাবা মা এইখানেই আছে? ..কাছে এসেছি তাহলে।...আমি এখনি যাই, মার কোলে বসে চুমু খাব।

আলো। একটু থাম।...এখন তাঁরা ঘুমুচ্ছেন···হঠাৎ ওঁদের জাগিয়ো না; তা ছাড়া সময় না হওয়া পর্য্যন্ত দরজা খুলবে না।

তিলতিল। সময়!···তাহলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, না?

আলো। না গো না; আর দু'চার মিনিট আছে।

তিলতিল। বাড়ী ফিরে এসে তুমি ভারী খুসী হয়েছ?...এ কি! কি হল তোমার?...অমন ফ্যাঁকাসে হয়ে গেলে কেন?...অসুখ করেছে না কি?

আলো। না, এ কিছু না; মনটা খারাপ হয়েছে।·· তোমাদের এবার ছেড়ে যেতে হবে কি না?

তিলতিল। ছেড়ে যাবে আমাদের?

আলো। হ্যাঁ; এখানে আর আমার কোন কাজ নেই ত। এক বছর পুরো হয়েছে।...পরী এবার তোমার কাছে নীল-পাখী নিতে আসবে।

তিলতিল। কিন্তু নীলপাখী ত পাওয়া গেল না!...স্মৃতির দেশে যেটা পেলুম সেটা ত একেবারে কালো রঙের; রাত্রির বাড়ীরগুলো সব মরে গেল; জঙ্গলেরটা ধরতে পারলুম না। যদি মরে যায়, কিম্বা পালিয়ে যায়, কি রঙ বদলায়, তবে কি সে আমার দোষ?...পরী কি বলবে?

আলো। আমাদের সাধ্যমত আমরা করেছি। এখন বোধ হচ্ছে যে, হয় নীল-পাখী নেই, না হয় তাকে ধরলে সে রঙ বদলে ফেলে।

তিলতিল। খাঁচাটা কোথায়?

রুটী। এই যে আমার কাছে।... এটী আমার জিম্মায় ছিল। এখন বেড়ানো শেষ হয়েছে—এখন এটী আমি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।...যেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম ঠিক তেমনি অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।... আমার কাজ শেষ হল। এখন জল আগুন চিনি এদের সকলের হয়ে আমি দু'কথা বলতে চাই।

আগুন। না, না; আমার হয়ে কিছু বলতে হবে না, আমার নিজের মুখ আছে।

রুটী। (বাগ্মীর ন্যায় বক্তৃতা জুড়িয়া

ছিল) আমাদের সদাশয় শিশু বন্ধু হুটীর কাজ আজ শেষ হয়েছে। এখন আমরা অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুব ব্যথিত প্রাণে আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ কচ্ছি, আর সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে...

তিলতিল। কি! তোমরা আমাদের বিদায় দিচ্ছ?...তোমরাও তবে ছেড়ে যাবে না কি?

রুটী। যেতেই হবে।...বাইরে আমরা তোমাদের ছেড়ে যাব।...তোমরা আর আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনতে পাবে না।

আগুন। তাতে আর কি ক্ষতি হবে?

জল। চুপ্ চুপ্, গোল করো না!

আগুন। যখন তুমি কেট্‌লিতে, কুয়োতে, নদীতে, নলে আর ঝরণাতে তোমার বক্‌বকানি-ঢক্‌ঢকানি বন্ধ করবে তখনি আমি চুপ করব।

আলো। (যষ্ঠি উত্তোলন করিয়া) ব্যস্, ঢের হয়েছে; এখন বিদায়ের সময়, এখনও কি ঝগড়া করবে?

রুটী। (আত্মম্ভরিতার সহিত) আমি ও রকম নই!...আমি বলছিলুম যে তোমরা আর আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাবে না, কিম্বা আমাদের এই জ্যান্ত শরীরও আর দেখতে পাবে না। জিনিষের মধ্যে যে অদৃশ্য প্রাণ আছে তা তোমরা আর দেখতে পাবে না; কিন্তু আমি সিন্দুকের মধ্যে, টেবিলের উপর, তাকের উপর সর্ব্বদা থাকব। আমার কথা যদি স্পষ্ট বলতে হয় তবে সে এই যে আমি মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু আর তার চির-অনুচর।

আগুন। বাহবা! আর আমি?

আলো। এস, এস, আর সময় নেই ...শীগ্‌গির ঘণ্টা বাজবে, চট্‌পট্ নাও, ছেলেদের চুমু দাও।

আগুন। (বেগে অগ্রসর হইয়া) আমি আগে, আমি আগে। (ছেলেদের চুম্বন করিয়া) বিদায় তিলতিল, বিদায় মিতিল!...আমায় মনে রেখো।...কোন জিনিষে আগুন ধরাতে হলে আমায় স্মরণ করো।

তিলতিল। ওহোহো পুড়িয়ে ফেল্লে!

মিতিল। উঃ, আমার নাকটা ঝল্‌সে দিলে।

আলো। আগুন, তোমার উল্লাস একটু কম কর...মনে রেখো যে তুমি এখন তোমার চিমনির মধ্যে নেই।

জল। আহাম্মক!

রুটী। কি ইত্‌রামি!

আগুন। ঐ দেখ, আমি ঐ চিমনির মধ্যে থাকব।...আমায় ভুলো না। আমি উনুনের মধ্যে আর চিমনির মধ্যে সর্ব্বদা থাকব।...তোমাদের ঠাণ্ডা লাগলে মাঝে মাঝে বাইরে আসব। শীতকালে আমি গরম থাকব আর তোমাদের জন্য বাদাম পুড়িয়ে দেব।

জল। (ধীরে ধীরে ছেলেদের কাছে আসিয়া) আমি তোমাদের শুধু আরাম দেব—যখনই শ্রান্ত হবে, আমায় ডেকো।

আগুন। সাবধান, ভিজিয়ে দেবে।

জল। আমি অমন নীচ নই—তা ছাড়া মানুষকে আমি বড় ভালবাসি।

আগুন। হ্যাঁ, তাই তাদের ডুবিয়ে মার?

জল। নদীর পানে চাইলে, ঝরণার কাছে গেলে আমায় দেখতে পাবে...আমি সেইখানেই থাকব।

আগুন। সমস্ত দেশটা ও বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে।

জল। সন্ধ্যেবেলায় ঝরণার ধারে বসে কান পেতে শুনো, আমি কি বলি, বোঝবার চেষ্টা করো।

আগুন। ঢের হয়েছে...আমি সাঁতার জানি না।

জল। আজ যেমন পষ্ট করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি তেমন ত আর পারব না; কিন্তু তোমাদের যে কত ভালবাসি, তা নদীর ধারে, ঝরণার পাশে গিয়ে বসলেই বুঝতেই পারবে।...ওহো, আর আমি কথা কইতে পারছি না... আমার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে, স্বর বন্ধ হয়ে আসছে।

চিনি। মনের এক কোণে আমার জন্য একটু ঠাঁই রেখো, আর মাঝে মাঝে স্মরণ করো যে আমার সঙ্গে একদিন তোমাদের কি রকম মিষ্ট সম্পর্ক ছিল।... চোখে আমার সহজে জল বেরোয় না। কিন্তু এক ফোঁটা যদি বেরোয় তাহলে আমি একেবারে গলে মরে যাই।

রুটী। হা ভগবান!

তিলতিল। আচ্ছা, টাইলো আর টাইলেট কোথা গেল?...তারা কি করছে?

বিড়ালটাকে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে শুনা গেল।

মিতিল। ঐ যে টাইলেটের চীৎকার! ...কেউ তাকে মারছে।

বিড়ালটা দৌড়িয়া আসিল। তার চুল এলো-মেলো, বেশ ছিন্নভিন্ন। গালে একখানা রুমাল জড়ানো। রাগে সে ফোঁস ফোঁস্ করিতেছিল। কুকুর তাহাকে আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া তাহার উপর অবিশ্রাম লাথি-ঘুষি বর্ষণ করিতেছিল।

কুকুর। কেমন!...আরো চাও?...এই যে, এই নাও।

(প্রহার)

আলো, তিলতিল, মিতিল। (ইহাদের ছাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল) থাম্, থাম্, টাইলো; তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি? আবার!...খবরদার বল্‌ছি!...ফের হাত তোলে! যা ওদিকে!

দুজনকে পৃথক করিয়া দিল।

আলো। কি হয়েছে?...অমন মারা-মারি কেন?

বিড়াল। ও-ই ত!...আমার অপমান কল্লে, আমার ল্যাজ ধরে টানলে, আমায় কামড়ালে, শেষ আমার খাবারে ধুলো দিলে।...আমি কিচ্ছু করিনি গো, কিচ্ছু করিনি।

কুকুর। (ভেঙ্‌চাইয়া) আমি কিচ্ছু করিনি গো, কিচ্ছু করিনি।...কিছু ত করেইছ, আরো কিছু করবার চেষ্টায় আছ তুমি।

মিতিল। (বিড়ালকে কোলে তুলিয়া লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আহা বেচারী! কোথায় লেগেছে রে? সর্ব্বাঙ্গে? আহা!...মুখপোড়া টাইলো, কেন ওকে অত মারলি বল্ দেখি!

আলো। (কুকুরের প্রতি রুক্ষভাবে) গোড়া থেকে তোমারই অন্যায় দেখছি বাপু!

বিশেষ এ সময়, এখন আমরা ছেলে দুটীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এ সময় এই রকম বিদিকিচ্ছি ঝগড়া-মারামারি! ভারী বিশ্রী! ছিঃ!

কুকুর। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) ছেলে-দুটীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি কি রকম ?

আলো। হঁ্যা; আমাদের বেড়ানো শেষ হয়েছে—সময়ও শেষ হয়-হয়। আমাদের এখন আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে যেতে হবে; তাই বিদায় নিচ্ছি।...আর আমরা এদের সঙ্গে কথা কইতে পাব না।

কুকুর। (চীৎকার করিয়া তিলতিলের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল) না, না; আমি তা পারবো না!...আমি চুপ করব না।...আমি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে কথা কইব।...আমি আর দুষ্টুমি করব না, খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকব।...আমি পড়তে শিখব, লিখতে শিখব, পিয়ানো বাজাতে শিখব, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব। রান্না-ঘর থেকে আর কোন জিনিষ চুরি করে খাব না, অনেক রকম খেলা দেখাব। তোমরা এবারটী আমায় মাপ কর।... বেরালের সঙ্গে আর ঝগড়া করবো না, বল ত ওর সঙ্গে আলাপ করে ফেলি। ওর চুমু খাই ?

মিতিল। (বিড়ালের প্রতি) আর টাইলেট্! তোমার কি কিছু বলবার নেই ?

বিড়াল। (কপটতার সহিত) আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি—তা সে যতখানি ভালবাসা যেতে পারে।

আলো। এস তিলতিল, এস মিতিল, আমি এই শেষবার তোমাদের চুমু নি!

তিলতিল ও মিতিল। (আলোকে জড়াইয়া ধরিয়া) না, না; যেয়ো না! তুমি যেয়ো না! আমাদের বাড়ীতেই থাক তুমি।...বাবা কিছু বলবেন না—মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি আমাদের কত ভালবাস—

আলো। তা যে হতে পারে না ভাই!...এই ঘরের মধ্যে আর আমাদের এ অবস্থায় ঢোকবার যো নেই।

তিলতিল। কোথায় তাহলে তোমরা যাবে ?

আলো। বেশী দূরে নয়! এই কাছেই!...নিস্তব্ধতার দেশে!

তিলতিল। না, না; তোমায় যেতে দেব না।...আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। মাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

আলো। কেঁদো না ভাই, কেঁদো না বোন, আমি তোমাদের চোখে চোখেই থাকব।...জলের মত আমার গলার স্বর নেই বটে কিন্তু আমার উজ্জ্বলতা আছে, তাইতে আমি কথা কই; তবে মানুষ তা বুঝতে পারে না, এই দুঃখ। মানুষের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি তার গতিবিধি লক্ষ্য করি।...চাঁদের কিরণ ঝলমল করে, আকাশে নক্ষত্র মিটমিট করে, ভোর হয়, আলো জ্বলে,—মনে রেখো, এ-সবে শুধু আমারই ভাষা ফুটে ওঠে —আমি ওদের মধ্য দিয়েই কথা কই আর মানুষের প্রাণকে পুলকিত করি।

বাড়ীর ভিতরে ঘড়িতে আটটা বাজিতে শুনা গেল।

ওই শোন, আটটা বাজল।...ওই দরজা খুলছে! ...তবে বিদায়!...আসি ভাই, আসি বোন!...যাও তোমরা ভিতরে যাও!

সে তিলতিল ও মিতিলকে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। রুটী কাঁদিতে লাগিল। চিনি, জল, আগুন প্রভৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে দক্ষিণ ও বামদিক দিয়া চলিয়া গেল। কুকুর মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জাগরণ

কাঠুরিয়ার গৃহাভ্যন্তর। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। জানালার ফাঁক দিয়া দিনের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছে। তিলতিল ও মিতিল নিজ নিজ ক্ষুদ্র শয্যায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

তিলতিলের মা প্রবেশ করিলেন।

মা। (স্নেহ-মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে) ওঠ্ না রে, ও ছেলেরা! আর কত ঘুমুবি তোরা?...ওমা কি ঘেন্না!...এত বেলা হল, আটটা বেজে গেল, গাছপালা রোদে ভোরে উঠল,—এখনও ঘুম!

ছেলেদের বুকের উপর ঝুঁকিয়া আদর-ভরে তাহাদের চুম্বন করিলেন।

আহা, বাছারা আমার!...ছেলে ত নয়, যেন গোলাপ ফুল! (পুনরায় চুম্বন করিলেন) আহা, ছেলে জিনিষ কি মিষ্টি! ওঠ্, ওঠ্, ওরে দুপুর অবধি ঘুমোনো কি?...অসুখ করবে যে!

(তিলতিলকে ধীরে ধীরে ঠেলা দিয়া)

ওঠ্, ওঠ্, ও তিলতিল!

তিলতিল। (ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল) অ্যাঁ, আলো! কোথায় গেলে ভাই! না, না, যেয়ো না!

মা। আলো যেয়ো না! ও আবার কি কথা! আলোয় চারদিক যে ভরে গেছে! বেলা যেন দুপুর!...দেখ বরং, আমি জানালা খুলছি।

তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দিলেন।

এই দেখ!...কি হয়েছে তোর?... চোখ খুলছিস্ না কেন?

তিলতিল। (চক্ষু রগড়াইয়া) মা, মা, তুমি?

মা। আমিই ত? তুই তবে কে মনে করেছিলি?

তিলতিল। হাঁ, ঠিক; তুমিই ত!

মা। কেন চিনতে পারছিস্ না, না কি?...আমি একরাত্রের মধ্যে বদলে যাইনি ত!

তিলতিল। আঃ, তোমায় দেখে বাঁচলুম! কদ্দিন, কদ্দিন পরে আবার তোমার কাছে ফিরে এলুম মা! ও মা একটা চুমু দাও!...আর একটা, আর একটা!...আঃ, আমার বিছানাটী কি নরম!...আবার বাড়ীতে এসেছি!

মা। কি হয়েছে রে?...অমন কচ্ছিস্ কেন?...উঠে বোস্ না?...অসুখ করেছে না কি!...দেখি, তোর জিভ্ দেখি!... নে, চল্, চল্, উঠে কাপড় ছাড়বি চল্!

তিলতিল। বা রে; আমি ত আমার সেই কামিজ পরেই রয়েছি!

মা। হাঁ, পরেই ত রয়েছ!...ওঠ, কোট আর পাজামা পর, ঐ চেয়ারের ওপর রয়েছে।

তিলতিল। ঐ গুলোই কি পরে বেরিয়েছিলুম?

মা। বেরিয়েছিলি কি রে? কোথায় আবার গেছলি এর মধ্যে?

তিলতিল। কেন সেই গেল বছর?

মা। গেল বছর কি রে?

তিলতিল। হ্যাঁ, সেই যে বড়দিনের দিন মা!...সেই যে আমি বেরিয়েছিলুম?

মা। সে কি রে!...ঘর থেকে আবার বেরুলি কখন?...কাল রাত্রে ঘুমিয়েছিলি ...আর আজ সকালে এসে আমি এই তুলছি!...সমস্ত রাত ধরে তাহলে সব স্বপন দেখেছিলি বুঝি?

তিলতিল। তুমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না?...গেল বছর আমি আর মিতিল, পরী, আলো, রুটী, চিনি, জল, আগুন এদের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম না? আহা! আলো মা বড্ড ভাল।...জল, আগুন, রুটী এরা কেবলই ঝগড়া করেছে! ...তুমি রাগ করনি মা?...তোমার বোধ হয় বড্ড দুঃখু হয়েছিল না মা—আমাদের দেখতে পাওনি বলে? আচ্ছা, বাবা কি বল্লেন? কি করি বল? তাদের কথা ঠেলতে পাল্লুম না।

মা। ওরে, এ সব কি বক্‌ছিস্? হয় তোর অসুখ করেছে, না হয় এখনো ঘুম ছাড়েনি।

ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া

তিলতিল জাগ্ দেখি, ও তিলতিল!

তিলতিল। মা আমি সত্যি কথাই বলছি।..আমার বোধ হয় তুমিই ঘুমুচ্ছ মা!

মা। আমি ঘুমুচ্ছি কি রে?...ভোর ছ'টায় উঠে, বাড়ী ঘর পরিষ্কার করে, উনুনে আগুন দিয়ে, তোদের জাগাতে এলুম—

তিলতিল। আচ্ছা, তবে মিতিলকে জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে?...আঃ, আমরা কি গোঁয়ার্ত্তুমি করেই সে রাত্রে বেরিয়েছিলুম!

মা। মিতিলকে জিজ্ঞাসা করব কি রে?

তিলতিল। সেও যে আমাদের সঙ্গে গেছলো।...দেখ মা, ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছিল।

মা। (অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া) ঠাকুর্দ্দা? ঠাকুমা?

তিলতিল। হ্যাঁ; স্মৃতির দেশে তাঁদের দেখে এলুম মা।...আমরা সেই পথ দিয়ে গেছলুম কি না! তাঁরা মরে গেছেন বটে, কিন্তু খুব ভাল আছেন।...ঠাকুমা আমাদের চমৎকার কুলের চাট্‌নি খেতে দিলেন।...ভাইদের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। বরাট্, জিম্, মাদ্‌লিন, পিয়োট্ পলিন, রিকেট্, সকলে সেখানে রয়েছে।

মিতিল। রিকেট্ এখনো চার পায়ে হেঁটে চলে মা।

তিলতিল। পলিনের নাকের উপর এখনো সেই মাংসর ঢিপিটা আছে।

মা। আচ্ছা, দেখ্ তোরা উঠে দাঁড়া ত।...আমার সামনে হেঁটে বেড়া দেখি।

তিলতিল ও মিতিল তাহাই করিল।

নাঃ, তা ত নয়!...তবে কি হবে গো!...এঁ্যা—হা ভগবান!...তাদের মত এদেরও শেষ হারাব না কি?

মা ভীত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া তিলতিলের বাবাকে ডাকিতে লাগিলেন।

ওগো, শীগ্‌গির এদিকে এস, ছেলেদের অসুখ করেছে!...

তিলতিলের পিতা কুঠার হাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।

বাবা। কি? কি হয়েছে?

তিলতিল ও মিতিল পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল।

তিলতিল ও মিতিল। বাবা, এই যে বাবা! আমরা এসেছি।...বাবা তোমার হাতে এ বছর কি খুব বেশী কাজ ছিল?

বাবা। ব্যাপার কি? ওদের অসুখ করেছে বলে ত বোধ হচ্ছে না?...বেশ ত সুস্থই দেখছি!

মা। (কাঁদিতে লাগিলেন) তুমি ওদের চোখ দেখে বুঝতে পারবে না।... তারাও ত এমনি ভাল ছিল; শেষে কি যে হল আর বাছারা আমার পালিয়ে গেল।...কাল রাত্রে যখন শুইয়ে রাখি তখন বেশ ভালই ছিল, আজ সকালে গিয়ে দেখলুম, সব গোলমেলে।...ওরা বলছে কোথাকার কোন্ আলো-কে সঙ্গে করে রাত্রে বেড়াতে গেছলো।...বলছে ঠাকুর্দ্দা আর ঠাকুমাকে দেখেছি...তারা মরে গেছে কিন্তু বেশ ভাল আছে। এ সব কি আবোল-তাবোল বকা বাবু?

তিলতিল। ঠাকুর্দ্দার কিন্তু আজও সেই কাঠের পা আছে।

মিতিল। ঠাকুমা এখনো বাতে ভুগচেন।

মা। শুনচ? যাও, দৌড়ে যাও, ওগো ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

বাবা। না, না; কিছু হয় নি; এই, তোরা এদিকে আয় ত।

বাহিরের দরজায় ঘা পড়িল।

কে?...ভিতরে এস।

প্রতিবেশিনী বারলিংগট প্রবেশ করিল। সে দেখিতে অবিকল পরী বেরীলুনের ন্যায়; বৃদ্ধা এবং ভর দিয়া সে হাঁটিতেছিল।

বারলিংগট। সুপ্রভাত! আজ বড় দিন। তোমাদের সকলকে বড়দিনের অভি-বাদন জানাতে এসেছি।

তিলতিল। এই ত পরী বেরীলুন!

বারলিংগট। বড়দিনে একটু ভাল করে রাঁধব কি না তাই একটু আগুন চাইতে এসেছি।...আজ বড় ঠাণ্ডা।...ওঃ, হাড় যেন কনকনিয়ে দিচ্ছে! সুপ্রভাত তিলতিল; সুপ্রভাত মিতিল; কেমন আছ তোমরা?

তিলতিল। পরী বেরীলুন, নমস্কার।... আমরা তোমার নীলপাখীর কোন সন্ধান পেলুম না।

বারলিংগট। কি বলছে গা ওরা?

মা। আমায় বাছা আর জিজ্ঞাসা করো না।...ওরা নিজেরাই জানেনা, কি বলছে। ...আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অবধি এই রকম কচ্ছে।...কিছু কুপথ্যি করে এমন হয়েছে আর কি!

বারলিংগট। তিলতিল, আমায় চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার বারলিংগট পিসি—চিনতে পারছ না?

তিলতিল। হ্যাঁ, পারছি চিনতে... আপনি পরী বেরীলুন।—আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

বারলিংগট। আমি বে—রী—কি বল্লে?

তিলতিল। বেরীলুন!

বারলিংগট। বারলিংগট?...তাই বল, বারলিংগট।

তিলতিল। বেরীলুন কি বারলিংগট যা খুসি বল...কিন্তু মিতিলও জানে।..

মা। মিতিলটারও এই দশা!

বাবা। থাম, থাম; ভয় নেই।... একটা কি দুটো চড় কসালেই সেরে যাবে।

বারলিংগট। না, না; এ সময় ও রকম করো না।...আমি জানি, কিসে অমন হল।...চাঁদের আলোয় ঘুমিয়েছিল আর কি! তাই ও রকম হয়েছে।... আমার ছোট মেয়েটা গো, যেটা অসুখে ভুগচে, তারও ও রকম হয়।

মা। ভাল কথা; তোমার মেয়েটী এখন কেমন আছে?

বারলিংগট! অমনি আর কি।... উঠতে পারে না।...ডাক্তারে বলে, মাথার ব্যামো।...কিন্তু আমি জানি, কিসে তার রোগ সারবে।...আজ সকালেও সে আমায় বলছিল...তার ধারণা—

মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তা জানি।... তিলতিলের ঐ পাখীটি সে চায়।...তিলতিল, দাও না বেচারীকে তোমার সে পাখীটি।

তিলতিল। কি মা?

মা। তোমার সেই পাখীটি!...কোন কাজেই ত সেটা আসে না...তার দিকে একবার চেয়েও ত দেখ না।...আর সে বেচারী ওটির জন্যে অস্থির। দাও ওটী তাকে।

তিলতিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমার পাখীটি!...আচ্ছা কোথায় সেটা এখানে!...এইটেই ত?...এর ভেতর ত দেখছি কেবল একটা পাখীই আছে।... আর গুলোকে বুঝি সে খেয়ে ফেলেছে? ...কিছু আশ্চর্য্য নেই!.. বাঃ রে, এ ত দেখছি নীল রঙের!...কিন্তু এটা ত আমারই সেই ঘুঘু। আগেকার চেয়ে আরো নীল হয়েছে!...আমরা এই নীলপাখীই ত চাই! .. এত দূরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, অথচ এটা বাড়ীতেই ত রয়েছে!...কি আশ্চর্য্য!... মিতিল, দেখ্‌ছ? আলো কি ভাববে বল দেখি?

চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া খাঁচাটা নামাইয়া আনিল এবং বারলিংগটের হস্তে প্রদান করিল।

এই নাও, তোমায় দিলুম। এটা তত নীল না হলেও এতেই চলবে।...তোমার ছোট্ট মেয়েটীকে শীগ্‌গির দাও গিয়ে।

বারলিংগট। সত্যি?...সত্যি আমায় এটা দিলে তাহলে? আহা, বেচারী কত সুখী হবে এখন! বেঁচে থাক বাছারা! ...(তিলতিলের মুখ চুম্বন করিল) তবে আমি যাই...শীগ্‌গির তাকে দিই গে।

তিলতিল। হ্যাঁ শীগ্‌গির যাও।...না হলে ওটাও হয়ত আবার রঙ বদলে ফেলবে।

বারলিংগট পাখীটি লইয়া চলিয়া গেল।

তিলতিল। (চারিদিক দেখিয়া) বাবা, মা, বাড়ীটাকে তোমরা এ কি করেছ?... সাজিয়েছ? জিনিষ-পত্তর সব তেমনি আছে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাবা। সুন্দর দেখাচ্ছে, তার মানে কি?

তিলতিল। গেল বছর যখন বাড়ী

ছেড়ে যাই তখন ত এমন ছিল না!.. এখন ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে!

বাবা। গেল বছরে? যখন বাড়ী ছেড়ে যাস্?

তিলতিল। (জানালার কাছে গিয়া) ঐ দেখ জঙ্গল...কত বড়, আর কেমন সুন্দর।...সব যেন নতুন আর চমৎকার!

মিতিল। আমিও—আমিও—

মা। পাগলের মত তোরা আবোল-তাবোল ও কি বক্‌ছিস্?

বাবা। বক্‌তে দাও, বকতে দাও—ওদের কথায় কান দিয়ো না। ওরা খুসীর খেলা খেল্‌ছে।

বাহির দরজায় ঘা দিল

কে? এস, ভিতরে এস।

প্রতিবেশিনী বারলিংগট প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার ছোট মেয়েটী—সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। তিলতিলের পাখীটি তার হাতে দিল।

বারলিংগট। আশ্চর্য্যি ব্যাপার দেখলে?

মা। অসম্ভব!...ও হাঁটতে পারে?

বারলিংগট। শুধু হাঁটতে পারা?...ও এখন ছুটতে পারে, লাফাতে পারে, নাচতে পারে।...আমার হাতে পাখীটিকে দেখেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল।...সত্যি এটী তিলতিলের পাখী কি না দেখবার জন্যে জানলার কাছে আলোয় ছুটে এল।... আর তার পর?...তারপর একেবারে রাস্তায়!...যেন পরীর মত উড়ে এল... আমি কি ওর সঙ্গে কদম ফেলে চলতে পারি?

তিলতিল। (মেয়েটীর কাছে গিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া) ওহো, এ যে আলোর মতই অবিকল দেখতে!

মিতিল। একটু ছোট।

রুটীর সিন্দুকের কাছে গিয়া

ও রুটী, কোথায় তুমি? মিতিল, দেখ্‌ছ, এখন কেমন চুপ করে রয়েছে! ...এই যে টাইলো। বাহবা! ও টাইলো, কি রকম লড়াই বেধেছিল মনে আছে? সেই জঙ্গলের মধ্যে?

মিতিল। আর টাইলেট্ কোথায়? সে আমায় চেনে।...কিন্তু কথা কইতে পারবে না!

তিলতিল। রুটী-মশাই, বলি ও রুটী-মশাই!

মাথায় হাত দিয়া

তাইত! সে হীরেও নেই, সে টুপীও নেই!...যাক্ গে আর কি হবে!...এই যে আগুন! ভারি মজার লোক ত ও! জলকে ঠাট্টা করে কেবল রাগাত!

জলের কাছে গিয়া

জল-মশাই, সুপ্রভাত! এখনও কথা কইছে যে কিন্তু আগেকার মত আর কিছু বুঝতে পারছি না।

মিতিল। চিনিকে দেখতে পাচ্ছি না ত?

তিলতিল। হাঃ হাঃ কি মজা!... আজ আমি খুব খুসী হয়েছি।

তিলতিল। তা বটে; তবে শীগ্‌গির বাড়বে ত?

বারলিংগট। কি বলছে ওরা?...এখনো কি ঘোর কাটে নি?

মা। অনেকটা ভাল।...কিছু খেলে-দেলেই সেরে যাবে।

বারলিংগট। (মেয়েটীকে তিলতিলের

কাছে আনিয়া) যাও, তিলতিলের সঙ্গে কথা কও, সোনার চাঁদ ছেলে—পাখীটিকে এক কথায় তোমায় দিয়ে দিলে! বেঁচে থাকো বাবা—রাজ্যেশ্বর হও।

তিলতিল সহসা ভীত হইয়া পশ্চাৎ হঠিয়া গেল।

মা। ও আবার কি? ভয় পেলে নাকি?...এস, ওকে চুমু দাও।...তোমার আবার অত লজ্জা হল কবে থেকে?...আর একবার!...আর একবার!...ব্যাপার কি? ...দেখে মনে হচ্ছে তোমার কান্না আসচে!

তিলতিল বালিকাটীকে চুম্বন করিয়া জড়সড় ভাবে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল এবং দুইজনে নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর তিলতিল পাখীটার মাথায় আস্তে এক ঠোক্কর মারিয়া কহিল।

তিলতিল। এটা কি চমৎকার নীল?

বালিকা। হ্যাঁ, এটী পেয়ে আমি ভারি খুসী হয়েছি।

তিলতিল। আমি এর চেয়েও নীল পাখী দেখেছি।...কিন্তু যেগুলো একেবারে নীল, তুমি যা-ই বলনা কেন, তাদের কিন্তু ধরতে পারা যায় না—ধরতে আমরা পারিওনি।

বালিকা। তা যাক্‌গে, এইটীই খুব ভাল।

তিলতিল। ওকে কিছু খাইয়েছ?

বালিকা। না। কি খায় এ?

তিলতিল। যা দেবে।...রুটী, গম, বার্লি, ফড়িং...

বালিকা। সত্যি?...কি করে খায়, বল না?

তিলতিল। কেন, ঠোঁটে করে,—দেখবে?...আচ্ছা দেখাচ্ছি, দাও—

তিলতিল নড়িয়া দাঁড়াইল এবং বালিকার হাত হইতে পাখীটি লইতে গেল। বালিকা তার হাতে পাখীটি দিতে যাইবে এমন সময় আলগা পাইয়া সে উড়িয়া পলাইল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

বালিকা। মা, মা; উড়ে পালিয়েছে! ...কি হবে!

তিলতিল। কেঁদো না, ভয় কি? আমি আবার ধরে এনে দেব।

(রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ হইয়া দর্শকগণের প্রতি)

আপনারা কেউ ঐ পাখীটিকে যদি ধরতে পারেন, তাহলে দয়া করে আমাদের দেবেন কি?...ওটিকে না পেলে আমাদের ভারি দুঃখ হবে।

যবনিকা

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

জাতীয় জীবনে নৈতিক অবনতি

যে সকল বৃত্তিকে আমরা নৈতিক গুণ বলি সেগুলি জীব-রাজ্যের নিম্নস্তরে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি আদিম মানব-সমাজেও সেগুলি বিরল (১)। নৈতিক গুণগুলি মানব-চিত্তে স্বভাবতঃই অন্তর্নিহিত ছিল, অথবা ক্রম-বিকাশের ফলে আবির্ভূত হইয়াছে,—সে-সকল দার্শনিক তর্ক তুলিবার স্থান ইহা নহে।

(১) Lubbuck—Origin of Civilisation—Charactor and Morals. Ch IX.

তবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই নৈতিক গুণগুলি অধিকতররূপে বিকাশ পাইয়া উঠিতেছে। আদিম বর্ব্বর মানব-সমাজে নৈতিক গুণ নাই বলিলেই হয়; আর সভ্যতার দিকে যতই তাহারা অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের মধ্যে এই সকল উচ্চতর বৃত্তি পুষ্ট হইয়া উঠে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যেমন উন্নতি হয়, নৈতিক বৃত্তির তেমন হয় না। সভ্যতার ইতিহাসকার বাকলে বলিয়াছেন যে, চারিত্র-নীতির ক্রমবিকাশ ধরিতে গেলে মানব-সমাজে এ পর্য্যন্ত তাহা বড় বেশী হয় নাই। তাহা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির সময়ে যেমন ছিল, আধুনিক কালেও প্রায় তেমনই রহিয়াছে (২)। কিন্তু আদিম অসভ্য-সমাজের চারিত্রনীতির ধারণা ও সভ্য-সমাজের চারিত্র-নীতির আদর্শে কি বিস্তর প্রভেদ নাই? বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল অসভ্য মানব আছে, তাহাদের সঙ্গে সভ্য-সমাজের তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যায়। নিগ্রো, ফিজিয়ান, জুলু বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের অপেক্ষা ইংরেজ বা ফরাসীর বুদ্ধিবৃত্তিই যে কেবল বেশী, তাহা নহে, জাতীয় চরিত্রও তাহাদের অনেক উন্নত। আবার বর্ত্তমান সভ্যজাতি-সকলের শৈশব অবস্থাতেও তাহারা নৈতিক গুণে বিশেষ গুণবান ছিল না—সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সেগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলতঃ সভ্যতা বলিতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বুঝায় না, তৎসঙ্গে নৈতিক উন্নতিও সূচিত হয়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানব যেমন জ্ঞানের নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়াছে, সেইসঙ্গে তাহার চারিত্র-নীতির আদর্শও বিচিত্র ও সূক্ষ্মতর হইয়া উঠিয়াছে—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখনই কোন জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে নৈতিক বৃত্তিরও উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। আবার যখন কোন জাতির অবনতি ঘটিয়াছে, তখনই তাহাদের মধ্যে নৈতিক বৃত্তিরও শিথিলতা দেখা গিয়াছে। প্রখর বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, উজ্জ্বল মেধা, ধারণা, শীলতা প্রভৃতি যেমন জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক,—সাহস, সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ প্রভৃতিও তেমনই। অন্যদিকে বুদ্ধির জড়তা, পল্লবগ্রাহিতা, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি যেমন জাতীয় জীবনে অধঃপতনের সূচনা করে,—ভীরুতা, স্বার্থান্ধতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, লোভ, হিংসা প্রভৃতি নীচবৃত্তিও তেমনি ঐ-সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হয়।

অর্দ্ধ পৃথিবীর সম্রাট রোমের ধ্বংসের প্রাক্কালে, তাহার জাতীয় জীবনে যে নানা দুর্নীতির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় সর্ব্বজনবিদিত। ক্ষমতাদৃপ্ত রোম তখন বিলাস-লালসায় হাবুডুবু খাইতেছিল; ফলে তাহার জাতীয় জীবনে অবসাদ, উৎসাহ-

(২) Buckle's History of Civilisation

হীনতা, কাপুরুষতা প্রভৃতি আসিয়া দেখা দিল। ব্যভিচার অন্তঃপ্রবিষ্ট কীটের ন্যায় তিলে তিলে দেশের ও সমাজের ক্ষয় সাধন করিতেছিল। নারীর সতীত্ব বা পুরুষের সংযম বলিয়া কোন কথাই ছিল না। পারিবারিক পবিত্রতা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি রোমের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ প্রণয়ী-পরিবর্ত্তনের দ্বারা বৎসর গণনা করিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা সমাজের নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছিল। আর, এইরূপে পৃথিবীবিজয়ী রোম যখন আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিতেছিল, তখনই বর্ব্বর গথেরা আসিয়া তাহার বুকে পাষাণ-ভার চাপাইয়া দিতে পারিয়াছিল। গ্রীস যখন উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল,—যখন তাহার শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের মহিমা জগৎময় ঘোষিত হইতেছিল, তখন তাহার জাতীয় জীবনে অশেষ সদ্‌গুণেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আবার সেই গ্রীস যখন মাসিদনিয়ার ষড়যন্ত্রে বিধ্বস্তপ্রায়, তখন তাহার জাতীয় জীবনে অনৈক্য, কলহ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অত্যন্ত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, সমসাময়িক সাহিত্যেই তাহার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। যে হিন্দুরাজগণের বীরত্বে চীন, ব্রহ্ম, গান্ধার ও পারস্যের সীমা পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিত, তাঁহারা তখন "মদনোৎসবে" মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, রণ-ক্ষেত্র ছাড়িয়া প্রেয়সীর অঞ্চলেই তাঁহারা স্থায়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন; আর শত্রুর অস্ত্ররাশির পরিবর্ত্তে কামিনীদের নয়ন-বাণের সঙ্গেই তাঁহারা বেশী পরিচিত ছিলেন। মেগাস্থিনিস যে জাতির সত্য-প্রিয়তা ও সাধুতার জয়গান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন, তাহাদেরই মধ্যে তখন 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, দেশদ্রোহিতা তখন ভারতের হিন্দুসমাজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল। নবম ও দশম এই দুই শতাব্দী ধরিয়া নীতিবর্জ্জিত ভারতবর্ষ কেবলই যুদ্ধ ও আত্ম-কলহে দুর্ব্বল হইতেছিল। ফলে নববলদৃপ্ত পাঠানেরা যখন ভারতবর্ষের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর তাহাদিগকে বাধা দিবার সামর্থ্য এতবড় ভারতবর্ষে আর-কাহারও ছিল না (৩)। মধ্যযুগে মুর-বিজিত, পরপদানত স্পেনেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই (৪)। তৎকালে একদিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কারপ্রিয়তা ও জড়তা প্রভৃতি যেমন স্পেনের জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বিলাসিতা, কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি তাহার মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। Inquisition নামে ধর্ম্মের অজুহাতে ভীষণ অত্যাচারের প্রথা এই সময়ে স্পেনের মাটীতেই গজাইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক ও মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের ব্যভিচার স্পেনে যেমন বীভৎস

(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের—"বাঙ্গলার ইতিহাস"—১ম ভাগ।
(৪) Buckle—History of Civilisation.

রূপে দেখা দিয়াছিল, এমন আর কোথাও নহে। সর্ব্বোপরি একটা দেশব্যাপী অবসাদ, নৈরাশ্য ও নির্জ্জীবতা এমন ভাবে স্পেনের বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল যে আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও স্পেন তাহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় নাই। আজও ইউরোপের মধ্যে স্পেনিসরাই সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি। পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গলার নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহার চিত্র রহিয়াছে। আমরা কেবল বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার কথাই বলিতেছি না। যে প্রতাপাদিত্য স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বারবার প্রবল-পরাক্রান্ত মোগলের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও যিনি তাঁহার জীবনের ব্রত ছাড়েন নাই, ভারতচন্দ্র তাঁহাকেই অতি নীচভাবে গালাগালি দিয়াছেন এবং বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দ ও আততায়ী মানসিংহের উচ্চস্তুতিতে শতমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। শব্দরচনাকুশল ভারতচন্দ্রের যশোগান প্রাচীনেরা যতই করুন, নব্যবাঙ্গালী উক্ত দেশদ্রোহী কবির এই গুরুতর অপরাধ কখনই মার্জ্জনা করিতে পারিবেনা। আর, যে সময়ে কবি দেশদ্রোহিতার জয়গান করিয়াছিলেন, সেই সময়েরই রাজনৈতিকেরা স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

জীবরাজ্যে নিম্নশ্রেণীর জীবদের মধ্যে প্রধানতঃ প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামই আত্মরক্ষা ও জাতিরক্ষার উপায়। কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীর জীব মানবের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে না। প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রাম মানব-সমাজের পক্ষে কিয়ৎ-পরিমাণে প্রয়োজনীয় হইলেও, সহযোগিতা ও প্রেমই এ সমাজের বিশেষত্ব। আর মানব যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার মধ্যে সহযোগিতা ও প্রেমের ক্রিয়া বেশী দেখা যাইবে। যে সামাজিকতা, ধরিতে গেলে, মানবের মধ্যেই প্রথমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সহযোগিতা ও প্রেমই সেই সামাজিকতার ভিত্তি (৫)। মানবের নৈতিক গুণাবলীও এই সহযোগিতা ও প্রেমের আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নৈতিক গুণাবলী যতই বিকাশ পাইতে থাকিবে, সামাজিকতা ততই দৃঢ়ভিত্তি হইবে, জাতিও ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এইরূপে জীবতত্ত্বের হিসাবেও নৈতিক গুণাবলী জীবন-যুদ্ধে সফলতার সহায়ক। কেবল প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম নহে—সহযোগিতা ও প্রেমও জাতিরক্ষার প্রধান উপাদান (৬)। নীট্শের প্রচারিত তথাকথিত জর্ম্মান "কাল্চার" আধুনিক কালে প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রামকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। তাহার ফলে হিংসা, মারামারি, কাড়াকাড়ি, যুদ্ধ, রক্তপাত—এককথায় দানবী শক্তির উন্মাদ লীলাই—জাতীয় উন্নতির চরম পন্থা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বীভৎস আদর্শের পরিণাম যে কি ভীষণ, ইউরোপের

(৫) Gidding's Sociology.

(৬) Kropotkin—Mutual Aid as a factor of Evolution.

বিরাট কুরুক্ষেত্রেই আজ তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কিন্তু, সত্য অপরাজেয় ও অবিনাশী। সহযোগিতা ও প্রেমই যে মানব-সভ্যতার মূলসূত্র—এই যুদ্ধের ফলে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে,—এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রেম ও সহযোগিতা-মূলক নৈতিক গুণাবলী যে জাতির মধ্যে সম্যক্ বিকশিত হইবে তাহারাই শেষ-পর্য্যন্ত জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে, আর যাহাদের মধ্যে এই সকল গুণের অভাব থাকিবে, তাহারাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। একদিকে মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি তাহার জাতীয় জীবনের শক্তি ক্রমশঃ অপহরণ করিতে থাকিবে, অন্যদিকে ব্যভিচার, অসংযম, পারিবারিক অপবিত্রতা প্রভৃতির ফলে বর্ণসঙ্কর ও জারজ সন্তান প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া বীজাশুদ্ধি ঘটাইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র জাতীয় জীবন রুগ্ন ও দূষিত হইয়া উঠিবে।

আবার, যখন কোন জাতি সজীব এবং নৈতিক বলে বলীয়ান থাকে, তখন তাহার জাতীয় জীবনেরও একটা উন্নত আদর্শ থাকে—আর সেই আদর্শই সমগ্র জাতিকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। কিন্তু যখনই এই নৈতিক বলের হ্রাস হয়, জাতিও তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার ধ্বংস ঘটিতেও বড় বেশী বিলম্ব ঘটে না। প্রাচীন রোমের আদর্শ ছিল—বিধিবদ্ধতা। এই আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়াই রোম বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিল। কিন্তু রোমের জাতীয় জীবনে যখন দুর্নীতির কীট প্রবেশ করিল, তখন এই আদর্শেরও লোপ হইল, সঙ্গে সঙ্গে রোমেরও ধ্বংস ঘটিল। প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ ছিল সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য। উত্তরকালে যখন সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করিল, তখন গ্রীসেরও এই আদর্শচ্যুতি ঘটিল—গ্রীকজাতিও লুপ্ত-প্রায় হইয়া গেল। প্রাচীন ভারতের আর্য্য সমাজ যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আদর্শকে উপলব্ধি করিয়াছিল, তখনই তাহা জ্ঞান-বিজ্ঞান নীতি-ধর্ম্মে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মহান আদর্শও ভারত-বর্ষকে নবজীবন দান করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বিচার সন্ন্যাস-প্রচারের ফলে সেই মহান্ আদর্শের অবনতি ঘটিয়াছিল। ইহলোক ও ইহজীবনকে তুচ্ছ করিতে পরামর্শ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উপদিষ্ট সন্ন্যাস, রাষ্ট্র ও সমাজ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সমস্ত ভারত-বর্ষকে দুর্ব্বল, বীর্য্যহীন ও আত্মরক্ষার অসমর্থ করিয়া তুলিল। আবার সেই কঠোর সন্ন্যাসেরই প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষদশায় এমন ঘোরতর দুর্নীতি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা সমাজে প্রবেশ করে যে, বিষাক্ত জীবদেহের ন্যায় তাহা শীঘ্রই প্রাণহীন হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষযুগের বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি ও তৎপ্রভাবপুষ্ট তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানাদিই তাহার প্রমাণ (৭)। মুসলমান-বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের যে

(৭) শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, নারায়ণ, ১৩২২

নৈতিক অধঃপতন ও শোচনীয় দুর্ব্বলতা দেখি, তাহাও ঐ সকলেরই পরিণাম। আধুনিক ইউরোপেও যে উদ্দাম বিলাস, যথেচ্ছাচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তাহাও বড় আশাপ্রদ নহে। খৃষ্টধর্ম্মের সংযম ও আত্মত্যাগের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই ইউরোপের এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। যদি আধুনিক মহাযুদ্ধের সর্ব্বধ্বংসী অগ্নিতে সেগুলি পুড়িয়া ভস্মসাৎ না হয়, তবে প্রাচীন রোমের ন্যায় আধুনিক ইউরোপের জাতীয় জীবনও শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে।

আধুনিক বাঙ্গলার—তথা ভারতবর্ষের—জাতীয় জীবনে আমরা কি কোন মহৎ আদর্শ অনুভব করিতে পারিতেছি? সহযোগিতা ও প্রেমের আদর্শ কি সেখানে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে? পরার্থপরতা, দেশপ্রেম, আত্মোৎসর্গ, তেজস্বিতা, সংযম ও তিতিক্ষা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী কি আমাদের জাতীয় জীবনে পূর্ব্বের চেয়ে বেশী দেখা যাইতেছে? বহুশত বৎসরের অবসাদের পর আজ যখন বিশ্বমানবের সভায় স্থান পাইবার জন্য আমাদের আগ্রহ জন্মিয়াছে, তখন এই হিসাব-নিকাশ আমাদের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি ও পল্লী-সংস্কার

কিছুদিন হইল, আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তার সহধর্ম্মিণী লেডী কারমাইকেলের উৎসাহে দেশীয় শিল্প-সমিতি (Bengal Home Industries Association) নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সংশ্রবে নিউমার্কেটের নিকটে একটি বিপণীও খোলা হইয়াছে। শুনিতেছি, প্রতি জেলার সদরে একটি করিয়া এইরূপ বিপণী ও প্রদর্শনী স্থাপন করার চেষ্টা চলিতেছে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণের যখন পৃষ্টপোষকতা আছে, তখন এ চেষ্টা যে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে এমন কথা বলা যায় না। পল্লীস্থ সমবায়-সমিতিগুলির যোগে যদি এই সমিতি মফঃস্বল হইতে গৃহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তৈয়ারীর পর distribution বা যথামূল্যে বিক্রয়ের জন্য আর দেশীয় শিল্পীদিগকে ভাবিতে হয় না। উপযুক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তা পল্লীশিল্পের উন্নতির পক্ষে বড় কম অন্তরায় নহে। এই প্রসঙ্গে উটজশিল্পের একটি সামান্য দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে মদনপুর ষ্টেশনের নিকটে "জঙ্গল" নামক গ্রামে কয়েকজন মুসলমান বংশখণ্ড-নির্ম্মিত খট্‌খটি নামক তাঁতের সাহায্যে মাছ ধরিবার নানা প্রকার 'ডোর' বা সুতা তৈয়ার করিয়া থাকে। মনে করুন স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণের চেষ্টায় এই ব্যবসায়ের কথা Indian Trades

Journal-এ স্থান পাইল এবং 'ডোরের' নানা প্রকার নমুনা সংগৃহীত হইয়া Commercial Museum বা গবর্ণমেণ্টের কলিকাতাস্থ স্থায়ী শিল্প-সংগ্রহাগারে রক্ষিত হইল। কিন্তু Commercial Museum তো দোকান নহে এবং আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণও এ-সকল স্থান হইতে কোন রূপ খবর লইতে জানে না, তাই মাছ-ধরার সুতা যাহারা সাধারণতঃ বিক্রয় করিয়া থাকে সে-শ্রেণীর দোকানদারগণের নিকট নমুনা ও দর-দাম প্রভৃতির সংবাদ সহজে পৌঁছিতে পারে না। এই "ডোর"-নির্ম্মাতাগণের মুখে শুনিয়াছি, তাহারা মুগা ও রেশম ফরাস-ডাঙ্গা হইতে কিনিয়া আনে এবং নিজেদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে সুতা প্রস্তুত হইলে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহা বিক্রয়ের চেষ্টা করে।

ভাল "ডোর" পাইলে অনেক মৎস্য-শিকারী উপযুক্ত মূল্য দিতে অনিচ্ছুক নহেন, কিন্তু বিক্রেতা যদি স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে অল্প মূলধনে এরূপ ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটে। জেলাস্থ শিল্পসমিতি যদি এই সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ভার লন এবং সমবায়-সংবদ্ধ হইয়া যদি এই শ্রেণীর গ্রাম্য শিল্পীরা একত্রে বহুল পরিমাণ কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারে, তাহা হইলে সময় ও অর্থের অপব্যয় বহু পরিমাণে বাঁচিয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থায় আরও একটা সুবিধার সম্ভাবনা। বিক্রয়ের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে না হইলে যখন মাঠে আবাদের কাজ থাকে না, গ্রামের চাষী লোকেরাও তখন নিজেদের গৃহে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায় অপর শিল্পীগণের সহিত একত্রে সেই অবসর-সময়েও কিঞ্চিৎ উপর্জ্জন করিতে পারে। ফলে কোন জেলা বা উপবিভাগের বিভিন্ন অংশে এই জাতীয় ব্যবসায়ের এক একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য তৈয়ারী মাল শিল্প-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট না দিয়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে লাভের কিয়দংশ মাঝের লোকের হস্তগত হওয়া অনিবার্য্য। হাতে-তৈয়ারী দ্রব্য কলের জিনিসের সহিত প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করিতে হইলে লাভ খুব অল্পই থাকে সুতরাং শিল্পীর জীবিকা-সংস্থানের দিকেও দৃষ্টি না রাখিলে চলে না।

আজকাল পল্লীগ্রামে যা-একটু ভাল অবস্থা দেখা যায় তা পাইকার মহাজন-শ্রেণীর। চাষীদিগকে পূর্ব্ব হইতে 'দাদন' দিয়া ইহারা একটা নির্দ্ধারিত দরে পাট, রেশম বা তামাক ক্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাই আবার উচ্চমূল্যে সহরের মহাজনদিগকে সরবরাহ করিয়া নিজেরা মাঝ হইতে দুপয়সা রোজগার করিয়া লয়। যদি কৃষকেরা কার্য্যসাধক "সংহতি" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক-একটি কৃষি-সমবায়-সমিতি স্থাপন করে, তাহা হইলে উক্ত সমিতির নিকট সস্তা সুদে ঋণ লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাড়ের গুঁড়া * প্রভৃতি

* কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার চালাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে গুঁড়া জোগাইয়া পরে দাম লইতেও আপত্তি নাই। কিন্তু অর্থাভাবে চাষীরা খরচে রাজি

তেজালো সার-প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ যেমন বাড়াইতে পারে, তেমনই আবার দাদনের দায় এড়াইয়া তৈয়ারী ফসল (distribute)-সমবায়-সমিতির সাহায্যে সহরে পাঠাইয়া সময়মত বিক্রয় করিতে পারিলে উপযুক্ত লভ্যাংশ হইতেও বঞ্চিত হয় না। Intensive cultivation বা কৃষিকার্য্যে অধিক মূলধন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী-প্রয়োগ এরূপ সমবায়-সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের দেশে কোনকালেই ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে যে লাভ পাইকারের কবলে যাইত, এ প্রণালী অবলম্বন করিলে শেষে তাহা চাষীদের হাতেই থাকিয়া যাইবে। বঙ্গদেশে মফঃস্বলের অনেকস্থানে Raffeisen (রাফি-সেন)-এর প্রণালীতে কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু সেগুলির কাজ টাকা কর্জ্জ দেওয়া মাত্র। এরূপ কাট্তির সাহায্য করা সেগুলির উদ্দেশ্য নয়। পাশ্চাত্য দেশে যৌথ-ঋণ-দান-সমিতির সহিত যৌথ-বিক্রয়-সমিতির মিলন থাকায় কৃষকগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের চমৎকার সুযোগ ঘটিয়াছে।

সমবায় বিক্রয় অর্থাৎ যৌথ কাট্তির ব্যবস্থা হইলে অন্যান্য বিষয়েও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে—যথা Dairy farming বা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন। কারখানায় অন্যান্য কারবারের অপেক্ষা এ ব্যবসায়টির কৃষিকার্য্যের সহিতই সাদৃশ্য অধিক। অল্পদিন হইল ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়া বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর সমবায়-প্রথায় প্রতিষ্ঠিত কোন একটি Dairy firm পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই যে ভেজাল ঘৃত লইয়া আজ গোলমাল চলিতেছে, তাহা শুধু দুই-একজন ধনী ব্যক্তি গোয়াবাগান হইতে দুই-একটি দুগ্ধবতী গাভী কিনিয়া ঘরে পুষিলেই মিটিয়া যাইবে না। দেশে যে পরিমাণ ঘৃতের প্রয়োজন, তাহা যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে ভেজাল গুপ্তভাবে চলিতে থাকিবে বলিয়া ভয় হয়। ইহার একমাত্র উপায়, সমবায় নীতি-অবলম্বনে উৎকৃষ্ট গাভী প্রভৃতি আনাইয়া দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যৌথ-কারবার স্থাপন করিয়া—দুগ্ধ-জাত দ্রব্যাদি তৈয়ারী ও তাহার সংরক্ষণে বৈজ্ঞানিক বিধির যথারীতি প্রয়োগ। সুলেখক রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর গল্পচ্ছলে সময়ে সময়ে যে সকল উপাদেয় উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার মধ্যে কোনও ম্যালেরিয়াদিগ্ধ পল্লীতে এইরূপ একটি Co-operative dairy স্থাপনের হাস্যোজ্জ্বল চিত্র অনেকেরই স্মরণপথে উদিত হইবে। এ ক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে কোনও বাধা নাই এবং যতদিন না হয় ততদিন এই ভেজালের অসুবিধা অল্প-বিস্তর ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া মনে হয়। কৌটিল্যের যুগে Dairy farming অজ্ঞাত ছিল না। তখন সরকার হইতে রাজভৃত্যগণের দ্বারা কিম্বা গোরক্ষক আভীর-গণকে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির অংশ দিয়া এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা হইতই। সে সঙ্গে

গোজাতির বংশোন্নতির দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। Vide foot note (ক)। সমবায়-প্রণালীতে organized বা ব্যবস্থাপিত না হইলে পল্লীর গোপগৃহে উদ্বৃত্ত দুগ্ধ হইতে যে কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সামান্য অংশও সহরে আসিয়া পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ এবং পৌঁছিলেও টানের খুব সামান্য অংশই পূরণ করা চলিবে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ, শুধু কলিকাতায় প্রত্যহ আটশত মন ঘৃত খরচ হইয়া থাকে। ১৯১২ সালের যৌথ সমিতির আইন-অনুসারে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকায় এখন আর কোন অসুবিধা নাই। ইউরোপে কিরূপ অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীর সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই দৃষ্ট হইবে।

	যৌথ ঋণদান	যৌথ সরবরাহ	যৌথ উৎপাদন (সাধারণত দুগ্ধজাত দ্রব্য)
আয়রল্যাণ্ড	১৮৯৫ খৃঃঅঃ	১৮৯০ খৃঃঅঃ	১৮৮৯ খৃঃঅঃ
ইংল্যাণ্ড	——	১৯০০ খৃঃঅঃ	১৯০০ খৃঃঅঃ
সুইজারল্যাণ্ড	১৮৯০ খৃঃঅঃ	১৮৮৬ খৃঃঅঃ	——
ফ্রান্স	১৮৮৫ খৃঃঅঃ	১৮৮৪ খৃঃঅঃ	——

(Vide Foundations of Indian Economics. p. 434.)

আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে যে-সকল ধর্ম্মগোলা সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা এই co-operative শ্রেণীর অনুষ্ঠান বটে—কিন্তু ইহাতে কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। বহুদিন ধরিয়া শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিলে আমাদের দেশের জল-বায়ুর প্রভাবে তাহা কতকাংশে নষ্ট হইবারও আশঙ্কা আছে।

এ দেশেও যৌথ মতের ক্রমেই প্রসার হইতেছে; কারণ এ দেশের চাষীরাও এক জোটে কাজ করিতে অনভ্যস্ত নহে। কুষ্টিয়া অঞ্চলে দেখিয়াছি এক এক পল্লীর চাষীরা দলবদ্ধ হইয়া স্থানীয় সাহেব কোম্পানির কুঠী হইতে আখমাড়া কল ভাড়া করিয়া লয় এবং কার্য্য-শেষে ভাগা-ভাগি করিয়া দেয়-টাকা চুকাইয়া দিয়া থাকে। বড় বড় কড়াই প্রভৃতি লোহার সরঞ্জামও এইরূপ একত্রে ভাড়া লওয়ার প্রথা আছে। কিন্তু ঋণ বা লোকসান সম্বন্ধে লেখাপড়ার মধ্যে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলেই অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর কৃষকেরা প্রায়ই ভয় পাইয়া থাকে। মফঃস্বলে সমবায়-সমিতি স্থাপন কালে এই লইয়া অনেক সময় ধুরন্ধর-গণকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। একেই ত বিধি-উপবিধিগুলি অশিক্ষিত লোকের নিকট একটু জটিল বলিয়া বোধ হইবার কথা, তাহার উপর আবার ব্যক্তিগতভাবে

(ক) "In Kautilya's time dairy-farming was undertaken by the State in one of the two ways—either the State farms were directly worked by the Government Department or with the help of herdsmen for a share of the produce. Cattle-breeding also engaged the attention of the State." Dr. P. N. Banerji. Public Administration in Ancient India. P. 253.

সকলেরই অসীম বা অনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব (unlimited liability),—সুতরাং গ্রামের দুই-একজন লেখাপড়া-জানা সচ্চরিত্র ও অবস্থাপন্ন লোক মাথা দিয়া না দাঁড়াইলে এরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। একবার কিন্তু ইহার সুবিধা বুঝিলে সমিতির সভ্যগণ নিজেরাই এ তত্ত্ব-প্রচারে সহায়তা করিতে থাকিবেন, তখন দেখাদেখি নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে এরূপ সমিতি স্থাপনে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। যে সকল কেন্দ্র-সমিতি আছে, সাধারণত সেই গুলিই গ্রাম্য ব্যাঙ্কের টাকা সরবরাহ করিয়া থাকে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা যদি সমিতিতে টাকা খাটায়, তাহা হইলে উহার কার্য্যের প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ হাড়ভাঙ্গা সুদ ত সমিতির নিকট আদায় করা চলে না, তাই মহাজনেরা এ সমিতিগুলিকে সুনজরে দেখে না। ফরাসী দেশে ও বেলজিয়ম প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত—credit foncier নামক কতকগুলি ব্যাঙ্ক আছে। এ গুলিতে জমিজমা বন্ধক রাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যায় এবং সুদ লাভের উদ্দেশ্যে টাকা লগ্নি করাও চলে। আমাদের দেশে ইউনিয়নে গ্রামে গ্রামে বা দুই তিনটি নিকটস্থ গ্রাম লইয়া—সমবায় ভিত্তিমূলে এইরূপ এক একটি যৌথ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে চাষীরাও মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার পায় এবং গ্রাম্য গৃহস্থগণও তাহাদিগের অল্প-স্বল্প সঞ্চিত টাকা—গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতার কথা অবগত হইলে সহজেই এই সকল ব্যাঙ্কে সুদে খাটাইবার উদ্দেশ্যে গচ্ছিত রাখিতে পারে। চিরাগত উপায়ের পথ বন্ধ দেখিলে মহাজনেরাও তাহাদের মূলধনে লাভ-জনক নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানার পত্তন করিতে পারে।

অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য যে কত প্রয়োজন, তাহা ওয়েডারবার্ণ ও মহামতি রাণাডে-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বহুপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই চাষীগণকে কৃষিকার্য্যের জন্য কর্জ্জ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তিনি ঋণের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ অধিক লইয়া কৃষকগণকে দয়াপরবশ হইয়া সাহায্য করিয়া থাকেন কি না? (সভাপর্ব্ব ৫ম) (Vide Dr. P. N. Banerjee. Public Administration in Ancient India. Chap. XVIII. P.257. চাষীদিগের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হইলেই গবর্ণমেণ্ট ও "তাগাবী" প্রণালীতে টাকা ধার দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় জন কৃষক এক জোটে সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে—এই টাকা খুব সামান্য সুদে ধার লয়। তাহাদের সুবিধার জন্য সরকারের কর্ম্ম-চারীগণ অনেক সময় গ্রামে গিয়াই এই সব টাকা বিলি করিয়া আসেন এবং কিস্তিমত—ফসল-কাটার পর—গ্রামে গ্রামে গিয়া এই সকল টাকা আদায় করেন। ইহাতে দরিদ্র কৃষকদিগের যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা আর বলিবার নয়।

গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে এই টাকা কর্জ্জ করার সুযোগ লোকে তাগাবী প্রথার ন্যায় গ্রামে বসিয়াই পাইতে পারিবে। নব-প্রতিষ্ঠিত সার্কেল প্রথায় এ সকল ব্যাঙ্কের আদায়-তহশিল ও হিসাবাদি-পরিদর্শনের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। উপস্থিত মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ এই সকল ব্যাঙ্ক মফঃস্বল-ভ্রমণের সময় পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উপদেশ-ক্রমে সার্কেল-অফিসারগণ নিজ নিজ সার্কেলের যৌথ সমিতিগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে প্রাথমিক স্কুলে "জমিদারী মহাজনী" শিক্ষা দেওয়া হইত; এখনও বোধ হয় এরূপ কোন পুস্তক নিম্নপ্রাথমিক পাঠ্যের তালিকাভুক্ত আছে। জমিদারী মহাজনীর সহিত যদি সমবায়-প্রথা ও যৌথ-সমিতির হিসাবাদি-রক্ষণ সম্বন্ধে কৃষক ও গ্রাম্য ব্যবসায়ীগণের সন্তানেরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পায়, তাহা হইলে পল্লীতে পল্লীতে কো-অপারেটিভ মত-প্রচার সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে। শুনিয়াছি, কো-অপারেটিভ-সমিতি সমূহের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে, এম, মিত্র মহোদয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে এ বিষয়টি স্থগিত আছে, তাহা জানিতে পারি নাই। শিক্ষাবিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কোন আদেশ প্রচার হইতে বিলম্ব ঘটিলেও শিক্ষিত গ্রামবাসীগণ ও গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগকে যৌথ-সমিতির নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহানুভূতি উদ্রেক করা যাইতে পারে। শুধু যৌথ-সমিতি বলিয়া নহে, পল্লীর বৈষয়িক উন্নতি-ব্যাপারেও গ্রাম্য পাঠশালা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে পলু পোষা (cocoon rearing) এবং লাক্ষা (lac) বা "লাহার" আবাদ আছে। জেলার যে অংশে পলু পোষা হইয়া থাকে সে অংশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যদি grasserie, flacherie প্রভৃতি রেশম কীটের রোগের কথা সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে এই পতনোন্মুখ ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সহায্য হয়। সেইরূপ আবার উক্ত জেলার উত্তরাংশে ধুলিয়ান, নিমতিতা অঞ্চলের লাক্ বা লাক্ষা-আবাদকারী কৃষকেরা যদি বাল্যকালে পাঠশালা হইতেই জানিতে পারে যে কুলগাছ ব্যতীত বাব্‌লা ও অড়হর গাছেও লাক্ষার আবাদ চলিতে পারে—তাহা হইলে এ ব্যবসায়ের আরও অধিক প্রসার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল বিভিন্ন স্থানীয় অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আজ-কাল কোন কোন চিন্তাশীল অর্থতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে যেথানে যে প্রকার গ্রাম্য ব্যবসায় চলিত আছে, সেখানে সেই সেই ব্যবসায়-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী স্কুলই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত —"জাতি বিদ্যালয়" বা caste schools-এর পক্ষপাতী, কিন্তু তাহা অপেক্ষা জাতি-নির্ব্বিশেষে এইরূপ "শিল্প-বিদ্যালয়" (craft schools) স্থাপিত হওয়াই উচিত

বলিয়া মনে হয়। মুর্শিদাবাদে কারুকার্য্য-খচিত রেশমী বস্ত্র-বয়নোপযোগী তাঁত-নির্ম্মাণে যে সর্ব্বাপেক্ষা কারিগরী দেখাইয়াছিল সেই ভুবরাজ জাতিতে "চামার" ছিল —তন্তুবায় নহে। কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্কুল অনুমোদিত হইলে গ্রাম্য যৌথ-সমিতির লভ্যাংশ হইতে ইহার সাহায্য অনায়াসেই চলিতে পারে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে স্কুল হাসপাতাল প্রভৃতি সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের উন্নতি-কল্পে যৌথ ব্যাঙ্কের লাভের নির্দ্দিষ্ট অংশ নিয়োজিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহা খুব অধিক না হইলেও নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। গ্রামের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ যত অধিক হইবে এই সকল হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য দানের নির্দ্দিষ্ট অংশও সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে। এখন অনেক মহানুভব ব্যক্তি জীবন-সায়াহ্নে চরম-পত্রের দ্বারা (will) কষ্ট-সঞ্চিত বিত্ত হইতে নিজ নিজ গ্রামে চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছেন। থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে চাঁদা উঠাইয়া এবং চৌকিদারী পড়তার (assessment) উপর দুই তিন পয়সা হিসাবে স্বেচ্ছাদত্ত মাসিক দান সংগ্রহ করিয়াও যে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিকিৎসালয় চলিতে পারে, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং জেলা বোর্ড ও যৌথ সমিতির সাহায্য পাইলে এইরূপ পল্লী-পরিচালিত গ্রাম্য দাতব্য ডিস্পেনসারী কালে সংখ্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া রোগক্লিষ্ট গ্রামবাসীগণের যে যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, দীক্ষা, রোগ-নিবারণ, রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া পল্লীর উন্নতি সংসাধিত হইতে থাকিবে। গ্রাম-ত্যাগী ভদ্রলোকেরাও সহরে আহার ও বাসস্থানের ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ কতকাংশে পুনরায় পল্লী-জননীর অঙ্কেই ফিরিয়া আসিবেন। গ্রামের রাস্তা-ঘাটের অবস্থা স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের উন্নতির উপর কি পরিমাণে নির্ভর করে তাহা অনেক স্থলেই চোখে দেখিয়াছি। যে স্থান হইতে ঘন ঘন মাল চালান দেওয়ার আবশ্যক থাকে, সেখানকার লোকেরা রাস্তায় পুল, পথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও মেরামতের উপর যথেষ্ট লক্ষ্য রাখে। কাদায় পাটের গাড়ী বসিয়া গিয়া উপযুক্ত সময়ে রেল ষ্টেশনে মাল পৌঁছিবার অসুবিধা ঘটিলে গ্রামবাসী ব্যবসায়ীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চাঁদা তুলিয়া প্রয়োজনীয় পূর্ত্তকার্য্যের জন্য উক্ত টাকা জেলা বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে, সে জন্য আর কোন অনুরোধ-উপরোধের প্রয়োজন হয় না।

আধুনিক পল্লীগুলি আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। স্যর্ চার্লস মেটকাফ্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতীয় গ্রাম্য জীবনের যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ধারার চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এখন বাহির হইতে জিনিসপত্র আমদানি না হইলে পল্লীর

অশন-বসনের সংস্থান হয় না এবং পল্লীজাত সামগ্রীও ভিন্ন স্থানে নীত না হইলে সেই সকল স্থানের অভাব পূরণ হয় না। পল্লীর সহিত বিশ্ব-জগতের যে অঙ্গাঙ্গীন যোগের কথা আমরা জানিতে পারিতেছি—সেই যোগের প্রধান উপকরণ—সভ্যতার শিরা-উপশিরা স্থানীয় রাস্তা প্রভৃতির সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক, গ্রাম্যশিল্পের কারখানা ও বিভিন্ন গ্রাম্য ব্যবসায় যতই বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য রেশমকীট-পালন প্রভৃতির যতই উন্নতি হইতে থাকিবে, প্রচুর উৎপন্ন দ্রব্যাদি-বহনের জন্য রাস্তা ও খালের উন্নতির দিকে ততই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখন যে সকল মরা নদী নানাবিধ জলজ উদ্ভিদে বোঝাই হইয়া অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া রহিয়াছে রাজা প্রজার সমবেত চেষ্টায় সেগুলি ক্ষুদ্র নৌকা-গমনাগমনের উপযোগী খালে পরিণত হইতে পারিবে। যশোহর ও নদীয়ার ড্রেনেজ বিভাগে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, পরে হয়ত সেগুলি সুবিধামত কাজে লাগান যাইবে। সার্কেল প্রথার বহুল প্রচলনের সহিত যখন সার্কেল বোর্ড (Circle Boards), ও ইউনিয়ন কমিটি (Union Committee) দেশময় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে, তখন গ্রামবাসী-দের স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদা, ধনী মহাজনদিগের দান, ইউনিয়ন কমিটির ধার্য্য ট্যাক্সের আদায়ী টাকা ও জেলা-বোর্ডের সাহায্য হইতে রাস্তা-ঘাট ও গমনাগমনের সুবিধা-অসুবিধা-বিষয়ক অনেক পল্লী-প্রশ্নের সমাধান হইবে। স্থানীয় শিল্পানুযায়ী শিল্পবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই সকল যৌথ ব্যাঙ্কের সাহায্যে, গ্রামবাসীগণের চাঁদা ও সরকারের বৃত্তি পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। বিদ্যার সহিত লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে; গৃহ-সন্নিহিত সার গাদা বা আবর্জ্জনার স্তূপ এবং পচা পানা ও water hyacinth বোঝাই ডোবাগুলি আর সেরূপ দুর্গন্ধ বিস্তার করিবে না; লোকের বহুকালের জড়তাও ক্রমে কাটিয়া যাইবে। এখন সরকার বা জেলা-বোর্ডের কিম্বা কোন ধনী দাতার পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি কূপ-প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ণয় করিতে আসিয়া মাল-মসলা আনয়ন সম্বন্ধে গ্রামবাসীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলে অনেকে উহা সে ব্যক্তির নিজের গরজ বলিয়াই মনে করে। কোন গ্রামে গিয়া শুনিয়াছি যে পল্লী-মধ্যস্থ একটি অনতি-বৃহৎ ডোবায় পর-পর তিনটি শিশু জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপি গ্রাম-বাসীরা ডোবাটি ভরাট করা বা উহার চারি-দিকে কোনরূপ বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে নাই। পল্লীবাসীর এই জড়তা-প্রসূত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-হীনতা বৈষয়িক অনুক্রমে বহির্জ্জগতের কর্ম্মস্রোতের সংস্পর্শে আসিলে আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। ক্রমশঃ অনাবশ্যক জঙ্গল কাটিয়া পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটাগুলি নানরূপ আনাজ-তরকারী উৎ-পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে। একত্রে সার্কেল বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটি ও গ্রাম্য ব্যাঙ্কে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলে লোকে

ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গ্রাম্য দলাদলি বিস্মৃত হইয়া হিতকর সাধারণ স্বার্থের দিকে মন দিতে শিখিবে। আইন-মতে যে সকল সামান্য মকর্দ্দমা মিটাইয়া দেওয়া যায়, সেগুলি গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও সার্কেল অফিসার এবং সমবায়-সমিতি ও ইউনিয়ন-কমিটির সভ্যগণের সাহায্যে যথাসম্ভব মিটিয়া গেলে অনেক সম্পন্ন গ্রামবাসীর অর্থ অসদ্ব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়া লাভজনক অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বৈষয়িক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সমবায় প্রথা-অবলম্বনে বিবিধ যৌথ অনুষ্ঠান-স্থাপনে যত্নবান হইতে হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তাঁহার অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থের মুখবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে কবে কি শিল্প কিসে নষ্ট হইয়াছিল, শুধু তাহারই আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কিম্বা সমবায় নীতি ও স্বেচ্ছা-প্রসূত উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিলে আইরীস জাতীয়-জীবনের খারাপ দিকটাই আমাদের দেশে উদ্ভূত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

শাক্ত-সাহিত্য

বৈষ্ণব-যুগের পরবর্ত্তী কবিরাও দৈব পাশ একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই; দৈব সম্পর্ক তখনও গ্রন্থের একটা বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশে দেবতার কিছু না কিছু হাত থাকিবেই, নহিলে গ্রন্থের অঙ্গ-হানি ঘটিত। বৈষ্ণব-কবি শ্যামের প্রেমেই বিভোর, কানু বিনা অন্য কোন গীত গায়িবার তাঁহার অবসরই ছিল না। শ্যাম মানুষ হইলেও দেবতা; গোপরাজপুত্র হইয়াও তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর। বৈষ্ণব-সাহিত্য তাঁহারই লীলা-সঙ্গীত। সেই লীলা কেবল মানবীয় প্রাকৃত ঘটনাচক্রেই আবদ্ধ নহে, ইহাতে দৈব অতি-প্রাকৃতের সন্নিবেশও বহুল বিদ্যমান। শিশু শ্যাম ক্ষণমাত্রেই যুবত্ব লাভ করিতে পারেন, দৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেও ইচ্ছামাত্রেই অদৃশ্য হন, চুরি করিয়া নবনী খাইতে খাইতেই মুখ-ব্যাদানে উদরমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করেন।

এই অতি-প্রাকৃতের ব্যাখ্যা যাহাই হউক, এই দেব শ্যামেরই মুরলীর আহ্বানে বৈষ্ণব কবির সুপ্ত বীণা জাগিয়াছিল। সেই বীণা বাজাইয়া কবি কখনও গোপ-কুলের দ্বারে দ্বারে শিশুর মত খেলিয়াছেন, কখনও রাখালের সঙ্গে রাখালবেশে মাঠে মাঠে ধেনু চরাইয়াছেন, আবার কখনও-বা ক্রীড়ারতা গোপাঙ্গনার নূপুর-শিঞ্জিতের

তালে তমালের কুঞ্জে কুঞ্জে নাচিয়াছেন। তাঁহার কাব্যচিত্রে মানব-হৃদয়ের ভাব-বৈচিত্র্য অঙ্কিত হইয়াছে বটে, বাৎসল্য, সখ্য, প্রণয়, সুখ, দুঃখ, অভিমান কবির তুলিকায় অতি পরিস্ফুটরূপেই দেখা দিয়াছে কিন্তু এই চিত্রের কেন্দ্রস্থলে যিনি বিরাজমান, যাঁহাকে বেড়িয়া এই মানুষী বৃত্তিসমূহ বিকশিত ও বিবর্দ্ধিত, তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ দেবতা।

এইরূপ দৈব-সাহচর্য্যে পরবর্ত্তী কবিরাও কাব্য রচিয়াছেন। তবে এখানে পালা উল্‌টাইয়া গিয়াছে। শ্যামের স্থলে শ্যামাই বেশী করিয়া দেখা দিয়াছেন। তাই এখানে যমুনার জল-কল্লোলের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে রণাঙ্গনের কোলাহলই শুনিতে পাই, বংশীগুঞ্জনের পরিবর্ত্তে অসির ঝনঝনাই ধ্বনিয়া উঠিয়া থাকে, ললিত নর্ত্তনের স্থলে ভৈরব তাণ্ডবই দেখা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবির কাব্য আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত যেরূপ কল্লোল ও সঙ্গীতেই ভরপূর, পরবর্ত্তী শাক্ত কাব্যে ভীমার রণলীলা তদ্রূপ অবিরাম নহে। অবিরাম হয় নাই বলিয়াই রক্ষা; নহিলে বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িত। মুরলী-ধ্বনি সকল সময়েই মধুর, যদি-বা কখন ততটা ভাল নাও লাগে, তবু শুনিতে বড় কষ্ট হয় না। কিন্তু রণাঙ্গনের অবিরাম রণ-নির্ঘোষে শুধু বাঙ্গালীর কেন, সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। শ্যামাভক্ত কবিবৃন্দ শ্যামাকে নিয়ত রণ-সাজে না নাচাইয়া ভালই করিয়াছেন। সেরূপ [illegible] ততটা বীররস হয় তো পাঠক হজম করিতেই পারিত না, আবার লেখকের লেখনীও যে গ্রন্থের মাঝামাঝি শুকাইয়া না যাইত, তাহারই-বা ঠিক কি!

তবেই দেখা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী কাব্যে দেবতা আছেন বটে, কিন্তু সে দেবতা বৈষ্ণবের দেবতার মত সর্ব্বগ্রাসী নহেন। কাব্যের সমস্তটা তিনি অধিকার করিয়া বসেন নাই। ইহাতে লাভ ও ক্ষতি দুইটাই লক্ষ্য করিবার মত। কাব্যের লাভ এইটুকু যে, ইহাতে বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে। ইহা অল্প লাভ নয়। মধু মিষ্ট হইলেও দিন-রাত কেহ তাই বলিয়া মৌচাক মুখে করিয়া থাকিতে পারেন না—যাঁহারা পারেন, জয়দেব তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। বঙ্গের একজন আধুনিক কবি তাঁহার মধু-চক্র হইতে গৌড়জনের জন্য নিরবধি মধু-পানের ব্যবস্থা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে মধু জয়দেব-জাতীয় নহে; তাহা শুধু কালিন্দীতটবর্ত্তী কুসুম-কুঞ্জ হইতেই আহরিত হয় নাই। তাহাতে দেশী ও বিলাতী, মিঠে ও কড়া দুই আছে। শুধু খাঁটি মিঠে মধু'র পিয়াসী চিরদিন জয়দেবেরই শরণাপন্ন থাকুন। কিন্তু এতটা মধু সকলের ধাতুতে সয় না। অনেকেই একটু রকমারির পক্ষপাতী। কষায় ও অম্লের তো কথাই নাই, একটু-আধটু তিক্তও চলিতে পারে। তাই ইঁহাদের পক্ষে পরবর্ত্তী কবিদিগের নানারসের ঘটনা-বৈচিত্র্য বেশ রোচকই হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী কবিদিগের প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের নাম করিলেই যথেষ্ট। ইঁহারাই এই শ্রেণীর কবিদের মুখপাত্র।

কাব্যগত লাভের কথাই এতক্ষণ বলা হইল, কবিগত ক্ষতির কথাও এখন একটু বলিতে হয়। সে ক্ষতি কবির ঐকান্তিকতার অভাব। ,চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস যতটা বৈষ্ণব কবি, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কথনই ততটা শাক্ত কবি নহেন। বৈষ্ণব-কবির শ্যাম দৈব-উপলক্ষ মাত্র নয়, শ্যাম তাঁহার সর্ব্বস্ব। মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের শ্যামা যেন অঙ্গহানিত্ব ঘুচাইবার জন্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছেন। বৈষ্ণব-দিগের ঐকান্তিকী ভক্তি ইঁহাদের নাই, অন্ততঃ গ্রন্থে তাহার পরিচয় ততখানি পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা ভক্ত ও কবি, ইঁহারা শুধুই কবি। ইঁহাদের পরে একজন শক্তিপূজক জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঐ দুই আখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার সঙ্গীতে বৈষ্ণব-কবির লালিত্য না থাকিলেও কবিত্ব যথেষ্ট আছে। আর ঐকান্তিকতায় তিনি বৈষ্ণব-কবির চেয়ে কিছুমাত্র খাটো নহেন। ইনি শাক্ত সঙ্গীত-রচয়িতা রাম-প্রসাদ।

মনে রাখা উচিত আমরা ব্যক্তির নহে, কবিরই আলোচনা করিতেছি। ব্যক্তিগত জীবনে চণ্ডীদাস বা কবিকঙ্কণ, কে বেশী ভক্ত ছিলেন, তাহা দেখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন থাকিলেও সম্ভবতঃ তাহা দেখিবার উপায়ও নাই, কারণ উভয়েরই খাঁটি জীবন-চরিত মেলা দুর্ঘট; তবে তাঁহাদের কাব্যদর্পণে তাঁহারা কি-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছেন, ইহাই মাত্র দেখান হইল। লোভ ও ক্ষতির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে —তাহা সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। এখন দুইটির একটু তুলনা করিয়া দেখা যাক। আলোচ্য কাব্যে লাভ ও ক্ষতি দুই আছে, কিন্তু এ দুইয়ের পরিমাণ কিরূপ? লাভের তুলনায় ক্ষতি বেশী, না, ক্ষতির তুলনায় লাভ বেশী? এ কথাটার উত্তর দেওয়া কিছু শক্ত।

লাভ ও ক্ষতির কথা বলা অনেক সহজ, কিন্তু তুলনায় দুইটার পরিমাণ ঠিক করা তত সহজ নয়। এরূপ তুলনা-মূলক হিসাবে অনেক গোলযোগ আছে। আমরা লাভ দেখিয়াছি ঘটনা-বৈচিত্র্যে, ক্ষতি দেখিয়াছি ঐকান্তিকতার অভাবে। এক্ষণে যাঁহারা ঘটনা-বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা লভ্যটাই বেশী মনে করিবেন। আবার ভক্ত শাক্তের প্রাণে অবশ্য ক্ষতিটাই বেশী বাজিবে। ভক্ত বৈষ্ণব যেরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্য উপভোগ করিবেন, ভক্ত শাক্তের পক্ষে মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্র কখনই সেরূপ উপভোগ্য হইতে পারে না; প্রসাদী ভজনই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়।

কিন্তু সংখ্যায় এই পক্ষ খুবই কম। অপর পক্ষ প্রবল তো বটেই এবং তাঁহারাও যে একেবারে ভক্তি-বিরোধী, তাহাও বলিতে পারি না। তবে তাঁহাদের যুক্তি আলাহিদা। ভক্তিপক্ষের ন্যায় তাঁহারা গ্রন্থমাত্রকেই ভক্তির ছাঁচে ঢালাই করা দেখিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে ভক্তি চিরদিন সাহিত্যের প্রধানতম অঙ্গ হইয়া থাকুক, কিন্তু তাই বলিয়া কি ভক্তের পদাবলী ছাড়া আর কোনপ্রকার সাহিত্যই বাঙ্গলায় গজাইতে পাইবে না? বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের অনুসরণে ভূ রি

ভূরি শুধু শাক্ত পদ-কর্ত্তা জন্মিলেই কি বঙ্গসাহিত্য বড় পরিপুষ্ট হইত? বৈচিত্র্যই যে সাহিত্যের পরিপোষণে একটা বিশেষ উপকরণ! এই উপকরণ না থাকিলে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধিত হইতেই পারে না। বৈষ্ণব-যুগের সাহিত্য তাই এক হিসাবে অতি উচ্চস্থান লাভ করিলেও, পূর্ণাঙ্গ নহে। শুধু পরমার্থ-তত্ত্বেই সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। সংসার, সমাজ, সাম্রাজ্যও সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়া চাই। মুকুন্দ-রাম ও ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুকরণে শুধু শ্যামা-বিষয়ক পদাবলী সৃষ্টি না করিয়া যে সমাজ ও সংসারের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ বৈ ক্ষতি হয় নাই। বৈষ্ণবদিগের একঘেয়ে সাহিত্যে এই বৈচিত্র্য-সমাবেশের জন্য ইহারা বাঙ্গালী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ, বৈষ্ণব-সুলভ ভক্তি-প্রবণতার অভাব-হেতু কখনই নিন্দনীয় নহেন।

এ কথায় সায় দিতে আমাদেরও তত আপত্তি নাই। ভক্তি অবশ্য স্বর্গীয় বস্তু। কিন্তু শুধু স্বর্গীয় বস্তুতে মর্ত্ত্য সাহিত্য গড়িলে চলিবে কেন? এখানে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য দুই থাকা চাই। বৈষ্ণব-দিগের সাহিত্যিক পরমার্থের মাঝে সংসার ও সমাজকে আনিয়া কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্র কেন নিন্দাভাজন হইবেন? তাঁহাদের কাব্যে যদি দেবতা সর্ব্বগ্রাসী না হইয়া থাকেন, যদি আগাগোড়া তাহাতে উগ্র ভক্তির প্রবাহ না ছুটিয়া থাকে, তাহাতেও নিন্দার কিছু দেখি না। কারণ সর্ব্বগ্রাসী

সাধন নহে। তথাপি নিন্দার কারণ আছে। কৃষ্ণনামের ধূয়ার রসে বিদ্যাসুন্দরকে আধ্যাত্মিক রকমে পাক করিয়া লইলেও, ভারতচন্দ্রের এ নিন্দা ঘোচে না।

নিন্দার কথা শুনিয়া কোন ভক্ত যেন রুষ্ট হইয়া না পড়েন! ভাষার বা ভাবের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা বলিয়া যে কিছুই নাই, অবশ্য এতটা উদার মত আমরা পোষণ করিতে পারি না। প্রকৃতি অবশ্যই কোন ব্যাপারেই শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ছাপ লাগায় নাই। এটা সাদা ওটা কালো, এটা গরম ওটা ঠাণ্ডা, এটা কঠিন ওটা দ্রব, এ জ্ঞান স্থূলতঃ প্রকৃতি শিখাইতে পারে; কিন্তু এটা অশ্লীল ওটা শ্লীল—এ শিক্ষা প্রকৃতির পাঠশালায় বড় পাওয়া যায় না। তাই কেবলমাত্র প্রকৃতি-চালিত জীবসমূহে এই জ্ঞানের নিদর্শন নিতান্তই দুর্লক্ষ্য। কিন্তু মানব-সমাজ কেবল অন্ধ প্রকৃতি-সম্ভূত নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের মত শ্লীল ও অশ্লীলের জ্ঞান মানব-সমাজ বিশেষ শিক্ষার বলেই অর্জ্জন করে। প্রাকৃতিক আদি মানবে ইহার লক্ষণ পরিস্ফুট না থাকুক, সকল সভ্য মানব-সমাজেই এই জ্ঞান লক্ষিত হয়। তবে অপর নানা জ্ঞানের মত দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ইহারও তারতম্য ঘটে। আমরা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী অশ্লীলতাকে নিন্দনীয় মনে করি, তা সে যত বড় কবির কাব্যেই ইহা দেখা যাক না কেন! তাই বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আমাদের কাছে নিন্দার্হ। কিন্তু এজন্য ভারতচন্দ্র ততটা

এই অশ্লীলতার জন্য ভারতচন্দ্র ততটা নহেন যতটা তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী-সমাজ দায়ী। তখনকার সমাজের বাতাসটাই ছিল ঐরূপ। অনেকে বলিতে পারেন, তিনি সেই বাতাসের গতি ফিরাইলেন না কেন? অবশ্য বলিতে হইবে, ততটা শক্তি তাঁহার ছিল না। যে শিক্ষা ও সংসর্গের মাঝে তিনি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সে সকলকে অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্যে কুলায় নাই। তিনি যে বিশেষভাবে খারাপ লোক ছিলেন, এ কথা নিশ্চিতই ভিত্তিহীন। বাইরণ যেরূপ নিজের উচ্ছৃঙ্খল গতিতে সামাজিক নীতিকে ঠেলিয়া লেখনী চালাইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা নিশ্চয়ই সেরূপ কোন ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা-মূলক নহে। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সামাজিক নীতির উল্লঙ্ঘন নহে, তাহার অনুসরণ। তাৎকালীন অশ্লীলতা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা গেল বটে, কিন্তু সে সময়ের ছোট বড় কোন কবিই ইহা হইতে বাদ যান না, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মুকুন্দরামও নন্।

পরবর্ত্তী কবিদিগের বৈষ্ণবী ভক্তির অভাব-সত্ত্বেও সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সংঘটনের জন্য তাঁহাদের পক্ষ একপ্রকার সমর্থন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু নিন্দার কথাও তোলা হইয়াছিল। মাঝে হইতে একটু অশ্লীলতার আলোচনা আসিয়া পড়িলেও বাস্তবিক সে নিন্দা অন্য কারণেই তোলা গিয়াছে। সেই কারণটা এখন বলি। এই পরবর্ত্তী কবিদিগের—বৈষ্ণব-যুগের তুলনায়—দেবভক্তিতে হ্রস্বতা আছে; থাকুক, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের দেবতাকে খেলো করিবেন কেন? চণ্ডীদাসের ভাবোন্মাদ যদি ভারতচন্দ্রে না থাকে ত দোষ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের দেবতাকে ভারতচন্দ্র যদি যথাযোগ্য স্থানে সমারূঢ় না রাখেন, তবে সেটা দোষের বৈ কি! শ্যাম প্রেমের দেবতা, বৈষ্ণব শ্যামকে লইয়া প্রেমের কত উচ্চ আদর্শই না আঁকিয়াছেন! যশোদার উগ্র বাৎসল্য, রাখাল-বালকের একান্ত সখ্য, গোপাঙ্গনার আত্মহারা অনুরাগ সবই প্রেম-বৈচিত্র্যের এক-একটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি! এই মূর্ত্তির কোনটিতে যদি বৈষ্ণব কবি কালিমার দাগ দাগিয়া থাকেন, তবে তাহাও অনেক সময়ে আবার আধ্যাত্মিকতার তুলিকাস্পর্শে বহু পরিমাণে মুছিয়া যায়! আর যদি আধ্যাত্মিক দিকটা নাও ধরা হয়, তথাপি বৈষ্ণব নিজের বিশ্বাস-মতে নিজের প্রেমের দেবতার যে লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা নিষ্কলঙ্ক না হইলেও বড় আবেগময়। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে বৈষ্ণবের শাস্ত্রগত প্রাচীন নজীরও আছে। সে নজীর শ্রীমদ্ভাগবত।

কিন্তু ভারতচন্দ্র কোন্ নজীরে শ্যামাকে ধরিয়া সুন্দরের গুপ্ত প্রেমের দূতীগিরি করাইলেন! শ্যামা শক্তির দেবতা, যুগে-যুগে অসুর-নাশিনী দুষ্ট-দলনী। ভারতচন্দ্র সেই শক্তিরূপিণীকে কোন্ উচ্চ কাজে লাগাইয়াছেন? তাঁহাকে দিয়া কোন্ অসুরবিনাশ করাইয়াছেন, কোন্ দুষ্টের দমন ঘটাইয়াছেন? ভারতচন্দ্রের শ্যামার প্রধান কাজ হইল কি না, চোরের জন্য সুড়ঙ্গ-কাটা! কেন, ইহার জন্য কি শুধু কতকগুলা মুষিক

পুষিলেই চলিত না? আর যদি দেবতারই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে একটা ছোট-খাটো দেবতা বা উপদেবতা খাড়া করিলেই ত সব কাজ চুকিয়া যাইত! শুম্ভনিশুম্ভ-বিনাশিনীকে এ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইহাতে আর এক কাজ হইল কি, না, রাজাকে ভয় দেখানো। কেন, রাজার কি দোষ? যে লোক এমন শয়তানী করিয়া তাঁহার সম্ভ্রান্ত কুল কলঙ্কিত করিতে পারে, তাহাকে যে তিনি শাস্তি দিবেন এ তো ন্যায়বিচারের কথা। দুষ্কৃত-দলনী ন্যায়-বিধায়িনী মহাকালীর প্রকৃতি যে ভারতচন্দ্র একেবারে উল্‌টাইয়া দিলেন! কেহ হয়তো বলিবেন, এই দুষ্কৃতকারী যে শ্যামার ভক্ত! সেইটাই তো দুঃখ! কাব্যকার এমন দুষ্কৃত-কারীকে এমন দেবতার ভক্ত করেন কেন? স্মর তো একজন দেবতা বটেন, তাঁহাকে লইলেই তো কাজ চলিত, স্মরারিশক্তিকে আবার এখানে টানিয়া আনা কেন! আবার কেহ হয়তো বলিবেন, সুন্দর তো দুষ্কৃত-কারী নয়। শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ব বলিয়া একটা পরিণয়-বিধান আছে। বিদ্যা, সুন্দরের সহিত সেই বিধান-মতে পরিণীতা। ভাল, শাস্ত্রবেত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, এ ব্যাপারটা কোন্ যুগের? অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিতে পারেন। ভাল হোক, আর মন্দই হোক তখন ও-ব্যাপারটার চলন ছিল। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের সময়েও কি সেটা খাটে? কাব্যকার দায়ে পড়িয়া খাটাইতে গিয়া শুধু গোঁজামিলই দিয়াছেন। আর যদি বিধানটার তখন চলনও থাকিত, তবুও সুন্দরের ওরূপ লুকোচুরি ও সিঁধকাটা বড় পৌরুষের পরিচায়ক হইত না। ভারতচন্দ্রের আর সব ছাড়িয়া কেবল বিদ্যাসুন্দর কাব্যই ধরা গিয়াছে দেখিয়া কাহারো ক্ষোভের কারণ নাই। অন্যত্রই কি দেবতা কাব্যকারের হাতে বড়-বেশী দেবোপম হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন? মহাযোগী মহাদেবকে লইয়াও কাব্যকার বড় কম নকড়াছকড়া করেন নাই। যাক, ও-সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের কথা এই পর্য্যন্ত।

এখন কবিকঙ্কণই বা এ-সম্পর্কে কি করিয়াছেন, একটু দেখিয়া কথাটা শেষ করা যাক। অবশ্য, তিনি ভারতচন্দ্রের মত তাঁহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অতখানি খাটো করেন নাই। সেরূপ করিবার তাঁহার প্রয়োজনও হয় নাই। তাঁহার নায়ক-নায়িকা ভারতচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মত ততটা রোমান্টিক নয়। সিঁধ কাটিয়া তাঁহাদের মিলন ঘটাইতে হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সাদাসিধে গৃহস্থ লোক। তাঁহাদের মিলন, বিচ্ছেদ, প্রণয়, পরিণয় সবই প্রায় সাদাসিধে গার্হস্থ্য বিধানেই শেষ করা হইয়াছে। তাঁহাদের উপাস্য দেবীও প্রায় তাঁহাদেরই মত সাদা-সিধে, তবে দুই-একটা ঘটনায় তাঁহার সাদাসিধে মূর্ত্তির অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু এই ব্যতিক্রমে তাঁহার সাদাসিধে মূর্ত্তির স্থলে দিব্য প্রতাপ-শালিনী শক্তি-মূর্ত্তিও তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। দুই-একটা সামান্য যুদ্ধ-ব্যাপার ছাড়া তিনি একবার স্বর্ণ-গোধিকার রূপে কালকেতুর গৃহে দেখা দিয়াছেন, আর

একবার সাগর-বক্ষে কমলাসনে বসিয়া হাতি গিলিয়াছেন! শেষটি তাঁহার কমলে-কামিনী রূপ। এই রূপের অদ্ভুতত্ব এত-বেশী যে, ইহা বাস্তবিক কতটা শক্তির পরিচায়ক, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। বলা বাহুল্য, কবিকঙ্কণও তাঁহার দেবতাকে দিয়া বড়-বেশী মহৎ কাজ করাইয়া লন নাই।

মোটকথা এই, কবিদিগের কাব্য-ক্ষেত্র শক্তিরূপিণীর শক্তিবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট-প্রশস্ত নহে। ইহার পরিধি বড়ই সঙ্কীর্ণ। সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দেবতা যতটুকু করিতে পারেন, তাহাই করিয়াছেন, এখানে তাঁহার বিশেষ কোন উপাসকের একটা-কিছু উপকার করাই যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। এই উপকার করিতে যদি কাহারো কিছু অপকার করা হয় সেদিকেও তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। ন্যায়, অন্যায় যে কোন উপায়েই হোক, স্তাবককে তুষ্ট করাই যেন তাঁহার একমাত্র কাজ! এই কি মহাশক্তির মহতী লীলা? মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভূভারহারিণী শ্যামায় আর এই শ্যামায় যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রভেদ! তাই বলি, দোষ-ত্রুটি-সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবি যেরূপ তাঁহার প্রেমের দেবতাকে সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন, শক্তি-দেবতার চিত্রাঙ্কণে শাক্ত কবি তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারেন নাই।

তবে ইঁহাদের সংসার ও সমাজের চিত্র মন্দ ফোটে নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের এ-চিত্র মুকুন্দরামের অপেক্ষা অনুজ্জ্বল। চিত্রের অঙ্কণে ও চিত্রের নির্ব্বাচনে,—দুইয়েই অনুজ্জ্বল। চিত্রাঙ্কণে অনুজ্জ্বল বলি কেন, না, তাঁহার কাব্যে অনেক ব্যক্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট থাকিলেও এক হীরা-মালিনী ছাড়া আর কেহ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই! আর নির্ব্বাচনের কথা তোলাই অনাবশ্যক, বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরের অতি-বড় ভক্তও কবির বিষয়-নির্ব্বাচনের তেমন তারিফ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। তাহা হইলেও প্রশংসার বিষয় তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। অমন ললিত শব্দের ঝঙ্কার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। তাছাড়া শব্দের গতিটুকু আগাগোড়া বেশ অবিরাম স্বচ্ছন্দ।

বাস্তবিক: এই শব্দকুহকেই ভারতচন্দ্র অনেককেই মজাইয়াছেন। এ মজান বড় সোজা মজান নয়। যাঁহারা মজেন, তাঁহাদের কানে কবির শব্দের তান এমন মধুবৃষ্টি করিতে থাকে যে, শ্রোতার সমগ্র চিত্ত যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাঝে একেবারে সমাধিগত হয়, কবির অন্যান্য ত্রুটি ও দৈন্য দেখিবার আর তাঁহার অবসরই থাকে না। কবির এই শব্দের ঝঙ্কার যেন তাঁহার উপাখ্যানের অভিনয়ে হীরামালিনীর হাততালির মত। বাল্যকালে যাত্রায় দেখিয়াছি হীরা যখন হাততালি দিতে দিতে আসরে নামিত, তখন যেন একটা আমোদের তড়িৎ-প্রবাহ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইত। এটা হইল সাধারণ শ্রোতার লক্ষণ। আবার, যাঁহারা আসল সমঝদার অর্থাৎ যাঁহারা রসের রসিক তাঁহাদের যে কি অবস্থা ঘটিত, তাহা বুঝি বর্ণনার অতীত। তাঁহাদের হাতের হুকা হাতেই থাকিত, কাঁধ হইতে গামছাখানা খসিয়া পড়িত, বিকট ভ্রূভঙ্গী সহকারে চীৎকার করিয়া

তাঁহারা আমোদচঞ্চল তরুণ শ্রোতৃসমূহকে মৌন করিতে বেজায় বিব্রত হইয়া উঠিতেন। একটা স্থচীপতনের শব্দও বুঝি তখন সেই আত্মহারা সমঝদারদের কানে বজ্রনাদের মতই ঠেকিত। এমনই হাততালির যাদু! ভক্ত পাঠকের কানে ভারতচন্দ্রের শব্দের তান ইহা অপেক্ষা বোধ হয় আরো-বেশী কুহকময়।

ভারতচন্দ্রের চিত্তহারী পদবিন্যাসে কাহার আপত্তি থাকিতে পারে? অমৃতে কাহার অরুচি? কিন্তু এই সুন্দর শব্দের সঙ্গে যদি সুন্দর ভাবের মিলন না ঘটে, তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা আক্ষেপের বিষয়। নয়নভুলানো মুক্তামালার যে শোভা, তাহার সার্থকতা কখন? না, যখন তাহা সুন্দরীর সুকুমার কণ্ঠে আশ্রয় পায়। কিন্তু একটা বানরীর গলায় পরাইলে কি সেই মুক্তামালার তেমন জলুস খোলে? চণ্ডীদাসের শব্দলালিত্য থাকিলেও, অবশ্যই তাহা ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নয়। তবুও চণ্ডীদাসের পদাবলী ভারতচন্দ্রের কাব্য অপেক্ষা কতটা বেশী মর্ম্মস্পর্শী! কেননা চণ্ডীদাস মহান্‌ ভাব-আলোকের আধার, ভারতচন্দ্র তাহার মহান অভাবের আধার।

ভারতচন্দ্রের বিষয়-নির্ব্বাচন লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে, কাব্যগত উপাখ্যানের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই, উহা কবির বিদ্বেষ-প্রণোদিত কল্পনার সৃষ্টি। কোন বিশেষ অবমাননার পরিশোধের জন্যই তিনি ঐরূপ গল্প রচিয়া গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন। কেহ বলে, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক উহাতে বিদ্বেষের কি নিদর্শন আছে? তাঁহার নায়ক-নায়িকারা ত শ্যামাদেবীর অনুগত ভক্ত, কবি তাঁহাদের জীবনে দেবীর মহিমাই প্রকটিত করিয়াছেন। অপর লোকের অপর মতও থাকিতে পারে। এই সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করা এখানে অসম্ভব। এরূপ কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী না হইয়াও কাব্যগত আলোচনা চলিতে পারে। যদি দেবীর মহিমা দেখানই ভারতচন্দ্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে কবি-হিসাবে তাঁহার যে খুব প্রশংসা করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইহা ছাড়া যদি বিদ্বেষের কোন গন্ধ থাকে, তবে শুধু কবি কেন, ব্যক্তি-হিসাবেও তাঁহার গৌরবের হানি ঘটে।

ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ উভয়েই সমাজকে কাব্যগত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই কবির সমাজচিত্র বড়ই ভিন্ন। উজ্জ্বলই হউক আর অনুজ্জ্বলই হউক, ভারতচন্দ্র সমাজের উচ্চস্তরের চিত্রই বেশী আঁকিয়াছেন। রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজকুমার ও রাজ-দরবার লইয়াই তাঁহার চিত্রপট, সমাজের সাধারণ বা নিম্নস্তরের দৃশ্য তাহাতে তত নাই। ভারতচন্দ্র ছিলেন তখনকার নামজাদা রাজ-সভার মার্কামারা রাজকবি। বিশেষ ব্যক্তিত্বের বল না থাকিলে এরূপ মার্কামারা কবি প্রায় একটু পেসাদার হইয়াই পড়েন। ভারত-চন্দ্রে যেন এই পেসাদারীর লক্ষণ একটু বেশীমাত্রায় ফুটিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রতিপালক রাজার মনোরঞ্জনার্থেই অপর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার কুৎসামূলক কাব্য লিখিয়াছেন।

ঐ কথা সত্য হইলে ইহা অবশ্যই পেশাদারির চূড়ান্ত! সত্য না হইলেও, তাঁহাকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বলে একটা অচল অটল পুরুষ বলিয়া মনে হয় না। তিনি যদি তাহা হইতেন তবে রাজদরবারের প্রভাব তাঁহার উপর এতটা পড়িত না।

কবির বর্ণনায় তাঁহার প্রতিপালক রাজার চরিত্র চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার আমোদপ্রিয়তার দিকটা আয়তনে যেন কিছু বেশী ছিল। এবং সে আমোদটা যে অনেক সময় উচ্চ কলাসম্ভূতও ছিল না, জনপ্রবাদে আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রবাদে যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন বা মিথ্যা নাই তাহা বলি না, কিন্তু ইহার কোন অংশও যে সত্য নয়, এমন কথাই বা কেমন করিয়া মানা যায়! রাজার সম্পর্কে প্রচলিত গোপালভাঁড়ের সব গল্প বিশ্বাস নাই করিলাম, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে আমোদের জন্য ভাঁড় পুষিতেন ইহা অবিশ্বাস করিবার কি বড় বেশী কারণ আছে? তখন রাজাদের এইরূপ ভাঁড় রাখা—একটা প্রচলিত প্রথা ছিল। এবং এই ভাঁড়ের সঙ্গে আমোদটাও যে খুব বিশুদ্ধ রকমের হইত না ইহাও ঠিক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে এইরূপ আমোদপ্রিয়তার অনধীন ছিলেন, এ-কথার অনুকূল অপেক্ষা প্রতিকূল প্রমাণই বেশী। ভারতচন্দ্র এইরূপ আমোদ-প্রিয় রাজার পোষা কবি। পোষা ভাঁড়ের মত অতটা না হউক, তাঁহাকেও রাজার আমোদের জন্য কিছু-না-কিছু খোরাক যোগাইতেই হইত। তাঁহার কাব্যে আমোদপ্রিয় রাজদরবারের কৃত্রিমতার ছাপটি তাই বুঝি এমন সুস্পষ্ট লাগিয়া আছে! মুকুন্দরামেরও একজন অনুগ্রাহক রাজা ছিলেন। কিন্তু হয়তো তিনি রসের ততটা সমজদার ছিলেন না, অথবা মুকুন্দরামের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিষটা কিছু অটুট ছিল। যে কারণেই হউক মুকুন্দরামের ব্যক্তিচিত্র সাধারণ হইলেও, বেশ স্বাস্থ্য ও সবলতার পরিচায়ক,—কোন প্রকার কৃত্রিমতার প্রভাব তাহাতে পড়ে নাই। তাই ভারতচন্দ্রে রাজদরবারের আতরমাখা বদ্ধ বায়ুই আমাদের গায়ে লাগে, আর মুকুন্দরামের কাব্যশালা গৃহস্থের মুক্ত আঙ্গিনার পুষ্পসৌরভে ভরপুর।

শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ।

আলেয়ার আলো

চব্বিশ

সুরেন্দ্রের কথা

আমাকে দেখে সরমা যে মোটেই খুসী হবে না, এ আমি খুব জানতুম! আমাকে সে কখনই ভালবাসত না—আমি মরে গেছি ভেবে সে একরকম নিশ্চিন্ত হয়েছিল—আবার বিবাহ করে' সে নূতন সংসার পাততে বসেছিল—এরি-মধ্যে হঠাৎ কোনখান্ থেকে দুষ্ট গ্রহের মত উদয় হয়ে আমি তার আশার বাতি একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দিলুম, একি কম আপশোষের

কথা! ওঃ, খুব সময়ে এসে পড়েছি যাহোক —নইলে এবারে আমাকে সত্যি-সত্যিই পথে দাঁড়িয়ে মরতে হোত!

...উপরে উঠে যখন ঘরের ভিতরে ঢুকলুম, সরমা তখন জানলার একটা গরাদে ধরে মাথা নীচু করে' দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে মুখ তুলে, সে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মুখ মুখোসের মত স্থির—তার ভাব একটুও বদলালো না। তাতে বিস্ময় বা বিরক্তির একটা রেখাও পড়ল না!

তার মুখ দেখে আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কথা কইতে গেলুম, কিন্তু জিভ্‌ যেন আঁটকে গেল।

সরমাও কিছু বললে না।

স্তব্ধ ঘরের মধ্য থেকে ঘড়ীটা খালি যেন টিট্‌কিরি দিয়ে বলছিল, টিক্‌, টিক্‌, টিক্‌!... ...

এ নীরবতা আর ত সওয়া যায় না! এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা, এখন এমন নীরবতা শুধু অসহনীয় নয়, অশোভনও বটে! অতএব আমিই প্রথমে মুখ খুলে বললুম, "সরমা, আমি এসেছি।"

সরমা যেন শিউরে উঠল। তারপর সুধু বললে, "বোসো।"

আমি একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে গুম্‌ হয়ে বসে রইলুম। আবার সেই নীরবতা!... ...এবার আমার রাগ হোতে লাগল। আমি তার স্বামী, একরকম যমালয় থেকে ফিরে আসছি বললেই চলে, আজ এই প্রথম সাক্ষাতের সময়ে অন্তত কর্ত্তব্যের খাতিরেও তার একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে, আমি কেমন আছি! রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন রি-রি করতে লাগল—কিন্তু, না, মনের রাগ এখন বাইরে জাহির করবার সময় নয়—তাহলে সব মাটি হবে—যে পূজার যে মন্ত্র!

মুখে হাসি টেনে এনে বললুম, "তুমি ভাল আছ ত?"

সুপ্তোত্থিতের মত সরমা বললে, "অ্যাঁ?"

—"ভাল আছ?"

—"আছি।"

—"অত দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এস, এতদিন পরে দেখা!"

পুতুলের মত সে আমার কাছে এগিয়ে এল।

তার একখানা হাত আমার নিজের হাতে টেনে নিলুম—উঃ, কি ঠাণ্ডা তার হাত! তার মুখের পানে চেয়ে আমি বললুম, "সরমা, অনেকদিন তোমাকে দেখি নি,—তুমি দেখতে কী সুন্দর হয়ে উঠেছ! তোমাকে আর সেই সরমা বলেই যে চেনা যায় না!"

সরমা কিছুই বললে না।

আমি আস্তেআস্তে তার মুখখানা নিজের মুখের কাছে টেনে আনলুম। সে কোন বাধা দিলে না—কিন্তু, তার চোখ! সে চোখদুটো যেন মড়ার চোখের মত, কৃত্রিম কাচের চোখের মত একেবারে স্থির, নিস্পন্দ। অমন বড়বড়, টানা, সুন্দর চোখের চাহনি যে এত কঠোর হোতে পারে, না-দেখলে তার ধারণা হয় না। মনের কথা মনেই চেপে, মুখ নামিয়ে আমি

তার মুখচুম্বন করলুম। মনে হোল, আমার এ চুম্বন যেন কোন পাথরের মুর্ত্তির শীতল কঠিন ওষ্ঠাধরের উপরে গিয়ে পড়ল... ...

খানিক পরে বললুম, "সরমা, ভাগ্যে আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি, নইলে তোমার কি হোত বল দেখি? তোমার সঙ্গে অন্য লোকের বিবাহ—"

আমার কথা শেষ না-হোতেই, হঠাৎ সরমার ভাবান্তর হোল! এতক্ষণ সে যেন জেগে-জেগে ঘুমোচ্ছিল—আমার কথায় তার সেই জড়তা ছুটে গেল। একবার আমার মুখের দিকে চেয়েই সে আমার মুঠোর ভিতর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিলে!

আমিও বাধা দেবার কোন চেষ্টা করলুম না—কারণ, আলিঙ্গন চুম্বন বা ভালবাসার দিকে এখন আমার একটুও নজর নেই! তবে যতটুকু না-হোলে নয়, ততটুকু করতে হবে বৈকি! নইলে চলবে কেন?

মেয়েমানুষের বুদ্ধির পরে আমার এক-রত্তি শ্রদ্ধা নেই। বাঙ্গালীর মেয়ে হচ্ছে পক্ষীর মত নির্ব্বোধ; ছুটো ধান-ছোলা ছড়ালেই পাখী সব ভুলে খাঁচার ভিতরেই সুখের গান সুরু করে' দেয়; ছুটো মন-রাখা মিষ্ট কথা বললেই রমণী তার সমস্ত নিজস্ব ভুলে অন্তপুরের অন্ধকারে বন্ধ থাকবে, তোমার পায়ের তলায় আপনাকে একেবারে বিলিয়ে দেবে! তুচ্ছ হার-তাগা-বালা পেলে তার মুখে হাসি আর ধরবে না;—সে একটিবারও তলিয়ে দেখবে না, এই গলার হার তার বগ্‌লোস্, এই চুড়ি-বালা তার হাতকড়ি, এই মল-পাঁয়জোর তার পায়ের বেড়ী! বাঙ্গালীর মেয়েরা এ যদি বুঝত, দেশে তাহলে এক নূতন বিদ্রোহ জেগে উঠত, ফ্রান্সের বাস্তিলের মত বাঙ্গলার অন্তপুরও ভূমিসাৎ হয়ে যেত!

সরমাও ত বাঙ্গালীর মেয়ে বৈ আর কিছু নয়! যতই সে লেখাপড়া শিখুক, টিয়াপাখীর মত যতই সে বুলি কপ্‌চাতে শিখুক,—আমি এ কথা কিছুতেই ভুলব না যে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে! আমার বুদ্ধির ভিতরে ঢোকে, তার এত সাধ্য নেই! এখন সে আমাকে ভাল-না-বাসুক্, কিন্তু ছুটো মিথ্যে খোসামোদে একটু পরেই সে আদরে গড়িয়ে আমাকে আত্মদান করতে বাধ্য হবে!

ভাল করে' গোড়া ফাঁদবার জন্যে আমি বেশ জোর দিয়ে-দিয়ে বললুম, "সরমা, বিদেশ থেকে ফিরে তোমাদের যে আমি কত খুঁজেছি, সে আর বলবার নয়! কাগজে তোমাদের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছি —কিন্তু তখন ত জানতুম না যে, তোমার পিতা আর ইহলোকে নেই! না-জানি তাঁর মনে আমি কত কষ্টই দিয়েছি,— ভেবেছিলুম, দেখা হোলে পায়ে ধরে তাঁর কাছে মাফ চাইব, কিন্তু ভগবান আমাকে সে সুযোগও দিলেন না।"—এই বলে আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলুম।

কিন্তু সরমা নিরুত্তর হয়েই রইল।

—"সরমা, তোমার কাছেও আমি ক্ষমা চাইছি, বুদ্ধির ভুলে তোমাকেও আমি অনেক ব্যথা দিয়েছি, সেজন্যে আজ আমি

অনুতপ্ত। তুমি আমাকে ক্ষমা করবে, সরমা ?"

কিন্তু সরমা নিরুত্তর হয়েই রইল!

খুব দুঃখের স্বরে আমি বললুম, "হয়ত আমি ক্ষমা চাইবারও অযোগ্য! তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি হয়ত তার মার্জ্জনা নেই! মানুষ বলে যদি কোনদিন পরিচয় দিতে পারি তবে সেইদিন আমার ক্ষমা চাইবার দিন আসবে।"—

সরমার দিকে চাইলুম,—আমার দুঃখের স্বর যে তার মর্ম্ম স্পর্শ করেছে, তার মুখ দেখে একেবারেই তা মনে হোল না।

ঘরের ভিতরে খানিকক্ষণ পাইচারি করতে লাগলুম। তারপর সরমার সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, "দেখ, কথায় কথায় ক্রমেই বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চিঠিতে আমি যা লিখেছিলুম, তোমার মনে আছে ত ?"

সরমা মুখ তুলে আমার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল।

—"এখানে ত আমি থাকতে পারব না, তোমাকে আমার বাসায় যেতে হবে।"

সরমা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল।"

—আমি ত অবাক! এত-অল্পে কাজ হাঁসিল! দেখলে, মেয়েমানুষের মন কি পল্‌কা—একটু চালাকি করে' দুটো মিষ্টি কথা বলেছি আর দেখতে-না-দেখতে কেল্লা ফতে! সরমা যে-রকম একগুঁয়ে, তাতে ও যে এত-শীঘ্র এখান থেকে নড়তে রাজি হবে, তা আমি ভাবি-নি। মনে-মনে নিজের বুদ্ধির বড়াই করে' প্রকাশ্যে বললুম, "কিন্তু যাই বললেই ত যাওয়া হয় না সরমা, জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে নিতে যথেষ্ট সময় লাগবে যে!"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, কেমন যেন শ্রান্তস্বরে সরমা বললে, "যা সঙ্গে যাবার সব গোছানো আছে।"

—"গোছানো আছে! কখন্ গোছালে ?"

—"তুমি আসবার আগেই!"

আমার মিষ্টকথায় সরমার মন ভোলে-নি,—সে তাহলে আমি আসবার আগে থাকতেই আমার সঙ্গে যাবে বলে প্রস্তুত হয়ে আছে! এ সত্যটা আমার গর্ব্বের পরে বড় কঠোর ঘা মারলে!

যতটা মনে করা গিয়েছিল, সরমা দেখছি ততটা সহজ মেয়ে নয়। একে খেলিয়ে হাত করতে হোলে আরো-বেশী সুতো ছাড়ার দরকার! আচ্ছা সরমা, তুমি যত-বড় সেয়ানা হওনা কেন, মনে রেখ আমি সেই পুরুষজাতিরই একজন—রমণীর যারা প্রভু, শাসনকর্ত্তা!

* * * *

শ্যামবাজারের বাসায় এসে সরমার ভাবগতিক দেখে, আমি ক্রমেই যেন বোকা বনে যাচ্ছি! প্রথমদিন এখানে এসেই সে আমার ঘরদোর এমন পরিষ্কার করে' গুছিয়ে ফেললে যে, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে একরকম কইত না বললেই চলে; কিন্তু ঠিক যে-সময়টিতে যা দরকার, সরমা হাতের কাছে সেটি এগিয়ে এনে দিচ্ছে! স্নান করে' উঠেই দেখি, আরসির কাছে রয়েছে কোঁচানো কাপড় জামা জুতো, চুল আঁচড়ে কাপড় পরতে-না-পরতে দেখি সরমা জলখাবারের

থালা আর পানের ডিবেটি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। জলযোগ করে' আমি বেরিয়ে যেতুম। তারপর যত বেলাতে যখনি বাড়ী ফিরতুম, দেখতুম গরম অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, যন্ত্রের মত সরমা কাজ করে' যেত—আপন মনে মৌনমুখে। এমন-কি, যখন কাজ-কর্ম্মের কোন দরকার নেই, তখনো সে যা-হোক একটা-কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকত!

কিন্তু, তবু সে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারলে না। ঐ যে তার নীরব ভাবহীন মুখ, ও-মুখকে আমি ঘৃণা করি। জানি, সে আমাকে ভালবাসে না—এমন-কি, কথাবার্ত্তায় মৌখিক ভালবাসাও সে আমাকে জানাতে পারত না,—ঐ কঠোর সরলতা আমার দু-চোখের বিষ।

আমিও যে তাকে কখনো ভালবাসতুম বা এখন ভালবাসি, তাও নয়। সত্য, সে অসীমা সুন্দরী; কিন্তু তার সৌন্দর্য্যকে আমি কামুকের মত ভোগ করতে চাই, প্রেমিকের মত গ্রহণ করতে চাই না। আইনত সে আমার স্ত্রী হোলেও, আমার আপনার নয়। পরপুরুষকে সে ভালবাসে—হয়ত পরে তাকে উপভোগও করেছে। আগে তাকে ভালবাসি-নি, এখন তাকে পাপিষ্ঠা বলে ঘৃণা করি।

ভালবাসব বলে তাকে ত আমার ঘরে আনি-নি! আমার চাই, টাকা! সরমার বাপ যে টাকা রেখে গেছে, সে টাকা যতদিন-না পাচ্ছি ততদিন আর আমার শান্তি নেই।

এখনো টাকার কথাটা তার কাছে তুলি-নি। সে যে কেমন মেয়ে, তা আমার জানতে বাকি নেই। আমি হচ্ছি পুরুষ, সরমার মত মেয়ের ধাত্ আমি বেশ বুঝি। আমি যে টাকার জন্যেই তাকে এনেছি—স্ত্রী বলে গ্রহণ করছি না, এটা ধরতে পারলে সে একেবারে বেঁকে দাঁড়াবে; একবার বেঁকলে তাকে তখন সোজা করা ভারি শক্ত হবে।

কিন্তু আর ত চুপচাপ থাকা আমার পোষাচ্ছে না। হাতে সামান্য যা টাকা ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এল—এখন সরমার টাকা হস্তগত করতে না পারলে, বিপদে পড়তে হবে। কেমন করে', কি সূত্রে বেশ সহজভাবে সরমার কাছে টাকার কথাটা পাড়া যায়, এ-ক'-দিন এই নিয়েই ক্রমাগত ফন্দি আঁটা যাচ্ছে।

সেদিন সরমা ঘরের এককোণে বসে পাণ সাজছিল। আমার তখন পাণের কোন দরকার ছিল না, তবু তার কাছে গিয়ে বললুম,—"সরমা, দুটো পাণ দাও ত।"

সরমা দুটো পাণ তাড়াতাড়ি মুড়ে আমার হাতে দিলে।

আমি বললুম, "আচ্ছা সরমা, তোমাদের ও-বাসায় যে জিনিষগুলো পড়ে আছে, সেগুলো আনার কি হবে বল দেখি? অনেকদিন হয়ে গেল, পরের বাড়ী, খালি করে দিতে হবে ত?"

সরমা মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।"

—"তোমার বাবা ত ঐ বাড়ীতে মারা যান?"

—"হুঁ।"

—"তাঁর বয়স হয়েছিল কত ?"

—"ষাট্।"

—"তোমাদের দেশের বাড়ীতে এখন কে আছে ?"

—"কেউ নেই।"

—"তোমাদের জমি-জমাও ছিল শুনেছি, তার খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা আছে ত ?"

—"না।"

—"না! কি মুস্কিল, এতদিন আমাকে বল-নি কেন? শুনেছি, তোমাদের নগদ টাকাও কিছু ছিল—"

—"হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে আছে।"—সরমা হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা ব্যঙ্গের ভাব! সে কি আমার মনের কথা ধরে ফেলেছে? আরে রামঃ! মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি হোলে আর ভাবনা কি ছিল!—যাক্, আজকে আর বেশী ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। পাখী এখনো ভাল করে' পোষ মানে-নি, ভয় পেলে এখনো শিক্‌লি কেটে উড়ে যেতে পারে।

কিন্তু, মনটা কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সরমার বাপ কত টাকা রেখে গেছে, ওদের স্থাপর সম্পত্তি কত আছে, এ সব জানবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। যদিও আমি স্বামী সে স্ত্রী, আমি পুরুষ সে নারী,—তার উপরে আমার জোর আছে ষোলআনা, তবু কেন জানিনা, এ-সব কথা তাকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে আমার বাধো-বাধো বোধ হচ্ছে!... ... ভেবে-চিন্তে মনেমনে একটা মতলোব খাটানো গেল।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে রইলুম—ঘুমলুম না!

রাত যখন অনেক—আস্তে-আস্তে উঠলুম। টেবিলের উপরে নীলরঙের ডোমের ভিতরে আলোর মৃদু শিখাটা ঘুমন্তের মত স্থির হয়ে আছে। সেই আলোতে দেখলুম, সরমা ঘুমিয়ে পড়েছে—তার চোখের পাতা বন্ধ।

খুব সন্তর্পণে সরমার গায়ে হাত দিলুম, সে নড়ল না। তখন সাবধানে তার আঁচল থেকে রিংটি খুলে নিলুম।

টেবিলের পাশেই সরমার একটি 'ষ্টিল ট্রাঙ্ক' রয়েছে—সরমার ক্যাশবাক্স-টাক্স ওরই ভিতরে থাকে। মুরারিবাবুর কাগজপত্র নিশ্চয় ঐখানেই আছে। সেগুলোর উপরে একবার চোখ-বুলিয়ে নিলেই সব বুঝতে পারব।

নিঃশব্দে চাবি লাগিয়ে ট্রাঙ্কটি খুলে ফেললুম। তারপর ক্যাশবাক্সটি ভিতর থেকে বার করলুম।

ক্যাশবাক্সে চাবি লাগাতে যাচ্ছি—এমন সময় পিছন থেকে শুনলুম, "দাঁড়াও, ও বাক্স খুলো না!"

কে যেন একচাঁই বরফ পুরে আমার বুকের ভিতরের রক্তটা হঠাৎ জমাট্ করে' দিলে! সেই অবস্থায়—হাঁটুর উপরে ক্যাশবাক্স নিয়ে, বিবর্ণ মুখে আমি চোরের চেয়েও নীচু হয়ে বসে রইলুম।

সরমা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। তার পর—আমার লজ্জাকে যেন আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্যেই—আলোর শিখাটা উস্কে দিলে। আমি মাথা হেঁট করলুম।

খুব শান্ত স্বরে সরমা বললে, "বাক্সটা দাও, তুমি যা চাও আমি বার করে দিচ্ছি।"

—ক্যাসবাক্সটা আমার কাছ থেকে নিয়ে সরমা সেটি খুলে ফেললে। তারপর একতাড়া কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

শুষ্ক স্বরে আমি বললুম,—"এ-সব কি?"

ক্যাশবাক্সটা বন্ধ করে' সরমা বললে,—"তুমি যা খুঁজছিলে। ওতে বাবার উইল, কোম্পানীর কাগজ আর ব্যাঙ্কের খাতা আছে। তোমার টাকার দরকার হয়েছিল, আমাকে বললেই পারতে ত!"

সরমার কাছে এই আমার দ্বিতীয় পরাজয়! উঃ, এ কী অপমান! আচ্ছা, আমারও দিন আসবে!

* * * *

অনেকদিন পরে আবার মদ ধরলুম! জানতুম মাতালকে সরমা অত্যন্ত ঘৃণা করে। তার ভয়েই এতদিন মদ ছুঁই-নি—নইলে, একবার যে ভক্তিভরে সুরাদেবীর পূজা করেছে, দেবীর প্রসাদ থেকে সে কি আর-কখনো বঞ্চিত থাকতে পারে? তাই দেবীর পূজা আবার ষোড়শোপচারে চলেছে—সরমাকে আর ভয় কি? যে-জন্যে তাকে ভয় করতুম, তার সেই টাকা এখন আমার হাতে—আমারই হাতে! সরমা যদি এখন রাগ করে—করুক, চলে যায়—যাক্, আমাকে এখন আর পায় কে?... ...

সেদিন বাইরের ঘরে বসে মদের রঙ্গে সন্ধ্যাবেলাটি গোলাপী করে' তুলছি,—এমনসময় একটি লোক এসে ঘরে ঢুকল। গেলাসটি হাত থেকে নামিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতেই তাকে চিনলুম। সে হরেন, সরমাকে নিয়ে আসবার দিনে, যে আমার সঙ্গে গোলমাল করেছিল।

তাকে দেখেই আমার মেজাজ চটে গেল। বিরক্তস্বরে বললুম, "আবার এখানে কি মনে করে?"

হরেন একবার আমার মুখের দিকে, আর-একবার বোতলের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করে' বললে, "মাভৈঃ সুরেনবাবু, মাভৈঃ! চঞ্চল হবেন না, আজ আমি শ্বেতপতাকা বহন করে এখানে এসেছি।"

—"তার মানে?"

"আমি আপনার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে এসেছি।"

—"কিন্তু আমি তাতে রাজি নই! আপনার সেদিনকার ব্যবহারটা স্মরণ করে দেখুন। আমি অপমান ভুলি না।"

—"আপনার স্মৃতিশক্তি যে এতটা প্রখর তা জানতুম না। আর, আমি যে আপনাকে অপমান করেছিলুম, তাও ত মনে হচ্ছে না।"

—"আপনার না মনে হোতে পারে, কিন্তু আমার বেশ মনে হচ্ছে, সেদিন আপনি যে ব্যভারটা করেছিলেন তাকে কিছুতেই খাতির বলে মনে করা চলে না। অতএব—"

—"অতএব, ঐ মদের গেলাসটির ভিতরে আপনার ক্ষুব্ধ মনটিকে আর-একটিবার সিক্ত করে নিন দেখি, দেখবেন মনের সব

ময়লা একদম্ সাফ্ হয়ে যাবে"—এই বলে হরেন হাসতে-হাসতে মদের গেলাসটি আমার মুখের সামনে তুলে ধরলে।

হরেন দেখছি আমার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়। তার মত্‌লোব্ কি? মদের গেলাসে চুমুক্ মেরে মুখে খানিকটা কাঁকড়ার ডিমের বড়া ফেলে দিলুম। তারপর বললুম, "এখন আপনার অভিপ্রায় কি স্পষ্ট করে বলুন ত! বেশী গৌরচন্দ্রিকা আমি পছন্দ করি না।"

হরেন বললে, "হ্যাঁ, এই বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় গৌরচন্দ্রিকার প্রথাটা বড্ড-সেকেলে হয়ে গেছে বটে! ও জিনিষটা এখন অনেকেই পছন্দ করেন না।"

—"কেননা, গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে দুষ্ট মত্‌লোব্‌কে শিষ্ট করে তোলবার একটি বিশিষ্ট উপায়।"

—"আপনার কথা আমার বেশ মিষ্ট লাগছে, মশাই!"

—"কিন্তু আপনাকে আমার বেশ মিষ্ট লাগছে না—বুঝেছেন?"

—"আপনার দেখছি সরল বাঙ্গলা ভাষায় কথা কওয়া অভ্যাস; এর-মধ্যে আর্ট খুব কম বটে, কিন্তু ধার এত বেশী যে সহজেই চর্ম্ম ফুঁড়ে মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে।"

কি আপদ! এ লোকটা যে কিছুই গায়ে মাখে না! তাইত, কি করতে এখানে এসেছে এ?

হরেন তার হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকতে-ঠুকতে আবার বললে, "কিন্তু এও ত জানেন সুরেনবাবু, যে একালে সভ্যতায় বেশী-সরল হওয়ার মানে, বেশী-অসভ্য হওয়া!"

আমিও তাকে ঠেস্ দিয়ে বললুম, "হরেনবাবু, এটাও আপনার জানা উচিত ছিল যে, আমার এ ঘরটি কোম্পানীর বাগান নয়, এখানে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ—এ বৈঠকখানা।"

—"বৈঠকখানা না-বলে সরাবখানা বললেই বোধকরি সঙ্গত হয়।"

আমি তেরিয়া হয়ে বললুম, "আপনি কি বাড়ী বয়ে আমাকে আবার অপমান করতে এসেছেন?"

হরেন আমার রুক্ষস্বরের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলে না, অন্যমনস্কের মত হাতের ছড়িটা ঘোরাতে-ঘোরাতে সম্পূর্ণ অবহেলাভরে বললে, "আজ্ঞে না, আমি এসেছি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করতে।"

—"তাহলে আপনি যত-শীঘ্র পারেন প্রস্থান করলেই ভাল হয়।"

—"অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ, আপনাকে আমি আমার শ্যালক-পদে অভিষিক্ত করতে সম্মত নই। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে না।"

হরেনের কপালের উপরে একটা শিরা ফুলে উঠল। বুঝলুম, সে এবার চটেছে। কিন্তু, মনের রাগ মনেই চেপে সে উচ্চস্বরে হাস্য করে' বললে, "সুরেনবাবু, ভগ্নীপতি বলেই আপনার কথাকে আমি ঠাট্টাচ্ছলে গ্রহণ করলুম, নইলে মুখের ওপরে আমাকে অপমান করে কেউ-কখনো পার পায় নি। যাক্, যেজন্যে আমি এসেছি আপনাকেই খুলে বলি। সরমা কেমন আছে?"

—"ভালই আছে।"

—"আর-এক কথা। আপনি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে অনুগ্রহ করে জেনে আসুন, মোহনের ভাড়া-বাড়ীতে যে-সব জিনিষ-পত্তর রয়েছে, সেগুলোর কি ব্যবস্থা হবে?"

—"বসুন, এ কথার উত্তর আমি এখনি এসে দিচ্ছি।"—এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর ভিতরে যেতেই দেখলুম, উঠানের উপরে সরমা চুপ-করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, আমাদের কথাবার্ত্তা সে সমস্তই শুনেছে!

বিরক্ত হয়ে বললুম, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?"

সে কথার কোন জবাব না-দিয়ে সরমা বললে, "হরেনদাদাকে এখানে নিয়ে এস।"

ক্রুদ্ধস্বরে বললুম, "না।"

সরমা কাতরভাবে বললে, "উনি আমাদের কত উপকার করেছেন, তা তুমি জান না। দেখা না করে ফিরিয়ে দিলে তিনি কি ভাববেন বল দেখি! যাও, যাও, নিয়ে এস!"

বৈঠকখানা থেকে হরেন নিশ্চয়ই আমাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পাচ্ছে! অত্যন্ত চটে গিয়ে চাপা গলায় বললুম, "চল, ঘরের ভিতরে চল।"

সরমা মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি হরেনদাদাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না—তোমার পায়ে পড়ি!"

রাগ আমার মাথায় চড়ে গেল! "কী! আমার কথা শুনবে না?"—এই বলে সরমাকে আমি বাড়ীর ভিতরদিকে জোর করে' ঠেলে দিলুম।

হঠাৎ ঠেলা পেয়ে সরমা তাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল। এবং সঙ্গেসঙ্গে "উহু"—বলে আর্ত্তনাদ করে' উঠল।

—তারপর, কোথা দিয়ে কী যে হোল কিছুই বুঝলুম না—শুধু এইটুকু মনে আছে, পিছন থেকে কে-একজন বাঘের মত আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং লোহার মত শক্ত দুখানা হাত দিয়ে আমাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—একটা চীৎকার করে' আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম!

পঁচিশ

সরমার কথা

ওগো আমার ভগবান, আমার এই ক্ষুদ্র নারীজীবন নিয়ে তুমি কি নিষ্ঠুর খেলা খেলতে চাও, বলে দাও আমাকে, বলে দাও বলে দাও! অদৃষ্টের সঙ্গে আমার এই লুকোচুরি আরো-কতদিন যে চলবে, কে আমাকে চোখের ঠুলি খুলে তা দেখিয়ে দেবে?

কঠোর চাপে ক্রমেক্রমে নিষ্পেষিত করে' নিঃশেষিত-রস ইক্ষুদণ্ডকে যেমন ফেলে দেওয়া হয়, আমার এ জীবনকেও তেমনি নীরস করে' কে আজ সংসারের ধুলিধূসর পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে;—দুদিন-আগেকার সোনার স্বপন আমার মনে আজ দূর-অতীতের স্মৃতির মত নাগালের বাইরে সরে গেছে।... ...

বিধবার স্বামী ফিরে এসেছে! রূপ-

কথায় যা সম্ভব হয় না, আমার অদৃষ্টে আজ তাই সম্ভব হয়েছে! এ কী সৌভাগ্য! তোমরা বলবে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুপুণ্যের জোরেই আমার ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু এমন সৌভাগ্যের দিনেও আমাকে কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে, বোধকরি দুর্জ্জয় ক্রোধে স্বর্গে তেত্রিশ কোটির সিংহাসন টলে উঠবে এবং মর্ত্তে সামাজিক মানুষগুলি মনুসংহিতা খুলে আমার প্রতি অনন্ত নরক-ব্যবস্থা করতে বসবেন। হায়, তবু ত এ পোড়া চোখের জল কিছুতেই মানা মানছে না—থামতে চাইছে না!

স্বামীকে কখনো ভালবাসতে পারি-নি, কখনো পারব বলেও মনে হচ্ছে না। আগে তাঁকে যমের মত ভয় করতুম, এখন কিন্তু সে ভয় আর নেই। তাঁর ভালবাসায় আদরেই যে আমার ভয় ভেঙ্গেছে, তাও নয়; কেননা আমি জানি তিনিও আমাকে ভালবাসেন না।.. ... ডুবে মরবে বলে যে-জলকে লোকে ভয় করে, মানুষের এমন দিনও আসে যেদিন সে সাঁতার না-জেনেও নির্ভয় হয়ে সেই জলেরই অতলে তলিয়ে যায়! আমারও এখন তাই হয়েছে! যিনি আগে আমার কাছে মূর্ত্তিমান বিভীষিকার মত ছিলেন, নিঃশেষে আজ তাঁরই হাতে আত্মসমর্পনকে আমি আত্মহত্যা বলেই মনে করি। মরণকে যে ডরায় না—তার আবার ভয়!

স্বামী আমাকে মুখে খুব আদর-যত্ন করেন। আমাকে বোধহয় তিনি এখনো বিয়ের কনে বলে ভাবেন, তাই মৌখিক প্রেমে আমার চোখে ধূলো দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অরণ্যের যে সামান্য জীবজন্তু, ব্যাধের কপট আদর তারাও যে ধরে ফেলে! নকল প্রেম কি চেপে রাখা যায়? স্বামী যে কি চান, তাঁর চোখ যে কি খুঁজছে, আমি তা জানি গো জানি!

তারপর, সেদিন রাত্রে আমি ঘুমেয়েছি ভেবে তিনি যখন চোরের মত আমার বাক্স খুলতে গিয়েছিলেন, তখন আমার সকল সন্দেহই ঘুচে গেল। মুখে প্রেমের অভিনয়ে আমার ঘৃণা ধরে গিয়েছিল—সে কপট অভিনয়ের উপরে একেবারে যবনিকা ফেলে দেবার জন্যে,—স্বামী আমার যা চান, সেই-দিন তখনি তা বাক্স থেকে বার করে' দিলুম। টাকায় আমার দরকার নেই, টাকা নিয়ে তাঁর যা-খুসি করুন-গে।...... সুধু তিনি আমাকে একটু শান্তি দিন, শান্তি!

* * * *

সেদিন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই বাইরের ঘরে চেনা গলার স্বর শুনলুম। সেই সপ্রতিভ ভাবে জোরে-জোরে কথা, সেই উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি—এ হরেন-দাদার গলা! এ স্বর যে একবার শুনেছে সে আর-কখনো ভুলতে পারবে না।

এতদিন পরে হরেনদাদা আমাকে মনে করেছেন! আনন্দের আবেগে আবার আগেকার মতই ছুটে তাঁকে ডাকতে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ নিজের অবস্থা মনে পড়াতে আপনাকে সামলে নিলুম।

তারপরেই শুনলুম, স্বামী ক্রুদ্ধস্বরে বলছেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।"

তার খানিক পরেই স্বামী ভিতরে এলেন। আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমি হরেনদাদাকে ডেকে আনতে বললুম। তিনি রেগে উঠলেন। আমি আবার তাঁকে মিনতি করে' হরেনদাদাকে আনতে বললুম। স্বামী অত্যন্ত চটে উঠে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ঠেলা দিলেন,—আমি পা-পিছলে পড়ে গেলুম।

পড়ে উঠতে-না-উঠতে দেখি, হরেনদাদা ঝড়ের মত ছুটে এসে স্বামীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—তাঁকে মাটি থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি বাধা দেবার অবসরটুকুও পেলুম না!

তারপর আমার কাছে এসে হরেনদাদা বললেন,"আমি বাইরের ঘর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলুম—রাস্কেল কিনা তোমার গায়ে হাত দেয়! সরমা, তোমার কি বড্ড লেগেছে?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "হরেনদাদা, তুমি এ কি করলে? ছিঃ!"

—"কেন, অন্যায়টা কি করেছি?"

—"অন্যায় কর-নি? আমাদের ভিতরে এসে এমন করে দাঁড়ানোটা তোমার ভাল হয়-নি!"

হরেনদাদা তখন বোধহয় বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই ব্যবহারের জন্যে আমাকেই পরে ভুগতে হবে। রাগে তিনি ফুলছিলেন, কিন্তু আমার কথায় তাঁর দেহ দেখতে দেখতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল; মাথা হেঁট করে' অনুতপ্ত স্বরে তিনি বললেন, "আমাকে মাফ কর সরমা, রাগের মুখে অতটা বুঝতে পারি-নি!"

আমি বললুম, "যাক্, যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই—তুমি এখন যাও—উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

আমি স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে লাগলুম।… …

একটু পরে মুখ তুলে দেখি, হরেনদাদা তখনো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন,—আর, আর, তাঁর চোখদুটি অশ্রুজলে ছাপিয়ে উঠেছে!

প্রাণের আবেগ প্রাণেই চেপে বললুম, "যাও, যাও,—উনি যেন উঠে আর তোমাকে দেখতে না পান।"

হরেনদাদার মুখ দেখে বুঝলুম, যেতে তাঁর কোনমতেই পা উঠছে না—তবু, জোর-করে' পা টেনে তিনি দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন। অস্ফুট কাতর স্বরে বললেন, "তুই ভাল থাক্ বোন, সুখে থাক্—আর কিছু আমি চাইনা!"

একটা কথা মনে পড়ল। হরেনদাদার স্নেহ-ভালবাসায় আমারও চোখে জল আসছিল, কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করে' তাড়াতাড়ি বললুম,—"হরেনদাদা, দাঁড়াও।"

—"কি সরমা?"

আমি বললুম, "দেখ, তুমি এখানে এসেছিলে, আর কারুকে বোলো না!"

* * * *

সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর থেকে, আমার প্রতি স্বামীর ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। আমার টাকাগুলি যেদিন থেকে তাঁর হস্তগত হয়, সেইদিন থেকেই তিনি আর-একরকমের মানুষ হয়ে গিয়ে-

ছিলেন; আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আর বড় কইতেন না, সর্ব্বদা মদ খেতেন, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে অনেক রাত বাইরে-বাইরেই কাটাতেন। আমি তাঁর স্বভাব জানতুম—তাই এ-সবের জন্যে আগে-থাকতেই প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু সেদিনকার ঘটনার পর থেকে আমার উপরে তিনি রীতিমত অত্যাচার সুরু করলেন। আমার স্বভাব-চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে', যখন-তখন এমন-সব কথা বলতে লাগলেন—যে-সব কথা পাগলের মুখে শুনলেও ধৈর্য্য রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু সব যন্ত্রণা সয়ে, মনের বিদ্রোহিতা প্রাণপণে দমন করে' আমি মৌন হয়ে থাকতুম—তা-ছাড়া আর আমার উপায় কি? আমার বাপ নেই, মা নেই, দাঁড়াবার ঠাঁই নেই,—পৃথিবীতে আমি কোথা যাব, কোথায়?

এমনি ভাবে আমার দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। মন দিয়ে স্বামীর সেবা না করতে পারলেও, দেহ দিয়ে যতটা পারা যায়, আমি তার ক্রুটি করতুম না;—কিন্তু আমার এ প্রাণপণ কর্ত্তব্য-পালনও স্বামীকে কিছুমাত্র নরম করতে পারলে না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ আর-এক অঘটন ঘটল।

পাড়ায় পাড়ায় শঙ্খের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে সেদিনকার সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ অতীত হয়ে গিয়েছে। হাতে কোন কাজ ছিল না, ঘরের এককোণে বসে আপন-মনে নানান কথা ভাবছিলুম।

এমনসময়ে চারিদিকে সাড়া তুলে আমার স্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ ও কাপড়-চোপড় দেখেই বুঝলুম, নেশার মাত্রাটা আজ অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে।

স্বামী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে স্তিমিত চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর হঠাৎ বিশ্রী স্বরে একটা অট্টহাস্য করে' বললেন, "আজ এখানে কে এসেছিল জানিস?"

আমি জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে তাকালুম।

—"হুঁ, এসেছিল বেটা বাঘের ঘরে! দূর করে' তাড়িয়ে দিয়েছি!"

আমি মৃদুস্বরে বললুম, "কার কথা বলছ?"

—"কার কথা আবার! মোহন—মোহন—যে বেটা পরের বৌকে বিয়ে করতে চায়!"

আমার বুকের মাঝখানে কে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরলে। পাছে মুখের ভাব স্বামীর চোখে পড়ে সেই ভয়ে তখনি আমি ঘাড় হেঁট করলুম।

স্বামী বললেন, "হুঁ, বুঝেছি। তুইই চিঠি লিখে সে বেটাকে আসতে বলেছিস্!"

এ মিথ্যে, মিথ্যে! ভগবান জানেন, মোহনবাবুকে ভোলবার জন্যে দিনরাত আমি কী চেষ্টা করছি!

স্বামী আবার কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "আমার বাড়ীতে বসে এ-সব চলবে না!

এই-সেদিন চিঠি লিখে তুই একটা গুণ্ডাকে আনিয়েছিলি—আমার বাড়ীতে ঢুকে সে আমাকেই মেরে গেল—তারপর, আজ আবার এই ব্যাপার! বড় চালাকি পেয়েছিস্, না?"

আমি দু-হাতে মাটি আঁকড়ে চুপ হয়ে রইলুম।

—"কথা ক'! বল্, এমন কাজ আর-কখনো করবি?"

আমি তখনো কথা কইলুম না।

স্বামী আমার দিকে আরো-এগিয়ে এসে বললেন, "জবাব দে বল্‌ছি—নৈলে এই বোতলের বাড়ি মাথা গুঁড়ো করে দেব!"

এতদিন খালি বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করছিলুম—আজ থেকে আবার প্রহারের ভয় দেখানো হচ্ছে! আর চুপ করে' থাকতে পারলুম না—চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "কী, তুমি আমাকে মারবে?"

মদের বোতলটা নিয়ে আস্ফালন করতে-করতে স্বামী চেঁচিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ, মারব—মারব! বল্, তুই চিঠি লিখেছিস্ কিনা?"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘৃণাভরে বললুম, "না!"

"মিথ্যেকথা!"

—"মিথ্যেকথা বল তোমরা—যারা কাপুরুষ, যারা স্ত্রীর গায়ে অকারণে হাত তুলতে লজ্জিত হয় না—যারা টাকার লোভে বিবাহের ছলে রমণীর সর্ব্বনাশ করে—যারা রমণীকে কুকুর-বিড়াল বলে মনে করে!"—অনেকদিনের ঘৃণা আর রাগ আজ আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল!

স্বামী আমার কথা শুনে প্রথমটা থতমত খেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলেন; তার-পরে "কী, মুখের ওপরে আমাকে অপমান!" বলে চীৎকার করে' মদের বোতলটা উঁচিয়ে আমার উপরে লাফিয়ে পড়লেন! দু-চারবার মারতেই, বোতলটা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল—তিনি তখন লাথি মেরে গলা ধরে আমাকে ঘর থেকে বার করে' দিলেন—আমিও সেইখানে আচ্ছন্নের মত বসে পড়লুম—মাথা ফেটে রক্তের ধারায় আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেল,—আমার চেতনাও ধীরেধীরে লুপ্ত হয়ে এল।

কতক্ষণ পরে জানিনা,—যখন জ্ঞান হোল, মনে হোল আমার গায়ে কে-যেন হুড়্‌হুড়্ করে' জল ঢেলে দিচ্ছে!

অত্যন্ত যন্ত্রণায় আস্তে আস্তে উঠে বসে দেখি—আকাশ মেঘে-মেঘে মেঘময়, ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতরে থেকে-থেকে বিদ্যুতের চক্‌মকি ও বাজের হুড়োহুড়িতে চোক-কান যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে' অবিশ্রাম বৃষ্টি-ধারা এসে আমার আহত দেহের উপরে গড়িয়ে পড়ছে,—যেন জাগ্রৎ দেবতার করুণাভরা স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত!

আমার গায়ে বোধহয় বোতলভাঙ্গা কাঁচ বিঁধে ছিল—কারণ, যেমন উঠে দাঁড়াতে গেলুম সর্ব্বাঙ্গে এমনি যাতনা হোল যে, আর্ত্তনাদ না-করে' থাকতে পারলুম না—

সঙ্গেসঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে আমার ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, আমার নারী-জীবনের একমাত্র আশ্রয়, আমার পূজনীয় স্বামী-দেবতা বিকৃত জড়িত স্বরে চীৎকার করে' উঠলেন, "তুই এখনো যাস্-নি! বেরো—বেরো, দূর হ'!"

ওগো আমার পাষাণাধিক পাষাণ দেবতা, তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলুম!

…… বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়া বিশ্বভেদী হাহাকার করছিল; সেই দিশেহারা বাধাহারা ঝড়ের রুদ্রতালে আমারও পাগল হৃদয় আজ যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

উচ্চশ্রেণী ভারতবাসীর সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ

এক্ষণে, উচ্চশ্রেণী ভারতবাসীদের সহিত ইংরেজদের কিরূপ সম্বন্ধ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

* *
*

ব্রাহ্মণ। অবশ্য, ম্লেচ্ছদিগের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষত উচ্চবর্ণ্য ব্রাহ্মণ-দিগের প্রগাঢ় অবজ্ঞা; তাহারা কাছে আসিলে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে কলুষিত মনে করে। কিন্তু এই বৈদেশিকদের আধিপত্য হইতেই তাহাদের প্রভুত্ব প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। রাজাদের দরবারে তাহাদের প্রভাব মাঝামাঝি রকমের। এখন তাহা-দের যেরূপ স্বাধীনতা এরূপ স্বাধীনতা তাহারা কস্মিনকালেও ভোগ করে নাই। কি মোহোন্তের মনোনয়নে, কি মঠ-মন্দিরাদিসংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কার্য্যপরি-চালনে এখন আর সরকার হস্তক্ষেপ করেন না। এই প্রভূত ধন-সম্পত্তি, মন্দিরাদির সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার, ট্রষ্টিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ট্রষ্টিরা অন্ধভাবে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়াই চলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় মতামতের বহুল প্রচার হইয়া, অনেকগুলি হিন্দুকে হয়তো স্বধর্ম্ম হইতে দূরে লইয়া যাইবে, ভক্তদিগের ভক্তি ও দানশীলতা কমাইয়া দিবে। কিন্তু আজিকার দিনে, নব-হিন্দুদিগের দল-সংখ্যা খুবই কম। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ—না বনিয়াদী উচ্চবংশীয়, না ধন-শালী। অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে ভিক্ষা দান করিয়া শাস্ত্রীয় নিয়ম-লঙ্ঘনের অপরাধ হইতে অব্যাহতি পায়। অতএব, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণদিগের আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই।

উচ্চবর্ণ্য ব্রাহ্মণ ও ইংরেজ—ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ নাই।

ইংরেজরা যেমন এই সকল ধর্ম্মান্ধদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে, ব্রাহ্মণেরাও তেমনি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট কাপড় দূরে নিক্ষেপ করে; ইংরেজরা ঘরের চৌকাঠ মাড়াইলেই গোবর-জলের ছিটা দিয়া উহারা গৃহশুদ্ধি করে।

* *
*

ব্রাহ্মণদিগের বিপরীতে, রাজপুত, মারাঠা, হিন্দুস্থানী, পারসীক, তুর্ক, কি মোগল-বংশীয়—হিন্দু ও মুসলমান রাজারা, আমীর-ওমরাওরা, সম্রাটকে স্বকীয় অধিপতিরূপে সম্মান করে; উহারা ইংরেজদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করে এবং ইংরেজপ্রদত্ত সম্মানলাভে তৃপ্তি লাভ করে। ইংরেজরা ব্রাহ্মণকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বেনিয়া ও ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত সরকারী কর্ম্মচারীকে অবজ্ঞা করে; কিন্তু আশৈশব nobilityকে মান্য করিতে অভ্যস্ত থাকায়, ভারতীয় আমীর-ওমরাওদিগের সহিত উহারা সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করে না। গর্ব্বিত পাঠান বা রাজপুত অশ্বারোহী তাহাদের জাঁকালো পরিচ্ছদ, তাহাদের সুন্দর অস্ত্রশস্ত্র, তাহাদের প্রাচ্য অনুচরবৃন্দ—এই সমস্ত ইংরেজের মনে রোম্যান্টিক স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। কোন বিশেষ উৎসব-দিনে Westminister প্রাসাদে ইংলণ্ডাধিপতি যে সকল অনুচর-বর্গে পরিবৃত থাকেন, তন্মধ্যে হিন্দুরাজাদিগকে দেখিয়া তিনি প্রীত হন; ভারত-বর্ষে "সহস্র-এক-রজনী"সদৃশ রাজদরবারের আড়ম্বরে ভাইস্-রয়ও পরমতৃপ্তিলাভ করেন। ইংরেজ-দোকানদার—যে কখন "লর্ডের" সম্মুখীন হয় নাই,—সে গর্ব্বিতভাবে ভারতীয় রাজার সহিত "সমানে-সমান-" ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে।

তাছাড়া, কোম্পানীর ঐতিহ্য-ধারা, সিপাহি-বিদ্রোহের স্মৃতি, রুসিয়ার দৃষ্টান্ত—এই সমস্ত ইংরেজের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া দিয়াছে যে, রাজা ও আমীর-ওমরাওদিগের সহিত নৃপতির অনুরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক। কোন রাজা কোন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, নিশান উঠানো হয়, তোপ-ধ্বনি করা হয়; অল্প-কিছু সরকারের হিতসাধন করিলেই উপাধি ও অলঙ্কারে তাহাকে বিভূষিত করা হয়। (১)

ভাইস্-রয়ের দরবারে এই নীতি-কৌশলটি যেরূপ বুঝিতে পারা যায় এমন আর কিছুতে নয়। বহুমূল্য জাঁকালো তাঁবুর ছাউনী, ইংরেজ ও ভারতীয় ফৌজ, দেশীয় রাজাদিগের অশ্বসৈনিকদল, মুখে 'লড়াকা' ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এইরূপ রাজপুত, আদব-কায়দা-দুরস্ত মুসলমান, রত্নালঙ্কার-সমাচ্ছন্ন রাজবৃন্দ। হাতী, উট, আরবী ঘোড়া, রজ্জু-বদ্ধ চিতা। সৈনিক, অশ্বারোহী

(১) India List এ (P.171.) তোপ-সেলামীর তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। সম্রাটের ১০১ তোপ; ভাইস্-রয়ের ৩১; নিজাম, বরোদা ও মহিশূরের ২১; ভূপাল, গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, কাশ্মীর, কলট, কোল্হাপুর, উদয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, ১৯; অধিকাংশ রাজাদিগের ১১ কিংবা ৯এর বেশী নয়।

অনুচর, রাজপক্ষীরক্ষক, ভৃত্যাদি। বাঁকা-সিংওয়ালা সাদা গরুযোজিত শকটের সারি। জনতা :—সাদা কাপড়-পরা পুরুষ; ঝক্‌ঝকে রঙের পরিচ্ছদ-পরা রমণী; রমণীদের কণ্ঠ, পদ, বাহু অলঙ্কারে সমাচ্ছন্ন; নগ্ন বা নগ্নপ্রায় শিশুবৃন্দ;—এই সমস্ত, সোনালী ধূলারাশির মধ্যে অগ্নিময় সূর্য্যের কিরণে দীপ্যমান; পশুদের চীৎকার, মানুষের কোলাহল, স্ত্রীলোকদের উচ্চৈস্বরে কথোপকথন, অস্ত্র-শস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, কামানের আওয়াজ। (২)

মোগল সম্রাটদিগের ঐতিহ্য-ধারা ইংরেজরা বজায় রাখিয়াছেন। প্রাচ্যখণ্ডের জাঁক-জমক ইংরেজদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছে। অবশ্য এটা একটু বেশীমাত্রা; কেননা, আমীর-ওমরাওরা—মধ্য-এসিয়ার রীতিনীতির প্রভাবের প্রতিনিধিস্বরূপ, সামন্ততন্ত্র ও বহুপুরাকালের যুদ্ধ-যুগের নিদর্শনস্বরূপ; সমস্তই অতীতকালের, বর্ত্তমান কালে, উহারা তেমন কিছুই নহে, এবং ভবিষ্যতে উহারা একেবারেই নগণ্য হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিনগণনার আদিতত্ত্ব

সূর্য্যোদয় হইতেই দিন আরম্ভ হয় ও রাত্রিশেষে দিনের অবসান হয় এই ধারণাটী আমাদের এমনই সহজ সংস্কারে পরিণত হইয়া গিয়াছে যে দিনের গণনা অন্য কোন-রূপ হইতে পারে তাহা শুনিলে সহজে আমাদের বিশ্বাস হওয়ার কথা নহে। কিন্তু পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিলে বর্ত্তমান গণনার পরিবর্ত্তে প্রথমে অন্যরূপ গণনা থাকারই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সেমিটিক জাতির মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে না হইয়া সূর্য্যাস্ত হইতেই দিন-গণনার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। ব্যাবিলনীয়দিগের এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে অপেক্ষাকৃত অল্পপূর্ণতাযুক্ত বস্তু হইতেই অধিক পূর্ণতা-যুক্ত বস্তুর বিকাশ হয়। এই নিয়মে চন্দ্র হইতেই সূর্য্যের বিকাশ হয়। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রের উদয় হয়। এই প্রকারে সন্ধ্যা চন্দ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া দিনের আদি হইয়াছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি ও তৎপর দিবা হয়, তাহাতে দিবা রাত্রিরই সন্তান হইয়া পড়ে। সুতরাং সন্ধ্যাই দিবসের আদি মাতা হয়। নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে আমাদের বক্তব্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে;—

"It is worthy of note that, in con-

---

(২) ১৯০২-০৩এর দরবারে, শোভাযাত্রার সারি এইরূপ গঠিত হয়:—অশ্বারোহী সৈন্য, অশ্ব-যোজিত তোপের গাড়ী, সোনালী পাড়-দেওয়া লাল কাপড়-পরা ১২জন তূরীবাদক, নকিবের দল, গোলাপী ও সোণালী রংএর উর্দ্দিপরা দেহ-রক্ষিবৃন্দ, নীল ও সোনালী পাড়-দেওয়া সাদা লম্বা-কোর্ত্তা-পরা cadet সৈন্য। জরির কাজ-করা প্রকাণ্ড রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত হাতীর উপর ভাইস্-রয়

sequence of the Babylonian idea of evolution in the creation of the world, less perfect beings brought forth those which were more perfect, and the sun was therefore the offspring of Nannara or Sin, the moon. In accordance with the same idea, the day, with the Semites, began with the evening, the time when the moon became visible, and thus becomes the offspring of the night." The Religion of Babylonia and Assyria (Religions Ancient and Modern Series). by Theophilus G. Pinches p 66.

উল্লিখিত যুক্তির কোন সারবত্তা থাকুক আর নাই থাকুক চন্দ্র ও রাত্রির সহিত যে আদিতে কালবিভাগের যোগ ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। চন্দ্রের এক নাম 'মাস্'—এই নামানুসারেই ত্রিংশদ্দিনাত্মক কালের নাম "মাস" হইয়াছে। ইংরেজী মাস-বাচক month শব্দও চন্দ্রবাচক moon শব্দ-জাত বলিয়াই আভিধানিকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের দুই পক্ষের দ্বারাই মাসার্দ্ধকাল 'পক্ষ' বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরেজী পক্ষবাচক "Fortnight" শব্দের সহিত রাত্রির স্পষ্ট যোগই বিদ্যমান রহিয়াছে। "Fortnight" শব্দ চতুর্দ্দশ রাত্রি অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষার্দ্ধবাচক কালের ইংরেজীতে যে 'sevennight' শব্দ পাওয়া যায়, তাহাতেও আমরা রাত্রিরই সম্বন্ধ দেখিতে পাই। কেবল তাহাই নহে, তিথিরূপ কালবিভাগের সহিতও চন্দ্র-গতিরই সম্বন্ধ। প্রতি তিথির স্থিতিকাল ষাইট দণ্ড। এই ষাইট দণ্ড প্রত্যেক দিনেরও মান। এই তিথিকে চান্দ্রদিন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে *। জ্যোতিষের সাবন গণনা এই তিথিমান অনুসারেই হয়। এই সাবন গণনায় ত্রিশ দিনে মাস এবং ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। "মাসমান" শব্দে বৎসর বুঝায়। ইহাও চন্দ্রের দ্বারা বৎসর গণিত হওয়ার অন্যতর প্রমাণ। চন্দ্র দুই পক্ষের পনর তিথি করিয়া ত্রিশ তিথিতে একবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। তাহাতেই প্রত্যেক তিথি এক এক দিনের সমান বলিয়া ত্রিশ দিনে এক সাবন মাস হয়।

"সাবন" শব্দ 'সবন' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'সবন' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'। যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হইত বলিয়াই তিথির গণনা 'সাবন' নামে অভিহিত হইয়াছে †। বস্তুতঃ কেবল যজ্ঞে নহে, সমস্ত বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডেই আমরা কেবল তিথিরই উল্লেখ দেখিতে পাই। চন্দ্র এই প্রকারে একদিকে তিথির নিয়ামক হইয়া যেমন "তিথিপ্রণী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনই অপরদিকে ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়ামক হইয়া "দ্বিজরাজ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেমিটিক জাতির মধ্যে সূর্য্যাস্ত হইতে দিন গণনার রীতি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে উল্লেখ পাইয়াছি বাইবেলেই আমরা তাহার মূল দেখিতে পাই। বাইবেলের সৃষ্টি অধ্যায়ে প্রথম সৃষ্টি-বর্ণনায়ই সায়ং-

* "তিথিনৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমানে প্রকীর্ত্তিতঃ"।

† বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনোমতঃ"॥

কালই যে দিনের আদি তাহার স্পষ্ট আভাস আমরা প্রাপ্ত হই। যথা—

"And God called the light Day, and the Darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day." Genesis. Chap. I. 5.

"পরমেশ্বর আলোককে 'দিবা' বলিলেন ও অন্ধকারকে 'রাত্রি' বলিলেন, এবং সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া প্রথম দিবস হইল।"

কেবল সৃষ্টির প্রথম দিনই যে সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া হইল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, পরবর্ত্তী দিন সকলও সায়ং ও প্রাতঃ লইয়া হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

সায়ংকাল দিনের আদি বলিয়া উল্লিখিত হওয়ার কারণ বাইবেলের সৃষ্টি বর্ণনার প্রারম্ভেই পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দিন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যে রাত্রিই বিদ্যমান ছিল তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। অভিধানে 'eve' ও 'evening' শব্দের 'পূর্ব্বরাত্রি' ও 'পূর্ব্ববর্ত্তী কাল' এই উভয়ার্থই স্বীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাইবেলের evening শব্দ বিশেষভাবে রাত্রির বাচক বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি এবং সায়ং বা রাত্রিই যে দিনের পূর্ব্বাংশ তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের বেদেও সৃষ্টির প্রথমে সমস্ত তমোব্যাপ্ত থাকারই বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহাতেও রাত্রিই যে দিনের আদি তাহা সপ্রমাণ হয়। বেদে 'নক্তোষিস্' যে একত্র স্তত হইয়াছে তাহা এক পূর্ণ দিনের বোধক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। *কারণ বেদের 'নক্তোষিস' বাইবেলের 'evening and morning'*এর সম্পূর্ণ অনুরূপ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত 'নক্তন্দিবং' শব্দে রাত্রি ও দিবাযোগে একদিন হওয়ার কথা যেন বিশেষরূপেই পরিস্ফুট। 'নক্তং' ও দিবা শব্দদ্বয়ের যোগে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়া 'নক্তন্দিবম্' এই একচনান্ত পদ সিদ্ধ হওয়ায় উভয়ের যোগে একটী পূর্ণদিন গঠিত হওয়ার প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে। এখানেও আমরা রাত্রিকেই পূর্ব্বে পাইতেছি।

জ্যোতিষশাস্ত্রে উষাযাত্রার যে বিধান পাওয়া যায়—তাহাতে পূর্ব্বদিনের উষা পরদিনেই ধরিতে হয়। যথা—

"মঙ্গলের উষা বুধে পায়
যথা ইচ্ছা তথা যায়।"

ইহা হইতেও উষা যে দিবসের আদিভাগ না হইয়া শেষ ভাগ তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মধ্যরাত্রির পর হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিনের মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত দিন গণনার বিধান দৃষ্ট হয়। ইহাতেও রাত্রিতেই দিনের আরম্ভ হইয়া পড়ে। ঘটিকানুসারে ইংরেজী দিন গণনায়ও আমরা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগণনার সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাগুক্ত পর্য্যালোচনা হইতে রাত্রি হইতেই যে দিন গণনা প্রথম আরম্ভ হয় তাহা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে দিবা হইতেও দিন গণনা সম্বন্ধে কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

রাত্রির বিশ্রাম ও জড়তার পর উষাতেই আমরা নবজীবনের সজীবতা অনুভব করি ও নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। সুতরাং উষা যে নূতন কালের প্রবর্ত্তিকারূপে বিবেচিত হইবে—তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। উষা সূর্য্যের অগ্রগামিনী। সূর্য্য দিবাকে উৎপন্ন করেন, তাহাতে তিনি "দিবাকর"। উষাতে এই দিবালোকের প্রথম স্ফুরণ হয় বলিয়া উষা দিবসের মুখস্বরূপ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। অমরকোষে তাহাতেই উষার 'অহর্মুখ' নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—"প্রত্যুষোঽহর্মুখং কল্যমুষঃ প্রত্যুষসী অপি।"

বৈদিক সময়ের আদিতে আর্য্যগণ সুমেরু ও উত্তর-কুরুতে যখন বাস করিতেন তখন উষা দীর্ঘব্যাপিনী হওয়ায় উষার প্রভাবই তাঁহারা অধিক অনুভব করিতেন—তাহাতেই বেদে উষার যেরূপ বর্ণনা ও স্তুতি পাওয়া যায়, সূর্য্যসম্বন্ধে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, আর্য্যগণ ক্রমে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেই সূর্য্যের অধিক প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সূর্য্যকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়া দিনের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন এবং এই প্রকারেই সূর্য্য 'দিনকর' নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু এইরূপে সূর্য্যকে "দিনকর" আখ্যা প্রদান করিলেও রাত্রিই যে দিনের আদি এই তত্ত্বটী আর্য্যগণ তখনও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাহাতেই বেদে সূর্য্য রাত্রির সহিত দিবাকে প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

"বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্‌জন্মানি সূর্য্য।"

ঋগ্বেদমণ্ডল, ৫০ সূক্ত।

"(সেই আলোক দ্বারা) রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যালোক ভ্রমণ কর।"—রমেশবাবুর অনুবাদ।

এই প্রকারে সূর্য্যপ্রাধান্যের সহিত কালমান প্রবর্ত্তিত হইয়াই সূর্য্যোদয়ের সহিত দিনগণনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই সৌরমানেও বেদের উষাকেই দিনমুখরূপে পরিগণিত দেখা যায়। তবে প্রভেদ এই যে, যেস্থলে চান্দ্রমানে উষা দিনশেষরূপে পরিগণিতা তৎস্থলে সৌরমানে উষা দিনাদিরূপে পরিণতা। এই উষা বিপরিণামের প্রকৃত রহস্য উষা শব্দের অভিধানেই যেন নিহিত রহিয়াছে। উষার একটী পর্য্যায় শব্দ আমরা অভিধানে "কল্য" পাইয়াছি। এই কল্য শব্দটীর 'গতদিন'ও 'আগামী দিন' এই দুইটী অর্থও স্বীকৃত দেখা যায়। এই অর্থদ্বয়ের দ্বারা দিন সম্বন্ধে উষার আদি ও অন্তরূপে গণনার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যাইতে পারে। উষাবাচক 'কল্য' শব্দের 'গতদিন' অর্থ ধরিলে 'উষা' দিনান্তরূপে পরিণত হয় আর 'আগামী দিন' অর্থ ধরিলে 'উষা' দিনাদিরূপে পরিণত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উল্লিখিত দুই অর্থে 'কল্য' শব্দটী কোন অভিধানেই সংস্কৃত শব্দমধ্যে পরিগণিত দেখা যায় না। এক প্রকৃতিবাদ অভিধানেই সংস্কৃত শব্দরূপে ইহার পূর্ব্বোক্ত দুই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের কথিত

ভাষায় ইহার 'কাল্' বা 'কালি' এই প্রকার রূপই দেখা যায়। বাঙ্গালা রচনায় ইহা পূর্ব্বোক্ত দুই অর্থেই সংস্কৃত বিশেষণ যোগে সাধু শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—'গতকল্য' 'আগামী কল্য'। ইহা হইতে মূলে যে ইহা সংস্কৃত শব্দ, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে প্রতীয়মান হয়। উষার দিনারম্ভ রূপে পরিণত হওয়ার যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে প্রদান করিয়াছি, ইংরেজী ভাষায় আমরা তাহার অতি চমৎকার সমর্থনই প্রাপ্ত হইতে পারি। উষাবাচক ইংরেজী যে 'morning' শব্দ আমরা বাইবেলের সৃষ্টিবর্ণনায় প্রাপ্ত হইয়াছি সেই 'morning' শব্দের সহিত ইংরেজীও আগামী দিনের বাচক 'morrow' শব্দকে আমরা একই প্রকৃতিমূলক দেখিতে পাই ‡। ইহা হইতে পূর্ব্ব গণনায় যাহা উষান্তরূপে আগামী দিন ছিল—তাহাই যে উষাদিরূপে বর্ত্তমান দিনে পরিণত হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারে উষাযোগে দিন আরম্ভ হওয়াতেই উষার একনাম ইংরেজীতে দিবারই এক প্রাকৃতিক 'dawn' হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিবেদন

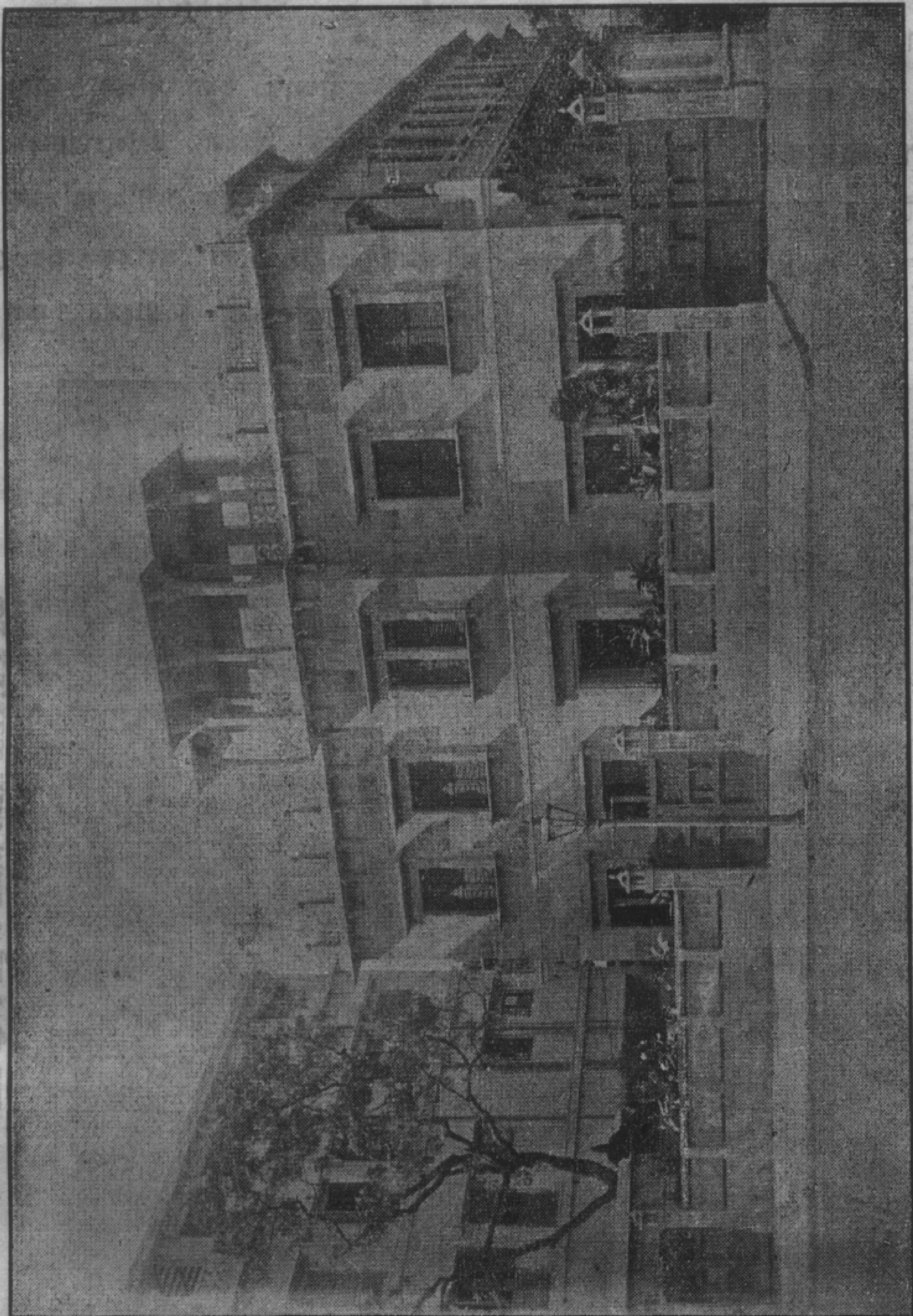
বাইশ বৎর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষে ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই-সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা

---

‡ উষাবাচক morn শব্দ যে আগামী-কল্যবাচক To-morrow অর্থে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে Chambers's Twenteieth Century Dictionaryতে এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি: "The morn (Scot.) to-morrow, The morn's morning, tomorrow morning."



বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই, যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল,

তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

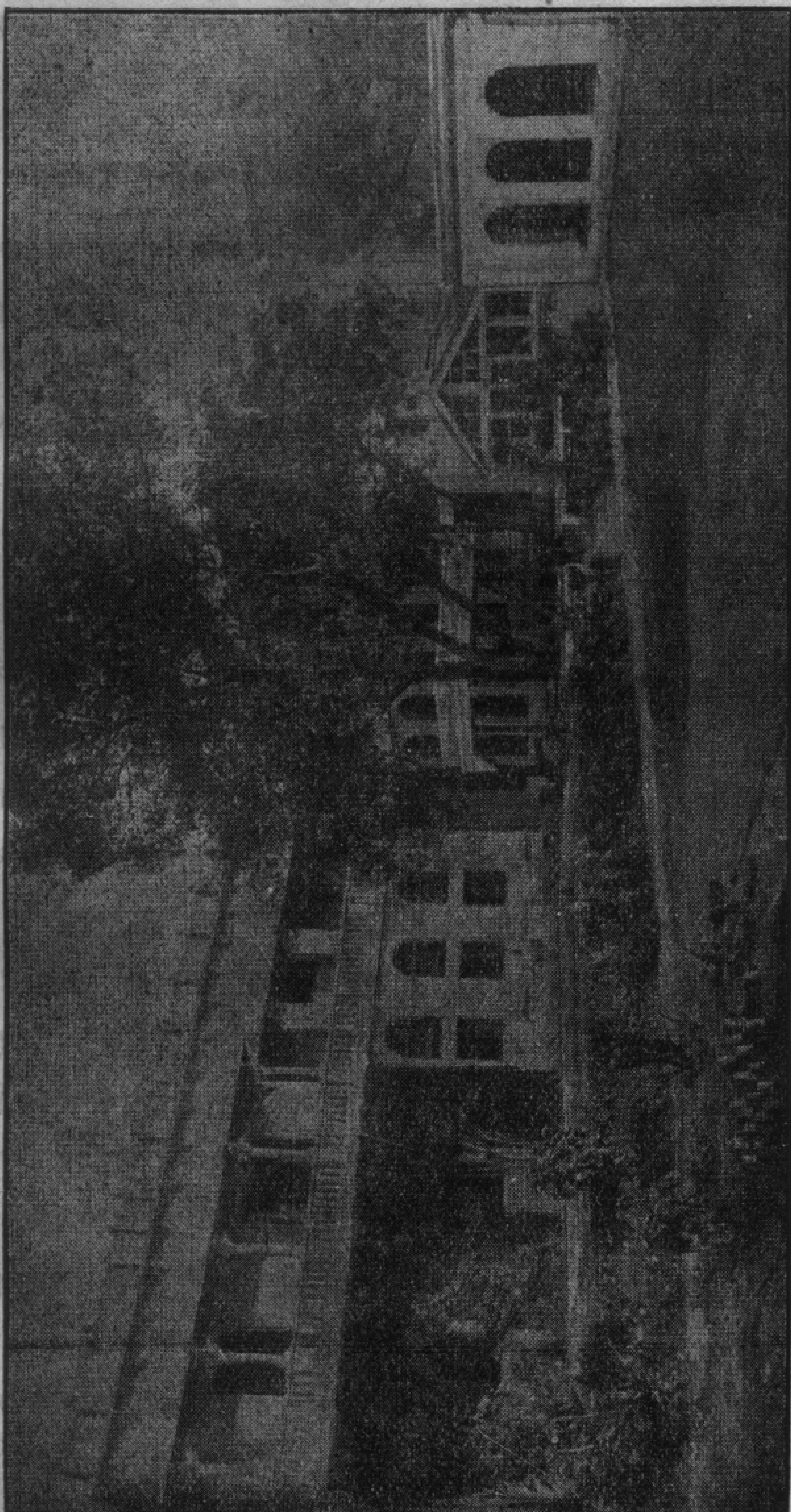
পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা



বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগানের মধ্যে বট ও অশথ গাছে অবলম্বিত মঞ্চ
শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে।

বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্যসম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা, ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর।



বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পশ্চাতের বাগান।
বাগানের মধ্যে যে দুটি বড় গাছ একটি মঞ্চ অবলম্বন করিয়া আছে দেখা যাইতেছে তাহা অন্যত্র হইতে ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া তুলিয়া আনিয়া ঐস্থানে লাগানো হয়।

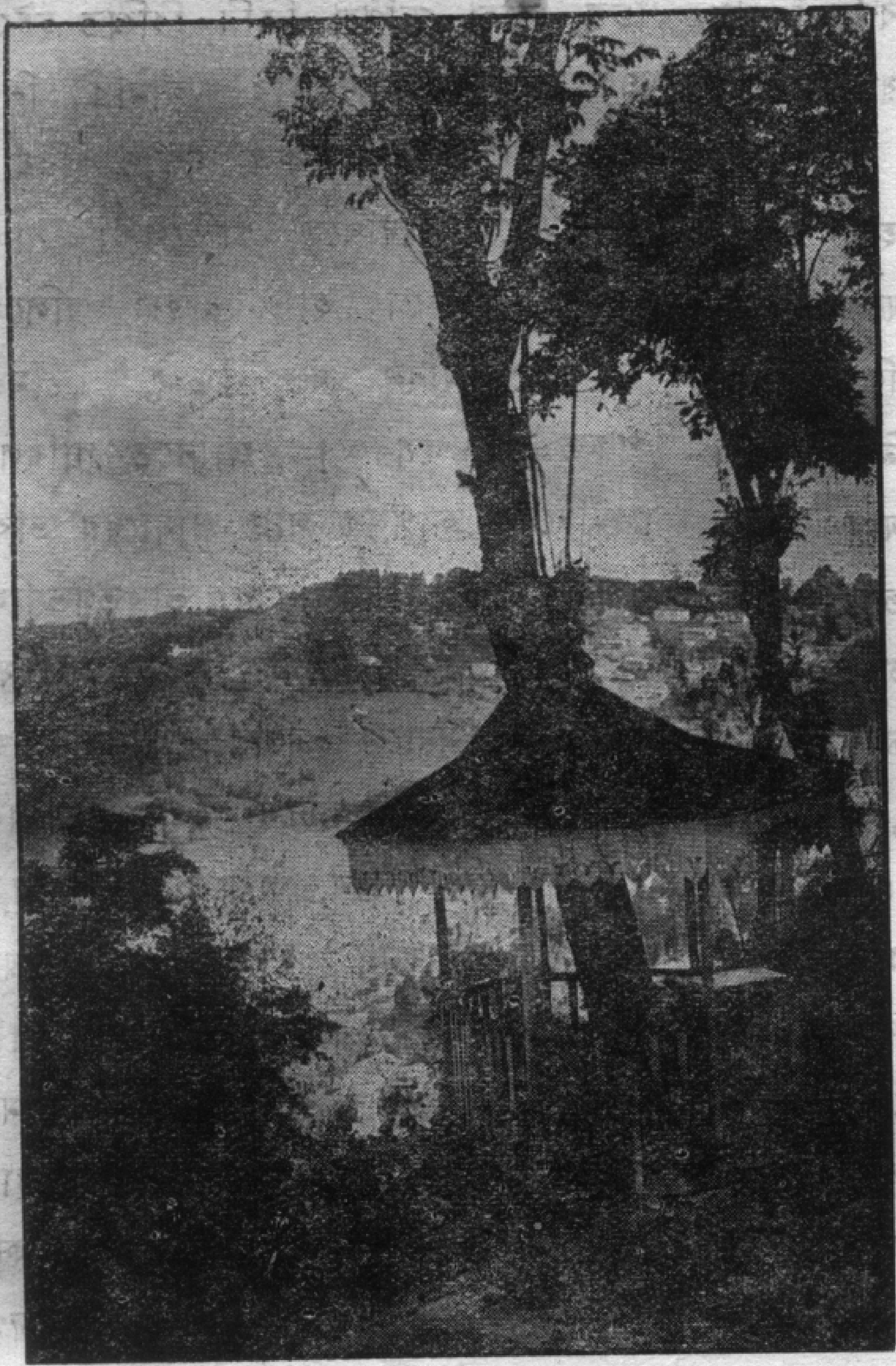
তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যর উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল! সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহুদেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই-সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ

কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্তকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মাণীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এ-দেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমান-কালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম, যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই-সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে।



আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দিরের ধ্যান-বিতান।

সেইদিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত-কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়া-লিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চির-দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত-মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয়গণ্ডী ত্যাগ করিয়া

জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার অবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল এক-দিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই-সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

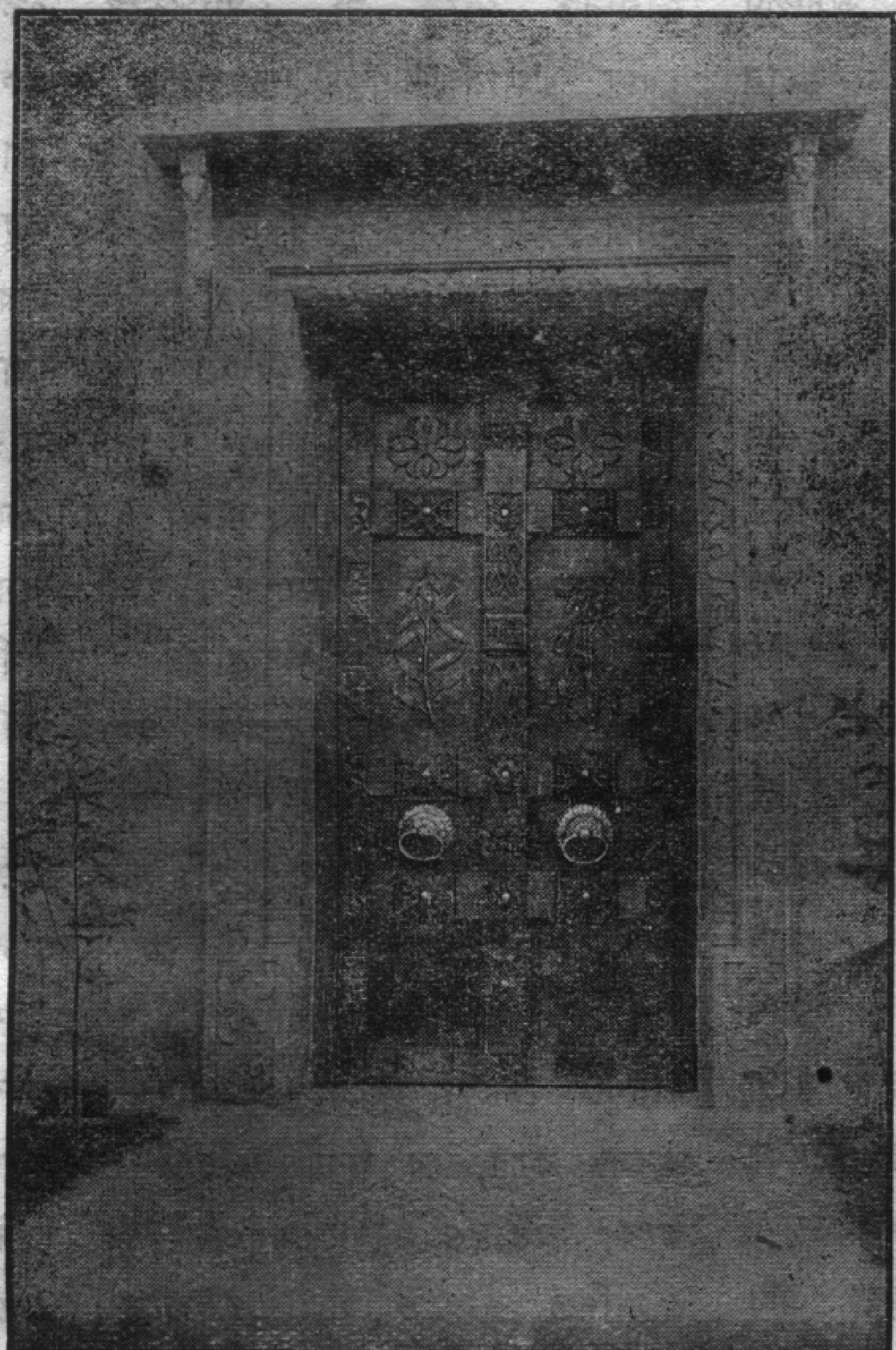
পৃথিবী-পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচবৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইতে-ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে-সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই-সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেইদিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারত-সচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারতগভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালি-ফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃষ্টে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের

দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরিভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়-শিষ্য অর্জ্জুনের।



বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, যে, এ-সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে-স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে,

যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে, তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণমাণ বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাণ জীবনের বেদনা-চাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষ উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ-দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়-স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষ-শরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই-সকল কথা কল্পনা-প্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা



আচার্য্য বসুর দার্জ্জিলিঙের গবেষণা-মন্দির।

তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন-কি, মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানে বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিস্তার

উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে-সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতিবিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান-বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ-কথা বিজ্ঞজনমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর-একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই-একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে-আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্ব-প্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছু-দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম! গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান-অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেই-জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ-স্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে-সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই-সকল নূতন সত্য এ-স্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত

পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেণ্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থ-লাভের উপায় নহে।

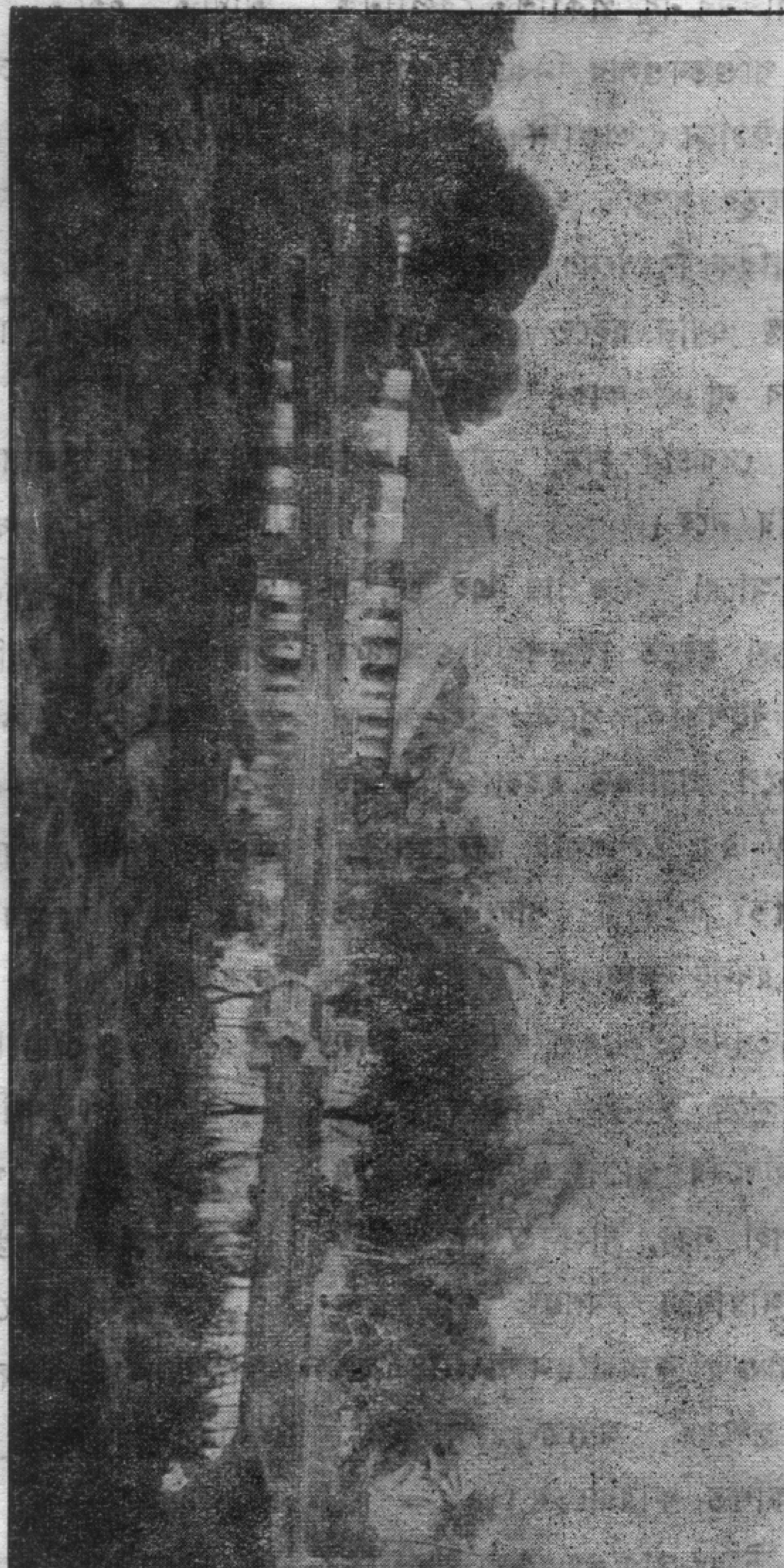
আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন আঘাতেরই ক্রিয়া যে

আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি-মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে-মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা; চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্ত-নাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুষ্ণীম্ভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে! তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই-সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া



আচার্য্য বসুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী নিজবাটিকার গবেষণা-মন্দির।

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণ পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও

পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখ-মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতের দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে। *

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

ফিরে-ফিরৃতি

পুজোর বাজারের মরসুম তখন শেষ হয়ে গেছে। কালীচরণ তার কাটা-কাপড়ের দোকানে এক ছোট্ট তক্তাপোষের উপরে বসে হিসেবের খাতা দেখছিল, এমন সময় তার ছেলে রমেশ এসে হাজির হ'ল। রমেশ দোকানের দিকে বড়-একটা ঘেঁসত না। আজ তাকে দোকানে আস্‌তে দেখে কালীচরণের মন ভারি খুসি হয়ে উঠল। এবার পুজোর বাজারে তার রীতিমত মুনফা দাঁড়িয়েছিল, তারই হিসেব দেখতে-দেখতে তার মন আনন্দে ফুলে উঠছিল; তার পর ছেলেকে

---

* বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এস-সি, সি-আই-ই, সি-এস-আই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির দেশ-জননীকে নিবেদন উপলক্ষ্যে পঠিত। এই প্রবন্ধের ব্লকগুলির জন্য আমরা "প্রবাসী"র নিকট ঋণী।

আজ দোকানে ঢুকতে দেখে সে-আনন্দের বাঁধ যেন ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি হিসেবের খাতা সরিয়ে, হাত-বাড়িয়ে বলে উঠল—"এস বাবা, এস!"

কালীচরণ বসেছিল দোকান-ঘরের পিছনে এক ছোট্ট অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে। চারিদিকে কেবল সরু-মোটা লম্বা-বেঁটে নানারকম খাতার বস্তা; বসবার তক্তাপোষের উপরেও খাতার ডাঁই। তাতে এই ঘরের বাতাস এবং অন্ধকার জমাট ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল।

এই অন্ধকার কুটুরীর ভিতর প্রবেশ করতে রমেশের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠত। সেই জন্যে সে পারতপক্ষে ঐখানে ঢুকতে চাইত না। বাপ কখনো ডাকলে সে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা শুনে পালাত। আজও সে সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কালীচরণ ব্যস্ত হয়ে বল্লে—"এস, ভিতরে এস।"

অগত্যা রমেশকে ভিতরে প্রবেশ করতে হল।

কালীচরণ বল্লে—"দাঁড়িয়ে কেন? বস।"

তারপর সামনের খাতাগুলোকে একটু ঠেলেঠুলে জায়গা করে রমেশকে বসতে দিলে।

কালীচরণ চোখের চশমা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে বলতে লাগল—"দেখ রমেশ, আজ ক'দিন থেকে ভাবছি তোমায় একটা কথা বলব। আমি ত বুড়ো হলুম—এইবার তীর্থধর্ম্মে মন দি—কি বল?"

রমেশ ঘাড়হেঁট করে বসেছিল, বাপের প্রশ্ন থেমে যেতেই একবার মুখতুলে চাইলে, কিন্তু কোনো কথা তার মুখে জোগালো না।

বাপ বলতে লাগল—"তুমি এখন বড় হয়েছ, বুদ্ধিমান হয়েছ, নিজে সব বুঝে-নিয়ে এইবার আমায় রেহাই দাও। কি বল?"

রমেশ শুধু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চাইতে লাগল;—মুখে একটি কথাও ফুটল না।

কালীচরণ একটুখানি চুপ করে থেকেই আবার বলতে লাগল—"এর আর ভাবনা কিসের! বাপ ত আর চিরদিন থাকে না!"

রমেশের চোখ-মুখ কেমন ছম্‌ছমে হয়ে উঠল।

কালীচরণ তার পিঠের উপর হাত রেখে বলতে লাগল—"কোনো ভয় নেই তোমার—আমি খাতাপত্র সমস্ত পরিষ্কার করে রেখেছি। এখন কলের মতো সব চলছে। দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে তুমি দোকান চালাতে পারবে।"

রমেশ তবুও মুখবুজে বসে রইল। কালীচরণ উৎসাহের ঝোঁকে ছেলের পিঠ-থাব্‌ড়ে বলে উঠল—"নাও, নাও, আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। এই খাতা-গুলো দেখতে আরম্ভ কর—এর থেকেই সব বুঝতে পারবে! যদি কোথাও খট্‌কা বাধে ঐ আমাদের বাগচীমশায় আছেন—ও বড় বিশ্বাসী লোক—ও তোমার সব ঠিক করে দেবে।"—বলেই কালীচরণ নিজের জায়গা ছেড়ে-উঠে রমেশকে ধরে সেইখানে বসিয়ে দিলে।

রমেশ মন্ত্রচালিতের মতো সেই খাতার বস্তার মধ্যে গিয়ে বসল। কালীচরণ খান-কতক খাতা টেনে বার করে বল্লে—"নাও এইগুলো দেখ।"

রমেশ ধীরে ধীরে একখানা খাতা তুলে নিয়ে দেখতে সুরু কল্লে। খাতার ভিতরকার জড়ানো-পাকানো অক্ষরগুলো তার চোখে ঠেকেই বেধে গেল,—মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। রমেশ কতকটা ভয়, কতকটা বিস্ময়ের সঙ্গে ঘরের চারিদিকটা চোখতুলে দেখতে লাগল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—এ যেন কোন্-এক অদ্ভুত রাজ্যে সে এসে পড়েছে! এখানকার আলো বাতাস—এখানকার ভাষা পর্য্যন্ত যেন কেমন অদ্ভুত। তার মনে হচ্ছিল তাকে এখানে দেখে এখানকার আসবাবপত্রগুলো যেন একটা কৌতূহলে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে মনের মধ্যে কেমন-একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কালীচরণ এতক্ষণ তার ছেলের দিকে কেবলই চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ বলে উঠল—"ওগুলো হচ্ছে হাল-সনের খাতা। কি-করে একটু-একটু করে গায়ের রক্ত দিয়ে এই ব্যবসাকে জমিয়ে তুলেছি তা যদি দেখতে চাও তবে ঐ ওখানকার খাতাগুলো অবসর-মতো পেড়ে দেখো।"—বলে সে কড়িকাঠের কাছে একটা উঁচু তাক দেখিয়ে দিলে। সেখানটা ঘোর অন্ধকার। রমেশের মনে হ'ল সেখানে কালিঝুলি-মাখা কারা যেন সব বসে আছে! কালীচরণ আঙুল দেখাতেই তারা সবাই যেন ঘাড়-তুলে নীচের দিকে চাইতে লাগল!

কালীচরণ বল্লে—"দেখ বাবা, আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। এতদিন ধরে —তা আজ মনে হচ্ছে—সার্থক হল।...ওকি অমন-করে চুপ-করে বসে আছ কেন? তোমার জিনিষ তুমি দখল কর—প্রভুত্ব কর।"—বলেই কালীচরণ তার পাকানো চাদরখানি গলায় ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(২)

তখনো সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি ছিল। আজ বিশবৎসরের মধ্যে কালীচরণ একদিনও এত সকাল-সকাল দোকান থেকে বেরুতে পায়নি। ভোরবেলা নাকে-মুখে দুটি গুঁজে সে ঐখানটিতে এসে বসত, আর রাত্রি যখন গভীর তখন বাড়ি ফিরে যেত। এমনি করে বিশ বছর তার কেটে গেছে। ঐ অন্ধকার ঘুলঘুলির বাইরেকার বাতাস-আলো কোথা দিয়ে কখন্ বয়ে গেছে তা টেরও পায়-নি। আজ এতদিন পরে বিকেলের আলোয় বেরিয়ে পড়ে তার মনটা ছাড়া-পাওয়া কয়েদীর মতো একটা প্রকাণ্ড হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। বাতাস এবং আলোর স্পর্শ একটা নতুন জিনিষ পাওয়ার মতন মনে হতে লাগল। অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে বসে একটি-একটি করে বছরের হিসাব করে সে যে নিজেকে বার্দ্ধক্যের কোঠায় এনে ফেলেছিল আজ হঠাৎ শরতের হাওয়া লেগে মনে হ'ল সে ভুল! ঐ অন্ধকারের মধ্যে সে যে-কয়েকটা বছর কাটিয়েছে সে যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন। আজ সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সে যে-যৌবন সম্বল নিয়ে ঐ ব্যবসায়ের কারাগারে প্রবেশ করেছিল

ঐ কারাগারের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, আজ তাকে পেয়ে আবার অভ্যর্থনা করে নিলে। তার এতটা স্ফূর্ত্তি হতে লাগল যে সে প্রায়-দৌড়ে দোকান-পল্লীর ঘিঞ্জি সীমানা কাটিয়ে একেবারে খোলা মাঠের মধ্যে গিয়ে হাজির হল। তার মনে হতে লাগল ঐ শরতের হাওয়ার মতোই তার হৃদয়টা আজ হাল্কা, ফুর্‌ফুরে! সে মাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ ঘুরতে লাগল। তারপর বাড়ি ফেরবার সময় বৌবাজারের মোড় থেকে এক-গাদা ফুল কিনে নিলে। এই তার সৌখীনতার প্রথম অপব্যয়; কিন্তু আজ সেটাকে তার অপব্যয় বলে মনেই হল না।

(৩)

বাপ চলে গেলে রমেশ আরো খানিক-ক্ষণ হতভম্বের মতন বসে রইল। তার পর হঠাৎ মনে হ'ল—তাইত এখনো সে এখানে বসে কেন? সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল;—এই তার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সময়। সে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই মনে হ'ল দোকান ছেড়ে ত তার যাবার যো নেই। সে আবার চুপ-করে বসল। কি করবে ঠিক না পেয়ে একখানা খাতা টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। কিন্তু তাতে মন বসল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কোনোরকমে যদি সে ফাঁক পায় ত ছুটে পালায়! সে জানত বাপ আর আসবে না তবুও একবার সে বাগচীমশায়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ হে! বাবা কখন আসবেন?"

বাগচীমশায় বল্লে—"তিনি বলে গেছেন আর আসবেন না। আপনিই এখন দোকানের মালিক।"

আমিই দোকানের মালিক!—আমিই দোকানী!—এই কথা মনে হওয়া মাত্র রমেশের সমস্ত শরীর শির্‌-শির্‌ করে উঠল। এই দোকানী-নামের উপর ছেলেবেলা থেকে তার একটা আন্তরিক লজ্জা ছিল। ছেলেবেলায় স্কুলের মধ্যে অমুক উকিলের ছেলে, অমুক ডাক্তারের ছেলে ইত্যাদি পরিচয়ের সঙ্গে সে নিজে দোকানীর ছেলে এই পরিচয় প্রকাশ করতে সে ভিতর থেকে কেমন-একটা কুণ্ঠা বোধ করত। সেইজন্য এই প্রসঙ্গ থেকে সে বরাবর পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত। তার পর বড় হয়েও তার এ দুর্ব্বলতা ঘোচেনি। সেই জন্য দোকানের ত্রিসীমানায় আসতে তার লজ্জা হ'ত। তার মনে হ'ত যদি কোনো রকমে তার বাপের নাম-ওয়ালা দোকানের ঐ সাইন্‌-বোর্ডখানা বদলে যায় ত সে বাঁচে!

রমেশ মনে-মনে অনেক আশা রেখে-ছিল। দোকানের ঐ লজ্জা তাকে যতই পীড়িত করত ততই সজোরে ঐ ভবিষ্যতের আশাগুলোকে সে আঁকড়ে ধরত। এই সবেমাত্র সে বি-এ পাশ করেছে—এখনো এম-এ, এখনো ল বাকি। তারপর?—তার পর কত কি! মানসম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, লোকের শ্রদ্ধা, যশ—এ সবই ত পড়ে রয়েছে। যখনি কোনো প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতা শুনেছে তখনই মনে হয়েছে এমনিতর বক্তা হতে হবে। যখনি কোনো বিখ্যাত কবির কবিতা পাঠ

করেছে এবং নানাদিকে তার প্রশংসা শুনেছে তখনই তার মনে এই লোভ জেগেছে যে এমনি প্রশংসা আমাকেও পেতে হবে। এইরকম কত আশা তার ছিল। আজ ঘরের ঐ অন্ধকারের উপর ভবিষ্যতের সেইসব আশার ছবি উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠে চোখের সামনে যেন মিলিয়ে গেল। একটা আক্ষেপ ও হতাশায় তার বুক ভেঙে পড়তে লাগল। যতবারই মনে হচ্ছিল সে একজন দোকানীমাত্র ততবারই নিজের প্রতি একটা ঘৃণায় তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। সেই ঘৃণা ক্রমে পাকিয়ে উঠে এমন তীব্র হয়ে উঠল যে সেই আগুনে বাপের প্রতি তার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভালোবাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন কেবলই মনে হতে লাগল বাপ হয়ে কত-বড় শত্রুতা সাধন না করলে!—জীবনের সর্ব্বস্ব থেকে বঞ্চিত করে কি-না পথের কাঙাল করে ছেড়ে দিলে! তার মনে হ'ল তার এই দুর্দ্দশা দেখে ঘরের সেই খাতা-পত্রগুলো, এমন-কি ধুলো-মাখা ভাঙা-চোরা আসবাবপত্রগুলো পর্য্যন্ত যেন টিটকারি দিচ্ছে। তাইতে সেই ছোট্ট কুটুরীর জমাট অন্ধকার মথিত হয়ে উঠে একটা তীব্র ঘৃণার বিষ চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই বিষ প্রত্যেক নিশ্বাসের সঙ্গে তার মর্ম্মে গিয়ে প্রবেশ করছিল। আজ তার প্রথম মনে হ'ল সে যে একজন সামান্ত দোকানীর ছেলে—এর চেয়ে বড় পরিচয় তার নেই—তার জন্যে দায়ী তার বাপ! এত-বড় একটা দীনতার ছাপ মেরে বাপ যে তাকে এই সংসারে এনেছে—বাপের এই অপরাধ তার চোখে অসহ্য বলে ঠেকতে লাগল। ক্রোধে লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল।

ক্রমেই রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল,—সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের জিনিষগুলো ঝাপ্‌সা হয়ে আসছিল। রমেশের মনে হতে লাগল তার সমস্ত জীবনটা ঐ ঝাপসার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। চাকর এসে একটা ছোটো তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। তারই সাম্‌নে রমেশ চুপ করে বসে রইল। পিছনে দেয়ালের গায়ে তার দেহের ছায়া পড়ে মনে হচ্ছিল যেন একটা কালো দৈত্য সবেমাত্র ঘুম-ভেঙে উঠি-উঠি করছে। সেই ছায়ার দিকে হঠাৎ-একবার চোখ-পড়াতে রমেশ চম্‌কে উঠল।

ছোট্ট কুটুরীর সাম্‌নে দোকান-ঘরের গোলমাল ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে, শেষে চুপ হয়ে গেল। বাগচীমশায় খরিদ্দারের আশা ছেড়ে তখন হিসেবের খাতায় মন দিলেন। কেউ আল্‌মারির চাবি বন্ধ করতে, কেউ ছড়ানো কাপড়গুলো ভাঁজ করে গাঁট্‌রি বাঁধতে লাগল। সকলেরই বাড়ি-যাবার তাগাদা, কেবল রমেশ নিশ্চল। সেই যে সে তক্তাপোষে বসেছিল আর ওঠেনি। ক্রমেই রাত হচ্ছে দেখে দোকানের লোকেরা উস্‌খুস্ করতে লাগল। শেষে তারা অধীর হয়ে রমেশের কাছে এসে বল্লে—"দাদাবাবু, রাত অনেক হল—উঠুন।" রমেশ এক ধমক দিয়ে উঠল। তারা আরো-একটু অপেক্ষা করলে, তার পর চাবির গোছা রমেশের সাম্‌নে রেখে বল্লে—"তা'হলে আমাদের ছুটি দিন।" রমেশ

একটা ভীষণ গর্জ্জন করে বলে উঠল—"বেরো তোরা—বেরো!" তারা অবাক হয়ে রমেশের মুখের দিকে চাইতে লাগল। তারপর রমেশের তীব্র দৃষ্টি তখনো তাদের উপর রক্তবর্ণ হয়ে ঘুরছে দেখে আর দ্বিরুক্তি না-করে তারা আস্তে-আস্তে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

(৪)

কালীচরণ যখন ফুলের মালা হাতে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরল তখন তাকে দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। প্রতিদিন সে চোরের মতন রাতের অন্ধকারে বাড়ি প্রবেশ করে;—কখন্ আসে-যায় কেউ টের পায় না। সবাই ভাবলে আজ হল কি! কালীচরণের স্ত্রী অনেক দিন মারা গেছে। বাড়িতে ছিল তার এক বিধবা বোন। সে দাদাকে এত সকাল-সকাল আসতে দেখে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"দাদা তোমার অসুখ করেনি ত!"

দাদা বল্লে—"নারে, না!"

—"তবে এত সকাল-সকাল যে!"

—"আমি যে ছুটি পেয়েছি!"

—"ছুটি? সে কি দাদা!"

—"আরে, আর আমার দোকানে বেরুতে হবে না।"

—"তবে দোকান চলবে কি করে?"

—"এখন থেকে রমেশ চালাবে।"

—"রমেশ ছেলেমানুষ—সে কি পারবে?"

—"দেখ্, আর ভাবতে পারিনে। এতকাল ধরে কেবল ঐ ভাবনাই ভেবে এসেছি! যা-কিছু করেছি সে ত ঐ রমেশের জন্যেই! আমার নিজের জন্যে হ'লে কি এমন-করে মুখের রক্ত তুলে খাটতে পারতুম? এখন ওর জিনিষ ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

—"তা বেশ করেছ দাদা, তোমার নিজের উপায় কিছু করে রাখলে?"

—"দেখ্ বিন্দি, আজ আর আমায় ভাবাস্‌নে! আজকে আমি সব ভাবনা ঠেলে-ফেলে হাঁফ-ছেড়ে বসেছি। রমেশ কি তার বুড়ো-বাপকে দুমুঠো খেতে দিতে নারাজ হবে।"

—"না দাদা, আমি সে-কথা বলছিনা। দোকান তুমি রমেশকে দিয়েছ, বেশ করেছ। নগদ টাকা-কড়ি যা আছে তা কি হাতে রাখলে? বুড়ো-বয়েসে ছেলের হাত-তোলা হয়ে থাকবে কেন? পরে ত রমেশের সবই।"

—"দেখ বিন্দি, তুই আজ আমায় জ্বালালি। সমস্ত হিসেবপত্র চুকিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়েছিলুম, —তুই আবার তার জের টানতে আরম্ভ করলি। আরে, নগদ টাকা কি আমার কিছু আছে? যা লাভ করেছি সে-সবই ত ঐ দোকানের গর্ভে ঢেলেছি, তা না করলে ব্যবসা ফলাও হবে কেন? ভবিষ্যতে রমেশকে সংসার চালাতে হবে ত? তার কোন্ দু-দশটা ছেলেমেয়েই না হবে। দেখ্ বিন্দি, এখন ওসব কথা যেতে দে; আমি আর কোনো-ভাবনা ভাবতে চাইনা। এখন খাবারের জোগাড় কর দেখি—আমার খিদে পেয়েছে।"

বিন্দি তাড়াতাড়ি উঠে দাদার জন্যে খাবারের জায়গা করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ

ফুলের মালার দিকে চোখ পড়াতে অবাক হয়ে বলে উঠল—"দাদা, আজ এত ফুল এনেছ যে! কি হবে?"

তাই ত ফুলগুলো হবে কি! কিসের জন্যে কিনলুম একথা কালীচরণের একবার মনেও হয় নি। সে শুধু মনের আনন্দে—গন্ধের লোভে—ফুলগুলো কিনে ফেলেছিল। বোনকে কি জবাব দেবে সে ভেবে পেলে না। সে বল্লে—"কী আর হবে! যা-হয় তুই করনা।"

বিন্দি খুসি হয়ে বল্লে—"বেশ ফুল দাদা! এগুলো আমার গোপালঠাকুরকে দিইগে।"—বলে সে চট্‌পট্‌ ফুলগুলো তুলে নিয়ে ঠাকুর-ঘরের দিকে ছুটল।

(৫)

রমেশ তখনো চুপ-করে বসেছিল। মনে যে তার বিশেষ-কিছু ভাবনা উঠ্‌ছিল তা নয়। কেবল ক্ষোভ, অভিমান, অপমানের ভাবগুলো স্ফীত হয়ে উঠে তার মনের তারগুলোকে টেনে কড়-কড়ে করে তুলছিল। একলাটি দোকান-ঘরের মধ্যে বসে-থেকে-থেকে এই কথা তার মনে ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল যে সে এই দোকানের দোকানী ছাড়া আর-কিছু নয়। দোকানটাকে তার মনে হতে লাগল একটা ভীষণ গারদ। এই গারদে তার জীবনকে চিরদিনের জন্যে বন্দী করে বাপ তাকে একলা ফেলে চলে গেছে।—বাপ তার নিজের মুক্তির জন্যেই এই শৃঙ্খলভার ছেলের সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে।—স্বার্থপর বাপ!

রমেশ চারিদিকে চেয়ে দেখলে—কেউ কোথাও নেই—সে একলা! তার মনে হতে লাগল এই নির্জ্জনতা, আর এই ভীষণ কারাগার ক্রমেই যেন দীর্ঘ হতে দীর্ঘ হয়ে উঠছে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তার সীমা দূরের দিকে ছুটে চলেছে। এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। সে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়াল।

রাস্তার জন-কোলাহল তখন থেমে গেছে। ঘরের প্রদীপ মিট্‌-মিট্‌ করে জ্বলছে। উঠে দাঁড়াতেই তার পিছনের সেই ছায়া-দৈত্যটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রমেশ তার সাম্‌নে খানিকক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল সে যেন মিটি-মিটি হাসছে—রমেশের অবস্থা দেখে ভারি মজা পেয়েছে। রমেশ তাড়াতাড়ি মুখ-ফিরিয়ে দাঁড়াল। অমনি মনে হ'ল সেই ছায়াটা যেন ভ্রুকুটী করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই উপরের তাকের কালো-কিষ্টি খাতাগুলো যেন ফিস্‌-ফিস্‌ করে হেসে উঠল। রমেশ পাগলের মতো ছট্‌-ফট্‌ করতে লাগল। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সাম্‌নের খাতাগুলো নিয়ে ওলট-পালট করতে লাগল,—টেবিলের টানাগুলো ধরে টানাটানি করতে লাগল। এমনি-করে জিনিষপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে একখানা বড় খামে-মোড়া এক-তাড়া কাগজ তার হাতে এসে পড়ল। কৌতূহলের বশে নয়—উত্তেজনার বশে নাড়াচাড়া করতে-করতে সেই কাগজের লেখার প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। এটি তার বাপের উইল।

রমেশ গোটাকতক লাইন পড়েই বুঝলে

তার বাপ এই দোকানের সর্ব্বস্ব তাকে দান করেছেন। হঠাৎ তার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে উঠল। এ ত দান করা নয়—এ অপমান করা! কে তাঁর কাছে এই দোকান ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল? যে-দোকানী-নামের অপমান তিনি চিরদিন গলার হার করে বহন করে এসেছেন সেই অপমানের হার তিনি ছেলের গলায় উপহার দিয়েছেন! আ মরি, মরি, কী উপহার! তাও আবার এমন-করে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা যে নিষ্কৃতি নেই! কারণ উইলে লেখা আছে—"ইহাতে আমার পুত্রের বিক্রয়াধিকার, দানাধিকার কিম্বা কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার অধিকার রহিল না।"

রমেশ উইলখানা দুই হাতদিয়ে ধরে, কুটিকুটি করে, পাশে কাপড়-ইস্ত্রী-করবার যে আগুনের গামলা ছিল তার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কাঠ-কয়লার আগুন প্রায় নিভে এসেছিল, খোরাক পেয়ে আর-একবার স্ফূর্ত্তিকরে জ্বলে উঠল। আগুনের এই স্ফূর্ত্তি নেশার মতন রমেশের মনে গিয়ে লাগল। রাগের আক্রোশ কোথায় গিয়ে পড়ে জায়গা না পেয়ে ঐ আগুনের গামলায় গিয়ে পড়ল। রমেশ তখন হাতের কাছে যা-কিছু কাগজ পেলে ঐ অগ্নিতে সমর্পণ করতে লাগল। শেষে হিসেবের খাতায় পর্য্যন্ত টান পড়ল। তার মনে হতে লাগল তার বাপ উইলে দোকানের সমস্ত অধিকার আটক রেখেছেন বটে কিন্তু এই একটা ফাঁকে মুক্তি আছে—সে এই অগ্নি!

সে যা হাতের কাছে পেলে ঐ আগুনে দিতে লাগল। তাতে আগুনের যত স্ফূর্ত্তি, রমেশেরও তত স্ফূর্ত্তি, আর তত স্ফূর্ত্তি ঐ কালো ছায়াটার! সে রমেশকে ইসারা করে আঙুল দেখিয়ে-দেখিয়ে বলছিল—দাও, দাও, আহুতি দাও, সর্ব্বস্ব আহুতি দাও!

দেখতে-দেখতে আগুন নানাদিকে শিখা বিস্তার করে উল্লসিত হয়ে উঠল। সমস্ত দোকানখানাকে শুষে খাবার জন্যে তার সহস্র জিহ্বা লক্-লক্ করতে লাগল। সে দোকানের যথা-সর্ব্বস্ব জিভ দিয়ে টেনে-টেনে ক্রমে নিজের উদরে পূরতে লাগল। শেষে এক মহা অগ্নিকাণ্ড! রমেশ ধোঁয়ায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * * *

পরদিন সকালে কালীচরণ যখন বার হচ্ছে, তখন বিন্দি বল্লে—"দাদা, এরই মধ্যে যে বেরুচ্ছ? কাল যে বল্লে, আমায় নিয়ে কাশী যাবার সব ঠিক করবে আজ!"

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"কাশী এখন মাথায় থাকুন। এখুনি আমায় একবার ফায়ার-ইন্সুরেন্স অফিসে যেতে হবে।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

আহ্বান

মোরে কে ডাকিছে অজানায়!
আকাশের চাহনিতে, বাতাসের
পরশ-লীলায়!
তাইতে আসন ছাড়ি মুগ্ধ আঁখি
মুক্ত জানালায়!

ছাড়াইয়া তোরণ-সীমায়,
এসেছি পথের ধারে, পথ যেথা
ভরা জনতায়,
মহানন্দে আগুয়ান, তরঙ্গের
নৃত্যভরে ধায়!

দাঁড়ায়ে রয়েছি আঙিনায়,
অলিন্দ-সোপান হতে একা নেমে,
ব্যাকুল হিয়ায়!
প্রসারিত আঁধারের আলিঙ্গনে,
সঁপি আপনায়!

ফিরিয়া চাহেনা কেহ হায়,
চলে সবে, চলে সবে, দূর হতে
সুদূরে মিলায়,
দ্রুত পদশব্দ যত, সমস্বরে
ডাকে, 'আয়' 'আয়'!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ছিটে-ফোঁটা

আমাদের গাঁয়ে শামলাং-এ একটি (মালার) কাঁসারী যুবক থাকতো; দেখতে ভারি সুন্দর, কালো-কুচ্‌কুচে পাথরের তৈরি মূর্ত্তিটির মত; আর তার মনটা ছিল স্বচ্ছ নীল আকাশের মত পরিষ্কার। সে আমাদের এই অসভ্য কোলেদের গাঁয়ের শিল্পী ছিল—গানও গাইতো তোয়লাও বাজাত। তাকে আমার ভারি ভাল লাগত। তারপর তার বিয়ে হ'ল। আমাদের বাড়ীতে সে তার বৌকে দেখিয়ে গেল—তার সেই দাম্পত্য-সুখের বুকভরা আহ্লাদ তার চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। কিছুদিন পরে হঠাৎ শুনলুম যে তার বাপ—অর্থাৎ শ্বশুর, তার কাছ থেকে জোর করে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—আর, সে আহার-নিদ্রা, শিল্প-কলা, কাজকর্ম্ম সবতাতেই জলাঞ্জলি দিয়ে তার কুঁড়েটিতে চুপচাপ বসে আছে—কারও সঙ্গে দেখাও করে না কথাও কয় না। আমি এই সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করলুম। তার কুঁড়েটি গ্রামের মধ্যে সব-চেয়ে ছোট, কিন্তু সব-চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আঙ্গিনায় একটি বড় অশ্বত্থ-গাছ; সেটির আলবাল মাটি দিয়ে সুন্দর-

ভাবে লেপা। তার ঘরের আর-একটি বিশেষত্ব, দেয়ালে বাঘ হাতি প্রভৃতির মূর্ত্তি নানান রঙে আঁকাজোখা।

আমি ঘরে প্রবেশ করে তার হাপরের পাশে তার কাছে গিয়ে বসতেই সে একটু দুঃখের হাসি হাস্‌লে; তারপর আস্তে আস্তে তার মনের কথা সব খুলে বল্লে। আমি ভাল করে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় তাকে বিয়ে করতে বল্লুম। সে তখন আমায় বল্লে, "আমি তোমার কথা শুনব না। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, অতএব তার বাপ তাকে যেখানেই লুকিয়ে রাখুক, আমি বারো বৎসর তাকে আগে দেশে দেশে পথে পথে খোঁজ করে দেখব—তারপর অন্য কথা"। শেষে একদিন শুনলুম, তার যেমন কথা তেমনি জ। সে ঘর-দুয়োর ধান-চাল সঞ্চিত যা-কিছু ছিল, সব ফেলে কোথায় তার প্রিয়ার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে তা কেউ জানেনা।

আমাদের মনে হয়—শিল্পিদেরও যাত্রা শিল্পলক্ষ্মীকে পাবার জন্যে এমনিতরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথঘাট বিচার করে তিথি-নক্ষত্র দেখে যাত্রা নয়—একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

* * * *

ভারতশিল্পের এই নবজীবনের যুগটি খুব সত্যিকারের যুগ। এটি নারকোলের মত; তার মালাটি যখন ভরে উঠবে তখন তার আশেপাশে জল আর একটুকুও থাক্‌বে না, সবটা একেবারে ভরে উঠবে। এইজন্যে অঙ্কুরোদ্গমের কালটাই আসল; এবং ফসল যখন ভরে উঠবে তখন আর ব্যাখ্যা বা সমালোচনার প্রয়োজন থাকবে না।

* * *

নিরেনব্বই জন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে আর্টিষ্ট নামে পরিচিত হলেই তাঁরা জান্‌তে চান, আমরা 'ফোটো-এনলার্জমেণ্ট' করতে পারি কি না। তাঁরা এটা বোঝেন না বা ভাবেন না যে, আর্টিষ্ট নির্জ্জীব ক্যামেরা-বাক্স নয়, ক্যামেরায় তোলা ছবির রূপটি তাঁর কাছে একেবারেই মূল্যবান নয় যতটা তার জীবন্ত চেহারাটা। এখানে আর্টিষ্ট যদি 'ফোটো-এন্‌লার্জমেণ্টে'র বদলে কেবলমাত্র চেহারাটা আঁকবার সুযোগ পান, তবে তাঁর কতকটা শিল্পনৈপুণ্য দেখাতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মোটের উপর মানুষের চেহারা দেখে আঁকাটা চরম বলে কোন বড় শিল্পীই মেনে নিতে পারেন না। এটা জানা উচিত যে, চেহারা দেখে দেখে আঁকার উপরেও শিল্পীর সৃজনী-শক্তি (Artistic Creation) বলে একটা জিনিষ আছে—এবং তার প্রতিই আর্টিষ্টের শ্রদ্ধা হচ্ছে সব-চেয়ে বেশী।

* * *

সঙ্গীত-বিদ্যাটি যে অনন্ত (Infinite) এবং চিত্র-বিদ্যা যে সান্ত (Definite) এ বিষয়ের প্রমাণ পাশ্চাত্য শিল্পীদের বস্তুপ্রধান শিল্পগুলি দেখলেই পাওয়া যায়। তাঁরা Still-life বা জড়-চিত্র—অর্থাৎ সামনের জিনিষ—নিয়েই এমনি মশ্‌গুল

যে, দূরের দিকে তাঁদের নজর একরকম চলে না বল্লেই হয়। আবার, যখন প্রাচ্য চিত্রকরদের আঁকা—বিশেষতঃ জাপান ও চীনের অনন্ত-নীল আকাশের উপরে ভাসমান বলাকা-শ্রেণীর সুদূরে যাত্রা প্রভৃতির ছবি দেখি তখন আর চিত্রবিদ্যাকে সান্ত (definite) বলতে কিছুতেই ইচ্ছা হয় না —এখানে সে ভূমাকেই মনে পড়িয়ে দেয়। সঙ্গীত বাহ্যত শব্দপ্রধান হলেও যেমন তার মধুর রসটুকু মনের কোণে এক জায়গায় স্পন্দিত হতে থাকে, এই প্রাচ্য শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি দেখার-মত-করে দেখলে তাদের মধ্যে রেখার সমষ্টি ছাড়াও অনেক অদেখা জিনিষও কল্পনায় জেগে উঠতে থাকে। আমাদের এই নবীন শিল্প-সাধনার দিনে তাই কবির কথায় বলতে ইচ্ছা হয়—

"সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন সহজ হবি
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি"

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

কাগজের হাতী

বা

নব্য দিঙ্‌নাগ্‌-প্রশস্তি

দূরে থেকে দেখে দিগ্‌গজ ব'লে
ভুল ক'রেছিনু প্রায় তারে,
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি
নজ্‌গজে এ যে এক্‌বারে!
পথ জুড়ে চলে প্রতি পদে টলে
চ্যাঁচাড়ি-চেরাই-দন্ত রে,
ঘোড়া ভড়্‌কায় দেখে আচম্‌কা
ছেলে ভয় পায় অন্তরে।
আগে আগে চলে ময়ূরপঙ্খী
কাগজের হাতী ধায় পিছে,
প্রহ্লাদ-মারা শুঁড়ের বহর
কিন্তু সে ভুয়ো—সব মিছে।
ও শুঁড় কারেও মুড়ে তুলে কভু
পাটে তুলে রাজা কর্ব্বে কি?—
ও শুঁড় কখনো মহালক্ষ্মীর
অভিষেক-ঘট ধর্ব্বে কি?—
ও শুঁড়ে পাকড়ি বট-পাকুড়ের
পাতাটাও ছেঁড়া যায় না রে!
ও শুধু খাম্‌কা সমাস ভাঙিতে
পটু টেনিসন-টার্ণারে॥

কলমগীর।

পর্-ঈ-তাউস্

ওপারে মুচিখোলার নবাবী নিলেমে চড়েছে, এপারে সবুজ ঘাসের ঢালুর উপরে তুই বন্ধুতে পা-ছড়িয়ে চড়ুই-ভাতির পরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি,—ঠিকে-গাড়ির ঘোড়াগুলো হঠাৎ কাজের অবসরে এক-এক-বার যেমন ধুলোয় লুটোপুটি খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে নেয়।

সেদিন একটা ভাঙা খাঁচা জলের স্রোতে ভেসে চল্‌তে দেখে আমি অবিনকে তামাসা করে বলেছিলেম—"ওহে খাঁচাটা নবাবের চিড়িয়াখানার দিক থেকে যখন ভেসে আস্‌ছে তখন এটা পক্ষীরাজের খাঁচা হলেও হতে পারে। দেখ-না সাঁৎরে, যদি ওটাকে ধরতে পারো।" অবিন সাঁতার একেবারে না জানলেও সেদিন যে-কোরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আর খাঁচাটা না তুলে, তাকে জেলে ডেকে জল থেকে তুলে আনার জন্যে আমার সঙ্গে যে-আড়িটা দিয়েছিল চিরদিন সেকথা আমার মনে থাকবে। এখন সে-কথা অবিন ভুলে গেছে কিন্তু পক্ষীরাজ তার সেই যৌবনের তুঃসাহস বোধ হয় ভোলেনি, তাই হঠাৎ আজ তার স্থূল-শরীর কাশীপুরের ঘাট থেকে জাহাজে আমাদের দর্শন দিতে এসে উপস্থিত! গোছা-গোছা ময়ূরের পালক-হাতে সে লোকটা! কী অদ্ভুত যে দেখতে তাকে তা আর কী বল্‌ব! ভণ্ডামির যত-রকম পালক হতে পারে সব-ক'টা দিয়ে সে আপনাকে সাজিয়েছে।

ছোট ছেলেতে পাখীর ছানা হাতে পেলে টিপে-টুপে পালক-ছিঁড়ে যেমন করে, অবিন ঠিক তেমনি এ লোকটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লে। অবিনের গায়ে তুলো-ভরা ছিটের কালো কোট। এ-লোকটাকে ময়ূর-পুচ্ছে বিচিত্র দেখে আমার কথামালার দাঁড়-কাকের গল্পটা মনে পড়ল। আমার তুলনাটা ইংরিজিতে অবিনকে শুনিয়ে দিতেই সে-লোকটা আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—"তোমার বন্ধুর কোটের নক্সাটা ভালো করে কি দেখা হয়েছে? ওটা যে আগাগোড়া ময়ূর-পালকে ভরা।"—বলেই লোকটা উত্তরপাড়ার ঘাটে লাফিয়ে পড়লো—গাঁজার বিকট গন্ধে জাহাজ ভরে দিয়ে। আমি অবিনের কোটের দিকে চেয়েই একেবারে ঘাড়হেঁট কল্লেম।

আকাশে একটা রাম-ধনুক ময়ূরের পালকের রং-ধরে দেখা দিয়েছে। আবার যখন মুখ-তুলে চাইলুম তখন সবপ্রথম ওইটেই আমার চোখে পড়লো। আমি অবিনকে সেটা দেখাবো বলে ডাক্‌তে গিয়ে দেখি অবিন সেখানে নেই। আশে পাশে কোনো সহযাত্রী দেখলেম না। জাহাজের ডেক্ সমস্তটা খালি পড়ে আছে। তারি এককোণে আমাদের বাঁয়া-তবলা-জোড়া পড়েছিল। হঠাৎ সে-তুটো দেখি তুখানা কোরে পালকের ডানা বের কোরে পাখীর মত উড়ে পালালো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের খালি বেঞ্চিগুলো একে

একে পালক গজিয়ে পক্ষীরাজের মতো লাফাতে লাফাতে ডেক্‌ময় ছুটোছুটি করতে করতে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিলে।

আমাকে না-জানিয়ে বন্ধুরা সবাই হয় মাছের মতো, নয় পাখীর মতো পাখা না গজিয়ে কেমন করে এই মাঝ-গঙ্গা থেকে সরে পড়লেন, বেঞ্চগুলো আর ডুগ্‌ডুগি দুটো কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগলো—একথা যখন আমার মনে উদয় হয়েছে অমনি দেখি ষ্টিমারখানা দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সোজা সেই আকাশ-জোড়া ময়ুর-পুচ্ছের মতো রামধনুকের ফাটকটার দিকে উঠে চল্লো।

জল ছেড়ে শূন্যে খানিক ওঠবার পর দেখছি অবিন উপরতলার সারেঙের কুট্‌রী থেকে উঁকি মেরে অমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে! তার পাশে সেই ময়ুরের পালক-ওয়ালা অদ্ভুত মানুষটা আমাদের! আমি এদের কোনো কথা বলেছিলেম কিনা মনে নেই, উত্তরে একটা খুব গম্ভীর গলায় শুনলেম—"পালকের যাদুঘরে চলেছি,—ময়ুর-পুচ্ছধারীদের সপ্তম স্বর্গে!"

স্বর্গ এবং যাদুঘর এর একটাতেও যাবার মতলবে আমি বাড়ি থেকে রওনা হইনি। তরী আমার বেরিয়েছে জোয়ার ঠেলে; ভাটা কাটিয়ে ঘরে ফিরবো—এই কথাই মনে ছিল। কাজেই আমি খুব চেঁচিয়ে বল্লেম—"জাহাজ ভেড়াও, আমি নামতে চাই।" কিন্তু জাহাজ তখন তার তরণীরূপ ছেড়ে পাগ্‌লা পক্ষীরাজ হয়েছে। আর চালাচ্ছেন তাকে সেই পালকধারী।

কাজেই কোনো ঘাটেই যে সে না-দাঁড়িয়ে বরাবর রামধনুকের মটকায় গিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে হঠাৎ থামবে তার আর বিচিত্র কি!

তিনটেতে আমরা পক্ষীরাজের পিঠ থেকে জ্বলন্ত উল্কার মতো কেন যে এতক্ষণ মহাশূন্যে ঠিক্‌রে পড়িনি এইটেই আশ্চর্য্য! ময়ুরের পালকের ডগায় মাছি যেমন, তিনটিতে আমরা তেমনি সাতরঙের একটু কিনারা প্রাণপণে আঁকড়ে শূন্যে দুলছি, এমন সময় আমাদের পাণ্ডা—সেই ময়ুরপুচ্ছধারী মানুষ-দাঁড়কাক—রামধনুর ডগায় স্থির হয়ে বসে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। সেখানে কি আশ্চর্য্য পাখীরাই ঘুরে বেড়াচ্ছে! রঙিন পালকের আলোতে সে-দিকটা কখনো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নার মতো নীল, কখনো সকালের আকাশের মতো সোনালী, সন্ধ্যার আকাশের মতো রাঙা, জলের মতো ঝকঝকে রূপালী, ধানের ক্ষেতের মতো ঠাণ্ডা সবুজ। এই বা নতুন পাতার মতো টাট্‌কা, এই ঝরা পাতার মতো মলিন। রঙের খেলার সেখানে অন্ত নেই। তারি মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে একদল শিশু, পাখীর ঝরা-পালক উড়িয়ে-উড়িয়ে ছড়া-ছড়ি করে—তপোবনের শকুন্তলার মতো। আমি অবিনের গা টিপে বল্লেম—"ওহে এরাই হচ্ছে পরী।"

পাণ্ডা একটু হেসে বল্লেন—"আজ্ঞে না। এরা হলো রামধনুকের প্রাণ। এরা আছে বলেই রামধনুকে রং আছে। পরী দেখতে চান্ তো ঐ দিকটায়—যে দিকটায় পালকের যাদুঘর—যেখানে পালকের দাম আছে।"—এই বলে তিনি দক্ষিণে—প্রায় দক্ষিণ-

বল্লেন—"ওই যে দেখছেন দুখানা ডানা বেঁধে হাত-দুটি বুকে রেখে, ওঁরা হলেন মানুষ, কেবল ডানার খাতিরে আমরা বলি ওঁদের এন্‌জেল্‌, আর কোনো তফাৎ মানুষের সঙ্গে নেই। আর ঐ দেখুন গরুড়কে। শুধু ডানা নয়, পাখীর ঠোঁটটা পর্য্যন্ত মুখোস করে' পোরে দাস্য-রসের রাজসিংহাসন আপনার রামা-চাকরের হাত থেকে বেদখল করে নিয়ে বসে আছেন। ওই ঠোঁট আর ডানা বাদ দিলে উনি মানুষমাত্র। আর ওই দেখুন বৃন্দাবনের শুক-সারী। এঁদের রাজা গরুড় তবু প্রভুর সেবার জন্যে মানুষের হাত দুখানা রেখেছেন; কিন্তু এই গরুড়ের চেলা সেবাদাস সেবাদাসীগুলি নিজেদের টিয়াপাখীর খোলসে সম্পূর্ণ মুড়ে ফেলে আসলটাকে একেবারেই গোপন করে' দিব্বি সুখে বিচরণ করছে। মানুষ যখন পালকের শিল্পে খুব বিচক্ষণ হয়ে ওঠেনি—অর্থাৎ তাদের গোঁজা পালক ও পাখ্‌না সহজেই লোকের কাছে ধরা পড়তো—এরা তখনকার জীবের আদর্শ। এ অংশটাকে যাদুঘরের পুরানো অংশ বলা যায়। এর পরেই ওদিকে ঐতিহাসিক যুগের জীবগুলো। ক্রুজেডারদের মতো পালক তারা কেবল মাথার ঝুঁটিতে রেখেছে, বাকি সমস্ত-দেহ লোহার সাঁজোয়া দিয়ে অনেকটা পাখীর ধরণে নিজেদের সাজিয়েছে। এই সময় থেকে ডানার চাল উঠে গিয়ে পালকের ঝুঁটি বাহাদুর-লোকমাত্রেরই মধ্যে ফ্যাসন হয়ে উঠলো। টুপিতে, পাগড়ীতে, মুকুটে, ঘোড়ার মাথায় পালক গোঁজার যুগ এটা। ময়ুরের পালক, বকের পালক, কাকের পালক, চিলের পালক,—উটপাখী, ঘোড়াপাখী, সবার পুচ্ছ এরা বহন করেছে,—নিজেদের পুচ্ছ খসিয়ে রেখে! তার পর আধুনিক যুগের জীব দেখ। এখানে একদল শীরে পুচ্ছ দেখা যায়। একদল দেখা যায় পালকের কলম পেশা। আর-একদল সম্পূর্ণ পালক গোপন করে' পালকধারীর রাজা হয়ে কেবল পালকের রং—গেরুয়া সাদা কালো ইত্যাদি গায়ে মেখে রাজত্ব করছে—কেউ আদালতে, কেউ বিদ্যালয়ে, কেউ ছাপাখানায়, কেউ ডাক্তারখানায়—প্রকাণ্ড পালকধারীদের কন্‌গ্রেসে কন্‌ফরেন্স স্ব-স্ব-দেশে। এর পরে যে-যুগ আসবে তার সোনার ডিম পালকের গদীর উত্তাপে এখনো সিদ্ধ হচ্ছে। এই ডিম ফুটে যে বার হবে তার পালক পিঁপড়ের পিঠের দুখানি ডানার মতো হঠাৎ গজাবে—এই-রূপই পণ্ডিতরা বলেন। আর সেই অদ্ভুত জীবের জন্মদিনের 'শোকোচ্ছ্বাস গাথা' লেখবার জন্যে ময়ুরের ডানার গেরুয়া রঙের পালকের কলমটা কানে গুঁজে যে আসবে তার স্মৃতিসভার বিজ্ঞাপন এখন হতে বিলি আরম্ভ হয়েছে দেখ।"

বড় বড় শিল্, পালক, ধুলো-বালি মুঠো-মুঠো ঝুড়িঝুড়ি আমাদের মাথায় মুখে চোখে পড়ছে। রামধনুক আঁকড়ে আর থাকা চলে না। এরি মধ্যেই তার সাত রং ফিকে হতে সুরু হয়েছে—সম্পূর্ণ গল্‌তে সাত সেকেণ্ডও লাগবে না। এই ঝড়ের মুখে অবিন তার পালক-ছাপা কোটের বোতাম এঁটে, পাণ্ডাজী তাঁর ময়ুর-পালকের চামর বাগিয়ে উড়ে পড়বার জোগাড় কচ্ছে দেখে আমি বল্লেম—"ওহে আমার উপায়?

আমার তো পালক নেই। আছে মাত্র গায়ে এই কাশ্মীরের 'পরীতোষ' শাল। এর নাম পরী বটে কিন্তু এর পালক মোটেই নেই! একে নিয়ে তো ওড়া চলবে না?" "খুব চলবে। ওকে বুঝি বলে পরীতোষ? ওর ফার্সি নাম হচ্ছে পর্-ঈ-তাউস্। ময়ূরের পেখমের গোড়াতে যে ছাই-রঙের নরম পালক লুকানো থাকে তাই দিয়ে এটা প্রস্তুত। বাদশারা তক্ত-তাউসে এই শালের বিছানা লাগাতেন। এখন আমরা গায়ে দিয়ে থাকি! ভয় নেই উড়ে পড়।"

মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শালখানা মুড়ি দিয়ে রামধনুকের মট্‌কা থেকে ঝুপ করে' আবার যে-জাহাজ সেই-জাহাজেই নেমে পড়লেম। চোখ খুলে দেখলেম যেখানকার সেইখানেই আছি—পূর্ব্বের মতো শ্রীঅবনীন্দ্র। রামধনুক আর পক্ষীরাজের সঙ্গে অবিনটা পালিয়েছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসকাবারি

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম

"আশ্বিন ও কার্ত্তিক" সংখ্যার 'নারায়ণে' বিপিনবাবুর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশ বাহির হইয়াছে। এবারকার আলোচনায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি এতই নূতন নূতন দিক হইতে ভাবিয়াছেন এবং তাঁর ভাবনাগুলিকে এমন স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে তাঁর রচনা পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ দিকের পক্ষ লইয়া তাকে দাঁড় করাইতে হইবে এই লক্ষ্য থাকিলে লেখা কখনই এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

বিপিন বাবু এবার 'philosophic anarchism' অথবা দার্শনিক অরাজকতার কথা উত্থাপন করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ পরিণাম বলিয়াছেন। কথাটি অত্যন্ত খাঁটি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ যাঁরা করেন,—যাঁরা সমাজ-তন্ত্রতা ও সমাজ-বোধ ব্যক্তিতন্ত্রতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের চেয়ে পূর্ণতর ও কল্যাণতর বলিয়া ইতি-হাস হইতে নানা নজির পাড়িয়া তর্ক করিতে বসিয়া যান্, তাঁদের কারো কাছেই রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের এহেন তাৎপর্য্য ধরা পড়ে নাই।

বিপিনবাবু লিখিতেছেন:—

"কোনও সংস্কার মানিব না, তিন হাজার বৎসরেরও নহে, ত্রিশ বৎসরেরও নহে—বেশ কথা। অন্তরে যে কর্ত্তাপুরুষ আছেন, কেবল তাঁহাকেই মানিয়া চলিব, বাহিরের কোনও কর্ত্তৃত্বের অধীনে

থাকিব না,—শাস্ত্রেরও নহে, গুরুরও নহে; এক জন রামমোহনেরও নহে, বারজন রামারও নহে; স্মৃতিরও নহে, সমিতিরও নহে;—অতি উত্তম কথা। এই সংকল্প লইয়া যে জীবনপথে ও সাধনপথে দাঁড়াইতে পারে এবং জীবনের সকল বিষয়ে বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য উদাসীন হইয়া, কেবল নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে চাহে, তাহাকে মাথায় করিয়া লই। * * * *

"সংস্কারের প্রভুত্ব যদি নষ্ট করিতে হয়, তবে এতটা বুকের পাটা থাকা চাই যে, যে ঈশ্বর মানিবে না, পরকাল মানিবে না, নীতি মানিবে না, ধর্ম্ম মানিবে না,—কেবল নিজের নিকটে খাঁটী থাকিয়া জীবনপথে চলিবে এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া অপরের স্বাধীনতা নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিবে না, এইটুকু মাত্র মানিয়া চলিবে,—তাহাকেও মাথায় করিয়া লইতে হইবে।

এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কেহ কেহ অরাজকতা বলিতে পারেন। কিন্তু এ অরাজকতা প্রাকৃতজনের সমাজদ্রোহী অরাজকতা নহে। ইউরোপে ইহাকেই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism বলে। আর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল হইতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে আশ্রয় করিয়া আত্মমত প্রচার করিতেছেন, এই দার্শনিক অরাজকতাই তার শেষ কথা ও অপরিহার্য্য পরিণাম। এই দার্শনিক অরাজকতা বা Philosophic Anarchism হেয় বস্তু নহে। যেখানে এবস্তু বাহিরের আমদানী নয়, কিন্তু ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানে তাহাকে শ্রদ্ধাভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।"

বিপিনবাবু বলিতে চান যে, আমাদের দেশে ও আমাদের সমাজেই বহু প্রাচীন কাল হইতে এই দার্শনিক অরাজকতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ "ধর্ম্মের ও সাধনের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে"। কেননা, বাহিরের ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া তোমার অন্তরে যে পুরুষটি আছেন, তাঁকে জানো, তাঁকে পাও—এ উপদেশ কেবল আমাদের ধর্ম্মেই নাকি পাওয়া যায়। অবশ্য জ্ঞানে হোক্, ভক্তিতে হোক্, কর্ম্মে হোক্, যে কোন মার্গে হোক্, সকল সাধনাতেই এই যে অদ্বৈত উপলব্ধি বা তাদাত্ম্য, কিম্বা সাযুজ্য-উপলব্ধি—ইহা আমাদের দেশে মোক্ষের চরম অবস্থা হইলেও, এ শ্রেণীর মোক্ষ-সাধনাকে ইউরোপীয় দার্শনিক অরাজকতা অথবা ঐকান্তিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাধনার সমতুল মনে করাটা ভারি ভুল। কেননা, বিপিন বাবুই দেখাইয়াছেন যে "দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, বিবেকবৈরাগ্য সিদ্ধি যার হয় নাই, এই ঐকান্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে তার সত্য অধিকার জন্মে না।" অথচ Philosophic Anarchism কোন সাধনা বা মার্গ বা পদ্ধতির ধার ধারে না—কোন নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বও তার তত্ত্ব নয়।

প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে আশ্বিন ও কার্ত্তিকের সবুজপত্রে প্রকাশিত "আমার ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্ম্মজীবনের যে অভিব্যক্তির স্তরপর্য্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাতে একটি কথা এই পাওয়া গেছে যে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম কোন সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে আসিয়া থামিয়া যায় নাই—বিকাশমান ও বিচিত্রায়মান জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশ ও বিচিত্রতা ক্রমশই নব নব রূপে দেখা দিতেছে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না; তিনি বলেন মানুষের সেই ধর্ম্মটিই তার নিজস্ব "যে ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি ক'রে তুলচে।"

কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে বিপিনবাবুই দেখাইয়াছেন যে কি বেদান্ত-ধর্ম্মে কি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে 'সাধন-ধর্ম্ম' ও 'সমাজ-ধর্ম্ম'—এই দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য দাঁড়াইয়া গেছে। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন, 'ইহাতে লোক-চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়'। আমাদের যুগগুরু রামমোহন রায় এই কারণেই বেদান্তের শিক্ষাকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ মায়াবাদের শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা জন-সমাজের যথার্থ সামাজিক হইতে পারে না। এবং এই কারণেই তিনি হিন্দুধর্ম্মকে যেমন কাম্যকর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা হইতে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন—কেননা তাহাদের দ্বারা "texture of Society" সমাজের বাঁধুনিই আল্‌গা হইয়া পড়ে ;—তেমনি বেদান্তসূত্রেরও নূতন করিয়া ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁর ভাষ্যে বেদান্ত-ধর্ম্মে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের স্থান আছে, নীতির স্থান আছে, কর্ম্মের স্থান পূরাপূরিই আছে। সুতরাং কি জ্ঞানমার্গে কি ভক্তিমার্গে, মোক্ষত্বের আদর্শ যদি এই হয় যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার রসে পূর্ণ হইয়া জীবনের বিচিত্র দিক্‌গুলিকেই একের মধ্যে পূর্ণের মধ্যে নিবিড়লীন করিবেন—তবে ত সে মোক্ষের আদর্শকে 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শন্' বা অবচ্ছিন্ন আদর্শ বলিবার জো নাই। কিন্তু রামমোহন রায় যে ভাবে বেদান্ত-ধর্ম্ম মানিতেন কিম্বা এখনকার কাল্‌চারে দীক্ষিত কোন ব্যক্তি যেভাবে বেদান্ত-ধর্ম্ম অথবা বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিবেন, তার সঙ্গে আসল বেদান্ত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি অল্প—একথা স্বীকার করিতেই হইবে। যেমন ধরুন, অবতারকে 'নরনারায়ণ' বলিলে এবং যুগে যুগে যুগধর্ম্মে সেই নরনারায়ণ নানাজনের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ-আবির্ভূত হইতেছেন—এভাবে humanityর পূজাকে অবতারবাদ বলিলে তাকে অবতারবাদের নূতন ব্যাখ্যা বলিব—সত্যকার অবতার-বাদ বলিবনা।

সুতরাং যে অভিনব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আমদানি করিতেছেন, সে জিনিস প্রাচীনকালে এ-দেশে ছিলনা, এখনও নাই। যে জিনিসটা আমাদের দেশে সত্য সত্যই ছিল তাহা ধর্ম্মমতের এবং সামাজিক শ্রেণী ও আচারের pluralism বা অসংখ্যতা। মতবৈচিত্র্য শ্রেণীবৈচিত্র্য অনুষ্ঠানবৈচিত্র্য—এ সকল বৈচিত্র্যকে ভারতবর্ষ চিরকাল উদার ভাবে স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমন্বয় গড়িবার চেষ্টাও পাইয়াছে। সেই চেষ্টায় ভারতবর্ষ এক একটা বড় বড় সংস্কার, এক একটা বড় বড় symbol গড়িয়া দিয়া তার আশ্রয়ে বহুলোককে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়াছে। কিন্তু সববৈচিত্র্য-পরখ-করা অথচ সর্ব্বসংস্কার-হরা যে ব্যক্তি-স্বারাজ্য বা দার্শনিক অরাজকতা—যেথানে কোন বিধিনিষেধ মানা একেবারেই নাই—সে বস্তু পূর্ব্বকালে কোথায় ছিল ? এতো ভারতবর্ষীয় সন্ন্যাসের আদর্শ কোন মতেই নয়। অসংখ্যতার মধ্যে এ বস্তুর উদ্ভব হয় না, দ্বৈতের মধ্যেই এ'র যথার্থ উৎপত্তি। ইউরোপে সেই দ্বৈতের দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্র প্রকট—একদিকে ষ্টেট্ অন্যদিকে

ইন্‌ডিভিডুয়াল্ বা ব্যক্তি; একদিকে ধনশক্তি অন্যদিকে জনশক্তি;—মাঝখানে বিচিত্র সমাজ-তন্ত্র বিচিত্র ব্যবস্থা বিচিত্র আচার-বিচারের কোন ল্যাঠাই নাই। সেই জন্য ইউরোপে দরকার—ব্যক্তি ও ষ্টেটের পরস্পরের সংঘর্ষ ঘুচাইবার জন্য পরস্পরের মাঝখানে সামাজিকতাকে বিচিত্র ভাবে গড়িয়া তোলা। তবেই একদিকে ষ্টেটের একতন্ত্র প্রভুত্ব ও তার ফলে কি অন্তর্যুদ্ধ কি বহিঃর্যুদ্ধ যেমন কমিবে, অন্যদিকে তেমনি anarchism প্রভৃতিও ঘুচিবে। এবং ভারতবর্ষে দরকার—ঐ নিবিড় অসংখ্যতার উপদ্রব ও সামাজিক জটিল জালকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তার মধ্যে একদিকে রাষ্ট্রের ও অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান করিয়া দেওয়া।

বিপিনবাবু যে মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের দেশে না থাকার জন্য আমাদের দেশের জনমণ্ডলীকে 'কৃপণ' করিয়াছে, তাদের মধ্যে 'সিভিক্‌ধর্ম্ম' জাগে নাই—সে কথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার কেন এদেশে থাকে নাই, সে কথাটা কি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয়? ভারতের ইতিহাসে ক্ষণে ক্ষণে রাষ্ট্রীয় শক্তি বড় আকারে দেখা দিলেও অচিরেও তার বড় বিকারও কেন ঘটিয়াছে? ক্ষত্রিয়শক্তি, বৈশ্যশক্তি কেন লোপ পাইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ-শক্তিও একপায়ে দাঁড়াইয়া বকবৃত্তি করিতে অপারগ হইয়া কেন শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অধঃপাতের চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে? তার কারণ কি এই নয় যে, যে 'সামাজিক

সহানুভূতি ও সাহচর্য্য' দেখিয়া বিপিনবাবু মুগ্ধ, তার ভিতরে বিচিত্র সম্বন্ধ-জাল ও বিচিত্র কর্ত্তব্য ও দায় আছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির কোন সুযোগ নাই? এই ব্যক্তিত্ব না থাকিলে নেশন গড়েনা, ষ্টেট্ গড়েনা; এই ব্যক্তিত্ব না থাকিলে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাধীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না; এই ব্যক্তিত্ব না থাকিলে রাজশক্তি গণশক্তিকে স্বীকার করে না এবং অভিজাতশক্তিও ক্রমশ গণশক্তির মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে চায় না।

ইউরোপের চাই communalism বা সমাজ-ধর্ম্ম; আমাদের চাই individualism বা ব্যক্তি-ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তি-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের দেশের রোগের সেই মহৌষধ।

অনেকে মনে করেন যে, ব্যক্তি-ধর্ম্ম আমাদের সমাজে জাগ্রত হইলে তাহা আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে। এটা কেন ভুলিয়া যাই যে, পূর্ব্বপুরুষানুগত সংস্কার যাহা হাড়ে মজ্জায় বহু শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া গেছে, তার পাশ মানুষ কখনই শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে পারে না। উত্তরাধিকারের সূত্রে যাহা আমরা পাইয়াছি, জাতি হিসাবে যে সকল লক্ষণে আমরা আক্রান্ত, তা কি তুদণ্ডেই ঘুচে? ব্যক্তিধর্ম্ম যদি আমাদের সমাজে অত্যধিক মাত্রায় দেখাও দেয়, যদি তাহা সাময়িক ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে লইয়াও যায়, তবু আশঙ্কার কারণ নাই। কোন নূতন আন্দোলনই কোন দেশেই অত্যন্ত সুস্থভাবে

আসে না। রেনেসাঁসের কালে ইউরোপের সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে নাই? ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কালে করে নাই? সেই উচ্ছৃঙ্খলতাটাই কি চিরজীবী হইয়া আছে? মধ্যযুগীয় ষ্টেট্ ও চার্চ্চের একতন্ত্র প্রভুত্ব এখনও মরে নাই—সেইজন্য রেনেসাঁসের পর হইতে ষ্টেট্ ও চার্চ্চের সঙ্গে নবজাগ্রত ব্যক্তির পূরোপূরি বনিবনাও আজ অবধি হয় নাই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "Principles of Social Reconstruction" নামক নূতন বইটিতে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যযুগের সংস্কার যথেষ্ট জড়িত হইয়া আছে—রাষ্ট্রের সর্ব্বময় প্রভুত্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে আমাদের অনেক বন্ধন শিথিল হইয়া ক্রমশ খসিয়া যাইবে, ইহা বিশ্বাস করি। কিন্তু ইহাও জানি যে, বন্ধন শিথিল করিবার জন্য অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ বা রেনেসাঁস, অনেক সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন বা রেফরমেশন, অনেক লড়াই, অনেক বিপ্লব, অনেক নড়াচড়া আবশ্যক। শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াই ইউরোপের দেশগুলি বড় হয় নাই—মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের উন্মেষ, স্বাধীন চিন্তার সূত্রপাত, প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন, এ সমস্তই সে-সকল দেশের মনকে সতেজ ও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। সেই জন্যই ভোগের পথ দিয়াই ইউরোপ ত্যাগের পথে ছুটিয়াছে। আর আমরা? আমাদের মধ্যে একটুখানি সাহিত্যের দেয় নাই। "রাষ্ট্রের শক্তি জাগুক্, শাস্ত্রের শাসন আপনি তার পথ করিয়া দিবে" সত্য বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের শক্তি জাগাইতে গেলেই জাতির মনন-শক্তিকে সর্ব্বতোভাবেই জাগানো চাই। নহিলে সে শক্তি কেহ হাতে তুলিয়া দিলেও, হাত হইতে খসিয়া পড়িতে পারে, একথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

আচার ও বিচার

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের "সবুজপত্রে" "আচার ও বিচার" প্রবন্ধের লেখক বলেন যে, "আচারকে বাদ দিয়া যদি শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজগুলা চালান হইত তবে কার্য্যের ক্ষেত্র কখন তেমন ব্যাপক হইত না। কাজও তেমন জোরে চলিত না।...মানব সমাজে আচার ও বিচার দুয়েরই প্রয়োজন।...সমাজের পরিচালনায় বিচার রাজা, আচার তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ।"

সম্প্রতি আচার জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজ চালাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে, এই ধারণাটাই লেখকের মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায় আচার ও বিচারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনা করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, একটা প্রথা যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন তার মূলে বিচার থাকেই। কিন্তু কালক্রমে সেই প্রথাটা বিচারের এলাকা হইতে আচারের এলাকায় আসিয়া পড়ে। তখন "যে প্রথাটা প্রথমে মঙ্গলের মূর্ত্তিতে দেখা

সেটা ক্রমে মহা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে।"

তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি কিছুমাত্র নূতন কথা নয়। কিন্তু আচারকে উঠাইয়া দিয়া বিচারের দ্বারাই সমাজের সকল কাজ চালাইবার মত অদ্ভুত প্রস্তাব কোথাও উঠিয়াছে বলিয়া আমি জানিনা। সমাজে জ্ঞানের আলো যখন জ্ঞানী-গুণীদের শিখরদেশ ছাড়িয়া নিম্ন-ভূমিতে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়ে, তখন যুক্তিহীন আচার-পালনের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ স্বভাবতই সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠে। অর্থাৎ তখন বিচার-পূর্ব্বক আচারকে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে হইবে, এই আদর্শটা দাঁড়ায়। তার অর্থ এমন নয় যে, আচারকে তুলিয়া দিয়া যার বিচার যেমন বলে সে তেমনি রীতিনীতি অবলম্বন করিবে। সেরূপ স্বেচ্ছাচারে কোন সমাজই টেঁকে না।

জড়বিজ্ঞানে বলে যে, শক্তির যেমন একটা conservation আছে, তেমনি তার রূপান্তর ঘটিতেছে। জড় জগতে এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্যেই শক্তির লীলা চলিয়াছে। সমাজতত্ত্বে শাস্ত্র, আচার, বিধি-বিধান প্রভৃতি সমাজের সেই conservationএর শক্তি। সামাজিক জীবন পরিবর্ত্তনশীল এ কথা সত্য; কিন্তু সে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বাপরবিচ্ছিন্ন উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের পরম্পরা মাত্র নয়। আচার, শাস্ত্র, বিধি প্রভৃতির দ্বারা সে সকল সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা যোগসূত্র রক্ষা পায়।

"It is the letter that killeth"—অজ্ঞানী শাস্ত্রের মর্ম্মকে ধরিতে পারে না, তার শব্দকেই শিরোধার্য্য করে। তেমনি অজ্ঞানীর আচার-বশ্যতা আর সজ্ঞানীর আচার-পালনের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য। একে গতানুগতিক ভাবে আচারকে আশ্রয় করে, অন্যে বিচারপূর্ব্বক যে আচার অশুভকর তাকে বর্জ্জন এবং যে আচার শুভকর তাকে গ্রহণ করে। যে সমাজে অজ্ঞ লোকেরই প্রাধান্য সেই সমাজেই আচার আছে কিন্তু বিচার নাই; সুতরাং সে সমাজে উন্নতির স্রোত নূতন নূতন পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের খাত কাটিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় না—মরা নদীর মত পাঁকে পঙ্কিল হইয়া পচিয়া উঠিতে থাকে।

আমাদের দেশে এযুগে রাজা রামমোহন রায় প্রথম অনুভব করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে আচার জিনিষটা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত বলিয়া ঐ দুই ধর্ম্মেই নীতির চেয়ে রীতিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাপ হইতে বিরত হইলেও মানুষ শুদ্ধ হয় আবার তিথিবিশেষে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয়—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির চেয়ে বহিঃশুদ্ধির দিকেই মানুষের মন স্বভাবতই ঝুঁকিবে। সেইজন্য রাজা রামমোহন রায় শুদ্ধাশুদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য, গম্যাগম্য বিচারের সঙ্গে পরমার্থের যে কোন সম্বন্ধই নাই, ইহা হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করিয়া দিলেন। হিন্দু-ধর্ম্মকে তিনি কাম্য কর্ম্ম, তামস কর্ম্ম, পৌত্তলিক আচার প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিতে ও লোকঃশ্রেয়-সাধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মুসলমান

ধর্ম্মকেও তিনি তার সরিয়ৎ, তার হারাম হালালাদি অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার হইতে মুক্তি দান করিলেন।

ধর্ম্ম হইতে আচারকে পৃথক করিলে আচারের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। তখন আচার কেবলমাত্র লোকস্থিতি ও লোক-সংগ্রহের একটা উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাজা রামমোহন রায় এইদিক্ হইতেই আচারের সার্থকতা দেখিতে পাইতেন।

সবুজ পত্রের লেখক আচারের সঙ্গে বিচারের সামঞ্জস্য যেভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেভাবে সামঞ্জস্য খাড়া করা শক্ত। বিচার যদি প্রতি ব্যক্তিবিশেষের বিচার হয়, তবে ত আচার দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। আচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার মত একটা আদর্শ বা principle থাকা চাই। রামমোহন রায় সে রকমের একটা আদর্শকে ধরিয়াছিলেন—তাহা তাঁর লোকঃশ্রেয়ের আদর্শ। তিনি লিখিয়াছেন, "যে যে উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল কর্ত্তব্য।" সুতরাং যে যে আচার পালনের দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ ঘটিবেনা তাহা অসদাচার; যে যে আচার পালনের দ্বারা লোকের মঙ্গল ঘটিবে তাহা সদাচার। আচারের বিচার করিতে হইলে এই রকমের একটা মানদণ্ড থাকা নিতান্ত দরকার।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,—কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, ১নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা, শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য সাত টাকা। সুপার-রয়েল অপেক্ষাও বড় আকারে এবং সম্পূর্ণ-নূতন বিশিষ্ট অক্ষরে ছাপা ১৫৭৭ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ হইয়াছে। ইহাতে লেখ্য ও কথ্য সকল বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ,—এবং বহুস্থলে তাহাদের ব্যবহারও দৃষ্টান্ত-সহ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার উপর সমোচ্চার্য্য শব্দাভিধান, সংস্কৃত ধাতুসমূহ ও তাহাদের অর্থ, বাঙ্গালা *ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, হিন্দী ও বিদেশী প্রবচন* ও শব্দাদির অর্থ, প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা, পরিমাণ, সংখ্যা ও পরিমাপ-বাচক শব্দাভিধান, বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত প্রবাদ বা উল্লেখের সহিত সংসৃষ্ট পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তির পরিচয়, বঙ্গীয় নর-নারীর প্রচলিত নাম-সংক্ষেপ ও ডাক-নাম-বোধক শব্দাভিধান, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের আরবী ও পারসী নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সঙ্গত বানান এবং অর্থ, বাঙ্গালা কাব্য, ইতিহাস-পুরাণাদি গ্রন্থ-উল্লিখিত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের উদাহরণ-সমেত ভৌগোলিক সংস্থান, বাঙ্গালায় প্রচলিত সংক্ষেপ শব্দসমূহের অর্থ, বাঙ্গালা গ্রন্থ-পত্রাদিতে ব্যবহৃত সংস্কৃত উদাহরণাদির অর্থ, মেট্রিক বা ফরাসী দশমিক পরিমাণ-প্রণালী, মুদ্রা-বিনিময়ের হার, বিদেশী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর, প্রুফ সংশোধনের সঙ্কেতাদি অত্যন্ত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। *এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে সম্পাদকের অসাধারণ* পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি—এবং যতদূর দেখিয়াছি, গ্রন্থখানি

সম্পূর্ণ নির্ভুল। প্রকাশক ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। এই অমূল্য গ্রন্থের ছাপা কাগজ যেমন পরিষ্কার, বাঁধাইও তেমনি মনোরম ও মজবুত—অথচ মূল্য মোটে সাত টাকা মাত্র। বঙ্গভাষার প্রত্যেক লেখক ও পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থখানি অমূল্য। গৃহ-পঞ্জিকার মত এ গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক। এমন বিশদ অভিধান বাঙ্গালা-ভাষায় আর নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

মায়া। গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত। বর্দ্ধমান, বন-নবগ্রাম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; সমালোচনা করিতে ভয় হয়। কারণ, লেখক 'উন্মেষিকায়' লিখিয়াছেন, "যদি মায়ার আদর না হয়, তবে তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই; কারণ সংসারের আপাত-মধুর খণ্ড-সুখপূর্ণ ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া কেহই প্রায় নিত্য সুখের অনুসন্ধান করিতে রাজী নহেন। যদি কেহ তৃষিত তাপিত থাকেন, যদি কাহারো চিত্ত নিত্য সুন্দরের অপরূপ রূপের জন্য পাগল হইয়া উঠে, তিনি অবশ্য 'মায়া' হইতে একটু ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হইবেন—সন্দেহ নাই। আর তাই সাধকের ক্ষীণ আভাস-প্রাপ্তির আনন্দই আমার একমাত্র সুখ, একমাত্র অভীপ্সিত বস্তু" ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা সাধক নহি, তাই হয় ত এ কবিতাগুলির রস গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ কথা বলিতে বাধ্য যে সাহিত্যের বাজারে এ জিনিবের কোনো দর নাই।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, এল, এম, এস ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, এল, এম, এস প্রণীত। কলিকাতা, ৭৮ নং রসারোড (নর্থ) হইতে গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাথী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, এ গ্রন্থে বৈরাগ্য-সাধনের কোন সুগভীর তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সূত্র অবলম্বনেই এ গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থকারদ্বয় উভয়েই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে তাঁহারা যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বঙ্গীয় নর-নারীর স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে ভাবিয়াই সে সত্য তাঁহারা এ গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব ও শারীর-তত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। ভূমিকায় গ্রন্থকারদ্বয় লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য্য বুঝিতে এবং বুঝাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অশ্লীলতা-দোষ অপরিহার্য্য। অনেকের মতে এ বিষয়ের শারীর-তত্ত্বালোচনা যুবকগণের নিকটে উপস্থিত করা উচিত নহে। কিন্তু জীবতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্বের অধ্যাপনা কলেজের সকল শ্রেণীতেই আরব্ধ হইয়াছে; ইহাতে সবই আছে, কেবল সংযমের কথাটা নাই। অন্যদিকে পেটেণ্ট ঔষধ এবং পেটেণ্ট চিকিৎসকগণের সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন হইতে অল্প-বয়স্ক বালকগণও জনন-তত্ত্বসম্বন্ধে অতি কুভাবে শিক্ষা পাইতেছে। যখন ঝড় নিবারণ করা সম্ভব নহে, তখন ঘর শক্ত করা বোধ হয় সুবুদ্ধির কার্য্য, অন্ততঃ অনেকের এইরূপ মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারণে এ পুস্তক প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।" গ্রন্থকারদ্বয়ের এ-সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না—ব্যাধি-প্রতিকার-কল্পে তাঁহাদের উপদেশগুলি ব্যবস্থা সমাজকে তাহার মঙ্গলের জন্য মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। কোন রুচিবাগীশ যদি তাহাতে নাসিকা কুঞ্চন করেন, তবে তাঁহাকে সমাজের শত্রু বলিয়া ধরিতে হইবে। একটা মোটা কথা সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবে—যে এই রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করিয়া তাহার সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটি কথা জানা সকলেরই উচিত। যাঁহারা রুচির দোহাই তুলিয়া এ-সব কথায় কর্ণপাত করিবেন না, তাঁহারা ত মৃত—শব! অবরোধ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলি অসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেরই পরিচয় দেয়। এই গ্রন্থে বংশানুক্রম, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকারদ্বয় যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উচ্ছ্বাস নয়—সুদৃঢ় যুক্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত।

গ্রন্থকারদ্বয়ের সহিত সর্ব্ববিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই—না থাকিলেও এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে এই অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রত্যেক তরুণ নরনারীর,প্রত্যেক সংসারীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার-দ্বয়ের বহু মত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বহুস্থলেই তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রহণীয়। তবে একটা কথা বলিবার আছে, কয়েক স্থলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়গুলি আরো বিশদ করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-বিধির সহিত খাপ খাওয়াইয়া এবং সেকাল ও একালের বিধির তুলনা-মূলক সমালোচনার আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

কাকলী। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি, এল প্রণীত। কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাধারণ বাঁধাই আট আনা; উৎকৃষ্ট বাঁধাই দশ আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "এগুলি ভগবৎ-গীতি"। সুতরাং মামুলি প্রেমের কবিতা এ গ্রন্থে নাই। অনেকগুলি গান এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সব গানগুলির প্রশংসা করিতে না পারিলেও কতকগুলি গান পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। লেখকের ভাব আছে, ভাষা চলনসই, তবে ছন্দ স্থানে স্থানে পঙ্গু—লেখকের কাঁচা হাতের পরিচয় বহুস্থলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বহুস্থলে রবীন্দ্র-নাথের প্রভাব এমনি আসিয়া পড়িয়াছে—তবে আজকাল এমন রচনা অল্পই আছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব-স্পর্শহীন—যে কয়েকটি গান তাঁহার গানেরই ভাবের প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ! লেখকের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

স্তবক ও কোরক। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, গুণালঙ্কার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। নিউ-ব্রিটানিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অক্ষম রচনার এমন নির্লজ্জ সমাবেশ বাঙলা গ্রন্থেও বড়-একটা দেখা যায় না। কবিতাগুলি রাবিশ—যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, আবার ছন্দও ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ! এমন ত্রিবেণী-সঙ্গম কচিৎ দেখা যায়! অনেক স্থলে ছেলেমানুষি এতদূর গড়াইয়াছে যে দেখিয়া অবাক হইতে হয়! দৃষ্টান্তস্বরূপ "শনিবারের বারবেলা" কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। আপনার পরিচয় দিতে গ্রন্থকার ধৃষ্টতার কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখেন নাই। গ্রন্থের 'মুখপত্র'টুকু উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন,—"হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য বিচারপতি অনারেবল্ ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) মহোদয়ের 'আশীর্ব্বাদ' ও বঙ্গের সেক্সপিয়ার নাট্যসম্রাট স্বর্গীয় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ভূমিকা' সম্বলিত "ভাব ও গাথা", "জ্ঞানাঞ্জন ১ম ভাগ", "জ্ঞানাঞ্জন ২য় ভাগ", "গুচ্ছ", প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা; ব্রিটিশরাজধানী লণ্ডন-নগরস্থিত গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, বৌদ্ধসমাজের একমাত্র মুখপত্র ও সমালোচন জগজ্জ্যোতিঃ-সম্পাদক শ্রীরমণী-রঞ্জন সেনগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ M. R. A. S. বিরচিত" ইত্যাদি। তাহার উপর ভূমিকায় কোথায়, কবে তিনি গলায় ফুলের মালা পরিতে পাইয়াছিলেন, সে-কথাটুকুও বাদ যায় নাই। এইটুকুই এ গ্রন্থের মৌলিক বিশেষত্ব! জানিনা, হঠাৎ গ্রন্থকার বঙ্গীয় পাঠকবর্গের উপর এ "স্তবক ও কোরক" নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, কেন! একটি কবিতায় কবি লিখিতেছেন,

"তুমি প্রেমের বাহারে এ হৃদি-সেতারে
লহরে উঠিলে বাজিয়া।
আমি জীবনে মরণে স্বপ্নে জাগরণে
রবো তুমিময় হইয়া।"

ইহার রস-বোধে হতভাগ্য আমরা বঞ্চিত! তাহার উপর একটা জিনিস দেখিয়া অবাক হইয়াছি,—'বাজিয়া' ও 'হইয়া'র যিনি ছন্দ মেলান, তাঁহাকেও কবিতা লিখিতে হইবে! কেন?

প্রবাসীর প্রত্যাগমন। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কাব্যাকারে

লিখিত একটি সামাজিক গল্প। এ গ্রন্থের সমালোচনা করাও এক দুরূহ ব্যাপার। লেখক এক হাতে সমালোচককে বেদম পিটিয়াছেন, আবার অন্য হাতে তাঁহার শিরে অজস্র পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন। অনেক লেখক আছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ ছাপাইবার সখ আছে,—এবং সমালোচনার জন্য পত্রাদিরও দ্বারস্থ তাঁহারা হন; তবে গ্রন্থের অনুকূল সমালোচনা না হইলেই সমালোচককে একেবারে "পরশ্রীকাতর" বলিয়া গালি দেন। উচিত সমালোচনা সহিবার সামর্থ্য যাঁহাদের নাই, তাঁহারা গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য এত ব্যাকুল হন কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার দুই পাতা 'মুখবন্ধে' ঠিক এই কথাই লিখিয়াছেন। তথাপি বলিতেছি, এ কাব্যে কোন বিশেষত্ব নাই—রচনায় এমন আকর্ষণী শক্তি নাই যে আগাগোড়া ধৈর্য্য রাখিয়া কেহ পড়িতে পারে।

প্রাতিমোক্ষ ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীগৌরীপ্রসাদ স্কুল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ। কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর যখন দুই-চারিজন করিয়া লোক তাঁহার নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখন বুদ্ধদেব ইহার বহুল প্রচারের জন্য ভিক্ষুকগণকে বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে বলেন। ভিক্ষুগণও নানা দেশে ঘুরিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই পূর্ব্বে যেখানে ধর্ম্ম-সাধনায় কেবল বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত, ক্রমে সেখানে ভিক্ষুগণের অর্থাৎ সঙ্ঘেরও আশ্রয় গ্রহণ আরম্ভ হইল। ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, উত্তম, অধম, যোগ্য, অযোগ্য, অধিকারী, অনধিকারী সকলেই যখন নির্ব্বিশেষে দলে-দলে সঙ্ঘ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন নৈসর্গিক নিয়মেই মানবের স্বাভাবিক ভ্রমপ্রমাদ ঘটিতে লাগিল; তাহারা নানারূপ অকার্য্য করিয়া ফেলিত। তখন বুদ্ধদেব উপাধ্যায়ের ব্যবস্থা করিলেন—তাহা হইতেই 'বিনয়ের' সূত্রপাত। সঙ্ঘের পরিধি বাড়িলে নানা দেশের বিভিন্ন সঙ্ঘে আহার বিহার আচার ব্যবহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই নানাবিধ বিশৃঙ্খলা বাড়িতে লাগিল এবং বহুবিধ অনাচারও দেখা যাইতে লাগিল। তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব সম্বন্ধে শরীর ও বাক্যের সংযম সম্বন্ধে শিক্ষার বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—এইরূপে নব-নব নিয়ম গঠিত হইতে লাগিল। এই সকল বিধি-নিষেধই 'বিনয়' নামে প্রসিদ্ধ। 'প্রাতিমোক্ষে' এই সকল বিধি-নিষেধেরই প্রধানভূত কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ যাহাতে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্যই প্রাতিমোক্ষের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে মূল পরে তাহার বঙ্গানুবাদ বিস্তীর্ণ টীকা ও বিবিধ পরিশিষ্ট-সমেত সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। লেখক এই বঙ্গানুবাদে এমন একটু কৌতুহল সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহা অবিশেষজ্ঞ পাঠকের চিত্তকেও বেশ আকৃষ্ট করিবে। এই গ্রন্থের ভূমিকাটির বিশেষ মূল্য আছে—বৌদ্ধ সঙ্ঘাদি ও তাৎকালিক আচার-ব্যবহারের একটি সমগ্র ছবি এই ভূমিকায় সুন্দর ফুটিয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

মুরলার ভুল। শ্রীমতী অনিলবালা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, বি, এ; রায় এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৩০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি উপন্যাস। লেখিকার হাত অত্যন্ত কাঁচা; লিপি-কুশলতারও একান্ত অভাব। প্লটটিও আজগুবি ধরণের।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



অতিবিলম্ব

Indian Press—Allahabad.

By M. A. Rahman Chughtai.

ভারতী

৪১শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৪ [১০ম সংখ্যা

ছাইভস্ম

সবাই বলছে সেটা হাঙর, কিন্তু আমি বলছি না, না, না! বালি-উত্তরপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জেলেদের জালে এই যে জিনিষটা ধরা পড়েছে তা আমাদের জাহাজের লেট্-শুশুক-সভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বাহন, জীবন-শূন্য শুশুকের খালি মোষোক বই আর-কিছু হতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উচিত ছিল ভূতপূর্ব্ব সব সভ্য মিলে খুব ঘটা-কোরে লেট্-সভার শ্রাদ্ধ করা। গঙ্গায় তখন তপসী মাছ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল, এবং আমাদের মুখুয্যে-মশায় আমার খাতির ও শুশুকের প্রেতাত্মার প্রীত্যর্থে ভোজের দিনে বালি-উত্তরপাড়ায় যতরকম পটোল বাজারে আসে ও ক্ষেতে জন্মায় সব তুলে নেবার জন্যে কোমর-বেঁধে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আমার সে-প্রস্তাবটা কেউ গ্রাহ্যই কল্লেন না। আমাদের লেট্-সভার সদ্গতি হল না;—উৎপাত সুরু হল—জলে স্থলে সভার সভ্যদের উপরে, দেশে বিদেশে আমাদের কজনের উপরে উৎপাত সুরু হল। হৃষীকেশে দু'জন সাহেব, কোথাও কিছু নেই, খামকা দুটো রুই কাৎলা ছিপে ধরে মৎস্যহিংসা করে' বসলো। এতে শুশুক-সভার সমস্ত হিঁদুসভ্য বিষম ব্যথা পেলেন। এদিকে আবার আমাদের বাঁড়ুয্যে-মশায় কুটিঘাটা থেকে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত বেড়া-জাল ফেলেও আর তপসী মাছ গ্রেফ্তার করতে পাল্লেন না। সমুদ্র ছেড়ে গঙ্গার খালে তপস্যা করতে আসাটা যে মূর্খের মতো কাজ হয়েছে এটা তাদের কে যে বলে দিলে তা জানা গেল না।

তারপর, উত্তরপাড়ার মালিনীকে আমাদের মুখুয্যে অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়েও তাঁর জন্যে নিত্য পটোল তুলতে রাজি করতে পারলেন না। নিমতলার অবিনাশবাবু আমার ছেলে-

বেলার বন্ধু হয়েও আমার নামে মানহানির মকদ্দমা আনবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। অজুহাত যে আমি 'ভারতী'তে ইদানিং যে-গল্পগুলো অবিন নাম দিয়ে লিখছি সেগুলো তাঁকেই উদ্দেশ করে' গালাগালি দেবার মতলোবে ছাপানো। অবিন যে 'অবনী'রই সূক্ষ্মশরীর, আর মুখে ছাড়া লিখে গালাগালি ও লিখে ছাড়া হাতে মারামারি যে আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব নয় এটা আমি কিছুতেই অবিনাশবাবুকে বোঝাতে পাচ্ছিনে।

শেষে, এই মাসে ঘোড়ালাভ আমার কুষ্টিতে পষ্ট-করে' লেখা রয়েছে। আমাদের লীলানন্দ স্বামিজীও বল্লেন এবারের ডার্বিতে জুয়াখেলার টাকাটা কাগজের দুখানা ডানা মেলে পক্ষীরাজের মতো আমারি দিকে আস্‌ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার অশ্বমেধ পণ্ড করে ঘোড়াটা পথ-ভুলে অন্যের আস্তাবলে গিয়ে ঢুকলো!

এই সব উৎপাত দেখে আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল। আমি অবিনকে কিছু না বলে-কয়ে জাহাজ ছেড়ে একেবারে নৈমিষারণ্যের দিকে বেরিয়ে পড়লেম—"বিফল জনম, বিফল জীবন!"—একতারাতে এই গান গাইতে গাইতে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াটা কিম্বা তার ডানার একটুক্‌রো কাগজও যদি তখন—যাক্ সে দুঃখের কথায় আর কাজ নেই।

কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে সবে ডুবটি দিয়ে উঠেছি এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে হাত ধরে বল্লেন—"ব্যস্ করো বেটা, চলো হর-দোয়ারমে কুম্ভকা অস্নান্ করেঙ্গে।" কি জানি সন্ন্যাসীঠাকুরের কি শক্তি ছিল আমি জড়ভরতের মতো জল থেকে উঠে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে দেখি পায়ে ধুলো নেই! আমি তখনি বুঝলেম ঠিক লোক পেয়েছি। একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে বল্লেম—"ছলনা করছ ঠাকুর? এখান থেকে হরিদ্বার একদিন এক-রাত্তিরের পথ; আর পাঁজিতে লিখছে আজ একটা-উনপঞ্চাশে হল কুম্ভু!" সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—"বেটা, কুম্ভুকা অর্থ ক্যা আগে তো সমঝ লেও!"

ঘাট থেকে সন্ন্যাসীর আস্তানা—মণিকর্ণিকার শ্মশান—বেশিদূর হবে না; কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে ঘটাকাশ যে অর্থে ভরা—পূর্ণকুম্ভুর ঘড়ার মতো শুধু গঙ্গা-জলে ভরা নয়—সেটা ঠাকুর যেন চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যিনি ঘটাকাশ এক-নিমেষে অর্থে ভরিয়ে দিতে পারেন, আকাশকুসুমের মতো দেখালেও ডার্বি খেলার ঘড়াভরা অর্থলাভের সদুপায় যে তাঁরি দ্বারা হতে পারবে—আর কারু দ্বারা নয়—এটা আমার বিশ্বাস হলো। আমি ভক্তি-ভরে গদগদভাবে বাবার ঠিক পিছনে-পিছনে চল্লেম। কাগজের অর্থ নয়, রূপেয়া ভরা কুম্ভও নয়, চক্‌চকে আকবরি মোহরের ঢাকাই-জালা তখন আমার যেন চোখের সাম্‌নে উদয় হয়েছেন এমনি বোধ হতে লাগলো। আমি বাবাকে নির্জ্জনে আপনার মনের দুঃখু জানাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি, বাবা বোধ হয় এটা আগে থাকতেই

জানতে পেরেছিলেন, তাই আজ আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন তিনি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাশীর বাঙালি-টোলার অলিতে-গলিতে ঘিউ আর আটা ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমি জেনেছিলেম যে এবার ঠিক লোকের নাগাল পেয়েছি। সোনা করবার ভস্ম, গাছচালাবার মন্ত্র—এমনি একটা-কিছু এবার আর না হয়ে যায় না। কাজেই ক্ষিদেতে তেষ্টাতে ভিতরটা আমার শুকিয়ে উঠলেও আমার চোখকে আমি একটুও শুকোতে দিলেম না;—প্রেমাশ্রুতে বেশ করে ভিজিয়ে রেখে দিলেম।

যখন আশ্রমের দরজায়, তখন বাবা একবার আমার দিকে কটাক্ষ করে বল্লেন—"আউর ক্যা? কুম্ভু আউর উস্‌কা অর্থ তো মিল্ গিয়া। আভি ঘর যাও।" এখনো পরীক্ষা! ভাঁড়ারঘরের দরজার কাছে এনে বলা হচ্ছে ঘরে গিয়ে ভাত খাওগে! আমি খুব জোরের সঙ্গে বল্লেম—"বাবা, অমন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। আমি এইখেনে পড়ে রইলুম, কৃপা করতেই হবে। বাবার কাছ থেকে কিছু চীজ না নিয়ে আমি নড়ছিনে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার।" বাবা আমার কথার আর-কোনো জবাব না দিয়ে আটা আর ঘি মেখে রুটি সেঁকতে বসে গেলেন। আমার দিকে আর দৃক্‌পাতও কল্লেন না।

দুপুরের রোদে আমি একলা মুখ-শুকিয়ে এক গাছের তলায় বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—"বাবা, তোমার কাছে কিছু টাকা-কড়ি আছে?" কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাংলা কথা, টান-টোন সব বাঙালির মতো, কিছু বোঝার যো নেই যে তিনি পশ্চিমের খোট্টা! "পয়সা থাকলে কি আমার এমন দশা হয় বাবা!"—বলেই আমি চোখ মুছতে থাকলেম। বাবাজী তখন আমাকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন—"তাতে আর দুঃখু কি! আমি বুঝেছি, তোমাকে এই কুম্ভুমেলার দিনে একলা দশাশ্বমেধে ডুব দিতে দেখেই আমি বুঝেছি—থার্ডক্লাসের ভাড়াটা পর্য্যন্ত তোমার অভাব। তা কেঁদোনা বাবা, আমি এখনি তোমাকে কুম্ভুস্থলে পাঠাব। এই ঘটিটায় ইঁদারা থেকে একটু জল আনো তো।"

আমার তখনো মোহ কাটেনি। হরিদ্বারে কুম্ভুস্নান আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হয়, যখন কাশীতে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি হিন্দু ইউনিভারসিটির ঘড়ির কাঁটা একটা-উনপঞ্চাশে পৌঁচেছে প্রায়! যেমন এইকথা মনে করা অমনি বাবা তাঁর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটি আমার কপালে ঠেকিয়ে দিলেন। ব্যাস্ একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত! সেই পিতলের লোটাটি পর্য্যন্ত আমার হাতে হাতে হরিদ্বারে এসে হাজির! অবশ্য হরিদ্বার আমি এর পূর্ব্বে দেখিনি, কিন্তু বাবাকে দেখে যেমন বুঝে-ছিলেম ঠিক লোকটি পেয়েছি, এবারেও তেমনি বুঝলেম ঠিক জায়গাটিতে এসে পৌঁচেছি। শুধু তাই নয় মনে হ'ল যেন এইখানে আমি অনেকদিনই এসেছি; আর-পাঁচজনের মতো আমিও আজ এক-কোমর বরফ-জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গার স্তব আওড়াচ্ছি

আর থেকে-থেকে ডুব দিচ্চি। চারিদিকের লোকজন পাহাড়পর্ব্বত মন্দির-ঘাট সত্যির চেয়ে বেশি সত্যি হয়ে যেন আমার চোখে পড়তে লাগলো। এক রাজা হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর আর বন্ধ দু'তিন খানা পাল্কিশুদ্ধ আমার পাশে স্নানে নামলেন। পবিত্র জলের পরশ পেয়ে কাঠের পাল্কিগুলো বুঝি সোনার পাল্কি হয়ে যায়, আর হাতি-ঘোড়াগুলো বুঝিবা রাজা-রাজোড়া হয়ে দেখা দেয়—এই ভেবে আমি সেইদিকে চেয়ে আছি এমন সময় একটা মোটা-পেট পুলিশম্যান্ পিছন থেকে আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে—"এ বাবু, ক্যা দেখ্‌তা? ভাগো হিঁয়াসে।"

আমি পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা কুল্‌কুচি করে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি চারিদিক থেকে যেখানকার যত পাণ্ডা "হাঁ—হাঁ কল্লে কি! গঙ্গায় কুলকুচি কল্লে! সবার স্নান মাটি হল!"—বলে তাদের নামাবলীর পাগড়িতে আমায় পিছুমোড়া করে বেঁধে কিল-চাপড় মেরে আমায় আধমরা করে একটা অন্ধকার ঘরে টেনে ফেলে দিলে। তারপর কি হলো জানিনে, কতক্ষণই বা অজ্ঞান ছিলেম বলা যায় না, কিন্তু খানিক পরে চোথ-চেয়ে গায়ের ধূলো ঝাড়তে গিয়ে দেখি আমি কাশীতে। বল্লে বিশ্বাস যাবেনা, আমার গা কিন্তু তথনো ভিজে ছিল, যেন সেইমাত্র স্নান করে উঠেছি! কাশীর হিন্দু-কালেজের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে ছুটো বাজলো। একটা উনপঞ্চাশ থেকে ছুটো এরি মধ্যে হরিদ্বারে গিয়ে কুম্ভস্নান, রাজদর্শন, কুল্‌কুচি, মারখাওয়া এবং পুনরায় কাশীতে ফিরে-আসা, সমস্তটা স্বপ্নে দেখতে গেলেও এর চেয়ে ঢের সময় লাগতো যে! বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লেন—"বেটা, কুছ চোট লাগা?" আমি একেবারে গদগদস্বরে বল্লেম —"চোট লাগবে বাবা! আপনার কৃপায় একটি আঁচড়, কি একটি দাগ পর্য্যন্ত নেই দেখুন।"

এবারে আমি খুব শক্ত করে বাবার পা ধরে রইলেম। এত শক্ত যে আমাকে ছাড়িয়ে বাবার আর এক পাও নড়বার সাধ্য রইল না। ওঁর কাছে কিছু আদায় করে নেবো এই প্রতিজ্ঞা! আমার সম্বলের মধ্যে তখন বাঙালিটোলার বাসা-বাড়িখানি। আমি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও ভাড়াটেদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে বাবাকে এনে সেইখানে বসালেম। তেতালায় একখানা ছোট ঘর, তারি সাম্‌নে একটু ছাদ। সেইখানে গুরুদেবের উপদেশ-মতো আমি যোগাসন, প্রাণায়াম উৎসাহের সঙ্গে সুরু করে দিলেম। ফৌজের জমাদার, হাবেলদার, কাপ্তান, কমাঁদা—সবার যেমন রকম-রকম পোষাক, ইউনিভারসিটির নানা ডিগ্রীর যেমন রং-বেরঙের ঘাঘরা, তেমনি সন্ন্যাসীদের দলেও সিদ্ধির তারতম্য হিসেবে রকম-রকম গেরুয়া আর রকম-রকম ফ্যাসনের কৌপিন, পাগড়ি, জটা, তিলকের সাজসজ্জা আছে। আমি তখন যোগ-সাধনের ইন্‌ফেণ্ট ক্লাসে বা ইন্‌ফেন্‌ট্রি দলে সবে ভর্ত্তি হয়েছি। কাজেই আমার উর্দ্দিটা হল সাদা লুঙ্গী, সাদা পাঞ্জাবি কোর্ত্তা, মাথায় সাদা পাগ, লম্বা ল্যেজ আর সেই

ল্যেজের গোড়াতে একটুখানি গেরুয়া পাড়; হাতে বাঁশের ছড়ি, পায়ে খড়ম, গলায় তেঁতুল-বিচির মালা, কপালে ছাই। সারা পাগড়ি-কোর্ত্তা-লুঙ্গী গেরুয়া হয়ে শেষে খালি গায়ের চামড়ায় গিয়ে পৌঁছোতে আমার অনেক বাকি। আমার যিনি গুরু তিনিও অতদূর এখনো অগ্রসর হতে পারেন-নি। কিন্তু তাই বলে হতাশ হলে চলবে না। বাবার উপদেশ মতো খুব উৎসাহের সঙ্গে সবটা গেরুয়া উর্দ্দি যত শীঘ্র পারি লাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ওদিকে বাবার সেবা করতে, সন্ন্যাসী খাওয়াতে, তীর্থ সারতে আমার জেবের সব গিনি-সোনা এক মোড়ক হরিতাল-ভস্মে ক্রমে পরিণত হয়েছে। আমার হাতে সেই ভস্মটুকু দিয়ে বাবা বল্লেন—"যাও বাবা, এখন সংসারে ফিরে যাও, সেখানে তোমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।" আফিসের কাজ, ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, অনেক কাজই বাকি রেখে চলে এসেছি। কিন্তু সে যে হল অনেকদিন। কাজগুলো আমার জন্যে এখনো বসে আছে কিনা জানিনে। তাছাড়া হাতে আমার বাকি রয়েছে মাত্র সেই হরিতাল-ভস্মের মোড়ক। সেটাও সত্যি ভস্ম কিনা তারও পরীক্ষা করতে সাহস হচ্ছে না। অবিনকে তখন একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানাবার ইচ্ছে হ'ল। আমি হরিতাল-ভস্মের মোড়ক বাবার কাছে বাঁধা রেখে ডাক-টিকিটের জন্যে দুটো পয়সা চাইতে গেলুম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"বাবা, আমরা মুক্তির মন্ত্র সাধন করি, কোন-কিছু বাঁধা রাখাতো আমাদের দ্বারা হতে পারে না। সন্ন্যাসী কি কখনো মহাজন হয় বাবা?"

বাবার মধ্যে মহাজনী যে এতটুকু নেই তাই দেখে ভক্তিতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমি 'বিফল জনম, বিফল জীবন' আর-একবার মনে মনে গাইতে গাইতে বাঙালিটোলার গলি পেরিয়েছি, এমন সময় অনেকদিনের পরে অবিনের সঙ্গে দেখা।

সে ঠিক তেমনি আছে—কোনো বদল হয়নি। কথায়-কথায় জানলুম সে গয়ায় চলেছে। আমাদের জাহাজের সেই লেট্ সভার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যতরকম সভা আছে ও নেই ব্রাহ্মণশূদ্র-নির্ব্বিশেষে সব ক'টার পিণ্ডদান করতে। আমারো তখন পিণ্ডি দেবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করছিল কিন্তু কার সেটা আর বলে কাজ নেই।

গাড়িতে উঠে আমি অবিনকে বল্লেম —"ওহে গয়ার সাধুসন্ন্যাসীদের খুসি করবার মতো কিছু পকেটে এনেছো তো?" অবিন হাতের মোটা লাঠি-গাছা দেখিয়ে বল্লে—"যথেষ্ট!"

কাশী থেকে গয়া কত দূরই বা? কিন্তু সময় তো লাগছে অনেকটা!—এই ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই অবিন চট্ করে আমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একটা ঝড় হ'য়ে প্ল্যাটফরমের সব আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে একটা সাদা মোটর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেঁপু দিচ্ছিল। অবিন আমায় নিয়ে তাতে উঠে বসলো।

মোটরখানা কোনো হোটেলের ভেবে আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে আমার এ বেশে তো হোটেলে ওঠা সম্ভব হবে না। কোনো ধর্ম্ম-শালায় গিয়ে থাকলে হয়-না ?" অবিন আমার পিঠ-চাপড়ে বল্লে—"ধর্ম্মশালা থেকে অনেকদূরে এসে পড়েছি যে! এখনো বুঝি ওটার মায়া কাটাতে পার-নি ?" বলতে বল্‌তে গাড়ি একটা ব্রীজ পেরিয়ে বাঁ-হাতে মোড় নিয়ে দাঁড়ালো। অবিন গাড়ি খুলে লাফিয়ে পড়লো। আমিও নাম্‌বো এমন সময় আমার পাগড়ীর ল্যেজটা গেল মোটরের একটা চাবিতে বেধে! ল্যেজের গেরুয়া অংশ তার সঙ্গে অনেকটা সাদা ফালিও ভাড়ার উপর বখশিশ-হিসেবে গাড়োয়ানকে দিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে নদীর ঘাটে শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডদান করতে বসে গেলুম। অনেকগুলো সত্তা, পিণ্ডি তো কম দিতে হলোনা ? সব সারতে ভোর হল। শ্রাদ্ধ সেরে সূর্য্যের প্রণাম করতে গিয়ে দেখি আমাদের বড়বাজারের শ্রাদ্ধ-ঘাটে বসে আছি। সেই সিঁড়ি, সেই মার্ব্বেল-পাথর-মোড়া ঘরে তেমনি মিন্‌টান্‌ টালির বাহার! আমি তো অবাক্। সন্দেহ হলো যে হরিদ্বারে যাত্রাটার মতো এ যাত্রাটাও বুঝিবা অতিশয় সত্যি। অবিনের দিকে চাইলেম, তারও চেহারাটা কেমন ঝাপসা বোধ হল,—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখছি! কুয়াশাটা আমার মাথার ভিতরে কি বাইরে জমা হয়েছে সেটা বুঝতে না পেরে আমি কাপড় ছেড়ে ব্রহ্মতেলোয় হাত বোলাচ্ছি এমন সময় আমাদের জাহাজের বাবাজী এসে আমার সামনে "জয় সত্যনারাণ!" বলে হাত পাতলেন। আমি তাঁকে সত্যিই ষোলআনার একআনা দেব বলে জেবে হাত দিতেই আমার হাতে ঠেকল সত্যি-নারাণের কোন কাজেই যেটা লাগবে না হরিতাল-ভস্মের সেই মোড়ক—যেটা অবিনের চেয়ে, হরিদ্বারের চেয়ে, কাশী গয়া, কলকাতার মোটরগাড়ি, শ্রাদ্ধের মন্তর, বাবাজী, এমন কি আমার নিজের চেয়েও সত্যি, সত্যি, সত্যি,—সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়।

আটটা-উনপঞ্চাশের জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে পণ্টুনে লাগল। অবিন, আমি, বাবাজী এবং আরো প্রায় জন-পঞ্চাশ গিয়ে জাহাজের কেউ প্রথম, কেউ দ্বিতীয়, কেউ তৃতীয় শ্রেণী, কেউ-বা কোনো শ্রেণীই নয় দখল কল্লেম।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ত্তমান সাহিত্যে যুগ-ধর্ম্মের রূপ

চোখের সাম্‌নে এই যে জল-মাটী-আকাশ-বাতাস-আগুনে ভরা দুনিয়াখানা দেখা যাচ্ছে, এটার আপাদমস্তক যে পাঁচ-ভূতের কীর্ত্তিকলাপে বোঝাই করা, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই একরকম নিঃসংশয় হয়ে এসেছি; এখন যদি কিছু সন্দেহ থাকে তবে সে-সন্দেহ শুধু এক বিষয়ে, আর সে বিষয়টী হচ্ছে এই—"ভূতেদের কোনো বাবা

আছেন কি না?' বস্তুতঃ, আমরা মানি আর নাই মানি, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নেরই চারিদিকে আমাদের সংশয় ও বিশ্বাস দিন-রাত্রির মতন পালায় পালায় ঘুরে চলেছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে এম্‌নি একটী ধারণার ধারা অন্তঃসলিলা বইছে, যে ও-ধরণের কোনো বাবা অতীতকালে হয়তো বা ছিলেন, কিন্তু এতকালে নিশ্চয়ই সদ্গতি লাভ করেছেন। ভগবান মরে ভুত হয়েছেন কি দশচক্রে পড়ে ভুত হয়েছেন, এ অবশ্য মহাসমস্যার কথা, তবে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করে' লাভ নেই; তা ছাড়া সাদা কাগজে কালির আঁচড় পাড়তে বসেই ভগবানের নামে দোহাই পাড়াটা আজ-কালকার দিনে ঠিক দস্তুরমাফিক নয়, এমন-কি দৌর্ব্বলেরই পরিচায়ক।

ও-পরিচয় অবশ্যই আমি দিতে চাইনে; কিন্তু যে পত্তনটীর উপর মনোবিজ্ঞান তার অজস্র শাখা বিস্তার করে' দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেই 'অহং'টীকে ভূতেদের পিতৃস্থানীয় করে' দিলে আশা করি কেউ আপত্তি করবেন না। এই 'অহং'টী আমাদের অনেকের কাছেই 'অপদার্থ'-রূপে গণ্য হয়ে থাকে, কেননা পদার্থ-বিদ্যায় যাকে 'পদার্থ' বলা হয়, ও-জিনিষকে তার সংজ্ঞা-ভুক্ত করা চলে না। তবে, স্পষ্টই যখন দেখা যাচ্ছে যে ঐ অহংএর ঠেলায় এই বিশ্বজোড়া ভূতের রাজ্য চঞ্চল হয়ে উঠছে, তখন ও-বস্তুকে 'কিছু না' বলে' উড়িয়ে দেওয়াও তো যায় না!

কিন্তু সে যাই হোক্, এ-দেশের ষড়দর্শন মানুষের কল্যাণ-কামনায় যে-সমস্ত মন্ত্র আউড়ে আসছিলেন, তাকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র বলেই যদি ধরা যায় তবে সে-শ্রাদ্ধ ছিল ভূতের; অপর পক্ষে, একালের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বেরুচ্ছি তা' ভূতের শ্রাদ্ধের নিশ্চয়ই নয়, তাদের বাপেরই শ্রাদ্ধের। অহংপুরুষের পৌরুষ কারুর মাঝখান দিয়ে প্রকাশ পেতে দেখ্‌লেই আমরা যে সর্ব্বাগ্রে তার গলা টিপে ধরবার জন্যে দলবদ্ধ না হয়ে থাক্‌তে পারিনে, এ-সত্য কাগজে কাগজে এতই প্রত্যক্ষ যে তার প্রমাণ অনাবশ্যক।

কবিরা কিন্তু ঐ নবশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মহা-সমারোহময় শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যোগদান কর্‌তে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছেন, কেননা তাঁদের মতে ভূতের বাবা তাঁর গুণধর পুত্রদের উৎপাতে আত্মহত্যা করেন নি, চাপা পড়েছেন মাত্র।

শ্রাদ্ধ-সভার সভাসদরা বলছেন—'প্রমাণ কি তা'র?'

কবির উত্তর—'প্রমাণ আমি প্রাণের মধ্যে পেয়েছি। নিয়মভঙ্গটা শীঘ্র শীঘ্র সেরে মনের গলা থেকে কাছা খুলে ফেল, তোমরাও অবিলম্বে সে প্রমাণ পাবে।'

বিজ্ঞ সভাসদবর্গ বল্‌ছেন—'খবর্দ্দার, নিয়মভঙ্গ করো না; কবির কথা অবিশ্বাস্য, অতএব শ্রাদ্ধের কাল যত পারো দীর্ঘ কর।'

২

কথাটা উঠেছে 'ব্যক্তি' আর 'সমাজ' নিয়ে। ব্যক্তিগত অধিকারকে সামনে ধরে

বঙ্গসাহিত্যের একদিক থেকে যে নবমত প্রচারিত হচ্ছে, আমাদের নব-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহিত্য-কীর্ত্তি তার শুভফল-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হচ্ছে, এবং Socialism-ভক্তেরা ঐ প্রচারের রূপটীকে Individualism নাম দিয়ে নানাপ্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

সমাজ-তন্ত্রে আর ব্যক্তিতন্ত্রে যেখানে বিবাদ বাধে সেখানে ধর্ম্মতন্ত্রের সালিশি অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে, কেননা ধর্ম্ম-জিনিষটী যে কি, তাই নিয়েই যে মানুষে মানুষে মতভেদ ও বুদ্ধিভেদ অনন্যসামান্য। সামাজিকরা বলেন, যা মানুষকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাই ধর্ম্ম; আর অসামাজিকরা বলেন, মানুষকে সমাজ থেকে যা' মুক্ত করে তাই ধর্ম্ম।

মনে পড়ে, বহুকাল আগে আমাদের এই গ্রামে একবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিষম রকম দাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল,—সে-দাঙ্গার উপলক্ষ্য ছিল 'গরু'। মুসলমান-ধর্ম্মতন্ত্রে ও-জীবটীর হত্যার ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দু-ধর্ম্মতন্ত্রে তার রক্ষার বিধান আছে—এই বিশ্বাসকেই বড় করে' তুলে হিন্দু-ধার্ম্মিক ও মুসলমান-ধার্ম্মিক পরস্পরের মাথা লক্ষ্য করে' লাঠি উঁচিয়েছিলেন। দুটী প্রবল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবুদ্ধি যখন গরুর উপর ভর করে' দাঁড়ায়, তখন তা' যে গো-বুদ্ধিতেই পরিণত হয়, ঐ উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তটিই তার প্রমাণ।

এখন, যে-বুদ্ধির কথা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে পাড়া হয়েছে তা' ঠিক গরুকে না হলেও সমাজকে আশ্রয় করে' দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের নব-ধার্ম্মিকদলের ধর্ম্মবুদ্ধি ঐ জিনিষটিরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আশা-আশঙ্কার পরিচয় দিচ্ছে।

আমরা নিজেরা Socialism বা Individualism এই উভয়বিধ ismএর কোনোটীরই বিশেষ পক্ষপাতী নই—কেননা ও-দুটীরই প্রতিষ্ঠাভূমিতে যা আছে তার নাম স্বার্থপরতা। এই স্বার্থবুদ্ধির উপর যতক্ষণ মানুষ বাস করে, ততক্ষণ তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যায়; সকলের স্বার্থ এক নয়, এবং স্বার্থ কস্মিনকালেও দুনিয়া-শুদ্ধ লোকের এক হতেও পারে না—অতএব স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঐ সকল ism-বাদীর ভবিষ্যৎ রক্তরেখাঙ্কিত হতে বাধ্য।

'সমাজ' হচ্ছে সেই জিনিস, যেখানে আমরা পরস্পরের পারিবারিক স্বার্থকে যথাসম্ভব সুবিধাজনক করবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসা বা রফাছাড়ের বন্দোবস্ত করে' পাশাপাশি বাস করি, এবং Socialism হচ্ছে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ঐ জাতীয় ব্যবস্থা বন্দোবস্তের নানারকম আইন-কানুন।

Individualismএর অর্থ অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ, অর্থাৎ পরস্পরের স্বার্থ-গত আদানপ্রদানের মাঝখানে নিজের স্বার্থটাই বড় করে' দেখা—অপর কথায় "চাচা আপন বাঁচা"—এই মতবাদ।

কোন লেখক-বন্ধুর পত্রে প্রকাশ—"সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় Individualism জিনিষটা পেটের অসুখে Castor oilএরই মত"।

উক্ত উক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে যে আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটা একেবারেই আশাপ্রদ নয়, কেননা তার চতুর্দ্দিকেই স্বার্থ-বুদ্ধির পেটের অসুখ দেখা দিয়েছে। বন্ধুর ঐ রোগ নির্ণয়টুকু নির্ভুল —কিন্তু তিনি চান ও-রোগ তাড়নার জন্যে Socialismএর জয়ঢাক-শব্দে সাহিত্য-ক্ষেত্র শব্দায়মান করে' তুল্‌তে এবং সেটি একটি প্রকাণ্ড ভুল।

যে স্বার্থ-সন্ধান-চেষ্টা জনে জনে সর্ব্বনাশের কারণ, তা দলে দলে স্বীকৃত হলে যে, মানব-জগতে পৌষমাষের আরাম দেখা দেবে, এমন কথা এক পাগল ছাড়া অন্য কেউ মনে করতে পারে না। সুতরাং সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় Individualism-এর প্রচার যদি Castor oil হয়, তবে Socialismএর প্রচারও বেলের মোরব্বা হবে না।

তবে কি Individualismএর প্রচার চল্‌তেই থাক্‌বে?

উত্তর—Individualismএর প্রচার কেউ কর্চ্ছেনই না। ব্যক্তির স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য নয়, কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যই আধুনিক সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ শিখর থেকে প্রচারিত হচ্ছে, এবং বলা বাহুল্য যে 'আত্মা' বল্‌তে যা বোঝায়, তা সর্ব্বস্বার্থপারেরই বস্তু। এ প্রচারকে যদি কোনো ইংরাজী নামে ই চিহ্নিত করতে হয়, তা হলে সম্ভবত Microcosm নামটী নিতান্ত অনুপযোগী হবে না।

৩

কিন্তু প্রচারের লক্ষ্যটা যে Individualismই, এ ধারণা এক-আধজনের নয় —আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ মাষ্টার-মহাশয়েরাই এ বিষয়ে একমত, কারণ তাঁরা সকলেই Ibsen পড়েছেন। 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য' নাম কোনোখানে দেখ্‌লেই যে তাকে Ibsenism মনে করতে হবে, এমন ধারণা নিশ্চয়ই আমাদের পেয়ে বসতো না, যদি 'স্বার্থ' ও 'আত্ম' এই দুটী শব্দের স্পষ্ট ভাব-চিত্র আমাদের মানস-চক্ষের সম্মুখে থাকৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা-সাগরটা সাঁতরে পার হয়ে এলেও স্বার্থের ঠুলি আমাদের অনেকেরই চোখ থেকে খসে পড়ে না, বরং কারুর কারুর চোখে বরং বেশী করে'ই এঁটে বসে। ফলে আমাদের মাষ্টার-মহাশয়েরা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে-ভাবে বলা-কওয়া করতে থাকেন, তাতে দুনিয়ার হাঁড়ির খবর এত অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় যে নাড়ীর খবরটার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না!

এর কারণ স্পষ্ট। বর্ত্তমানে আমরা কলেজে যাই ভবিষ্যতের ভাত-কাপড়ের ভাবনায়, কিন্তু হৃদয়-মনের অনুশীলনের জন্যে ক্বচিৎ। ফলে, শিক্ষক সেজে যখন শেখা-বুলিকে লেখায় পরিণত করতে বসি তখন ঐ এক স্বার্থ-বুদ্ধির বাত-রোগকেই মানুষ থেকে সমাজে এবং বিধি থেকে বিধানান্তরে সঞ্চালিত করা ছাড়া অন্য কোনোরূপ কর্ত্তব্যের কল্পনাও করতে পারিনে!

বিশ্বের সঙ্গে দাঁতের যোগ দেহ-রক্ষার জন্যে যে অত্যাবশ্যক তাতে অবশ্যই সন্দেহ নেই, কিন্তু আঁতের যোগটাই যে গোলযোগ

এমন কথাও ঠিক নয়। প্রথমোক্ত যোগটি রক্ষা করবার জন্যে যে ফসল দরকার, তার চাষের পক্ষে মাঠের মাটীই যথেষ্ট; এ উদ্দেশ্যে মনকেও মাটী করে' সাহিত্য-ক্ষেত্রে লাঙল চালানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কিন্তু এ সত্য মানা দূরে থাক্, রস-সাহিত্যের দরটা পর্য্যন্ত সম্প্রতি আমরা দাঁতের কষ্টি-পাথরেই যাচাই করতে ব্যস্ত হয়েছি এবং দন্তস্ফুট হচ্ছে না দেখে রসিক-সম্প্রদায়কে 'বস্তুতান্ত্রিক নয়' বলে নিন্দে কর্চ্ছি।

দাঁত ওঠবার আগেও যে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আঁতের যোগ থাকে, তার প্রমাণ শিশুদের হাসি-কান্নায় ঘরে ঘরেই পাওয়া যায়; অপর পক্ষে, দাঁত পড়ে গেলেও যে ও-যোগ নষ্ট হয় না তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বুড়োবুড়ির দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকায়'। চোখের উপর এ-সব নিত্য দেখেও কেন যে আমরা মাঝখানের ঐ দন্ত-রোগটাকে এ-বিশ্বের রাজাসনে বসাতে চাই তা' বলা শক্ত। কিন্তু বসাচ্ছি যে, এ-অপবাদ অস্বীকার করে' লাভ নেই; আমাদের ঐ শিক্ষকদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা দেশশুদ্ধ লোক আজ আত্ম-চর্চ্চার ঋষিক্ষেত্রকে পাশ কাটিয়ে যত-রাজ্যির ভূতের বোঝায় কুব্জপৃষ্ঠ ও ন্যুব্জদেহ হতে চলেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিঠের বোঝা স্বজাতির পেটের মধ্যে সজোরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তারা যে হাঁসফাঁস করতে করতে 'সমাজের' খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়বে, এতে অবশ্য বিস্মিত হবার কারণ নেই। সেই

চারিদিকে যা' দেখ্‌ছি তা' আসলে ঐ সমাজেরই সেবায়েৎ, আর ধর্ম্মের নামে যা' পাচ্ছি তা' ও-বস্তুর পোষা-পুরুত ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

সাহিত্যিক বলে' সাধারণ্যে আপনাকে চালিয়ে দেবার জন্যে, অথবা ধার্ম্মিক বলে' লোকারণ্যে গণ্য হবার পক্ষে ও-পন্থার অনুসরণ যে সম্পূর্ণ নিরাপদ তাতে আর সন্দেহ কি! সমাজবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মনস্তুষ্টির জন্যে যা করা যায়, তার মস্ত সুবিধাটা এই যে তাতে লজ্জার ভয় থাকে না; কেননা, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"।

কিন্তু লজ্জাটাকে কোনমতে পাশ কাটিয়ে চলাই যে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, এমন কথা শুধু লজ্জার মাথা খেয়েই বলা চলে। তা' ছাড়া, ধর্ম্ম বা সাহিত্যের অর্থ-নির্ণয় করতে হলে সমাজের ভোটই যে দরকার, এমন কথা তাঁরাই বল্‌তে পারেন যাঁদের আস্থা মাথার চেয়ে ধড়ের উপরই বেশী। দেশের ধর্ম্ম দেশের প্রতিভা-শালীদের মধ্যে নেই—ওজনে-ভারী জন-সংখ্যায় আছে এ-কথা মানা সম্ভব হ'ত, যদি দেখতুম যে কুড়িজন শিশুর বুদ্ধি একত্র করলে একজন প্রাপ্তবয়স্কের অভিজ্ঞতার সমান হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ থেকে প্রতিভাবানদের তফাৎ করে' ধরলে শাঁসে-জলে যে প্রকাণ্ড দেহটা পাওয়া যায়, তা' কবন্ধ বই আর কি? এ হেন "সমাজ-কবন্ধের" গুণ-বর্ণনা করে' প্রবন্ধ লিখলে হাততালি দেবার লোক খুবই মেলে বটে,

হয়ে উঠ্‌লে যে মূর্ত্তিটা গড়ে ওঠে, তা' নিতান্তই 'দশানন'। এই রাক্ষস-রাজের কুড়িহাতে ধর্ম্মের নামে যে ঘট-স্থাপনা করা যায়, সে-ঘটে ধর্ম্মের দর্শনলাভ স্বভাবতঃই দুর্ঘট হয়ে ওঠে, কেননা ও-কার্য্য আসলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই ধর্ম্মঘট ছাড়া অপর-কিছু নয়।

৪

ধর্ম্মের যথার্থ আরম্ভ হচ্ছে একের 'অহং'এ, অনেকের 'গোলে-হরিবোলে' নয়। ও-বস্তু সামাজিকতাও নয়, লোক-লৌকিকতাও নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম্মের অপর একটী নাম হচ্ছে আত্মবোধ বা আপনাকে চেনা, কিন্তু সমাজের জনে জনে আমরা আত্মবিরোধই দেখতে পাই। লোক-পিছু চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে পরস্পরের মুখচেনাচেনি নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু আপনাকে চেনা অবশ্যই তাতে হয় না। আত্ম-পরিচয় নিতে গেলে নিজের মনের মধ্যে বিজনবাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, কেননা 'অহং'এর চরম বিকাশটী মনের অতিরিক্ত, অন্তর্ভুক্ত নয়; আর ঐ মনের বিদ্যাবুদ্ধিকে আত্মাধীন করে'ই আমরা আত্মপ্রবুদ্ধ হতে পারি। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহংএর বেদীতেই ঐ অগ্নি-মন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম শিখা দেখা দেয়, এবং মনের ভূতগ্রস্ত দিকটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েই বিরাট অহংএর অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আত্মস্বরূপের প্রতিষ্ঠাভূমিটী স্বচ্ছ করে' তোলে।

জীবন-ধর্ম্মে আর সাহিত্য-ধর্ম্মে যদি

আর 'প্রকাশের'। প্রথমটী যদি আত্ম-বিকাশ হয়, তবে দ্বিতীয়টী হবে আত্মপ্রকাশ। এ-কার্য্যে পরতন্ত্রতা হচ্ছে প্রতিবন্ধক এবং স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য আশ্রয়।

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত আত্ম-বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ-ধর্ম্মকে ঘোষণা করাই হচ্ছে বর্ত্তমান-সাহিত্যের যুগধর্ম্ম। কঠিন-মৃত্তিকাপৃষ্ঠ পৃথিবীর গভীর তলদেশে যে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কূপই যেমন তাকে সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করতে পারে, তেম্‌নি এই মানব-জগতের বিচিত্র চিত্ত-স্তরের গভীর তলদেশে যে অখণ্ড প্রাণের ধারা প্রবাহিত রয়েছে ব্যক্তিগত চিত্ত-বিশ্লেষণ-ফলেই তা' লভ্য হয়ে থাকে। সরোবর বা দীর্ঘিকা থেকে যেমন কূপের জল সংগৃহীত হয় না—পরন্তু খনিত সরোবর প্রভৃতিতেও কূপের উৎস-মুখেই বারিরাশি ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ব্যক্তির প্রাণ-শক্তিও সমাজ থেকে সংগৃহীত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিরই প্রাণের বেগ সমাজকে সজীব ও সবল করে' তোলে। সমাজ যত-বড় ভারী জিনিষই হোক না কেন, ধার যদি কারুর থাকে তবে সে ব্যক্তিরই আছে। অতএব, আধুনিক মানব-সমাজের কর্ণছিদ্রে যাঁরা ঐ ব্যক্তি মাহাত্ম্যের যুগধর্ম্মটী নির্দ্দেশ করতে দাঁড়িয়েছেন, সমাজ-ভারাচ্ছন্ন-সম্প্রদায়ের তিরস্কারে অবশ্যই তাঁরা বিচলিত হবেন না। যথার্থ মানব-কল্যাণের উপায়সম্বন্ধে যাঁরা বুদ্ধিমান হয়েও অবোধ, তাঁদের অপরাধকে মার্জ্জনা ও তিরস্কারকে শিরোধার্য্য না করলে এ-জগতের মধ্যে মানুষ গড়ে

সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পরিণতি-দানের চেষ্টা নিশ্চয়ই Ibsenism নয়; যদি হয়, তবে এ-দেশের সব-চেয়ে দুর্দ্দান্ত Ibsen ছিলেন বৈদিক ঋষিরা।

"হোক্ সত্য যত বড়, মিথ্যা তাহা মোর কাছে
বুঝি নাই যারে
খুঁজে লব প্রাণ হ'তে তারে"—এই মন্ত্রই হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মূলমন্ত্র, এবং তাঁরাই ও-সঙ্কল্পকে দোষের বল্‌তে পারেন যাঁরা পড়া-বুলিকে গড়া-বুলিতে পরিণত করে' তোলবার উপযুক্ত পাকযন্ত্রের অভাবে নিজেদের ঐ অভাবটাকেই সম্পদ বলে গণ্য করেন।

'আত্মা'-জিনিষটী যে নির্লিপ্ত, স্বয়ং সিদ্ধ ও স্বাধীন—এ-কথা আমরা কেতাবে পড়ি ও বক্তৃতায় ছড়াই। কিন্তু মানুষের আত্মপ্রকাশে স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রলীলা দেখ্‌লেই আমরা শিউরে উঠে বলাবলি করি—"সর্ব্বনাশ হল, উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ ভাস্‌লো!" শৃঙ্খলের অর্থাৎ শিকলির উর্দ্ধে গেলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে, এই ক্ষুদ্র আশঙ্কায় চিরন্তন শৃঙ্খলাকে আর আমরা তফাৎ করে' রাখবো না—কেননা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, মানুষের ঘরগড়া শৃঙ্খল এই চমৎকার বিশ্ব-শৃঙ্খলার কাছে কিছুই নয়। ঋতুর পর ঋতু, জন্মের পরে মৃত্যু, রাত্রির পরে দিন আমাদের হাতে-গড়া জীর্ণ-নীতির প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে' পরমানন্দে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে এবং আমাদের ক্ষুদ্র ভয় ও তুচ্ছ দ্বিধাকে ব্যঙ্গ করে' involuntary দেহ-যন্ত্রগুলিরও আড়াল থেকে প্রাণ তার আপন নিয়মকে প্রকাশ কর্‌ছে।

প্রাণের এই সর্ব্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাভূমিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ-বর্জ্জন করাতেই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অহংএর যথার্থ আত্মপ্রতিষ্ঠা, কেননা স্বার্থ-স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জন আর আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-অর্জ্জন একই কথা। গোবিন্দকে যদি নমস্কার করতে হয় তবে সে এইখানে—এই স্বাতন্ত্র্যের অর্জ্জন-ক্ষেত্রে। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' কর্‌লে সামাজিক যজমানের চোখে ধুলো দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মৃতের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে মোহপ্রাপ্ত হলে প্রাণের শঙ্খধ্বনি শোনবার কানটাও নিশ্চয় বধির হয়ে উঠবে।

৫

আমাদের শিক্ষার প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে extreme nagativeকে অনায়াসেই আমরা extreme positive বলে ভুল করে' ফেলি, এবং তা' এই কারণে যে, ও-দুয়ের চেহারা প্রায় একই রকম। আলোকের কম্পন যখন মৃদুতম, তখন আমরা চোখে অন্ধকার দেখি,—যখন দ্রুততম, তখনও কাণা হয়ে থাকি। শব্দ-সম্বন্ধেও অবস্থা ঠিক ঐ একই রকম; অর্থাৎ ও-বস্তু যখন অতি-ক্ষীণ তখনও আমরা শুনতে পাইনে—আর যখন অতি-উচ্চ তখনও কালা হয়ে থাকি।

আধুনিক শব্দ-শিল্পীদের মধ্যে যে দু'একটী প্রবলকণ্ঠ দেশের লোকের মনের কান কালা করে' দিচ্ছে তা' এই শেষোক্ত কারণে। তবু, ভরসার কথা এই যে ও-শব্দ অবিলম্বেই দেশ শুনতে

পাবে,—এমন-কি, অনেকে ইতিমধ্যে পেয়েছেনও।

কিছুকাল আগে আমাদের ধারণা ছিল যে বিশ্বের জঞ্জালের দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে' দিতে পারাই ভগবানের নিকটতর হবার উপায়—তাই কেন্দ্রটীকে নিজের বাইরে ধরে' এগুতে চাইছিলুম। আজ একটা দম্‌কা-হাওয়ার বিপরীত ধাক্কায় অকস্মাৎ সে দিকটা ঘুরে গিয়েছে—তাই যুগ-ধর্ম্মের মুখে নূতন এক মন্ত্রশক্তি বাণীময় হয়ে বল্‌ছে—"রোগটা ঠিক ঐ বটে, তবে চিকিৎসার পন্থাটা হচ্ছিল ভুল; মনকে বিশ্বে বিক্ষিপ্ত না করে' বিশ্বকে মনে সংক্ষিপ্ত করতে থাক,—ভগবানের নিকটতর হবার চেষ্টা ছেড়ে ভগবানকে নিকটতর কর্‌বার সাধনায় লেগে যাও, কেননা তাতেই যাবতীয় অন্যমনস্কতা আত্মমনস্কতায় পরিণত হবে।

জীবনের পরিপূর্ণতা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো সুদূর-পারের কেন্দ্র থেকে আমাদের ডাক পাড়ছে না—আমাদেরই অভ্যন্তর থেকে বাইরের পরিধিটাকে সে কাঁপাচ্ছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুটী আদি-অন্তহারা সমান্তরাল সরল রেখারই মতন বৃত্তাকার।

বিশ্ববস্তুকে মানস-লোকে আকর্ষণ এবং মনের ছাপ্ লাগিয়ে লাগিয়ে অভিনব রস-মূর্ত্তিতে বিশ্বপথে বিকর্ষণ—এরই নাম হচ্ছে ব্যক্তিগত সাহিত্য-সাধনা এবং এই জাতীয় আত্মপ্রকাশ থেকেই সাহিত্য-সাধকদের জীবন-পদ্ম ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলতে পারবে; কিন্তু পরের মুখে ঝাল খেয়ে কাগজের পাতায় 'গোটা নাল' ভেঙে চলাতে নয়।

সকলেই যদি পরস্পরের মনের কথা বল্‌তে আরম্ভ করি, তা' হলেই আদানে-প্রদানে উচ্চ থেকে উচ্চতর ছাঁচে মনকে ঢালা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে—অতএব ব্যক্তিগত ভাবে স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন বিচার-চিত্র অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত-জীবনের এই সত্য-পরীক্ষা-গ্রহণ-ব্যাপারকে যাঁরা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চান্, তাঁরা মানব-কল্যাণের সহায় নন। একমাত্র বিচারের সর্ষে-পড়া প্রয়োগেই অহংএর ঘাড়ের ভূত তার পদানত হতে পারে, অন্য কোন উপায়েই নয়।

কিন্তু আমাদের Ibsen-ভীতিগ্রস্ত জনৈক প্রফেসার-লেখকের একটী উক্তি উদ্ধৃত করে' একজাতীয় চিত্ত-রোগের বীজটা দেখিয়ে দিচ্ছি—

"তবে কি বেদান্তের 'অভয়ের কথা' আমার চরমতম চিরন্তন সত্য? কে জানে! হয়তো যাহা জ্ঞানের' অনধিগম্য তাহাকে 'ভক্তি'তে লাভ করা যায়।"

'জ্ঞান' আর 'ভক্তি' যে দুটী পরস্পর-বিযুক্ত জিনিস, এ-ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু আসলে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগের মধ্যে একেবারেই গোলযোগ নেই, কেননা ও-তিনটীই পরস্পরসাপেক্ষ, এবং মনেরই তিনটী বিভিন্ন অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। 'ভক্তি' বল্‌তে যা' বোঝায় তা' কোনো-কিছু লাভের উপায় নয়—পরন্তু ঐ জিনিষই হচ্ছে লভ্য ফল।

'মন' বল্‌তে আমরা যে চঞ্চল ও তরল পদার্থটীকে বুঝি, 'ভক্তি' বল্‌তে সেই

একই পদার্থের স্থির ও প্রগাঢ় অবস্থাকে বোঝায়। 'বুদ্ধি' বা বিবেক বল্‌তে যে জিনিষটী বুঝি তা ঐ মনকে জ্বাল দেবার অগ্নি ছাড়া আর কিছুই নয়—আর 'ক্রিয়া' হচ্ছে সেই জিনিষ যা' ঐ বুদ্ধির উত্তাপে মন-পদার্থে দেখা দেয়। 'মন'-জিনিষটীর প্রাথমিক ধর্ম্ম হচ্ছে তারল্য—আমাদের হৃদয়ের বিচিত্র বৃত্তি সত্যসত্যই পৃথক পৃথক বিভাগ নয়, আমাদের স্বায়ত্ব না হওয়া পর্য্যন্ত ও-জিনিষ তরলপদার্থের ধর্ম্মানুসারে যখন যা সাম্‌নে পায় তারই আকার ধারণা করে বলেই তা বিচ্ছিন্ন দেখায় মাত্র—বিচারের উত্তাপে ক্রিয়াশীল হ'তে হ'তে 'মন' যখন চরম-স্পন্দনে উপনীত হয়ে অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ হয় তখনই তা ভক্তের ভাব ও ভক্তি-পরিণাম লাভ করে।

মনোবৃত্তি হচ্ছে instinctive, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীতেই এ-জিনিষ আছে। Argument হচ্ছে ঐ instinctএর দ্বিতীয় অবস্থা, এবং পশুধর্ম্মজয়ী মানুষের মধ্যেই তা দেখা দেয়। Inspiration হচ্ছে ঐ বিচার-সমুদ্রপারের আত্মপ্রতিষ্ঠ অবস্থা আর এই inspiration যাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁরাই ভক্ত। যথার্থ কবিই হচ্ছেন একমাত্র ভক্তিযোগী, 'দর্শন' তাঁদের দৃষ্টির ভিত্তিতে তো আছেই, তা' ছাড়া আরও এমন-কিছু আছে যা' দার্শনিকের দৃষ্টিতে নেই; ভক্তিই হচ্ছে ঐ অতিরিক্ত কিছু। এই বস্তুই সর্ব্ববিচারের উপর লব্ধজয় নিত্যরস, অপরকথায় আত্মানন্দ।

ভক্তি দুর্ব্বলের ছল নয়, বিচার-বুদ্ধি-হীনের অন্ধতা নয়—ঐ বস্তুই দিব্য-চক্ষু এবং ঐ বস্তুই আপন নির্ভীক ও সতেজ, নিঃসংশয় ও অপরাহত-পরাক্রম প্রেরণ-শক্তিবলে সেই সমস্ত দুর্ব্বলের অজস্র বিরুদ্ধতা অবাধেই অতিক্রম করে' চলে যেতে পারে, যাঁরা নাকি 'অভয়ের কথা'র দোহাইটাও 'সভয়ে' না পেড়ে থাকতে পারেন না।

শুধু 'অভয়ের কথা' কেন, এ-দুনিয়ার কোনো কথাই সত্য নয়; সত্য যা তা' ঐ 'অভয়'; সত্য যা, তা' সেই শক্তি ও দীপ্তি, অশ্রু ও হাস্য, নির্ভীকতা ও দৃঢ়বিশ্বাস, আনন্দ ও সরসতা—এক কথায় সেই প্রচণ্ডবেগ প্রেরণশক্তি যা কথার আড়ালটিকে আলোকিত করে' তোলে।

বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই প্রেরণ-শক্তির উদ্বোধন-গান সহস্রকণ্ঠে গায়িতে দাঁড়িয়েছে। এ-সঙ্গীতে সমাজধর্ম্ম বা দেশধর্ম্ম, মানবধর্ম্ম বা বিশ্বধর্ম্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু গঠিত হবে। ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই সমাজ, অতএব ব্যক্তিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সমাজ-ধর্ম্মকে ঐক্যপ্রতিষ্ঠ করবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই দেশ, সুতরাং ব্যক্তিগত আত্মবোধই দেশাত্মবোধে সত্য-প্রতিষ্ঠা পাবে—ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই মানবজগৎ, অতএব ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন লাভই বিশ্বমানবধর্ম্মে জয়ধ্বনি অর্জ্জন করবে।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

আলেয়ার আলো

ছাব্বিশ

মোহনের কথা

হায় রে জীবন-সুরার তিক্তরস! ঐযে তোমার বিরাট পাত্রের মত বিশাল গগন এই বিচিত্র জগতের উপরে অনন্ত কাল ধরে উপুড় হয়ে আছে, ঐ দিগন্তব্যাপী সুরাপাত্র থেকে যে বিষাক্ত রসের বিস্বাদ ধারা বিশ্বের মুখে দিবারাত্র ঝরে পড়ছে আর পড়ছে,—কেন আমরা তৃষিত কণ্ঠে উন্মুখ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছি—কেন আমরা বুঝছি না যে, ঐ ক্ষণিক, তরল গরল-ধারার মত্ততা ক্ষণপ্রভার মতই ক্ষণস্থায়ী? দীন, ক্ষুদ্র মানব আমরা,—আমরা সুধু অন্ধ নই,—আমাদের অনুভূতিও নেই, আমাদের এই বাহিরের জীবন, ভিতরের প্রচ্ছন্ন অসাড় জড়তার তুচ্ছ আবরণ-মাত্র!

জানিনা, এ জীবনটা কি? এর একদিকে সুখের রাগিনী, হাসির ফোয়ারা, আনন্দের নন্দন; আর-একদিকে দুঃখের হাহাকার, কান্নার অশ্রু, দুর্ভাগ্যের দাবদাহ; এরই মাঝে এই যে ভঙ্গুর মানব-জীবন অসহায় হয়ে পড়ে আছে, কী এর সার্থকতা? মানুষ নিয়ে এই যে গড়া আর ভাঙ্গার, ভাঙ্গা আর গড়ার চিরকাল-ব্যাপী অকারণ খেলা, স্রষ্টার কোন্ মহৎ, বিরাট, দুর্ব্বোধ উদ্দেশ্য এর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে?

এ বিশ্বখেলার যিনি নিষ্ঠুর ক্রীড়ক, তাঁর অদৃশ্য হস্ত জীবনের পিছনে মরণকে, যৌবনের পিছনে জরাকে, সুখের পিছনে দুঃখকে কখন্ পাঠিয়ে দেয় কেউ টের পায় না, তারা গুপ্তঘাতকের মত চুপিচুপি এসে ফুলশয্যায় চিতাভস্ম ছড়িয়ে দিয়ে যায়—আর, দুনিয়ার মালিক হয়ে তিনি বসে বসে অটলভাবে তাই দেখেন! তিনি ত কাঁদেন না—তিনি ত কাঁদেন না! 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য',—এ-কথা বলেছে কোন্ অবোধ? আশার আলেয়া দেখিয়ে যিনি দুর্ব্বল, নাচারকে নিরাশার কূপে ডুবিয়ে মারেন, তাঁকে আমি ধন্যবাদ দেব না!

একে, একে, একে ছয়মাস কেটে গেল,—নিরানন্দ, অন্ধকার, বিষাদবিস্বাদ দীর্ঘ ছয়মাস! খাই আর বিছানায় গিয়ে শুই,—কখনো ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি, কখনো জেগে দুর্ভাবনা ভাবি। বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতে সাধ যায় না—পৃথিবীর লোকজন, চেঁচামেচি, হাসি আর গান, এ-সব আমার প্রাণকে যেন হৃদয়ের মাঝে মূর্চ্ছিত করে' দেয়।

সরমার কথা মনে হচ্ছে। স্বামীকে সে ফিরিয়ে পেয়েছে—কিন্তু সে স্বামী তাকে ভালবাসে না। তার দুঃখের কথা ভাবলে আমার দুঃখ কত ছোট হয়ে যায়! সরমার মন ত আমি জানি! সে আমাকে ... ...

এই মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে,

অত্যাচারী, প্রেমহীন, কুচরিত্র পতির সংসারে তাকে দিনরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে। শুষ্ক সাগরের তাতল বালুগর্ভে একটি ফুটন্ত কুসুমের মত সরমা এখন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে! সরমা, সরমা, দুঃখের উপরে দুঃখ সইতে কেন তুমি আমার পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে? তোমার এ দুর্ভাগ্যের জন্যে হয়ত আমিই দায়ী, আমিই দায়ী!

যমুনার হাত দিয়ে সরমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম; এখানি তার যাবার দিনে লেখা।

আজ সন্ধ্যাবেলায় চিঠিখানি বার করে' আবার পড়লুম। সরমার আপন হাতে লেখা এই ক-টি লাইন ছাড়া তার আর-কোন স্মৃতিচিহ্ন ত' আমার কাছে নেই! লিখতে লিখতে সরমা যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে, এ পত্রের ছত্রে ছত্রে—অস্পষ্ট লেখায় তারই স্পষ্ট ছাপ্ রয়েছে! তার অশ্রুজলে অভিষিক্ত এই লিপি আজ আমার মর্ম্মের অন্দরে যেন তারই হারিয়ে-যাওয়া স্পর্শটুকু আবার ফিরিয়ে আনছে!

সরমা লিখেছে:—

"মোহনবাবু,

অভাগীকে ভুলে যান। আমার ক্ষুদ্র জীবন আপনার যোগ্য নয়,—ভগবান তাই আমাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে দিলেন। এতদিন আপনার আশ্রয়ে ছিলুম, আপনার মহত্বের ঋণ আমি কখনো শুধতে পারব না—আপনি আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

আশীর্ব্বাদ করুন, স্বামীর সংসারে গিয়ে আমি যেন আপনাকে ভুলতে পারি। এখন এর-চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার কাছে আর ত কিছুই নেই!

সরমা।"

সরমা আমাকে ভুলতে চায়! কিন্তু আমি? আমি কখনো তাকে ভুলতে পারব কি? জানি, তার কথা ভাবাও আমার পাপ—কিন্তু এ পাপ সমস্ত নিষেধ ঠেলে আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে' থাকবে যে! এ পাপই যে এখন আমার একমাত্র আনন্দ!

সরমা হয়ত এতদিনে আমাকে ভুলতে পেরেছে! নইলে আজ-পর্য্যন্ত তার কোন খবর পেলুম না কেন?

আচ্ছা, সে ভাল আছে ত? যাবার সময় তাদের বাড়ী যেমন তালাবন্ধ করে' গিয়েছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে। সে বাড়ীতে তার জিনিসপত্তর পড়ে রয়েছে—কৈ, সে-সব নিতেও ত কেউ আসে-নি! তাই ত, সরমার অসুখ করে-নি?

সেদিন সরমার জন্যে মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠল! খালি মনে হোতে লাগল, সরমা ভাল নেই—সরমা ভাল নেই! হয় তার অসুখ করেছে, নয় স্বামীর সঙ্গে সে কলকাতা ছেড়ে গেছে।

আচ্ছা, তার ঠিকানা আমি ত জানি, একবার খোঁজ নিয়ে এলেই ত হয়! আমার খবর নেয়-নি বলে সরমাকে আমি দুষছি—কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক, তায় পরাধীন। বরং এতদিনে তার কোন

খবর না-নেওয়া আমার পক্ষেই অনুচিত হয়েছে !

তখনি কাপড়-জামা পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম ! তারপর শ্যামবাজারের দিকে অগ্রসর হলুম।

খুজতে-খুজতে যখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের —নং বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাড়ীখানা ছোটখাট,—দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

সরমার স্বামীর নাম ধরে ডাকব, কি ডাকব না—তাই ভাবছি, এমনসময় পিছন থেকে জড়িতস্বরে কে বললে, "ভর্‌সন্ধ্যায় বাড়ীর সামনে এ কোন্ যোগী ভিখারীর মূর্ত্তি বাবা !"

ফিরে দেখলুম, একটা লোক রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে; নিশ্চয় মাতাল !

আমার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে সে বলতে লাগল, "কি বাবা, তুমি কি মূকবধির-বিদ্যালয় থেকে আস্‌ছ ? কথাও জাননা, শুনতেও পাও-না ?"

কোথাকার কে এক মাতাল ! বিরক্ত স্বরে বললুম, "যান মশাই যান, ভাল আপদ !"

—"এযে বেজায় বেতর বেতালা বেসুরো আওয়াজ দিচ্ছ বাবা ! আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই গরমা-গরম্ বুলি শোনাচ্ছ, এযে দেখছি ভয়ঙ্কর মিলিটারি-মেজাজ !"

আমি সচমকে বললুম, "এটা কি আপনার বাড়ী ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পথে এস ! মদ খেয়েচি বলে যে নিজের বাড়ীর ঠিকানা ভুলে যাব, আমাকে এমন বেহুঁস্ মাতাল পাওনি হে !"

—"মাফ করবেন মশাই, আমি ভেবেছিলুম এটা সুরেনবাবুর বাড়ী।"

—"অধীনের দণ্ডবৎ নাও মাণিক ! বাড়ী চিনেছ আর বাড়ীর মালিককে চেন না, এতে যে নেশা চটে যাচ্ছে বাছা ! বোতল ভরে ঢল্‌ঢলায়মান সুধা নিয়ে সুরেনবাবু যে তোমার সামনেই টল্‌টলায়মান বাবা !"

—"অ্যাঁ, আপনি ! আপনিই সুরেন-বাবু !"

—"নাম শুনেই আঁৎকে ওঠ কেন হে ! বিশ্বাস হচ্ছে না—আমাকে সনাক্ত করবার জন্যে আবার লোক ডাকতে হবে নাকি ?"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এই সরমার স্বামী ?

—"চুপ করলে চলবে না সোনার চাঁদ ! আমার নাম ত শুনলে, এখন তোমার নামটি কি চট্‌পট বলে ফেলে দিকিন ?"

তখনি সেখান থেকে চলে আসতে ইচ্ছা হোল, এ দুর্দ্দান্ত মাতালের সঙ্গে কি কথা কব ! কিন্তু তারপরে ভাবলুম, এতটা যখন এসেছি, তখন সরমার খবরটাও অন্তত নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ভেবে বললুম, "আমার নাম মোহনলাল রায়।"

সুরেন আমার নাম শুনেই চম্‌কে উঠল। তারপরে বললে, "মো-হ-ন-লা-ল ! হুঁ, ও নাম যে চিনি ! এখানে কি দরকার হে তোমার ?"

—"আপনার স্ত্রী কেমন আছেন, তাই জানতে এসেছি।"

—"কী! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! আমি জল্‌জ্যান্ত বর্ত্তমান থাকতেই আমাকে মর্ত্তমান দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে বাবা, তাতেও তোমার সাধ মেটেনি? আবার এখানে এসেছ আমার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে! ভাগো হিঁয়াসে, জল্‌দি ভাগো!"

—"মশাই—"

—"চোপ্‌রাও পাপিষ্ঠ, চোপ্‌রাও! দেখবি মজাটা!" এই বলে সে কাপড়ের ভিতর থেকে একটা মদের বোতল বার করে' সেটা উঁচিয়ে আমাকে মারতে এল।

ভাবলুম, পশুটাকে ধরে দি ঘা-কতক বসিয়ে! কিন্তু তখনি চোখের উপরে জেগে উঠল, সরমার কাতর মুখ! মনের রাগ মনেই চেপে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে চলে এলুম।

* * * *

এ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক! এমন স্বামীর হাতে পড়ে সরমা কি আর বাঁচবে? এর-চেয়ে যে বৈধব্য ভালো! এতদিন আপন দুঃখেই ভেঙ্গে পড়েছিলুম, আজ কিন্তু সরমার দুঃখের কথা ভেবে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল! ওঃ, সেই ফুলের মত বিমল, শিশুর মত সরল, দেবীর মত সুন্দরী সরমা, তার কপালে এই ছিল!

বাইরে, কয়লার চেয়ে কালো, নিবিড় মেঘের বুক চিরেচিরে ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুতের তীব্র অগ্নিস্রোত বয়ে যাচ্ছে,—ঘনঘন বাজ ডাকছে, আর মনে হচ্ছে যেন বিরাট আকাশের বুকের উপর দিয়ে একটা বিশাল অদৃশ্য গোলা গড়্‌গড়্‌ শব্দে এ-কোণ-থেকে-ও-কোণ পর্য্যন্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে।

এই দুর্য্যোগে সরমা কি করছে? ঘরে তার মাতাল স্বামী, প্রাণে তার জ্বলন্ত আগুন, সে কি এখন ঘরের কোণে বসে গুম্‌রে-গুম্‌রে কেঁদে মরছে? সুরেনের আজ যে-অবস্থা দেখে এসেছি, আজ কি সে সরমাকে ঘুমুতে দেবে?

খোলা জানলা দিয়ে হঠাৎ সরমাদের খালিবাড়ীর দিকে চোখ পড়ল। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের জানলার উপরে আমার ঘরের আলোটা গিয়ে পড়েছে; সচকিতে দেখলুম, সরমার ঘরের জানলাটা খোলা! সে গিয়ে-পর্য্যন্ত জানলাটা বরাবরই বন্ধ দেখে আসছি—আজ কিন্তু এ কি ব্যাপার! জানলাটা কি ঝড়ের ঝাপটে আপনি খুলে গেল?

আশ্চর্য্য হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় দপ্‌দপ্‌ করে' দু-তিনবার বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠল। সরমার অন্ধকার-ঘরের একদিক থেকে নয়—দুদিক থেকে বিদ্যুতের দীপ্তি-রেখা এসে পড়েছে! তাহলে শুধু ঐ জানলাটা নয়,—ও-ঘরের অন্যদিকের জানলা বা দরজাও খোলা আছে!

নিশ্চয় চোর এসেছে! ঘরের মধ্যে এখনো সরমার জিনিষপত্তর আছে, যদি চুরি করে? তাইত, দেখতে হোল একবার!

ছাতি ও লণ্ঠন নিয়ে বাগানের পথে সরমার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

কেউ কোথাও নেই। কিন্তু উঠান পেরিয়ে সিঁড়িতে উঠতে দেখি, সদর দরজায় ভিতর থেকে খিল দেওয়া! না, আর কোন সন্দেহ নেই—খালিবাড়ী পেয়ে নিশ্চয় কেউ বদ মত্‌লোবে ভিতরে ঢুকেছে!

চারিদিকে চাইতে-চাইতে উপরে উঠলুম। সরমা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দেখলুম, দরজাটা সত্যিই খোলা!

খুব সাবধানে ঘরের ভিতরে গেলুম। লণ্ঠনের আলোতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর—ঘরের মধ্যে চোখ পড়তেই দেখলুম, মেঝের উপরে উপুড় হয়ে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি নিথর ভাবে পড়ে রয়েছে। সে মূর্ত্তিকে চিনতে একটুও বিলম্ব হোল না—সরমা, সরমা—সে সরমা!

সরমা!… …এই নিশুতি রাত্রে, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এই শূন্য অন্ধকার বাড়ীতে, সরমা! আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না! কেন এসেছে সে,—কেন অমন-করে' ওখানে পড়ে আছে, সরমার কি হয়েছে?

ভাল করে' দেখবার জন্যে লণ্ঠনটা উপরে তুলে ধরলুম। অ্যাঁ,—ও কি ও! সরমার কাপড়ে কালো কালো ও কিসের দাগ? রক্ত!… …অ্যাঁ, রক্ত, রক্ত! তার হাতে, কাঁধেও রক্ত যে জমাট্ বেঁধে আছে! তবে কি সরমা… … …

ভয়ে আমার বুক উড়ে গেল—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল! চেঁচিয়ে উঠলুম, "সরমা, সরমা!"

সরমা আস্তেআস্তে দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বস্‌ল। আমার দিকে না-চেয়েই ক্ষীণস্বরে বললে, "মরিনি গো, মরিনি! কপাল যার পোড়া, যম তাকে পায়ে ঠেলে গো!"

আঃ, রক্ষে পাই! সরমা যে বেঁচে আছে সেটা বুঝে আমি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

অনেকক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলুম। আমি ভাবছিলুম, সরমার এমন হোল কি করে'? সরমা কি ভাবছিল, তা সে-ই জানে!

বাইরে তেমনি ঝমঝম জল হচ্ছিল, হুড়্‌মুড়্ বাজ্ পড়ছিল, বাগানের নড়্‌বোড়ে গাছপালাগুলো টল্‌মল করে' টলছিল—জগতে আর জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। ঘরের ভিতরে আমি তখনো স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে,—আর, সুমুখে আমার প্রাণের প্রতিমা রক্তে রাঙ্গা হয়ে লুটিয়ে আছে! কী দৃশ্য! জীবনের সে মুহূর্ত্ত, অনন্ত মুহূর্ত্ত,—আমার মর্ম্মের মধ্যে তা চিরস্থির হয়ে আছে!

হঠাৎ আমার হুঁস্ হোল! এমন দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না—সরমা যে মারা পড়বে! তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললুম, "সরমা, এ তোমার কি হয়েছে, তোমার গায়ে এত রক্ত!"

সরমার মুখের উপরে একরাশ এলো ভিজে চুল এসে পড়েছিল—দুহাতে সেগুলো সরিয়ে সে আমার দিকে মুখ তুলে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে! এই ক-মাসে তার

চেহারা কি ভয়ানক বদলে গেছে—এ যে মরা-মানুষের মুখ! তেমনি সাদা—তেমনি ভাবহীন! আমার গা-হাত-পা শিউরে-শিউরে উঠতে লাগল!

সরমা বললে, "এত রক্ত কেন, এত রক্ত কেন? এ আমার অদৃষ্টের দান—আমার স্বামীসেবার পুরস্কার!"—যে স্বরে সরমা কথা কইলে, তেমন স্বর তার কণ্ঠে এই প্রথম শুনলুম!

দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে' বললুম, "কী! সুরেন তোমার এ দশা করেছে? সে তোমার গায়ে হাত তুলেছে?—দেখে নেব, আমি দেখে নেব তাকে!"

—"মোহনবাবু, নারীর যা পাবার আমি তা পেয়েছি! আমরা যে দুর্ব্বল, আমরা যে পুরুষের দাসী!"

—"সরমা, তোমার কি হয়েছে আমাকে বল!"

—"সে দুঃখের কথা কি হবে শুনে?"

—"না, বল, বল!"

সরমা খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে তার হতভাগ্য জীবনের যে কাহিনী আমাকে সে শোনালে, তা যেমন করুণ, তেমনি ভীষণ! শুনতে-শুনতে মনে হোতে লাগল, আমার বুকের হাড়গুলো যেন এক-একখানা করে' খসেখসে পড়ছে!

সংক্ষেপে তার কথা বলে সরমা চুপ করলে—আমিও মৌন হয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

আবার মনে পড়ল, সরমা আহত। তাড়াতাড়ি বললুম,—"সরমা, আমি কি নির্দ্দয়! তোমার এই অবস্থা দেখেও হাত-গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! তোমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে,—না? দেখি তোমার কোথায় লেগেছে!"

—"এ দেহের যাতনার চেয়ে যে মনের যাতনা অনেক বেশী! আমার কি হবে মোহনবাবু, আমি কি করব!"

—"কেন সরমা, তুমি এখানে যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে!"

—"তা হয় না। যে দিন যায়, আর ফেরে না।"

—"কেন ফিরবে না সরমা! সেই তুমি, সেই আমি, সেই সবই ত তেমনি রয়েছে!"

—"না মোহনবাবু, আমার আর সে জীবন নেই—আমি এখন নতুন মানুষ হয়েছি।"

—"কিন্তু আমার চোখে ত তুমি নতুন মানুষ নও—তুমি যে আমার সেই পুরাণো সরমা!"

—"সে মরেছে। মোহনবাবু, ভুল করবেন না—ও ভুলকেই আমি সব-চেয়ে ভয় করি, ঐ ভুলের জন্যেই এখানে আমার থাকা অসম্ভব।"

—"তবে তুমি কোথায় যাবে?"

—"জানিনা। হয়ত স্বামীর কাছে ফিরে যাব। হয়ত পৃথিবীর বাইরে একটু ঠাঁই খুঁজে নেব। সে সাহস যদি না-হয় তবে আর-কোন উপায় আছে কিনা, দেখব।"

—"একি বলছ সরমা!"

—"হ্যাঁ, হৃদয়কে বিশ্বাস করি না!"

—"তোমার হৃদয় অবিশ্বাসী হবে না সরমা,—আমি তোমাকে জানি।"

—"কিন্তু সমাজ তা বিশ্বাস করবে না, সমাজের অত্যাচার আমিও আর সইতে পারব না। তখন যে ভরসায় লোকের কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি, সে ভরসা আজ কোথায়! মনের সঙ্গে আমি আর ত একলা যুঝতে পারব-না!"

—"তবে এলে কেন? এসে যদি চলেই যাবে, তবে—"

—"চুপ করুন মোহনবাবু, চুপ করুন! এ উচ্ছ্বাসের সময় নয়! আর আমাকে মজাবেন না, আপনি কাতর হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

—"বল।"

—"মোহনবাবু, আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করেছি! জানবেন, এই কথার উপরে আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"—

আমি কোন উত্তর দিলুম না! সরমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ-চোখের এমন অস্বাভাবিক ভাব, এর-আগে আমি আর-কখনো লক্ষ্য করিনি!

আমার চোখের উপরে তার সেই স্থির-বিদ্যুতের মত জলন্ত দৃষ্টি রেখে, সরমা দৃঢ়স্বরে বললে, "মোহনবাবু, বলুন আমাকে ভুলবেন, বলুন আপনি বিবাহ করবেন!"

—"বিবাহ করব, বিবাহ?"

—"হ্যাঁ, বিবাহ!"

—"সরমা, সরমা!"

—"আপনি যদি বিবাহ করেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারি! আমার জন্যে কেন আপনার জীবন নষ্ট করবেন? আপনার প্রেমে আর-একটি জীবন সফল হবে, তার প্রেমে আপনার সকল অভাব পূর্ণ হবে।"

—"সরমা, আমায় ক্ষমা কর!"

—"মোহনবাবু, আমার কথা রাখুন!"

সরমার নির্দ্দয় কথা শুনে আমার চোখে জল এল! সকাতরে বললুম, "তুমি আমার কথা ভেবে দেখ, আমার মনটা বোঝ, আমার উপর দয়া কর!"

সরমার চোখ আবার জলে উঠল। তীব্রস্বরে সে বললে, "দয়া করব,—আপনার উপরে দয়া করব! আমার কি সে অধিকার আছে মোহনবাবু! এখন বুঝছি, ভুল করে আমি এখানে এসেছি! চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আপনার এই বাড়ী তেমনি করে আমাকে টেনে এনেছে—আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে এসেছি, কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারি-নি—আপনাকে সামলাতে পারি-নি! যে বাড়ীর এত মোহ, সেখানে থাকলে আমি মরব—আমি মরব! তখন মনের ঝোঁকে যা বুঝিনি, এখন তা ভাল করেই বুঝতে পারছি! মোহনবাবু, আপনি যখন আমাকে ভুলতে পারবেন না, তখন আর-কি আমার এখানে থাকা উচিত? বলুন, আপনিই বলুন!"

—"সরমা—"

—"মোহনবাবু, কথা রাখুন—আমাকে বাঁচান!"

—"সরমা, এর-চেয়ে তুমি আমাকে প্রাণদণ্ড দাও—সেও আমার সুখের হবে!

কিন্তু, এই প্রাণ নিয়ে আবার বিবাহ-করা —বেঁচে মরে থাকা? ওঃ, সে হয়না সরমা, সে হয় না!"

সরমা আমার দিকে দু পা এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি তাহলে আমার কথা রাখবেন না?"

—"তোমার আর সব কথা রাখতে পারি, কিন্তু ও-কথা রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব!"

—"অসম্ভব?"

—"হ্যাঁ, অসম্ভব—অসম্ভব!"—এই বলে আমি সকাতরে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেললুম,—সরমার সে কঠিন দৃষ্টির সামনে আমি আর মুখ তুলতে পারছিলুম না।

সরমা একেবারে চুপ হয়ে গেল।

এমনি ভাবে কয়মুহূর্ত্ত মৃত্যুর মত একটা দুঃসহ নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। তারপর আমি বললুম, "সরমা, আমার উপরে তুমি রাগ কোরো না। বিবাহ করতে বলছ,—কিন্তু বিবাহ করলেই আমি কি তোমাকে ভুলতে পারব? তা যখন পারব না, তখন আমার দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে মিছামিছি আর-একটা জীবনকে নষ্ট করে লাভ কি বল?"

সরমা সাড়া দিলে না।

আস্তে-আস্তে মুখ তুললুম। ঘরের ভিতরে সরমা নেই!

বাইরে আকাশে তখনো অন্ধকার, বাজ তখনো গজ্‌রাচ্ছে, বিদ্যুৎ তখনো অগ্নিবাণ হানছে, বৃষ্টি তখনো সৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সরমা কোথায়? তাড়াতাড়ি আলোটা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ব্যাকুল চোখে দেখলুম, সদর দরজাটা খোলা!

সরমা কি আমার উপর রাগ করে' আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেল? আমার মন যেন বলে উঠল না, না, না!

তবে? তবে কি ... ...

সে কথা মনে হবা-মাত্র আমি তীরের মত উপর থেকে নেমে রাস্তায় গিয়ে পড়লুম!

পথ দিয়ে কল্‌কল্ করে' জলস্রোত ছুটে চলেছে—যতদূর দেখা যায়, কোথাও জনপ্রাণী নেই!

তাইত, কি করি—কোথা যাই, সরমা কোন্‌দিকে গেছে? এর-মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেল? আমার গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই কি প্রাণপণে সে ছুটে পালিয়েছে?

এ-পথের এদিকটা গেছে সোজা গঙ্গামুখে। পাগলের মত ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অনেক ছুটেও অনেকদূর গিয়েও সরমাকে দেখতে পেলুম না! তবুও ছুটছি আর ছুট্‌ছি!

এই ত গঙ্গার ধার! কৈ, কোথায় সরমা? ঝক্‌মকে বিদ্যুতের লক্‌লকে শিখায় গঙ্গার মেঘবর্ণ জল যেন জ্বলে-জ্বলে টগ্‌বগিয়ে ফুটে উঠছে,—তরঙ্গের পর তরঙ্গ অজগরের মত ফণা তুলে পাকিয়ে-পাকিয়ে ফোঁশ্‌ফোঁশিয়ে ছুটে চলেছে—ও জলস্রোত, না মৃত্যুস্রোত?

বিদীর্ণস্বরে ডাকলুম, "সরমা! সরমা! সরমা!"

ও-পার থেকে প্রতিধ্বনি টিটকিরি দিয়ে উঠল!

গঙ্গার তীর ধরে আবার উন্মত্তের মত দৌড়তে লাগলুম—কানের পাশ দিয়ে বৃষ্টিশীতল উদ্দাম ঝোড়োহাওয়া হুহু হুহু করে' ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল—গঙ্গার পিছল মাটির উপরে কতবার পড়লুম, কতবার উঠলুম—কিন্তু তবু এ ছোটার বিরাম নেই!

এই ভীষণ নিশীথ তার তিমির-পক্ষ বিস্তার করে' জল-স্থল-আকাশকে আবৃত করে' ফেলেছে—এর মধ্যে আমার সরমা আজ একেবারেই বুঝি হারিয়ে গেল! এমন যে হবে, কে তা জানত! জানলে যে তখনি বলতুম, সরমা, আমি বিয়ে করব—তুমি যেওনা, তুমি যেওনা, তুমি যেওনা!

সে কি আমাকে দেখে কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে? গঙ্গার তরঙ্গ-ধ্বনি, ঝড়ের হাহাকার, বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝর্ঝরানি ডুবিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "সরমা, সরমা! ফিরে এস—আমি বিবাহ করব—তুমি ফিরে এস, ফিরে এস!"

কিন্তু সে প্রলয়োৎসবের মধ্যে কোথায় সরমা? উত্তরে বজ্রনাদে আমি যেন নিয়তির ঘন-ঘন অট্টহাস্য শুনতে পেলুম! আমার সরমাকে চুরি করে' রজনীর অন্ধকার গঙ্গার বিক্ষুব্ধ বক্ষের উপর থেকে ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আকাশের নিবিড় মেঘ ভেদ করে' ধীরে-ধীরে প্রাতঃ-সন্ধ্যার ম্লান আলোর ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠছে!

দূরে—নিমতলার শ্মশানে সহসা একটা নূতন চিতা জ্বলে উঠল—আলো-আঁধারের মধ্যে তার লেলিহান জিহ্বা যেন আমার বুকের রক্তে রাঙ্গা হয়ে কেঁপে কেঁপে ক্রমেই ঊর্দ্ধপানে উঠতে লাগল। সেইদিকে পাষাণ-নেত্রে চেয়ে হাঁটুভোর জলে,—সব-হারা কাঙ্গাল আমি, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম।

* * * *

হঠাৎ মনে হোল, সরমা হয়ত তার স্বামীর কাছেই ফিরে গেছে! তখনি সেই খোঁজে চললুম। যেতে-যেতে ভোর হয়ে গেল।

কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না-করে' একেবারে সুরেনের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

—সুরেন একটা ঘরে বসে ছিল; আমার সেই জলে-ভেজা ধুলোকাদামাখা চেহারা দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কে তুমি?"

—"আমি মোহনলাল। সরমা এখানে এসেছে?"

—"কী! তুই মোহনলাল! আবার আমার বাড়ীতে—"

—"চুপ! বেশী কথা না! বল্ সরমা কোথায়!"

—"বলব না। বেরো এখান থেকে!"

বাঘের মত তার উপরে লাফিয়ে পড়লুম! দুহাতে তার গলা টিপে ধরে বললুম, "এখন বলবি?"

—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—জানি না! সে এখানে নেই।"

—"তুই মিথ্যা বলছিস্! তুই আমার

সরমাকে খুন করেছিস্! বল্ বলছি, নইলে আমিও তোকে খুন করব!"

—"ওঃ! গেলুম—গেলুম, ছেড়ে দাও—মরে গেলুম!"

—"বল্—বল্—"

—"সত্যি জানি না! সে চলে গেছে—কাল, কাল রাত্রে!"

—"আর আসে নি? ঠিক?"

—"না, আসে নি, আসে নি! আমাকে ছাড়, আমায় খুন কোরো না!"

সে হতভাগা পশুটাকে ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলুম। সরমা!—তুমি বেঁচে আছ কি, বেঁচে নেই? ফিরে এস প্রিয়তমে, ফিরে এস,—তোমার মুখ-চেয়ে আমি বিবাহ করব—আমি, আমি— ... ...

* * *

খুঁজছি, খুঁজছি আর খুঁজছি,—কিন্তু সরমার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যেমন হঠাৎ তাকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তেমনি হঠাৎ আবার তাকে পথেই হারিয়ে ফেলেছি,—আমার সে প্রান-জুড়ানো হারামণি আজ কোথায়? আশার ছলনায় ভুলে আমি গিয়েছিলুম আলেয়ার আলো ধরতে; কিন্তু ছুঁতে-না-ছুঁতে সে আলো নিবে গেছে, নিবে গেছে গো,—মনের মাঝে জেগে আছে শুধু তার অশ্রুময়ী স্মৃতিটুকু!

লোকে বলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সংসারের ধরা-বাঁধা ধারার ভিতরে থাকতে পারি না বলেই কি সকলে আমাকে ক্ষ্যাপা ঠাউরে নিয়েছে? মনের কান্না মনেই লুকিয়ে আমি তাদের নাচ-গান-হাসিতে যোগ দিতে পারি না বলেই কি তারা আমাকে এই অপবাদ দিয়েছে! কিন্তু আমি ত পাগল নই,—পাগল যে তারাই! এই শ্মশানের ধোঁয়া-ভরা জগতে, দুঃখ-শোকের তুষানল যেখানে দিবারাত্র জ্বলছে, সেখানে যারা নাচতে-গাইতে-হাসতে পারে, তারাই কি উন্মাদ নয়? শ্মশানে এসে নাচ, গান, হাসি! এ যে নিষ্ঠুরতা! এখানে বসে কাঁদ, কাঁদ, কাঁদ,—তোমাদের অশ্রুজলে বিশ্বের তপ্ত চিতাভস্ম স্নিগ্ধ হয়ে উঠুক!... ...

ঘনঘোর বাদল-রাতে ঘরের বাইরে বাজ্ যখন আকাশ তোল্পাড় করে' তোলে, ঝম্ঝম্ বর্ষাজলে নিশীথিনী যখন আর্দ্র হয়ে ওঠে, জান্লায়-জান্লায় উতলা বাতাস যখন ধাক্কা মেরে চেঁচিয়ে মরে, তখন ঘুমুতে-ঘুমুতে এখনো আমি চমকে ধড়্মড়্ করে' উঠে বসি! তখন মনে হয় সত্যই আমি পাগল হয়ে গেছি!

কোন-কোনদিন আমি শুনতে পাই, সরমাদের পোড়ো-বাড়ীর সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে কে-যেন ক্রমাগত কড়া নাড়ছে নাড়ছে নাড়ছে, কে-যেন দূর—বহুদূরের অজ্ঞাত-লোক থেকে শ্রান্তপ্রাণে ক্লান্তচরণে ফিরে এসেছে, কে-যেন আর্ত্ত কাতর স্বরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বারংবার ডাকছে—'দরজা খোলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো গো!'

কোনদিন নিজের ঘরে বসেই দেখতে পাই, সরমার খালিঘরের দরজা-জানলা-গুলো দুম্দুম্ করে' খুলে গেল, কে-যেন একরাশ এলানো ভিজে চুল দুলিয়ে,

শোণিতাক্ত দেহে, রক্তরাঙ্গা কাপড়ে ভিতরে ঢুকে মেঝের উপরে দড়াম করে' আছড়ে পড়ল—তারপর সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-নাদের মধ্যে অন্ধকারকে স্তম্ভিত করে' ডুকরে ডুকরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুকফাটা কান্না কাঁদতে লাগল!

উঃ! সে কান্না অ·হ্‌! ছুটে গিয়ে আমি ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে' দিতে যেতুম—অমনি বিদ্যুতের তীক্ষ্ণধারে মেঘভরা আকাশ দুফাঁক হয়ে যেত—আর সেই ফাঁকে পরলোক থেকে ইহলোকে দু-হাত বাড়িয়ে মুরারিবাবু যেন বজ্রনাদে বলে উঠতেন,—'ওরে আমার মেয়ে দে, আমার মেয়ে দে—তোর ভয়েই সে পালিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে—ওরে দে রে, দে রে, আমার মেয়েকে এনে দে!'... ...

এ কী জীবন! সরমা, তোমাকে হারিয়ে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, এখন নিজের বুদ্ধিও হারাব নাকি?

* * * *

অনেকে আমাকে উপদেশ দিতে আসে—হায়রে কপাল! কেউ বলেন, বিয়ে কর, কেউ বলেন, বিদেশ ঘুরে এস, কেউ-বা বলেন, কাজ-কর্ম্মে মন দাও!

উপদেশ দেয় না খালি হরেন! সরমার কথা উঠলে সে আমার দিকে মৌনমুখে করুণ চোখে চেয়ে থাকে—সে যে আমার মরমের মরমী! আমি আপন মনে সরমার শত কথা বলে যাই, সে আমাকে বাধা দেয় না, বিরক্ত হয়ে উঠেও যায় না। বলতে-বলতে কোন-দিন আমি কেঁদে ফেলি, আর তারও চোখদুটি দরদে ভিজে ওঠে!

তার বুকে মুখ রেখে আমি ডাকি,—"বন্ধু!"

আমাকে দু-হাতে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে সেও সজল চোখে বলে, "বন্ধু!"

—"আমার সরমা কোথা গেল ভাই?"

—"যেখানে শোক-তাপ নেই। ইহলোকে যাকে হারিয়েছ ভাই, পরলোকে হয়ত তাকে খুঁজে পাবে!"

... ...সেই পরলোকের আশায় দিনের পর দিন গুনছি। কতদিন—আর কতদিন?

শেষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

যুগান্ত কাব্য নাট্য

কাব্যের দেবদেবীগণ:

শিব, শিবানী, নন্দী, ভৃঙ্গি, ইন্দ্র, যম,
লক্ষ্মী, সরস্বতী, ন্যায়, প্রেম ও
তৎপত্নী শান্তি ও করুণা।

প্রথম দৃশ্য

কৈলাসধাম

তুষারাবৃত সমুচ্চ পর্ব্বত-দৃশ্যের নিম্নে মাঝে মাঝে ঝরণ প্রবাহিত। উপত্যকা-ভূমিতলে তরুলতার মধ্যে শিবমন্দির। ঈষদুন্মুক্ত তরু-দ্বারপথে ব্যাঘ্রাজিনধারী

ধ্যানস্থ মহাদেবের মূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দর্শকদিগের নেত্রে পড়িতেছে। দ্বারদেশে এক পার্শ্বে বৃষ—অন্য পার্শ্বে সিংহমূর্ত্তি। সম্মুখের বিস্তৃত মঞ্চে ত্রিশূলধারী নন্দী ও ভৃঙ্গি কখনো স্থিরভাবে—কখনো পদচারণা পূর্ব্বক, স্তবগান গাহিতেছে। ভৃঙ্গি মাঝে মাঝে নীরবে অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছে।

গান

জয় হর শঙ্কর প্রভু পশুপতি,
জয় তারা শঙ্করা প্রকৃতি পার্ব্বতী,
লয়ঙ্কর মহাশিব, শিবাণী রক্ষেন দিব
মহেশ্বর মহামায়া—কারণ শকতি !
মহারুদ্র, বরাভয়া, দোঁহে এক সর্ব্বজয়া
অগম্য বুদ্ধি বিজ্ঞানে, ভক্ত-নেত্রে জ্যোতি।
ছত্র ধরে মহা ব্যোম নমে ইন্দ্র বায়ু যম,—
কালাকাল ছন্দে করে প্রণতি আরতি !
নমো তারা শঙ্করা রুদ্র পশুপতি।

শিবানীর প্রবেশ

নন্দী ভৃঙ্গি। নমস্তে ভবানী মাতা ;
শি। শুন বৎসগণ,
নন্দী। বলিতে হউক আজ্ঞা ;
ভৃঙ্গি। আনিব কি ধরি—
ধরা হতে বৃকাসুর কোন ? বল মাতা !
থাকিত বাঁচিয়া যদি মহিষ দানাটা
কি হইত মজাখানা ! আনিতাম ধরি
শিং ধরি হড় হড়ি, আর একবার
করিতে দলন তারে, মহিষমর্দ্দিনি।
শি। থাম বৎস, সে কথার এ নহে সময়।
নন্দি। থাম্ ভৃঙ্গি—
ভৃ। থাম্ তুই রাখ্ দাদাগিরি !
কেমনে ভুলি মা বল সুখের সেদিন!
দাও আজ্ঞা—
নন্দী। চুপ চুপ বচনবাগীশ।
ভৃঙ্গি। ঈষ্ ঈষ্ চুপ্ রব তোমার কথায় !
তুমি আজ নন্দী থাক, জাননা কে আমি ?
মায়ের আদুরে ছেলে ধিঙ্গি ভৃঙ্গিবর !
নন্দী। বক' মা একটু, করে বড় বাড়াবাড়ি।
ভৃ। মার প্রতি আজ্ঞাজারি ! দেখ স্পর্দ্ধাখানা !
কর্ত্তাদাদা হন্ যেন উনি আমাদের !
শি। স্থির হও বৎসগণ কোরোনা বিবাদ।
ভৃ। ওই ত ঝগড়া করে—কেন কথা কয় ?
যা বলি তা বলি আমি, বলেছি মায়েরে,
ওর কি তাহাতে, কেন মিছে গালি পাড়ে ?
বল মাগো দাও আজ্ঞা, লুটি ধরা বন ;
যদি ভাগ্যে মিলে যায় তেমনি ভীষণ—
লম্বিত শৃঙ্গিত গুম্ফ মহিষ একটা !—
উঃ উঃ—হো হো—হা হা—!
ন। দেখ মা জননি,
ভৃঙ্গি তব হইয়াছে বড়ই বেয়াড়া !
একটু শাসন যদি না কর উহারে
চড়িবে মাথায় কিন্তু দুই দিন পরে,
এই আমি বলে ক্ষান্ত— ;
শি। (সহাস্যে) দুর্দ্দান্ত ছেলেটী
একটু সংযত হও, শুন যাহা বলি ;
ভৃ। হইনু নির্ব্বাক্ আমি,—আজি হতে মূক !
তোর বাক্যে নহে, ইহা মাতার আদেশ।
ন। ফের যদি কথা ক'স, আমি কিন্তু তবে—
ভৃ। কিন্তুটা কি শুনি দাদা ! দেখ মাগো শুন
নন্দীটারে যদি তুমি সাজা নাহি দাও—
আমি কিন্তু অশ্রুজলে ভাসাব নয়ন।
শি। তুমি ত সুবোধ নন্দি, ছোট ভাইটিরে
কহিও না রূঢ় কথা। মিষ্ট ব্যবহারে—
শিষ্ট করি লও ওরে। কাঁদিও না বাছা
মন দিয়া দুইজনে, শোন যাহা বলি।
ন। (স্বগত) সুশান্ত ছেলেটি কিনা মোয়ামণ্ডা দিয়া

ভুলায়ে রাখিব ! দোষ নন্দীটারই যত ।
(প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা ।
ভৃ। (নন্দীর কাণের কাছে) কেমন জব্দ !
শি। চলেছি ধরায়,—
তোমরা দুজনে দেখো দেব মহেশ্বরে ;
ধ্যান ভাঙ্গায়োনা যেন কলহ বিবাদে !
নন্দী। নহেত শরৎ মাগো, প্রতিমা রচিয়া
ডাকেনা ত নরনারী তোমারে সাদরে—
অধিষ্ঠিত হতে তাহে, এ যে অসময় !
জানিনা ত কি কারণে যাবে সেথা এবে !
সঙ্গে তবে লও দাস অনুচরগণে।
ভৃ। একটু খেলিব রঙ্গে, লও মাগো সাথে।
পরম দাম্ভিক হের ঐ মানীজন
চলেনা চরণ গর্ব্বে—ধরা দেখে সরা !
পিছে হতে আচম্বিতে পদতলে ওর—
ঢালি দিব ঘটিভরা গোময় সলিল ;
পড়িবে ধপাস করি—পিচ্ছল মাটীতে !
হা হা কি কৌতুক সুখ ! ভাব নন্দীভায়া !
শি। না বৎস—
ভৃ। লও মা সাথে দুটি পায়ে পড়ি ;
বরঞ্চ ফিরায়ে দিও দুই দণ্ড পরে।
ঐ যে প্রতাপশালী নৌকার আরোহী—
কাড়িয়া অন্যের ধন ছলে অত্যাচারে
ভরাখানা ভরি লয়ে স্বার্থের বোঝায়—
নিস্তরঙ্গ নদী-বুকে সুখে বেয়ে যায়—
দেখো মাগো চাও—
শি। দৃষ্টি সব দিকে তোর !
ভৃ। ভয় নাই ডর নাই, নাহি অনুতাপ
মনে জানে বিনা বিঘ্নে হয়ে যাবে পার—
মহান প্রতাপী—
ন। (উঁকি মারিয়া) ঠিক বলিছে ত ভৃঙ্গি।
ভৃ। একবার দাঁড়াইয়া হালের উপর—
দোলাব তরণী তার ভীষণ দোলায় !
ন। বাজাব ডমরু আমি ঘোর বজ্র রবে।
ভৃ। বেশ ভাই বেশ কথা ! তখন দেখিব—
কোথা থাকে প্রতাপীর দুর্দ্দম্য প্রতাপ !
রক্ত মুখ পাংশু হয়ে যায় কি না যায় !
ন। একবার মা মা বলি ডাকে কি না ডাকে !
ভৃ। হা হা হো হোঃ; দাও আজ্ঞা চলি
মাগো সাথে।
শি। খেলার এ কাল নয় ধ্যানমগ্ন দেব—
সে কথা ভুলো না। আমি মর্ত্ত্যে চলিলাম,
স্মরিছেন্ লক্ষ্মীবাণী আমারে কাতরে।
একা রহিলেন হেথা দেব ভোলানাথ
দেখিও দুজনে, আমি ফিরিব সত্বর।
ন। যথাদেশ, নমি মাতা, প্রাণ কিন্তু কাঁদে !
শি। আশীর্ব্বাদ, ভায়ে ভায়ে রহ সদ্ভাবে।
(প্রস্থান)
ভৃ। নন্দি-দাদা ! হি হি ! হা হা !
ন। ভাইটি আমার।
ভৃ। কোলাকুলি করি এস দাদা—
ন। এস ভাই।
ভৃ। স্ফূর্ত্তি একি মনে জাগে ! তরল সুন্দর
মেঘরাশি যেন ঐ, জমি পদতলে
ঠেলিছে আমারে, নাহি থামিতে শকতি।
হাসিরাশি ঝর ঝর উথলে কৌতুকে।
থেকোনা গম্ভীর হয়ে এ সময় তুমি—
দুটি পায়ে ধরি দাদা !
ন। হাসিব কেমনে !
তুষার জমাট ঐ গিরিখানা যেন—
চাপায়ে মাথার পরে, মা গেলেন চলি।
ভৃ। খোকা তুমি দুগ্ধপোষ্য ! একটি মুহূর্ত্ত
মা ছাড়া থাকিতে নার ! বড় রাগ ধরে !
হাস দাদা হাস ভাই, এস দোঁহে নাচি !

ন। চলে না চরণ ভৃঙ্গি, হাসি নাহি আসে;
হৃদয় উদাস শূন্য এ বসন্তে নব,—
শারদ আকাশ সম মন করে হুহু!
ভৃ। বনে না ত তাই! কিন্তু অহং সোহং
খোলা যদি পাই ভায়া মুহূর্ত্তেরো তরে।
এক টানে টানি শুষি মুক্ত বায়ুরাশি
উধাও হইয়া উড়ি ঝড়ের দোলায়।
ন। আমার কে জানি আজি মনে পড়ে শুধু
দক্ষযজ্ঞ কথা সেই, প্রলয় বিপ্লব—
জননীর দেহত্যাগ—
ভৃ! নৃত্য মহেশের?—
ওঃ কি সে মহোচ্ছাস উদ্দাম উল্লাস!
পুনঃ কোন লয়-যজ্ঞ আছে কি ধরায়?
তাই কি গেলেন মাতা বিনা নিমন্ত্রণে?
বল দাদা জান যদি, কোর না গোপন
এ হেন সংবাদ শুভ। কুসুম-পরাগে
আর হলুদ চন্দনে, কালো মুখখানা
তব রাঙ্গাইয়া তুলি।
ন। কি মিথ্যা বকিস!
ভৃ। সত্যি কথা বলি তবে, খুলে গেছে মন—
চাপিয়া রাখিতে নারি, দেখ নন্দী ভাই—
পিতার উপর বড় বেশী রকমের
প্রভুত্ব করেন যেন মাতা আজ কাল!
সদা তাঁরে রাখি বন্দী অঞ্চলের ছায়ে
জড় ভোলা করি তুলি, সমস্ত ক্ষমতা
নিয়েছেন নিজ করে। ভাল নাহি লাগে!
ন। করিস মায়ের নিন্দা, এত বড় মুখ!
ভৃ। এ কি নিন্দা! মিথ্যাবাদী! আমি শুধু বলি
পিতা হতে মাতা বড় এ কেমনতর!
ন। বড় ছোট নাহি জানি—মায়ের মিলনে
পিতা শিবরূপ, রুদ্র সতী বিনা তিনি।
ভৃ। আমি ত তাহাই চাই, হাসি রঙ্গ খেলা
একটু নাহিক পেলে বাঁচিব কেমনে!
ন। তুমি চাও সুখী হতে বিশ্বের অসুখে
হতভাগ্য প্রেতাধম!
ভৃ। ফের গালাগালি!
এক টানে দন্তপাটি ফেলিব উপাড়ি—
তখন হইবে শিক্ষা,—
ন। বড় দম্ভ দেখি।
ভৃ। তোর না আমার! দাঁড়া—করি চুরমার—
ন। বটে বটে আয়—দেখি বীরত্ব কেমন!
(উভয়ের মারামারি)
ভৃ। (নন্দীর নিকট হইতে পলাইয়া)
মাগো দেখ প্রাণ যায় ছেলের তোমার।
(নেপথ্যে ঠুংঠুং ঘণ্টার শব্দ)
(ভৃঙ্গি চমকিয়া)
মা এলেন বুঝি! মোরে ক্ষমা কর দাদা;
বলিও না কিছু তাঁরে রব চির দাস।
ন। (হাসিয়া) নিজ ঘরে আসিবেন
মাতা বুঝি ভূত—
ঘণ্টা বাজাইয়া?
ভৃ। দেখ কে এসেছে তবে;
একটু আরামে আমি পা ছড়ায়ে বসি।
(আঃ)
(পুনরায় ঘণ্টার শব্দ ও গান)
জয় জয় শম্ভো,—মহাদেব মহাদেব
ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—
জয় জয় শম্ভো।
(গমনপরায়ণ নন্দী পশ্চাৎমুখ হইবামাত্র)
ভৃ। ন ভূত ভবিষ্য ওটা, অসৃষ্টি স্রষ্টার!
মহাদেব। নন্দীভৃঙ্গি—!
ন। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া)
ধ্যান ভঙ্গ হোল মহেশের!
হায় হায়! মা আসিলে কি বলিব তাঁরে?

ভৃ। (সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া)
তোর দোষে ঘটিল এইটি!
ম। নন্দী ভৃঙ্গি!
নন্দীভৃঙ্গি। ভগবন্!
(উভয়ের নিকটে আগমন)
ম। শুনিছ না ঘণ্টার নিনাদ?
ভৃ। আজ্ঞে, আসি নাই কাছে, ধ্যানভঙ্গ ভয়ে।
ম। কলহের বিরাম ত ঘটে নাই তাহে।
দুষ্টামিতে ভরা সব অলসের সেরা!
ভৃ। (নন্দীর কানে) যথা পিতা তথা পুত্র—
নন্দী। চুপ দুঃসাহসী।
শিব। যত দোষ ভবানীর, তাঁহার আদরে,
এক মুখে শত জিহ্বা। যা দুষ্ট ভূতেরা
নিয়ে আয় আহ্বানি দেবেরে!
নন্দী। যথাদেশ।
(প্রস্থান)

নেপথ্যে গান

জয় জয় শম্ভো, মহাদেব মহাদেব—
ভোলা ভূতপতি পরম শরণ—
জয় জয় শম্ভো।
পরাগতি, প্রলয়বান, ত্রিনয়ান,—
মহাকাল, অগ্নিভাল—
তুমি হর শঙ্কট সংহর—
জয় জয় শম্ভো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবমন্দির সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চ সুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ন্যায়রাজের সহিত নন্দী ভৃঙ্গি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহাকে মহাদেবের স্থান দেখাইয়া দিল। ন্যায়রাজ মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন। ভৃঙ্গি তরুলতা মধ্যে থাকিয়া মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গি সহকারে উঁকি মারিয়া দর্শকদিগের কৌতুক উদ্রিক্ত করিতে লাগিল! নন্দী স্তব্ধভাবে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় তরুগাত্রে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়। (মহাদেবের নিকটে আসিয়া)
জয় জয় মহেশ্বর প্রণতি চরণে।
ম। শুভমস্তু মর্ত্ত্যেশ্বর, অধিষ্ঠ অজিনে—
ধর্ম্মরাজ-প্রতিনিধি! কিন্তু কোথা তব
সূর্য্যোজ্জ্বল রাজদণ্ড, মহিম-মুকুট!
ব্রহ্মার সে মহাদান?
ন্যা। নাই—কিছু নাই।
পরাজিত পরাহত পীড়িত লাঞ্ছিত
দেবারি দানব করে 'ন্যায়' তোমাদের!
ম। কি বিপদ ওহো! তবু ন্যায়রাজ ইথে
হয়োনা অধীর তুমি। তুচ্ছ মেঘজালে,
জ্যোতির্ম্মালী হল বন্দী, দীপ্ত মহিমায়
পুনঃ প্রকাশের তরে;—মনে রেখো ইহা।
এ শুধু কলির খেলা, দুদণ্ডের জয়।
ন্যা। ক্ষণ শুধু তুচ্ছ ক্ষণ—ওহে মহাকাল
অসীমেরি মাঝখানে। দু দণ্ডের ঝড়ে
ওলট-পালট বিশ্ব; মৃত্যু সেত দেব
ক্ষণিকেরি ক্ষমতা মহান্। 'ন্যায়' আজ
জরজর মরমর অন্যায় আঘাতে;
শাসনিতে ধরা-রাজ্য একান্ত অক্ষম;—
যথা প্রজাপতি তারে করিলা স্থাপন।
ম। ধরা যাক রসাতলে—ন্যায়রাজ তবে,
স্বর্গে চলে এস তুমি স্বর্গের দেবতা।
ন্যা। ত্রিদিব প্রবেশে-নাহি অধিকার মোর
অন্যায়ের দাস এবে পুণ্য-শক্তিহীন।
ম। এ বড় অন্যায় নীতি ত্রিদিব-রাজের!
যাও তবে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা-সখা তুমি,
অধিষ্ঠিত ধরাতলে যাঁহার কর্ত্তৃক।
ন্যা। আসিতেছি তথা হতে;

ম। কি বলেন তিনি ?

স্র। স্রষ্টা তিনি বিনাশের সাধ্য নাহি তাঁর।
যদি দয়া করি —

(প্রেমরাজকে সঙ্গে লইয়া নন্দী ভৃঙ্গির দ্বারে আগমন এবং পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁহাকে মহাদেবের নিকটস্থ হইতে বলিয়া তরুলতার মধ্যে দণ্ডায়মান)

প্রেম। (মহাদেবের নিকটে আসিয়া)
নমস্কার মহাপ্রভো !

ম। এস এস বিষ্ণুসখা, ত্রিদিব-দুর্ল্লভ,
ধরার আনন্দ ওহে ! পুলকিত প্রাণ—
তব দরশন লাভে ;—শত বসন্তের
প্রফুল্ল হিল্লোল তুমি ! কিন্তু কেন হায়—
পরিমলহীন আজি ! কোথা ফুল্ল ধ্বজা—
পুষ্পিত কুসুম তব গন্ধ ভরপুর !
আনন্দ-মুরতি কেন মলিন এমন ?

প্রে। কিছু নাই ! সর্ব্বস্বান্ত ; নিপীড়িত প্রেম
কলিরাজ সেনাপতি অপ্রেমের করে।

ম। এমনি প্রভাববান্ হইয়াছে কলি !
এ শুধু মৃত্যুর আগে ক্ষণিক চমক !
যাও সথে বিষ্ণুলোকে জানাও বিপদ !

প্রে। আসিতেছি তথা হতে,

ম। কি বলেন তিনি ?

প্রে। স্থিতিপতি তিনি নাহি বিনাশ-ক্ষমতা !

ম। যাও তবে ইন্দ্রলোকে। মর্ত্ত্যে যবে তব
হেন অনাদর প্রেম, থেকোনা তথায়।
নন্দন নন্দিত করি—বিরাজ ত্রিদিবে।

প্রে। নিরানন্দ মূর্ত্তিমান, প্রেমানন্দ আজি ;
অভাগা-জনার এই চরণ-পরশে
ত্রিদিবের মুক্তদ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে,—
কেমনে পশিব তথা !

ম। বড় অবিচার !
স্বর্গের প্রসাদ তুমি করুণা-জীবন !

প্রেম। বন্দিনী করুণা মোর অপ্রেমের গৃহে ;
রাজ্যহীন রাণীহীন আমি অভাজন ?

স্র। অশান্তি-নিলয়ে দাসী শান্তিও আমার,—
কৃপা কর বিত্তি-ভঞ্জন ?

ম। নন্দী ভৃঙ্গি !

(উভয়ের প্রবেশ)

যথায় করুণা শান্তি আছেন বন্দিনী
যাও তথা,—সুকৌশলে বন্ধন খুলিয়া
আন তাঁহাদের হেথা।

উভয়ে। যথাদেশ প্রভো।

(প্রণামপূর্ব্বক গমন।)

ম। (কণ্ঠবিলম্বিত শিঙ্গায় হাত দিয়া)
বাজাই প্রলয় শিঙ্গা ; যাক্ থেমে যাক্
বিশ্বের এ হাহাকার—প্রাণান্ত সংগ্রাম।
কিন্তু কেন স্তব্ধ হেন ব্রহ্মা নারায়ণ,
আছে কি কারণ কোন ? পূর্ণ নহে কাল !
কোথা দেবি ভগবতি তুমি ?

স্র। মর্ত্ত্যে তিনি।

প্রে। এসেছি কৈলাসধামে তাঁহার আদেশে।

ম। ভক্তগুলা যত তাঁর কাণ্ডজ্ঞান-হীন,
শক্ত শিক্ষা দিতে হবে ! যখন তখন
মা মা করি ডাকে ; শূন্য আমার ভবন।

(নন্দী ভৃঙ্গির প্রবেশ ও
নমস্কারপূর্ব্বক)

ন। দেবাদেশে আনিয়াছি—

ভৃ। আমি মুক্ত করি
দেবী দুই জনে—

ম। কোথা তাঁরা নিয়ে আয় ;
দ্বারে রেখেছিল বুঝি দাঁড় করাইয়া ?
বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে হয়েছে নিঃশেষ !

(উভয়ের গমন)

ন্যা। আসিছেন দেবীগণ, আজ্ঞা হোক প্রভো
একটু আড়ালে থাকি—
প্রে। দেখিলে মোদের
ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন তাঁরা—
ম। তথা অস্তু!
(দুজনের উঠিয়া তরুলতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক)
ন্যা। একি! শান্তি! একি তুমি! হায় ভগবন্
কেন না করিলে মোরে দৃষ্টিহীন আগে—!
নাহি রাজদণ্ড হায়! বাহু শক্তিহীন
কেমনে লইব শোধ দিব প্রতিফল!
এস বজ্র ভীমবল হও আবির্ভাব—
তোমার জলন্ত তেজে কর বলীয়ান—
ভস্মীভূত করে দিই পাপাত্মা দানবে।
প্রে। হা করুণারাণি—হেরি একি দশা তব!
ভেদী মর্ম্মস্থল হায় সমুদ্র আকারে
অশ্রু উথলিয়া ওঠে—কেমনে সম্বরি!
(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)
উভয়ে। নমস্কার দেবদেব পরমশরণ।
ম। এস কন্যা এস শান্তি এস মা করুণা—
ধরা কর সুশাসন ধরার ঈশ্বরী
করি আশীর্ব্বাদ। সুধা-ঝারি নাহি হাতে
কেন শান্তি-রাণি তব?
শান্তি। অশান্তি-দানবী
কলিরাজ-অনুচরী, সুধা-ভাণ্ড হরি
সমুদ্রে করেছে ক্ষেপ—হস্তহীনা আমি।
ম। মা করুণা রাণী—তুমি, কেন সে সময়
দগ্ধ না করিলে তব নয়নের তেজে
নিষ্ঠুর দানব-সৈন্যগণে?
করু। দেবদেব,
উৎপাটিত চক্ষু মোর, আমি দৃষ্টিহীনা।
ম। অসহ্য অসহ্য ওহো! যুগান্তের কাল
উপস্থিত সুনিশ্চয়।
(লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত ভগবতীর প্রবেশ)
ম। দেবি ভগবতি?
কেমনে রয়েছ স্থির এত অত্যাচারে?
কে উহারা দীনা নারী?
পা। লক্ষ্মী-বাণী তব।
ম। ইন্দিরা ভারতী মোর এমন শ্রীহীনা!
কোথা লক্ষ্মীদেবী তব মোহন কুন্তল?
কে দুরাত্মা স্পর্দ্ধা করি করেছে হরণ?
রতন-মুকুট কোথা—মণি-আভরণ?
শোভাময় স্বর্ণভাণ্ড ধনধান্য ভরা?
ল। নাহি মোর নাহি কিছু। শ্রীসম্পদ সবি
সঁপিয়া দিয়াছি দেব—অন্যায়ের করে।
শোভাহীনা লক্ষ্মীহীনা আজি লক্ষ্মী তব।
ম। মাতা-বাণী, জ্ঞানবাণী উচ্চারিয়া দেবি
অজ্ঞানের কর্ণে, কেন না রক্ষিলে তুমি
ভগিনী লক্ষ্মীরে! একি বীণা কোথা তব?
পদ্মাসন কোথা?
ক। নহি দেবী পিতঃ আর,
শক্তিহীনা বাণীহীনা সামান্যা রমণী!
মোর শুদ্ধ জ্ঞানবাণী শিখিয়া লইয়া
দুর্বাণী রচিয়া তাহে ভরি ঈর্ষানল—
আমারি উপর তারা করেছে পরীক্ষা—
হের অস্ত্রাঘাত!
(বক্ষঃ প্রদর্শন)
ম। থাম কন্যা আর নহে।
কোথা নন্দী ভৃঙ্গি—কোথা ভূত-প্রেতগণ?
বাজায়ে প্রলয়-শিঙ্গা ঘোর বজ্ররবে
সংহার-মূরতি ধরি—হও অগ্রসর।
শিব আজি মহারুদ্র যুগান্ত তাণ্ডবে।
(মহাদেব তাণ্ডব-মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হইবামাত্র দেব-

দেবীগণের অন্তর্ধান এবং ভূত-প্রেতগণের শিবকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গান।)

চলরে চল সবে, হর হর শিব বম।
পেয়েছি আজ্ঞা—করি অবজ্ঞা ইন্দ্র বরুণ যম।
আয় দানব যক্ষ—ডাকিনী রক্ষ—
আজিকে মহোল্লাস!
লম্ফে ঝম্ফে, মহান দম্ভে—
বিশ্বে লাগাব ত্রাস!
মোরা পেয়েছি আজ্ঞা—না মানি প্রজ্ঞা,
না জানি শম দম,
আজি প্রলয় কাণ্ডে—নাশি ব্রহ্মাণ্ডে
খসাব সূর্য্য সোম!
চল্‌রে চল্ চল্—বলরে বল্ বল্
হর হর শিব বম—!

পটক্ষেপ।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র পরিবৃত সুবিস্তৃত ব্যোমে তিনখানি আলোক-সিংহাসন ভাসমান। পার্শ্বের দুইখানি আসন শূন্য, মধ্যাসনে ব্রহ্মা আসীন; নিকটে ক্ষুদ্র দুই দীপাসনে যম ও ইন্দ্র উপবিষ্ট।

ইন্দ্র। (করযোড়ে)
মহেশে করুন্ ক্ষান্ত দেব ভগবন্!
মহাত্মা পুণ্যাত্মা কেহ না আসে ত্রিদিবে,—
ইন্দ্রত্ব করিব আমি কারে লয়ে আর!
শূন্য মোর ধাম—

যম। পূর্ণ যমের ভবন।
অকাল-মরণ যদি পৃথিবী-বাসীর
না কর বারণ ত্বরা, হইবে প্রমাদ।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

সকলে (উত্থানপূর্ব্বক)
নমো দেব নারায়ণ স্থিতির কারণ।

বিষ্ণু। নমস্তে ব্রহ্মন্ সখে, নমো ইন্দ্র যম।

(বিষ্ণুকে হস্তধারণে পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া)

ব্রহ্মা। আসন গ্রহণ কর যম ইন্দ্ররাজ!

বিষ্ণু। কেন স্মরিয়াছ সখে?

ব্র। এ দুর্দ্দিনে হরি—
যদি না স্মরিব তোমা কারে আর স্মরি?
বিশ্ব ত্রস্ত বিকম্পিত সৃষ্টি হয় লোপ;
তুমি বিনা হরবন্ধু কে বারে তাঁহারে?

বি। ব্রহ্মার অসাধ্য কার্য্য সাধিব কেমনে
আমি স্থিতিপতি বিষ্ণু? আমার পরশে
স্থিতিশীল হয় পাছে মহেশের গতি
এ আশঙ্কা জাগে।

ইন্দ্র। যাক্ তবে স্বর্গ মর্ত্ত্য
রসাতলে যাক্, দেখ নীরবে বসিয়া।

যম। প্রেতভূমি হোক বিশ্ব—আমি ধর্ম্মরাজ
নিজালয়ে হই বন্দী। হেন রাজ্যপদে
নাহি প্রয়োজন মোর। লও যমদণ্ড,
মুক্তি দাও ব্রহ্মা বিষ্ণু—করি অনুনয়।

ব্র। স্থির হও ইন্দ্র যম।

বি। হয়োনা নিরাশ।
শক্তিরে স্মরণ করি—এস সবে মিলি,
অবশ্য উদ্ধার পাব তাঁহার সহায়ে।

ব্র। এমন সহজ সত্য ছিলাম ভুলিয়া!
ধন্য তুমি! আপনারে মহাধন্য মানি—
সখারূপে হৃষিকেশ, লভিয়া তোমারে।

ইন্দ্র যম। সার্থক তোমার দেব দীনবন্ধু-নাম।

(সকলের স্তব)

ওজগ-জননী ভবানী
শুনাও অভয়-সুবাণী
দুর্নীতি-ভারে অতি ভুবন কম্পমান!
সুরনরকিন্নরে, কাতরে তোমারে স্মরে
অকুলে তরী দান করি—
করগো পরিত্রাণ।

(ভবানীর প্রবেশ)

সকলে। (উঠিয়া)
নমস্তে বিশ্ববন্দিতে ;
ভ। জয়স্তু—সু স্বস্তি।
ব্র। প্রসন্ন হইয়া কর আসন গ্রহণ।
ভ। প্রসন্ন হউন সবে ;—
সকলে। যথাদেশ দেবি।

(সকলের উপবেশন)

ব্র। বিশ্ব গায় ত্রাহি ত্রাহি শরণ-সঙ্গীত,
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ বিপত্তারিণি ?
ভ। তুমি ব্রহ্মা সৃজনেশ, তুমি স্থিতিপতি
ত্রিলোক-ঈশ্বর দোঁহে, তোমরা থাকিতে
আমি কি করিব দেব, সামান্যা শকতি।
বি। বিনয়ের নহে কাল দেবি শক্তিরূপা।
ব্র। সৃজন পালন কভু হোত কি সম্ভব
আদ্যাশক্তি তুমি যদি না থাকিতে মূলে ?
ই। অগতির গতি তুমি,—
য। কৃপা কর দেবি।
ব্র। শান্ত কর হরে। যদি কিছুক্ষণ আর
চলে হেন নৃত্য তাঁর, সৃষ্টি হবে নাশ।
ভ। ক্ষতি কিবা ? দুর হোক আলস্য তোমার,
ঘুচুক জড়তা। কোন্ আদিযুগে সেই
সৃষ্টি করি একবার—রয়েছ বসিয়া
চেষ্টাহীন নির্ব্বিকার, সেত নহে ভাল ;
স্ফূর্ত্তি আনন্দের কাল ইহা ত তোমার !
বি। ব্যঙ্গরূপা মূর্ত্তি দেখি মনে পাই ভয় !
ভ। এ বিশ্বজগৎ লয়ে একা তোমরাই
হাসিবে করিবে রঙ্গ ? অন্যের তাহাতে
অধিকার নাই কোন ? বেশ তাই হোক।
লয়শ্রান্ত শিব যবে নৃত্য-অবসানে
হইবেন ধ্যানমগ্ন,—লীলাচ্ছলে পুন
প্রলয়-পয়োধি-জলে, ব্রহ্মার সৃজিত
পদ্মদলোপরি বিষ্ণু—হয়ো ভাসমান্।
অপেক্ষা করিতে কিন্তু হবে ক্ষণকাল !
ব্র। একবার লয়কাণ্ড হয়ে গেলে শেষ,
ধ্বংসেরে গঠিতে পুন ব্রহ্মাও অক্ষম।
নিজের নিয়ম-পাশে নীতি-শৃঙ্খলায়
জড়িত পীড়িত হেন নিজে সৃষ্টিধর।
ভ। শক্তিরও নাহিক শক্তি, হে সৃজনপতি,
ফিরাইতে কালগতি, কহিনু নিশ্চয়।
যে মুহূর্ত্তে খর্ব্ব হবে কলির প্রভাব,
উচ্চ হতে নিম্নে হবে পাপের পতন,
দেবের চরণ-স্পর্শে হব অধিকারী,
থামাব তাঁহার নৃত্য রাখিব সংসার।
ব্র। কিছু না রহিবে আর রক্ষিতে তখন !
ভ। বেশত সে মন্দ কিবা ! নূতন প্রথায়
গড়িবে ভুবন নব। দেখো প্রজাপতি
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ভেদ যেন রেখোনা এবার ;
নিন্দেনা তোমারে যেন ধরাবাসী আর।
পুরাতন কালগর্ভে হউক বিলীন।
বি। ইচ্ছা তব পূর্ণ হোক্—হের গো পাষাণি
বিশ্বের প্রলয়রূপ কিবা মনোহর।
ভ। একি দৃশ্য ! খসি পড়ে চন্দ্র সূর্য্য তারা
রোহিণী ভরণী মঘা রাশিগণ যত,
কক্ষচ্যুত ঘূর্ণ্যমান সপ্তর্ষি দেবর্ষি,
মহাকাশ মহাশূন্য ঘোর অন্ধকার !
আমারেও কি মায়া এ দেখাও রমেশ ?
বি। চাও নিম্নে ধরাতলে, কি দেখিছ দেবি ?
ভ। অসীম সমুদ্র গর্জ্জে ভীষণ নিনাদে।
কোথা স্থল-গিরি-নদী-তরু-লতাবন ?
জীবজন্তু-নরনারী ? কি করিছ দেব ?
ভক্ত যে উহারা মোর প্রাণের সন্তান—
মা মা করি ডাকি সবে পড়িয়া ঘুরিয়া
তলাইয়া যায় নীচে ! সহিব না ইহা !

ধরিয়া তোমার হাত ভীমামূর্ত্তি ধরি—
রক্ষিব সন্তান মম,—বিষ্ণু সাবধান!
বি। কি করিব আমি দেবি—তোমারি ইচ্ছায়
প্রলয়-পয়োধি-জলে মগ্ন চরাচর!
শূন্য মহাকালে তুমি শক্তি শূন্যরূপা
বিরাজিছ—একা শুধু; হের গো কালিকা।
ভ। আমার ভারতী লক্ষ্মী, গণেশ কার্ত্তিক
ডুবে যে মহান্ শূন্যে—আর না আর না—
সংহর প্রলয়-মূর্ত্তি—সম্বর সম্বর।
বি। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবেই ভবানি
এ প্রলয় হবে লয় মুহূর্ত্তে এখনি
নিবার হরের নৃত্য।
ভ। তথাস্তু স্থিতীশ,
সহায় হও হে তবে ব্রহ্মা নারায়ণ।
ব্র। বল কি আদেশ?
বি। সাধি সর্ব্বশক্তি দানে।
ভ। অকালে এ মোহ নৃত্য ভাঙ্গালে দেবের
ঘটিবে প্রমাদ বড়, বাড়িবে দ্বিগুণ
কলির প্রভাব।
বিষ্ণু। কহ কি তবে উপায়?
ভ। নব যুগ হে ব্রহ্মন্ কর প্রবর্ত্তন।
বিষ্ণু তুমি হয়ি তাহে মহা অবতার
বন্দী কর কলিরাজে। যত দেবগণ
হও সৈন্য অনুচর। আমি শক্তিরূপা—
পথ দেখাইয়া চলি, জাগাই শিবেরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু। তথাস্তু ভবানি।
ইন্দ্র যম। জয় জয় বল জয়।

গান

জয় জয় বল জয়
সুর অসুর মানব দানব সবে।
দিগদিগন্ত ধ্বনিত করি অশনিমন্দ্রিত রবে-
জয় জয় সত্য সনাতন
জয় জয় ব্রহ্মা নারায়ণ
জয় জয় শিব-শক্তি—
গাহি, পুণ্য মঙ্গল আহবে।
ছিলাম শাপসুপ্ত
শক্তির বরে লভেছি চেতনা
হয়েছি প্রসাদ-মুক্ত।
এবে, আমরা প্রবল দৈব!
দূরিত মোদের ভ্রান্তি শ্রান্তি
মিলেছি শাক্ত শৈব!
দুর্জ্জয় ঐক্য-মন্ত্র উচ্চারি—
নবীন কল্পে আনিব ভবে।
জয় জয় বল সবে।

পটক্ষেপ।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের ন্যায় শিব তরুলতাচ্ছন্ন মন্দিরে ধ্যানমগ্ন; সম্মুখের রঙ্গমঞ্চে ভৃঙ্গি নৃত্যপরায়ণ, নন্দী স্থির ভাবে তরুগাত্রে নির্ভর করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান।

ভৃ। (নাচিতে নাচিতে)
এ কি জ্বালা পা দুটা যে না মানে বারণ!
কে যেন চালায়ে মোরে গ্রহের মতন—
করিছে অস্থির?
ন। নাচ তবে আরো নাচ।
ভৃ। ঈষ, ভারী আজ্ঞাজারি! আমি নেচে মরি
তামাসা দেখুন উনি! সেটি হইবে না;—
তুমি নাচ আমি বসি তুড়ি দিই কষি।
(উপবেশন ও পায়ে হাত দিয়া)
বেদনা করিছে বড় টিপে দাও দাদা!
ছোট ভাইটিরে কর দয়া একটুকু।
এ হেন শান্তির দিনে কর শান্তি দান।
ন। নীরবে থাকিস যদি—
ভৃ। রাজি খুব রাজি;

টেপো দাদা ভাল ক'রে।

(নন্দীর পা টিপন)

ভৃ। আঃ কি আরাম!

ন। ফের কথা—ফের!

ভৃ। এই ক্ষান্ত হনু—শুধু—

দুটি ছোট্ট কথা দাদা বেশী কিছু নয়—

ন। সর্ত্ত ভঙ্গ হয়ে গেছে, উঠিনু আর না!

(পা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া)

ভৃ। বেশ ব'স, গল্প কর, বল দাদা বল—

ভূত প্রেত দৈত্য দানা পশু নর যবে

মেতে উঠেছিল সবে, তুমি কি তখনো

এমনি গম্ভীর স্থির ছিলে দাঁড়াইয়া

নৃত্যশীল প্রভুর পারশে!

ন। মনে নাই।

ভৃ। মনে নাই! বল তবু যাহা মনে আছে,—

বলিতেই হবে—

ন। বড় আবদার এ ত!

শোন তবে; শুণ্ডরূপে বিস্তারিয়া মুণ্ড

শুষিয়া সাগরখানা করিলাম গ্রাস

সিংহি হয়ে ভৃঙ্গি কায়া।

ভৃ। থাম' দাদা থাক্!

তোর সনে গল্প করা পণ্ড পরিশ্রম,

সুখ নাই এতটুকু! মনে কি করিস—

পূজা দিব তোরে মোরা ভোলা-চেলা বলে?

ন। পূজাটা তোরেই দেব ছেড়েদে আমারে।

ভৃ। তা হবেনা দাদাভাই, শুনিতেই হবে,—

পেয়েছি তোমারে হাতে অমনি কি ছাড়ি!

ঘুষাঘুষি মারামারি করি কথাগুলা

পেটের ভিতর, মোরে করিছে অস্থির—

বাহির করিয়া পাই ত্রাণ—,

ন। [illegible] বল্ তবে।

ভৃ। [illegible]—কিছু মনে নাই!

আমার যে মনে পড়ে প্রতি-পদক্ষেপ!

সুখ তরঙ্গিত প্রতি দেহ-সঞ্চালনা—

রণবাদ্য তালে তালে;—

ন। সৌভাগ্য তোমার!

ভৃ। চুপ কর্ বলিতে দে, শুনি সব কথা

তখন করিস পরে—ভাগ্য-আলোচনা—

এমন অস্থির পঞ্চ!

ন। শুনিতেছি বল!

ভৃ। শুনিতে হবেনা আর ফুরায়েছে কথা!

ন। এত শীঘ্র! বাঁচিলাম। হর হর বম।

ভৃ। তুমিত বাঁচিলে কিন্তু মরিলাম আমি!

উল্লাস বিঘোরে যবে—দিনু উল্লম্ফন

যোজন উপরে—কাটি গেল তাল লয়—!

ন। সত্যি নাকি তারপর?

ভৃ। হোল সর্ব্বনাশ!

হারানু সকল শক্তি, ইন্দ্রিয় বিকল!

ছুটিয়ে চলিল নীচে জড় দেহখানা;

পড়িয়া পাষাণ-লোহ-কঠিন মাটীতে

এখনি হইবে চুর্ণ, চক্ষু মুদিলাম!

ন। আহা মরি তারপর?

ভৃ। ঠেকিল চরণে

সুকোমল তৃণশয্যা; চাহিয়া দেখিনু—

শিবের দুয়ার পরে আছি দাঁড়াইয়া!

ন। বেশ বেশ বড় সুখী। ভৃঙ্গিহারা হ'লে

আমারও ঘটিত মৃত্যু!

ভৃ। কিন্তু বল দাদা

এ কেমন স্বপ্ন! হেন মহাপ্রলয়কাণ্ড

মিথ্যা কি সকলি নন্দী,—শুধাই তোমারে?

ন। সত্য কিবা মিথ্যা দেখ নয়ন মেলিয়া;

ঐ বিরাজেন বিষ্ণু নবযুগ-বেশে,

নন্দী করি কলিরাজে দেবগণ সাথে

সর্ব্ব অগ্রে—শক্তিরূপা জগজ্জননী!—

(উভয়ের নেপথ্যে দৃষ্টিপাত)

ভৃ। একি দৃশ্য সুমহান্ কোন্ পুণ্যফলে
লভিনু এ দিব্য দৃষ্টি—খুলিল নয়ন!
প্রাণ ভরি গাহি সবে জয় জয় গান।
উভয়ে। সর্ব্ব বিশ্ব ঐক্যনাদে গাও জয় জয়।

(সহসা আলোকচ্ছটার মধ্যে দেবদেবীগণ চিত্রার্পিত মূর্ত্তিতে প্রকাশ। ব্রহ্মা ও মহাদেব উচ্চে আলোক-সিংহাসনে আসীন। সম্মুখে ধৃতখড়্গা ভগবতী নবযুগ-বেশী বিষ্ণু এবং বন্দী কলিরাজ, ইন্দ্র, যম, ন্যায় প্রেম, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শান্তি, করুণা এবং দিগবালা প্রভৃতি দেবদেবীগণ-পরিবৃত হইয়া দণ্ডায়মান।)

নন্দী ভৃঙ্গি ও দিগবালাগণের গান।

গান

হের ঐ নবযুগ উদীয়মান!
প্রীতিদীপ্তিময় দিব্য আলোকে
ঈর্ষা-তিমির অবসান।
সুরনর গাহে জয়গান।
সমীরণ পুলকে ভরা
শান্তি কান্তি রূপে জাগিছে ধরা;
ত্রিলোক-দেবতার পুণ্য আশীষ-ধার
দ্যুলোকে ভূলোকে ভাসমান,
বিশ্বভুবনে বাজে মঙ্গল-তান।

পটক্ষেপ।

সমাপ্ত

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

শিল্পচর্চ্চা

(ক্রপটকিন হইতে)

প্রাণধারণ বা কেবলমাত্র দিনযাপনের উপযোগী অন্ন, পানীয় ও আশ্রয় সংগ্রহই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়—তাতে তার সমস্ত শক্তিও ব্যয়িত হয় না। সাধারণ অভাব-পূরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য নানাবিধ অভাব মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে জেগে ওঠে—আমাদের অন্তরনিহিত সৌন্দর্য্যরুচির প্রেরণায়। আমরা প্রত্যহই দেখি প্রত্যেক নর-নারী আবশ্যকীয় জিনিষের অভাব সত্ত্বেও এমন দু-একটা জিনিষ কেনেন, যাতে দৈহিক বা মানসিক আনন্দ পাওয়া যায়। কোন নীতিবাগীশ বা সন্ন্যাসীর চোখে এই বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তি অসন্তোষের কারণ হতে পারে—এ-গুলিকে তাঁরা পাপের প্রবেশ-দ্বার মনে করতেও পারেন; কিন্তু বাস্তবিক এই-সব ছোটখাট খেলার জিনিষই জীবনের একঘেয়ে ভাবকে নষ্ট করে, তার মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দেয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর নিজের রুচি-পরিতৃপ্তির ও অবকাশযাপনের কোন উপায় যদি না থাকত, তবে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে কোন মানুষ বাঁচতে চাইত কিনা, সন্দেহ। প্রতি লোকের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং সমাজ যতই সভ্য হবে, ততই মানুষের স্বাতন্ত্র্য বাড়বে এবং তার ফলে প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও পরিতৃপ্তি ভিন্ন হবে। নীতির পুঁথি বা নীতিবাগীশের উপদেশের

উপর মানুষের উন্নতি নির্ভর করছে না এবং কখনও যে করবে এমনতর ভয় আমাদের নেই, কাজেই আশা করতে পারি যে আমাদের সমাজে শিল্পচর্চ্চার কোনো ত্রুটী হবে না।

সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করতে হলে অবশ্য প্রথমে সবার মুখে অন্ন যোগাতে হবে। বর্ত্তমানের সমাজ-ব্যবস্থায় সক্ষম কর্ম্মী কর্ম্ম-প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে কেঁদে ফিরছে, আশ্রয়হীনা নারী অসহায় শিশু মনের বেদনা জানিয়ে পথে পথে ঘুরছে—অর্দ্ধাশন ত কর্ম্মী-পরিবারের চিরসাথী। আবালবৃদ্ধবনিতা যত্ন-সহানুভূতি ত দূরের কথা, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত—পশু-জীবনের চেয়েও দুঃর্ব্বিসহ তাদের জীবন। এই সমস্ত অত্যাচার ও অন্যায় দমন করতেই আমরা বিদ্রোহ করছি। কিন্তু বিদ্রোহ এখানেই থামবে না, তাহলে আমাদের কাজ অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমরা দেখছি যে মজুরের দল মানুষের সুখের জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু মানুষের উদ্ভাবিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের সংবাদ তাদের জানা নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারজাত আনন্দের পথ তাদের সামনে রুদ্ধ, শিল্প ও শিল্পসৃষ্টির আনন্দ ও অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। এই-সব আনন্দের অধিকার আজ জনকয়েকের হাতে, কিন্তু আমরা এটিকে সাধারণের অধিকারভুক্ত করতে চাই। এই আনন্দ উপলব্ধির জন্যে মনের ও বুদ্ধির সম্যক পরিচালনা বিশেষ আবশ্যক। এগুলি অবকাশসাপেক্ষ—অথচ, অশন-বসন-আশ্রয়ের অভাবের সঙ্গে লড়াই করে অবকাশ মেলাই দায়। এই বাধা দূর করবার জন্যে আমরা প্রথমে সাধারণ অভাব মেটাবার চেষ্টা করব,—যাতে সবাই শিল্পচর্চ্চার উপযোগী যথেষ্ট অবকাশ পায়।

বর্ত্তমানে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক অশন, বসন ও আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সেখানে শিল্পচর্চ্চাকে বিলাসিতা বলা চলে সন্দেহ নেই। অভাবের মাঝখানে বিলাসিতা মহা দোষের, কিন্তু যখন সমাজে অন্ন প্রচুর, তখন শিল্প-চর্চ্চা কোন অংশে নিন্দনীয় নয়। সব মানুষ একরকম হতে পারে না, কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে, সব সময়েই আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকবেন যাঁদের রুচি ও প্রবৃত্তি সাধারণের থেকে ভিন্ন হবে। সকলেই যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে যাবে এমন কোন কথা নেই, যদিও এমন লোকের অভাব হবে না দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে চর্চ্চা করতে যে ভালবাসে। সাধারণ শিক্ষা একরকমের হলেও বিশেষ- শিক্ষার পথও প্রশস্ত থাকবে। অধিকন্তু, রুচির মূল এক হলেও নানা লোকের নানা রুচি হওয়াই সম্ভব—কারও-বা মর্ম্মর-মূর্ত্তি কারও-বা ছবি ভাল লাগে, কেউ-বা একটা সেতার আর কেউ-বা একটা পিয়ানো পেলে আর কিছু চায় না।

বর্ত্তমানে মহাজনী বন্দোবস্তের ফলে অগাধ অর্থ না থাকলে সৌন্দর্য্য-রুচির পরিতৃপ্তিসাধন দুরূহ; এ অর্থ উপার্জ্জন

করতে হলে কঠোর দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করতে হবে এবং সে অর্থসঞ্চয় সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। সকলের মনে কোন-না-কোন রকমের বিলাস-বাসনা আছে; সেটার পরিতৃপ্তি না হলে মনে অসন্তোষ জাগে এবং সমাজে গোল-যোগ বাড়ে। শিক্ষিত লোকই হোক, আর অশিক্ষিত কৃষকই হোক, সুন্দরের প্রতি টান সকলেরই আছে, যদি জোর করে সেটিকে দমন করবার চেষ্টা করি তাতে উল্টা ফল ফলবে। অধিকন্তু, শিক্ষিত জনের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করতে হলে শিক্ষা বন্ধ করতে হবে— অর্থাৎ সত্যের পথে না-এগিয়ে আমরা পিছিয়েই যাব। ইতিহাসের শিক্ষা যদি আমরা কাজে লাগাতে চাই, তবে সবের বিরুদ্ধে সাবধান হতে হবে। আমরা মনুষ্যত্বের দাবীতে বিদ্রোহ আরম্ভ করছি; মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে আমাদের কাজের পরিসমাপ্তি।

অবশ্য স্বীকার করি যে, যখন চারিদিকে অভাব-অনশন, মর্ম্মন্তুদ যাতনা ও ব্যর্থ জীবনের সুগভীর নৈরাশ্যের কথা ভাবি, তখন এ প্রশ্ন মনে আনতে লজ্জা পাই— আমাদের সমাজে প্রাচুর্য্যের দিনে কেমন করে লোকের নানারকমের সথ ও খেয়াল চরিতার্থ করব? আমরা আগে-ভাগে উত্তর দিই—আগে ত সকলের অন্নের সুবন্দোবস্ত হোক পরে খেয়ালের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়িতে এটা ভুললে চলবে না যে, মানুষ শুধু অন্নের কাঙাল নয়—দেহের ক্ষুধা ছাড়া তার মনের ক্ষুধাও আছে এবং তার দাবীও কম নয়—কাজেই আমরা তার আলোচনা করতে বাধ্য।

দৈনিক পরিশ্রমের ঘণ্টার হার নিয়ে অনেক তর্ক-বিচার বহুকাল থেকে হয়ে আসছে এবং অনেকের মতে পাঁচ ঘণ্টাই নির্দ্ধারিত হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম সমাজ-রক্ষার উপযোগী জিনিষ-উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচ ঘণ্টা আমাদের সীমা হলেও সাধারণ মানুষ বছরে তিনশো দিন দশ ঘণ্টা পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বাধ্য হয়ে পরের জন্যে খাটতে গিয়ে মানুষ শেষে কল হয়ে ওঠে, তার বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য নষ্ট ত হয়ই, বেশীরভাগ তার মনুষ্যত্বও জখম হয়; কিন্তু কাজের মধ্যে যদি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আনন্দ থাকে, তবে দশ-বারো ঘণ্টা পরিশ্রমে সে কাতর হয় না। সমাজের কল্যাণে সে তার নিয়মিত সময়টুকু মাঠে বা কারখানায় বা অন্য কোন-রকমের কাজে ব্যয় করবে, কারণ তার উপর কেবলমাত্র সমাজের অভাবমোচন নয়, সাধারণের উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করছে। বাকি সময়টুকু তার হাতে, এ-বিষয়ে সে পুরামাত্রায় স্বাধীন।

শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে বহু সমিতি গঠিত হবে, এবং এ-সব বিষয়ে যাদের কৌতুহল কম তারা নানারকম খেলা ও খেয়াল-সমিতি স্থাপন করবে— অবসর-টুকু সুন্দরভাবে যাপন করবার জন্যে। পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বিচার মেলা-মেশায়, ভাবের আদান-প্রদানে ও

সহানুভূতিতে এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। জ্ঞান এবং রস সাহিত্য প্রচারের জন্যে গ্রন্থকার-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে ; গ্রন্থকার, ছাপাখানার কম্পোজিটর, প্রিণ্টার, চিত্রকলাবিদ ও খোদাইকার একত্র দলবদ্ধ হয়ে কোন বিশেষ চিন্তা প্রচারের চেষ্টা করবে। বর্ত্তমানে গ্রন্থকারের সঙ্গে ছাপাখানার কোন সাক্ষাৎ-যোগ নেই বল্লেই হয়, সামান্য যা আছে তা অর্থের এবং তাও আবার কর্ম্মী-জনের সঙ্গে নয় ; ছাপাখানার কার্য্যাধ্যক্ষ বা সত্বাধিকারীর সঙ্গেই তার কারবার। কর্ম্মজীবনের সঙ্গে গ্রন্থকারের কোন সহানুভূতি নেই বল্লেও অত্যুক্তি হবে না ; অবিরাম সীসা-ব্যবহারে যদি কম্পোজিটর সীসা-বিষে কষ্ট পায় বা কল-পরিষ্কারক বালক যদি রক্তশূন্যতা রোগে মারা যায়, তবে তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না—পৃথিবীতে তাদের স্থান পূরণ করবার মত হতভাগ্যের অভাব ত কোনদিন হয়নি ! কিন্তু যেদিন দেশে অনশন-অভাবের দায় থাকবে না, যেদিন কেবলমাত্র জীবন-রক্ষার জন্যে কেউ দেহ-মন বেচবে না, যেদিন জনসাধারণ যথেষ্ট শিক্ষা ও অবকাশ লাভ করবে এবং মনোভাব প্রকাশ করবার মত শক্তিশালী হবে, সেদিন বর্ত্তমানের গ্রন্থকারকে তাদের শরণাপন্ন হতে হবেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-বার্ত্তাই হোক আর রসরচনাই হোক, জনসাধারণের সমবায় ভিন্ন সে-সব প্রকাশ ও প্রচারের আর কোন উপায় থাকবে না।

যতদিন বস্ত্রবয়ন, যন্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারকম হাতের কাজ ইতরজনোচিত বলে বিবেচিত হবে, ততদিন কেবলমাত্র আনন্দের জন্যে নিজের হাতে বই-ছাপান লোকের চোখে অদ্ভুত লাগতে পারে, কারণ আনন্দলাভের অন্য পথ অনেক আছে। যেদিন সমাজে সকলের দাবী সমান হবে, সেদিন কিন্তু আর হাতের কাজের নিন্দা থাকবে না, কারণ কোন-কিছুর বিনিময়ে কেউ কারও দাসত্ব করবে না—প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেককে নিজের হাতে করতে হবে। গ্রন্থকার ও তাঁর ভক্তের দল সানন্দে ছাপাখানার কাজ করবে এবং সৃষ্টি করবার সুখ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে। কয়েকখণ্ড মুদ্রার জন্যে যে বালক-মজুর ছাপাখানায় পরিশ্রম করে, তার কাছে এটি মরণের যন্ত্র মনে হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু যে-সব লোক তাদের প্রিয় কবির বা লেখকের মহৎ চিন্তা-প্রচারে ব্রতী, তাদের কাছে এটি সুন্দর বলে মনে হবে—যন্ত্রের প্রতি স্পন্দন, প্রতি শব্দ আনন্দের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ বলে' মনে হবে।

এতে সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হবেনা। গৃহকোণের আরাম-শয্যা ছেড়ে দেশের সঙ্গে নিজের ও সমাজের কাজ করলে কবি কিছু অকবি হবেন না—কল-চালাতে, খনি খুঁড়তে বা রাস্তা তৈরি করতে নানা-রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশায় ঔপন্যাসিকের মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বাড়বে বৈ কমবে না। স্বীকার করি, কয়েকখানা বই পূর্ব্বের চেয়ে আয়তনে ছোট হবে, কিন্তু তাতে কমকথায় বেশী বলা হবে। বাজে কথা কমই ছাপা হবে এবং যা ছাপা হবে তা সবাই পড়বে ও বুঝবে। দেশে

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গুণীর সমাদর বেড়ে যাবে, কারণ মার্জ্জিত ও শিক্ষিত লোকরাই তখন সাহিত্য-চর্চ্চা করবে। এতদিন ছাপাখানার সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগ না থাকায় যন্ত্রের উন্নতি বিশেষ-কিছু হয়নি; এবার থেকে তার উন্নতির সূচনা হবে।

বর্ত্তমানে প্রতি সভ্যদেশে হাজার হাজার বিদ্বজ্জনসভা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যসমিতি আছে। সভ্যদের স্বেচ্ছা-মিলনের ফলে সেগুলি জন্মলাভ করেছে এবং শিক্ষিত জনপদবর্গের সহানুভূতিতে সেগুলি পুষ্টিলাভ করছে। এক-একটি বিশেষ শাখা বা বিভাগ অবলম্বন করে জ্ঞান-বিস্তার ও আনন্দ-বিতরণের জন্যে তারা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করেন। সেখানে অর্থের কোন সম্বন্ধই নেই—পরস্পরের মধ্যে বিতরণ ও বিনিময়ে কাজ চলে, লেখকও নিজের আগ্রহে লেখেন, অর্থের বিনিময়ে নয়। কিন্তু এই সমস্ত পুস্তক-পত্রিকা অর্থের বিনিময়ে ছাপাখানায় ছাপবার জন্যে দেওয়া হয়, কারণ হাতের কাজের উপর শিক্ষিতজনের কিছু ঘৃণা আছে। তাঁদেরই সহানুভূতির ও চেষ্টার অভাবে যন্ত্রপাতির অবস্থা শোচনীয়। দেশে উদার ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে এগুলি সুচালিত হবে এবং বিদ্বজ্জন-সভা সাধারণের কাজে যোগ দিতে ইতস্তত করবেন না, এমনতর আশা আমরা রাখি। একক বা স্বতন্ত্র চেষ্টার চেয়ে সমবেত শক্তির প্রাধান্য কারুকে বুঝিয়ে দেবার দরকার হবে না। বর্ত্তমানে নানাদেশে সমবায়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চলছে, তাতে ভবিষ্যতে সে যে একটা মহাশক্তিতে পরিণত হবে, তা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমানে লেখককে সংবাদপত্র-সম্পাদক, ছাপাখানার সত্বাধিকারী বা পুস্তক-প্রকাশকের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়, ভবিষ্যতে লেখকের স্বাধীনতা বিশেষ বাড়বে, কারণ যাঁর নতুন-কিছু বলবার থাকবে তিনি সমজদার লোকের সাহায্যে সে-সব নিজেই প্রকাশ করতে পারবেন। এখন কতকগুলি লোক জ্ঞানের চর্চ্চা ও বিস্তারে মনযোগ দেবার শিক্ষা ও অবকাশ পায়, আমাদের কাম্য-সমাজে সকলেই সে সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে—তাতে বর্ত্তমানের চেয়ে সমজদার লোকের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে।

সাহিত্যের ও সংবাদপত্রের চারদিকে যে ব্যবসার আবহাওয়া আছে, সেটা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তার শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। অর্থশালী লোকের বা দলের খেয়াল বা লাভের জন্যে লোকে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে না এবং জনসাধারণ সে-সব সভার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। যাঁরা দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ও খবরের কাগজের ভিতরের খবর জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের মতে সায় দেবেন। এতদিন তাঁরা অন্যায়কে নির্ব্বিবাদে সহ্য করেছেন, শক্তির অভাবে তাকে দমন করতে সাহস করেন নি, ভবিষ্যতে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বা শিল্পের সাধকেরা কেবলমাত্র ভক্ত ও রসিকের জন্যে আবিষ্কার ও সৃষ্টি করবেন—পরের মুখচেয়ে

তখন ভয় পাবার কোন কারণ থাকবে না। সকলবাধামুক্ত হয়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপোষক হবে!

শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা তাঁরাই সুন্দর ভাবে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে করতে পারেন, যাঁরা কায়মনোবাক্যে স্বাধীন। যতদিন-না মানুষ শাসন-তন্ত্রের, ধনবান মহাজন বা অর্দ্ধশিক্ষিত মাঝারিদলের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, ততদিন তার কোন মঙ্গল নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই জানাশুনা আছে যে, শাসন-তন্ত্রের সাহায্য কোন কাজেরই নয়। তাতে উপকারের বদলে বরং সমূহ ক্ষতি হয়। একে ত শাসন-তন্ত্র শতের মধ্যে হয়ত একজনকে সাহায্য করতে পারে; তাও এই কড়ারে যে, পুরানো দস্তুরের বাঁধা পথে তাকে চলতে হবে—নতুন কথা বলবার অধিকার তার থাকবে না—স্বাধীনতার বদলে এ সাহায্য কেউ কি চাইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয় বা শাসন-তন্ত্র গঠিত সমিতির অধিকারের বাইরেই জগতের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে। সারাজীবন অনশন ও নানা অভাব-অনটনের সঙ্গে অবিরাম লড়াই করে যাঁরা মানুষের উন্নতিসাধন করেছেন শাসন-তন্ত্র তাঁদের সাহায্য করবার জন্যে একটা আঙুল পর্য্যন্ত তোলে নি। শাসনতন্ত্রের সাহায্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমেরিকায় ও য়ুরোপে নানা সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং পরস্পরের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যে ও চেষ্টায় কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। এর-মধ্যে যা-কিছু গলদ আছে বিদ্রোহের পর স্বাধীন সমাজে মৈত্রী ও সহানুভূতির প্রসাদে সেগুলি দূরীভূত হবে।

যন্ত্রাদির উদ্ভাবনের পথে শাসনতন্ত্রের ও মহাজনী ব্যবস্থার বাধা বিস্তর; বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবও এ পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। নিজের লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে কোন উদ্ভাবক বা আবিষ্কারক কাজে হাত দেন না—দেশের উপকার ও আনন্দের জন্যেই তাঁর সাধনা তাঁর কৃচ্ছ্র সাধন। মনের স্বাধীনতা যেখানে, চিন্তার অবাধ গতি যেখানে, সেখানেই শিল্পীর ও উদ্ভাবকের স্বর্গ এবং সামাজিক পরিবর্ত্তন সেই স্বর্গকে মর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা করছে। শিল্পী ও উদ্ভাবকের চেষ্টায় নানা যন্ত্রাগার স্থাপিত হবে এবং অবসর-সময়টুকু তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে আকার দেবার চেষ্টা করবেন—সফল হোন বা বিফল হোন, কারও কাছে সেজন্য অনাবশ্যক জবাবদিহি করতে হবে না এবং বারবার চেষ্টার অধিকার থেকেও তাঁদের কেউ বঞ্চিত করবে না। অভাব ও বাধার সঙ্গে লড়াই করে যে-সাধনা, তার হাত থেকে তাঁরা পরিত্রাণ পাবেন, এটি নিতান্ত আকাশ-কুসুম বা অলীক স্বপ্ন নয়। য়ুরোপের অনেক রাজধানীতে এমনতর যন্ত্রাগার স্থাপিত হয়েছে এবং তার কাজ পূরাদমেই চলছে। তার মধ্যে ত্রুটী অবশ্যই আছে, কারণ শাসনতন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়, তার উপর পরস্পরের সহানুভূতিরও যথেষ্ট অভাব। এই সমস্ত বাধা দূর করে' মানুষের চেষ্টাকে সফল

করাই আমাদের বিদ্রোহের প্রধান কর্ত্তব্য।

চিত্র প্রভৃতি চারুশিল্পের অবনতি হয়েছে বলে অনেকে অনেক দুঃখ করেন, 'য়ুরোপীয় নবযুগে' যে বিরাট শিল্পের উদ্ভব ও উন্নতি হয়েছিল বর্ত্তমানে তার আদর্শ থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ইদানীং শিল্পকৌশলের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং হাজার হাজার মাঝারী শক্তিশালী লোক শিল্পের নানা বিভাগে ব্যাপৃত আছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে শিল্প যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ কলাকৌশলের যতই উন্নতি হোক, শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রাণের প্রেরণার আভাস আমরা কদাচিৎ পাই। প্রাণের প্রেরণা আসবে কোথা থেকে, আমরা নিজের হাতেই সে পথ যে রুদ্ধ করেছি! জীবনে যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু বিরাট তার মধ্যেই আর্টের প্রেরণা আছে,— কিন্তু আমরা আজ সঙ্কীর্ণতার ও জড়তার অন্ধ উপাসক। আর্ট, সৃষ্টিরই নামান্তর এবং সৃষ্টিমাত্রই নূতন। কিন্তু হাজার হাজার কৌশলী শিল্পীর মধ্যে ক্বচিৎ দু-একজন হয়ত চিরনবীন, চির-সুন্দর প্রাণের আভাস জীবনে একবার মাত্র উপলব্ধি করেন, বাকী সকলেই নিতান্ত গতানুগতিক এবং পুরাতনের মোহে অন্ধ। প্রয়োজনের বাঁধা-পথে বা পুঁথির বাঁধা গতে এ প্রেরণা পাওয়া যায় না, জীবনের অকারণ পুলকের উৎস-মুখেই এর সন্ধান মেলে। কিন্তু সাধারণের এ সন্ধানে যাত্রা করবার মত আগ্রহও নেই সাহসও নেই। স্বার্থসাধনের পাষাণ চাপিয়ে মাঝারি দল তার স্রোত বন্ধ করে দিয়েছে—স্বাধীন জীবন লাভের চেষ্টাই তাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়।

গ্রীক শিল্পী বা নবযুগের শিল্পীর দল যা সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে দেশের নাড়ীর টান ছিল, প্রাণের সাক্ষাৎ-যোগ ছিল। দেশের আগম পুরাণ, সুমহান চিন্তা-ধারা ও তার অন্তরনিহিত প্রাণটিকে তাঁরা রেখায় ও রংয়ে বা পাষাণে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং প্রাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ-যোগ ছিল বলেই দেশবাসীর কাছে তাঁদের হাতে-গড়া শিল্প সত্য-সুন্দরের প্রতিমা বলে পূজা পেয়েছে। শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা এইখানেই। গ্রীক শিল্প বা নব-যুগের শিল্প এখন সভ্যদেশের যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। সহরের বুকের উপর যাদের আসন ছিল, শত শত জনপদের যারা আনন্দের ও পূজার সামগ্রী ছিল, আজ তারা মৃতের জড় কঙ্কালরাশির মধ্যে স্তূপীকৃত। তখনকার কালে দেশবাসীর মধ্যে মেলামেশার যথেষ্ট সুবিধা ছিল, তার ফলে নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা একতা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে সে মিলন-ক্ষেত্রটি লোপ পেয়েছে। এখনকার সহর যেন লোকের মেলা, এখানে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ই নেই, মনের বিনিময় ত স্বপ্ন-কথা; সহর এখন অর্থ-উপার্জ্জনের স্থান; পরকে দাবিয়ে, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে আত্মপ্রাধান্য আত্মপোষণ যাদের মূলমন্ত্র, জীবনের লক্ষ্য, তাদের মধ্যে সহানুভূতি, মনের মিল থাকবে কেমন করে? অর্থশালী মহাজন ও কলের মজুর হচ্ছে নেকড়ে

বাঘ ও মেষশাবক; এই বিপর্য্যয় বিরোধী অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকা অসম্ভব। উভয়ের এক মাতৃভূমি থাকতেই পারে না, আর চির-দাসের মাতৃভূমিও নেই, সব জায়গাই তার পক্ষে সমান—মাতৃভূমি তার, যে স্বাধীন, যে আত্ম-বিশ্বাসী।

আমাদের শিল্প বাবুয়ানার শিল্প, আমাদের সাহিত্য বিলাসীর সাহিত্য। এ সাহিত্যে, এ চিত্রে কর্ম্মজীবনের কাব্য তেমন জমে না, কর্ম্মজীবনের মূর্ত্তি তেমন ফোটে না। তার কারণ, শিল্পী কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য থেকে আপনাকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার চেষ্টা করেন—তাঁর এ শুচি-বায়ুর ফলে তাঁর নিজের ত ক্ষতি হয়েছেই, বেশীর ভাগ, শিল্পের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়। কায়ক্লেশে প্রাণধারণের জন্যে দেহের রক্ত ও মনের স্বাধীনতা বিক্রয় করে কল-কারখানায়, মাঠে, খনিতে বাধ্য হয়ে পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দ নেই স্বীকার করি, কিন্তু স্বাধীনভাবে দশের উপকারে কাজ-করায় যে যথেষ্ট আনন্দ আছে এবং এই আনন্দের প্রকাশই যে যথার্থ কাব্য ও চিত্র, এ-কথা না-মানা চলে না। কর্ম্মক্ষেত্রে নরনারীর মিলন-সঙ্গীত কাব্যে গান করবেন, চিত্রে রেখা-সম্পাতে ফুটিয়ে তুলবেন তাঁরা,—যাঁরা কর্ম্মজীবনের দুঃখের সংঘাত ও সুখের আস্বাদ প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন, নিজের হাতে সামাজিক জীবনের নূতন মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন। এতদিন যে-সব চিত্র অঙ্কিত ও মূর্ত্তি খোদিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাচুর্য্যই বেশী, বলিষ্ঠ প্রাণের ছাপ খুব কম। পটের ছবি বা পাষাণের মূর্ত্তি যদি পটকে, পাষাণকে অতিক্রম না করে, যদি প্রাণের আনন্দ ব্যক্ত না করে, তবে সে ব্যর্থ পরিশ্রমে লাভ কি?

এ-সব কেবলমাত্র সেই সমাজে সম্ভব, যেখানে জীবন-যাত্রা সহজ সরল ও সুন্দর,—শিল্প যেখানে মাঝারি দলের বিলাসের বস্তু নয়, জন-সাধারণের আনন্দের সামগ্রী। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হলে পুরাণো ব্যবস্থা দূর করতে হবে এবং আমাদের কাম্য সামাজিক পরিবর্ত্তন ঠিক সেই কাজটিই করতে চায়।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেম

হা-হুতাশের অন্ধকারে নেইক আমার কেউ সাথী,
প্রেমের সাধন করছি কেবল কেঁদে কেঁদে দিনরাতি!
কাম-কামনার ঊর্দ্ধলোকে পুণ্য প্রেমের বাসভূমি,
সেথায় আজো যাইনি আমি, মিছাই ফুলের গাল চুমি!

মিছাই কেবল গভীর রাতে আঁকড়ে ধরি জ্যোস্‌না‌কে,
জানিনে সে পালায় কিসে আলিঙ্গনের কোন্ ফাঁকে!
এমনি করে কত নিশীথ কেঁদে বেড়াই ময়দানে,
জানে গাছের রাতের ছায়া, জানে আমার মন জানে!

জ্যো'স্না রাতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা একলাটি,
আশায় আশায় রাত কাটানো, শেষে বোঝা সব মাটি!—
এইটি আমার চিরদিনের জেনে শুনে ভুল করা,
এত যে ভুল করছি তবু প্রেমের আশায় বুক ভরা!
প্রেমের পরিচয়টি নিতি পাই গো প্রতি নিশ্বাসে,
তাইতো তাকে পাবার আশায় আকুল গভীর বিশ্বাসে।
কাম-কামনার ধাপে ধাপে উঠছি ধীরে প্রেম-লোকে,
ভয়-ভাবনার ধার ধারিনে, ভয় করিনে দুখ-শোকে!

কাজ আছে গো কাজ আছে এই কামের ধূপ ও গুগ্‌গুলে,
কোকিল কেবল পরাণ মাতায়, মাতায় নাকি বুল্‌বুলে!
দেহের রূপের সুধা যদি প্রেমের ক্ষুধা নাশ করে,
চাইনে তেমন মিলন আমি, জ্বলবে আগুন অন্তরে!
কিসের পিছে ছুটছি মিছে, পাইনি তো প্রেম এক ছিটে!
পাবার আশাই যাচ্ছে বেড়ে, জীবন কোথা হয় মিঠে!
প্রেমের পূজা চলবে তবু প্রাণের কুসুম-চন্দনে,
ভোগ-লালসায় এই জীবনের কাটবে না দিন ক্রন্দনে!

কামের শুধু নই পিয়াসী ও প্রকৃতি সুন্দরী!
আপন-ভোলা প্রেমের লোভে গান গাহি লো গুঞ্জরি'!
যখন তোমার রূপের মাঝে পুলক লভি এক কণা,
তখন ওগো তখন আমি এক নিমেষে উন্মনা!
এক পলকের সুখের সাড়ায় হৃদয়-সারঙ্ ঝঙ্কৃত,
সেই ক্ষণিকের সুখটি কবে হবে জীবন-ব্যাপৃত!
হাল্‌কা সুখে প্রাণ বাঁচে না, এই পাওয়া তো কাল-গুণে;
তাই তো প্রেমের পাগল আমি যৌবনের এই ফাল্গুনে।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কুকী

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ৭৫৪৭ জন কুকী আছে। *তন্মধ্যে ৩৭৭৭ জন পুরুষ, অবশিষ্ট ৩৭৭০ স্ত্রী। 'কুকী' ইহাদিগের, জাতীয় ভাষার শব্দ নহে। স্বভাষায় কুকীগণের জাতীয় নাম 'হ্রিয়েম্'। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর কুকী আপনাদিগকে লুছাই নামক এক পৃথক্ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মেইতেই ভূমি, এবং দক্ষিণে আরাকান—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূমি কুকিজাতির আবাস-স্থান। ইহারা প্রধানতঃ ২৪ ভাগে বিভক্ত; যথা—

১। পাওতু বা পাইতু (পয়টু)।

২। বংছের।

৩। বেলঠুট্।

৪। থাংলুয়া।

৫। লাইক্ষং।

৬। বংখই।

৭। মিজেল।

৮। নামতে।

৯। ছাল্যা।

১০। অমড়ই।

১১। চোটলাং (চোটলাং ও ফাটলেই। ত্রিপুররাজ্যের কুকিদিগের সহিত ইহাদিগের খুব কমই সম্পর্ক হইয়া থাকে। 'ফাট্লেই' শ্রেণী ত্রিপুরা জেলায় বাস করে।)

১২। থরেং।

১৩। বাইফেই।

১৪। চন্লেল্।

১৫। বল্‌তে।

১৬। বিয়েতে।

১৭। বালতে।

১৮। হ্রাং চস্।

১৯। রাংচিয়ে।

২০। ছাইলই।

২১। জংতে।

২২। পাট্লেই।

২৩। বেতনু।

২৪। পাইতে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত ৫ সম্প্রদায়ের কুকী ত্রিপুররাজ্যে বাস করিতেছে। কৈলাসহর বিভাগেই প্রধানতঃ এই রাজ্যের কুকীগণের বাস।

এই ২৪ শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নয়। প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে যে পার্থক্য ইহাদের মধ্যেও তাহাই। কুকিদিগের আচার ব্যবহার তিপ্রাদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কোন কোন অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদের শ্রেণী-সমূহের মধ্যে পরস্পর আচারব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায় যাবতীয় পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া থাকে এবং জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে না। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তবে পরকাল বা পুনর্জন্ম মানে না। কুকিদিগের সকল রকম ধর্ম্মানুষ্ঠানই

রোগশান্তি প্রভৃতি ঐহিক ফলের প্রত্যাশায় হইয়া থাকে। ইহারা মনে করে যে গবয়, ছাগী, কুক্কুট, প্রভৃতি বলিদান করিয়া পূজা করিলে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। ইহাদের কোন শ্রেণীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। দুই তিন শ্রেণী এক পর্ব্বতে কিংবা একশ্রেণী দুই তিন পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

শিক্ষা। কুকিগণ প্রায়শঃই অশিক্ষিত, তবে ত্রিপুররাজ্যের কুকিগণ ক্রমশঃ শিক্ষা লাভ করিতেছে। কুকি বালকগণের শিক্ষার জন্য সম্প্রতি এ রাজ্যে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

রাজা। তিন জন কুকি সর্দ্দার ত্রিপুররাজদরবার হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছে। কুকি-রাজত্রয় বঙ্গভাষায় আলাপ করিতে সমর্থ।

ধর্ম্ম—পাথিয়েন নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম কুকিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করে। পাথিয়েন প্রচার করিল—"একজন এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ভিন্ন অন্যান্য অনেক আরাধ্য দেবতা আছেন"। পাথিয়েন সামাজিক নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করে।

পরে তার্পা নামক আর এক ব্যক্তি প্রথম ধর্ম্মপ্রচারকের ধর্ম্মমত, কার্য্য-প্রণালী রীতিনীতি বজায় রাখিয়া পাথিয়েনের ধর্ম্মের কিছু সংস্কার সাধন করে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক নূতন নূতন নিয়মেরও প্রবর্ত্তন করে।

কুকিদিগের ধর্ম্ম তার্পা দ্বারা সংস্কৃত হইলেও বরাবর একভাবেই চলিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু আধটু বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছে তাহাদের মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। হিন্দুগণ যেমন 'হরি' 'নারায়ণ' প্রভৃতি বলিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ তাঁহাকে 'লাচী' বলিয়া সম্বোধন করে।

কুকিগণ যখন তাঁহাদের আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া 'দারলঙ্' পর্ব্বতে বাস করিতে আরম্ভ করে সেই সময় পাথিয়েন তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করে। সে সাহসী যোদ্ধা বলশালী ও পরোপকারী ছিল। পাথিয়েন নিজে না খাইয়া বাড়ীর সকলকে আহার করাইত। কাহারও পীড়া হইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত। কাহারও কোন খাদ্যের অভাব হইলে যে কোন উপায়ে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দিত। কুকিরা কাজেই তাহাকে পরমেশ্বরের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। পাথিয়েন প্রথম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া কুকিরা তাহাদের দেব-দেবীর নামের পরে পাথিয়েনের নাম যোগ করিয়া দিত।

আরাধ্য দেবতা

১। কুকিদিগের আরাধ্য দেবতাদিগের মধ্যে 'লোচরী পাথিয়েন' একটি। 'লোচরী দেবতার' সপ্তমুণ্ড বলিয়া কুকিদের বিশ্বাস। ঐ দেবতার অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পূজা বাড়ীতেই হইয়া থাকে। অবস্থানুসারে লোকে এই পূজায় হংস, মোরগ, বরাহ, মহিষ, গণ্ডার ও গবয়

বলি দিয়া থাকে। এই পূজায় কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় না, কেবল কাঁচা বাঁশ দিয়া দুইটী নিশান উচ্চমঞ্চে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

২। 'তুই পাথিয়েন'—এই পূজা জলের নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। চাউল, সাদা রঙের মুরগী, সাদা রঙের 'পার্চ্চা' হংস এমন কি পারাবত পর্য্যন্ত এই পূজায় বলি দেওয়া হয়। কুকি ভাষায় 'তুই' শব্দে জল বুঝায়। এই পূজাপদ্ধতিতে আমাদের গঙ্গাপূজার সামান্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। 'ষাপিতে পাথিয়েন'—এই পূজায়ও কোন প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না তবে অবস্থানুসারে বলিদানের বিধি আছে—'যাপিতে' শব্দের অর্থ লছ্মী বা লক্ষ্মী। এই দেবী লক্ষ্মীস্বরূপা। ইনি কৃষিকার্য্যের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, গৃহকর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মী। কুকিরা 'জুম্' করার পূর্ব্বে ও পরে যাপিতে পাথিয়েনের পূজা করিয়া থাকে।

৪। 'খুয় পাথিয়েন'—বাড়ীর সমস্ত লোক একত্র হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাড়ীর ভিতর একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই পূজা হয় এবং কুকিরা ছাগ, বরাহ, হংস, পারাবত, মহিষ, গণ্ডার ও গবয় বলি দিয়া থাকে। কুকিদের নিকট এই পূজাটী বড়ই আমোদজনক। ইহারা স্ত্রীপুরুষ পূজাস্থলে একত্র হইয়া মদ্য মাংসাদি ভোজন এবং নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকে। খুয় পাথিয়েন পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের মধ্যে যে কোন এক সময়ে এই পূজার অনুষ্ঠান হইলেই হইল। কুকিদের নিকট এই পূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। দুই একজন কুকী ইহাকে 'কের পূজা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু ইহার সহিত 'কের' পূজার কোনই সংশ্রব দেখা যায় না। পূজার কার্য্যপ্রণালী কতকটা কালী পূজার অনুরূপ। এই পূজায় কোন প্রতিমা থাকে না। কাঁচা বাঁশের নিশানে ফল ইত্যাদি ঝুলাইয়া কাঁচা বাঁশ সংযোগে উচ্চ মঞ্চে উড়াইয়া দেয়। দুইদিন পর্য্যন্ত 'খুয় পাথিয়েনের' পূজা হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় দিবসে এই পূজা শেষ হয়। পূজার দুই দিনের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কেশরচনা (চুল আঁচড়ান) নিষিদ্ধ। পরিধানের কিংবা ব্যবহারের বস্ত্রাদি এবং ধান্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য রৌদ্রে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় কেহ সূতা কাটিতে কিংবা বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে না। অন্য বাড়ীর লোক পূজা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে পূজাবাড়ীর লোকও অন্য বাড়ীতে যাইতে পারে না। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে পূজাবাটীর লোক অন্য বাড়ীতে আসে তাহা হইলে তাহাদিগকে জরিমানা দিতে হয়। অবস্থানুসারে টাকা পয়সা, আহার্য্য দ্রব্য এমন কি মদ্য পর্য্যন্তও জরিমানা স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির উপর পূজার ভার ন্যস্ত থাকে, তাহার নিকটেই জরিমানা দাখিল করিতে হয়। সাধারণতঃ উজীর বা মোক্তারই এই ভার পাইয়া থাকে।

৫। 'শিবপূজা'—কুকিদিগের মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার পূজাকে ইহারা 'শিব

পূজা'—এই আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুগণের শিবপূজার সহিত ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। এই পূজা কুকিদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহাতে ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে।

জুম কাটার পূর্ব্বে পল্লীবাসী জন সাধারণ মিলিত হইয়া এই পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। গবয় বলি এই পূজার প্রধান উপকরণ।

এই বলির গবয়টীকে অতি নির্দ্দয়ভাবে বিনষ্ট করা হয়।

বধ্য গবয়ের সর্ব্বাঙ্গে চুণের ফোঁটা দিয়া পূজায় সমবেত কুকিগণ এক একটী চুণের ফোঁটাকে নিজ নিজ লক্ষ্য বলিয়া মনোনীত করে। পরে পূজান্তে কিয়দ্দূর হইতে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহারা গবয়ের দেহে নিজ নিজ বল্লম নিক্ষেপ করে। যাহার বল্লম লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হয় সে ভাগ্যবান্ ও যাহার বল্লম লক্ষ্যভেদ করিতে পারে না সে দুর্ভাগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। লক্ষ্যভেদ কার্য্য শেষ হইলে অতি নিষ্ঠুরভাবে গবয়টীকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস সম্মিলিত ব্যক্তিগণ ভোজন করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন কুকিদের অনেক ছোট ছোট পূজা আছে। প্রত্যেক পূজায় কুকিরা নিজ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে। এই মন্ত্রগুলি তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না। কুকিদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য এই—তাহারা পীড়া হইলে কোন ঔষধ ব্যবহার করে না, রোগ-মুক্তির জন্য নানাবিধ পূজা করে এবং মোরগ, ছাগ, বরাহ, পারাবত প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। ইহাতেই তাহারা রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

এক শ্রেণীর কুকি কোন নির্দ্দিষ্ট দেব-দেবীর পূজা করে না।

জন্মোৎসবাদি

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে কুকিদিগের অশৌচ গ্রহণের বিধি নাই। ইহারা জাত-সন্তানের কল্যাণের জন্য কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না।

অবস্থাভেদে দশ দিন হইতে তিন মাসের মধ্যে মাতা পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ মতে সন্তানের নাম-করণ হইয়া থাকে। কুকিগণ সেইদিন আত্মীয়-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং সকলে সমবেত হইয়া একসঙ্গে শিকারে গমন করে, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র মদ্য মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

রাজা, উজীর, মোক্তার, প্রভৃতি অবস্থা-পন্ন ব্যক্তির সন্তান হইলে রণবাদ্য ও নৃত্য-গীতাদি হইয়া থাকে।

বিবাহ

কুকিদের বিবাহ দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার বিবাহ অভিভাবক ও পিতা মাতার নির্ব্বাচনে ও উদ্যোগে হইয়া থাকে। অপর প্রকার বিবাহে পাত্র পাত্রী উভয়ে গোপনে আলাপ করিয়া পরস্পরের মনোনয়ন স্থির হইলে তাহারা প্রকারান্তরে তাহা আপন আপন অভিভাবকের গোচর করে; অতঃপর অভিভাবকগণ একত্র হইয়া বিবাহ স্থির

করেন। বিবাহ কন্যার পিত্রালয়েই হইয়া থাকে। কুকিদের বিবাহ মাত্রে বর-পক্ষ হইতে পণ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। রাজকন্যার বিবাহ কালেও পণগ্রহণ করা হইয়া থাকে, পরন্তু এ ক্ষেত্রে পণের টাকা অধিক পরিমাণেই দিতে হয়। বিবাহের পণ ২০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত দেওয়ার নিয়ম আছে। পাত্রের পক্ষ হইতে যদি বিবাহের দিন কোন কারণে পণের টাকা দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে পাত্র-পক্ষ ৫।৭ বৎসরের মধ্যে কিছু কিছু করিয়া দিলেও বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের পর যেদিন বর-কন্যা এক শয্যায় শয়ন করিবে সেইদিন বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নগদ টাকা অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান্ দ্রব্য যৌতুক দিতেই হইবে। বরপক্ষকে ইহা হইতে কোনওরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয় না। কন্যা বিবাহের পর যখন শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যাইতে পারে না। শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় কন্যার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবককে স্বকীয় অবস্থানুসারে (কন্যার সহিত ?) বস্ত্র-শয্যাদি দিতে হয়। যে পিতামাতা যত বেশীদিন কন্যার বস্ত্র নিজালয় হইতে যোগাইতে পারিবে, বৈবাহিকদিগের নিকট তাহার তত বেশী সম্মান হইবে। বৈবাহিক সম্বন্ধে কুকিগণের পক্ষে ইহা অতি সম্মানের বিষয়।

কুকিদের মধ্যে কোন ক্রমেই ১০ বৎসরের পূর্ব্বে কিংবা ২৫।৩০ বৎসর বয়সের পর কন্যার বিবাহ হয় না। সচরাচর কন্যা প্রাপ্তযৌবনা এবং জুমকার্য্য করিতে সমর্থ হইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পর কোন কারণবশতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ইচ্ছায় বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে তাহাকে জরিমানা স্বরূপ অপর পক্ষকে নগদ ১৬৲ টাকা দিয়া বিবাহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লইতে হইবে। এইরূপে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে পর কন্যার স্থানান্তরে বিবাহ হইলে তাহাতে সমাজ প্রতিবন্ধক হয় না।

কুকিদিগের বিবাহের কোন বিশেষ দিন, মাস, বার প্রভৃতি কিছুই নাই। কন্যার বয়স অধিক হইলেও উভয়ের মনোনয়ন-প্রথায় বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কোনরূপ মন্ত্রপাঠ করিতে হয় না। কন্যার বাড়ীতে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন মিলিত হইয়া বর ও কন্যাকে সভাস্থলে আনয়ন করে, অতঃপর বর কন্যাকে মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া উভয়ের মধ্যস্থলে একটী মদের কলসী রাখিয়া দেয়। ইহার পর যখন বর-কন্যা দুইটী নলের সাহায্যে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে তখন কন্যার পিত্রালয়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সে সেখানে উপস্থিত হইয়া বর-কন্যার দুই গুচ্ছ কেশ একত্র বাঁধিয়া দেয় এবং দম্পতীর মদ্যপান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বর বা কন্যার সমবয়স্ক কেহ আসিয়া ঐ বন্ধন মোচন করে এবং তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া মদ্য মাংস খাইয়া থাকে। আহারান্তে

ঐ দিনই তাহাদিগের বাসরশয্যা হয়। যদি কোন কারণে যৌতুকাদির অভাব হয় তাহা হইলে ২।১ দিন পরেও বাসরশয্যা হইতে পারে।

সমাজ

কুকিদিগের মধ্যে যে কয়েকটী শ্রেণী আছে তাহাদের মধ্যে আহারাদি বিষয়ে কোনও বাধা নাই; সকলেই একত্র ও একপাত্রে পান ভোজন করিতে পাবে। বিবাহ বিষয়ে শ্রেণী বিশেষের আপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ এক শ্রেণীর নাম 'ঠাঙ্গুর' (?)। ইহারা রাজার জাতি। আর এক শ্রেণীর নাম 'চেঙ্‌ই', ইহারাই কুকিদের পূর্ব্বতন রাজবংশীয় ছিল। ইহাদের সহিত ঠাঙ্গুরদের বিবাহাদি হইতে পারে। বর্ত্তমান কালে এই বংশের অধস্তন পুরুষের নাম লাল্‌বুঙ্‌ ঠোমা বাহাদুর। তৃতীয় শ্রেণীর নাম 'পালিয়েন'। ইহারাও কুকিদিগের মধ্যে সম্মানিত বটে তবে রাজারা প্রায়ই ইহাদিগের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে সুন্দরী কন্যা থাকিলে রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর নাম রিভুঙ্‌,—এই বংশের পূর্ব্বতন পুরুষ (পিতা) রাজা ছিলেন। কিন্তু মাতা সাধারণ ব্যক্তির ঘর হইতে গৃহীত। পঞ্চমশ্রেণী জাদেঙ নামে পরিচিত। ষষ্ঠশ্রেণীর নাম চেইহাঙ্‌, ইহাদের সম্মান রিভুঙদিগের অপেক্ষা কিছু কম।

সপ্তমশ্রেণী সাধারণ কুকী। ইহারা সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী; ধর্ম্মে ও রীতি-নীতিতে কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

কুকিদের প্রত্যেক বাড়ীতে একজন উজীর কি মোক্তার থাকে; ইহারা প্রধান-স্বরূপ হইয়া উক্ত বাড়ীর বিচার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের বিচারাধীন থাকিয়া ইহাদের পরামর্শমতেই বাড়ীর সকলে কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। একজন রাজার দশ বারজন মোক্তার থাকে। একজনের অধিক উজীর থাকিতেও বাধা নাই।

এক রাজার জিম্মায় দশ বার খানা বাড়ী থাকে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন রাজার বংশ লোপ পায়, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীই রাজ্য পাইয়া থাকে।

কুকি রাজাদের পুত্রই সাধারণতঃ উত্তরাধিকারী হয়। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাও না থাকিলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য পায়। কুকিদের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণের পদ্ধতি অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই।

অধুনা কৈলাসহরের এলাকায় তিন জন কুকি রাজা এবং একজন কুকি সর্দ্দার আছে। রাজাদের নাম 'মুরচুঙ্গা রাজা' 'লালচুক্‌থামা রাজা বাহাদুর' ও 'বানকাম্পুই' রাজার পুত্র 'ঙুরচাইলিএন'। সর্দ্দারের নাম 'লালবুঙঠোমা' বাহাদুর। এই চারিজনের অধীনে প্রায় ৪৮০ ঘর অধিবাসী। এক এক ঘরে ১২ হইতে ৩০ জন বাস করে।

রাজাদিগের মধ্যে মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে জন-সংখ্যা অধিক, কিন্তু লালনাই

ও রচাইলিএনের আরও অধিক। মুরচুঙ্গা রাজার অধীনে ১৭৫ হইতে ২০০ ঘর অধিবাসী লালচুকমার অধীনে ১৩০ ঘর এবং বানকাম্পুইএর অধীনে ১৭৫ ঘর।

রাজা ও সর্দ্দারগণের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। সাধারণ কুকিদের বিবাহে ইহারা পণের টাকার অংশ পায়। যাহারা কোন কারণবশতঃ রাজাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে তাহাদের বিবাহের পণের টাকাও পাইয়া থাকে। কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে ইহারা তাহার মালিক হয়। কুকিদের মধ্যে বিধবার কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। যতদিন ঐ কন্যা বিবাহিত না হয় ততদিন রাজা তাহাকে প্রতিপালন করে। সম্পত্তি যাহা থাকে তাহা রাজাই গ্রহণ করে।

সাধারণতঃ কুকি বালিকার বিবাহে পণের টাকা যাহা পাওয়া যায় তাহা পিতা ভ্রাতা জ্যেঠা, খুড়া, মাতুল ও রাজা এই ছয়জনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়। ভ্রাতা কখনও পণের টাকার অধিকারী হইতে পারে না।

কন্যা বিধবা হইলে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে। প্রথম স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে (পুনর্ব্বার বিবাহ হইলেও) সে তাহার অধিকারিণী হইবে। যদি প্রথম বিবাহের পুত্র থাকে, তাহা হইলে সেই পুত্রই সম্পত্তি পাইয়া থাকে, কিন্তু কন্যা থাকিলে সম্পত্তি পায় না। বিধবার দ্বিতীয় স্বামীর প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোনই অধিকার থাকে না।

কুকিদের মধ্যে চোর, বদমায়েস ও মিথ্যাবাদীর সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজাই সাধারণতঃ কুকিদের অপরাধাদির বিচার করিয়া থাকে। রাজার বাড়ী দূরবর্ত্তী হইলে সামান্য সামান্য বিচার বাড়ীর মোক্তার অথবা উজীর সম্পন্ন করে, এবং দণ্ডলব্ধ অর্থ রাজার নিকট দাখিল করে।

পূর্ব্বে প্রথা ছিল যে, কোন বিবাহিত রমণী অন্যাসক্ত হইলে ভ্রষ্টা নারী ও লম্পট পুরুষকে বিচারার্থ সভায় আনয়ন করা হইত, পরে উভয়কে একত্র দণ্ডায়মান করাইয়া ভ্রষ্টা রমণীর স্বামীকে দিয়া তাহার কর্ণমূল ছেদন করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে ছেঙ্ নামক অস্ত্রদ্বারা লম্পট পুরুষটীকে বধ করা হইত। বর্ত্তমান লালচুক্থামা রাজা বাহাদুর এই লোমহর্ষণ প্রথা বন্ধ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, দুষ্ট পুরুষ তাহার পুরুষানুক্রমে রাজার গোলাম হইয়া থাকিবে। তবে দুষ্টা স্ত্রীর এক কর্ণ কাটিয়া ফেলা হইবে। ইহার স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। তজ্জন্য স্বামীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। কুকিদের মধ্যে ভ্রষ্টা রমণী অত্যন্ত নিন্দার পাত্র। পরম রূপবতী হইলেও ইহাকে কেহ গ্রহণ করে না। দুষ্টা পুরুষকেও কেহ গ্রহণ করে না; সেও সাধারণের ঘৃণাভাজন হইয়া থাকে।

কেহ কোন অবিবাহিত কন্যার সহিত কন্যার সম্মতিক্রমে সঙ্গত হইলে উভয়কে

পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয়। এরূপ স্থলে কন্যা অপ্রাপ্ত-বয়স্কা হইলে পুরুষের কর্ণযুগল ছেদন করাইয়া তাহাকে রাজার দাসত্বে নিযুক্ত করা হয়। আর কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হইলে দুষ্ট পুরুষের অবস্থানুসারে ১৬৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত জরিমানা হয় এবং তাহাকে মদ্য মাংসাদি উপচারে ভোজন করাইয়া পঞ্চাইতের সন্তোষ বিধান করিতে হয়।

বারবনিতা

কুকিদিগের মধ্যে বারাঙ্গনা আছে, কিন্তু বারাঙ্গনাগণ পল্লীমধ্যে স্থান পায় না; পল্লীর বহির্ভাগে তাহাদিগের জন্য পৃথক্ বাসস্থান নিরূপিত হয়।

অবিবাহিত বা বিপত্নীক যুবক কিংবা প্রৌঢ় ব্যক্তি ভিন্ন অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ কিংবা বিবাহিত যুবক) বেশ্যালয়ে গমন করিলে সে সমাজে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

মোক্তার বা উজীর

কুকি-সমাজে জাতিহিসাবে মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত হয় না। বাড়ীর মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজা মোক্তার বা উজীর নিযুক্ত করিয়া থাকে। তবে এই নির্ব্বাচনে বাড়ীর লোকদিগের সম্মতিও গ্রহণ করিতে হয়।

রাজদণ্ড নিবন্ধন যে অর্থ বাড়ী হইতে মোক্তারগণ গ্রহণ করে, তাহা তাহারা রাজার নিকট পাঠাইয়া থাকে। রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে ইহার কিয়দংশ মোক্তার-দিগকে প্রদান করে।

পুরোহিত—কুকিদিগের মধ্যে কোন্ জাতি পুরোহিত (পূজক) হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; যিনি পূজার কার্য্য শিক্ষা করেন তিনিই পূজা করিতে পারেন। বিশেষতঃ নিজের কর্ত্তব্য পূজা নিজে করিতে পারিলে তাহাতেও ক্ষতি নাই। অনেক বাড়ীতে মোক্তারের প্রতিই পূজার ভার ন্যস্ত হয় এবং মোক্তারই পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিয়া থাকে।

পর্ব্বদিন—কুকিদিগের কোন পর্ব্ব নাই। সুতরাং নৃত্য গীতাদিরও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি বন্য জন্তু অর্থাৎ বরাহ, শশক, গবয়, গণ্ডার, মহিষ, হস্তী, হরিণ ইত্যাদি শিকার করিয়া আনে, তবে সে বাড়ী প্রবেশ করিবা মাত্রই বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকে; 'গুঙ্' 'রশেম' 'ঢোল' 'দারতেঙ্' 'দারবু' প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে থাকে এবং সকলে একত্র সমবেত হইয়া মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজন করে। যুদ্ধ জয়ান্তে কেহ গৃহপ্রত্যাগত হইলেও ইহারা এইরূপ নৃত্যগীতাদি করিয়া মদ্য মাংস ভোজন করে।

আমোদ-প্রমোদ

ইহাদের আমোদ প্রমোদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অবসর পাইলেই বিশেষতঃ ভোজ উপলক্ষে ইহারা নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। নৃত্য করিবার উপযোগী ইহাদের কোন স্বতন্ত্র পোষাক নাই। বাঙ্গালীগণের

সাক্ষাতে নৃত্য গীতাদি করিতে হইলে পোষাক সামান্যরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। গান করিবার সময় কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা তাহারও গুণগ্রাম গাইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত কুকিদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

বাদ্যযন্ত্র

৮খানি বাঁশ ও বেত সংযোগে ইহারা লাউ দিয়া এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে। ইহার নাম 'রশেম'। কুকিদিগের যত প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে তন্মধ্যে ইহার শব্দই অতি মধুর।

বড় কাঁসরের মত বাদ্যযন্ত্রকে ইহারা 'গঙ্', 'গুঙ্' বা 'দারখুওঙ্' বলে। এই যন্ত্র ইহাদের নিজের তৈয়ারী, কোন স্থান হইতে কিনিয়া আনে না। ইহার শব্দ ১½/২ মাইল পর্য্যন্ত যায়। 'দারতেঙ্' বাঙ্গালী কাঁসীর মত।

'দাররিকু'—গঙের মত কিন্তু আকারে ছোট।

যুদ্ধ-সামগ্রী

কুকিদিগের প্রায় সকলেরই বন্দুক আছে, কুকিদের অপর যুদ্ধাস্ত্র চেম, টাকুয়াল দা, চাকলা (চেম) তীর (কুই বাঁশ দ্বারা তৈয়ারী)। তীর একটী লোহার ফলক। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী অস্ত্র আছে, সেগুলির নাম—চিলাই (বন্দুক), আদাং আবই চেমতে, চেমতে লুজুম, হ্রেই (কুড়াল), ছাইতিরকুওই (অঙ্কুশ) ইত্যাদি।

কুকিগণ সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ়লক্ষ্য। ইহারা এক প্রকার সর্ব্বভুক্। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহাদের ভক্ষ্য, সরীসৃপ-জাতিও কুকিদিগের প্রিয় খাদ্য। ত্রিপুরা-রাজ্যের কুকিদের এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে। একটী কুকুরকে মারিয়া তাহার উদর মধ্যে কিছু চাল প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই কুকুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করে, সেই দগ্ধ কুকুরের উদর-মধ্যস্থ অন্নই তাহারা পিষ্টক রূপে খাইয়া থাকে। কুকিগণ অতিশয় মদ্যপায়ী। পল্লীর স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া ইহারা মদ্যপান করে। জুম কাটার পরে ইহারা প্রায় দুই মাসকাল মদ্যপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া থাকে।

সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বর্ণের তারতম্য ব্যতীত চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু 'ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।' দেশ কাল পাত্র ভেদে রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। স্ত্রীলোকের কোমর মোটা অথচ প্রশস্ত ও কর্ণের ছিদ্র বড় হইলে কুকিরা তাহাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে। যাহার কর্ণের ছিদ্র যত বড় সে তত সুন্দরী। এই কারণে বাঁশের চোঙ্গা দিয়া কুকি-রমণী কাণের ছিদ্র বড় করিয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কুকিরা গৃহমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উলঙ্গাবস্থায় থাকিত, উলঙ্গ হইয়া স্নানাহার করিত। ইহাতে তাহাদের কোন রূপ নিন্দা বা লজ্জার কারণ নাই। রাজাও অনেক সময়ে গৃহাভ্যন্তরে নগ্নাবস্থায়ই থাকিত। অবসর মত অথবা কোন অন্য জাতীয় লোক গৃহে প্রবেশ করিলে স্ত্রী-

লোকেরা এক হাত প্রস্থ একখানা বস্ত্র পরিধান করিত। পুরুষেরা একটা মোটা চাদর গায়ে দিত। এই কারণে না জানাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে কুকিজাতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত।

মৃত্যু

কুকিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা অমানুষিকভাবে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অশৌচ-গ্রহণের প্রথা ইহাদিগের মধ্যে নাই। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ-লাভার্থ ইহারা আত্মীয় স্বজন সহ মিলিত হইয়া সমস্ত লোক মদ্যপান ও মাংসাদি-ভোজন করে। মৃত দেহ ঘরে রাখিয়াই ভোজনব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতঃপর যেস্থানে মৃত-ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে তন্নিকটবর্ত্তী কোন এক-স্থানে একটী মাচা তৈয়ারী করিয়া রাখে এবং মৃত ব্যক্তি আহার করিবে এই বিশ্বাসে মাচার উপর মৃতদেহের নিকট মদ্য মাংসাদি নিত্যই রাখিয়া দেয়। কুকিরা মৃতদেহ ৫ দিন হইতে ৯০ দিন পর্য্যন্ত ঘরে রাখে এবং প্রত্যহ খাদ্য সামগ্রী দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যত অধিক দিন মৃতদেহ ঘরে রাখিয়া এইরূপে আহার্য্য দিতে পারিবে, কুকি সমাজে তাহার সম্মান তত অধিক। সামর্থ্যানুসারে লোকে অল্পদিন বা অধিক-দিন মৃতদেহ বাড়ীতে রাখিয়া থাকে। অবস্থানুসারে এইরূপে ঘরে রাখিবার পর তাহারা মৃতদেহ কবরে সমাহিত করিয়া থাকে। কবরের স্থান পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত গভীর হওয়া আবশ্যক এক-জন পূর্ণাবয়ব মনুষ্য কবরের জন্য খনিত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে যাহাতে উপর হইতে দেখা না যায় এইরূপ গভীর করিয়া কবর খননের ব্যবস্থা ইহারা পছন্দ করে।

মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পর মৃতের জন্য আর আহার্য্য প্রদানের নিয়ম নাই। ইহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি নাই। কবর দিবারও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কোন মন্ত্রতন্ত্রেরও ইহারা ধার ধারে না। কোন পুণ্যবান্ বা পাপীর অপমৃত্যু হইলে উহারা তাহার ঊর্দ্ধগতির জন্য মাত্র পানভোজন করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অথবা অগ্নিদগ্ধ হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির শরীরের যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ঘরে আনিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম বজায় রাখিয়া কবর দেয়। মৃত ব্যক্তিকে কবর দিবার আরও এক প্রকার প্রথা আছে। রাজা, উজীর, মোক্তার অথবা অন্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার মৃতদেহ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাক্সের ভিতর নগ্নাবস্থায় প্রবেশ করাইয়া ঘরের কোন স্থানে মাচা পাতিয়া তাহার উপর মাটীর বিছানা করিয়া সবিশেষ যত্নে অগ্নি জ্বালাইয়া বাক্সটী এমন ভাবে ঝুলাইয়া রাখে যে তাহাতে অগ্নিদ্বারা বাক্সটীও নষ্ট হয় না এবং মৃতশরীর হইতে দুর্গন্ধও বাহির হয় না। এইরূপে তিনমাস অর্থাৎ ৯০ দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে ভোজনাদি করিয়া শেষে মহা সমারোহের সহিত মৃত-

দেহটীকে কবরস্থ করে। মৃতদেহ ঘরে থাকিতেও ঐ ঘরে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য হইতে কোন বাধা নাই।

মৃতদেহ সমাহিত করিবার সময় সামর্থ্যানুসারে তৎসঙ্গে বন্দুক, দা, ঝুলা, নূতন বস্ত্র, ভাত-তরকারী, মদ্য, মাংস প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের জিনিষ ও কতকগুলি টাকা অথবা কয়েকটী পয়সা পর্য্যন্তও কবরের মধ্যে দিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলেও ঐরূপ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সূতা-কাটার চরকা, সর্ব্বদা ব্যবহারের জিনিষ, কাপড়, বেম, (অর্থাৎ পইছা) মদ্য, মাংস ইত্যাদি সঙ্গে দিয়া কবর দিয়া থাকে। এই প্রথা মাত্র রাজাদিগের জন্য। অপরে এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিলেও তাহাদের কোন অপমান নাই। রাজা কিংবা অন্য অবস্থাপন্ন লোকের অর্থাভাব, লোকাভাব, স্থান পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ বাক্সে পুরিয়া মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়। তাহাতেও তাহাদের সম্মানের কোনরূপ হ্রাস বা পাতিত্যের কারণ নাই।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থান

যত প্রকার পশু পক্ষীর কঙ্কাল রাখা যায় ততই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। পূর্ব্বকালে কোনও কুকিরাজা বা সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে বিদেশীয় লোকগণ ভয়ে ঐ রাজা বা সর্দ্দারের সমাধির নিকটবর্ত্তী স্থানেও গমন করিত না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

রুষিয়ার কবিতা

ভোরের বেলা

(ফেৎ)

একটুকু উস্‌খুস্,
একটা কি ফিস্‌ফাস্,
কার মৃদু নিশ্বাস !
কার নিদ্ টুট্‌ল !

ভেদ করে' আব্‌লুস্
ঘুট্‌ঘুটে রাত্রির
শান-দেওয়া সাত তীর
নিঃসাড় ছুট্‌ল।

হিম-হাওয়া বিল্‌কুল্
ঢুল্‌ছিল নিউরে
উঠ্‌ল সে শিউরে
শিউলির স্পর্শে ;

বোল্ বলে বুল্‌বুল্,
আর পাখী দ্যায় শিস্,
চন্‌মনে চৌদিশ
ভরপুর হর্ষে।

সঙ্গিনী রাত্রির
শুকতারা রিম্‌ঝিম্‌
জাগ্রত রক্তিম
দীপ্তির সঙ্গে
গুল্‌গুলাবের ছোপ
লাল মেঘে লাগল,
ধূপছায়া জাগ্‌ল—
বর্ণের বর্ষা,

মোর প্রেম-পাত্রীর
ছায় চুমা চক্ষে
চক্ষেরি পক্ষ্মে
সুপ্তির ভঙ্গে।
মোর মানিনীর কোপ
অশ্রুতে ভাস্‌ল
চুম্বনে ফাঁসল
দশ দিক ফর্সা।

তুষার-নদীর জাগরণ

(বোরিস্‌ পেট্রোভ্‌স্কি)

গাংচিলেরা নদীর প্রেমে পাগল,—
ঘোম্‌টা তুলে নদী ঈষৎ হাসে ;
ঘুম্‌সুষমায় গড়া নয়ন-যুগল—
তায় পাখীদের অমল বিম্ব ভাসে।
জড়োয়া-জরির জাজিম্‌ ’পরে নদী
গা’টি গড়ায়, সূর্য্যি জড়ায় তারে,
তাতিয়ে তোলে মাতিয়ে নিরবধি
চান্‌কে তোলে চুম্বনেরি হারে !
ফুটে উঠে চুম্‌কি এলোকেশে,
ওঠে নদী ঘুমের ঘোরে হেসে !
খুব হুঁশিয়ার ঘুম-ভাঙা সুন্দরী !
দেখো দেখো সাম্‌লে থেকো—
আগুন না যায় ধরি’ !

সিন্ধু-শকুন নদীর প্রেমে পাগল
উল্লাসে ঘুর্‌পাক্‌ দে’ লাগায় চমক,
বুক পেতে সয় সকল ঢেউয়ের ধকল
ফুকারে তার অকূল জলের গমক !
“জাগো নদী ! মেল আঁখির পাতা,
আমরা তোমার প্রাণের স্বপন-ছবি ;
আমরা তোমার মন্‌-কামনার গাথা,
জাগো ! জাগো ! ডাকছে তোমায় রবি,
পাথ্‌না তুমি পাবে গো যার বরে,
সেই রবি ওই দাঁড়িয়েছে শিয়রে !’
পাথার ভরে সাগর-দরশনে
চল্‌বে তুমি প্রেমে-পাগল
গাংচিলেদের সনে।”

নিবেদন

(লার্মণ্টভ্)

তফাৎ হয়ে যাই যদি-বা তবু মনের মন্দিরে
দেবী তোমার ওই প্রতিমা থাক্‌বে জেনো থাকবে গো,
শূন্যদিনে সুখের স্মৃতি—হায় সে ভোলা যায় কি রে ?
এই পীরিতি হিয়ায় নিতি জাগ্‌বে সে যে জাগ্‌বে গো।

অন্য দিনে অন্য আঁখি করলে দাবী এই হিয়া
ভাব্‌ছ তুমি ভুল্‌তে এ প্রেম পার্‌ব ? প্রাণে সইবে সে ?
বিগ্রহ আর মণিকোঠায় তফাৎ যদিই হয় প্রিয়া,
দেবী দেবীই, মণিকোঠা—মণিকোঠাই রইবে সে।

তবু

(নেক্রাসভ)

ব্যর্থ মোদের হবে অনেক আশা,
অনেক সাধে পড়বে যে ছাই, জানি,
মানুষ ধূর্ত্ত,—ফন্দী জানে খাসা,
ভাঙ্‌লে বেড়ী গড়্‌বে নূতন, মানি ;
একশো-রকম গড়িয়ে শিকল, ধীরে,
ফিকির ক'রে জড়িয়ে দেবে ফিরে।

তথাস্তু, ভাই, মান্‌ছি সবি, তবু
এ কথাটাও স্পষ্ট আমার কাছে,
খুব বেশী দিন সইবেনা তাও কভু,
ভাঙার শক্তি—তাও মানুষের আছে ;
গড়্‌লে বেড়ী ভাঙ্‌বে বারেবার
এ বিশ্বাসে বুক বাঁধা আমার।

এ বিশ্বাসে বেঁধে সেতারটিরে
ঊষার আলোয় ধরেছি আজ তুলে,
অব্যাহতির আব্‌-হাওয়াতে ফিরে
সকল শিকল পড়্‌ছে খুলে খুলে !
ধ্রুব আশায় হে চিত্ত আমার
নবীন ঊষায় কর নমস্কার।

আপ্ত

(পুশ্‌কিন্‌)

ক্লান্তি-কাতর শরীর নিয়ে কণ্ঠে নিয়ে তৃষা
হারিয়ে দিশা ঘুর্‌তেছিলাম গহন অন্ধকারে,
ঝল্‌মলিয়ে ছ'খান ডানা ভেদ ক'রে মোর নিশা
দূত এল গো স্বর্গ হ'তে সেজে কিরণ-হারে !—
বুলিয়ে দিল চোখের পাতায় মম
আঙুলগুলি স্বপ্ন-সোহাগ সম।

সেই পরশে সুপর্ণ শ্যেন-পাখীর আঁখি হেন
দিব্য আঁখি ফুট্‌ল আমার—ফুট্‌ল আচম্বিতে,
সেই পরশে দিব্য-শ্রবণ পেলাম আমি, যেন
কর্ণ-কুহর উঠ্‌ল ভ'রে স্বর্গায়কের গীতে।
গগন-ভরা গোপন আনা-গোনা—
সাগর-চারীর সঞ্চারও যায় শোনা !

পাহাড়-তলীর ঝোপে-ঝাড়ে বাড়্‌ছে যে-সব শাখা
শুন্‌ছি তাদের বেড়ে-ওঠার ব্যস্ত কোলাহল,
ডিম্ব-মাঝে বাড়ছে ভ্রূণ যুক্ত দুটি পাখা—
শুন্‌ছি তাদের শিউরে-ওঠা—আনন্দে চঞ্চল !
হঠাৎ নুয়ে দূত সে স্বর্গচারী
চোখে আমার রাখ্‌ল দু'চোখ তারি।

ওষ্ঠাধরে নির্নিমেষে দৃষ্টি দিয়ে হেসে
হঠাৎ সে মোর পাপ-রসনা উপ্‌ড়ে নিল জোরে,—
উপ্‌ড়ে নিল মন্দ মায়িক মন থেকে নিঃশেষে
স্বর্গদূতের দু'হাত ব'য়ে রক্ত পড়ে ঝ'রে।
ছিন্ন এ মোর ঠোঁট শেষে ফাঁক ক'রে
তক্ষকেরি জিহ্বা দিল ভ'রে !

তলোয়ারে বুক ভেদ ক'রে হৃৎপিণ্ড নিল ছিঁড়ে,
তার বদলে বসিয়ে দিল জ্বলন্ত অঙ্গার ;
রইনু প'ড়ে মরুভূমে তপ্ত বালুর নীড়ে
মড়ার আকার স্পন্দহারা কেবল সংজ্ঞা-সার।
এম্‌নি—কতকাল গেল না জানি
শুন্‌তে শেষে পেলাম অলখ্‌ বাণী।

"আপ্ত! ওঠো, দ্রষ্টা শোনো প্রাপ্তি-পরম্‌-ক্ষণে
আজ্‌কে হ'তে আমার ইচ্ছা জাগ্‌ল তোমার মাঝে!"
হর্ষে, ভয়ে, কী বিস্ময়ে শুনি স্তব্ধ মনে
কর্ণে আমার বিশ্ব-ধাতার বাণী গভীর বাজে
আজো শুনি—"মশাল আমার নিয়া—
যাও—দুনিয়ার জাগাও যত হিয়া!"

সাঁচ্চা সল্লা

(ক্রাইলফ্‌)

"নেক্‌ড়ে বাঘের অত্যাচারে
ছাগল ভেড়া বাঁচবে না রে,
দারোগারে জানাই গিয়ে চল্‌!"
দাড়ি নেড়ে বল্‌লে রামছাগল।
তাই না শুনে তাড়াতাড়ি
ছাগলগুলো চল্‌ল ফাঁড়ি
সঙ্গে সঙ্গে তুড়্‌-তুড়া-তুড়্‌
চল্‌ল ভেড়ার দল।

থানায় গিয়ে ধন্না দিয়ে
বেলান্ত সব রয় দাঁড়িয়ে,
হুজুর শেষে এলেন সন্ধ্যেবেলা ;
কর্‌লে তখন রামছাগল এত্তেলা।

সব শুনে কন্‌ রূঢ় স্বরে
"কি হবে ছাই ডাইরী ক'রে?—
লেখালিখি—কাজ কি ক্যাসাদ?—
কাজ কি ফ্যাচাং মেলা?

তার চেয়ে শোন্‌ যুক্তি আমার—
ভাব্‌না কি ভয় থাক্‌বে না আর—
বুঝ্‌লি?—তোদের বোঝাব বল্‌ কত,—
মূর্খ মেড়া বোকা ছাগল যত,—
শোন্‌ তবে,—ফের নেক্‌ড়ে বাঘে
কর্‌লে জুলুম—ধর্‌বি তাকে—
টুঁটি টিপে আন্‌বি থানায়
ইঁদুর-ছানার মত।"

কালো শাল

(পুশ্‌কিন্)

হুঁশ হারিয়ে তাকিয়ে থাকি, আঁধারে চোখ ছায়,—
কালোরঙের শাল সহসা দেখ্‌লে কারো গায়!
শিঠিয়ে ওঠে শুকনো হৃদয় রক্ত সে হয় হিম,
হুতাশ-হাওয়ায় আম্‌লে পড়ে দুনিয়াটা নিঃসীম!
জীবনটা নিঃসঙ্গ আমার—নেই প্রীতি স্নেহ,—
আমিও ভালোবেসেছিলাম,—মান্‌বে কি কেহ?
সারা প্রাণের আবেগ দিয়ে—বেসেছি ভালো
আধেক রাতে হঠাৎ আমার নিবেছে আলো।

*　　*　　*　　*

মনে পড়ে বয়েস-কালের সহজ সে বিশ্বাস,—
মনে পড়ে গ্রীক-তরুণীর ভালোবাসার ভাব।
আমিও ভালোবেসেছিলাম—হৃদয় প্রাণ দিয়ে,
সুন্দরী সে ছিল আমার সকল নন্দিয়ে।
রইল না সে সোনার-স্বপন, সইল না সে সুখ,
কাল্ ইহুদী বুড়ো আমার দমিয়ে দিল বুক।

*　　*　　*　　*

পাঁচ ইয়ারে জটলা ক'রে কাট্‌ছিল বেলা,
কাল্ ইহুদী হঠাৎ দিলে দুয়ারে ঠেলা,
জনান্তিকে বল্লে ডেকে "খুব দেখি ফুর্ত্তি
(তোমার) গ্রীক-রূপসী খেল্‌ছে হোথা প্রেম নিয়ে স্ফূর্ত্তি।"
ধম্‌কে তারে হাঁকিয়ে দিলাম—লাগল কি ধান্দা!
বেরিয়ে 'পলাম সঙ্গে নিয়ে বিশ্বাসী বান্দা।
বেরিয়ে প'লাম তীরের বেগে আরব-ঘোড়াতে
মায়া দয়া তল গেল সব ঈর্ষা-সংঘাতে।

*　　*　　*　　*

গ্রীক-মেয়েটার চেনা বাড়ী চিন্‌তে কী দেরী!
মনের ঝড়ে হাত-পা বিকল, সব ধোঁয়া হেরি।
আব্‌জানো দ্বার—ফাঁক দে' দেখি—চোখের উপর ঠিক
অধরে তার অধর মিলায় আর্ম্মানী সৈনিক!

চোখে হঠাৎ দেখ্‌লাম আঁধার—তলোয়ারেতে হাত—
চোরাই-চুমু শেষ না হ'তে চোরের মুণ্ডপাত।
লাথি মেরে থেঁৎলে ছুঁড়ে মুণ্ড-কাটা ধড়
পড়্‌ল দৃষ্টি পাণ্ডাস-পারা গ্রীক-মেয়েটার 'পর।
মনে পড়ে তার কাকুতি—তার সে আর্ত্তনাদ—
সকল অঙ্গ রক্তে ভাসে—বাঁচতে তবু সাধ!
কে হাতিয়ার রুক্‌বে হাতে? লুটিয়ে প'ল দেহ,
সঙ্গে ম'ল অপঘাতে আমার প্রাণের স্নেহ।

* * * *

চট্‌কা ভেঙে ঝট্‌কা দিয়ে মোর-দেওয়া সেই শাল
খুলে নিলাম ধড় থেকে তার—থেমে নিমেষ কাল—
শালে মুছে অস্ত্র চ'লে এলাম তুরন্ত,
বান্দা দিলে ভাসিয়ে ছুটোয় স্রোতে দুরন্ত।
সেই থেকে আর মাতানো-চোখ মাতায় না মোরে,
সেই থেকে সব ফুর্ত্তি গেছে, মন গেছে ক্ষ'রে।
সেই অবধি দেখ্‌লে পরে কালো রঙের শাল
হুঁশ হারিয়ে তাকিয়ে থাকি, চোখে আঁধার জাল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাসকাবারি

কংগ্রেস

এবার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় কংগ্রেসের বৈঠক হইয়াছিল, সুতরাং বাংলা দেশের সকল লোকেরই মন সেই প্রসঙ্গ লইয়া চঞ্চল হইয়া আছে।

যদিচ এটা সমস্ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সম্মিলন-সভা, তবু মনে হয় যে, গোটাকতক প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন উপলক্ষ্যে সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া পাঁচ দশ মিনিট কাল ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার দ্বারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পরের পরিচয় লাভ অথবা চিন্তার আদান প্রদানের বাস্তবিক কতটুকু সুযোগ থাকে? কংগ্রেস-মণ্ডপে চক্‌কাটা সতরঞ্চের মত বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বেহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের প্রাদেশিক সভ্যদের বসিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীর দ্বারা চিহ্নিত—তাদের একত্র পাশাপাশি বসিবারও বন্দোবস্ত হওয়ার উপায় নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে

বিস্তর কন্‌ফারেন্সও বসিল, কিন্তু সবগুলির ধরণ-ধারণ ঐ একই রকমের। সেইজন্যই বারম্বার এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, বাংলাদেশে যে ভারতের এতগুলি লোক অতিথি হইয়া আসিল, তারা বাংলাদেশের হৃদয়ের কতটুকু পরিচয় লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল!

অবশ্য বলা হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সভার চেহারা সব দেশেই এই রকম—কংগ্রেস নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-সভা, এখানে বাংলার বিশেষ পরিচয়ের জন্য সমস্ত ভারত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যারা বাস্তবিক সুখে-দুঃখে, সামাজিক সম্বন্ধে, আচারে বিচারে এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাদের সভাসমিতির যে ধরণ আমাদের সভাসমিতিতেও কি সেই ধরণটাই চলিবে? বাঙালী বেহারীকে কতটুকু জানে—বেহারীই বা বাঙালীর যথার্থ পরিচয় কতটুকু পাইয়াছে? সব দেশেই রাষ্ট্রবন্ধনের গোড়ায় আছে মানস বন্ধন—মনের সঙ্গে মনের যোগ। বাঙালীর মনটা কি, তাহা আজ আমরা কতকটা জানি—কারণ সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, নানা শুভ অনুষ্ঠানে, সে মন আপনার পরিচয় আপনি দিতেছে। কিন্তু নিখিল ভারতের মনটা কি, তার পরিচয় তেমন প্রত্যক্ষ ত হয় নাই, সে যে এখনো অস্পষ্ট কুয়াশার লোকে স্বপ্নচারী হইয়া আছে। তাকে বাস্তব করিতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল প্রদেশের লোকেরই ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে এই রকমের বড় বড় সঙ্গীতি, বড় বড় 'মেলা' হওয়া চাই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে যে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন যে, দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে যদি আমাদের কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সাদির যোগ সাধন করা দরকার মনে করি, তবে ঐরূপ বিদেশী ধাঁচার সভার আয়োজন না করিয়া, স্বদেশী ধাঁচার মেলার আয়োজন করা চাই। কথাটা আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। এইতো ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের 'কুম্ভমেলা' অচিরেই বসিতেছে—সেখানে যত জনসমাগম হয় এত কংগ্রেসে হয় না। বীরভূমে 'জয়দেবের মেলা' উপলক্ষ্যে যত লোক জমে, এত কোন বৈদেশিক সভা-সমিতিতে জমেনা। যদি সেইরূপ একটা কংগ্রেস-মেলা বসিত, কংগ্রেসের রথী-মহারথীদের বড় বড় তাঁবু সেখানে পড়িয়া যাইত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জনসমূহকে প্রাদেশিক ভাষায় যাহা বলা দরকার তাহা বলা হইত, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প-প্রদর্শনী প্রভৃতি নানাপ্রকারের চিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষা দুয়েরি উপযোগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইত, তবে তখন কেবল যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত গুণীজনের মিলন ঘনিষ্ঠতর হইত তা নয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মিলনও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইত।

ভারতবর্ষের যে সকল লোকেরা ইংরাজী জানে না, তারা কি ভাবে বড় বড় 'মেলা'র আয়োজন করে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সাধারণের সেটা দেখাও উচিত এবং সেই জিনিসটাকে নিজেদের কার্য্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাও উচিত।

শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা

কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়া শ্রীমতী বেসান্ত যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তার মত এমন সারালো ও ধারালো বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসে কখনও পড়া হইয়াছে কিনা জানি না—অন্ততঃ গত দুই তিন বছরের কংগ্রেসে হয় নাই এটা সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড যখন বেল্‌জিয়মের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে নামিয়াছিল, তখন ভারতবর্ষের আশা হইয়াছিল যে এযুদ্ধে সে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া লড়িবার সুযোগ পাইবে। ইংলণ্ড তার ধন চাহিল, কিন্তু সৈন্য গড়িল না। অথচ ১৮৫৯ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সবশুদ্ধ ৩৭টি যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সিপাহিরা প্রেরিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয়ভার ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইয়াছে। ভারতের ভাগ্যে সৈন্য-বিভাগের এই ব্যয়ভার ক্রমশ বাড়িয়াছে বই কমে নাই—যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের অনুপাতে ভারতের ব্যয়ের অনুপাত কুড়িগুণেরও বেশি ছিল। এসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস হইতে ক্রমাগত প্রতিবাদ হইয়াছে—ইহা দেখানো হইয়াছে যে, সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়াধিক্যের জন্য ভারতবর্ষে লোকশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা যে পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা হইতে পারিতেছে না,—তবু এ সকল প্রতিবাদে বিশেষ কোন ফলই হয় নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবর্ষ সৈন্যবিভাগে এত অর্থ জোগাইয়াছে, সেই ভারতবর্ষকেই অস্ত্র-আইন প্রভৃতি নিষেধক বিধিপ্রচারের দ্বারা নির্বীর্য্য করিবার জন্য বিধিমতেই চেষ্টা হইয়াছে। বাঙালী বা মাদ্রাজী পাঞ্জাবীর চেয়ে যে সৈনিক হিসাবে নিকৃষ্ট, একথা বলার এখন আর উপায় নাই;—কিন্তু এই বাঙালীকেই এতকাল ধরিয়া বীর্য্য প্রকাশের কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

সভানেত্রী একটি কথা তাই জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন এই যে, "ভারতবর্ষে ও ইউরোপে একপ্রভুতন্ত্র (autocracy) ও আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) যে পর্য্যন্ত না সমূলে বিনষ্ট হইবে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ হইবে না।"

তারপরে তিনি ভারতে নূতন প্রাণের আবির্ভাবের কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এইরূপ:—

(১) এসিয়ার জাগরণ।

(২) বৈদেশিক শাসন সম্বন্ধে এবং সাম্রাজ্যের নূতন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশে আলোচনা।

(৩) শ্বেতকায় জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্ত্তন।

(৪) বণিকদিগের অভ্যুদয়।

(৫) নারীজাতির জাগরণ।

(৬) জনসমূহের জাগরণ।

এবং এই প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বেসান্ত লিখিয়াছেন যে, শ্বেত-কায় জাতিদিগের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ভারত-বর্ষীয় লোকদের ধারণার যে ক্রমশ বদল হইয়াছে, তার কারণ থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও আর্য্যসমাজ ভারতের লোকদের

নিজ সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ করিয়াছে এবং পশ্চিমকে সকল বিষয়ে অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেও নিবৃত্ত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও নাম করিয়াছেন। অথচ থিওসফিক্যাল সোসাইটি, আর্য্যসমাজ ও বিবেকানন্দ-মিশনের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে, রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এবং তার পরে আর্য্য সমাজ ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির সমসম কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি, ভারতের সভ্যতার বিশিষ্টতা ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে ভারতবাসীকে যেভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তার উল্লেখ থাকা নিতান্তই উচিত ছিল। আর কারও নাম উল্লেখ না করিলেও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, কেননা তিনিই আমাদের স্বাজাত্য-বোধের জনক। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ বলি, সমাজ-সংস্কারের আদর্শ বলি, ভারতবর্ষের সভ্যতার আদর্শ বলি—সকল আদর্শেরই প্রেরণা তাঁহা হইতেই প্রসূত। বিশ্বসভ্যতার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় আসন তিনিই সকলের আগে নির্দ্দেশ করিয়া গেছেন। তারপরে যখন শ্রীমতী বেসান্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিলেন, তখন তাঁর উচিত ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরও নাম করা। কেননা বিবেকানন্দের চেয়ে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার ব্যাপারে ইঁহাদের কৃতিত্ব কিছুমাত্র কম বক্তৃতায় দেশ সম্বন্ধে জানিবার ও ভাবিবার বিস্তর কথা আছে।

অনুন্নত জাতিদের দুর্দ্দশা নিবারণের প্রস্তাব।

এবারকার কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষভাবে আলোচিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় কংগ্রেস-কর্ত্তারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ প্রভুরা স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রধান অন্তরায়রূপে যে জিনিসটাকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে এবারকার কংগ্রেসের নীরব থাকাটা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ভারতবর্ষে ৬ কোটি অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতি থাকিতে আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবী করি কোন্ হিসাবে—এই কথাই আমাদের প্রভুরা আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দেন্। অবশ্য আমাদের সমাজে ভেদ বিভেদ যতই থাকুক না কেন, তবু যে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন দরকার এটা আমাদের জানানোই চাই। কেননা স্বাধীনতা না থাকিলে দায়িত্ব-বোধও জাগেনা এবং দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তৃত্ব-বোধ না জাগিলে সামাজিক দুর্নীতি ও দুর্দ্দশা নিবারণের চেষ্টাও পুরাপুরি দেখা দেয় না, এটা একবারে স্বতঃসিদ্ধ কথা এবং পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসই এ কথার সাক্ষ্য দিবে। সে যাহাই হউক, স্বায়ত্তশাসন পাইলে তবেই আমরা সমাজের উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হইব, একথা কোন কাজের কথাই নয়। বরং যাতে

হয়, সে জন্য অন্যান্য বিষয়েও সচেষ্ট হওয়া এখন হইতেই দরকার।

এবার কংগ্রেসে তাই একটু নূতন ধরণের প্রস্তাব ছিল এই যে, প্রয়োজন ও ন্যায়ধর্ম্ম সকল দিক্ হইতেই ভাবিয়া দেখিলে অনুন্নত জাতিদের দুর্দ্দশা মোচন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাব যাঁরা উত্থাপন ও সমর্থন করিলেন তাঁরা সকলেই ভিন্ন প্রদেশীয় লোক—কোন বাঙালীকে এ প্রস্তাবের সমর্থক রূপে দেখিলাম না। যাঁরা বক্তৃতা করিলেন তাঁরা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"-প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেই ভাবের কথাই বলিলেন। একজন বলিলেন যে, আমরা রাষ্ট্রব্যাপারে 'ব্যুরোক্রেসি' বা আমলা শাসনতন্ত্র দূর করিতে চাই, অথচ সামাজিক ব্যাপারে সামাজিক আম্‌লাতন্ত্রকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি, ইহার মত অসঙ্গত কাণ্ড আর কিছুই হইতে পারে না। রাষ্ট্র-ব্যাপারে স্বাধীনতা লাভ পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে যারা স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইতেছে না, তাহাদিগকে সেই সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া ত সম্পূর্ণরূপেই আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্বিগ্ন থাকি কেন?

কিন্তু দেখিলাম এই যে, ইংরাজ সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামান্য কথাও যেমন উন্মাদনা ও উত্তেজনার সঞ্চার করে, এ বিষয়ে তাহা করিল না। অত বড় সভা হইতে কোন সাধুবাদ বা সম্মতিসূচক করতালি পড়িল না। সমাজ সম্বন্ধীয় কথাগুলো যে আমাদের মুখরোচক নয়, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল।

সোস্যাল্ কন্‌ফারেন্সে ডাক্তার রায়ের অভিভাষণ

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছর হইতে সামাজিক কন্‌ফারেন্স বসিতেছে। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে এ সভাতেও কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকে। প্রস্তাবগুলি সভার দ্বারাই গৃহীত হয় বটে, তবে যাঁরা সমর্থন করিবার জন্য হাত তোলেন, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের যে আগ্রহ আছে তার কোন মানে নাই। সুতরাং সে হিসাবে দেখিতে গেলে এ ধরণের একটা কন্‌ফারেন্স খাড়া করার বিশেষ সার্থকতা নাই—তার চেয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সমাজের উন্নতি বিধানে উদ্যোগী একটা দল দাঁড় করাইতে পারিলে ভাল হইত।

এ বৎসর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি ছিলেন—তাঁর সভাপতির অভিভাষণ তাঁরই উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি তাঁর অভিভাষণের গোড়াতেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন এই যে, "যখন স্বরাজ বা হোমরুলের কথা দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যখন ভারতীয় জনগণের সকল শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে বড় বড় নক্সা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এবং যখন সম্মিলিত ভারতের স্বপ্ন আমাদের কল্পনাকে সম্মোহিত করিয়াছে, তখন কেন আমাদের মধ্যে নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়

হইতে প্রতিবাদ ঘোষিত হইতেছে? এমন একটা বিষয়েও আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরও তিনি পরিষ্কার করিয়াই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—"আমরা জাতীয় সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে যতই ভাগ করিয়া স্বতন্ত্র করিতে যাই না কেন, তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া আছে; আমরা ইচ্ছামত তাদের এক অংশকে অন্য অংশের চেয়ে বড় করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত সমাজ-সংস্কারকে আমরা যেমনি অবহেলা করিয়া আসিয়াছি, তেমনি এই সময়ে সেই অবহেলার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় রথের চাকা-গুলাকে সুদ্ধ তাহা অবরুদ্ধ করিতে বসিয়াছে।"

গত দুই মাসের 'ভারতী'তে 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধের প্রসঙ্গে আমরা ত এই কথাটাই অন্যান্য পাঁচ কথার মধ্যে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইলেই যে সমাজের সব সমস্যার মীমাংসা আপনিই হইয়া যাইবে, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা আমাদের সমাজে উচ্চ ও নীচ জাতিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান আছে, সে ব্যবধানজনিত সংস্কারের প্রতিক্রিয়াটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে বাধ্য। যেমন ইংরাজ ত আপন দেশে স্বাধীনতার মর্য্যাদা খুবই বোঝে; কিন্তু এদেশে আসিলেই তার সে বোধটা লোপ পায় কেন? তার কারণ কি এই নয় যে, ইংলণ্ডের ডিমোক্রাসির বা গণতন্ত্রের আব্‌হাওয়ায় বর্দ্ধিত ইংরাজের স্বাধীনতার সংস্কার এখানকার ব্যুরোক্রেসির বা আমলা-তন্ত্রের আব্‌হাওয়ায় পড়িয়া ক্রমশ একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া যায়? তখন এখানকার এই নূতন অর্জ্জিত সংস্কারটাই পূরোদস্তুর চলিতে থাকে। ঠিক তেমনিতর, আমাদের সমাজে জাতিভেদের যে সংস্কারটা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা স্বরাজ বা হোমরুলের সঙ্গে কোন মতেই খাপ্ খায় না। সুতরাং সে সংস্কারটা দূর করিবার জন্য আমরা যদি সচেষ্ট না হই, তবে স্বরাজই পাই আর যাই পাই, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ সংস্কারের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতে বাধ্য।

অথচ এ সময়ে লোকের মন হোম-রুলের কল্পনায় এমনি মাতিয়া আছে যে, এ সকল কথা কাহারও রুচি-রোচন হইবে না জানি। বরং উল্টা দিকে এই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ আমাদের স্বায়ত্ত শাসন লাভের বিরুদ্ধে এ সকল কথাকে নজির স্বরূপে ব্যবহার করিতে থাকিবে। এরি মধ্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা হইতে এই ধরণের নজির উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু তাদের ঐটুকু মুখবন্ধের সুযোগ দেওয়া হইবে ভাবিয়া এ সম্বন্ধে দেশের লোকের মুখ বন্ধ করা উচিত নয়। কেননা সময় আসিয়াছে যখন সত্যকে নির্ভীক ভাবেই স্বীকার করা দরকার।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইতে গেলে সামাজিক স্বাধীনতাও চাই, এ কথা বলার দ্বারা

এমন বুঝায় না যে, তবে বুঝি যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যাপারে আমাদের সমস্ত ভেদ বিভেদ দূর হইয়া না যাইতেছে এবং সকলের অধিকার প্রশস্ততর না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইবার দাবী আমাদের নাই। আমরা বরং এই কথাই বলি যে, স্বাধীনতা এখানে চাই, ওখানে চাই না—বাইরে চাই, ঘরে চাই না,—এতটুকু চাই, অত দূর পর্য্যন্ত চাই না, অনেক পরে চাই, এখন চাই না—এভাবে স্বাধীনতা পাওয়ার কোন অর্থ ই নাই। কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে অনেক পরাধীনতার লজ্জা আছে অনেক রকমের বন্ধন আছে; সেইজন্য কি বাহিরে পথ চলিবার স্বাধীনতাও আমি দাবী করিব না? তখন কি প্রতি-পদেই আমাকে বাধা দিয়া বলা হইবে যে, আগে ঘরের বন্ধন মোচন কর, পরে পথে বাহির হইও। কিম্বা যে ব্যক্তি ঘরে এত বন্ধনে জর্জ্জর, সে পথে বাহির হইলে পদে পদেই হোঁচট্ খাইতে পারে, অতএব তার আর বাহির হইয়া কাজ নাই? বরং এই কথাই কি বলা উচিত নয় যে, উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রশস্ত রাজপথে নানা যাত্রীদলের সঙ্গে যে একবার জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, সে আর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া খোপের পর খোপ পিঞ্জরের পর পিঞ্জর তৈরি করিতে উৎসাহিত হয় না—সে সব সঙ্কীর্ণতাকে একেদমে ঘুচাইয়া না দিয়া থাকিতে পারে না? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই কথা যদি আজ বলিত, তবে সেই কথাই তার মুখে শোভা পাইত। অতএব

সেই স্বাধীনতার অভাবেই আমাদের সামাজিক জীবন ও অন্যান্য জীবন সংকুচিত ও নিরুদ্ধ হইয়া আছে; পক্ষান্তরে সামাজিক স্বাধী-নতাও আমাদের চাই, কেননা সেই স্বাধী-নতার অভাবেই আবার আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন ও অন্যান্য বৃহত্তর জীবন আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছেনা। তার মানে দুই দিক্‌কার স্বাধীনতাই পরস্পরের অপেক্ষী—একের আবির্ভাবে অন্যেরও আবির্ভাব, একের তিরোভাবে অন্যেরও প্রায় তিরোভাব ঘটিয়া পড়ে।

ডাক্তার রায়ের অভিভাষণে তিনি বাংলাদেশের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ঐতি-হাসিক দিক্ হইতে আলোচনা করিয়া তার অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশ সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল বলিয়া, সেই সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল কিম্বা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল বলা যায়। তিনি রিজ্‌লী সাহেব ও রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। আশা করি যে তাঁর অভিভাষণ বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইবে; তখন সকলেই ইহা পড়িবার সুযোগ পাইবেন।

ডাক্তার রায় লিখিয়াছেন যে, আমরা যখন তখন জাপানের উদাহরণ দেখাইয়া বলি যে, দেখ দেখি, ঐশীয় কোন জাতির

কিন্তু সামাজিক উন্নতি সাধনে জাপান যাহা করিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। জাপানেও অস্পৃশ্য জাতি ছিল এবং সেখানেও সামুরাইগণ ব্রাহ্মণেরই মত সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সামুরাইগণ আপনা হইতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া জাপান-বাসী সকলকেই সমান অধিকার দিয়া এক করিয়া লইলেন—জাপানের জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন। অথচ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপানে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।

ডাক্তার রায় বাঙালীর মস্তিষ্কের অপ-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকবার লিখিয়াছেন—এবারেও সে বিষয়ে তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন নাই। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে যে সময়ে গ্যালিলিও, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানের সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা উত্তর পশ্চিম কোণে বিশেষ মুহূর্ত্তে কাক ডাকিয়া উঠিলে সেটা শুভ কি অশুভ এবং তার ফলাফল কি হইতে পারে, তাহারই নির্ণয়ে মহা ব্যস্ত—বাঙালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের এর চেয়ে আর কি দৃষ্টান্ত হইতে পারে?

অবশ্য ডাক্তার রায়ের অভিভাষণের সমালোচনায় বোধ করি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন সমস্ত কথাই অত্যন্ত সত্য ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই—তবু তিনি সমাজের সকল প্রথা ও রীতি নীতিকে কেবলমাত্র সংস্কার-কের চোখ দিয়াই দেখিয়াছেন। বিস্তর ঐতিহাসিক নজির সংগ্রহ করিলেও সামাজিক প্রথাগুলিকে যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে অথবা সমাজতত্ত্ব-বিদের চোখে তিনি দেখেন নাই। আমাদের দেশে জাতিভেদ-প্রথা কোন সত্য ভিত্তির উপরে যখন প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন তাহা এই বর্ত্তমান আকারে টিঁকিবে না, এটা শীঘ্র হোক্ বিলম্বে হোক্ আমাদের দেশের লোককে বলিতেই হইবে। কিন্তু এ প্রথার উৎপত্তির সময়ে কোন্ আদর্শ ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা জানা উচিত। অর্থাৎ, সমাজ গঠনের আদর্শে গুণকর্ম্মবিভাগের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা সমাজের শীর্ষে ইউরোপীয় সমাজের ধনকুলীন চাই, না ত্যাগী ও জ্ঞানতপস্বী ব্রাহ্মণ চাই—এ একটা মস্ত প্রশ্ন। সুতরাং এ সকল আদর্শের কথা বাদ্ দিলে হিন্দুসমাজের কোন প্রথা কোন আচার সম্বন্ধেই সুবিচার করা হয় না। তার পর, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে শিক্ষার অভাবে নানা রকমের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, এটা যেমন সত্য কথা, এটাও তেমনি সত্য যে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সমাজের ভিতর দিয়া নানা স্বাভাবিক উপায়ে, ব্রত দান ধ্যান ক্রিয়াকর্ম্ম যাত্রা কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা অর্জ্জন করে, যে হ্রী ধী ও শ্রী লাভ করে, সহস্র কেতাবী শিক্ষায় সে সকল সম্পদের অধিকারিণী তারা হইতেই পারিত না। এই যে নৈসর্গিক 'কাল্‌চার', ইহাকে 'একচোখো' সংস্কার অগ্রাহ্য

করিলেও ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে; একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই পুরাতনের বনিয়াদের উপরেই নূতন বাড়ীর পত্তন হইবে—আমাদের সম্পদ্ যেখানে যাহা আছে তাকে আহরণ করিয়া তবেই তাকে কালের উপযোগী করিয়া গড়িয়া পিটিয়া লওয়া সম্ভব।

কিন্তু ডাক্তার রায় যে স্পষ্ট কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র। সমাজের তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টায় অনেক সময় তথ্যগুলা চাপা পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে সেই তথ্যগুলাকেও উঁচু করিয়া ধরা দরকার। কেননা. তাহা হইলেই তত্ত্ব নিরূপণের বেলায় sophistry'র চেষ্টাটা ম্লান হইয়া পড়ে। তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাখের মধ্যে একজন তত্ত্ববিদ্ করিয়া থাকেন, তিনি ধন্য—কিন্তু তর্ক—কুতর্কের—sophistry'র অত্যাচার—বাকী আমরা যারা ভোগ করি তাদের উদ্ধারের জন্য তথ্য চাই, অত্যন্ত নীরস-কঠিন তথ্য চাই—আর কিছুই না।

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব

ভারতবর্ষে এক ভাষা প্রচলনের প্রস্তাব সম্বন্ধেও এবার কলিকাতায় এক কন্ফারেন্স বসিয়াছিল। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি মহোদয় মনে করেন যে, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা কহিবার ভাষা ইংরাজী না হইয়া হিন্দী হওয়া উচিত। কেননা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই হিন্দী ভাষা বুঝিতে পারে, মুসলমান আমলেও এই ভাষাই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ইংরাজী ভাষাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা আলাপ করেন বলিয়া জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের আর যোগ থাকিতেছে না। বাস্তবিক ইংরাজী কয়জন লোকে বোঝে? তা ছাড়া ইংরাজীতে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আমরা ক্রমশ বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছি, আমাদের মন অলক্ষ্যে ইংরাজী সভ্যতার দ্বারা অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে গান্ধি মনে করেন যে হিন্দীভাষা শিখিয়া ঐ ভাষাতেই ভারতের সকল প্রদেশের লোকদিগের পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলা উচিত।

হিন্দী ভাষা উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকেই বোঝে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তেলেগু-তামিল-কানাড়ী-ভাষী দক্ষিণ ভারতের লোকেরা এ ভাষা বোঝে না। বাঙালী ও ওড়িয়ারাও যে হিন্দী বোঝে তা বলা যায় না—হিন্দীর সঙ্গে বাংলার কতক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই সহজ দুটো চারটে হিন্দী কথা বাঙালী বুঝিতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষটাকে গোটা ধরিলে এমন কোন ভাষাই নাই যাহা সমস্ত ভারতের লোকদের অধিগম্য বলা যায়।

ইংরাজী ভাষা যে আমরা শিখি, তাহা কেবল ইংরাজ আমাদের রাজা—অতএব ঐ ভাষা রাজভাষা—বলিয়া নয়। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদের মন বিশ্বমানব-মনের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পরওয়ানা

পাইয়াছে। সুতরাং মনের ক্রিয়াটাকে যদি সচল রাখা আমাদের অভিপ্রায় হয়, 'কাল্‌চার' জিনিষটার প্রতি যদি আমাদের মনের অনুরাগ থাকে, তবে ইংরাজী না শিখিলে আর কোন ভাষা শিক্ষার দ্বারাই আমাদের মনের ধর্ম্ম পূরোপূরি বজায় থাকিবে না। কেননা, বিশ্বের জ্ঞানকে ইংরাজী ভাষা নিজের ভাণ্ডারের মধ্যে মজুত করিয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই আমরা কথাবার্ত্তায় ইংরাজী এত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হই—কেননা ইংরাজী ভাষার ধাত্রী-স্তন্যে আমাদের মন যে পুষ্ট। বাংলা ভাষা যে এই কয় বছরের মধ্যে এমন অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যে আসন পাইয়াছে, তারও কারণ এই যে, ইংরাজীর ভাব-সম্পদ্‌কে বাংলাভাষাই সব চেয়ে বেশি আহরণ ও আত্মসাৎ করিয়াছে। এই আধুনিক বাংলাভাষাকে ও আধুনিক বাংলা-সাহিত্যকে 'ফেরঙ্গ'-ভাষা ও 'ফেরঙ্গ'-সাহিত্য বলিয়া যিনি যতই বিদ্রূপ করুন্, গঙ্গাকে যেমন গঙ্গোত্রীতে হটাইয়া লইয়া যাওয়া যায় না, তেম্‌নি এ ভাষা ও সাহিত্যের গতিকে এখন বাংলার মধ্যযুগে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই ভাষা পুরোহিত হইয়া বিশ্ব-মনের সঙ্গে বাঙালীর মনের যে পরিণয় সাধন করিয়াছে, তাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সেইজন্য স্বভাবের নিয়মে আপনিই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলি ও সাহিত্য-গুলি ইংরাজীর ভাবৈশ্বর্য্যে সম্পৎশালী হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাদের নিজেদের বিশেষত্বও বিলুপ্ত হইতেছে না। কেননা দেখিতে পাই যে, ইংরাজীর ভাবকে তারা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে, নিজেদের দেশীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে। সেইজন্য আধুনিক বাংলাসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এ কথাও যেমন সত্য, তাহা ইংরাজী সাহিত্য হইতে বিশিষ্ট ইহাও তেমনি সত্য। এই যে দেওয়া-নেওয়া, ইহাইত স্বাভাবিক। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার মধ্যে এই আদান-প্রদানের সম্বন্ধটা সজীব না হইলে, তারা-ত প্রত্যেকেই পরস্পর হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষের সভ্যতার যদি কোন বিশিষ্টতা থাকে তবে তাহা এই যে, নানা জাতির নানা ধর্ম্ম রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানকে ভারতবর্ষ আত্মসাৎ করিয়া এক বিরাট সমন্বয়-সূত্রে বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে। আর কোন সভ্যতাই এত বিচিত্রতাকে হজম করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারত-বর্ষের স্বাজাত্যের পরিকল্পনায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সভ্যতার স্থান আছে, তেমনি ইংরাজজাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতারও স্থান আছে। "পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা"—এইটেই ভারতের বিশেষ গৌরবের কথা।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলির সঙ্গে সাহিত্যের সঙ্গে যেমন ইংরাজীর একটা জৈব সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেছে, তেমনি ভারত-

বর্ষে যদি কোন ভাষার সার্ব্বজাতিক ভাষা হইবার অধিকার থাকে, তবে সে অধিকার ইংরাজীরই আছে। কেননা এই ভাষার আশ্রয়ে আমরা যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরাই পরস্পরের ভাবের ও চিন্তার বিনিময় করিতে পারি তাহা নয়, আমরা এই ভাষার সূত্রে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্বকে সামনে রাখিলে আমাদের বাণীর মধ্যে যে মহৎ উদারতা যে সার্ব্বভৌমিক সত্য, যে উজ্জ্বল আনন্দ দীপ্যমান হইয়া উঠে, শুধু ভারতবর্ষকে সাম্‌নে রাখিলে তাহা হয় না। তখন অলক্ষিতে আমাদের চিন্তার মধ্যে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। এযুগে জগতের কাছে ভারতের বাণী যাঁরা বহন করিয়া লইয়া গেছেন, সেই রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—কোন্ ভাষায় সেই বাণীকে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন? ইংরাজী ভাষায় নহে কি?

অন্যের জীবন যথেষ্টপরিমাণে আত্মসাৎ করিলে কোন সভ্যতারই নিজের বৈশিষ্ট্য কোনকালেই নষ্ট হয় না, নিজের অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় না। রামমোহন রায়ই সকলের আগে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, অথচ তাঁর মত ভারতের অতীত গৌরব, ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আর কেহই আমাদের জন্য উদ্ধার করিয়া যান্ নাই। ভারতবর্ষের জাতি-বৈচিত্র্যে ইংরাজও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে—ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ের মধ্যে ইংরাজেরও স্থান আছে—এই কথাটি যদি স্বীকার করি তবে ইংরাজীভাষাকে বাদ দিয়া মানসিক জড়ত্বলাভের জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

নব-হিন্দুদের সহিত ইংরেজের সম্বন্ধ

(সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা)

(ফরাসী হইতে)

যাহারা নব্যভারত গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহারা একদিন ভারতের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে তাহারা ঠিক্ সেই সব লোক যাহারা উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী, অসন্তুষ্ট, যাহাদিগকে অনেকে মনে করে—"হঠাৎ বড়" ও স্বশ্রেণী-বহির্ভূত।

ইংরেজের সহিত ইহাদের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, পৃথক্‌রূপে উভয়ের মনোভাব পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ভারতবাসীর মনোভাব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, যাহা-কিছু ইংরেজী তাহাই ভাল এইরূপ মনে কর

নব-হিন্দুদের একটা বাতিকের মধ্যে ছিল :—ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী ধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, ইংরেজী ভাষায় কথা কওয়া, ইংরেজী ভাষায় লেখা। উহাদের সংখ্যা খুবই কম এবং উহারা নিতান্ত সামান্য শ্রেণীর লোক। পক্ষান্তরে কোম্পানীর শাসন আমলের ভিত্তি তেমন সুনিশ্চিত ছিল না; আমীর-ওমরা ও ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে যুঝিবার জন্য কোম্পানী, ইংরেজীভূত ভারতবাসীদিগের উপর নির্ভর করিল; তাহার পর, উদার মতামতের একটা "ফ্যাশান্" আসিয়া পড়িল, তখন উহারা ভারতকে সভ্য করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইল; এই সমস্ত কারণ, ইংরেজ ও নব-হিন্দুর মধ্যে সম্বন্ধটাকে সহজ করিয়া তুলিল।

কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে ইরেজদের বিশ্বাস নষ্ট হইল; দিল্লী ও কানপুরের দারুণ কাণ্ডে উহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল; ভয়াকুল হইয়া, উহারা বিদ্রোহী ও রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে চাহিল না। উহাদের সংবাদপত্রাদি, সে সময়ের সমস্ত অত্যাচার ভারতবাসীদের স্কন্ধে চাপাইল, স্বকীয় সমাজ হইতে উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহার পর বিজয়ের উন্মত্ততা। কোম্পানীর আমল হইতেই ইংরেজরা বিপদের আশঙ্কা করিত; ইংলণ্ডাধিপতি রাজার শাসন-আমলে উহারা বেশ অনুভব করিল, ভারতবাসী নিষ্পেষিত হইয়াছে, চিরকালের মতো নিষ্পেষিত হইয়াছে।

তথাপি শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। প্রতিবৎসর ইংরেজি-ধরণে শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; সরকারের অধীনে নিম্ন-পদ সকল অধিকার করিয়া উহারা আপনাদের শক্তিসামর্থ্য অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দরিদ্র, বিলাতী বিলাস-সামগ্রীর দ্বারা উত্তেজিত, শিক্ষা-প্রসূত নূতন নূতন অভাবের তাড়নায় বিচলিত,—ইহারা যে সকল বেতনের পদ ইংরেজের জন্য রক্ষিত ছিল, সেই সকল বেতনের পদ পাইবার জন্য দাবী করিতে লাগিল। যে দেশে ত্রিশকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেবল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের ৮০০ ফ্র্যাঙ্ক (ফ্র্যাঙ্ক = ॥০ আনা—এখন আরও বেশী) মাত্র বার্ষিক আয় সেই দেশে ২০, ৪০, ১০০,০০০ বেতনের পদ আছে।

সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশে যে সমস্ত যুবকবৃন্দ সরকারী স্কুলে শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল না; যাহারা কাজে নিযুক্ত হইল তাহাদের মধ্যে অনেকে, একঘেয়ে জীবন-যাত্রা-পদ্ধতিতে ও স্বল্পবেতনে বিরক্ত হইয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিল। উক্ত উভয়দলই সাহিত্যের দিকে মুখ ফিরাইল, কিংবা সংবাদপত্র-সম্পাদক, সভা-সমিতি-পরিচালক, ও পুস্তিকা-প্রচারক হইয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক খুব খ্যাতি লাভ করিল। অধিকাংশ লেখক বিফল-মনোরথ হইল; অনেক স্থলে নিম্নতর বর্ণ হইতে উদ্ভূত হইয়া, আত্মীয়দের সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ভারত-বাসীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ইংরেজদের

কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া এই সকল শিক্ষাহীন, দুর্দ্দশাপন্ন, টোকো মেজাজের লোক, রাষ্ট্রনৈতিক বাদানুবাদের মধ্যে প্রচণ্ড উগ্রতা, কটু-কাটব্য, স্থূলরুচিতা, অন্যায্যতা আনিয়া ফেলিল, অন্তরে অপরিসীম বিদ্বেষ পোষণ করিয়া উহারা জনসাধারণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে উহাদের এই প্রচণ্ড উগ্রতা, অকপটতার প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইল। অনেক সময়ে উহারা সেইসব সমাজ-সংস্কারককে আপনাদের দলে টানিয়া আনিল যাহারা স্বকীয় চরিত্র ও ক্ষমতার গুণে, আত্মরক্ষণে অসমর্থ নিতান্ত অজ্ঞ জনসাধারণের প্রকৃত রক্ষক হইবার উপযুক্ত।

* *
*

প্রথমে ভারতবাসীদের দোষ, তাহার পর ইংরেজের দোষ।

স্বকীয় গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশে, শ্রীযুক্ত প্রমথ বসু উহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"ভারতে, ইংরেজরা বাস করে না। ভারতকে উহারা এমন-একটি দেশ মনে করে যেখানে, কি বণিক, কি কারখানা-ওয়ালা, কি সরকারী কর্ম্মচারী সকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জ্জন করা। বিশেষত আজিকার দিনে বাষ্পপোতের চলাচলের উন্নতি হওয়ায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে; কেননা, তিনমাসের ছুটিতেও তাহারা এক-দৌড়ে বাড়ী যাইতে পারে। তাছাড়া, তাহাদের মধ্যে অল্প লোকই হিন্দুজাতিকে সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য করে, এবং ভারত-বাসীর সহিত সমানভাবে মেশামেশি করিবে বলিয়া তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।" (Hindu Civilization I. p. 4 XII.)

এই দোষারোপগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক্। ইহা নিশ্চিত, ইংরেজ আগন্তুকের মধ্যে অধিকাংশ লোকই টাকা করিবার জন্যই কিংবা শুধু জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই ভারতে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে, ভারতের কিংবা ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টে তাহাদের কোন 'গা' নাই। ইহাও নিশ্চিত, এই দোষটা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেকালে, উঁহারা বিশ ত্রিশ বৎসর ভারতেই থাকিত, দেশে ফিরিয়া যাইত না। এবং যেহেতু বড় বড় নগরে খুব অল্পসংখ্যক ইংরেজ বাস করিত, কাজেই তাহারা দেশীয় লোকের সহিত মেশামেশি করিতে বাধ্য হইত। আজিকার দিনে, বণিক ও রাজকর্ম্মচারীদিগের মনে সর্ব্বদাই ইংলণ্ডই জাগিতেছে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতি বৎসরেই, অনেকে তিন বৎসর কিংবা চারি বৎসরান্তে ইংলণ্ডে যাত্রা করে। শীতকালে পর্য্যটক ও রাজনৈতিকদিগের আমদানী হয়। সমস্ত বড় বড় নগরে ইংরেজরা আপনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে। ইংরেজের এক পৃথক্ অঞ্চলই আছে—Cantonment। ইংরেজের ক্লব্, ইংরেজের দোকান, ইংরেজের সংবাদপত্র, ইংরেজী কথাবার্ত্তা, ইংরেজদের একটা বিশেষ মতা-মত,—দেশীয় মতামতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। খ্যাতনামা হিন্দুদের গৃহে যাতায়াত করা, কুশিক্ষার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজকর্ম্মচারীরা এই উভয় দলের মধ্যে মধ্যস্থত

করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অবধি কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ক্লব্ কোন রাজ-কর্ম্মচারীকে কখন গ্রহণ করে নাই। আজি-কার দিনে, যাহারা ত্রিশকোটি ভারতবাসীর শাসনকর্ত্তা হইবেন, সেই সব যুবকের মধ্যে অনেকে ভারতকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয় ও ভারতবাসীর দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসে।

এই দুই জাতির মধ্যে বৈরতার আর এক কারণঃ—হিন্দুদের অভ্যুন্নতি। এখন সর্ব্বত্রই চোখের সাম্‌নে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—ভারতবাসীরা পরীক্ষা দিতেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছে, কারখানা, ব্যাঙ্ক ও সওদাগরের কুঠী স্থাপন করিতেছে। যে সকল উদার-চিত্ত পুরাতন "অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান,"দেশীয় লোকদিগের মুরুব্বি হইতে ভালবাসেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা, তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব আশ্রিত জনেরা তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের কাজের বিচার-আলোচনা করিলে, অথবা জজের আসনে বসিয়া কিংবা রাজ-কর্ম্মচারীর উচ্চপদে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি হুকুমজারী করিলে বরদাস্ত করিতে পারেন? যে আইনের দ্বারা ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট য়ুরোপীয়কে গ্রেপ্তার কিংবা বিচার করিবার অধিকার পাইয়াছিল, সেই আইন ভারতীয় ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। এই আইনের প্রবর্ত্তক লর্ড রিপন, ইংরেজদের চক্ষুশূল হইলেন। কিন্তু লর্ড রিপনের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, কলিকাতা, এলাহাবাদ ও বোম্বায়ের যাত্রাপথে শতসহস্র হিন্দু উচ্চকণ্ঠে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছিল ভারতে কোন নৃপতি সেরূপ অভিবাদন প্রজাবৃন্দ হইতে কখনো প্রাপ্ত হয় নাই। (১)

ভারতীয় ইংরেজ-মণ্ডলী অনেক সময়ে খুব তীব্রকটু অথচ ভদ্রোচিত ভাষায় স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে; তবু কখন কখন বিদ্বেষবশতঃ দেশীয়দিগের প্রতি অবমাননাও করিয়া বসে। এই প্রবন্ধে তাহা অনেক বার উদ্ধৃত হইয়াছে।

"Dept fordএর ৪০০ নির্ব্বাচক, কোন নব-সৃষ্ট এলাকার উদারনৈতিক উমেদার রূপে লালমোহন ঘোষকে বরণ করিতে ইচ্ছা করায়, তিনি তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই ৪০০ ক্রোধান্ধ নগণ্য লোক পাগ্‌লা-গারদের বাসিন্দা হইবার উপযুক্ত, আমাদের দেশের ভাগ্য তত্ত্বাবধান করা তাহাদের কর্ম্ম নহে। যদি একজন বাঙ্গালী বাবু পার্লেমেণ্টে প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে শীঘ্রই "আর্য্যদিগের" ইহা একটা আকাঙ্খিত স্থান হইয়া উঠিবে। ইংরেজ জনসাধারণ এই মূঢ় নূতনতার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া কোথায় গিয়া থামিবে? একটা বনমানুষকে কাপড় পরাইয়া খাড়া করিয়া দাও, দেখিবে,

(১) একথা সত্য, (১৮৮৩) Ilbert Bill সংশোধিত হইয়াছিলঃ ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইংরেজ জুরী ভিন্ন ইংরেজের বিচার হইতে পারে না। কেবল প্রথম শ্রেণীর দোষীর মেজিষ্ট্রেট, ইংরেজকে গ্রেপ্তার করিতে পারে, কেবল প্রথম শ্রেণীর দেশীয় জজই ইংরেজের বিচার করিতে পারে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী

কোন কোটির এলাকায় তাহার নির্ব্বাচনের অনেক সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এই ঘোষবাবু অপেক্ষা বনমানুষ ঢের বুদ্ধিমান। এই ঘোষবাবু ঢাকায় যে সব মনোভাব প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার ডাক-নাম হইয়াছিল Pole-cat। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই ৪০০ নির্ব্বাচককে লইয়াই একটা নির্ব্বাচনের এলাকা নহে, শেষমুহূর্ত্তে যখন ইংরেজের দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিবে, তখন ঘোষবাবু তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তখন রাস্তার মুটেমজুর রাগান্ধ হইয়া তাঁহার ধৃষ্টতার জন্য তাঁহার বিলক্ষণ নাকাল করিবে। যে-সব ইতর বাঙ্গালী ইংরেজ-মহিলার পাণি গ্রহণ করিতে সাহসী হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা ন্যায়বিচার করিব, কিন্তু যে ইংরেজ-মহিলা একজন এ দেশী লোককে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে বারাঙ্গনার ন্যায় প্রকাশ্যভাবে ধিক্কার করা উচিত,—সে রমণীর লজ্জা-শরম নাই; সে স্ত্রীজাতির কলঙ্ক, সে ইংরেজ-কুলের কুলাঙ্গার।" (Bengal Times. June, 1885)।

এই দুই জাতির মধ্যে, সামাজিক-সম্বন্ধে বিদ্বেষ ভাব কতদুর যাইতে পারে তা তো দেখাই যাইতেছে। এ রোগের কি ঔষধ নাই? কতকগুলি ইংরেজ বা ভারতবাসী সেরূপ মনে করেন না। M. Cotton, Sir William Hunter, M. Digby, Sir William Wedderburn—ইঁহাদের প্রণীত উদার ভাবের গ্রন্থাদি হইতে এবং Bright ও Gladstone প্রভৃতির বক্তৃতা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, এমন কতকগুলি ইংরেজ আছেন যাঁহারা ভারতবাসীদিগের মানসিক ও নৈতিক মূল্য বুঝিতে সমর্থ; পক্ষান্তরে মালাবারী, M. Ghose, M. Dutt প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ইংলণ্ড ও ইংরেজ ভারতের জন্য যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ভারতবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ড ও ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভাগী

(আন্তন্ শেখভের গল্প হইতে)

বাসাবাড়ীর একটি ঘরে বসিয়া ষ্টিফেন ক্লস্‌কোভ্ 'অ্যানাটমি'র পড়া মুখস্থ করিতেছিল।

জানলার ধারে একটি যুবতী—দেখিতে রোগা, বয়স বছর পঁচিশ, নাম অনীতা। হেঁটভাবে বসিয়া সে একটি পিরাণের গলা সেলাই করিতেছিল। ক্লস্‌কোভ্ ডাক্তারী পড়ে, অনীতা তাহারই সঙ্গে থাকে।

সকাল হইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এখনো ঘর-দুয়ার গুছাইয়া পরিষ্কার করা হয় নাই। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড—তাহার উপরে বালিশ, কাপড়-জামা, বই প্রভৃতি

হরেক-রকম জিনিষ এলমেলো ভাবে ছড়ানো রহিয়াছে।

ক্রুস্‌কোভ্‌ নরদেহের পার্শ্বাস্থি সম্বন্ধে পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। পড়িতে পড়িতে বই হইতে মুখ তুলিয়া সে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকাইল। তারপর আপন মনে বলিল, —"পাঁজ্‌রার এই হাড়গুলো হচ্চে পিয়ানোর চাবির মত। এগুলো ভাল করে বুঝতে হলে হয় মড়ার কঙ্কাল নয় জীবন্ত মানুষের দেহ নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার —নৈলে সব গুলিয়ে যেতে পারে।...হুঁ, অনীতা—এদিকে এস ত!"

অনীতা সেলাই রাখিয়া উঠিয়া আসিল। ক্রুস্‌কোভ্‌ তাহার সামনে বসিয়া তার পাঁজ্‌রার হাড়গুলো হাত দিয়া একে একে গুণিতে লাগিল।

"—তাইত, প্রথম হাড়খানা হাতে ঠেকে না কেন!—এই যে, এখানা নিশ্চয় দ্বিতীয় হাড়! হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তৃতীয়, আর এটা চতুর্থ! ঠিক! অনীতা, তুমি অমন শিউরে শিউরে উঠছ কেন?"

—"উঃ! তোমার আঙুলগুলো ভারি কন্‌কনে যে!"

—"তাতে হয়েছে কি, এতে ত আর তুমি মরে যাবে না! এস—হ্যাঁ, এই হচ্ছে তৃতীয় হাড়, এই হচ্ছে চতুর্থ! ... ...অনীতা, তুমি এত রোগা, তবুও তোমার গায়ের হাড়গুলো ভাল করে হাতে ঠেকছে না! এটা দ্বিতীয়—এটা তৃতীয় ... ...আরে ছ্যাৎ, সব যে ঘুলিয়ে যাচ্ছে! অনীতা, আমার পেন্সিলটা নিয়ে এস ত!"

ক্রুস্‌কোভ্‌ পেন্সিল দিয়া অনীতার আদুড় বুকের উপরে সারি সারি কতকগুলো সরল রেখা টানিল।

"এতক্ষণে ঠিক হোল। এইবার আমি তোমাকে সহজেই পরীক্ষা করতে পারব। উঠে দাঁড়াও!"

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল—ক্রুস্‌কোভ্‌ একমনে তাহার পাঁজ্‌রার হাড়গুলো পরখ করিতে লাগিল। এদিকে বেচারী অনীতার নাক, ঠোঁট ও হাতের আঙুলগুলো হাড়-ভাঙ্গা শীতে ক্রমেই যে শীঠাইয়া নীল হইয়া উঠিতেছে—পরীক্ষায় তন্ময় ক্রুস্‌কোভ্‌ তাহা মোটেই খেয়ালে আনিল না। অনীতাও ভয়ে কিছু বলিতে ভরসা করিল না—বাধা দিলে পাছে তাহার পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয়!

ক্রুস্‌কোভ্‌ বলিল—"এতক্ষণে সব বোঝা গেল। অনীতা, তুমি চুপচাপ বসে থাকো —দেখো, পেন্সিলের দাগ যেন উঠে না যায়! ততক্ষণে আমি পড়াটা আরেকটু এগিয়ে নি!"

ক্রুস্‌কোভ্‌ আবার পাইচারি করিতে করিতে বই পড়িতে লাগিল।

অনীতা শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকময় পেন্সিলের লাইন—ঠিক যেন উল্কির দাগ! স্বভাবতই সে মৌনবতী—এখনো সে কোন কথা কহিল না, বসিয়া-বসিয়া আপন মনে কি যে ভাবিতে লাগিল, তা সেই জানে!...

আজ ছ-সাত বছর সে এমনি করিয়া নানান ছাত্রের সঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে। সে-সব ছাত্র এখন পড়াশুনো সাঙ্গ করিয়া যে যার নিজের ধান্দায় চলিয়া গিয়াছে।

অভাগিনী অনীতার কথা এখন ভুলিয়াও কেহ ভাবে না বোধ হয়। তারা যে এখন নামজাদা লোক—কেহ ডাক্তার, কেহ চিত্রকর, কেহ প্রফেসর!... ...ক্লস্‌কোভ্‌ও একদিন তাহাকে একলা ফেলিয়া আর-সকলেরই মত চলিয়া যাইবে! কালে সেও হয়ত একজন মস্ত বড়লোক হইবে।

কিন্তু, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে —বর্ত্তমানে ক্লস্‌কোভের ত দুর্দ্দশার সীমা নাই! পয়সার অভাবে এখন তাহার চা ও চুরুট পর্য্যন্ত জোটেনা। অনীতা সেলাইয়ের কাজ করিয়া যদি কিছু পয়সা আনিতে পারে, তবেই ক্লস্‌কোভের তামাক ও চা কিনিবার উপায় হইবে।

বাহির হইতে কে ডাকিল—"ওহে, আমি ভিতরে যেতে পারি কি?"

অনীতা তাড়াতাড়ি একখানি পশ্‌মী শাল টানিয়া আপনার খোলা বুকের উপর ফেলিয়া দিল। ফেটিসভ্‌ ঘরের ভিতরে ঢুকিল। সে চিত্রকর।

তার মাথার লম্বালম্বা চুল মুখ অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহারই মধ্য হইতে বন্য জন্তুর মত চাহিয়া ফেটিসভ্‌ বলিল, "ওহে, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। তোমার অনীতাকে একবার ঘণ্টা-দুয়ের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে? আমি একখানা ছবি আঁকছি—কিন্তু 'মডেলে'র অভাবে কাজ এগোচ্ছে না।"

ক্লস্‌কোভ্‌ বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অনীতা, তুমি এখুনি যাও!"

অনীতা মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু আমার শেলাই এখনো শেষ হয়নি যে!"

"চুলোয় যাক্ শেলাই। আমার বন্ধু হচ্ছেন আর্টিষ্ট—আর্টের জন্যে উনি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ত আর যে-সে কাজ নয়!"

অনীতা নীরবে জামা-কাপড় পরিতে সুরু করিল।

ক্লস্‌কোভ্‌ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আঁকছ?"

—"একটি স্নানরতা সুন্দরী! বিষয়টা চমৎকার! কিন্তু বন্ধু, তুমি এমন নোংরা হয়ে থাক কেমন করে?"

—"কি করব বল, বাড়ী থেকে আমি মাসে মাসে মোটে উনিশ-কুড়ি টাকা পাই, তাতে কি আর ভদ্দরলোকের দিন চলে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তা বটে! কিন্তু, তবু তুমি ইচ্ছে করলে আরেকটু মানুষের মত থাকতে পার ত! শিক্ষিত লোকের রুচি থাকা উচিত, তা না হলে চলবে কেন? এই ত্তাখনা, তোমার বিছানা এখনো বাসি রয়েছে, আর ঘরের চারিদিকে এমনি ময়লা আর জঞ্জাল জমেছে যে, পা পাতবার জো নেই,—আরে ছোঃ ছোঃ!"

ক্লস্‌কোভ্‌ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, কিন্তু অনীতা আজ এত ব্যস্ত ছিল যে, ঘর-দুয়োর গুছোবার একটুও সময় পায় নি।"

বন্ধুর সঙ্গে অনীতা চলিয়া গেলে, ক্লস্‌কোভ্‌ সোফার উপরে শুইয়া পড়িল এবং সেই অবস্থায় পড়া মুখস্থ করিতে

করিতে ঘুমের ঘোরে তাহার চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

ঘণ্টাখানেক পরে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অনীতা তখনো ফিরে নাই।

ক্রস্‌কোভ্‌ উঠিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল নানান কথা ভাবিতে লাগিল।

তাহার বন্ধুর কথা মনে হইল—'শিক্ষিত লোকের রুচি থাকা উচিত।'—বাস্তবিক, সে কি পশুর মতই আছে! আজ এই ঘরখানা তাহার চোখে ঠিক নরকের মত দেখাইতে লাগিল!

ক্রস্‌কোভের সামনে আশাভরা ভবিষ্যতের জ্বলজ্বলে ছবি জাগিয়া উঠিল। তখন সে একজন গণ্যমান্য ডাক্তার,—রোগীরা তাহার প্রকাণ্ড ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে,—এক ধনীর মেয়েকে সে বিবাহ করিয়াছে,—সাজানো-গুছানো ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া পরম আরামে সে চা পান করিতেছে!

এই উজ্জ্বল দিবাস্বপ্নের পাশে, অনীতার সাদাসিধা, এলমেল, ময়লা পোষাক-পরা, সকরুণ মূর্ত্তি কি বেমানান!...... ক্রস্‌কোভের মনে হইতে লাগিল, অনীতাকে আজই বিদায় করা দরকার!

এমনসময় অনীতা ফিরিয়া আসিল।

সে বাহিরের কাপড় ছাড়িতেছে,——ক্রস্‌কোভ্‌ গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখ অনীতা, একটা কথা আছে শোন, তোমার আর আমার একসঙ্গে থাকা চলবে না,—অর্থাৎ, তোমাকে আর আমার কোন দরকার নেই।"

আর্টিষ্টের ঘরে ছবির মডেল হইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অনীতা কেমন হ্যাতাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার শীর্ণ মুখখানি এখন যেন আরো-বেশী রোগা দেখাইতেছিল। ... ...ক্রস্‌কোভের কথায় সে কোন জবাব দিল না—সুধু তার ঠোঁটদুখানি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

ক্রস্‌কোভ্‌ বলিল, "আজই হোক্‌ আর দুদিন পরেই হোক্‌, আমার কাছে তোমার চিরদিন থাকা যখন আর চলবে না, তখন এ নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তে মিছে! আর, তুমি ত বোকাও নও—সুতরাং, আমার কথা তুমি বুঝতেই পারছ!"

অনীতা আবার পোষাক পরিতে লাগিল। তারপর মৌনমুখে তাহার সেলাইয়ের টুকিটাকি জিনিষগুলি গুছাইয়া লইল। তার টেবিলের পাশে কাগজের মোড়কে খানিকটা চিনি ছিল; সেটুকু একখানা বইয়ের মলাটের উপরে রাখিয়া অনীতা কোমল স্বরে বলিল, "এই—এই—তোমার চিনি রইল"—বলিয়াই সে চোখের জল ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

ক্রস্‌কোভ্‌ বলিল, "কি বিপদ, তুমি কাঁদছ যে!"

অনীতা মাটির দিকে চাহিয়া স্তব্ধ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার অশ্রু-ভরা কণ্ঠে একটিও কথা বাহির হইল না।

ক্রস্‌কোভ্‌ ঘরের ভিতরে পাইচারি করিতে-করিতে বলিল, "তুমি আশ্চর্য্য করলে দেখচি! জানই ত, সময়ে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই,—চিরকালটা ত আর আমাদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না!"

অনীতার জিনিষ-পত্তর গুছানো শেষ হইল। ক্লুস্‌কোভের দিকে ফিরিয়া সে বিদায় লইতে গেল—"আমি তবে আসি?"

এই কথাটাতে যেন ক্লুস্‌কোভের চট্‌কা ভাঙিল;— ভবিষ্যতের স্বপ্নটা যেন জাগরণের মধ্যেও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "অনীতা না হয় আরো কিছুদিন এখানে থেকেই যাক্। তারপরে তাকে সময়-মত যেতে বললেই হবে!"—তারপর নিজের এই দুর্ব্বলতায় নিজের উপরেই হঠাৎ চটিয়া গিয়া ক্লুস্‌কোভ্‌ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "এস, এস, তুমি ওখানে দাঁড়িয়া রইলে কেন অনীতা? যেতে চাও—যাও; থাকতে চাও—থাকো! নাও, জামা খোলো, তুমি থাকতে পার!"

অনীতা তাহার বাহিরের পোষাক খুলিতে লাগিল, নীরবে—চুপেচুপে। তারপর লুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া, একটি অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জানলার ধারে আপনার জায়গাটিতে গিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

ক্লুস্‌কোভ্‌ আবার তাহার ডাক্তারী বইখানা লইয়া পড়া সুরু করিয়া দিল— "দক্ষিণস্থ ফুস্‌ফুস্‌ ত্রিভাগে বিভক্ত, যথা—"

রাস্তায় একটা ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া উঠিল,—"খাবার চাই, খাবার!"

শ্রীরেণু রায়।

শীতের সকালবেলা

শীতের সকালবেলা,—আলো আজ
হয়েছে কৃপণ,
খোলে নাই দানছত্র তার;
উপাসী নয়ন তাই করে প্রাণপণ,
একবার চেয়ে, ফিরে চায় আর-বার!

গেছে দিন,—নাই আর খুসি হয়ে'
মুঠো ভরে দান।
কাঙাল তো বোঝে না সে কথা;
অভাব প্রবল যার তারি অপমান,
শুধু চায়, ভুলে গিয়ে মানের মমতা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

আলেয়া। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের প্রকাশিত 'আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষোড়শ সংখ্যক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে লেখিকার রচিত 'আলেয়া', 'প্রত্যাখ্যান', 'নূতন পূজা' ও 'সুখী' শীর্ষক চারিটি 'বড় গল্প' সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলিকে ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না; অথচ এগুলি উপন্যাসও নয়।

'নূতনপূজা' গল্পের প্লট ছোটগল্পের; কিন্তু রচনায় বাহুল্যদোষ প্রবল, ভাষা অত্যন্ত ফেনানো—তাহার ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া ছোটগল্পের আর্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'আলেয়া' গল্পের ভাষা কটমট, প্লটও বিশেষত্বহীন। 'প্রায়শ্চিত্তের' প্লটে উপন্যাসের উপাদান ছিল, কিন্তু সেটিও লেখিকা 'স্ংটে' সারিয়াছেন। শেষটুকু টানিয়া বুনিয়া দেওয়ায় করুণ রস প্রাণে কোথাও একটু ছাপ রাখিতে পারে না। "দিদি" ও "অন্নপূর্ণার মন্দির"-রচয়িত্রীর হাতে রচনাগুলি আরও উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিবে বলিয়া আশা ছিল, কিন্তু আমরা "আলেয়া" পাঠে নিরাশ হইয়াছি।

অষ্টক। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট রচিত চারিটি গল্প "পক্ষীরাজ", "বোবার ডায়েরি" "অগ্নিশুদ্ধি" ও "স্নেহের সার্জ্জারী" এবং শ্রীমতী নিরুপমা দেবী-রচিত চারিটি গল্প "ব্রতভঙ্গ", "চাঁদের আলোর প্রাণী", "প্রত্যর্পণ" ও "অপমান না অভিমান ?,'—সর্ব্বসমেত এই আটটি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। 'বোবার ডায়েরি' এবং 'অপমান না অভিমান' এই দুইটি গল্প আমাদের ভাল লাগিয়াছে—গল্প দুটিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ এবং অভিনবত্ব আছে। "অগ্নিশুদ্ধি" গল্পের প্রারম্ভভাগ চমৎকার; বেশ একটি সামাজিক সমস্যা লেখক খাড়া করিয়াছিলেন, এবং হৃদয়ের দিক দিয়াই তাহার সমাধান মিলিবে ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু সহসা শেষের দিকে গোঁড়ামির চাপে পড়িয়া গল্পটি মাটী হইয়া গিয়াছে। লেখকের গোঁড়ামির রাশ জগবন্ধুকে হঠাৎ এমনি বেকায়দায় টান দিয়াছে যে শেষদিকটায় সে বেচারা একেবারে হেঁয়ালির অন্ধকূপে হুচট খাইয়া মরিয়াছে। "স্নেহের সার্জ্জারী"র রচনা-ভঙ্গী প্রাঞ্জল, সরল, কিন্তু প্লটে বিশেষত্ব নাই। নবীন ও মাধুরীর মিলনটুকু একেবারে থিয়েটারী ধরণের হইয়াছে। "অপমান না অভিমান ?" গল্পটি চমৎকার লাগিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই সুন্দর।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ 'দরিদ্র বান্ধব ঔষধালয়' হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এই ক্ষুদ্র জীবনীখানি প্রতিষ্ঠিত। লেখা ভাল, কোথাও গদ্গদ বাজে উচ্ছ্বাস নাই। ভাষা সরল, আড়ম্বরহীন।

নারীরত্ন। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার ঘোষ, ৫২ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি জনৈক হিন্দু-রমণীর জীবন-কাহিনী। পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। এক গৃহস্থ রমণী অবরোধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া সংসারের ও সমাজের কত কাজ করিতে পারেন—সমাজের উপর তাঁহার নীরব আড়ম্বরহীন জীবন-ধারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—এ সমস্ত বিষয় অত্যন্ত 'ঘরোয়া' রকমে সহজ ভাষায় এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এ গ্রন্থ-পাঠে আদর্শ শিক্ষা হয়। প্রত্যেক বালিকা-বিদ্যালয়ে এ গ্রন্থখানি পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থের প্রধান গুণ, যাঁহার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাঁহার নামটুকু শুধু জানিতে পারা যায় তাছাড়া অপর কোন পরিচয় নাই—ঢক্কানাদ করিয়া আদর্শ খাড়া করিবার চেষ্টা আদৌ নাই—প্রকাশকের পক্ষে এ সংযম আজিকালিকার দিনে অল্প প্রশংসার কথা নয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



পথের সাথী

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৪১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৪ [১১শ সংখ্যা

যুদ্ধ-গীতি *

রণরঙ্গিণী নাচে, নাচেরে
নাচে, ঐ নাচে!
রুন্ রুন্ ঠুন্ ঠুন্ নাচেরে
নাচে
রণ মাঝে।
ঝাঁজর ঝমঝম বাজেরে
বাজে, শুন বাজে!
ডমডম্ ডমরু আওয়াজে রে
বাজে, শুন বাজে!

গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে!
আজি নাচে!
ঐ নাচে!
রণ মাঝে।
(বন্দে মাতরং)

২

অভয়ার ডঙ্কা বাজেরে
বাজে রণমাঝে
রক্ত-তপ্তকর হুঙ্কারে শঙ্খ
নিনাদে, জয়নাদে!
পায়ে পায়ে তালে তালে চল্‌রে চল্‌
সবে চল্‌! আগে চল্‌!
মারিতে মরিতে চল্‌ চল্‌রে ত্বরিতে
দলে দল দলে দল!
গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে!
আজি নাচে!
ঐ নাচে
রণমাঝে।
(বন্দে মাতরং)

---

* মেসোপটেমিয়া হইতে যুদ্ধযাত্রী বাঙ্গালী সৈনিকদের অনুরোধে যুদ্ধক্ষেত্রে গাহিতে গাহিতে যাইবার জন্য এই marching songটি রচনা করিয়া স্বরলিপি সমেত প্রেরিত হইয়াছে।

৩

মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে চল ছুটে সবে
আহবে, আগে কে হবে !
বিজয় বা স্বরগের স্বাদ কেবা লবে
আহবে, আগে কে হবে !
আমি সে, আমি সে, আমি, আমি, আমি,
যেতে দে, আগে হতে দে !
রণরঙ্গে মার সঙ্গে হতে দে
আগে যেতে দে !
গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজননী সমর সাজে রে
নাচে !
আজি নাচে !
ঐ নাচে
রণমাঝে !
(বন্দে মাতরং)

শ্রীসরলা দেবী।

স্বরলিপি

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

[স১ স১ ।। র১ —১ গ১ গ১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ ।
র ণ র — ঙ্গি নী না — চে — না — চে —

রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র১ —১ —১ —১ । —১ —১ গর১ সন্১ । ন্১ স১ র১ —১ ।
রে — না — চে — — — — — ঐ — না — চে —

—১ —১] —১ —১ ।। স১ গর১ গ১ —১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ ।
— — — — রুন্ — রুন্ — ঠু ন্ ঠু ন্ না — চে —

রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র১ —১ —১ —১ । —২ র১ গ১ । মী১ —১ প১ —১ । —০ ।।
রে — না — চে — — — — র ণ মা — ঝে — —

স১ —১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । ন্স র১ র১ —১ । র১ গর১ স১ র১ ।।
ঝাঁ — ঝ র ঝ ম ঝ ম বা — জে — রে — বা —

গ১ —১ —১ —১ । —১ —১ ম১ মগ১ । র১ ম১ গ১ —১ । —০ ।। স১ —১ স১ —১ ।
জে — — — — — শু ন বা — জে — — ডম্ — ডম্ —

স১ স১ ন্১ স১ । র১ —১ র১ —১ । র১ গর১ স১ র১ । গ০ । —২ ম১
ড ম রু আ ওয়া — জে — রে — বা — জে — শু-

মগ১ । র১ ম১ গ২ । গ১ ধ১ ধ১ —১ ।। ধ১ —১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্স১ নো১
ন বা — জে গ র জে — তো — প কা মা — ন

ধ১ । প১ মী১/২ ধপমীপ১ –১ । –১ –১ র্স১ স১ । র১ গ১ গ১ –১ । গ১
– মা – ঝে – – – জ গ জ ন নী – স

ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪ । –২ গ১
ম র – সা – জে – রে – না – চে – আ

রস১ । ন১ স১ –২ । –২ গ১ রস১ ।। ন্১ স১ র২ । –১ –১ র১ গ১ ।
জি না – চে – ঐ – না – চে – – র ণ

মী২ প২ । –২ –২ ।।
মা ঝে – –

স১ স১ র১ গ১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ । গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১
অ ভ য়া র ড – ঙ্কা – বা – জে – রে – বা

স১ ।। র৪ । –২ গ১ রস১ । ন্১ স১ র২ । –৪ ।। সগ২ গ১ গ১ ।
– জে – র ণ মা – ঝে – র ক্ত ত

–১ গ১ গ১ গ১ । গ২ গ১ গ১ । ম২ গ১ র১ ।। ন্১ স১ র২ । –২ র১
– প্তু ক র হু ঙ্কা রে শ ঙ্খ নি না – দে – জ

গ১ । মী২ প২ । –৪ ।। স১ স১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । র৩ র১ ।
য় না দে – পা য়ে পা য়ে তা লে তা লে চল্ রে

র১ গর১ স১ র১ ।। গ৪ । –২ ম১ মগ১ । র১ ম১ গ২ । –৪ ।।
চ ল্ স বে চ ল্ আ গে চ – ল্ –

স১ স১ স১ স১ । স১ স১ ন্১ স১ । র১ র১ র১ র১ । র১ র১ স১ র১ ।।
মা রি তে ম রি তে চ ল্ চ ল্ রে ত্ব রি তে দ লে

গ৪ । –২ ম১ মগ১ । র১ ম১ গ২ ।। গ১ ধ১ ধ১ –১ ।।
দ ল দ লে দ – ল গ র জে –

ধ১ –১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্স১ নো১ ধ১ । প১ মী১ ধপমীপ১ –১ ।
তো – প কা মা – ন – মা – ঝে –

–১ –১ স১ স১ । র১ গ১ গ১ –১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ ।
– – জ গ জ ন নী – স ম র –

গ১ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪ । –২ গ১ রস১ । ন্১ স১
সা – জে – রে – না – চে – আ জি না –

—৪ । —২ গ১ রস১ ।। ন্১ স১ র২ । —৪ । —২ র১ গ১ । মী২ প২ । —২ —২ ।।

চে — ঐ — না — চে — — র ণ মা ঝে — —

স১ স২ র১ । গ১ ম১ প১ প১ । গ১ প১ ম১ গ১ । র২ গর১ সন্১ ।।

মা ভৈ মা ভৈ — র বে চ ল ছু টে স বে —

ন্১ স১ র২ । —২ গ১ রস১ । ন্১ স১ র২ । —৪ ।। গ১ গ২ গ১ ।

আ হ বে — আ গে কে হ বে — বি জয় বা

গ১ গ১ গ২ । গম১ প১ ম১ গ১ । র১ গ১ র১ রস১ । ন্১ স১ র২ ।

স্ব র গের স্বা দ কে বা ল — বে — আ হ বে

—২ র১ গ১ । মী১ মী১ প২ । —৪ ।। স১ স১ স২ । স১ স১ স২ ।

— আ গে কে হ বে — আ মি সে আ মি সে

র১ র১ র১ র১ । র১ র১ স১ র১ । গ৪ । —২ ম১ মগ১ । র১ গ১ ম২ ।

আ মি আ মি আ মি যে তে দে — আ গে হ তে দে

—৪ ।। স১ স১ স২ । স২ ন্১ স১ । র২ র২ । —২ স১ র১ ।

— র ণ র ঙ্গে মা র স ঙ্গে — হ তে

গ৪ । —২ ম১ মগ১ । র১ গ১ ম২ ।। গ১ ধ১ ধ১ —১ ।।

দে — আ গে যে তে দে গ র জে —

ধ১ —১ ধ১ ধ১ । ধ১ র্স১ নো১ ধ১ । প১ মী১ ধপমীপ১ —১ ।

তো — প কা মা — ন — মা — ঝে —

—১ —১ স১ স১ । র১ গ১ গ১ —১ । গ১ ম১ প১ ধপ১ ।

— — জ গ জ ন নী — স ম র —

গ২ প১ ম১ গ১ । রগ১ রস১ ন্১ স১ ।। র৪ । —২ গ১ রস১ । ন্১ স১ ।

সা — জে — রে — না — চে — আ জি না —

—২ । —২ গ১ রস১ । ন্১ স১ র২ । —৪ । —২ র১ গ১ । মী২ প২ । —২ —২ ।।

চে — ঐ — না — চে — — র ণ মা ঝে — —

শ্রীসরলা দেবী।

পুশ্‌কিনের কবিতা

স্বপ্নময়ী

ঝাপ্‌সা ভোরের আলোয় এলে তুমি,
ভোরের আলোয় দেখেছি ওই ছবি,
ছেলেবেলাই গানের প্রসাদখানি
তোমার বরে পেয়েছে এই কবি।
স্বর্গ-পথে দেউটি-হাতে এসে
কী মালা মোর জড়িয়ে দিলে কেশে!

হিন্দোলাতে ঘুমিয়েছিলাম শিশু—
মর্ত্ত্যলোকের ধুলি-মলিন গেহে,
স্বর্গ হ'তে কখন্‌ এসে চুপে
আশীস্‌ তুমি কর্‌লে গভীর স্নেহে;
এলে যদি রও কাছে, বান্ধবী!
যে-অবধি মরে না যায় কবি।

প্রাণে কেবল ঢালো স্বপন্‌-মধু,
পেলব ও হাত রাখো এ মোর মাথে,
লঘু তোমার পক্ষ-ত্বটি দিয়ে
ঢাকো আমায় ঢাকো দিবস-রাতে;
দুখের উদাস?—পাঠাও বনবাসে,
থাকো তুমি থাকো আমার পাশে।

মনকে আমার নাওগো তোমার করে',—
ভুলিয়ে রাখো সব্‌-ভোলানো সুরে,
পথ দেখিয়ে চল্‌ গো নিয়ে মোরে
জীবন-শেষের চির-জীবন-পুরে।
জ্বালো তোমার আঁধার-হরণ-বাতি
চিরযুগে জাগ্রত যার ভাতি।

মাত্বলি

পাহাড়ে আর পোস্তা-গাঁথা গড়ের ভিতে যেথা
গাঁজলা-মুখো ঢেউএর হানাহানি,—
সন্ধ্যাবেলার কুয়াসাতে ফিঁকে চাঁদের আলো
চোখে যেথায় স্বপ্ন মিলায় আনি',—
রংমহলের আল্‌কোহলে মাতাল হ'য়ে যেথা
জীবন ফুঁকে আয় গো তুরুক্‌গুলি,—
ইস্তাম্বুলি সেই মুলুকের এক যে যাত্বকরী
দিয়েছিল আমায় এ মাত্বলি।

হাতের পরে হাতটি রেখে আঁখির পরে আঁখি
বলেছিল—"যত্নে রেখো এরে
ভালোবাসার কবচ এ যে রাখ্‌লে এ ধন বুকে
পড়্‌বেনাকো ফাল্‌তো ফ্যাসাদ ফেরে।

ঝড়-তুফানে এ মোর কবচ আস্‌বেনাকো কাজে—
জানিয়ে রাখি তোমায় খোলাখুলি,—
মৃত্যু এলে শিয়র-দেশে হয় তো গো বাঁচাতে
পারবেনাকো আমার এ মাত্বলি।

গুপ্ত ধনের মালিক হ'তে পারবে না এর গুণে,
সোনার খনি মিল্‌বে না এর বলে;
ত্বষ্‌মনেরা পড়বেনাকো আপ্‌নি তোমার পায়ে
এই মাত্বলি ধারণ করার ফলে।
স্মরণ-করা-মাত্র এসে মিল্‌বে না সহসা
মনটা যারে কাছে পেতে করছে ঝুলোঝুলি,
প্রবাসে মন কাঁদ্‌লে পরে তোমার আপন দেশে
পৌঁছে দিতে পার্‌বেনা মাত্বলি।

কিন্তু যদি চটুল চোখের চাউনি চপল কভু
কাবু তোমায় করে যাদুর বলে,
অনুরাগের অরুণিমা নেইক যে অধরে
সে যদি ছোঁয় তোমার অধর ছলে,

প্রেমের যদি হয় অপমান মনের ভুলে কভু
দুখের সাগর মর্ম্মে ওঠে ফুলি',
অবিশ্বাসী হাসির ফাঁসী কণ্ঠ যদি রোধে
রক্ষা তখন করবে এ মাদুলি।"

ভগ্নহৃদয়

গোপন প্রাণের সাধের স্বপন সকল গেল মরে,
রইনু বেঁচে আমি;
মুকুল-দশায় অনেক আশাই শুকিয়ে গেল ঝরে
অনেক মনস্কামই।
মৌন হিয়ায় খেদের হাহাধ্বনি—
রইল পুঁজি,—পাঁজরে কালফণী।

উড়িয়ে নে যায় দুর্ণিয়তির দুরন্ত ঝঞ্ঝাতে
কবির মুকুট মম,
আপন বল্‌তে রইলনা কেউ তুল্‌তে ধরে' হাতে,—
জগৎ মরু-সম।
ছন্নছাড়া, আঙার-মাড়া আঁখি,
ভাব্‌ছি শুধু শেষের কত বাকী।

নগ্ন শাখার পাণ্ডুছবি শেষ-পাতাটির মত
উঠছি কেবল কেঁপে,
জাড়ের বাদল ঝড়ের মাদল বাজিয়ে শতশত—
তুষার ঘোড়ায় চেপে—
পাহাড় হ'তে আস্‌বে কবে নেমে?
কাঁপন আমার ফুরিয়ে যাবে থেমে।

আমার ছবি

(পুশ্‌কিনের পনেরো-বছর বয়সের রচনা।)

আমার ছবি চাই, লিখেছ, তাই হবেগো তাই,
লকেট্‌-সাইজ্‌ দিই এঁকে, নাও, একটু ফারাক নাই।
ভালো-ছেলে নইক, বলে' রাখ্‌ছি গোড়াতে,
হাঁদা ছাড়া যা' বল তাই,—চট্‌বনা তাতে।
অথচ নই তর্কবাগীশ,—টোলের ধনুর্দ্ধর,—
মাদ্রাসা কি মক্তবেতেও হইনি মাতব্বর;
এক্‌টুকু খাম্‌খেয়ালি খুঁৎখুঁতে বেশ এক্‌টুক্‌,—
দুই মিলে যা হয় আমি তাই,—নেই কোনো ভুলচুক্‌।
আকার কিছু দীর্ঘ, গায়ের রংটা কিছু লাল
কোঁকড়া রকম চুলগুলো আর ঢিলে রকম চাল।
এক্‌লা থাকা সয়না ধাতে—হাঁপিয়ে ওঠে মন,—
সব সময়েই নয় সাথী মোর কল্পনা স্বপন,—

সঙ্গ খুঁজি,—বাক্য-সভার চাইনে কচ্‌কচি,—
নিরালা আর লোকালয়ে সোনার জাল রচি।
ভালোবাসি এই দুনিয়া—চন্মনে সবক্ষণ,
মন খুসী হয় নৃত্য খেলায়,—কর্‌ব না গোপন।
ভালোবাসি মিষ্টি হাসি,—বল্‌বনাকো কার,—
চিন্তে বোধ হয় পার্‌ছ এখন?—এই ছবি আমার!
বিধি আমায় যা গড়েছেন, দিয়েছেন যে বেশ—
সেই চেহারায় জাহির হ'তে নেই শরমের লেশ।
মস্করাতে মাকড়া খাঁটি,—রং জমাতে জিন্‌,—
ফুর্ত্তিবাজের বাদ্‌শাজাদা—এই কবি পুশ্‌কিন্‌।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইংরেজ ও ভারতবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ

(ফরাসী হইতে)

ব্যক্তিগত জীবনক্ষেত্রে ভারতবাসী ও ইংরেজের যে মনোভাব তাহা হইতে সার্ব্বজনিক কর্ম্মক্ষেত্রে উহাদের মনোভাব কিরূপ হইতে পারে তাহার আভাস পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায়। সকল দেশেই সামাজিক সমস্যাদির উপর রাষ্ট্রনীতির আধিপত্য পরিলক্ষিত হয় এবং এই সকল সমস্যার সমাধান, অনেকাংশে ধনী ও দরিদ্র, কর্ত্তা ও কর্ম্মীদের দৈনন্দিন সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে; যে দেশ বৈদেশিকের শাসনাধীন, সে দেশে স্বদেশীদের সহিত বিদেশীদের দৈনন্দিন সম্বন্ধের ভাবটা যেরূপ তদনুসারে স্বদেশীদিগের স্বাধীনতা পুনর্লাভের ইচ্ছা বাড়ে কিংবা কমে।

দরিদ্র, উদাসীন, আপন কাজে নিমগ্ন—ভারতের কৃষকেরা, হিন্দু কিংবা মুসলমান রাজার যেরূপ আজ্ঞাবহ, ইংরেজ রাজারও সেইরূপ আজ্ঞাবহ। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা নূতন ভাবের কথা কিছু শুনিলেই তাহার নিন্দা করে। অধিকাংশ মুসলমান কোরাণ ও চিরাগত প্রথার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চপদ লাভ করাই মুসলমান আমীর-ওমরাওর একমাত্র বাসনা। কেবল নব-হিন্দু, পার্সী ও কতকগুলি মুসলমান, যাহারা ইংরেজি ভাবে শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত তাহাদেরই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ঔৎসুক্য দেখা যায়।

বহুশতাব্দী হইতে যে-হিন্দুরা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক, রাজা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, তাহারা যখন য়ুরোপের ইতিহাস পাঠ করিল তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না!

"Hindu Civilisation"-এর গ্রন্থকার প্রমথ বসু বলেন:—

"ইংরেজি শিক্ষা হইতে হিন্দুরা ঐতিহাসিক সাহিত্যের সহিত যখন প্রথম পরিচয় লাভ করিল, তখন উহারা জানিতে পারিল, অনেকগুলি সভ্যতম পাশ্চাত্য জাতির লোকেরা কি-করিয়া প্রবল রাষ্ট্রীয় শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কি

করিয়া তাহারা অনিচ্ছু উৎপীড়নকারী প্রভুদিগের নিকট হইতে কতকগুলি গুরুতর অধিকার ছিনিয়া লইয়াছিল; কি করিয়া স্বেচ্ছাচারী রাজাদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিল, তাহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, এমন কি, তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুরা সেইসব রাজাদের কথা অবশ্য জানিত যাহারা আপন নিকট-আত্মীয়দের রক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল; যাহারা উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষ অথবা অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত; কিন্তু রাজ্যের প্রজাবর্গ কোন গুরুতর রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হইয়াছে একথা তাহারা কখন শুনে নাই। এ কথা সত্য, তাহারা প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের সহিত বহুপূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিল, কিন্তু সে শাসনতন্ত্র নিছক স্থানীয় ধরণের। কোন গ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে সেই গ্রামের শাসন-এলাকা কিংবা জাতের পঞ্চায়ৎ কখন প্রসারিত ছিল না। জাতীয় প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের কথাটা হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা হইতেই প্রথম অবগত হয়। তাহারা জানিতে পারিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি, প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণের মঞ্জুরী ব্যতীত এক পয়সাও আদায় করিতে পারেন না। এবং যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরেজ, ভারতবর্ষের বৃহদায়তন রাজ্যের রাজাদিগকে সিংহাসনে বসাইতেছেন, সিংহাসন হইতে নামাইতেছেন, দণ্ডপুরস্কার বিধান করিতেছেন, তাঁহারা নিজ কার্য্যের জন্য ঐসকল প্রতিনিধিদিগের নিকট দায়ী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ত ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত দুরাচারের জন্য বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাদ্‌শারা সরাসরিভাবে দুরাচারী শাসনকর্ত্তাদিগকে দণ্ডিত করিতেন ইহা তাহারা জানিত, কিন্তু প্রজাবর্গ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণের এ বিষয়ে কোন হাত আছে, একথা তাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। পাশ্চাত্যখণ্ডে জনতন্ত্রের অভ্যুদয়সম্বন্ধে তাহারা এই প্রথম জ্ঞান লাভ করিল এবং এই কথাটা তাহাদের মনে গভীররূপে অঙ্কিত হইল"।

তাছাড়া, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশে প্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হইবার ২০ বৎসর পরে, Sir Charles Treveylan জানিতে পারিলেন —য়ুরোপীয়ধরণে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতির তত্ত্ব সকল গ্রহণ করিয়াছে; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে স্কুল-আদি বিরল ছিল, সেখানে এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা—"বিদেশীকে দেশ হইতে তাড়াও;" এবং বঙ্গদেশ যেখানে শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেখানে প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্র পাইবার ইচ্ছা বলবতী।

তাহার পর হইতে শতসহস্র হিন্দু য়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হইবার অধিকার হইতে ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতে উহাদের রাষ্ট্র-নৈতিক মতামত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে এবং বে-আইনী না করিয়া কিরূপে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন করিতে হয়, তাহা ইংরেজের নিকট উহারা শিক্ষা পাইয়াছে। অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পাইয়া হিন্দুরা স্বাধীন দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠান লাভ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছে; শাসন-বিভাগের অনেক পদে নিযুক্ত হইয়া, শাসন-বিভাগের সমস্ত পদ অধিকার করিবার জন্য উহাদের এখন উচ্চাভিলাষ জন্মিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেকালের গল্প

বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেকালের কয়েকজন সাহিত্যিকের সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটী গল্প প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, যে সকল প্রাচীন ব্যক্তির মুখে গল্পগুলি শুনিয়াছি, এ-সকলের ভিত্তি তাঁহাদের উক্তির উপরেই প্রধানতঃ স্থাপিত, তাহা ছাড়া উহাদের সত্যতা অন্য কোনও উপায়ে প্রমাণিত করা একরূপ অসম্ভব।

(১) প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)।*

সত্যানুরাগ। এমন অনেক লোক



প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)

* ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র ৺হীরালাল মিত্রের শ্যালক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত-মহাশয় এইরূপ অনেকগুলি গল্প বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে প্যারীচাঁদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত প্রকাশ্য সভায় বিবৃত করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় সভার কার্য্যবিবরণীতে এগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

দেখা যায় যাঁহারা একবার যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন বা যে-অভিমত প্রকাশ করেন, পরে ভুল বা অন্যায় বলিয়া বুঝিলেও তাহা সংশোধন করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু প্যারীচাঁদের সত্য-নিষ্ঠা এমন প্রবল ছিল যে, তিনি কখনও প্রয়োজন বুঝিলে আপনার ভ্রম-সংশোধনে বা মত-পরিবর্ত্তনে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। একবার কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের কোন সভায় তিনি কোন প্রস্তাবের সমর্থন করেন; পরে সেই বিষয়ে অপর সদস্যগণ যখন তর্কবিতর্ক করেন, তখন প্যারীচাঁদ আপনার ভুল বুঝিতে পারেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের বিপরীত অপর-এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে প্যারীচাঁদ সেই বিপরীত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। ইহাতে উক্ত সভার সভাপতি তদানীন্তন ভাইস্-চান্সেলার, স্যর আর্থার উইলসন্ বিস্মিত হইয়া প্যারীচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, এখন উহার amendmentএরও সমর্থন করিতেছেন, এ কেমন ব্যাপার?" ইহাতে প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠিতভাবে বলেন, "Am I not capable of amendment, Sir?" (শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের এই উক্তি এখনও তাঁহার মনে আছে।)

বাক্‌চাতুর্য্য। স্যর এশ্‌লি ইডেনের সহিত প্যারীচাঁদ মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র যখন নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তখন স্যর এশ্‌লি সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে এদেশে আসিয়া তাঁহার নিকট শাসনকার্য্য শিক্ষা করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ এবং সুপ্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন, তখন স্যর এশ্‌লি (উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া) উক্ত পত্রে নীলকরগণের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতেন। প্যারীচাঁদও প্রায়ই ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে লিখিতেন এবং সেই সূত্রে, স্যর এশ্‌লির সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। স্যর এশ্‌লি ইডেন যখন বাঙ্গলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, তখন প্যারীচাঁদ কোনও ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাদের নিকট সুপারিস করেন। স্যর এশ্‌লি চিরপ্রচলিত প্রথামত চীফ্ সেক্রেটারীকে সেই সুপারিস-পত্র পাঠাইয়া সেই সঙ্গে নিজেরও একখানি পত্র লিখিয়া দেন। তথাপি সেই ব্যক্তিকে বিফল-মনোরথ হইতে হয়। প্যারীচাঁদকে তিনি পুনরায় সুপারিসের জন্য অনুরোধ করিলে পরোপকারী প্যারীচাঁদ স্বয়ং স্যর এশ্‌লির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্যর এশ্‌লি তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্যারীচাঁদ সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনি যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা 'শ্রী'-যুক্ত ছিল না, এবারে একখানি 'শ্রী'-যুক্ত পত্র দিতে হইবে।" স্যর এশ্‌লি প্যারীচাঁদের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় প্যারীচাঁদ বলিলেন, "কোনও জমিদার, তাঁহার প্রজারা কোনও আবেদন পত্র আনিলে তৎক্ষণাৎ সেই

আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহার নায়েবের নিকট পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু নায়েবের প্রতি তাঁহার গোপন আদেশ ছিল যে, 'শ্রী'-যুক্ত স্বাক্ষর ভিন্ন অন্য স্বাক্ষর গ্রাহ্য হইবে না। প্রজারা হৃষ্টচিত্তে নায়েবের নিকট যাইত কিন্তু 'শ্রী'-হীন আবেদন গ্রাহ্য হইত না। সুতরাং এবার আপনি 'শ্রী'-যুক্ত স্বাক্ষর দিন।" এই কথা শুনিয়া স্যর এস্‌লি হাসিতে হাসিতে স্বহস্তে উপযুক্ত আদেশপত্র লিখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, সেবারে প্যারীচাঁদের মুখরক্ষা হইয়াছিল।

ধর্ম্মমতের উদারতা। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ্ ইংরাজীশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেন। তৎকালে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সংকীর্ণ মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু প্যারীচাঁদ সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকল বিষয়েই উদার মত পোষণ করিতেন। প্যারীচাঁদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যাহাতে "কুসংস্কার-কলুষিত (১) হিন্দুধর্ম্ম" সহজেই পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই আশায় ডাক্তার ডফ্ প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাঁহাকে প্ররোচিত করিতেন। এমন-কি, গুজব রটিয়াছিল যে, প্যারীচাঁদ শীঘ্রই খৃষ্টান হইবেন। ডাক্তার ডফ একদিন আসিয়া প্যারীচাঁদকে খৃষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্যারীচাঁদ নীরবে সমস্ত উপদেশ শুনিয়া প্রত্যুত্তরে ধীরভাবে বলিলেন: "দেখুন, আমাদের এই পাখা-টানা বেহারাটি অতি সচ্চরিত্র, একটিও মিথ্যা কথা বলে না, কখনও চুরি করে নাই। এর নৈতিক জীবন খুব উঁচু। কিন্তু এ লোকটি খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না বা শুনে নাই। আপনি কি বলিতে চান যে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবে না?" প্যারীচাঁদের উত্তর শুনিয়া ডাক্তার ডফ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং আর কখনও

---

(১) এ-সম্বন্ধে Bengal Hurkaru (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) বলেন;—"The Ryot's friend of yesterday has given circulation to an idle report, to the effect that a certain native gentleman of the highest respectability and who is connected with most of the literary and educational societies of Calcutta, was about to embrace Christianity with his entire family. The statement, we have been assured, is totally without foundation. It would have been as well if *Ryot's friend* had instituted enquiries, before he proceeded to put this tale before the world, because, although the individual in question can well afford to smile at the report, it is unpleasant to be brought before the public without even so much as a "by your leave".

৺কৃষ্ণদাস পাল এ-সম্বন্ধে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৬ই অক্টোবর তারিখের 'হিন্দুপেট্রিয়টে' লিখিয়াছিলেন;—"The Hurkaru contradicts the statement of the Ryot's friend that Babu Peary Chand Mittra the enlightened Secretary and Librarian of the Calcutta Public Library, was about to embrace Christianity with his entire family. We can only say that the Babu is an earnest man in the matter of religion".

প্যারীচাঁদের নিকট তাঁহার খৃষ্টান হইবার প্রসঙ্গ তুলেন নাই।

রসিকতা। টেকচাঁদ ঠাকুরের রসিকতার পরিচয় 'আলালের ঘরের দুলালে' প্রচুর পরিমাণে আছে। এ-স্থলে দুই-একটি গল্প বলিয়া প্যারীচাঁদ-প্রসঙ্গের 'মধুরেণ' সমাপন করা যাইতেছে।

যখন শোভাবাজারের নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন, তখনও তাঁহার অগ্রজ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। একদিন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশনে দুই ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া প্যারীচাঁদ হাসিতে হাসিতে রাজা কমলকৃষ্ণকে বলেন, "রাজাবাহাদুর, এইবার ছোটভাই মহারাজকে প্রণাম কর!" উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

একবার ইটালীর দেবনারায়ণ দের পুত্রের বিবাহের পত্র-সভায় প্যারীচাঁদ দুই তিন দফায় দেবনারায়ণ বাবুকে টাকা দিতে অনুরোধ করিলে দেবনারায়ণবাবু বলিলেন, "প্যারীবাবু, আপনি তো বেশ মজার লোক! প্রত্যেক বার আমাকেই দিতে বলিতেছেন!" ইহাতে প্যারীচাঁদ বলিলেন, "বাপু, তুমি দেবে না ত দেবে কে? তোমার নামের আগে "দে", শেষে "দে" —সুতরাং তুমিই দেবে!" সভায় হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল।

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম)

কৌতুক ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' কালীপ্রসন্ন সিংহের রসভাষের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"রহস্য-কৌতুক হাসি রসিকতা-ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

কালীপ্রসন্নের এই কৌতুকপ্রিয়তা অতি অল্পবয়স হইতেই দেখা গিয়াছিল। কালীপ্রসন্নের সতীর্থ ও প্রিয়সহচর, 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়'-প্রণেতা, (অধুনা বিন্ধ্যাচলে কৃত-নিবাস) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়, একবার আমাদিগকে তাঁহার ছাত্রাবস্থার একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটী এই,—কালীপ্রসন্ন যখন হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পড়িতেন, তখন তিনি "আন্দোলন-পত্র" নামক একটি দৈনিক পত্র বাহির করিতেন। তাহাতে অনেকেই লিখিতেন এবং কালীপ্রসন্ন তাহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রে অনেকের প্রতি বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি থাকিত। উহা শ্লেটের উপর 'হস্তদ্বারা মুদ্রিত' হইয়া দুই তিন ক্লাসের ছাত্রগণের মধ্যে চালাচালি করিয়া প্রচারিত হইত। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ হইতে তাঁহার সতীর্থ ও শিক্ষকগণও নিষ্কৃতি পাইতেন না। 'আন্দোলন-পত্রে'র সম্পাদক-বিরচিত একটি কবিতা এখনও প্রতাপবাবুর স্মরণ আছে:—

Sturgeon সাহেবের classএ
পড়্তো লাহা।
তার নীচে ঈশ্বর সাহা॥
ঈশ্বর সাহার ছোট পেট।
তার নীচে জয়গোপাল সেট॥
জয়গোপাল সেটের লম্বা ঠ্যাঙ্গ।
তার নীচে বেণী ব্যাঙ্গ॥



কালীপ্রসন্ন সিংহ

*   *   *

তার নীচে বুনো কালো
বুনো কালো মারে বড়।
তার নীচে গুপী দড় ॥
গুপী মিত্র, খাতায় চিত্র,
Blankও বুকে Blackও মার্ক ॥
ইত্যাদি—(২)

কালীপ্রসন্নের ছাত্রাবস্থায় আর একটি গল্প পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' হইতে আমার রচিত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক গ্রন্থে

---

(২) হিন্দুকলেজের পুরাতন রিপোর্ট হইতে এই সময়ের কয়েকজন শিক্ষকের নাম উদ্ধৃত হইল ;—

মিষ্টার টি, এইচ, ষ্টার্জ্জন	বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা	,, বনমালী মিত্র
,, জয়গোপাল শেঠ	,, গোপীকৃষ্ণ মিত্র

উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সে গল্পটী পুনরুল্লেখ-যোগ্য :—

“কালীপ্রসন্নের বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভাল-বাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একজন শিক্ষক বলেন, একদিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহির্দৃশ্যমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময় হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীরভাবে বলিলেন, “মহাশয়! আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া একে “আজ মারিয়াছি।”

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল পরলোক-গত মনমোহন দত্ত-মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি শুনিয়াছিলাম।

কালীপ্রসন্নের অন্যতম বন্ধু * * * পাল-মহাশয় দরিদ্রের সন্তান ছিলেন কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠেন, বড় বড় সভা-সমিতিতে যান, রাজা-মহারাজেরা তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন; কিন্তু পাল-মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি অনাবৃত দেহে বাজার হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনেন, সংসারের সকল কাজই করিয়া থাকেন। একদিন কালীপ্রসন্ন দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া পাল-মহাশয় চাপকান আঁটিয়া ঘড়ীর চেইন ঝুলাইয়া কোথায় যাইতেছেন এবং পশ্চাতে আতপতাপে দগ্ধ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বাজার হইতে তরী-তরকারী কিনিয়া বাটী ফিরিতেছেন। কালীপ্রসন্নের চোখে এই দৃশ্য এত অসহ্য বোধ হইল যে, তিনি উপর হইতে গম্ভীরভাবে পালমহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “পাল-মহাশয়! পাল-মহাশয়! আপনি কোথা হইতে এমন ভাল ভাল চাকর পান? আমাদের চাকর-ব্যাটারা ত দিন-রাত পড়ে পড়ে ঘুমায়! আপনার চাকরটি ত' বেশ! দেখিতেছি, এই রৌদ্রে বারবার বাজারে আনাগোনা করিতেছে। বুড়া মানুষ—কম মোটটীও ত' বহিয়া লইয়া যাইতেছে না!” বলা বাহুল্য, পাল-মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বৃদ্ধ যে তাঁহার পিতা, এ-কথাও কালীপ্রসন্নকে জানাইলেন। কালীপ্রসন্ন যেন কিছুই জানেন না এমনই ভাব দেখাইয়া তাঁহার ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বেশভূষায় আড়ম্বরহীনতা। পুণ্য-স্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কালীপ্রসন্ন আদর্শ পুরুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির ইচ্ছা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই কালীপ্রসন্ন, বিদ্যা-সাগরের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনিও বিদ্যাসাগরের অনেক গুণেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। বেশভূষায় তিনি তাঁহারই মত আড়ম্বরহীন ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মত তিনিও ধুতির উপর সামান্য একখানি চাদর খুলিয়া গায়ে দিতেন। একবার একপ্রকার ঢাকাই উড়ানির

ফ্যাসান উঠে। উড়ানির মূল্য এত বেশী যে, খুব ধনী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও তাহা কিনিবার সামর্থ্য ছিল না। একবার সহরের একজন প্রসিদ্ধ ধনী সেইরূপ একখানি উড়ানি গায়ে দিয়া কালীপ্রসন্নের বাটীতে পূজার নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়া দেখেন যে, কালীপ্রসন্ন একখানি সামান্য দেশী চাদর গায়ে দিয়া বেড়াইতেছেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের দিকে কালীপ্রসন্নের লক্ষ্য নাই, এমন সুন্দর শিল্পকার্য্যের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন না বলিয়া সেই ধনী ব্যক্তি কালীপ্রসন্নের নিকট অনুযোগ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় বিস্মিত হইয়া তিনি দেখিলেন, কালীপ্রসন্ন সেইরূপ উড়ানি অনেকগুলি ক্রয় করিয়াছেন এবং তাঁহার বাটীর সমস্ত সরকার ও ভৃত্যদিগকে সেই উড়ানি এক-একখানি দান করিয়াছেন!

(৩) রামনারায়ণ তর্করত্ন

("নাটুকে নারা'ণ")

বাক্‌চাতুর্য্য ও রসিকতা।

রামনারায়ণ কবিরত্নের নাটক ও প্রহসন গুলিতে তাঁহার রসরচনার ও বাক্‌চাতুর্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তর্করত্ন-মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য, সুলেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী দত্ত-মহাশয়ের নিকট তর্করত্ন মহাশয়-সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প শুনিয়াছিলাম। তাহার কয়েকটি এস্থলে বিবৃত করিতেছি ঃ—

একসময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী আশু-



রামনারায়ণ তর্করত্ন

তোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-বিদায় হইতেছিল। ছাতুবাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণকে ছাতুবাবু তিনটাকা বিদায় দিলেন। তারপর তরুণবয়স্ক রামনারায়ণ তর্করত্ন-মহাশয়কে দুইটী টাকা দিলেন। তর্করত্ন-মহাশয় দুইটী টাকা পাইয়া ছাতুবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত (৩) করিলেন! আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন না?" ছাতুবাবু তর্করত্ন-মহাশয়ের বাক্‌-চাতুর্য্যে প্রীত হইলেন কিন্তু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন, "তর্করত্ন-মহাশয়,

(৩) 'দুই'য়ে পক্ষ, 'তিনে' নেত্র।

ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেই সম্ভবে, মানুষের ত' ত্রিনেত্র নাই।"

ইহাতে তর্করত্ন মহাশয়, বলিলেন, "আপনাকে ত আমরা আশুতোষ বলিয়াই জানি। ত্রিনেত্র কেন? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।" তর্করত্ন-মহাশয়ের এই বাক্যে অতিশয় প্রীত হইয়া ছাতুবাবু তাঁহাকে পঞ্চদশ মুদ্রা বিদায় দিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন।

তর্করত্ন-মহাশয়ের নাটকাদি প্রকাশিত হইলে অনেক ধনী ব্যক্তি বহুব্যয়ে সেগুলি আপনাদের আবাসে অভিনয় করাইতেন। সকলেই তর্করত্ন-মহাশয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। ধনীদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে তর্করত্ন-মহাশয় পদধুলি দিতেন। একদিন তিনি কলিকাতায় কোন এক বিখ্যাত ধনীর বাটীতে গিয়া দেখিলেন, সেই বাটীর একজন যুবক কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অখাদ্য ও অপেয় ভোজন এবং পান করিতেছেন। তর্করত্ন-মহাশয়কে দেখিয়া একজন তরলমস্তিষ্ক যুবক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আসুন, তর্করত্ন-মহাশয়, আসুন, আসুন, আমাদের সহিত একটু 'খানা' খান।" তর্করত্ন-মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওহে বাবুরা, তোমরা সহুরে লোক, তোমরা 'খানা' খাও। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, আমরা খানায় (পয়ঃ-প্রণালীতে) মলমূত্রাদিই ত্যাগ করিয়া থাকি।" উপযুক্ত উত্তর পাইয়া যুবকগণ নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

একবার ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে তর্করত্ন-মহাশয় পদার্পণ করিলে, উপস্থিত ব্যক্তিগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কে আছিস্, তর্করত্ন-মহাশয় আসিয়াছেন, (বসিবার জন্য) চৌকী দে।" তর্করত্ন-মহাশয় ইহা শ্রবণ করিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হা কপাল, আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, চোর নহি, ডাকাতও নহি, আমাদেরও চৌকী দিতে হইবে?"

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিতও তর্করত্ন-মহাশয় রসিকতা করিতে ছাড়িতেন না। পুলিনবাবু বলেন যে, তাঁহার অন্যতম সহপাঠী "যাদবকিশোর গোস্বামী"কে তর্করত্ন-মহাশয় রহস্য করিয়া ডাকিতেন, যাদব কি-শোর (শূকর)। পড়ায় অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া উমেশ নামক অপর এক ছাত্রকে সম্বোধন করিতেন, উ ভো মেষ!

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

লুকিবিছে

টিকটিকি, গীরগিটি, মশা, মাছি, ঘুঘু, গায়ে-পড়া-আলাপী, ঘাড়ে-চড়া-বন্ধু,—এক কথায় সমস্ত পরকীয়া-সাধকদের দলের কাছ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা চলে এমন লুকিবিছেটা আংটি কোরে কর্তা আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুনে আমাদের কৌতূহলের সীমা রইল না। আমরা আংটির কেচ্ছা শোনবার জন্যে কর্তাকে চেপে ধরলেম। কোন্ সূত্রে, কোন্খান থেকে, আংটিটা তাঁর আঙুলের গাঁটে এসে যে আটকে রইল সেটা জানাতে কর্তা নারাজ। কাজেই কাণ্ডের আদিপর্ব্বের শেষ থেকে তিনি আরম্ভ করলেন—

"অন্যের দেশালাইয়ের বাক্স যেমন করে অজান্তে সময়ে-অসময়ে আমাদের পকেটে থেকে যায়, তেমনি করে রাং এবং সীসা এই দুই ধাতু দিয়ে গড়া লুকিবিছের এ আংটি হাতে নিয়ে সুন্দরবনের অঘোর-পন্থীদের আড্ডা ছেড়ে হাঁটা-পথে অনেক ঘুরতে-ঘুরতে শেষে আমি তমলুকে এসে হাজির। তমলুক খুব একটা ভারি সহর। সেখানে আমি একবার ছেলেবেলায় আমার বড়মামার সঙ্গে গিয়েছিলুম। মামা তখন ফুরুস্ কোম্পানির মুচ্ছুদ্দি। সাহেবটা যে পাজি ছিল তা আর কি বলবো! একবার এক কেরানি তার কাছে বাপ মরে বোলে ছুটি চাইতে সে বল্লে কিনা—"ইয়োর ফাদার হেজ্ নো বিজ্নেস টু ডাই হোয়েন্ বজেট প্রেসার ইজ গোয়িং অন্!" দেখো দেখি, বাপ্ মরে, তাকে কিনা এই কথা! সেকালের সাহেব দু-একটা ভালও ছিলো। টুনি—সে বড় মজার সাহেব ছিল। ধুতি পোরে সে কালী-পুজোর যাত্রা শুনতে যেত। তার পাখি শিকারে ভারি সখ। সেটার এক রোগ ছিল এই যে পাখিটাকে মেরেই আগে তার ল্যাজটা কেটে নেবে! সেইজন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল ল্যাজকাটা টুনটুনি। সে প্রথম আসে ১৮৩৫ সালে ফৌজের ডাক্তার হয়ে। তারপর মিউটিনির কিছু আগে একটা নীলকরের মেয়েকে বিয়ে কোরে কোন্ বড় মিলিটারি পোষ্টে বহাল হয়ে সাংহাই চলে যায়। সেইখেনে বসে লোকটা সাংহাই টু ইণ্ডিয়া একটা রেল খোলবার প্ল্যান হোম গভর্মেন্টকে পাঠায়। তখন চীনে মিস্ত্রী আসতো জাহাজে কোরে, আমরা দেখেছি।—ঐ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের দুধারে জুতোওয়ালা। সন্ধ্যাবেলা ছুরি-হাতে তারা ঘুরে বেড়াতো। যত সেলার আর চীনের আড্ডা ছিল ওই থানটায়! ব্যাটারা যে জুতো বানাতো বাপু, তেমন জুতো এখন পাওয়াই যায় না। ওই 'আচীন্'—ওর অনেক দিনের দোকান। আমার জ্যাঠার মামাশ্বশুর—তিনি ওই দোকান থেকে জুতো নিতেন। সেকালে তাঁর মতো সৌখিন ছিলনা। ওই যেখান-টায় এখন রিপণ কালেজ হয়েছে, ওইটে ছিল তাঁর বৈঠকখানা। তাঁর বাগানে একটা

সাদা চাঁপার গাছ ছিল, তাই থেকে ও-পাড়াটার নাম হয়েছিল চাঁপাতলা! শুনেছি সেই চাঁপাফুলে তাঁর দোলমঞ্চ সাজানো হতো! দেলোয়ার খাঁর নাম শুনেছো তো? —ওই তারি ওস্তাদ তাঁর কাছে চাকর ছিল। ওই মিস্‌নারিরা ছিরামপুরের তাঁর বাগানখানা কিনে প্রথম ছাপাখানা বসায়। তখন সব কাঠের টাইপ্‌। রামধন বলে এক ব্যাটা যে কারিকর ছিল তার মতো পরিষ্কার অক্ষর কাটতে কেউ পারতো না বাপু! তার বংশের একটা ছোঁড়া এখন আমাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান কোরে ডাক্তার হয়ে বসেছে। সবপ্রথম এদেশে বিলিতি ওষুধের ডাক্তারখানা খোলেন আমাদের নাকাসি-পাড়ার শ্যাম-ডাক্তার। সাহেবরা তাঁর ওষুধ ছাড়া খেত না। কবিরাজগুলো কিন্তু তাতে বড় চটে ছিল—চটবারই কথা!"

আমরাও কর্ত্তার গল্পের বহর দেখে যে না চটেছিলুম তা নয়। কথাটা আংটি থেকে কবিরাজি শাস্ত্র, সেখান থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস, মামাশ্বশুরের রূপবর্ণন, মিস্‌নারিদের জুয়োচুরি, ব্রাহ্মদের ভণ্ডামো, চৈতন্যদেবের কয় পার্ষদের সঠিক জীবন-বৃত্তান্তে এসে পৌঁছল। তারপর বুদ্ধের দাঁতের হিসেব থেকে ক্রমে যখন রাসমণির মন্দির যে-মিস্ত্রি বানিয়েছিল সে যে হিন্দু নয়—মুসলমান, এবং তার নাতির নাতি এখন পোর্ট-কমিশনারের এই জাহাজের খালাসী হয়েছে —এই রকম একটা জটিল সমস্যাতে এসে পড়লো তখন আমাদের জাহাজ প্রায় বড়বাজার পৌঁচেছে! আমি অবিনের গা-টিপে বল্লেম—"ওহে লুকিবিদ্যেটা কি লুকিয়েই থাকবে? আংটিটার তো কোনো সন্ধান পাচ্ছিনে!"

"তার পর আংটিটার কি হলো কর্ত্তা?" —বলেই অবিন চোখ বুজ্‌লে। গল্প চল্লো—

"লুকিবিদ্যে বড় সহজ বিদ্যে নয়। রাজা কেষ্টচন্দরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন রসসাগর, তিনি লুকিবিদ্যে জানতেন। লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতে এই রসসাগরের লুকি-বিদ্যের কথা লেখা আছে—"

লর্ড ক্লাইব থেকে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখান থেকে ব্লাক হোল ও সমস্ত বাংলার ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে গল্প ক্রমে রূমের বাদশার কত টাকা, রামমোহন সাহা কি দিয়ে ভাত খেতেন—এমনি সব ঘরাও খবর আবিষ্কার করতে করতে বড়বাজারের পণ্টুনের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চল্লো—আংটির দিক দিয়েও গেলনা! কর্ত্তার শেষ-বক্তব্য দেশের এক নমস্য ব্যক্তির নামে একটা কুৎসা। ভদ্রলোকটির খুব আত্মীয়রাও যে খবর ঘুণাক্ষরে জানেনা এমন একটা গোপনীয় সংবাদ চুপিচুপি জাহাজের সকলকে জানিয়ে এবং কাউকে বলতে মানা কোরে দিয়ে কর্ত্তা ডাঙায় পা দিলেন!

আমি অবিনকে বল্লেম—"ওহে, যথার্থই কর্ত্তা লুকিবিদ্যে জানেন। গল্পটা কিছুতেই ধরা গেলনা!"

অবিন খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে—"আমি ওই জন্যেইতো ওঁর নাম দিয়েছি আবিষ্কর্ত্তা! নিজের খবর এঁর কাছে লুকোনো থাকে, আর পরের গোপনীয় খবর আবিষ্কৃত হয় এঁর কাছে ওই আংটির প্রভাবে। পরের ছোটখাটো

ব্যবহারের জিনিষ—চুরুট, দেশলাই, পান মায় তাদের ডিবে, এঁর পকেটে আপনি-গিয়ে প্রবেশ করে; পরের লাঠি, ছাতা, বই ইত্যাদির মতো সামগ্রী আপনি-গিয়ে হাতে ওঠে! পরের বিত্তেয় ইনি পণ্ডিত; পরচর্চ্চায় ইনি অদ্বিতীয় পরকীয়া-সাধক; ইনি পরের যা-কিছু পার করবার কর্ত্তা,—আপনার কেউ নয় অথচ আমারও কেউ নয়।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নারীর অধিকার

(ক্রপটকিন হইতে)

মূলধনী মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেলে সমাজের শান্তি বাড়বে, কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যাবে এবং দেহ ও মনের উপর অহিতকর-জবরদস্তির দাসত্ব লোপ পাবে এমনতর আশ্বাস যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা এতদিন সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। এই হাসির মধ্যে অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস যতই থাক্ তাদের স্বার্থহানির ভয়টুকুই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁরা যতই অন্ধ হোন এ ক্ষেত্রে আজ-পর্য্যন্ত যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তা সাধারণের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে' যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তারা ভাল করে' জানে এ ব্যবস্থায় পরিশ্রমের কত লাঘব হয়।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারের মত কল-কারখানাও যে স্বাস্থ্যসুখের আবাসে পরিণত হতে পারে এবং তাতে সুফলও যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, এ কথা বোধ হয় নতুন করে' ও বায়ুচলাচল-যুক্ত কারখানায় কর্ম্মীরা স্ফূর্ত্তিতে কাজ করবার সুবিধা পায়; তাতে কাজের পরিমাণও বেড়ে যায়। সময় ও দৈহিক পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে যন্ত্রের উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্বন খুব কঠিন ব্যাপার নয়। বর্ত্তমানে কল-কারখানা যে অস্বাস্থ্যকর ও দূষিত, তার কারণ কারখানার ব্যবস্থার মধ্যে কর্ম্মীর কোন হাত নেই, তার সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ নেই। কাজেই কল-কারখানায় দেশের যতই সুবিধা হোক, তাতে মানব-শক্তির অপব্যয়ও যে হচ্ছে, এ-কথা কোন মতে অস্বীকার করা চলে না।

মানব-শক্তির অপব্যয় সম্বন্ধে সাধারণত অমনোযোগী হওয়া অধিকাংশ কারখানার বিশেষ লক্ষণ হলেও বর্ত্তমানে এমন কারখানার অভাব নেই যেখানকার সুচারু বন্দোবস্তের ফলে কর্ম্মীজন কাজের মধ্যে বেশ আনন্দ পায়। অবশ্য এ-কথা বিশেষ

বেশী কাউকে কাজ করতে হবেনা এবং প্রত্যেকের ইচ্ছা ও রুচি-অনুযায়ী কাজের বদল করবার যথেষ্ট অধিকার থাকবে। পুরানো বন্দোবস্ত-মত সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যে মানুষের মন স্ফূর্ত্তি পেতে পারেনা; কারণ সেটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

আমরা আশা করি, কেবলমাত্র কল-কারখানায় নয় খনিতেও এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হবে। বর্ত্তমানে খনির অবস্থা নরকের মত ভীষণ হলেও নতুন বন্দোবস্তে ভবিষ্যতে সেটা বায়ুচলাচলযুক্ত হবে এবং সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপ ও শৈত্য রক্ষার ব্যবস্থা হবে। এতদিন সেই অন্ধকারের মধ্যে মানুষ আর জানোয়ার জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি করে' মরেছে, নানা রকম উৎপাতে কত অমূল্য জীবন অকালে হেলায় নষ্ট হয়েছে, এবার তার অবসানের সূচনা। যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুধু শ্রম-লাঘব নয়, যাতে ভবিষ্যতে কোন বিপদ না ঘটতে পারে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখব। আমাদের আশা ও সাধনাকে স্বপ্ন ও ব্যর্থতা বলে উড়িয়ে দিলে কেবল-মাত্র অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হবে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ঐরূপ দু-একটি খনি আছে। উপস্থিত তার মধ্যে যা-কিছু ক্রটি আছে, পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এ-বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে সময় নষ্ট করায় কোন লাভ নেই—'সোসিয়ালিষ্ট' দলের চেষ্টায় এ-সব কথার সবিস্তার আলোচনা বহুবার হয়েছে এবং এর আদর্শ ও কার্য্যকারিতার

দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে কাজ করে' লোকে নিজেকে যেমন সুস্থ, নিরাপদ ও সুখী মনে করে, তেমনি কল-কারখানা ও খনি প্রভৃতিতেও যাতে সেরূপ হয়—সেই আদর্শে সেগুলিকে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের বন্দোবস্ত যত সুন্দর ও উপযোগী হবে কাজও সেই পরিমাণে প্রচুর ফলদায়ক হবে, এর অন্যথা হতে পারে না।

অভাবের তাড়নায় যে-কোন কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য না হলে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে পরের কাছে আত্মবিক্রয় দরকার না হলে, সমাজে সাধারণের জন্যে একযোগে কাজ করা কর্ম্মীর কাছে খেলা বা উৎসব বলে মনে হবে। কাজ ত দায় নয়, গ্রহ নয়, সে যে অসীম জীবন-শক্তির আনন্দময় বিকাশ! জৈব ক্রিয়ার মত সে যে জীবনের অঙ্গ। বর্ত্তমানের এই দেহ ও মনের-পক্ষে-অসুখকর-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকবে তারা, দাসত্ব যাদের অস্থিমজ্জায়, পরপ্রসাদ-লেহন যাদের জীবনের লক্ষ্য, আপনার উপরে যাদের কোন বিশ্বাস নেই, নিজের শক্তিতে যাদের শ্রদ্ধার অভাব! বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে সরিয়ে নিজেদের সুবিধামত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করবে তারা, যারা মানুষকে জানে, স্বাধীনতাকে পূজা করে। কেবলমাত্র নিজের বা আত্মজনের সুখ-স্বাধীনতা নয়, সমাজের জন্যই তারা পরিবর্ত্তনসাধনে প্রয়াসী হবে। প্রথম প্রথম মাত্র দু এক জায়গায় এ ব্যবস্থা

প্রতীক্ষা করছি যেদিন আজিকার ব্যতিক্রম সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে।

এতক্ষণ আমরা বাইরের কথা বলেছি, কিন্তু ঘরের কথার বিশদ আলোচনাই এ প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য। গৃহস্থালীর মধ্যে নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তন যে অবশ্য-বাঞ্ছনীয় —সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে তা অবশ্যম্ভাবী। মানব-জাতির ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি জানেন, এ পর্য্যন্ত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সংসারের সকল কাজ, সকল দায়িত্বের ভার অবনত শিরে বহন করেছে মানব-সাধারণের দাসী—নারী! কেমন করে' তাঁদের কাঁধে এ ভার চেপেছে, কত অসহ্য অত্যাচার, কত অপমানের মধ্যে তাঁদের এই বাধ্য-পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, তার ইতিহাস-আলোচনার এ সময় নয়। বর্ত্তমানে নারী সমাজের যে পর্য্যায়ে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে সেখান থেকে উন্নত স্থানে বসাবার জন্যে আমরা কি করতে পারি এবং তাঁদের বিরক্তিকর ও মিথ্যা কর্ম্মভার দূর করবার সুচারু উপায় কি, তারই আলোচনা করা যাক্।

বাইরের কোন শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন, কিন্তু সেটা ঘরের দাসত্বের মত এত কঠিন নয়,—এ পথে বাধা বিস্তর। নারীর এই দাসত্ব-বন্ধন যে অচ্ছেদ্য, তার প্রধান কারণ সেটা সনাতন। কেবল বাইরের শক্তি নয়, মনের স্বাধীনতা ভিন্ন এ-থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই। আজ যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণবিসর্জ্জনে উন্মুখ নারীর অধিকার-আলোচনার পথে তাঁরা কাঁটার মত অগুন্তি প্রতিবাদ সাজিয়ে রেখেছেন। কারণ এ ব্যবস্থা অ-ভূতপূর্ব্ব। আমরা মুখে যতই বলি নারী আমাদের সহকর্ম্মিনী, সহধর্ম্মিনী, কিন্তু কাজের বেলায় তাদের কাছে কেবলমাত্র দাসোচিত বাধ্যতাটুকুই আমরা আশা করি এবং তার কোনরূপ অন্যথা হলেই চঞ্চল ও বিরক্ত হয়ে উঠি। যতদিন আমাদের মন থেকে এই মিথ্যা অন্ধ সংস্কার দূরীভূত করবার চেষ্টা না হবে, ততদিন এ অন্যায় কোন-না-কোন রকমে থাকবেই। কিন্তু সব-চেয়ে বড় আশার কথা এই যে, এতদিনে নারী আপনার অধিকার বুঝে নেবার জন্যে অগ্রসর এবং এতদিনের সংস্কারকে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁদের সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে পরে তার আলোচনা হবে।

আমাদের ব্যবস্থাকে সার্থক করে' তুলতে হলে, নর-নারীর সমান অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে গৃহস্থালীকে বিসর্জ্জন দিতে হবে,—এমন একটা কথা আমরা শুনেছি। অনেকে বলছেন, হোটেল খুলে বা ঐ-রকম কোন বন্দোবস্ত করে' নারীর দাসত্বের উচ্ছেদ-সাধনই প্রকৃষ্ট উপায়! হোটেল যদি কর্ম্মীজীবনের মিলন-কেন্দ্র হয়ে ওঠে, তবে আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই; কিন্তু এ ব্যবস্থাটা যদি তাদের উপর চাপানো যায়, তবে সেটা কোনমতেই সুখের হবে না। এবং তারা যে এ বন্দোবস্ত স্বীকার করে' নেবে, এ-কথা আমরা মনে করি না। নিজেকে সকলের

কাছ থেকে একেবারে তফাৎ রাখাও নয়, কিম্বা আর-সবায়ের সঙ্গে হট্টগোল করাও নয়, কিন্তু ঐ দুটোর উপযুক্ত মিশ্রণই সাধারণের অভিপ্রেত। সাধারণ কারাগারের কষ্ট মানুষের কাছে যে অসহ্য হয়ে ওঠে, তার কারণ সেখানে নির্জ্জনতা নেই; আর নির্জ্জন কারাবাস যে অত্যাচার বলে মনে হয়, তার কারণ সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলা-মেশার কোন উপায় নেই। মানুষের জীবনে দুটোরই দাম আছে, কোন-একটাকে স্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব।

কেবলমাত্র হিসাব খতিয়ে যারা সংসারে বাঁচতে চায় তারাই হোটেলখানার কথা তুলবে। ভবিষ্যতের গৃহস্থালীর আদর্শ যাঁদের কাছে সুপরিস্ফুট, নর-নারীর স্বেচ্ছা-সমবায় ও পরস্পরের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি যাঁদের অভিপ্রেত, তাঁরাই জানেন মানুষের পক্ষে গার্হস্থ্য-জীবন কত সুন্দর, কত মহৎ। বিপদকে এড়িয়ে নয়, তার সামনে এগিয়ে যাওয়াই সুপরামর্শ। আজিকার সংসারে নারীর পক্ষে যা বন্ধন, নারীর চেষ্টায় ও পুরুষের সহানুভূতিতে ভবিষ্যতে তাই তার মুক্তির সহায়ক হবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

আবার আর একদল আছেন, যাঁরা সামঞ্জস্য করতে চান। তাঁরা হোটেল প্রভৃতির পক্ষপাতী নন। পুরুষেরা কলে-কারখানায় হাটে মাঠে কাজ করবেন আর নারী সংসারের সকল দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নেবেন—তাঁরা এই কথাটাই প্রচার করছেন। তাঁদের কথাটা যে নিতান্ত পুরানো, একথা আমাদের অজ্ঞাত নেই। এককথায়, পূর্ব্বের মতই নারী সংসারে দাসীবৃত্তি করুন আর আমরা ক্রমেই এগিয়ে চলি। আমরা যে-সব কাজ যন্ত্র বলে মনে করি, সেই কাজ নারী হাতে করে' দিনের পর দিন করে' যান, এ-কথা বলতে পারেন তাঁরা, নিজেদের স্বার্থটুকুই জগতে যাঁরা সব-চেয়ে বড় জিনিষ বলে জেনেছেন।

কিন্তু মানুষের এই মুক্তি-ক্ষেত্রে নারী আজ তাঁর দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভার-বাহী পশু-জীবনের প্রতি তাঁর সুগভীর ধিক্কার জন্মেছে। সন্তান-পালন-ব্রতে তাঁদের জীবনের যে কয় বছর ব্যয়িত হয় তার সকল ক্লেশ ও চেষ্টাই তাঁর জীবনের সব-চেয়ে বড় কাজ, এই কথাটা তাঁরা প্রচার করছেন। কেবলমাত্র আশ্রয় ও দেহ-ধারণের বিনিময়ে পুরুষের কাছে দাসত্ব-স্বীকারে তাঁরা নারাজ—সংসারের ভিতরের সকল রকমের বাধ্যতা থেকে মুক্তি-লাভের জন্যে নারী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কেবল কাগজে-কলমে আন্দোলন করে' তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় নারী আজ স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হবার সাধনায় ব্রতী। আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ ও বিস্তৃত আন্দোলনের ফলে সেখানে দাসী পাওয়া ভার। নারী আজ অন্ধকার রান্নাঘর ছেড়ে দেশের কাজে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু গৃহস্থালীর কাজ করবার মত দাসী দুষ্প্রাপ্য

উঠেছে—সবাই বলছে, ঘরের কাজ করবে কে? এর উত্তর এই:

যার অভাব, সে যদি নিজে সেটা মেটাবার উপায় না করে, তবে অপরে সেটা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে না। স্বাধীনতা-কামী নারী এ কথাটা বিশেষ-ভাবে বুঝেছেন এবং তার ফলে সমস্যার সমাধান খুব সহজ হয়ে গেছে। আজ মার্কিন গৃহস্থালীর বারো-আনা কাজ যন্ত্র-পাতির সাহায্যে অল্পসময়ে প্রায় বিনা-পরিশ্রমে সম্পন্ন হচ্ছে। কয়েকটী উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার করতে চাই।

একটা জুতার উপর ২০।৩০ বার একটা ব্রুস নিয়ে ঘষা খুবই হাস্যকর ব্যাপার, কিন্তু প্রত্যহ সকালে যে সকল নারীকে এই কাজ করতে হয় তাঁরা এটাকে অপমান-জনক বলেই মনে করেন। এখন এ অপমান ঘুচেছে। উদ্যোগী জনের চেষ্টায় একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে। বড় বড় হোটেলে, স্কুলে আজকাল এই যন্ত্রের বহুল প্রচার। তার পর বাসন মাজা! মেয়েদের কাছে এ-কাজটা কত বিরক্তিকর, কত ঘৃণ্য তা তাঁরাই জানেন। বাসনমাজা কলটি একটী স্ত্রীলোকের উদ্ভাবিত। সকলের পক্ষে এটী অনায়াস-লভ্য, কাজেই দাসীর সাহায্য-ব্যতিরেকে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অনেক বাসন একেবারে মাজা চলে।

এ সমস্ত কল তৈরী করা খুব কঠিন ত নয়ই, ব্যয়সাধ্যও নয়। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে মহাজনের লাভের জন্যই এ সব জিনিষ বেশী সস্তা হয়নি, ভবিষ্যতে এগুলি মানব-সাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠবে। কেবল যে যন্ত্র-পাঁতির সহায়তায় ঘরের কাজের দায় ঘুচবে তা নয়—এতদিন প্রতি পরিবার আলাদা করে' নিজেদের জন্যে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করত, এবার পরস্পরের স্বেচ্ছা-মিলনের ফলে তা কম খরচেও সম্পন্ন হবে। নানা রকমের সমিতি স্থাপিত হবে এবং তাদের হাতে এক একটী বিশেষ কাজের ভার থাকবে। ছোট খাট কল তৈরী করে' আমরা নিশ্চিন্ত থাকবনা। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে নানারূপ উন্নতি সাধিত হবে এবং তার ফলে জীবন-যাত্রা আরও সুন্দর, সুখময় ও ফলপ্রদ হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে খুঁটীনাটীর বিশদ আলোচনার সময় নেই নতুবা বলা বাহুল্য গৃহস্থালার যাবতীয় কর্ম্মই এই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপেই করা সম্ভব।

এই সমস্ত বিরক্তিকর ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ নারী অবনত মুখে করে' এসেছেন, তার কারণ এসব ভাববার জন্য পুরুষের কোন দায়িত্ব ছিল না। নিজেদের কাজ ও উন্নতির স্বপ্নে তারা এতই বিভোর যে নারার কথাটা তারা চিন্তা করবার সময় পায়নি অথবা নারীজনোচিত কাজকে তারা পুরুষোচিত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে! কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নারী নীরবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে' তার দেহের কাপড়, আর পেটের অন্ন জুগিয়েছে অথচ এই দাসীত্বের পরিবর্ত্তে সে লাভ করেছে অজস্র লাঞ্ছনা, অসহ্য অত্যাচার! তাঁর এই আত্মত্যাগকে সে শ্রদ্ধা করতে পারেনি। তার ফল অবশ্য মানবসাধারণের

পক্ষেই সুখের হয়নি সে কথা বলা বাহুল্য। নারীকে পিছনে রেখেছি বলে তাঁরা যে এতদিন আমাদের পিছনেই টেনেছেন আমরা অন্ধতা-বশত তা বুঝতেও পারিনি। আমাদের সে অন্ধতা ঘুচেছে এইটাই বর্ত্তমানের সবচেয়ে বড় আশার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয় ও আদালতের সদর ফটক ও রাজনৈতিক অধিকারের খিড়কী দরজা মুক্ত করে' দেওয়াই যে নারীকে মুক্তি দেওয়া, এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। সংসারের নানারকম অসম্ভব অকাজের দায় থেকে মুক্তিই তার প্রকৃষ্ট পন্থা। সংসারের দাসীত্ব থেকে তাঁর যতদিন না মুক্তি হবে ততদিন উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত কারণ উচ্চশিক্ষিতা ও অধিকার-প্রাপ্তা নারী অশিক্ষিতা নারীর পরে গৃহস্থালীর কাজ চাপাতে কুণ্ঠিত হবেন না। পুরুষ যেমন করে' এতদিন পুরুষের উপর প্রভুত্ব করেছে নারীও তেমনি করে আপনার প্রভুত্ব জাহির করবে। ভবিষ্যতের গৃহস্থালীর দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক পরিবর্ত্তন-সাধনে যাঁরা প্রয়াসী, তাঁরা একথাটা যেন কোন রকমে ভুলে না যান। ভবিষ্যতে নারীকে এমন সুযোগ দিতে হবে যাতে সন্তান-পালন করেও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে যোগ দেবার তাঁর যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্ত-মানের শত ত্রুটি, শত বাধার মধ্যেও এর সূচনার আভাস আমরা পেয়েছি। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমরা যতই নিজেদের ভোলাবার চেষ্টা করিনা কেন, নারীর দাসীত্ব না ঘুচলে আমাদের এ বিদ্রোহ মিথ্যা! আমাদের আশা নিষ্ফল! নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের উন্নতির আশা বাঁধা নৌকার চলার মতই অসার কল্পনা মাত্র; এবং এ-কথাও সত্য যে, দাসত্বের নাগপাশবদ্ধ নারীসমাজ বন্ধন-মুক্ত পুরুষ-সমাজের বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহে অগ্রসর হবেন। ভবিষ্যতের শান্তি যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আশা করি আমরা এখন থেকে সাবধান হতে দ্বিধা করব না।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

তরুণা

ক

তাদের পরস্পরের প্রথম-পরিচয় হয়—ঘরেও নয় পথেও নয়, একেবারে গহন বনে! জায়গাটি খুব চমৎকার না-হইলেও, তাহাদের আলাপটি প্রথমদিনেই জমিয়া উঠিয়াছিল খুবই চমৎকার!

—অতএব, দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ দিনের কথা রাখিয়া, সেই প্রথমদিনের কথাটাই সবপ্রথমে বলিয়া লইতে চাই।...

গোমো-জংসনে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়া, প্রকৃতির রূপ দেখিয়া বসন্ত একেবারে

মোহিত হইয়া গেল। তুমি-আমি প্রকৃতিকে যে চোখে দেখি, বসন্ত ঠিক সে চোখে দেখিল না; কারণ, সে ছিল চিত্রকর—প্রকৃতিকে দেখিল সে শিল্পীর চোখে।

তার পরদিনেই সে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে একটি মনের মত জায়গা বাছিয়া, 'চিত্রাধার'টিকে দাঁড় করাইল। তারপর পটের উপরে প্রকৃতিকে আকৃতি দিবার চেষ্টায় একমনে লাগিয়া গেল।

এম্‌নি-করিয়া প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তার ছবি-আঁকা কাজ চলিতে লাগিল।

খ

বসন্তের ছবি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর দু'-একদিনেই তুলির কয়েকটি শেষ-স্পর্শে চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

পশ্চিমের নীলসায়রে রবি-করের রঙিন ঢেউ তখন ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে; দূরে আকাশভেদী 'পরেশনাথে'র শিথর শিখরে খানকয় ছোটছোট মেঘ পতাকার মত থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, বসন্ত অনিমেষে সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভাবিতে ছিল, চিত্রকরের হাতে যদি এমন যাদু থাকিত, যাতে-করিয়া ছবির মেঘও ঠিক অমনি ভাবেই কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, তাহাহইলে—

তাহাহইলে কি হইত সেটা ঠিকমত বুঝিতে-না-বুঝিতে পিছন হইতে হঠাৎ কামিনী-কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল,—"ও দাদা! ঘাখ, ঘাখ, কি চমৎকার ছবি!"

সচমকে পিছন ফিরিয়া বসন্ত বিস্মিত নেত্রে দেখিল, একটি তরুণী তাহার ছবির উপরে হেঁট্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! তাহার পিছনেই একটি যুবক,—সাহেবী পোষাকে।

যুবকটি আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"তরু, দিন-কে-দিন তুমি বড় অভদ্র হয়ে উঠচ!"

এই ভৎর্সনার স্বরে অপ্রস্তুত হইয়া তরুণী বসন্তের দিকে সসঙ্কোচে চাহিল, লজ্জায় তার গালদুটি রাঙা হইয়া উঠিল।

বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আপনি কে তা জানিনা, কিন্তু আপনার ছবি-আঁকায় ব্যাঘাত দিলুম বলে ক্ষমা-প্রার্থনা করছি।"

বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! দশ-জনকে দ্যাখাবার জন্যেই ছবি-আঁকা! আপনারা যে আমার ছবির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেছেন, এজন্যে আমিই ধন্য!"

বিনয়ে এই অচেনা চিত্রকরটিকে হারানো শক্ত দেখিয়া যুবক আর-কিছু না-বলিয়া ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চিত্রাধারের দিকে অগ্রসর হইল। ছবির এককোণে বসন্ত নিজের নাম-সই করিয়াছিল,—ছবি দেখিতে-দেখিতে যুবকের চোখ হঠাৎ সেই নামের উপরে পড়িল এবং তখনি মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ, মাসিক কাগজে প্রায়ই যাঁর ছবি দেখি, আপনি কি সেই বসন্তবাবু?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

—"আপনিই বসন্তবাবু!"—বলিয়া মহিলা-টিও দু পা আগাইয়া আসিলেন।

যুবক বিরক্ত স্বরে বলিল, "তরুণা, ফের!"

তরুণা থতমত খাইয়া তাড়াতাড়ি আবার পিছাইয়া গেল।

তারপর বসন্তের দিকে ফিরিয়া যুবক বলিল, "মশাই, আমার এই বোনটি কিছু অন্যায়-রকমের চঞ্চল! তার ওপর ও নিজেও কিছু-কিছু আঁকতে জানে বলে, আজ ওর ছেলেমানুষী যেন বেড়ে উঠেছে!"

তরুণার লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া বসন্ত বলিল, "উনিও ছবি আঁকেন বুঝি? শুনে সুখী হলুম!"

যুবক বলিল, "বসন্তবাবু, আপনাকে এর আগে আর-কখনো দেখি-নি বটে, কিন্তু তবু আমরা আপনাকে ভালরকমেই জানি—আর, বলতে-কি, আমরা আপনার ভক্ত!"

বসন্ত বলিল, "লেখক বা চিত্রকরদের ঐ এক মস্ত সুবিধে আছে, তাঁরা বিদেশ-বিভূঁয়েও পথে-ঘাটে-মাঠে—"

—"এমন-কি পাহাড়ে-পর্ব্বতে, গভীর জঙ্গলেও বন্ধু কুড়িয়ে পান, এই বলতে চান ত? হ্যাঁ বসন্তবাবু, আপনি আমাদের যথার্থই বন্ধু বটে!"

বসন্ত কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল, "আমি যে আপনাদের এতটা আনন্দ দিতে পেরেছি, এ আমার ভাগ্যের কথা! কিন্তু আমাদের পরিচয়টা যেন অত্যন্ত একতরফা হোল বলে আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে!"

যুবক হাসিয়া বলিল, "অবশ্য, অবশ্য! আমি হচ্ছি রজতভূষণ সেন আর ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী তরুণা রায়—আমার ভগ্নী। এর-চেয়ে বেশী করে পরিচয় দিতে পারি,

গ

কয়ঘর রেলওয়ে কর্ম্মচারী ছাড়া গোমো-জংসনে লোকজন বড় বেশী নাই; বাঙ্গালী 'বায়ু-ভুক্'রা এখনো এই স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব জায়গাটিকে ভাল-করিয়া চিনিতে পারেন নাই, তাই পূজা বা বড়দিনের ছুটির সময়েও কলিকাতার অসংখ্য বুটের মস্-মসানিতে এবং অট্টহাসির হট্টগোলে গোমোর নীরব পার্ব্বত্য প্রকৃতি সরব হইয়া উঠে না!

কাজেকাজেই এমন নির্জ্জন বিদেশে পরস্পরের দেখা পাইয়া বসন্ত ও রজতভূষণ, দুজনেই বর্ত্তিয়া গেল; এবং তাদের আলাপটাও যথার্থ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না।

সেদিন বৈকালের চায়ের বৈঠকে বসন্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা রজতবাবু, আপনার ভগ্নীর স্বামী কি করেন?"

চায়ের পেয়ালায় চিনি দিতে দিতে তরুণা হঠাৎ থামিয়া পড়িল—তার মুখের মৃদু হাসির রেখাটিও সেইসঙ্গে মিলাইয়া গেল।

রজত চায়ের পেয়ালাটা মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার ভগ্নীপতির কথা বলছেন?"

—তরুণা আর সেখানে দাঁড়াইল না, আস্তেআস্তে হেঁটমুখে চলিয়া গেল।

রজত আবার বলিল, "আমার ভগ্নীপতিটি একেবারেই মানুষ নয়, ব্যারিষ্টারী শিখতে বিলেতে গিয়ে সে আর ফেরবার নাম করে না।"—একটু থামিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া

বসন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন ?"

রজত বলিল, "শুনছি সে নাকি মেম বিয়ে করেছে !"

—"বলেন কি !"

—"হ্যাঁ। আমার বোনের অদৃষ্ট ! বাইরে বালিকা হলেও তরুণার মনটা বোধহয় আর তরুণ নেই।"

বসন্ত একটা সিগারেট ধরাইয়া সামনের মাঠের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল—

—রজতও আর কিছু বলিল না।...

খানিক পরে পাণের ডিবা হাতে করিয়া তরুণা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "বসন্তবাবু, পাণ খান।"

বসন্ত ব্যথিত দৃষ্টিতে একবার তরুণার দিকে চাহিয়া, ডিবা হইতে একটি পাণ তুলিয়া লইল।

বসন্তের সামনে একখানা বেতের মোড়ায় বসিয়া পড়িয়া তরুণা বলিল, "কাল্‌কে আপনি যে বললেন, আমাকে মডেল করে আপনি একখানি ছবি আঁকবেন, তার কি হোল বসন্তবাবু ?"

তরুণার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে-ভাবিতে বসন্ত বলিল, "না না—সে থাক্, তাতে আপনার কষ্ট হবে !"

তরুণা মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহুঁ, কিচ্ছু কষ্ট হবে না !"

রজত বলিল, "বসন্তবাবু, আপনার ছবির মডেল হোতে তরুর যখন এতই সাধ, তখন আপনি ইতস্তত করছেন কেন ?"

বসন্ত তখন রাজি হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে কাল সকাল থেকেই কাজে লাগব !"

তরুণা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওহো, কি মজা ! বসন্তবাবুর ছবির সঙ্গে আমিও অমর হব !"

যুবতী তরুণার সেই বালিকার মত সরল হাসি-হাসি মুখখানির দিকে বসন্ত মুগ্ধ চোখে চাহিয়া রহিল।... ... ...

আজ একমাস ধরিয়া রোজই সে সকালে-দুপুরে বিকালে-সাঁঝে এই তরুণাকে দেখিতেছে, কিন্তু তার আসল স্বভাবটি কিছুতেই ধরিতে পারিল না ! প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির মত তরুণাকে যেন কতক বোঝা যায়, কতক যায় না। সে যখন তার আঁকা ছবিগুলি একটু-আধটু সুধরাইয়া দেয়, তরুণা হয়ত তখন অত্যন্ত অসঙ্কোচে তাহার কাঁধের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অবাক হইয়া তার নিপুণ হাতের টানগুলি দেখিতে থাকে ! তখন বসন্তই হয়ত ব্যস্ত হইয়া একটু সরিয়া বসিত, কিন্তু তরুণা তাতে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিত না—তার মত যুবতীর পক্ষে যে এটা অশোভন, এ বুদ্ধি তার মাথায় ঢুকিত না ! অথচ তাহার সমস্ত হাবভাবের ভিতরেই এমন একটি সহজ সরলতা থাকিত, যাতে-করিয়া তাকে কেউ বেহায়া বলিয়াও ভাবিতে পারিত না। ... ... কচিবয়সে বাপ-মা হারাইয়া একমাত্র ভাইয়ের হাতে সে মানুষ হইয়াছিল। রজত কিছু পাগ্‌লাটে ধরণের লোক; দুটি জিনিষকে সে সমান অন্যায়, অসহ ও যুক্তিহীন ভাবিত—বিবাহ এবং বাঙ্গলা মাসিকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা !

এ তুটি জিনিষকে আজ-পর্য্যন্ত সে সন্তর্পনে তফাতে রাখিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না-থাকার দরুণ তরুণা পুরুষের মতই স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মেম-শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে বই-মুখস্থ করিয়াছিল তোতাপাখীর মত, কিন্তু বাঙ্গালী-মেয়ের যেমন শিক্ষার দরকার তার কিছুই পায় নাই।... ...

বিবাহিত জীবন ভোগ করাও তরুণার কপালে ঘটে নাই। বিবাহের পরেই তার স্বামী রজতের টাকাতেই বিলাতে চলিয়া যান। স্বামীর হাতে লেখা একখানি মাত্র চিঠি তার হাতে আসিয়াছিল—তারপর হইতেই তিনি নীরব। এখন সে এই নীরবতার কারণ শুনিয়াছে—তার স্বামী এখন আর তার নয়, বিলাতে তিনি নূতন সংসার পাতিয়াছেন—হয়ত এতদিনে কতকগুলি 'অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানে'র 'ফাদার' হইয়াছেন! কিন্তু এ আঘাত তরুণার কোমল প্রাণে যে কতটা বাজিয়াছিল, তার হাসিখুসি ও নিশ্চিন্ত চঞ্চলতা দেখিয়া বাহির হইতে কেহই সেটা আন্দাজ করিতে পারিত না। নির্ঝরের তরল ধারার তলাতেই যে জমাট্ পাথর্ থাকে, সংসারের চোখে সে সত্য সহজে ধরা পড়ে না।

ঘ

যেখানে নিভৃত পাহাড়ের শীতল ছায়ায়, একখানি কালো পাথরের গায়ে নিকষে সোনার দাগের মত গুটিকয় শিশিরে-ভেজা হল্‌দে ফুল ফুটিয়াছিল এবং ঠিক তারই তলায়, বাধা পাইয়া নদীর জলতরঙ্গে কলরাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, বসন্ত সেইখানটিতে লইয়া গিয়া তরুণাকে বসাইয়া দিল।

বসন্তের ছবির বিষয়, 'কায়া ও ছায়া।' নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া, এক রূপসী চপলজলে আপনার চঞ্চল রূপের লীলাচ্ছায়া দেখিয়া সরল পুলকে হাসিয়া উঠিতেছে—এই ছিল তার পরিকল্পনা।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, এমন করে বসে থাকতে কষ্ট হবে না ত?"

—"না, না, না! কতবার বলব বসন্তবাবু!"

তরুণার রাগ দেখিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল, "বেশ, বেশ, তাহোলেই হোল!"—তারপর, সে ক্ষিপ্রহস্তে ভবিষ্য ছবির একটা মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া লইতে লাগিল।

রজতও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া বলিল, "এদের সময় ত দেখছি তোফা কেটে যাবে—কিন্তু আমি কি করি! আচ্ছা, এদিকে-ওদিকে পা-তুটোকে একটু চালিয়ে নিয়ে আসা যাক্!"—নানা জীবজন্তুর পদচিহ্ন-লেখা নদীর চরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, রজত আঁকা-বাঁকা তীর ধরিয়া আপনমনে আগাইয়া গেল,—তরুণা বসিয়া-বসিয়া দেখিতে লাগিল, জলের ধারে একটা মহা গম্ভীর বক এক ঠ্যাং তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—সেও যেন তার মত নিজের ছবি তুলাইতে চায়!

ঙ

এম্‌নি ভাবে কয়েকদিন কাটিল। বসন্ত রোজ সকালে ও বিকালে একমনে ছবি

আঁকে, তরুণা একমনে বসিয়া থাকে, আর তাহাদের ধৈর্য্যের অসীম বহর দেখিয়া রজত মনে-মনে বেজায় গরম হইয়া ওঠে! "এই দুই আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়ে মাঝখান থেকে আমি-বেচারী স্রেফ্ মারা পড়ব দেখছি—উঃ, আর ত পারা যায় না!"

—এই বলিয়া রজত সেদিন বিরক্তিভরে দাঁড়াইয়া হাত ছড়াইয়া আগে একটা মস্ত হাই তুলিল, তারপর আমলকী-বনের ভিতর দিয়া, সামনের পাহাড়ে উঠিতে লাগিল।... ...

ছবি আঁকিতে-আঁকিতে বসন্ত বিভোর চোখে দেখিল, পাথরের উপরে আঁচল ছড়াইয়া তরুণা একগোছা বনফুল তুলিয়া, ঘাসের ডোরে আনমনে তোড়া বাঁধিতেছে; তার প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি পড়ন্ত রোদে লাল-টুক্‌টুকে হইয়া উঠিয়াছে, চোখদুটি শ্রান্তিতে এলাইয়া পড়িয়াছে।

সেদিনকার মত সে ছবি-আঁকা শেষ করিবে ভাবিতেছে—এমনসময় তরুণা হঠাৎ সভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল, "মাগো—"

—"কি—কি হোল?"

—"সাপ—সা—" তরুণার আড়ষ্ট মুখ দিয়া আর বাক্য সরিল না।

—"সাপ!" বসন্তের হাত হইতে প্যালেট্ ও তুলি খসিয়া পড়িয়া গেল। একলাফে সে তরুণার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—তরুণাও আতঙ্কে অজ্ঞানের মত একেবারে দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইল!

চকিতে পাথরের উপর একটা সাপ কালো বিদ্যুতের মত তীব্রবেগে বাহির হইয়াই মিলাইয়া গেল!... ... বসন্ত অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—সর্পভয়ে নয়, তরুণার সেই অভাবিত স্পর্শে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

অনেকক্ষণ পরে তরুণা চোখ চাহিয়া মুখ তুলিল—তখনো তার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে, দৃষ্টি স্তম্ভিত, দেহ থর্‌থর্ কাঁপিতেছে! থামিয়া-থামিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "সাপটা চলে গেছে?"

বসন্ত বিহ্বলের মত বলিল, "হুঁ!"

তখন তরুণার হুঁশ্ হইল,—নিজের অবস্থা বুঝিয়া সচমকে সে বসন্তকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল—তার ভয়ভরা পাংশু মুখখানি গভীর লজ্জায় আবার আরক্ত হইয়া উঠিল! তরুণার খোঁপা খুলিয়া তার ধব্‌ধবে গৌর গ্রীবার উপরে এলাইয়া পড়িয়াছিল,—বসন্তের দিকে পিছন ফিরিয়া সে ফের নিজের চুল বাঁধিতে লাগিল।

বসন্ত তখনো নির্ব্বাক—নিজের বুকের অধীর স্পন্দন সে বুঝি শুনিতে পাইতেছিল! ... ... তরুণার অপূর্ব্ব স্পর্শটুকু তখনো তার দেহের ভিতরে শিরায়-শিরায় যেন তরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল!

ভাল-করিয়া শালখানা মুড়ি দিয়া তরুণা প্রায় আপনা-আপনি বলিল, "দাদা বুঝি এখনো পাহাড় থেকে নামেন-নি?"

বসন্ত কোন সাড়া দিল না।

অস্তাচলের ভাঙা মেঘে তখন যেন রক্তগঙ্গা বহিতেছে—তাহারই ভিতরে সূর্য্য কখন্ তলাইয়া গিয়াছে,—কেউ তা লক্ষ্য করে নাই। চারিদিক নীরব নির্জ্জন—সুধু অশ্রান্ত নদীর শান্ত কল্লোলের সঙ্গে মাঝে-

মাঝে দূর হইতে দু-একটা পাখীর স্বর ও গৃহগামী গাভীর ডাক হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে।

বনভূমির একান্ত স্তব্ধতায় তরুণার প্রাণটা কেমন দুপ্‌দুপ্‌ করিয়া উঠিল। শোনা যায়-কি-না-যায় এমনি স্বরে সে ভয়ে ভয়ে বলিল, "বসন্তবাবু, চলুন বাড়ী যাই!"

যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—ঠিক তেমনিভাবে চাহিয়া বসন্ত আস্তেআস্তে ডাকিল, "তরুণা, —তরুণা!"

নাম ধরিয়া বসন্ত এই তাকে প্রথম ডাকিল! তরুণা চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বসন্ত অপলক চোখে তার মুখপানে তাকাইয়া আছে—সে দৃষ্টির সামনে শিহরিয়া উঠিয়া সে আবার মাথা নীচু করিল। ... ... সেও যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত দেখিল, বসন্ত ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল, তারপর তার কম্পমান হাতদুখানি নিজের দু-হাতে চাপিয়া ধরিল, এবং তার মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুপিচুপি আবেগভরে বলিল, "তরুণা, তরুণা, আমি তোমাকে ভালবাসি!" ... ... বসন্তের হাতের ভিতরে আপনার অসাড় হাত রাখিয়া, এবং তার ঘনঘন তপ্তশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া, তরুণা একেবারে এলাইয়া নদীর তীরে বসিয়া পড়িল—এবং অস্ফুট প্রতিধ্বনির মত তার কাণের কাছে রহিয়া-রহিয়া সেই একই কথা জাগিতে লাগিল—"আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি!" ... ...

হঠাৎ একঝাঁক বক ডানার ঝট্‌পট্‌ শব্দ তুলিয়া তাহাদের মাথার উপর দিয়া সারে সারে উড়িয়া গেল!—

—সেই শব্দে স্বপ্ন হইতে তারা সচমকে জাগিয়া উঠিল, অত্যন্ত মলিন মুখে তরুণার হাত ছাড়িয়া বসন্ত তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণা মাটির উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—হৃদয়ের উত্তেজনা আর সে সহ্য করিতে পারিল না!... ... ... সে কান্না বসন্তের মাথা একেবারে হেঁট করিয়া দিল, সে যেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশাইয়া গেল! এত অল্পক্ষণে এমন অঘটন ঘটিতে পারে সে তা জানিত না! সে কি হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছিল?

একটু দূরে একটা শব্দ হইল। বসন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, পাহাড়ের উপর হইতে জঙ্গল সরাইয়া রজত নামিয়া আসিতেছে! ভয়ে অপমানে লজ্জায় কাঠ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল,—সে যে গুরুতর পাপ করিয়াছে এখনি সব প্রকাশ হইয়া যাইবে, তখন সে কি আর কোথাও মুখ দেখাইতে পারিবে?

আসিতে-আসিতে দূর হইতেই রজত বলিয়া উঠিল, "কি বসন্তবাবু, ছবি আঁকা হোল ত?"

রজতের গলা পাইয়া পলক না-পড়িতে তরুণাও উঠিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের আকস্মিক আচরণে তরুণা যে আঘাতটা পাইয়াছিল, ততক্ষণে তা সামলাইয়া লইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে দাদার দিকে ছুটিয়া গেল।

তরুণার দিকে চাহিয়া রজত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "হ্যাঁরে তরু—একি! তোর চোখে জল কেন?"

বসন্তের সামনে পৃথিবীর সমস্ত আলো হঠাৎ যেন দপ্‌-করিয়া নিবিয়া গেল!

দাদা তার চোখের জল দেখিতে পাইয়াছেন! তরুণা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল;—কিন্তু তার সে ভাব ক্ষণিকের জন্য,—পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া দাদার হাত ধরিয়া বলিল,—"দাদা, দাদা, একটা মস্ত সাপ বেরিয়েছিল—আরেকটু হোলেই আমাকে কামড়ে দিত আর-কি, ভাগ্যে বসন্তবাবু ছিলেন, তাই—"

রজত তড়াক্ করিয়া তিনহাত-উঁচু এক লাফ মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে! সাপ? অ্যাঁ! সাপে কামড়ালে মানুষ যে আর বাঁচে না, জানিস না বুঝি? সাপ—বলিস্ কি রে—কৈ, কোথায়?"

তরুণা হাসিতে-হাসিতে, সকৌতুকে বলিল, "সাপ কি আর তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চুপ মেরে বসে আছে দাদা, সে অনেকক্ষণ নিজের ধান্দায় চলে গেছে!"

তরুণার হাসিতে মহা চটিয়া রজত বলিল, "সবসময়ে তোর হাসি ভাল লাগে না, থাম্ বলচি তরু! সাপ বেরিয়েচে বলে হাসি! দিন-কে-দিন তুই যেন বেশী ছেলেমানুষ হয়ে উঠ্‌ছিস!"

দাদার রাগ দেখিয়া তরুণার হাসি আরো বাড়িয়া উঠিল।

চ

পরদিন সকালে রজতের বাড়ীতে চায়ের বৈঠকে বসন্তের দেখা পাওয়া গেল না। ... ...

বিকালে বসন্ত বসিয়া-বসিয়া চিন্তিতমুখে জিনিষপত্তর গুছাইতেছিল ও মোটমাট বাঁধিতেছিল, এমনসময়ে রজত ও তরুণা আসিয়া হাজির!

রজত বলিল, "হ্যাঁ বসন্তবাবু, হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছেন কেন বলুন দেখি? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েচে বুঝি? একি, এত মোট্-মাট বাঁধা হচ্ছে যে!"

বসন্ত বাধ'-বাধ' স্বরে বলিল, "কাল সকালের গাড়ীতে কলকাতায় যাব ভাবচি!"

—"অ্যাঁ, কলকাতায়! আমাদের খবর না-দিয়েই?"

তরুণা অনুযোগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বসন্তবাবু, আপনি বেশ মানুষ ত! না—না, সে হচ্ছে না! আমাদের একলা ফেলে চোরের মত চুপিচুপি পলায়ন! এ অন্যায় বসন্তবাবু, এ অন্যায়!"

বসন্ত শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আমাকে মাফ করুন—এ জায়গাটা আমার আর ভাল লাগচে না।"

তরুণা প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, আপনার যাওয়া অসম্ভব! এখনো আমার ছবি শেষ হয়-নি, এখনো ছবিতে আমার নাকটা খ্যাঁদা হয়েই রয়েছে! নিন—উঠুন, রং-টং নিয়ে চটপট্ বেরিয়ে পড়ুন!"

বসন্ত অত্যন্ত দমিয়া গিয়া বলিল, "না না, ছবি আঁকতে যেতে আমি আর পারব না!"

রজত যেন ঠিক কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছে, এম্‌নি ভাবে হাসিয়া বলিল, "ও, আপনি বুঝি সাপের ভয়ে নদীর ধারে যেতে চাইছেন না? বসন্তবাবু, কুছ্ পরোয়া নেই, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি—এই দেখুন, সাপ দেখেচি কি মেরেচি!"—এই বলিয়া রজত তার হাতের

মাথা-সমান-উঁচু মোটা বাঁশের লাঠিটা সগর্ব্বে তুলিয়া ধরিল।

তরুণা তার দাদার রকম-'সকম' দেখিয়া আর হাসি রাখিতে পারিল না। তারপর মুখে কাপড়-চাপা দিয়া কোনরকমে হাসি থামাইয়া, বসন্তের হাত ধরিয়া বলিল, "তবে আর কি, দাদা লাঠি-কাঁধে পাহারা দেবেন আর আপনি অকুতোভয়ে ছবি আঁকবেন! দাদা আজ সর্পবংশ সমূলে ধ্বংস করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছেন! নিন— নিন, উঠুন, আর দেরি করবেন না!"

খুবই ইতস্ততের সহিত বসন্ত উঠিল, —তরুণার প্রতি কথা, প্রতি হাসি তীরের মত তার বুকের মাঝখানে গিয়া বিঁধিতেছিল, তার মুখের দিকে লজ্জায় অনুতাপে সে আর মুখ তুলিতে পারিতেছিল না!

ছ

নদীর ধারে গিয়া রজত আগে তন্নতন্ন করিয়া—তরুণা যেখানে বসে সেখানটা— খুঁজিয়া দেখিল। তারপর মুরুব্বিআনার সহিত বলিল, "তরু, তুমি এখন বসতে পার, সাপ আর নেই। হুঁ, সাপ দেখেচি কি মেরেচি!" —বলিয়া লাঠি দিয়া সজোরে ঠকাস্ করিয়া পাথরের উপরে সাপের উদ্দেশে একটা আঘাত করিল!

তরুণা বলিল,"তুমি আজ যে প্রকাণ্ড লাঠি এনেচ দাদা, তাতে স্রুধু সাপ কেন, বাঘ-ভাল্লুক পর্য্যন্ত ল্যাজ তুলে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাবে!"

—এই বলিয়া সে পাথরখানার উপরে গিয়া বসিয়া পড়িল।

মনোযোগের সহিত সাপ খুঁজিতে লাগিয়া গিয়াছে! যেখানে কোন-একটা গর্ত্ত-'টর্ত্ত' কিছু দেখে, সেইখানেই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত লাঠিটা ভিতরে ঢুকাইয়া দেয় আর বলে, "আজ সাপ দেখেচি কি মেরেচি!" এম্‌নি করিতে-করিতে সে খানিক তফাতে চলিয়া গেল।

বসন্ত তখনো তুলি হাতে করিয়া অপরাধীর মত ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে।...... একবার ফিরিয়া দেখিল, তরুণা ঠিক কাল্‌কের মতই সহজভাবে বসিয়া ঘাসের ডোরে বনফুলের তোড়া বাঁধিতেছে!

অনুতপ্ত স্বরে বসন্ত বলিল, "আপনি কি—"

তরুণা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কাল আমাকে নাম ধরে ডেকে আজ ফের 'আপনি' কেন বসন্তবাবু? আমাকে 'তুমি' বলে ডাকুন!"

এ বিদ্রূপ, না কৌতুক? কিছুই না বুঝিয়া আরো কাতর হইয়া বসন্ত বলিল, "আমাকে—"

বাধা দিয়া দুষ্ট তরুণা বলিল, "থাক্ বসন্ত-বাবু, থাক্! আপনি কি বলতে চান আমি বুঝেছি—ক্ষমা করবার কথা বলবেন ত? দরকার কি!"—বলিয়া, সে সদ্য-বাঁধা ফুলের তোড়াটি নাকের কাছে ধরিয়া একমনে তার গন্ধ শুঁকিতে লাগিল।

বসন্ত সত্যসত্যই ক্ষমা চাহিতে যাইতে ছিল; কিন্তু এই কথায় তার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল। তার মনে হইল, তরুণা যেন একটি মূর্ত্তিমতী প্রহেলিকা—কোনদিক দিয়াই তার মনের ভিতরটা ধরিবার-ছুঁইবার

বসন্ত হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া আছে,—এমনসময় তরুণা হাসিতে-হাসিতে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া তার কাছে উঠিয়া আসিল। আগে বনফুলের ছোট তোড়াটি যত্নের সহিত বসন্তের জামায় বোতামের ছেঁদায় ঢুকাইয়া দিল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কোমল অথচ ব্যথাভরা স্বরে আস্তে-আস্তে বলিল, "বসন্তবাবু, কাল্‌কের কথা ভেবে আপনি অমন কিন্তু হয়ে আছেন কেন? কী আর আপনি করেছেন? আমাকে ভালবাসেন, এই বলেছেন বৈ ত নয়? তাতে হয়েছে কি? কেন আপনি আমাকে ভালবাসবেন না—ভাই কি বোনকে ভালবাসে না!"—একটু থামিয়া, বসন্তের মুখের দিকে ছলছল চোখে চাহিয়া, তার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "আর আমাকে ভুলবেন না—ছোট বোনটি বলে মনে রাঁখবেন!"

বসন্তের চোখদুটি অশ্রুজলে ছাপিয়া উঠিল।

তরুণা আবার একছুটে পাথরের উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "দাদা, ও দাদা! সাপ-টাপ্‌ কিছু পাওয়া গেল কি?... ...বসন্তবাবু, নিন নিন, তাড়াতাড়ি ছবি আঁকুন, ছবিতে আমার নাক এখনো খ্যাঁদা-খ্যাঁদা দ্যাখাচ্ছে—তুলি বুলিয়ে নাকটাকে শীগ্‌গির টিকলো করে তুলুন!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ত্রিপুরা-রাজ্যের কতিপয় জাতি

মণিপুরী

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ১৬,৩৮১ জন মণিপুরী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ৮,৭১৭ জন পুরুষ এবং ৭,৬৬৪ জন স্ত্রী। মণিপুরীগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদিগের সাধারণ পদবী ভট্টাচার্য্য, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বিদ্যানুসারে ইহাদিগের মধ্যে 'বিদ্যালঙ্কার' 'সার্ব্বভৌম' প্রভৃতি উপাধিও আছে। ক্ষত্রিয়গণ সিংহ উপাধি ধারণ করিয়া থাকে। শূদ্রের পদবী দে, দত্ত, কর, দাস ইত্যাদি, এবং বৈশ্যের পদবী

মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং পরিত্যক্ত স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করিয়া বিবাহ দিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করে। সাধারণতঃ দিবাভাগেই বিবাহ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে কখনও কখনও রাত্রিকালেও বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে পণপ্রথা আদৌ নাই। বিবাহকালে সাম বা যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র পঠিত হয়। মণিপুরীদিগের বিবাহ দ্বিবিধ—ব্রাহ্ম ও গান্ধর্ব্ব। ব্রাহ্ম-বিবাহে মাতা-পিতা কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। প্রায়শঃ পাত্র, কন্যার বাড়ীতে

অর্থবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা কন্যার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ দেওয়া অসুবিধা মনে করে তাহারা কন্যাকে নিজগৃহে 'তুলিয়া' আনিয়া বিবাহ করে। কন্যাপক্ষীয়দিগের অবস্থা ভাল না হইলে বরপক্ষীয়দিগের গৃহে বিবাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কন্যা অন্ততঃ পঞ্চদশবর্ষে পদার্পণ না করিলে ইহারা তাহাকে বিবাহযোগ্য মনে করে না। ৮।৯ বৎসর বয়সে কখনও কখনও কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রশস্ত নয়।

মণিপুরীদের মধ্যে কেহ মরিলে মৃতদেহ প্রথমে ধৌত করিয়া দাহার্থ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে গৃহে দুইটী পিণ্ড দিয়া থাকে। একটী পিণ্ড উঠানে দেওয়া হয়, বহির্দ্বারে আর একটী পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হয়।

দাহকালে ইহারা আর একটী পিণ্ড দিয়া থাকে তাহার নাম শ্মশানপিণ্ড। মণিপুরীগণ তিথি নক্ষত্র বিশেষভাবে মানিয়া চলে। অন্যান্য চাতুর্ব্বর্ণ্য আচার সম্পন্ন জাতির ন্যায় ইহাদেরও মৃতাশৌচ ও জননাশৌচ আছে। সন্তান জন্মিলে ইহারা ছয় দিবসে ষষ্ঠী পূজা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মণিপুরীরা অধিক পরিমাণে পান খাইয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহিরে যায় না বটে, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া সকলের সহিত অবাধে বাক্যালাপাদি করিয়া থাকে। ইহারা পর্দার পক্ষপাতী নয়। ইহাদের মধ্যে কোন ব্রতাদির অনুষ্ঠান নাই। দেবতার মধ্যে মণিপুরীরা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, সত্যনারায়ণ ও শনির পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবন ইহাদিগের ঈপ্সিত তীর্থ। ইহারা ঝুলন, দোল, রাস ও রথের উৎসব করিয়া থাকে। নবদ্বীপের গোস্বামিগণের নিকট ক্ষত্রিয় মণিপুরীরা দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। মণিপুরীরা তাস, ছতরং (দাবা), ছাগলকঞ্চি, (পোলো) খোকঞ্চী (হকী), গিলা (হাডুডুর ন্যায় একপ্রকার খেলা) হাবি লিকন বা ছানেড়া (কড়ি) খেলিয়া থাকে। মণিপুরী স্ত্রীলোকগণ সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে। ইহারা সূচের কাজ, জালবোনা, বস্ত্রবয়ন ও রেশমী কাজে বিশেষ পটু।

প্রথমব্রহ্মযুদ্ধের সময় হইতে মণিপুরীগণ ত্রিপুরারাজ্যে ঔপনিবেশিক রূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ত্রিপুরা রাজবংশে কন্যাদান করিয়া ইহাদের কেহ কেহ ধনশালী ও সম্মানভাজন হইয়াছে। 'মেথ্‌লী' মণি-পুরীদের নামান্তর। রাজবংশীয় ও সাধারণ মেথ্‌লী এই দুই প্রকার মণিপুরী ত্রিপুরারাজ্যে বাস করে। মণিপুরী ভাষায় মণিপুরীর নাম 'মেয়তেয় পাঙান্'।

(১) আসল বা খাই, (২) বিষ্ণুপুরী বা কালেসা এই নামে দুইটী বিভাগ মণিপুরীদিগের মধ্যে আছে তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী অপেক্ষাকৃত সম্মানিত।

মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে। সাধারণতঃ মণিপুরী গ্রামে সেই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ২।৪ গ্রামের লোকের ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত একটী সাধারণ উপসনামন্দির থাকে। সেইস্থানে

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে।

মণিপুরীদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত লোকও কিয়ৎসংখ্যক আছে।

চাক্‌মা

ত্রিপুরারাজ্যে চাক্‌মাদিগের সংখ্যা ৪,৩১০। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। অধুনা ত্রিপুরা-রাজ্যের সোণামুড়া, বিলনীয়া ও উদয়পুর বিভাগে চাক্‌মাগণ বাস করিতেছে। ইহাদিগের ভূতপূর্ব্ব বাসস্থান পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম। চীন-লুসাই অভিযানের সময় ইহাদিগের আদিম বাসস্থানে কুলিধরার ভয় হয়, সেই ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাক্‌মা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরারাজ্যে আগমন এবং এখানেই বাস করে। পরে ইহাদিগের মধ্যে অনেকে আবার স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিল। অন্যূন ৬০ বৎসর হইবে ইহারা প্রথম বিলনীয়া অঞ্চলে আপনাদিগের বাসস্থান স্থির করে, পরে ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানেও বাস করিতেছে।

সম্প্রদায় বিভাগ

এখানকার চাক্‌মাগণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মলীমা। ২। তন্ত্যা। ৩। বরুয়া। ৪। উয়াছাং। ৫। বুমা। ৬। কোড়া। ৭। কুর্চ্যা। ৮। কত্নুয়া ইত্যাদি। প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায়ের লোকই ত্রিপুররাজ্যে বেশী।

ইহাদিগের মধ্যে সম্প্রদায়-ভেদে সম্মানের কোনরূপ তারতম্য হয় না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর ভোজন এবং বিবাহাদি প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে 'দেওয়ান' উপাধিধারী ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্র, 'খিজা' 'তালুকদার' ও 'কারবারী' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও সম্মানের পাত্র, কিন্তু দেওয়ানের নিম্নে ইহাদিগের স্থান। চাক্‌মা-রাজের প্রবর্ত্তিত এই উপাধি-গুলির সম্মান রাজ্যান্তরে আসিয়াও ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় বজায় রাখিয়াছে এবং এখনও ইহারা যোগ্যতানুসারে এই সকল উপাধি গ্রহণ করিতেছে।

চাক্‌মাগণ নিরতিশয় ধূমপান করে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ধূমপানে অত্যন্ত আসক্ত। ইহারা চুরুটের পাইপের মত অতি ক্ষুদ্র হুকা ও বাঁশের হুকা ব্যবহার করে। মদ্যপানাদি ইহাদিগের সমাজে অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতির তুলনায় অতি কম। স্ত্রীলোক মদ্যপান করে না। ইহারা যে-কোন প্রাণীরই মাংস ভোজন করে, এমন কি ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর মাংসও ইহারা বাদ দেয় না; 'ব্যাঙাচি' 'কাঠের পোকা' 'বোলতার চাক' প্রভৃতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। সর্প, শুট্‌কি (শুষ্ক) মাছ, মাংসও ইহাদের উপাদেয় আহার্য্য।

চাক্‌মাদিগের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়। ইহারা অধিকাংশ সময়ে অপরাধীর বিচার ও সামাজিক গোলযোগের মীমাংসার ভার দলপতির হস্তে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। দলপতিও যথামতি তাহার সুমীমাংসা করে। চাক্‌মাগণ খুব কমই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে।

ধর্ম্ম

ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মোচিত আচার ইহাদিগের মধ্যে একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না বলিলেই হয়। অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় ইহারাও নানাবিধ দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং বহুবিধ পশুপক্ষী 'বলিদান' করিয়া থাকে। ত্রিপুরারাজ্যের চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বৌদ্ধভিক্ষু বা 'বাওয়ালী' নাই। চট্টগ্রামের 'বাওয়ালী' আসিয়া কখনও কখনও ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিবাহ

চাকমাদিগের মধ্যে বিবাহে কন্যাপণ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। বরকন্যার অভিভাবকগণ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করে। ইহাদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা নাই। সাধারণতঃ কন্যার ১৫—২০ এবং বরের ১৮—২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বরপক্ষ হইতে কন্যার পিতা বা অভিভাবককে ৮০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ দিতে হয়। সাধারণতঃ বরকন্যার বয়সের মাত্র ২।৩ বৎসর পার্থক্য থাকে। যুবতী কখনও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের সঙ্গে পরিণীত হয় না।

চাকমাগণ সবল ও সুস্থকায়। কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ব্যতীত অন্যরোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে নাই। সম্ভবতঃ পচা মাংস মাছ ইত্যাদি ভক্ষণের জন্যই এইরূপ মহারোগের প্রাদুর্ভাব ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। ইহারা মহারোগগ্রস্তকে ঘৃণা করে এবং তাহার জন্য পৃথক্ বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া পরিবারস্থ যাবতীয় লোক তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করে। মহারোগিগণ কেবল দৈনিক আহার প্রাপ্ত হয়।

চাকমা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা 'পাছরা' পরিধান করে, অঙ্গে জামা, তদুপরি 'বক্ষোবন্ধনী' এবং মস্তকে উষ্ণীষের মত একখণ্ড কাপড় ধারণ করিয়া থাকে। পুরুষগণ সাধারণতঃ বিলাতী বস্ত্রই পরিধান করে। চাকমা স্ত্রীগণ মুক্তার মালার ন্যায় স্ফটিকের মালা গলদেশে ধারণ করে। ইহারা সর্ব্বদা পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ফুলের বিশেষ আদর করে। চাকমাগণ জুমে শস্য উৎপাদন করে, অতি অল্পসংখ্যক লোক হল কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করে। ইহাদিগের জুমে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। ইহারা 'লং' 'কুন্দা' 'পালা' ইত্যাদি করিয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। সঞ্চয়পরায়ণতার অভাব ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। চাকমা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক পরিশ্রমী। অধিকাংশ কার্য্যের ভার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ন্যস্ত করিয়া পুরুষগণ নিশ্চিন্ত থাকে। চাকমাদিগের দাম্পত্য-বন্ধন ও প্রেম অতি দৃঢ় ও মধুর। সাধারণ পর্ব্বতীয় জাতির ন্যায় কাষ্ঠ-সংগ্রহ, শস্যবপন ইত্যাদি কার্য্য অনেক সময় চাকমা-দম্পতী একত্রও করিয়া থাকে।

মৃতসংকার ইত্যাদি

পরেই পোড়ান হয় না। দূরস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বগণের সম্মিলন-প্রত্যাশায় চাক্‌মারা ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত সযত্নে ইহা রক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপে শবরক্ষা করিবার জন্য ইহারা কাষ্ঠ দ্বারা একটী শবাধার প্রস্তুত করে, এই শবাধার দেখিতে অনেকাংশে 'কুন্দা' নৌকার ন্যায়। এই শবাধারে শবরক্ষা করিয়া তদুপরি তাহারা একখণ্ড তক্তা স্থাপন করে। ইহাতে শব হইতে ৩।৪ দিনের মধ্যে পুতিগন্ধ নির্গত হয় না। মৃতদেহ পোড়াইবার পূর্ব্বে চাক্‌মাগণ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দাহকার্য্যের সুবিধা করিয়া লয়।

কলেরা ও বসন্তরোগে কাহারও মৃত্যু হইলে চাক্‌মাগণ তাহার সৎকার করে না। নদীস্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া বা ভূগর্ভে প্রোথিত করা ইহার ব্যবস্থা।

কোন ধনবান্ বৃদ্ধ চাক্‌মার মৃত্যু হইলে একটী রথে করিয়া মহাসমারোহে শবদেহ শ্মশানে নীত হয়। রথের উপরে শবাধারে রক্ষিত শবদেহ স্থাপন করা হয়, মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ রথে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ঐ অর্থ, দাহকার্য্য শেষ হইলে বাওয়ালী, বাদ্যকর, রথ ও শবাধার নির্ম্মাণকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। মৃতের উত্তরাধিকারীর এই অর্থে কোন অধিকার থাকে না।

অপরাপর পর্ব্বতীয় জাতি হইতে পূজা প্রভৃতি বিষয়ে চাক্‌মাদিগের একটু বিশেষত্ব আছে; অন্য পর্ব্বতীয়গণ রোগমুক্ত হইলে অথবা অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিলে, পরে পূজা করিব এইরূপ মানৎ করে না, কিন্তু চাক্‌মাদিগের মধ্যে এইরূপ কামনা (মানৎ) করিয়া পূজা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

শিক্ষা ও বর্ণমালা ইত্যাদি

চাক্‌মাগণের কথ্য ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু ইহাদিগের পৃথক্ বর্ণমালা আছে। ইহাদিগের লেখার কার্য্য চাক্‌মা অক্ষরেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন কোন চাক্‌মা বাঙ্গালা লেখাপড়াও জানে; চাক্‌মাদিগের প্রত্যেক বৃহৎ পল্লীতে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পুস্তক আছে; ঐ সকল পুস্তক সুর-সহযোগে পঠিত হয় এবং পাঠকালে যথেষ্ট শ্রোতা পাঠকের চতুর্দ্দিকে সমবেত হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক শিক্ষিত চাক্‌মা আছে।

জুলাই

ইহারা প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের কোন কোন শ্রেণীর ভাষার সহিত কুকি ও মণিপুরী ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হালাম, রিয়াং, নওয়াতিয়া, জুলাই জাতির সাধারণ নাম ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংশ তিপারা বা তিপ্‌রা এবং ইহাদিগের ভাষা সমুদয়ের নাম তিপ্‌রা ভাষা।

জুমকৃষি এবং জঙ্গল আবাদই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। বুড়াছা, লাম্প্রা প্রভৃতি ইহাদিগের উপাস্যদেবতা। ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত ও ভাবী বিপৎশান্তির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ উপাস্য দেবতার নিকট কুক্কুট, ছাগী ইত্যাদি বলি দিয়া থাকে। ইহারা ছাগী, কুক্কুট, গোসাপ ইত্যাদির মাংস

ভক্ষণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশ আচার ব্যবহারই হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ নয়।

একসময়ে রাজদ্রোহ অপরাধে কতিপয় ত্রৈপুর প্রজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তদানীন্তন ত্রিপুর-রাজমহিষী দয়াপরবশ হইয়া ত্রিপুরপতির নিকট তাহাদিগের প্রাণ ভিক্ষা চাহেন। মহিষী সন্তানহীনা ছিলেন, রাজা মহিষীর প্রার্থনা পূরণ করিলে তিনি কারামুক্ত ব্যক্তিদিগকে এক বাটী দুগ্ধ পান করিতে দিয়াছিলেন। বাটীটী রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল। দুগ্ধ দান করিবার পূর্ব্বে মহিষী তাহাতে আপন স্তন স্পর্শ করাইয়াছিলেন। ঐ দুগ্ধ পান করিলে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বলিলেন, অদ্য হইতে তোমরা আমার পুত্রস্থানীয় হইলে। তিনি তাহাদিগকে কয়েকগাছি চুল চিহ্ন-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি তাহারা রাণীর জুলাই নামে পরিচিত হয়।

রিয়াং

ত্রিপুররাজ্যে রিয়াং অধিবাসীর সংখ্যা ১৫,১১৫; তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৭৪৩ ও স্ত্রী ৭,৩৭২ জন। তিপ্রাদিগের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উগ্রস্বভাব। রিয়াংগণ ত্রিপুর-রাজ্যের সোণামুড়া ও বিলনীয়া বিভাগে বাস করে। ইহারা চতুর্দ্দশ দফায় বিভক্ত; নিম্নে উপাধিসহ দফাগুলির নাম লিখিত হইল।

দফা বা শ্রেণী	উপাধি
১। তুই মুইরাস্কাক	১। রায় ২। কারমা (প্রথম)
২। মরছই	৩। চাপিয়া খাঁ ৪। য্যাক্ছুং (প্রথম)
৩। মেচ্কা	৫। চাপিয়া ৬। য্যাক্ছুং (দ্বিতীয়)
৪। আপেত	৭। কাচকাউ (প্রথম ৮। দরকালিম।
৫। চরকি	৯। কাচকাউ(দ্বিতীয়) ১০। দৈয়াহাজ্রা
৬। মাসা	১১। হাজরা (১ম) ১২। কান্দা
৭। রাইচাক্	১৩। দলৈ ১৪। খাসকালেম (১ম)
৮। তথ্মা য্যাক্চ	১৫। মুড়িয়া ১৬। খাসকালেম।
৯। ওয়ারিং	১৭। দাওরা ১৮। কাংরেং
১০। নকখ্যাম	১৯। কারমা (২য়) ২০। ডুকরিয়া।
১১। চম্প্রেং	২১। ছেগ্নাং ক্রাক্ ২২। খাওল
১২। দরবং	২৩। ভাণ্ডারী ২৪। হাজরা (২য়)
১৩। সগরায়	২৫। কান্দা হাজরা ২৬। কারমা (৩য়)
১৪। রিয়াং	২৭। কাচকাউ (৩য়)

রিয়াংগণ প্রধানতঃ মেস্কা বা মেচ্কা এবং মছলই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, উল্লিখিত উপবিভাগগুলি এই দুই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত চতুর্দ্দশ দফার মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে নিম্নলিখিত উপাধিভূষিত লোকগুলি প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রায় ও কাচ্ক ইহাদিগের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি। রায় উপাধিধারী ব্যক্তি

এক শ্রেণীর ও কাচ্‌ক উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অপর শ্রেণীর নেতা।

রায় ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। রায়—রাজা, রিয়াংদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রায় উপাধিবিশিষ্ট।

২। চাপিয়া খাঁ—ভাবী রায়।

৩। চাপিয়া—ভাবী চাপিয়া।

৪। দরকালিম—রায়ের পুরোহিত।

৫। দলই—রায়ের পেস্কার।

৬। ভাণ্ডারী—রায়ের দ্রব্যসমূহের রক্ষক।

৭। কান্দা—রায়ের সেবক ও ছত্র-দণ্ডধারী।

৮। দয়াহাজারী—ঢোলবাদক।

৯। মুরিয়া—সানাইবাদক।

১০। ডুগ্‌রিয়া—কাড়াবাদক।

১১। দাওয়া—পূজার টলুয়া।

১২। ছিয়াক্রাক্—পূজার বলির মাংসাদি বিতরণ এবং চাপিয়াখাঁর ছত্রবহন করে।

কাচ্‌ক ও তাহার অধীন সর্দারগণ

১। কাচ্‌ক—উজীর।

২। ইয়াক্ছুং—নাজির।

৩। হাজ্‌রা—কাচ্‌কের সেবক।

৪। কাংরেং—কাচ্‌কের ছত্রধারী।

৫। কার্‌মা—ইয়াক্ছুংএর সেবক।

৬। খান্‌কালিম—ইরাক্ছুংএর ছত্রধারী।

৭। খান্দল—আহার্য্য-সংগ্রাহক।

ইহাদিগের সাধারণ নাম কতর দফা। কতর=প্রধান।

কতরদফার লোকগুলিকে বরচুক্তি খাজনা

রিয়াংগণ অবস্থাদিতে ত্রিপুরজাতির অন্যান্য শ্রেণী হইতে নিকৃষ্ট। ইহারা অতিশয় মদ্যপায়ী। ইহারা জুমকৃষিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কদাচিৎ কেহ ব্যবসায়াদিও করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বিবাহাদি বিষয়ে ইহারা ইহাদিগের মূল জাতি ত্রিপুরার নিয়মের বশবর্ত্তী।

ইহাদিগের নেতৃবশ্যতা অতুলনীয়। জুমকাটা ও শস্যসংগ্রহের পূর্ব্বে ইহারা সমারোহের সহিত জাতীয় দেবতার পূজা করে। খাইন বা চাঁদা করিয়া এই পূজার টাকা সংগৃহীত হয়। পূজার শেষ সময় শুধু আমোদে পর্য্যবসিত হয় না। তৎকালে রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিদিগের একটা বৈঠক বসে, তাহাতে তাহাদের সামাজিক অবস্থাদির বিচারের মীমাংসা হইয়া থাকে। খাইনের টাকা অতিরিক্ত হইলে তাহা জাতীয় ভাণ্ডারে রক্ষিত হয়। এই টাকা হইতে কতরদফার লোক কিছু কিছু পাইয়া থাকে। অবশিষ্ট সর্ব্বজনীন মঙ্গল কার্য্যে ব্যয়িত হয়।

মগ

ত্রিপুরারাজ্যে মগের সংখ্যা ১,৪৯১। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৭১ এবং স্ত্রী ৭২০ জন। মগগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আচার-ব্যবহারাদিতে ইহারা চাক্‌মাগণের অনুরূপ। ইহারা ত্রিপুররাজ্যের আধুনিক প্রজা।

জমাতিয়া

পার্ব্বত্য ত্রিপুররাজ্যে জমাতিয়া জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ৪,৯১০, তন্মধ্যে পুরুষ

বিভক্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে জমাতিয়া শ্রেণী সম্মান, সভ্যতা ও অবস্থাদিতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে 'পুরাণ ত্রিপুরা'র নিম্নেই জমাতিয়াগণের স্থান। পরন্তু কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতায় ইহারা 'পুরাণ ত্রিপুরা' দিগকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান সৈনিকের কার্য্য করিত, তৎকালে জমাতিয়াগণ বড়ই উগ্রস্বভাব ছিল। ইহারা মূলতঃ বিভিন্ন জাতীয় হইয়াও ক্রমশঃ ত্রিপুরজাতির অন্তর্নিবিষ্টতা লাভ করিয়াছে। এই জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরেশ্বরের যে সৈন্যদল গঠিত হইত তাহা জমাৎ নামে পরিচিত ছিল, এই জমাৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণ জমাতিয়া নামে অভিহিত হইত, তদনুসারে তাহাদিগের বংশধরগণও জমাতিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুতরাং 'জমাতিয়া' কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণে জাত হইয়াও একটী অভিনব জাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। জমাতিয়াদিগের মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরা, নওয়াতিয়া, রিয়াং, কলই প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে জমাতিয়াগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিল। দুই-শতাধিক জমাতিয়ার মুণ্ডপাত করিয়া ত্রিপুরাধিপতি বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে জমাতিয়াগণ নিরতিশয় শান্তিপ্রিয়। বিবাদ-বিসংবাদাদি ইহাদিগের মধ্যে প্রায়ই

রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্য ব্যতীতই ইহারা তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে।

পর্ব্বতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে জমাতিয়াগণের আর্থিক অবস্থা ভাল। বর্ত্তমানসময়ে জমাতিয়াগণ জুমকৃষি পরিত্যাগ করিয়া গোরুর সাহায্যে হল কর্ষণ দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।

জমাতিয়াগণ তাহাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সুশৃঙ্খলা সাধনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বজাতির মধ্য হইতে উপযুক্ত দুই ব্যক্তিকে সর্দার বা দলপতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে এবং কি সামাজিক কি অন্যান্য বৈষয়িক সকল বিষয়েই এই দুই দলপতি বা সর্দারের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই দুই পরিচালকদ্বয় চলিত ভাষায় 'মুল্লুকের সর্দার' নামে পরিচিত। নিরূপিত সময়ের অবসানে বা অপর কোন অনিবার্য্য কারণে পূর্ব্বের দলপতির পরিবর্ত্তন হইয়া অপরকে তৎপদে অধিরোপিত করা হয়। এই সমাজপতিদ্বয়ই তাহাদিগের বিবাহাদির মীমাংসা ও অপরাধীর দণ্ড বিধানাদি করিয়া থাকে।

নৃত্যগীতাদি

জমাতিয়া সম্প্রদায় স্বভাবতঃ সঙ্গীতানুরাগী। ইহাদের স্বর-মাধুর্য্যও যথেষ্ট। অধিকাংশ পল্লীতেই হরি-সঙ্কীর্ত্তনের একটী করিয়া দল আছে। ইহাদের সঙ্কীর্ত্তনশক্তি প্রশংসনীয়। সম্প্রতি তাহারা দুইটী

দলপতি সংস্কৃত পদাবলী গান করিতেও সমর্থ।

ধর্ম্ম প্রভৃতি

ত্রিপুরা জেলার নুরনগর পরগণার অন্তঃপাতী মেহারী গ্রামের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশীয়গণ কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। ইহারা বৈষ্ণব জনোচিত তিলক ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকে। তীর্থ দর্শনাদিতেও ইহাদিগের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও ইহারা জাতীয় বন্যদেবদেবীর পূজাগুলি পরিত্যাগ করে নাই।

রিয়াংদিগের ন্যায় ইহারা 'থাইন' করিয়া টাকা আদায় করে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় দেবদেবীর পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রচলিত পূজাগুলির মধ্যে শিবগৌরী পূজা, দুর্গাপূজা, ত্রিপুরাসুন্দরী পূজা ও গোমতী পূজা প্রধান। দুর্গাপূজা সর্ব্বাংশে বাঙ্গালীদিগের প্রবর্ত্তিত পূজার অনুরূপ। এই পূজা বাঙ্গালী পূজক দ্বারা সম্পাদিত হয়।

বিবাহ

জমাতিয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রশংসনীয়। কন্যাপণগ্রহণ ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। পরন্তু এই প্রথাকে ইহারা অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে। বিবাহের জন্য নির্ব্বাচিত পাত্র, কন্যার পিত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক বিবাহ করে। বিবাহের সময় কন্যার পিতা সামর্থ্যোচিত যৌতুকাদি সহ কন্যাদান করিয়া থাকে।

দুই বৎসর কাল শ্বশুরগৃহে জামাতার অবস্থান করার প্রথা জমাতিয়া সম্প্রদায়েও প্রচলিত আছে। তবে বর ইচ্ছা করিলে, স্ত্রীকে লইয়া নিজগৃহে গমন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যাপার কদাচিৎ হইয়া থাকে; কারণ এই রকম ঘটনা হইলে ইহা হইতে উভয় পক্ষের মনোমালিন্য হয়।

নওয়াতিয়া বা নোয়াতীয়া

ত্রিপুররাজ্যে নোয়াতীয়া জাতির সংখ্যা ১৪,৪৩৭ তন্মধ্যে পুরুষ ৭,৩৯১ ও স্ত্রী ৭,০৪৬। নোয়াতীয়াগণও জমাতিয়াগণের ন্যায় মিশ্রজাতি। ইহারা বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুর জাতির শাখা-বিশেষরূপে পরিণত হইয়াছে। নোয়াতীয়গণ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দফায় বিভক্ত—

১। কেওয়া।
২। মুরাসিং।
৩। আছলং।
৪। গর্জ্জন।
৫। খালিচা।
৬। তংবাই।
৭। লাইতং।
৮। দেইলদাক্।
৯। আনা ও কিয়াথরু।
১০। তোতারাম।

এই রাজ্যে প্রথমোক্ত ছয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে।

ইহারা গোমতী নদীর দক্ষিণে ফেণী নদীর উত্তরে বাস করে। কেহ কেহ সম্প্রতি ফেনীনদীর দক্ষিণেও বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার

অনেকাংশে জমাতিয়াগণের অনুরূপ। সম্প্রতি মুরাসিং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ক্রমশঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। জমাতিয়াগণের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও হলকর্ষণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদিগের বিবাহ-প্রথা রিয়াংগণের ন্যায়।

আসামী

বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যে আসামী অধিবাসীর সংখ্যা ৯৯ (নিরানব্বই) জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৭ জন ও স্ত্রী ৪২ জন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের আহোম বংশীয় এক রাজকন্যা বিবাহ করেন। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া কতকগুলি আসামী এইখানে বাস করিয়া আসিতেছে।

হালাম

হালামগণ কুকি ও তিপ্রার মধ্যবর্ত্তী জাতি। (মতান্তরে হালাম এবং কুকিগণ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে যে সকল কুকি ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহারাই হালাম নামে অভিহিত হইয়াছে। হালামের অপর নাম মিয়োকুকি। হালাম ভিন্ন অন্য কুকিগণ অধুনা কাঁচা কুকি আখ্যায় পরিচিত।) ত্রিপুর রাজ্যে হালামগণের সংখ্যা (২,১১৫ তন্মধ্যে পুরুষ ১,০৯০ স্ত্রী ১,১২৫) হালামগণ নিম্নলিখিত দফা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত—

(১) রাংথল—(রাং=রৌপ্যমুদ্রা) ইহারা গলদেশে রৌপ্য মুদ্রা পরিধান করে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে।

(২) কাইপেং বা কাইপেন—(কাই=বশ্যতা)। এই দফার লোকগণ সর্ব্বপ্রথমে ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করে।

(৩) মরছম বা মুরছুম—(সত্যবাদী)। হালামগণের মধ্যে এই দফার লোক শ্রেষ্ঠ। ইহারা সর্ব্বদা সত্যবাদী বলিয়া খ্যাত।

৪। রূপনী—(যাতায়াতকারী)। ইহারা সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে যাতায়াত করিত বলিয়া ইহারা এই আখ্যায় অভিহিত।

৫। খুলং *

৬। দাপ বা ভাব *

৭। কলই বা কলয়—(হরিদ্রা)। কলয়গণ ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনাগারের হলুদের বোঝা বহন করিত।

৮। চড়ই বা চড়াই। *

৯। মছবাং বা মসবাং। *

১০। লঙ্গাই বা লাঙ্গাই। *

১১। বংশের বা বংছের। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বস্ত্রের বোঝা বহন করিত।

১২। কর্ব্বং। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের শয্যা-বাহী ভৃত্য ছিল।

১৩। মুতিলাংল। *

১৪। বং—(ঘাতক)। ইহারা যুদ্ধের সময় সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিত এবং সর্ব্বাগ্রে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিত।

১৫। ছাইমাল। ভীরু বলিয়া ইহাদিগের এই নাম।

---

* তারকা-চিহ্নিত সম্প্রদায়গুলি এবং তদতিরিক্ত খামাচেপ ও ছাকাচেপ এই দুই সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর অঞ্চলে বাস করে। স্ব স্ব বাসস্থানের ও বংশের প্রধান ব্যক্তিগণের নামানুসারে

১৬। হাওয়া। যুদ্ধের সময় হাওয়ার ন্যায় গমন করিয়া ইহারা শত্রুদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত এবং রাজ্যে সর্ব্বদা গুপ্তচরের কার্য্য করিত।

১৭। লুছুই-মুছুই। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের ভোজনের জন্য হরিণ শিকার করিত।

১৮। বেতু—(বেদনা-নিবারক)—যুদ্ধের সময় ইহারা আহতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিত।

ইহাদিগের একশ্রেণীর ভাষার সহিত অপর শ্রেণীর ভাষার ঐক্য নাই। কোন কোন ভাষার সহিত কোন ভাষার আংশিক সাদৃশ্য আছে।

ইহাদের প্রত্যেকের জাতি-বিষয়ক উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার শ্রেণী আছে।

হালামদিগের ত্রয়োদশ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রায় হয় না। কদাচিৎ কোন শ্রেণীর সহিত অপর কোন শ্রেণীর বিবাহ হইয়া থাকে।

হালামগণ গোমতীনদীর উত্তর এবং কৈলাসহরের দক্ষিণ এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের অপর নাম 'খীল হালাম'।

এই ত্রয়োদশ প্রকারের খীল ব্যতীত আরও ১০।১২ প্রকারের অতিরিক্ত হালাম আছে। তাহারা 'চড়ই' এই সাধারণ নামে অভিহিত। চড়ইদিগের ভাষাও স্বতন্ত্র। সমুদয় হালাম জাতির প্রত্যেক দফারই আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রায়ই বিভিন্ন। দুই এক শ্রেণীর আচার-ব্যবহার অপর দুই এক কুকি বলিয়া পরিচয় দিতে বড়ই ভালবাসে; কিন্তু প্রত্যুতঃ ইহারা কুকি নয়। ত্রিপুররাজ্যে হালামদিগের সংখ্যা ৫,৬০১। 'সাখাচেপ' থাঙ্গাচেপ ও লাঙ্গাই আখ্যায় পরিচিত হালামগণ পূর্ব্বকালে লুসাই জাতীয় কিরাত-রাজের অধিকারে বাস করিত। লুসাইগণ হালামদিগের উপর নিরন্তর অত্যাচার করিত বলিয়া পরে তাহারা 'রুপোবই তপোইবোং' নামক পর্ব্বতে (এই পাহাড় তৎকালে ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল) উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত 'হায়চেফ' বা 'হাতুফ' পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে বহুদূরে অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতেই বেগবতী ধলেশ্বরী নদীর উৎপত্তি। এই সময় লুসাইপতি রুপোবই তপোইবোং পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বকোণে অবস্থিত 'চাংছেন' পর্ব্বতোপরি বাস করিত। হতভাগ্য হালামগণ তাহাদিগের নুতন বাসস্থানে গিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না; সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহারা ত্রিপুররাজের অধিকৃত 'আইন কুওঙ' পর্ব্বতে আপনাদিগের বাসস্থান নির্ণয় করিল; কিন্তু সেখানেও লুসাইগণ তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। হালামগণ আইনকুওঙ পরিত্যাগ করিয়া হায়চেফ পর্ব্বতে বসতি করিল। তদবধি পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর হালামগণ সেই পর্ব্বতে ত্রিপুররাজ্যান্তর্ভুক্ত অন্যান্য পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিতেছে। মহারাজ ডাঙ্গরফার শাসনকালে হালামগণ প্রথম ত্রিপুররাজ্যে আগমন করিয়াছিল।

জয়ন্তীদেশের রাজা ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ে বিজয়-মাণিক্য সাথাচেপ ও থাঙ্গাচেপ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের হালামদিগকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। অসভ্য হালামগণ রাজদ্রোহী না হয়, এইজন্য তৎকালে মহারাজ বিজয়-মাণিক্য বিতস্তি পরিমিত ধাতুনির্ম্মিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্র তাহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। হালামগণও রাজদত্ত উপহারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। অদ্যাপি হালামগণ দেবতাজ্ঞানে উক্ত রাজদত্ত ব্যাঘ্র ও হস্তীর পূজা করিয়া থাকে।

হস্তী ও ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে নিম্নলিখিত শব্দগুলি উৎকীর্ণ আছে—

পূর্ব্বাপর্য্যক্রমাদ্ ভবন্ত আত্মীয়া ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্ত নাশো ভবিষ্যতি পশ্চাদ্‌গজশার্দ্দূলো ॥

ইহার মধ্যে 'ভবি'পর্য্যন্ত গজপৃষ্ঠে ও অপরাংশ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে খোদিত আছে। এই উপহার প্রাপ্তির বহুকাল পরে লাঙ্গাই সম্প্রদায়ের হালামগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট হইতে ধাতুনির্ম্মিত আরোহীসমেত একটী অশ্ব পাইয়াছিল। অশ্বপৃষ্ঠে বিজয় মাণিক্য, ছত্রমাণিক্য ও উপহারপ্রাপ্ত লাঙ্গাই সর্দারের নাম খোদিত আছে।

রিয়াংগণের মত হালামদিগের মধ্যেও 'রায়' 'কাচ্‌ক' 'গালিম' ইত্যাদি উপাধিধারী লোক আছে। ইহারাই হালামদিগের সমাজপতি অর্থাৎ নেতা। হালামগণ পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পর্ব্বতীয় জাতির রমণীগণের মধ্যে হালাম জাতীয় স্ত্রীই সুন্দরী।

ইহাদিগের নির্ম্মিত 'পাছরা' অতি সুন্দর। ইহারা বাঁশ ও বেত দিয়া বহুবিধ জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

স্বীকার

কাশীর গঙ্গাতীরে ছোট বাড়ী; সম্মুখের বারান্দা হইতে ভাগীরথীর জল দেখা যায়, তাহার পাশের ঘরে গঙ্গার দিকে মুখ রাখিয়া রুগ্নার শয্যা বিছানো। রুগ্নার জীর্ণ দেহ, মৃত্যুচ্ছায়া-ম্লান মুখ, আশে-পাশে ঔষধাদির বিশেষ চিহ্ন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে নিকটে-দূরে অন্তিম-ব্যবস্থারই আভাষ পাওয়া যায়।

গৈরিকধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রুগ্নার সম্মুখে বসিলেন।

রুগ্না ডাকিলেন, "গুরুদেব——"

"কি মা? এই যে আমি।"

"আজ আর বিলম্ব নেই—নয়?"

"সে কি কেউ বল্‌তে পারে, রমা? তবে মিছে সময়ের হিসাব করবার প্রয়োজনই বা কি। নারায়ণ স্মরণ কর।"

"করছি বাবা, তাঁর কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু একটা কথা—" রুগ্নার মুখ উদ্বেগে বিকৃত হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "কথা বলতে তোমার কষ্ট হবে মা।"

"না বাবা, তবু আমায় বলতেই হবে যে। আপনার মুখে আমার শেষ পরিণামের বিচার না শুনলে মরণও বোধ হয় আমায় ছোঁবে না। বেশী নয়, তবু বলতে পারব কি? শক্তিতে কুলোবে কি? বাবা, আপনার চরণধূলি—"

"দিচ্চি, তার আগে একটু বেদানার রস খাও দেখি, তাতে বল—"

"সে বলের কথা বলিনি বাবা, সে শক্তি আমার খুব আছে এখনো। আমি ভাবছি—ভাবছি, সে কথা আপনাকে বলতে পারব কি না!"

"না যদি পার তাতে ক্ষতি কি, মা? তুমি এখন ইষ্ট দেবতার নাম কর।"

"আপনিই আমার ইষ্ট, তাই তো এ কথা বলতে যাচ্ছি। আপনি ত আমায় ছেলে বেলা থেকে জানেন, আচ্ছা, বলুন দেখি, জীবনে আমি কোন দুষ্কর্ম্ম কোন পাপ করেছি কি?"

"ভাল প্রশ্ন করেছ রমা, এ কথার উত্তরে তুমি তৃপ্তি পাবে। বাল্যকালে বিধবা তুমি, কিন্তু তোমার মত পবিত্র সংযত ত্যাগের জীবন ক'জন সন্ন্যাসীতেই বা পায়? তোমার মায়া, দয়া, ভক্তি, ব্রত উপবাস পুণ্য তীর্থভ্রমণ—"

রুগ্নার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। "ছেলে-ভোলানো কথা কেন বলছেন বাবা? এখন আমি তা শুনতে চাইনে। আমি জানি, আপনি জ্ঞানী পণ্ডিত, তার উপর আমার গুরু,—আমার যা কথা—"

তাঁহার মুখে কথা আট্‌কাইয়া গেল, গুরুরও মুখে গাম্ভীর্য্যের উদাস ছায়া-পাত হইল। ক্ষণকাল পরে শিষ্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন, "তোমার নিজের কথা? বুঝেছি মা। যেদিন তুমি আমার শিষ্যত্ব চেয়েছিলে রমা, তার অনেক আগে থেকেই আমি তোমায় জানতাম; তোমার অম্লান জীবনের মাধুর্য্য অনুভব করতাম,—তাই ত তা বিশ্বনাথের চরণে তুলে দেয়েছি। কিন্তু মা জানো ত, মানুষ দেবতাও নয়, অন্তর্যামীও নয়, তোমার কোন কথা যদি আমার না জানা থাকে—"

"আছে, তাই আছে। সেই কথাই আপনাকে শুনিয়ে যাব, আর বুঝে যাব যে এর পর আমি কোথায় যাচ্ছি—স্বর্গে না নরকে!"

"ও কি রমা, কি বলছ তুমি! বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ কর, তোমার কণ্ঠরোধ হচ্ছে।"

"না বাবা, তার জন্য নয়। আমার মনে হচ্ছে, বাবা বিশ্বেশ্বর ত সব জানেন—"

"তার মধ্যে আর কোন দ্বিধা এনো না মা, তোমার যা বলবার আছে, তাঁকেই জানাও, তিনি সব ঠিক করে নেবেন। তুমি কি জানো না যে—"

"সে-সবই জানি বাবা,—তাঁর কথা পরে বলছি—। কিন্তু আমার কথা—"

"না, না, ভুল করো না মা, আগে তাঁরই কথা বল। তুমি—"

জোড় করিয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া বলিল, "কোন ভুল নয় বাবা। এ যে আমার তাঁরই কথা, বুঝি,—আপনি পদধূলি দিন আমায়, আমি বলি।"

২

উত্তেজনার ভাবটুকু কাটিলে রমা ধীরে ধীরে বলিলেন, "বেশী কথা নয়, বেশী দিনেরও কথা নয়, কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে আমার গত জীবনের কথা ভাবতে ইচ্ছা হয়। আপনি আমার গুরু, আপনার কাছে কোন জিনিষকে বাড়িয়ে বলা বা মিথ্যা বলা যেমন অন্যায়, কিছুকে খাটো করে লুকোনোও তেমনি ভুল। ছেলেবেলায় কখন্ বিয়ে হয়েছিল বা বিধবা হয়েছিলাম, তা ঠিক্ স্মরণ নেই, কিন্তু জ্ঞানের পর থেকে আমার যা কর্ত্তব্য—সংসার বা সমাজ আমার কাছ থেকে যা চায়, তার সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা বা ভয় ছিল না। সাধারণতঃ নারী-জীবনের পক্ষে লোকে যাকে দুঃখ বলে থাকে, আমি ঠিক্ তার মধ্যেই এমন একটা চিরস্থিতির আশ্রয় পেয়েছিলাম, একটি অমর অক্ষয় সুখ আমার হৃদয়ে অঙ্কুর দিয়ে ক্রমে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল, যার ছায়ায় পৃথিবীর অন্য সব দুঃখ-জ্বালা স্বচ্ছন্দে জুড়িয়ে যেতে পারে। কর্ত্তব্য আমার পক্ষে ভার ছিল না, বরং তাকে ভাল বেসে বয়ে চলাই আমার প্রিয় অভ্যাস গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ছিল।"

তাঁহার শ্বাস ঘন দেখিয়া গুরু বলিলেন, "আজ তুমি কেন এ কথা বলছ মা? তোমায় কে না জানে? কত দুঃখীকে যে কাঁদিয়ে

ঘাড় নাড়িয়া মৃদু হাসির সহিত রমা বলিলেন, "সে সব কোন কথাই নয়; শুনুন্, শীঘ্র বলে নিই। আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম পূজা-আচ্চার মধ্যেও আমি আর-একটা জিনিষ ঠিক্ তাদেরি মত ভালবাস্‌তাম, জানেন কি? আমি সাহিত্য-চর্চ্চা করতাম, কবিতা পড়তে খুব ভালবাসতাম, বাবা।"

"তাও জানি। আর তুমিও বোধ হয় জান্‌তে যে যারা মানুষের মনের দুয়ার-জানলা বন্ধ করে বাইরের কিছু ভিতরে আসতে দিতে নারাজ, আমি সে-দলের নই!"

"জানি, আপনি শুধু আমার গুরু বলে নয়, আপনি যে মানুষের মন জিনিষটাকে খালি একটুক্‌রো জমাট্ বরফ্ বলে ধরে রাখেননি, সে যে রক্ত-মাংসের চাপে চাপে ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাতে পারে—অথবা সে এই মাটীর পৃথিবীর অংশ একটু মাটীর ধর্ম্ম পেয়ে শুকিয়ে পাষাণ হয়ে গেলেও কচিৎ একটা দুর্ব্বার জন্ম এড়াতে পারে না, এ আপনি ভোলেন নি; জানি, বুঝি—তাই তো এ কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছি। আমার দ্বারা যার স্থির মীমাংসা হয় নি, আপনি হয়তো তার মানে করে দিতে পারেন। আচ্ছা, আর অন্য কথা নয়—সেই কথাই বলি।

ছেলেবেলায় বিধবা হবার পর থেকেই, —কেউ ত আমায় শেখায়ওনি বোধ হয়, বাবা; বড় বেশী ছোট ছিলাম কি না, এগারো বৎসরের মেয়ে বিধবা পিসি জ্যেঠাইমারা পর্য্যন্তও আমায় বাঁধাবাধির

তবু—কিসের শিক্ষায় বা সংস্কারে তা জানি না, ঐ জ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই আমি আমার সেই অবস্থাটিকে যেন আমার বুকের হাড়ের মধ্যে তুলে নিয়েছিলাম। বড় শোক বা দুঃখ ত নয়ই,—যিনি চলে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় ছিল না, কিন্তু সেই শিশু-জীবনের খেলা-ধূলা ঢেউয়ে-ভাসা হাল্‌কা প্রাণটা এক-দিনের ধাক্কায় এমন উল্টে পাল্টে গেল,—জলে-ডোবা জাহাজের শেষ মাস্তল্‌টার মত বালির উপর জলের উপর আটকে শক্ত কাঠ উঁচু হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল,—ওঃ সে যেন কী! আমিই নিজে তার সব ভাব বুঝতে পারিনি বোধ হয়। সবাই বলত, আমার স্বামী স্বর্গে, আমি দেবতার স্ত্রী, তাই সাধারণ মেয়েদের চেয়ে আমার কর্ত্তব্য যেমন কঠোর, আমার আসনও তেমনি সবার উর্দ্ধে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা দিদিমা ঠাকুমারা অনেক কথা অনেক কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে আমার এমনি অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, যেখানে বাবা মার কান্নার দুঃখটুকু বাদ দিলে, নিজের পক্ষে আত্ম-সম্মানের উচ্চ ঐশ্বর্য্যশালী অথচ বেদনা-বন্ধন-হীন আনন্দ-গর্ব্বের বিচিত্র দেবাসন-খানিই আমি দখল করে বসেছিলাম। বয়স বাড়তে বাড়তে যখন আমি সকলের প্রশংসা বা শ্রদ্ধা পেতে লাগলাম, তখন তাতে আমার আশ্চর্য্য বা আনন্দ বোধ হত না; আমি যে মানবীরূপে দেবী, আমি যা করছি তা যেমন আমার পক্ষে সহজ, তেমনি আমায় সম্মানের চক্ষে দেখাও তাদের কাছে সোজা না হবে

কেন? হাসি পাচ্ছে, বাবা। এখন আমি সেদিনের কথা মনে করে হাসি, কিন্তু অনেকখানি বয়স পর্য্যন্ত এ হাসিটুকুও আমি হাসিনি, কারণ নিজেকে তখন সে সব চপলতার অতীত বলেই ধারণা ছিল। তবে তারি মধ্যে তরল সাহিত্যের মোহ-টুকু কোথা থেকে এসেছিল কি জানি! গল্প-উপন্যাস ইচ্ছা করে ঘৃণা করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু নড়াতে পারতাম না ঐ কাব্যকে; বুঝতাম, তারা অনেক মাটীর জিনিষকেও সোনার রং মাখিয়ে চোখের সুমুখে ধরে, অনেকের কাঁচা মুগ্ধ দৃষ্টি তাতে ঝলসেও যায়, কিন্তু নিজের পরে তখন আমার এতখানি অটুট বিশ্বাস যে ভ্রমেও মানতে চাইতাম না যে অমনি কোন সামান্য জিনিষ আমার প্রস্ফুটিত জ্ঞান-নেত্রকে ভ্রান্ত করে দিতে পারে! আমি যে দেবী, আমার নিত্যকৃত দুঃসহ ক্লেশের অম্লান পুণ্যই আমার মনের সমস্ত আঁধার ঘুচিয়ে সত্যের পথ দেখাবে!

না বাবা, কিছু বলতে হবে না আপনাকে, আর নিজের কর্ম্মের গর্ব্ব নাই, তবে বিধাতার চিরদিনের দয়া, তাঁর আশীর্ব্বাদে ঐ পুণ্যকে এখনও আমি তেমনি বিশ্বাস করি! তার ইঙ্গিতেই ত এত কথা বলে যাচ্ছি। তা নয়, শুধু আমার অহঙ্কার যে তখন কত বড় ছিল, কেমন অনাহত ছিল, তাই জানাচ্ছি আপনাকে।

তারপর বহুদিন অমনিভাবেই কেটে গেল। পৃথিবীতে থেকে ভগবানের কায করছি, এই অভিমানের তৃপ্তিতে মরণের সাধ ছিল না, কিন্তু তখন যদি মরণ

আসতই তা হলে তার পক্ষে খুব অসময়ও হত না। চল্লিশ পার হয়ে গেছল; শরীরে রোগ ছিল, চোখের দীপ্তি অনেকখানিই নিবে এসেছিল। কিন্তু মেয়েমানুষের চশমা পরাকে যারা অত্যন্ত সৌখীনতার চিহ্ন বলে মনে করে, তারাও আমার সেই নিস্তেজ চোখের কাচ-ঢাকা প্রখর দৃষ্টির সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যেত। আমার লেখাপড়া বই কাগজ—অনেক গিন্নী-বান্নী শ্রেণীর বিধবারা বিরক্তির চক্ষে দেখ্‌লেও ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না, কারণ পুরোহিত-ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বদাই আমার তর্কে পরাস্ত হন ও মাঝের-পাড়ার স্মৃতিরত্ন খুড়া গ্রামে এলে বাড়ী এসে আমার সঙ্গে দেখা এবং আলাপ করে যান। যাঁরা আমার নিন্দুক, তাঁরাও নিন্দার পথ খুঁজে পেতেন না, কেন না নিষ্ঠায় আচারে প্রতিদিন আমিই তাঁদের খুঁৎ ধরে দিই। আমি জানতাম, যিনি যাই বলুন, তার অধিকাংশই তাঁদের মুখে,—সেখানে আমার কার্য্যই আমার প্রবল সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়, আমি তাঁদের ভয় করতে যাব কেন?"

"তার জন্য এত কথা বলছ কেন, রমা? অনুতাপের কথা এর মধ্যে কি আছে? মানুষের মনের মধ্যে অমনি কিছু উগ্র শক্তি না থাকলে সহজে সে সংসারের পথে চলে যেতে পারবে কেন?"

"শক্তি? হাঁ, আমিও তখন এই নামই দিতাম বটে। কিন্তু পরে বুঝেছি, শক্তি বা ভক্তি যে নামই দেওয়া যাক তার, সমঝদার লোক বসে থাকে, তবে সে ভাল সামগ্রীগুলিও—নারায়ণ!"

একটা টানা নিশ্বাসে রুগ্নার দুর্ব্বল বক্ষ-পঞ্জর কাঁপিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে গুরু বলিলেন, "একটু স্থির হও দেখি মা। তুমি বুঝতে পারছ না কিন্তু আমি দেখেছি—মৃত্যুর ধারণাটা যে সময় মানুষের প্রাণে স্থির বিশ্বাসের মত জেগে ওঠে, কোন উপায়ে তখন জীবনের ছোট-খাটো অপরাধগুলোও মনকে খুব বেশী রকম অনুতপ্ত করে তোলে। তুমি যা বলছ, তা ত কিছু দোষের নয়, রমা।"

"এখনও যে কিছু বলা হয়নি বাবা, এবার আসল কথা বলি। সবটুকু খুলে বলতে হবে, পারব কি অত বলতে? তবু—

সে বৎসর আমরা তীর্থে বেড়িয়েছিলাম, আপনার মনে আছে ত? আপনারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু বাড়ীর কাছে কার প্লেগ হয়েছিল নাকি—আপনি লিখে বারণ করলেন?"

"হাঁ, সে তো সেদিনের কথা।"

"পাঁচ বৎসর হয়েছে। এই পাঁচটি বৎসর—যাক্ সে কথা। আমাদের দেশের অনেক লোকই ছিলেন সে দলে, ধনী গরীব মেয়ে পুরুষ—সবাই মিলে যেখানে আমরা নামতাম, সেখানে দিব্যি সোর-গোল পড়ে যেত। দান-ধ্যান, পূজা, শ্রাদ্ধ—খুব ঘটার সঙ্গেই চলছিল। চিত্রকূট নর্ম্মদা গোদাবরীর পথ ধরে আমরা দ্বারকা গিয়ে আমেদাবাদের পথ ঘুরে ফিরছিলাম পুষ্করতীর্থ করব বলে।

এলাম, উঃ, সেদিন কী ভীড়, বাবা! কোন্ সাহেব না কে কোথায় যাচ্ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ঝেড়ে জবাব দিলে যে ফাষ্ট´ বা সেকেণ্ড ক্লাস দিতে তাঁর সাধ্য নাই। ইণ্টার বলে কোন ভদ্র বিড়ম্বনা সে ট্রেনে ত নাই—শুনে আমাদের সঙ্গী বড় লোকেরা হতাশ্বাস হয়ে বসে পড়লেন। পরের ট্রেনে বা তার পরদিন ফিরলেই হত, কিন্তু ব্যস্ত-বাগীশদের সে বুদ্ধি দেয় কে? বিশেষ টিকিট লগেজ সব প্রস্তুত, আর কি ফেরা হয়? গাড়ী দাঁড়াতে সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে একটা থার্ড ক্লাশে উঠে বস্‌লেন। শিকের বেড়া দেওয়া একটু অংশে ষ্টেশন মাষ্টার দয়া করে ফীমেল লেখা একটুকরা কাগজ এঁটে দিয়েছিলেন, আমরা দু-চারটি মেয়ে তাতে ঢুকে পড়লাম। তীর্থে এসে এটুকু কষ্টে কেউ ক্ষুণ্ণ হন নি, বোধ হয়। আমার ত ভালই লাগল।

পাশের পুরুষ-কামরাটি লম্বা দৌড়দার ঘর, একটু একটু কাঠের ঘের দিয়ে চার-পাঁচখানা ভাগ-করা। তাতেই কাঠের ছোট ছোট বেঞ্চ সাজিয়ে যাত্রীদের বসবার জায়গা। এত যাত্রীও কি উঠেছে তাতে! পেশোয়ারী কাবুলী থেকে রাজপুতানার সব শ্রেণীর সব জাতির লোককেই দেখে নিলাম সেদিন। শুধু পাগড়ীর পর পাগড়ী, কত বর্ণের, কত আকারের, আর কত ছাঁদের বাঁধনে বাঁধা সে শিরোভূষণগুলি!

আমাদের সাথীরা নিকটেই ছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও কাছে ছিলেন একদল মারাঠী। তাঁদের সঙ্গেও স্ত্রীলোক ছিল কিন্তু তাঁদের জন্ম কোন মেয়ে-গাড়ী বা ঠেলাঠেলির দরকার হয় নি; তাঁরা পূর্ব্বে উঠে বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলেন, তারপর ক্রমশ সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সরে এসে কোণে পড়ে গেছেন, মানুষকে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্ম কোন ঝগড়া বা হাতাহাতি নাই সেখানে।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এল। সবাই স্থির হয়ে স্থান দখল করে বসে'—পাছে আর কেউ উঠে পড়ে! এমন সময় একটু গোল উঠল—কোনো কুলীর সর্দার হোক্ বা রেলের ছোট-খাটো কেউ হোক্ দুজনে মিলে একজন রোগা লোককে আমাদের কামরার দুয়ারে এনে হাজির করলে। সবাই হাঁক পেড়ে উঠল, "আর জায়গা নেই, গাড়ী ভরে গেছে,"—কিন্তু সে সব চীৎকার গ্রাহ্য না করে তারা সেই রোগাকে ঠেলে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিলে! একজন বল্লে, "বেশীদূর নয়, এর ভাই বান্দীকুই-এ এসে ওকে নামিয়ে নেবে।"

আমাদের বাঙালীরা 'পুলিশ পুলিশ' করে চেঁচাচ্ছিলেন, তারা হাসতে হাসতে চলে গেল। গাড়ীও ষ্টেশন ছেড়ে দিলে।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। শীতের রাত্রি, মেঘ করে আকাশের আঁধার ও বাতাসের ঠাণ্ডাকে যেন জমাট করে তুলেছিল। গাড়ীতে গা মেলবার ঠাঁই নাই, তারি মধ্যে যিনি লগেজ বা বাক্সর উপর পা ছড়াতে পেয়েছেন, তিনি নিজের কৃতিত্বে প্রফুল্ল। ও পাশে সেই রোগীটা কম্বলমুড়ি দিয়ে কাঠের মেজেয় পড়ে আস্তে আস্তে কোঁথাচ্ছিল। ঘরশুদ্ধ সবাই তার উপর রুষ্ট, তার কাছের মুলতানী ছোক্‌রাটা লাঠির গুঁতায় ক্রমশ তাকে কোণ-ঠেসা

করে ফেল্লে। কোণের বেঞ্চে আমাদের পাড়ার রক্ষা বুড়ী বসেছিল, ছোঁয়া যাবার ভয়ে সে প্রথমে মুল্‌তানীর সঙ্গে কোঁদল পরে সেখানে পরাস্ত হয়ে অজ্ঞান শক্তিহীন রুগ্নের উপরই নানা উপায়ে রোষবর্ষণ স্থরু করলে। অন্য পাশ থেকেও তার মাথায় চুরুটের ছাই কমলালেবুর খোসা থেকে পালি তামাকের পিচ, সবই জমা হতে লাগল।

রাত্রি বেশী হয়ে উঠেছে, ঘুমে মাথা নুয়ে আসছে, হঠাৎ রক্ষা চেঁচিয়ে উঠল—"ড্যাক্‌রা আমার পোঁটলা বুচকী সব নোংরা করে দিলে!" ঘরখানায় সত্যই দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। রোগী তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান, কোন কথা বলতে পারছে না। আমাদের সঙ্গিনীরা বল্লেন, "সব কল্লা, আসল নষ্টামি!" মুল্‌তানী খোঁচা দিয়ে দেখতে লাগল। পেশোয়ারী সেই ময়লা জায়গার উপর দিয়েই নিজের প্রকাণ্ড বস্তা টেনে দূরে গিয়ে বসল, আর মথুরার আগরওয়ালা মত প্রকাশ করলেন, "ইস্‌কো হায়জাকা বেমারি হুয়া।"

কথাটা শুনেই আমাদের সংক্রামক-রোগ-ভীরু বাবুরা একসঙ্গে চম্‌কে উঠলেন। কলেরা কি আর কিছু—কেউ তার খোঁজ নেয় না, শুধু গোল্‌মাল আর ঠেলাঠেলি! পুরুষদের কি হবে এই ভয়ে আমাদের কুঠ্‌রীর মেয়েরা পর্দ্দা ফাঁক করে "ওগো, তোমরা এ ঘরে এসো" বলে ডাক্‌ দিতে লাগলেন। সবারি ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেই নিশ্চল অবসন্ন বস্তুটি কাপড়-ঢাকা-দেওয়া স্বয়ং মৃত্যু, আর সে এখনি লাফিয়ে উঠে যার-ঘাড়ে-খুসি লাফিয়ে পড়বে!

তারি মধ্যে যে লোকটা সব-চেয়ে সাহসী বা সব-চেয়ে মূর্খ, সবারি অনুরোধে পড়ে সে-ই রোগীটাকে ছুঁয়েছিল; তারপর ভয়ে হোক্‌ বা নির্ব্বুদ্ধিতায় হোক্‌ সে বলতে লাগল, "মানুষটা বেঁচে নেই!" কথাটা শুনেই সব হৈ-চৈ খানিকক্ষণের জন্য থেমে গেল। প্রকাণ্ড ঘরখানায় একটিমাত্র বাতি, তাতে উজ্জ্বলতার চেয়ে ছায়ার ভাগই বেশী। ভয়ে কি ভাবনায় জানি না, আমার মনটাও কেমন হয়ে গেল। ভাবলাম, কি আশ্চর্য্য, এতগুলি লোকের মধ্যে কেউ একবার কাছে গিয়ে দেখচে না যে লোকটা সত্যি মরল কি না? আমার পাশের গৃহিণীকে বল্লাম, "দিদি, বাবুকে বলাওনা, মানুষটা বেঁচে আছে কি না কাউকে দিয়ে দেখান্‌।"

"এত রাত্রে কোন্‌ জাতের মড়া—কে ছুঁতে যাবে? কার মরণ-পালক উঠেছে?"

এমনি কতকগুলা বিরক্তির সঙ্গে তিনিও আমার আক্কেল্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। আমি আর কিছু বল্লাম না, মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরের কাণ্ড শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম। তার বেশী আর করবই বা কি? আমি মেয়ে মানুষ—আমার ইচ্ছা ত আমার ক্ষমতার মধ্যে নয়!

সবাই অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে; আগ্রা ও মথুরার লোক কটা ত এমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে বোধ হয় পরের ষ্টেশনেই তারা নেমে যাবে! বাবুরাও "বাঁদিকুই" কোথায়, কতক্ষণে পৌছুবে, এই প্রশ্নে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ এমন সময় এপাশ থেকে পরিষ্কার হিন্দীতে উত্তর হল, "বাঁদীকুই

আস্‌তে এখনও দেরী আছে, সবাই স্থির হয়ে বসুন এখন।"

চেয়ে দেখি, আমাদের পাশের সেই মারাঠীদলের মধ্যে যে বয়স্ক লম্বা লোকটি চোখে চশমা এঁটে এতক্ষণ শুধু বই পড়ে যাচ্ছিলেন, তিনিই সে কথা বল্লেন। তার উত্তরে আমাদের কে একজন ভাঙ্গা হিন্দীতে বলে উঠলেন,—ততক্ষণ কি মড়া নিয়ে বসে থাক্‌তে হবে না কি?

তিনি এতক্ষণ বাবুর দিকে চেয়েছিলেন, এইবার একটু হেসে বাংলাতেই বল্লেন, "ব্যস্ত হবেন না, তারও উপায় করতে হবে। কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার হচ্ছে যে লোকটা বেঁচে আছে কি না।" বলে তিনি সঙ্গের লোকদের দিকে ফিরে তাঁদের সঙ্গে অজানা ভাষায় কি কথা বলতে লাগলেন। খানিক পরে গাড়ী একটা ষ্টেশনে পৌঁছুলো। বাবুরা ও হিন্দীভাষীরা সমস্বরে 'পুলিশ-পুলিশ' করে চেঁচালেও সে অন্ধকার আড্ডায় কোন তক্‌মাধারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। দু-একটা ছেঁড়া কাপড়-পরা লোক এসেছিল, কিন্তু কুলীর প্রয়োজন নাই শুনে প্রস্থান করলে। ইত্যবসরে ট্রেন চলতে লাগল।

গাড়ীর লোকেরা আবার অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। রক্ষা পালিয়ে এসে আমাদের ঘরে ঢুকছিল কিন্তু গৃহিণীরা তাকে পর্য্যন্ত আসতে দিলেন না, কেন না সেও হয়ত মড়া ছুঁয়েছে, দ্বিতীয়ত তার কাপড়-চোপড় ত নিশ্চয় কলেরার ময়লায় ছোঁয়াপড়া,—সুতরাং—

মুসল্‌মানী মেয়ে কটা ছেলে কোলে করে একপাশে সরে গেছল কিন্তু তাদের পুরুষেরা রাগে বিরক্তিতে এমন উদ্ধত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল যে রোগা বা সেই মৃত দেহটাকে এখনি তারা বাহিরে টেনে ফেলে দেয় আর কি! এ পাশ থেকে সেই ভদ্রলোকটি ডেকে ডেকে বল্‌ছিলেন, "বাঁদিকুই এল বলে, তোমরা কেউ গোল করো না, সেখানে পৌঁছে সব ঠিক্ হয়ে যাবে।" কিন্তু সে কথা কে শোনে? সে পাশ থেকে সরে সরে সকলে মাঝখানে জমা হয়ে এমন আড়াল্ করে ফেল্লে যে দেহটার কি হল আর আমরা দেখতে পেলাম না।

ঘরখানা জুড়ে একটা বিষম ব্যাপার চলছিল, অতগুলো লোক সব দাঁড়িয়ে উঠে বড় গলায় কথা কচ্চে, কে কার কথা শোনে, তারও ঠিক নাই!

আবার একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। ছোট মানে মুখ বাড়িয়ে তার ঘর-দুয়ার কি একটা আলোও দেখতে পাইনি। তখন একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে; আর শীত—কিম্বা ভয় ও উদ্বেগেও বুঝি—আমাদের বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমে গেছল। আমাদের নিজের পক্ষে এমন বিপদ আর কি হয়েছিল, বলুন, তবু মনে হচ্ছিল, এ রাত্রিটার বুঝি আর শেষ নাই, এ শীত যেন ভাঙ্‌বে না কখনও!

গাড়ী থেকে গলা বাহির করে কে চেঁচাচ্ছিল, "এ কোন্ ষ্টেশন?"

দূর থেকে কি-একটা উত্তর এল, তার সঙ্গে এরা আরও চেঁচিয়ে বল্লে, "এটা কি বাঁদীকুই?"

আবার একটা শব্দ শোনা গেল, তা হাঁ কি না বোঝাও গেল না, কিন্তু গাড়ীর লোকেরা শুনলে এই বাঁদীকুই। কারণ সেই কথাটাই তাদের প্রয়োজন ছিল!

তারপর গোল ও লোকের চঞ্চলতা এত বেড়ে উঠ্‌ল যে স্থির করতে পারলাম না, সেখানে কি হচ্চে। ৺স্বা লোকটি মানুষ ঠেলে ওধারে যাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বোরখা-ঢাকা মুসলমানী মেয়ে কটি রাস্তার উপর ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে আর তাদের প্রহরার হিসাবে পঞ্জাবী পুরুষদুটো এমনভাবে লাঠি বাগিয়ে প্রস্তুত যে শুধু ভদ্রতার শান্তির হিসাবেও সে ব্যূহ ভেদ করা দুষ্কর ব্যাপার!

তবু বুঝতে বাকি থাক্‌ল না যে তারা সেই লোকটাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিচ্চে। পেশোয়ারী আর সেই জাঠ-চাষা দুজন ধরাধরি করে তাকে দুয়ারের কাছে এনে ফেল্লে—বেশ বোঝা গেল। আমাদের বাবুরাও উৎসুকভাবে ঘাড় তুলে দেখছিলেন। মনে হল ভয়ের সঙ্গে তাঁদের মুখে বেদনারও আভাস দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আমারও প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হল, যদি মানুষটা বেঁচে থাকে? যদি এটা বাঁদিকুই না হয়? কি ভয়ানক কাণ্ড—ওরা এ করছে কি!—দিদির হাত চেপে ধরে বল্লাম, "তীর্থ করতে এসে এ কি সর্ব্বনাশ হচ্চে দিদি, বাবুকে বলাও না—মানুষটা যে যায়!"

দিদিও ভয় পেয়েছিলেন, বল্লেন, "আমি কি করব ভাই, বাবুকে ডেকে দেবে কে?"

ছেলে-পিলের মার এতে কি অকল্যাণ হচ্চে!"

তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। "ছাখ বোন, যা ভাল হয় কর।" বলে তিনি দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। পর্দ্দা তুলে আমি ডাকতে উদ্যত, এমন সময় ধপ্‌ করে শব্দ হল—তার পর খস্‌-খস্‌ ঘড়-ঘড়্‌, যেন কি গড়িয়ে একটু নীচে পড়ে গেল। সর্ব্বনাশ, তারা তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে! কে একজন বল্লে, "তারের ওপারে খাদ ছিল তা ত জানি না, হাত ফসকে পড়ে গেল।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বল্লে, "যাক্‌, কাল সকালে পুলিশ এসে সব ঠিক্‌ করে নেবে।"

আর বেশী কথা নয়, গাড়ী তখন চল্‌তে সুরু করেছে। বাবা, বুঝে নিন, এমন ঘটনায় মেয়েমানুষের মনে কি হয়? দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আমার যেন সেটুকুও শুখিয়ে গেল! চোখের সুমুখে এমন নির্দ্দয় কাণ্ড ঘটে যায়, বসে থেকে তার কোন উপায় পর্য্যন্ত করতে পারলাম না? নারী-জন্মটার উপর সেদিন কেমন ধিক্কার জন্মেছিল! আমার স্ত্রী-দেহটাকে কখনো কোন কারণে আমি ঘৃণা করিনি, কিন্তু সেদিন প্রথম বুঝলাম—যাক্‌। দিদি সেই কাবুলী মিন্সেটাকে হাজার গালি পাড়ছিলেন, আর আমার মনে হচ্ছিল, মিথ্যা, তাদের গালি দেওয়া ভুল। সামনে বসে আমাদের যে ঐ-সব ভদ্র আত্মীয়, তাঁরা সে মূর্খ জাঠ বা নিষ্ঠুর কাবুলীর চেয়ে কোন অংশে সহৃদয় নন্‌; সবাই মিলে চেষ্টা করলে তাদের ক্ষমতা কি যে এ কাজ

—শুধু বয়ে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী ঐ দুটো লোকের চেয়ে তাঁদেরি তা বেশী প্রাপ্য, কারণ তাঁরা শিক্ষিত, ভদ্র; ওঁদের ভয়ের মূর্ত্তি দেখে তারা আরও ভয় পেয়েছে; ওঁদের মনের ভাব অনুসরণ করেই তারা তাকে ফেলতে সাহস করেছে,—নিশ্চয়। আমাদের গৃহিণীরা "ভগবানের লীলায় এখানেই ওর মরণ লেখা ছিল" ইত্যাদি কথায় অদৃশ্য ভাগ্য-বেচারীকে টেনে এনে শেষ অপরাধী খাড়া করছিলেন; আমার কিছু ভাল লাগছিল না, আমি চুপ করে জানলার পাশে বসে রইলাম।

চোখ মেলে চিরে ফেল্লেও আঁধার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস, মাঝে মাঝে পাৎলা জলের কণা উড়ে মুখে লাগছিল। আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তকে 'অন্ধতামস' বলে যে নরকের বর্ণনা পড়েছি—বারবার আমার তাই মনে পড়তে লাগল।"

রমা একটু থামিলেন। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখেও তাঁহার মুখখানি এমন একটি উৎসাহের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত হইয়াছিল, যাহাতে বোধ হয় মরণই ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে! গুরুর মুখেও ঔৎসুক্যের স্তব্ধ ভাব! রমাকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এরি জন্য তুমি এত অনুতপ্ত হয়ে আছ মা?"

রমা চোখ মুদিয়া যেন কি স্মরণ করিতেছিলেন, তাঁহার কথায় চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "না, না, তা কেন হবে? তার জন্য অনুতাপ করবার তো কিছু নাই। সেদিন সেখানকার পঞ্চাশখানা নিষ্ঠুর হাতের সঙ্গে ভগবানের নিজের দুখানি করুণার বাহুও যে নেমে এসেছিল, বাবা! নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে তাঁর কাজ শেষ করে গেছলেন তিনিই—আর তাতেই আমাদের অতগুলো লোকের সমস্ত পাপ-তাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।"

পীড়িতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; ভয় পাইয়া গুরু বলিলেন, "কি মা, কি হল? কিছু—"

"না বাবা, ভালই আছি আমি, সে কথা মনে হলে মরণের অসহ্য কষ্টেও আমি সুখ পাই—তাই—" বলিয়া চোখের জলধারা বালিশে মুছিয়া রমা বলিলেন, "কিছুই ভুলিনি, অথচ মনে হচ্চে আর ঠিক্-ঠিক্ বলতে পারব না। তার পরের ঘটনা, হাঁ, সব চুকে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের মুরুব্বি বাবু এ-ঘরে উঁকি দিয়ে বল্লেন, "কোন ভয় নেই, তোমরা সব ভাল আছ ত?"

এবার দিদি একটু রাগের সঙ্গে গর্জ্জন করে বল্লেন, "সব্বাই ভাল আছে আর থাকবেও, এখন তোমরা তো সে অনাথ মানুষটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এলে, যাও, ঠাণ্ডা হয়ে বসো গে।"

বিচলিতভাবে বাবু বলিলেন, "সে কি-রকম কথা হল? আমরা ফেলে দিলাম কিসে?"

দিদি সে কথায় কান্ না দিয়া বকিয়া চলিলেন, "মরা কি জ্যান্ত, তার ঠিক্ নেই—এই আঁধার রাত্রি, কেউ কোথাও নেই—অমন রুগ্ন,—হলই বা কলেরা, নিজেদের কারো হলে কি হত? কি বলে কেমন করে তাকে ফেলে দিলে?" দিদিকে

আমার তখন প্রণাম করবার ইচ্ছা হচ্ছিল। দিদির কথায় বাবুর মুখ শুখিয়ে উঠল।

একটু নীরব থেকে তিনি বল্লেন, "কোথাকার কে, তার জন্য আমি ঐ পঞ্জাবী গোঁয়ারদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে যাব নাকি? খুব মেয়েলী শাস্তর বার করেছ ত! কিন্তু ধৈর্য্য ধর, চেয়ে দেখনি তাই অত চেঁচাচ্ছ, সে একলা ভাগাড়ে যায় নি ত—তার সঙ্গে আরও একজন জলজ্যান্ত মানুষও নেমে গেল, দেখ্‌লে না?"

"কখন্—কে?" আমার মনের প্রশ্নটা দিদি ছাড়া আরও অনেকে উচ্চারণ করলে।

"চিনিনে, সেই যে লোকটা বাংলাতেও কথা কইতে পারে—ওদিকে তাকে নামাচ্ছিল সেই সময়ে এ পাশ দিয়ে সেও নেমে গেছে—আমি দেখেছি।" কথা কটা মুখে নিয়েই বাবু পিছিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বস্‌লেন।

"মাগো, সে আবার কে? অত আঁধারে নামল কি করে?" গাড়ীর গৃহিণীরা সভয় বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাহিলেন। আমার কিন্তু তখন—বাবা, লোকটির মুখ বা চেহারা কিছুই স্মরণ হচ্ছিল না। ভাল করে দেখিইনি হয় তো,—নাটক-নভেলে বা বিদেশী উপদেশের বই-এ যেমন সব ঘটনা পড়া যায়, অল্পবয়সী ছেলেদের বা মেয়ে-মানুষের মন যে-সব কথায় এক মুহূর্ত্তে ছল্‌-ছল্‌ করে ওঠে, এ যে চাক্ষুষ তাই!—একটু আগে একটা অসম্ভব রকম নিষ্ঠুরতা দেখে যেমন চম্‌কে গেছলাম, তারপর হঠাৎ তেমনি আশ্চর্য্য তেমনি নূতন—আঃ, কি নাম দেব তার? যা ঘটে সব কটারি বিপরীত সে যে! খালি মনে হচ্ছিল, মানুষ নয় মানুষ নয়।

সব চুপ হয়ে আছে তখন; একটা বড় রকম ধাক্কা পেয়ে পাশের কামরায় "বম্বে বারোদা মধ্যভারত,—রাজপুতানা ও মালবেরা" সব স্থির হয়ে বসেছিল। তাদের গল্পগুজব সব যেন থেমে গেছে, আমি আমার পুঁটুলিটি কোলে করে বাইরের আঁধার-পানে চেয়ে। একটু একটু তন্দ্রার ভাব আসছিল, আর চম্‌কে ভেঙ্গে যাচ্ছিল; বুকের মধ্যে রক্ত যেন ছল্‌কে উঠ্‌ছিল, আর কি-একটা মধুর ভাব—যেন সুস্বপ্নের মত,—বাবা, ক্ষণে ক্ষণে আমার মনে হচ্ছিল,…আমি আজ দেখেছি, আমার নারায়ণ—আমার হরি, আমার দেবতা! আজ আমি এই ছার নয়নে তাঁরই দর্শন পেয়েছি। তিনি এসেছিলেন, আমাদের পাশে সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন,—তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁর অঙ্গের বাতাস এই গাড়ী-ভরা লোকের গায়ে লেগেছে,—যত অপরাধ করুক—তারা আজ পবিত্র, তাদের সঙ্গে আমিও ধন্য, আমার তীর্থযাত্রা আজ সার্থক!

মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখলাম, তাঁর আসনখানি শূন্য। সাধ হচ্ছিল, নামবার পূর্ব্বে যদি একবার ঐ কাঠের তক্তাটুকু মাথায় কপালে ছুঁইয়ে যেতে পারি! গাড়ীখানার উপরই যেন আমার মায়া জড়িয়ে এল, সেখান থেকে এখনি নামতে হবে ভেবে কান্না পাচ্ছিল। গাড়ী-ভরা লোক, ঐ নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর কটা, সবারি উপর আমার সমান

উপলক্ষেই ত আমার গোলোকের দেবতা আজ মাটীর ধরায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন! হ্যাঁ, দেবতা,—আমি দেখেছি—তাঁকেই দেখেছি!"

"কি বলছ, মা?"

"আমি কি ভুল বুঝেছি বাবা? সত্য বলুন।"

গুরু নিশ্চলভাবে শিষ্যার কথা শুনিতে ছিলেন, তাঁহারও চোখের তারায় মোহের বিহ্বল ভাব! প্রশ্ন শুনিয়া মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "যা বল্‌ছিলে এতক্ষণ, তার পরে আবার এ প্রশ্ন কেন রমা?"

"কি জানি বাবা, তাঁর খেলার বিশেষত্ব এইখানেই। তিনি হাত বাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যাকে দেবেন, সে যে হাতে হাতে তা পায় না! এই খুঁজে মরা, ভুল বোঝা, হারিয়ে যাওয়া, ঘোর-ফেরের পাকে ফেলে মানুষকে তিনি চিরটা কাল কাঁদিয়ে আস্‌ছেন।"

রমার মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া আবার দুইটি জলধারা নামিল। সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া গুরু বলিলেন, "খামখা প্রশ্ন কর মা, তোমায় শেখাবার মত আমার কিছুই নাই। কিন্তু তার পর? সে রোগী বা মারাঠী ভদ্রলোকটির খোঁজ পাওয়া যায় নি বোধ হয়? বলতে পারবে কি, না, শ্রান্তি বোধ হচ্চে? থাক্—"

একটু জোর হাসির সহিত রমা বলিলেন, "থাকবে কেন? এটুকু না বল্লে ত কিছুই বলা হল না। যা বল্লাম, সে তো শুধু উপলক্ষ গল্প, শেষ যার সঙ্গে আমার নিজের কথা জড়ানো,— তা আপনাকে না বল্লে চলবে কেন? শুনুন, কতক্ষণ, বোধ হয়, অনেকক্ষণ পরে গাড়ী বেশ একটা জাঁকালো ষ্টেশনে থামল। সে দেশের ধরণে তৈরি ভারী পাথরের মোটা থামওয়ালা প্রকাণ্ড ষ্টেশন। আলো বাতি লোকজন, যে-সব জায়গা ছেড়ে এলাম সন্ধ্যার পর থেকে—তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। খানিক পরে শুনলাম, এই বাঁদিকুই।

নামটা শুনে যেন সবাই একটু চম্‌কে গেল। চুপ, চুপ! বাইরের গোলের সঙ্গে কেউ আপনার আওয়াজ্ মেলালো না! সবাই জেগে আছে—কিন্তু অনেকেই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখাতে লাগল। তা হোক্ তবু তারা যা এড়াতে চাচ্ছিল তার ভুল হল না! একটু পরেই দেখা গেল—একজন হিন্দুস্থানী লোক প্রায় প্রত্যেক কামরার দুয়ারে এসে কি জিজ্ঞাসা করছে। আমাদের ঘরের কাছে এসেও সে ঘরে কোন রোগী আছে কি না প্রশ্ন করলে। তখন সবারি যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল—এমনি বিরক্তভাবে ধমক্ দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের বাবুরাই তার অগ্রণী, তাঁদের গুরুগম্ভীর আকৃতি ও চেন-ঘড়ির ঝক্‌মকে আভার চমকে দিরুক্তি না করে লোকটি সরে গেল।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে উঠছিল, দিদি বল্লেন, "মাগো, সবারি যেন ভীমরতি হয়েছে! মানুষটার যে কি হল—সে কথাটা ওকে বল্লেও না! আমার ইচ্ছে হচ্চে—"

ইচ্ছাটা তাঁর একার নয়। কিন্তু যাদের যাদের প্রাণে সে প্রবল ইচ্ছা দুয়ার ভাঙ্গবার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় তারা সব কটিই বাংলা দেশের রুদ্ধঘরের বদ্ধপাখী, ওকে ডেকে সাড়া দিতে গেলে এখনি

তাদের ঘরে বাইরে—যাক্, সে খুব বেশী কথা নয়।

এমনি সময় একজন ডাকপিয়ন গাড়ীর কাছ দিয়ে কি নাম ধরে ডেকে যাচ্ছিল; শুনে একজন মারাঠী উঠে বল্লেন, "টেলিগ্রাফ কি?"

হাত বাড়িয়ে খাম তুলে পিয়ন বল্লে, "আপনিই কি—"

"হ্যাঁ, দাও।" তারপর সেখানা পড়ে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের সঙ্গীদের কি বলে তিনি প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়লেন। আমার মনে চমক্ লাগ্‌ল, এ তাঁরই টেলিগ্রাফ্ নয় ত!

আবার সেই গরীব লোকটি কাছে এসে উপস্থিত, "আমায় ডাকলেন, হুজুর?"

"হ্যাঁ, নারায়ণা ষ্টেশন জানো?"

আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্লে, "জানি।"

"সেইখানে তোমার ভাই আছে, এই ডাকগাড়ীতে উঠে তুমি সেখানে চলে যাও।"

"ডাকগাড়ীতে? নারায়ণা? সে সেখানে নামল কেন, মালিক?"

"তার অসুখ বেশী হয়েছিল। যাও, আর দেরি নয়,—ট্রেন ছেড়ে যাবে।"

"এখন—এতরাত্রে—?"

"হ্যাঁ, ঐ যে গাড়ী দাঁড়িয়ে—যাও। হ্যাঁ, তোমার কাছে ভাড়ার পয়সা নেই বোধ হয়?" বল্‌তে বল্‌তে লোকটাকে প্রায় টেনে নিয়ে তিনি অন্ধকারে চলে গেলেন।

ষ্টেশনটায় গাড়ী-বদলের হাঙ্গাম ছিল, অনেক চাষাভূষো নেমে গেল, দু-চারজন উঠ্‌লও। আমাদের সাম্‌নেই ফিরতি ডাকগাড়ী ছুটে গেল। অনেকক্ষণ পরে চুরুট মুখে লাঠী ঘোরাতে ঘোরাতে সেই মারাঠী ভদ্রলোক ফিরে এলেন। এ গাড়ীও তখন ছেড়ে যাচ্ছে।

এতক্ষণ দেখেছি আমাদের সাথী পুরুষেরা গাড়ীর অন্য আরোহীদের সম্বন্ধে নির্ব্বিকার ছিলেন; নিজেদের মধ্যে ছাড়া আর কারো সঙ্গে আলাপও করেননি। এবার কিন্তু স্বয়ং বড়বাবু মহাশয় এগিয়ে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়ালেন। ইংরাজিতে কি কি কথা হল, হাসিমুখে মারাঠী তার উত্তর দিলেন। তার পর আমাদের শিকের কাপড় তুলে হাস্‌তে হাস্‌তে বাবু বল্লেন, "ওগো শুনলে? তোমাদের সে পুষ্যিপুত্তুরটি বেঁচে আছে। তার ভাই সেখানে চলে গেল।"

তিনি যাচ্ছিলেন,—দিদি তাঁর গায়ের কাপড় চেপে ধরে বল্লেন, "শোন, শোন, আর কিছু খপর পেলে? ওরা আরও সব কি বল্‌ছিল তোমায়?"

"বেশী আর কি! বল্লে, বাবু তার দিয়েছেন, তার ভাইকে পাঠাতে।"

"বাবু! বাবু আবার কে এল এর মধ্যে?"

"কি জানি, বাবুসাহেবই ত বল্লে। বড় লোক হলে ওরা ও বাবুই বলে বোধ হয়। সে-ই খরচ-পত্র রেখে গেছল শুন্‌লাম, মানুষটা ভাল বটে।"

"যা হোক এতক্ষণে তার ভালমানুষীর একজন সাক্ষী পাওয়া গেল! তুমি না বললে তার সব ভালটুকু পাঁকে পোঁতা থেকে যেত!" দিদি খুব হাস্‌ছিলেন, বাবুও একটু হেসে বল্লেন, "তোমরা রাগ করছিলে বটে কিন্তু আমারও ভারী ভাবনা হয়েছিল, জেনো। উপায় ছিল না—কি করব—তাই।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

দেশী ছবির মেলা *

এ-বছর দেশী ছবির মেলায় গিয়ে, এমন-কতকগুলি বিষয় চোখে পড়েছে, আর কোন বারে যা দেখতে পাইনি। বাঙ্গালীর প্রাণে দেশী ছবির রস যে ক্রমশ রীতিমত জমে আসছে, এবারে তের-চোদ্দ জন নতুন পটুয়ার দেখা পেয়ে ভালরকমেই সেটা বোঝা গেল। অবিশ্যি, এই নতুন দলের সবাই যে রং-রেখার খেলায় খুব-বেশী কারিকরি জাহির করতে পেরেছেন, তা নয়; হয়ত তাঁদের সকলকার ভিতরেই অল্পবিস্তর খুঁৎ আছে। কিন্তু এ-সব খুঁৎ আমোলে আনতে আমাদের মন সরছে না; কেননা, এই নূতন সাধকদের আগমনে মেলার মধ্যে এমন-একটু উৎসাহ, তারুণ্য ও জীবন সঞ্চার করেছিল, যার জন্যে আমরা এঁদের ভ্রম-প্রমাদ হাসিমুখেই এড়িয়ে যেতে পারি!

দেশী ছবিতে নিসর্গের শোভা বড়-একটা দেখা যায় না বলে অনেককে অভিযোগ করতে শুনেছি। আর এটাও ঠিক যে, এদেশী শিল্পীরা এতদিন নিছক নিসর্গ-চিত্র নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামান-নি। তাই অন্য-অন্য বারের মেলায় নিসর্গ-পট দেখবার সুযোগ আমরা খুবই কম পেয়েছি। কিন্তু এবারের মেলায় গিয়ে দেখি, নিসর্গ-চিত্রের সংখ্যা গুণ্‌তিতে অনেকগুলি। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার ও মুকুলচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এবারে পটের উপরে বহিঃপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁদের আঁকা ছবিগুলির কোনখানিই মাছিমারা কেরাণীর মত যেমন-দেখা তেমনি-আঁকা নয়—এঁরা জড়কে চিত্রলোকে এনে, শিল্প-তন্ত্রের মন্ত্র পড়ে জ্যান্ত করে তুলেছেন এবং আকাশ-পৃথিবী, পাহাড়-প্রান্তর, নদ-নদী ও তরু-লতার মধ্যে বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত দিতে সবিশেষ চেষ্টা করেছেন। এ-সব ছবির ভিতর দিয়ে প্রকৃতিকে চেনবার যতটা সুবিধা হয়, আসল নিসর্গ-দৃশ্য দেখলে ততটা হবে না—কারণ, বেশীরভাগ লোকেরই তেমন দেখবার মত চোখ নেই।

অবনীন্দ্রনাথের দুখানি নিসর্গ-পটে আমরা তুলির যে অবাক-করা কায়দা দেখেছি, তা কখনো ভুলব না;—এত-অল্প রেখায় ও এত-কম রঙে যে এত-বেশী ভাব জাগানো যায়, না-দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত। গগনেন্দ্রনাথের রাঁচির প্রাকৃতিক দৃশ্যেও ভাবের বিচিত্রতা এবং আলোক-ছায়ার মাধুরী দেখে মোহিত হয়ে যেতে হয়।

এবারকার মেলার আর-একটি বিশেষত্ব, গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র। বছর-দুই আগে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা খানকয়েক ব্যঙ্গচিত্র এই মেলাতেই দেখেছিলুম, বোধহয়। সে-হিসাবে এবারকার ব্যঙ্গচিত্রগুলি একেবারে আন্‌কোরা নূতন না-হলেও, আর-সব দিক দিয়ে এগুলি অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র। গগনেন্দ্র-

* কলিকাতার ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক প্রাচ্য-চিত্রকলা-প্রদর্শনী।



'ফাল্গুনীর ছবি'

অন্ধ বাউল

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত



'ফাল্গুনীর ছবি'

দোদুল দোলা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

নাথের ব্যঙ্গচিত্রের বিশেষত্বের কথা কিছুদিন আগে 'ভারতী'তেই আমরা বিস্তৃতভাবে বলেছি—সুতরাং এখানে আর-কিছু না-বললেও চলবে।

সুধু গগনেন্দ্রনাথের নয়—তাঁর এক শিষ্যও এবারে সতেরোখানি ব্যঙ্গের ছবি মেলাতে পাঠিয়েছেন। এই নূতন ও তরুণ শিল্পীর নাম শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওস্তাদ-পটুয়া গগনেন্দ্রনাথের ছবির ভিতরে যেমন ভাবের গভীরতা ও রেখার আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল দেখা যায়, এই নবীন শিল্পীর কাছ থেকে যদিও ততটা আশা করা যায় না, তবু এ-কথা বলতে হবে যে, ব্যঙ্গচিত্রে গোড়া থেকেই দক্ষ হাত ও তীক্ষ্ণ চক্ষু নিয়ে ইনি আসরে নেমেছেন; ভবিষ্যতে ইনি যে খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট হবেন, বর্ত্তমানে তিনি তা ভালমতেই প্রতিপন্ন করতে পেরেছেন;—কারণ, তাঁর ছবিগুলির হাসিখুসি ও রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে বেশ-একটি টাট্‌কা ভাব ও মৌলিকতা আছে।

* *
*

বাঙ্গলা চিত্রকলার বৈচিত্র্য ক্রমেই যে বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রকৃতির সদর-অন্দরের হাসি আর অশ্রু, আলো আর ছায়া, হাল্কা আর ভারি সকলরকম ভাবের আভাসই এখনকার চিত্রকরদের তুলির লিখনে জেগে উঠছে। সমঝদার শুনিয়ে পান না বলে রসিক ধ্রুপদিয়ার বিচিত্র গানের খেলা অনেক আসরেই বন্ধ হয়ে যায়। সমঝদার পড়ুয়ার

কালি শুকিয়ে গেছে,—এমন-কি মনের খেদে অনেকে যে মরতেও ডরান-নি—সাহিত্যের ইতিহাসে সে প্রমাণও আছে! বাঙ্গালী শিল্পীরাও এদেশে বড়-বেশী সমঝদার রসিক পান-নি; কিন্তু এই অনাদর ও অবহেলায় দরুণ তাঁরা যে ভেঙ্গে না-পড়ে আরো জোর-উদ্যমে শিল্পলক্ষ্মীর চরণ আঁকড়ে ধরেছেন, এতেই তাঁদের অসীম প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দেশের এককোণে বসে অবনীন্দ্রনাথ কলাকমলার আরতির জন্যে যে ছোট্ট দীপটির শীষ উস্‌কে দিয়েছিলেন, তার আলো আর মিট্‌মিটে হয়ে সুধু সেই ঘরের দেওয়ালেই ঘুমন্ত ছায়াকে জাগিয়ে তোলে না,—শিল্পীর হাতের মায়াস্পর্শ পেয়ে সে আলো আজ প্রাতঃসন্ধ্যার উদয়-তোরণে সদ্যজাগ্রৎ সূর্য্যকরের মত দীপ্ত হয়ে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, এদেশকে তবু এখনো বারংবার ডাকাডাকি করতে হচ্ছে—'অন্ধ জাগো, অন্ধ জাগো!' কিন্তু, তবু অন্ধ জাগে না; রূপসায়রের ধারে বসে মাথায় হাত দিয়ে সে ভাবে তার 'কিবা রাত্র, কিবা দিন'!

এবারের মেলায় আর-একটি জিনিষ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে। দেশীশিল্পের পুনর্জন্মের সময়ে,—সে বড় বেশীদিনের কথা নয়,—যে-সব ছবি আঁকা হোত তার পোনেরোআনাই ছিল হয় পৌরাণিক, নয় ঐতিহাসিক। তাদের ভিতরে একালের কথা, ভাব, দৃশ্য বা আদর্শের একটা মস্ত অভাব ছিল। সে ছবিগুলি খুব



'ফাল্গুনীর ছবি'
শীত
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত

কিন্তু তাদের ভিতরে একাল তার প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনতে পেত না। এখন এই বড় অভাবটি পূর্ণ হয়েছে। আজকাল দেশীশিল্পে একালের সুর যথেষ্ট পাওয়া যায়—এমন-কি শিল্পীরা এখন দেশের সাময়িক ছবি পর্য্যন্ত আঁকতে সুরু করেছেন, সমাজের সমস্যাগুলিকেও মূর্ত্তিমান করে তুলতে তাঁরা আর পিছ্‌পাও নন। এবারের প্রদর্শনীতে এমনিতর আধুনিক ছবি ছিল অনেক,—তার উপরে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, নৈসর্গিক এবং কাল্পনিক ও বাস্তবিক ছবির হাট নিয়ে এবারকার মেলাটি এমনি নিখুঁত হয়েছিল যে, কিছুতেই কেউ ছুৎ ধরে খুঁৎখুঁৎ করবার যুৎ পান-নি!

অনেকে বলতেন, "দেশী ছবি এত ছোট হয় কেন?"—শিল্পীরা দেখছি এবারে তাঁদেরও মুখবন্ধ করেছেন! এমন বড়বড়

দেশীচিত্রের পটও আর-কোনবারে এত-বেশী ছিল না। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল—এই দুই গুরু-শিষ্যে একসঙ্গে "ঋতুরাজ" নামে যে প্রকাণ্ড পটখানি এঁকেছেন, তা দেখে সকলেই বুঝেছেন, রূপে-গুণে আকারে-প্রকারে দেশী ছবিও কত সুন্দর ও বৃহৎ হোতে পারে! লম্বায়-চওড়ায় মস্তবড় না-হলে যে-সব 'সর্ট্-সাইটেড্' ক্রিটিক কিছু বড়-করে দেখতে পারেন না, এবার মেলায় গিয়ে তাঁরাও টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারেন-নি!

* *
*

মেলায় ঢুকেই সামনে একখানি বড় আকারের ছবি দেখে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ-ছবিখানির নাম হচ্ছে 'পথের সাথী'—এঁকেছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। * একটি সাঁওতাল যুবা বাঁশী বাজাতে-বাজাতে পথ দিয়ে চলেছে, পাশে তার তরুণী প্রেয়সী।—ব্যস্, এত-বড় ছবিখানিতে হ-য-ব-র-ল আর কিছু নেই! চারিদিক ধূ-ধূ করছে;—মূর্ত্তিদুটির সামনে পথের ছোট্ট রেখাটি একটুখানি বেঁকে সেই সীমাহীনতায় ডুব দিয়ে কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। এরি-মধ্যে এই দুটি মূর্ত্তিকে মানিয়েছে ঠিক যেন প্রকৃতির বুকের দুলালের মত। সেই নিরিবিলি শূন্যতার মাঝখানে এদের দুজনকে দেখলে মনে হয়, এদের আর কেউ নেই, এ দুনিয়ায় এরা সুধু এ-ওর মুখ চেয়েই সংসারের পথ দিয়ে আপনমনে হেঁটে চলেছে। মূর্ত্তিদুটি দর্শকের দিকে পিছন ফিরে আছে বটে,—কিন্তু তাতে-করে তাদের ভাবমাধুর্য্য নষ্ট না-হয়ে আরো-বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুবতীর এক পায়ে পাঁয়জোর, আর এক পায়ের আঙ্গুলে একটি চুট্‌কী; এথেকে তার সরল প্রাণের নারীসুলভ চপল ভাবটি খুব চমৎকার ফুটেছে। যুবক তার প্রেয়সীকে শুনিয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে—আর চারিদিকের স্তব্ধতার ঘুম ভাঙ্গিয়ে বাঁশীতে যে মেঠো সুরটি বেজে উঠেছে, তার সঙ্গিনীর সঙ্গে আমরাও যেন তা প্রাণের কাণে শুনতে পাচ্ছি!

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ বা নন্দলাল প্রভৃতি পাকা শিল্পীদের রপ্ত হাতের এর-চেয়ে ঢের ভাল ছবি দেখলেও আমাদের তাক্ লেগে যেত না; কেননা, তাঁদের কাছ থেকে একেবারে পয়লা নম্বরের জিনিষ আদায় করতে আমাদের মন আগে-থাকতেই তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আর-সবাইকে জানিনা বলে তাঁরা যা দেন আমরা মুখ বুঁজে তাই-ই নি—খুব উঁচুদরের কিছু তাঁদের কাছ থেকে চাই-ও না, পাই-ও না—অমনি পাঁচা-পাঁচি মাঝামাঝি হলেই তুষ্ট হয়ে যাই। তাই, এবারকার মেলার আর-সব ছবির চেয়ে এই ছবিখানিই আমাদের প্রাণে বিস্ময়ের একটি চমক লাগিয়ে দিয়েছে—নবীন শিল্পীর তুলিতে যে এত জোর ছিল, তা ত আমরা

* "পথের সাথী"র প্রতিলিপি 'ভারতী'র মুখপত্রে দেওয়া গেল। অতবড় ছবির প্রতিলিপি এত ছোট হওয়াতে আসলের রস অবশ্য নকলে জমে-নি; তবু দুধের স্বাদ যাঁরা ঘোলে মেটাতে চান, ছবিখানি তাঁদের ভালই লাগবে।

জানতুম না! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের ‘শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা” এবং ‘বসন্ত’ নামে ছবিদুখানিও সকলকার মনের মত হয়েছে।

মেলার সব ছবির বর্ণনা বা নাম করা এখানে পোষাবে না। তবে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ‘ফাল্গুনী’র ছবিগুলি আমাদের খুবই ভাল লাগল। তাঁর আঁকা আরো-কয়খানি ছবি এই মেলার সার্থকতা বাড়িয়েছে, যদিও সেগুলির প্রায় সব-ক-খানিই পুরাণো। তাঁর ছবিগুলি দেখলেই শিল্পীকে চেনা যায়—এমন বাঁধা ষ্টাইল খুব কম আর্টিষ্টেরই আছে। অবনীন্দ্রনাথের মত রং ফলাবার পটুতাও তাঁর আর কোন শিষ্যের কাজে দেখলুম না,—এ রং যে ছবির গায়ে লেপা রং, হাজার খুঁটিয়ে দেখলেও তা বোঝা যায় না;—ফোট-ফোট ফুলের পাপড়ীতে ধীরে ধীরে ভিতর হোতে যেমন আপনা-আপনি রং ধরে,—এ রং ছবির ভিতর থেকে তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে ওঠে!

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর “কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন” আর-একখানি চমৎকার ছবি। শুধু চমৎকার বললেই এ ছবির সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয় না—কারণ পৃথিবীর খুব বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ চিত্রের সঙ্গে সমশ্রেণীতেই অনায়াসে এ ছবিখানির নাম করা যেতে পারে। তাঁর “নাচে”র ছবিখানিও অপূর্ব্ব। এটি একটি নৃত্যচপলা দেবদাসীর মূর্ত্তি—তার বেশ-ভূষা ও সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে গতির লীলা বয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দের আঁকা রবীন্দ্র-নাথের ছবি প্রদর্শনীর আর-একখানি অবশ্য-উল্লেখ্য চিত্র। তাঁর হাতের নক্সাগুলিও বাঙ্গলাদেশের শিল্পে একটি নতুন ধারা এনেছে।

এবারে আরো-বিস্তর উঁচুদরের ছবি দেখলুম; সেইসঙ্গে আধুনিক ভাস্করের গড়া কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তিও এই ছবির হাটে বৈচিত্র্যের সঞ্চার করাতে, এই “দেশী ছবির মেলা” সকল দিক দিয়েই সার্থক হয়ে উঠেছিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কোরিয়ার কবিতা

ভগবানের চিড়িয়াখানা

(ফোঃ লোন্)

কহিল কুকুর দূর হ’তে এক সিংহে হেরে,—
“আমি করি অশ্রদ্ধা এরে।”
—“কি রে! তিরিক্ষি! কারণটা কি?” পুছে কাঠবিড়ালি।
—“মেয়েলি-ধাঁচায় চুল রাখে, ছাখ্,—ভাবন্ খালি!
(ছি, ছি) সিংহের জাত মেয়েলি নেহাৎ,—জান্লি, ক্ষুদ্র!
ন্যাড়া-মাথা নেড়ি কুকুরের দল মর্দ্দ শুধু!”

* * * *

হাড়গিলা বলে—নাচে-মশ্‌গুল্‌ ময়ূরে দেখে,—
"এর প্রতি কভু শ্রদ্ধা টেঁকে ?"
—"ইস্‌! কেন ? শুনি !" পুছে টুন্‌টুনি—ছিব্‌লে পাখী।
—"অশ্লীল নাচ—কুভাবের আঁচ,—বুঝিস্‌ তা' কি ?
(ওযে) ঠোঁটে করে' চাপে ব্যাং-খোর সাপে,—নোংরা অতি ;
কুঁড়োজালি নেই মোর মতো, নেই ধর্ম্মে মতি!"

* * * *

কহে উল্লুক হুকু হুকু-রবে ভুবন ভরি'—
"কোকিলে ?—আমি না শ্রদ্ধা করি।"
পুছে কাণা-মাছি "অপরাধী পিক কী অপরাধে ?"
ডিগ্‌বাজী খেয়ে উল্লুক কহে "চটি কি সাধে ?—
(ওর) নাম হ'ল করে' মোদেরি নকল,—জানো তো,—তবু,—
ঢং করে' বলা হয় 'কুহু', 'হুকু' না বলে কভু!"

জলৌকা ও মহীলতা

(হ্বাং-হো-ফো-লিং)

কোরিয়ার কেঁচো কেওকেটা হ'ল
জাপানী জোঁকের সঙ্গ করে' ;
কোরিয়ার বুক কুরিয়া গড়িল
নিজ মনুমেণ্ট্‌ টঙ্ক করে' !
সে মনুমেণ্টে চড়িয়া, দম্ভে
ফণা-ধরা-ছাঁদে হেলায় গ্রীবা ;
ধরাখানা বুঝি সরার মতন
ভাখে সে,—আ মরি ! ভঙ্গী কিবা !
জাপানী জোঁকেরা তারিফ করিছে
কহিছে "কেষ্ট-বিষ্টু তুমি,
তোমায় পয়দা করিয়া কেন না

জোঁকের বন্ধু তুমি কেঁচোরাজ !
তোমার তুলনা নাই ভুবনে,
জোঁকের চরম বিদ্যা আমরা
দানিব তোমায় করেছি মনে।
কেঁচোর অঙ্গে কেঁচো বসাইব
ওগো অনুপম ! নকল-জোঁক !
বিস্ময়ে হবে সুবিস্ফারিত
কোরিয়ার আধ-মুদিত চোখ।"
কেঁচো বলে "এঁহে, না না, তা' তা' হেঁ হেঁ,
ভবদীয়া ভাষা মিষ্ট ভারি,
কদর কে বোঝে তোমরা নহিলে ?

লীলা-ছলে বল 'বন্ধু' কেবল,
গোলাম যে মোরা জানি সে কথা ;
কেঁচো-মাটি মোর কেল্লা হইবে
পদধুলি যদি দাও একদা।
হলুদিয়া জেঁাক ! বলদিয়া জেঁাক !
শোনো গো আমার মিনতি শোনো,
চীনে জেঁাক আর ছিনে জেঁাক ওগো
করজোড়ে করি নিমন্ত্রণ।"
টকাস্ করিয়া উঠিল গো-জেঁাক,—
সেঁটে ধরে যারা গোরুর বাঁটে,—
"কোরিয়ার কোনো পোকা কি মাকড়
জুটিয়োনা যেন মোদের নাটে।"
কাচুমাচু কেঁচো কেঁচোতর হ'য়ে
বলে "না, না ;—তবে গুটি-পোকারে
বলেছিনু দুটো তুঁত-পাতা খেতে
বল যদি, দিই হাঁকিয়ে তারে।"
"এখনি, এখনি !" জাপানী জেঁাকেরা
বলিয়া উঠিল সমস্বরে—
"রক্ত না পিয়ে রাঙা ডানা যার
গজায়, তারে কি ঢোকায় ঘরে ?"

স্পষ্ট

(ফোঃ লোম্)

না বুঝি কী বলে পিক, কী যে বলে শুক ;
বুঝি শুধু ব'সে ব'সে ছাতু-কলা খায়।
উড়িয়ে দে পাখীগুলো, শেয়াল ডাকুক,
"ক্যা হুয়া" সুস্পষ্ট কথা,—মানে বোঝা যায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপদেশের তাড়স্

(গল্প)

ব্যাপারটা খুবই সামান্ত, কিন্তু তার হুল-ফোটানোর দাগ এখনো আমার মনের উপর দগ্-দগ্ করচে।

এন্‌জিনিয়ারিং কালেজ থেকে বেরিয়েই এক চাকুরি পেলুম—বিদেশে। একটা নতুন রেলওয়ে-লাইন খোলা হচ্ছিল, তারই একটা কাজ।

আমি খাঁটি সহুরে ছেলে ; এ-পর্য্যন্ত এক শিবপুর ছাড়া বিদেশ কাকে বলে জানিনা। বিদেশের নামে উৎসাহে বুকটা যেমন লাফিয়ে উঠল, তেমনি আবার ভিতরে-ভিতরে কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ও করতে লাগল। অজানার প্রতি মানুষের যেমন টানও আছে তেমনি ভয়ও আছে। ঐ দুটো দৈত্যকে বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে আমি বাড়ি-ছেড়ে রওনা হলুম।

রেলগাড়িতে অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখলুম। তার মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ। আমি তাঁকে চিনিনা; কিন্তু আমি গাড়িতে উঠতেই তিনি বলে উঠলেন—"এস ভাই, এস!"—বলে আমার হাত-ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে দিলেন। লোকটি বোধ হয় ঘটক হবেন। কারণ নানারকম কৌশলে তিনি কেবলই এই খবরটা জানতে চাইছিলেন যে আমি-লোকটা বিবাহিত কি-না। যেমন ফাঁস হয়ে গেল যে আমার বিয়ের ফুল তখনো ফোটেনি, অমনি আমার কানের পাশে ঐ মধুকরটির গুঞ্জন রীতিমত জমে উঠল। তিনি বোধ হয়, আমার আগাগোড়া-পরিচয়টা মুখস্থ করে নিচ্ছিলেন। কারণ কথার মধ্যে তিনি প্রায়ই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠছিলেন—"কি বল্লে তোমার বাপের নাম ভাই?—অমুক—না? তোমাদের বাড়ি অমুক জায়গায়?—না?" ইত্যাদি।

রেলগাড়ির সঙ্গী-হিসেবে লোকটিকে আমার নেহাৎ মন্দ লাগছিলনা;—তাঁর মধ্যে ভারি একটি মজা ছিল। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি করে ফেল্লেন যে ওরই মধ্যে আমার উপর তাঁর দু-একবার মান-অভিমানও হয়ে গেল। ইনি নিশ্চয় সেই-দলের লোক, পরের প্রতি যাদের দরদ অতিমাত্রায় অতিরিক্ত;—তুমি চাও বা না চাও গায়ে-পড়ে তোমার উপকার তারা করবেই। আমি একে একলা, তায় এই প্রথম বিদেশ যাচ্ছি শুনে তাঁর মহা চিন্তা উপস্থিত হ'ল। তিনি বলতে লাগলেন—"তাই ত হে, তুমি একলা যাচ্ছ, আমার ভাবনা হচ্ছে! তোমাকে সঙ্গে করে আমি নিশ্চয় পৌঁছে দিয়ে আসতুম, হায়-হায়, যদি না—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যে-রকম ভালোমানুষ এবং আন্-কোরা লোক তাতে বিদেশে গিয়ে যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাব সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যে বিদেশে যেতে হলে কি-কি জিনিষ জানতে হয় এবং কোন্-কোন্ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার সে-সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমায় চিবিয়ে-চিবিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। তার মধ্যে যেটা তাঁর বিবেচনায় সবচেয়ে অমূল্য কথা সেটা হচ্ছে বিদেশে কি-করে চোর-ডাকাত চিনে নিতে হয় তারই তত্ত্ব। তাঁর ঐ অমূল্য তত্ত্বের অধিকাংশই আমার মন-থেকে এখন মুছে গেছে, নইলে জগতের হিতার্থে আজ সেগুলোকে আমি প্রচার করে দিতে পারতুম। তাঁর দেওয়া আর-একটি জিনিষও আমি হারিয়ে ফেলেছি। সেটা হচ্ছে সেই আশ্চর্য্য কষ্টিপাথর যার উপর মানুষকে কষে নিয়ে আবিষ্কার করা যায় তার চোরত্ব কতটুকু।

এসব জিনিষ খুইয়ে ফেল্লেও তাঁর কথার এই সারটুকু আমার মনে আছে যে, আমরা স্বদেশী চোরদের মুখ-চেনা বলে' আমাদের প্রতি তাদের একটু চক্ষুলজ্জা আছে। কিন্তু বিদেশী চোরদের তো তা নেই, সেই জন্যে বিদেশে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। আমার মনে পড়চে তিনি এ-কথাও বলে-ছিলেন যে, কেন তা বলা যায় না বটে, কিন্তু বিদেশের লোকমাত্রেই হয় চোর, না-হয় ডাকাত! সাধুলোক সেখানে দুর্লভ।

তাঁর এই মতটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যে অভিজ্ঞতার থলি ঝেড়ে তিনি অনেক গল্প বার করতে লাগলেন। শেষে হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লেন যে তিনি এত চালাক যে আমাকেই তিনি একজন মস্ত ধড়িবাজ চোর বলে' ধরে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পরীক্ষা করে বুঝলেন বটে যে তা নয়।

তিনি এত চোরের গল্প জানেন যে শুনলে মনে হয় লোকটা যেন "দারোগার দপ্তর" গ্রন্থাবলী আগাগোড়া মুখস্থ করে রেখেছে। চোর-ডাকাতের হাতে মানুষের কতরকম বিপদ এবং লাঞ্ছনা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে ঘটতে পারে তার একটা বিশদ তালিকা তিনি মুখে-মুখে তৈরি করে ফেল্লেন। আমাকে ধরে বল্লেন—"নোট্‌বুকে টুকে রাখ হে! অনেক কাজে লাগবে।" আমি রাজি হলুম না দেখে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, মনে-করে রাখলেও চলবে।"

তাঁর এই একঘেয়ে চোরের কাহিনীতে গাড়ির সমস্ত বাতাস যেন ঘুলিয়ে উঠতে লাগল এবং চৌরতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশের ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। আমি তাঁর কাছ থেকে সরে পড়বার জন্যে উশ্‌খুশ্‌ করতে লাগলুম। তাই দেখে তিনি আমার হাতখানা চেপে ধরলেন এবং এমন-করে আমাকে আগ্‌লে রইলেন যে পালাবার ফাঁক রইলনা। এমন-কি কারুর পানে চাইলেও তিনি ধমক দিয়ে উঠছিলেন—"জানা নেই, শোনা নেই, যার-তার সঙ্গে ফস্‌-করে আলাপ করা কি! কার মনে কি আছে কে জানে!"

আস্তে-আস্তে ফিস্‌ফিস্‌-করে বলছিলেন। তার কারণটা কি তা বলবার সময় তিনি গাড়ির আর-সকলের মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে একবার চেয়ে নিয়ে বল্লেন—"চোরেরা যদি কোনোরকমে টের পায় যে আমি তাদের শিকার ছিনিয়ে নিচ্ছি তাহ'লে হয়ত তারা দলবেঁধে এই গাড়ির মধ্যেই আমাকে আক্রমণ করবে। কি জান বাপু, সাবধানের মার নেই!"

আমার কানে-কানে তাঁর শেষ-কথাটি হচ্ছে এই যে তিনি খবর পেয়েছেন সম্প্রতি অনেকগুলো চোর-ডাকাত জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—অতএব সাবধান!

আমার নামবার জায়গা ঝাগ্‌ড়া ষ্টেশনে যখন গাড়ি এসে পৌছল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একরকম ঠেলাঠেলি করেই বৃদ্ধ আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি-থেকে নামিয়ে দিলেন। কি-জানি যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়!

প্ল্যাটফর্ম্মে জনমানুষ নেই। গোটাচারেক কাঠের খোঁটার উপর ময়লা পরকোলার মধ্যে মিট্‌মিট্‌-করে আলো জ্বলছে।—মনে হতে লাগল কারা যেন ঘোলা-চোখের মরা দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে দেখছে! একটা ঝাপ্‌সা অন্ধকার, ঘন কুয়াশার মতো, চারিদিক ঘিরে রয়েছে। তার স্পর্শে শুধু চোখের পাতা নয়, মনের ভিতরটাও কেমন ভেরে আসতে লাগল। ষ্টেশনের বাইরে ঘন-গাছের মাথায়-মাথায় পুরু আলকাৎরার পোঁচড়া পড়ে-পড়ে অন্ধকার

দেখে-শুনে আমার মনটা এমন দমে গেল, যেন কান্না পেতে লাগল। আমি জিনিষপত্র নামিয়ে গাড়ির হাতল ধরে চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সেই বৃদ্ধ বন্ধুটি জানলা দিয়ে একটুখানি মুখ বার করে বল্লেন—"ইস! এ যে একেবারে বনালয় দেখছি!"

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। বিদেশ-বল্‌তে মনের মধ্যে যে স্বপ্নরাজ্য গড়ে রেখেছিলুম মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটা চুরমার হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল এ যেন কোন্ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে এলুম। গাড়ি ছাড়বার সময় বুড়োটি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লেন—"সাবধান! এখানে নিশ্চয় চোর ডাকাত আছে!"

তাঁর এই কথা শোনবামাত্র নিজেকে এমন একলা ও অসহায় মনে হ'তে লাগল যে আমি চারিদিক যেন শূন্য দেখতে লাগলুম। ধীরে-ধীরে গাড়ি ছেড়ে দিলে;— মনে হ'ল আমার সমস্ত বল-ভরসা ঐ গাড়িখানা নিজের গারদের মধ্যে পুরে নিয়ে চলে গেল। আমি কাতরভাবে সেই পলাতক গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইলুম।

এখান থেকে বিশ মাইল গোরুর-গাড়ির পথে ভিটেমাটি। সেইখানে আমায় যেতে হবে। এখন গাড়ি ছাড়লে কাল ভোরে গিয়ে পৌছব। মনের রাশটার উপর একটা কড়া হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে আমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাইরে এলুম। সেখানে খানদুই পেট-ফুলো গোরুর গাড়ি আকাশের দিকে পা-তুলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গাড়োয়ানকে তখনই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু গোরু খুঁজে বার করতে অনেক দেরী হ'ল। এর মধ্যে খাবারের পুঁটুলি খুলে আমি কিছু খেয়ে নিলুম।

ছই-ঢাকা গাড়ির মধ্যে বিছানা পেতে, পাশে কাপড়ের ব্যাগটি রেখে আমি চুপ করে বসলুম। যাত্রা সুরু হল—সামনের ঘনঘোর অন্ধকারের দিকে! দুধারে শাল-বন, মধ্যে সরু পথ, তার উপর দিয়ে গাড়ি চলছিল। ক্রমে-ক্রমে গ্রামের যে দুটি-একটি আলো দেখা যাচ্ছিল তা মুছে গেল। কোথা-থেকে মাদলের আওয়াজ আসছিল তাও মিলিয়ে গেল। যা রইল সে কেবল অন্ধকার। যতই দূরের দিকে দৃষ্টি দিই, ততই দেখি অন্ধকার আরো জমাট! তখন আমার মনটা এম্‌নি করতে লাগল যে যেমন-করে-হোক কোনোরকমে এই অন্ধকারটা তীরবেগে পেরিয়ে এখনই একটা আলোর মধ্যে পৌছই। কিন্তু হায়, আমার বাহন! সে আমার মনের উপর মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে-দিয়ে এই বিরাট অন্ধকারটিকে রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতে-করতে, অগ্রসর হবার কোনো তাগিদ না রেখে, খোস্-মেজাজে, অতি ধীরমন্থরগতিতে চলতে লাগল।

সাম্‌নের দিক-থেকে যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল তার মধ্যে দেখলুম একটি শিশু-তারা আমারই মতো একলা ঐ অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে;—আমারই মতো ভয়ে তার বুকখানি থর-থর-করে কাঁপছে। সেইটিকে দেখে আমার মন যেন আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু চলবার পথে কোথায় যে

আমার এই নবীন বন্ধুটি হারিয়ে গেল তার সন্ধান পেলুম না। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে আলোকটুকু পাচ্ছিলুম সেটুকুও নিভে গেল।

তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার মনে পড়তে লাগল আমার মায়ের মুখখানি, আমার ছোট বোন্দের জ্বল্জ্বলে চোখগুলি! তার পর ঘুরতে-ঘুরতে আমার চিন্তা এসে পৌঁছল রেলগাড়ির সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির উপর—যাঁকে আমি ঘটক-বলে' স্থির করে নিয়েছিলুম।

হঠাৎ দেখি গোরুর গাড়ি বন পেরিয়ে একটা জলার মধ্যে এসে পড়েছে। সেখানে চারিদিক খোলা পেয়ে বাতাসটা ছোটো ছেলের মতো মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। হঠাৎ একটা কালো পাখী তার প্রকাণ্ড ডানা-দুখানা দিয়ে বাতাসের গায়ে চাপড় মেরে সাম্‌নে দিয়ে উড়ে গেল;— আমি তার শব্দে চমকে উঠলুম।

আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম— "এ জায়গাটার নাম কি রে?"

সে বল্লে—"ধড়ভাঙা!"

ধড়ভাঙা কথাটার মধ্যে কি যেন ছিল, হঠাৎ আমার বুকটা দুর্‌দুর্ করে উঠল।

এতক্ষণ ঘন-বনের মধ্যে দিয়ে আসছিলুম বলে' বোধ হয় চারদিকের আঁটসাটে মনটা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল; হঠাৎ এই ধুধু-করছে খোলা জায়গা দেখে মনে হল যেন কোন্ অকূলে পড়লুম। তখন ঐ ধড়ভাঙা-কথাটার ভিতরকার একটা অজানা লাগল। মনে হতে লাগল যেন ধড়ভাঙার মতো কি-একটা বিপদ এরই আশেপাশে কোথায় লুকিয়ে আছে। হঠাৎ একবার সন্দেহ হল কে যেন আমার পিছু নিলে। আমার সন্দিগ্ধ চোখ এমনি-করে আশপাশ-গুলো দেখতে লাগল যে কিছুতেই তাকে বাগ্ মানাতে পারলুম না।

হঠাৎ কি মনে হল, আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে এখানে ডাকাতের ভয় নেইত?"

সে বল্লে—"ডাকাত কোথায় বাবু! আগে এখানে ডাকাতি হ'ত শুনেছি।"

আমি যেন তার কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলুম না তাই সজোরে বলে উঠলুম —"দেখিস্! ঠিক বলছিস্ ত?"

বলেই আমার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বোধ হয় বুড়োর সেই চোর-সন্দেহের নেশাটা তখন আমায় ধরেছে। আমার ভাবনা হ'তে লাগল গাড়োয়ানটার কাছে এমন-করে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি! এখানে ডাকাত না থাকতে পারে, কিন্তু এতে ওকে সাহসী করে' তোলা হল। আমি যে একা! ও-লোকটাও একা বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ঢের বেশী জোয়ান;—ইচ্ছে করলে এখনই বেরাল-বাচ্ছার মতো আমার টুঁটি টিপে ধরতে পারে! এই নির্জ্জন স্থানে সেটা কিছুই শক্ত নয়। হাজার চীৎকার করলেও এখানে সাড়া দেবার কেউ নেই। এমন ঘটনা ত ঢের শোনা গেছে—বিশেষ যখন এ-বৎসর দুর্ভিক্ষ! চারিদিক দেখে-শুনে আমি নিজেকে

দেহের সমস্ত শক্তি যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগল।

গাড়ি সোজাপথে আপন-মনে চলছিল। গাড়োয়ানটা ছইখানার একটা কিনারায় ঠেসান দিয়ে চুপ-করে বসেছিল। আমি কেবলই মনে করছিলুম—এই জঙ্গলটা কতক্ষণে পার হই! কিন্তু তার শেষ যে কোথায় তার কোনো ঠিকানা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিলুম।

আমি মনে-মনে নিজেকে-নিজে ধমক দিয়ে-দিয়ে বুকটাকে একটু চিতিয়ে নিলুম। তারপর তখনই স্থির করে ফেল্লুম যে-অন্যায়টা করে ফেলেছি সেটাকে শুধ্রে নিতে হ'বে। তখন সেই রেলগাড়ির বুড়োকে মনে-মনে বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম। সে সময় তাঁর কথাগুলোকে খুব-একটা ঠাট্টার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সে-সব সত্যিই কাজে লেগে গেল। ভাগ্যিস্ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল! ভাগ্যিস্ তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন! নইলে আজ তো বেঘোরে প্রাণটি গিয়েছিল!

আমি গাড়োয়ানটাকে বল্লুম—"দেখ্, আমি ডাকাতের কথা জিজ্ঞাসা করছি কেন জানিস?—আমি ডাকাত ধরতে এসেছি!"

গাড়োয়ানটা কোনো কথা কইলে না, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে লাগল।

আমি গলাটায় বেশ-একটু জোর দিয়ে বল্লুম—"আমাকে একলা মনে করিস্ নি। আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে। তারা এই আশে-পাশে লুকিয়ে-লুকিয়ে চলেছে; একটা

গাড়োয়ানটা আমার দিকে কেমন-এক-রকম-করে চাইতে লাগল, তার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না! মনে হ'ল সে আমার কথা বিশ্বাস করছে না। তাইতে আমার মনে আরো ভয় হতে লাগল। তাকে বিশ্বাস না-করালে ত চলবে না!

আমি বল্লুম—"ঐ যে আমার ব্যাগ্ দেখছিস, ওটার ভিতর বড়-বড় পিস্তল ঠাসা। ওর এক-একটা পিস্তলে ছ-ছটা-করে মানুষ মারা যায়। তা ছাড়া আমার বুক-পকেটে দুটো খুব ভালো পিস্তল আছে।"

পিস্তলের নাম শুনে গাড়োয়ানটা ভয় পেয়েছে মনে হল। তাহ'লে এতক্ষণে ওষুধ ধরেছে! এই ভয়টাকে আরো ঘন ও দৃঢ় করে তোলবার উপায় আমি মনে-মনে খুঁজতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বল্লুম—"হুঁ! আমি খবর পেয়েছি এখানকার ডাকাতরা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান সেজে সওয়ারিদের লুঠ-তরাজ করে! নইলে আমার গোরুর গাড়িতে আসবার দরকার কি ছিল? আমি হাওয়াগাড়িতে আসতে পারতুম না!"

গাড়োয়ানের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে আমার সন্দেহ হল এইবার আমাকে আক্রমণ করে বুঝি! কিন্তু আমি নিজেকে দম্তে দিলুম না। তাড়াতাড়ি একটা হাত আমার বুক-পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। অমনি দেখি সে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গেছে।

● এখন থেকে আমি ভারি সতর্ক হয়ে রইলুম। গাড়োয়ানটাকে মুহূর্ত্তের জন্যও

যদি অন্যমনস্ক পেয়ে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে! বলা বাহুল্য, আমি তখনো ভিতরে ভিতরে কাঁপছি। কিন্তু সে-কাঁপুনি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্যে স্নায়ুগুলোকে দৃঢ় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম।

খানিক-ক্ষণ চুপ-করে কেটে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল গাড়োয়ানের ভয়টাকে জুড়োতে দেওয়া কিছু নয়। আমি তখন যেন আপনার মনেই বলতে সুরু করলুম—"ডাকাত যদি ধরতে পারি, তাহ'লে মজা টের পাইয়ে দিই, একেবারে পুলিপোলাও চালান!"

পুলিপোলাওর নাম শুনে গাড়োয়ানটা অস্ফুটভাবে আঁৎকে উঠল—দেখলুম। মনে-মনে ভাবলুম—এইবার ঠিক হয়েছে!

গোরুর মুখের দড়ি গাড়োয়ান ছেড়ে দিয়েছিল,—গোরুদুটো আপনিই চলছিল। এতক্ষণ সে ছইখানার পিঠে ঠেসান দিয়ে পড়েছিল, এইবার সোজা হয়ে বসল। পিঠটাকে খাড়া করে সে কেবলই রাস্তার দিকে দেখতে লাগল। আমার বুকটা আবার ছাঁৎ করে উঠল—তাই ত এ-রকম করে কেন!

আর-কিছু না পেরে আমি খপ্-করে তার হাতখানা ধরে ফেললুম। সে কোনো জোর দেখালেনা। কেন? এর মানে কি! সন্দেহে আমার বুকটা ধক্‌ধক্ করতে লাগল।

কি-করব ঠিক করতে না পেরে আবার খানিকক্ষণ চুপ-করে কেটে গেল। গাড়োয়ানটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলনা; কিন্তু শয়তানকে বিশ্বাস কি।

ছেলেবেলায় শুনেছিলুম, বাঘের চোখের উপর যদি সাহস করে চেয়ে থাকতে পারা যায় তাহ'লে বাঘ কিছু করতে পারেনা; কিন্তু যেই ভয়ে চোখের পাতাটি কোঁচ্‌কাবে অমনি সে থাবা মেরে বসবে। এই গল্পের নীতিটা যে তখন আমার মনের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল সে আমার কার্য্য থেকেই প্রমাণ হচ্ছে।

ভয়টাকে আরো ঘোরালো করবার একটা ফন্দি বুড়োর গল্প থেকে হঠাৎ মাথায় এল। আমি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, গলার স্বরটাকে খুব দৃঢ় করে বলে উঠলুম—"হুঁ, এই ত ঠিক মিলছে দেখছি!"

যেমন আমার কথা শেষ হওয়া অমনি মনে হ'ল আমার হাতের ভিতর থেকে তার হাতখানা যেন একবার একটু হ্যাঁচ্‌কা দিলে। আমি জোরে চেপে ধরলুম।

আমি বলতে লাগলুম—"এখানকার এক ডাকাত-গাড়োয়ানের ছবি আমার কাছে আছে। ডাকাতটা জানেনা যে তার ছবি বেরিয়ে গেছে। সে ভারি মজা! সে যে-লোকটাকে খুন করে, মরবার সময় সে চোখ মেলে মরেছিল, তাইতে ডাকাতের ছবিটা সেই চোখেতে আট্‌কা পড়ে যায়। সে-ছবির নকল আমার কাছে আছে। তার সঙ্গে তোর মুখের চেহারাটা যেন—" বল্‌তে-বল্‌তে তার মুখখানা খুব তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখতে আরম্ভ করেছি এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মতো একটা দম্‌কায় আমার হাত ছিনিয়ে লোকটা তড়াক্-করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট।

তারপর সেই জনমানবশূন্য অন্ধকার নির্জ্জন জলার মধ্যে চালকহীন গাড়িতে একলা আমি—আমার যে দুর্দ্দশাটা হ'ল তা আর বল্‌তে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু যখন আরম্ভ করেছি তখন শেষ করতেই হ'বে।

সেই প্রকাণ্ড লাফানির একটা ঝাঁকানি খেয়ে গোরুদুটো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি একেবারে অবাক! কি যে হ'ল কিছু বুঝতে পারলুমনা। একবার মনে হ'ল বোধ হয় খুব ভয় পেয়েছে তাই পালালো। তারপর মনে হ'ল নিশ্চয় দলের লোক ডাক্‌তে গেছে। আমি ডাকাত ধরতে এসেছি এ-খবর ডাকাতদের দলের মধ্যে এতক্ষণ রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে—ডাকাত-ধরার মজাটা তারা এইবার আমাকে দেখাতে আস্‌বে।

কি যে করি কিছু ঠিক করতে পারলুম না। একবার চীৎকার করে তাকে ডাকলুম —"ওরে শোন্, শোন্!"

কিন্তু কে তখন শোনে!

ভাবলুম, একদিকে দৌড়ে পালাই। কিন্তু অন্ধকারে কোথায় গিয়ে পড়ব ভয় হ'তে লাগল। তারপর দৌড়-দেবার মতো শক্তি আমার তখন ছিল কি-না সন্দেহ। আমি সেই অন্ধকারে একলাটি গাড়ির মধ্যে কাঠ-হয়ে বসে রইলুম।

এমনি-করে বসে থেকে মনে হ'ল যেন আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আসছে। ভাবলুম গাড়িটাকে দিই চালিয়ে। চলার বাতাসে তবু মনের হাঁপানি কমবে।

অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু গোরু-দুটো আমার হাতে এক পা-ও নড়লনা। তখন লাঠি নিয়ে ঘা-কতক কসিয়ে দিলুম, তাতে অল্প-একটু চলেই আবার থেমে পড়ল। আবার লাঠি চালালুম, তাতেও সেই-সমান অবস্থা। আমার উৎসাহ ভেঙে গেল। তখন আমার মনে হতে লাগল এই নির্জ্জনতার কবরের মধ্যে যেন তিল-তিল-করে আমার সমাধি হচ্ছে। আমি হতাশ হয়ে গাড়ির মধ্যে শুয়ে পড়লুম। হায়, আমার অদৃষ্টে কথামালার মেষপালকের মতো বাঘ বাঘ বল্‌তে বল্‌তে শেষে কি সত্যই বাঘ এসে পড়ল! আমি চোখবুজে কেবলই দেখতে লাগলুম —সারিসারি ডাকাতের দল—কেবলই তারা আসছে,—পিঁপড়ের সারের মতো চলে-চলে আসছে।

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলুম জানিনা, হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা কলরব শুনে চম্‌কে উঠলুম;—হাজার-হাজার লোক যেন হল্লা করতে-করতে এগিয়ে আসছে।

এই নির্জ্জন জায়গায় একসঙ্গে এত লোক কোথেকে আসবে? নিশ্চয় ডাকাতের দল! ব্যস্, এইবার আমার সব-শেষ!

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমি উঠে বসলুম। আত্মরক্ষার একটা তাড়না আগুনের ফুল্‌কির মতো একবার জ্বলে উঠে হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেল। কেবলই মনে হতে লাগল—হায় হায়, নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলুম! একা গাড়োয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুঝতেও ত পারতুম। তারপর যা হয় হ'ত। কিন্তু আমার মনগড়া ঐ পিস্তলের বস্তাকে ব্যর্থ করবার জন্যে ডাকাতের যে প্রকাণ্ড দলটি আসছে তাদের এখন ঠেকাই কি করে! পিস্তলের ফাঁকা-আওয়াজে

গাড়োয়ানের মনকে জব্দ করেছিলুম বটে কিন্তু এই অগণন জল্‌জ্যান্ত শত্রুদের মোটা মোটা লাঠিসোটাগুলোকে ত কথার ফাঁকা-আওয়াজে ফেরানো যাবে না। তবে উপায়?

এইবার আমার মনের রাশ একেবারে এলিয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তার সমস্ত খেই যেন হারিয়ে ফেল্লুম। তখন কি যে হ'ল না হ'ল কিচ্ছু মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে আমি গাড়ি থেকে সুড়্‌সুড়্ করে নেমে গাড়ির তলায় গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম; চারিদিককার ঐ খোলা জায়গার মধ্যে এই ঘের-দেওয়া স্থানটুকু ভারি নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল; এবং গাড়ির চাকা-দুখানা যেন সুদর্শন চক্রের মতো আমায় ঘিরে ছিল।...

যারা হল্লা করতে-করতে আসছিল, তারা আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে থেমে পড়ল। মনে করলুম এখনই একটা মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দ উঠ্‌বে। কিন্তু তা ঠৈক হল না। বোধ হয় সব-আগে আমাকে খুঁজছে! আমি গায়ের চাদরখানা টেনে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিলুম।...

দলের কতক লোক এগিয়ে চলে গেল বলে মনে হল; কতক লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভাবলুম এইবার এরা ব্যূহ রচনা করছে। শুনেছে আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে, তাদের ঘেরাও করবার ফন্দি করছে। তাহ'লে আমার পালাবার পথটি পর্য্যন্ত আর রইলনা! ইস্, আমার প্রত্যেক মিথ্যাটি আমার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ দাম আদায় না-করে ছাড়বে না দেখছি।...

লোকগুলোর ভাবগতিক আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। সেইজন্যে একটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে আমার মনের ভয়টা এত দোল খাচ্ছিল যে থেকে-থেকে যেন জ্ঞানের সীমাকেও ছাড়িয়ে যেতে লাগল।...

তারা মহা ব্যস্ত হয়ে কেবলই এদিক-ওদিক ঘোরা-ঘুরি করছিল, আর নিজেদের মধ্যে কি বলা-বলি করছিল—যেন কিসের খোঁজ করছে। সে আর কে? সে আমি!...

হঠাৎ কে-একজন গাড়ির তলায় উঁকি মেরে দেখেই চীৎকার করে উঠল। আমার মাথা-ঘুরে, গা ঝিম্-ঝিম্ করে, আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়লুম।...

যখন একটু জ্ঞান হ'ল তখন মনে হ'ল কে যেন জিজ্ঞাসা করছে—"বাবু, চোট্ কি বেশি লেগেছে?"...

আমি বুঝলুম আমি প্রাণে মরিনি—বন্দী হয়েছি মাত্র!...

তারা ধরাধরি-করে আমাকে গাড়ির উপর তুল্লে। আমি চোখবুজে পড়ে রইলুম। হঠাৎ মনে হ'ল যেন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। ঐ আলোর সঙ্গে-সঙ্গে মনে একটু আশার উদয় হ'ল। আমি চোখ-চেয়ে উঠে বসলুম।

একটা ঝাঁকড়াচুলো লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমি প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হলুম;—অর্থটা কি বুঝতে পারলুম না। আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাবে সে তো ওরাই জানে, আমি তার কি জানি!

আমি চুপ-করে আছি দেখে, সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাবেন কর্ত্তা?"

আমি ভাঙা-ভাঙা গলায় বল্লুম—"ভিটেমাটি।"

একজন বলে উঠল—"ওরে ওটা আমাদের নয়া নেস্‌পেক্‌টাবাবু!"

আর-একজন বল্লে—"চল্ বাবু, চল্। মোরাও যাব।"

আর-একজন বল্লে—"বাবু-গো, আমরা যে হোথাকার কুলি—কাজে বেরিয়েছি!"

আর-একজন বল্লে—"ওরে চল্ চল্—আর দেরি করিস্‌নে!"

এমনি হট্টগোলের মধ্যে একটা লোক তড়াক-করে আমার গাড়িতে লাফিয়ে উঠে গোরুর ল্যাজ-মল্‌তে সুরু করে দিলে।

আবার যাত্রা আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো গণ্ডগোল করতে-করতে চল্‌ল। রথারূঢ় বিজয়ী বীরের মতো সৈন্যপরিবৃত হয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম।

খানিক বাদে যে-লোকটা গাড়ি হাঁকাচ্ছিল সে জিজ্ঞাসা করলে—"বাবু, আপনার গাড়োয়ান গেল কোথায়?"

আমি ধীরে-ধীরে বল্লুম—"সে আমায় একলা ফেলে পালিয়েছে।"

সে অবাক হয়ে বল্লে—"পালালো কেন বাবু?"

নিজের আহাম্মকিটা ঢাকবার জন্যে হয় ত একটা মিথ্যা বলবার দরকার ছিল, কিন্তু মিথ্যা রচনা করার জন্যে যে সাজা পেয়েছি তার পর আর মিথ্যে নিয়ে খেলা করবার প্রবৃত্তি হল না। আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—"আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলুম!"

নতুন গাড়োয়ানটা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—"এখানকার লোকগুলো অম্‌নি-ধারা বোকা ম্যাড়া! ঠাট্টা বোঝেনা বাবু।"

আমি মনে-মনেই বল্লুম কে যে কার উপর ঠাট্টা করলে বোঝা গেল না।…

তার পর দুপুরবেলা আমার কাজ-কর্ম্ম যখন বুঝে নিচ্ছি তখন দেখি সেই ঝাঁকড়া-চুলো লোকটা আমার সেই গাড়োয়ানটাকে ধরে এনেছে। তাকে ধমক দিয়ে সে বলছে—"যা—বাবুর পায়ে ধর!"

ব্যাপারটা বোধ হয় আগাগোড়া ফাঁস্ হয়ে গিয়েছিল। কারণ কুলিগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল পরস্পরে যেন হাসাহাসি করছে।

গাড়োয়ানটা আমার দিকে কাঁচুমাচু হয়ে চাইতে লাগল। আর, মিথ্যা যখন বল্‌বনা প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বল্‌তেই হবে আমিও যে তার দিকে খুব সহজ-চোখে চাইতে পারছিলুম তা নয়।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

সাহিত্যের দায়িত্ব

পৌষের 'উপাসনা'য় সম্পাদক 'সাহিত্যের দায়িত্ব' সম্বন্ধে ছোট একটু টিপ্পনি লিখিয়াছেন। বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যেমন, সাহিত্যেও তেম্‌নি কতকগুলি সাধারণ স্বীকার্য্য আছে; সেগুলি মানিতে কারও বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। যেমন ধরুন, রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য; অলঙ্কার শাস্ত্রের এই সাধারণ স্বীকার্য্যটি সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু রস বলিতে কে কি বোঝেন, তাহা তলব করিলেই ঐ সাধারণ স্বীকারের মধ্যে হরেক রকমের অর্থবিকার ঘটিতে দেখা যায়। অতএব মাম্‌লা—সাধারণ স্বীকার্য্য লইয়া নয়; সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ স্বীকার্য্যগুলাকে প্রয়োগ করিতে গেলে তাদের যে বিচিত্র অর্থান্তর ঘটে, সেই অর্থান্তর লইয়াই আসল মাম্‌লা।

সম্পাদক লিখিতেছেন, "জীবনই সাহিত্যের জন্মদান করে।...যে সাহিত্য জীবনের বিরোধী...সে ঝুটা সাহিত্য।" এ একটা সাধারণ স্বীকার্য্য। কিন্তু 'জীবন' বলিতে সম্পাদক যাহা বোঝেন, সাহিত্য-রসজ্ঞ মাত্রেই কি তাহাই বোঝেন? ওয়াল্ট হুইটম্যান তাঁর কাব্যারম্ভে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনের গান গাহিবেন —"of life immense in passion, pulse and power।" অথচ রাধাকমলবাবুর টিপ্পনি পড়িয়া বোধ হয় যে সাহিত্যে জীবনের সেই প্রবল 'passion'-অংশের যেন কোনই স্থান নাই। তার প্রমাণ তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিটি:—"এমন রীতি ও নীতি বঙ্গসাহিত্যে এখন অনেক সময় প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহা জীবনের বিরোধী —যেটা আশ্রয় করিলে যে জীবনের পথে মানুষ সেই আদিম কাল হইতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আদিম বর্ব্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ করিয়া মানুষ এটা অন্ততঃ ঠিক বুঝিয়াছে যে, পবিত্রতার আদর্শ খাট করিতে গেলেই তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সেই আদর্শ বরং বড় করিয়া রাখিয়াই জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং বড় আর্টিষ্ট কখনই পবিত্রতা ও অপবিত্রতাকে সমান চক্ষে দেখেন না।"

রাধাকমল বাবু সাহিত্যে 'পবিত্রতার আদর্শ' রক্ষা করা বলিতেই বা কি বোঝেন, তাহা তাঁর টিপ্পনি হইতে পরিষ্কার বোধগম্য হয় না। এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, সাহিত্যে sex-passion অথবা মিথুন-রাগের চিত্র তাঁর পবিত্রতার আদর্শকে বোধহয় পীড়িত করে। অথচ ঐ মিথুন-রাগের রঞ্জনেই নিখিল সাহিত্য অনুরঞ্জিত। ঐ রঞ্জন দিয়া জীবনকে আঁকিবার বেলায়, কোন কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক কোন সংকীর্ণ সমাজনৈতিক আদর্শকে চোখের সামনে খাড়া করিয়া রাখেন নাই।

তা যদি রাখিতেন, তবে সে সাহিত্যে জীবনই প্রস্ফুরিত হইত না। কেননা, নৈতিক আদর্শ জিনিষটা সমাজে চির-কালই পরিবর্ত্তনশীল; তাহা কোথাও ধ্রুব হইয়া নাই। গ্রীকের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে মধ্যযুগের পোপেদের নৈতিক আদর্শের মিল ছিল না; আবার পোপেদের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে রেনেসাঁসের নৈতিক আদর্শের মিল ছিল না; আবার তখনকার নৈতিক আদর্শের সঙ্গে বর্ত্তমান ইউরোপের নৈতিক আদর্শের ত মিল নাই। ঠিক্ তেমনি, ভারতবর্ষেও বৌদ্ধযুগের নৈতিক আদর্শ আর পৌরাণিকযুগের নৈতিক আদর্শের মধ্যে কি মিল আছে? বৌদ্ধরা শরীরের দাবী ইন্দ্রিয়ের দাবীকে যেমন অগ্রাহ্য করিয়াছে, পৌরাণিক যুগে ইন্দ্রিয়ের দাবী তেমনি স্বীকৃত হইয়াছে; এমন কি দেবতাদের লীলায় পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। তার সাক্ষী, ভুবনেশ্বর ও কণারকের মন্দিরের চিত্রাবলী। আবার সে যুগের আদর্শের সঙ্গে এ যুগের আদর্শের মিল নাই। সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সমাজনৈতিক আদর্শের এই বদল কালে কালেই ঘটিবে, সেই জন্যই সমাজ নৈতিক আদর্শকে 'সংকীর্ণ' এই বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সাহিত্য-শিল্প পাদ্রী-পুরুতের শাসন চিরকালই অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে ও ভাবের স্বাধীন লোকে বিহার করিয়াছে; তাই তার কাছে সব চেয়ে বড় আদর্শ জীবনেরই আদর্শ। কিন্তু সে জীবন গণ্ডিবদ্ধ জীবন নয়। তাহা "Life immense in passion, pulse and power"—তাহা আবেগময়, শক্তিময় ও স্পন্দমান নাড়ীবিশিষ্ট চঞ্চল জীবন। অর্থাৎ সকল সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া ফেলিলে যে অখণ্ড, বিচিত্র ও বেগবান্ জীবন আমাদের চোখের সাম্‌নে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, সেই জীবন। সাহিত্যেই তাই মানুষ conventionকে সব চেয়ে বেশি করিয়া অস্বীকার করিয়াছে; এই একটি মাত্র ক্ষেত্র, যেখানে convention বা সংস্কারের বাঁধন হইতে মানুষ মুক্তি কামনা করিয়াছে। এর উদাহরণের জন্য অন্য দেশের সাহিত্যে যাইবার দরকার নাই, ভারতবর্ষের সাহিত্যেই এর উদাহরণ মিলিবে।

রাম লক্ষ্মণ সীতার কথা ছাড়িয়া দি; মহাভারত ত হিন্দুর পঞ্চম বেদ—মহা-ভারতের মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সংস্কারগত নৈতিক আদর্শের সঙ্গে মেলে? দৃষ্টান্ত দিয়া দরকার নাই; কেননা—a word to the wise is sufficient—বিজ্ঞের পক্ষে ইঙ্গিতই যথেষ্ট নয় কি? তারপর সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য—কালিদাস প্রভৃতি কবিদের রচনা ধরা যাক্। মেঘদূত, শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, শৃঙ্গার রসাষ্টকম্, শৃঙ্গারতিলকম্, চৌরপঞ্চাশিকা, অমরুশতক, গীতগোবিন্দ পর্য্যন্ত—এতগুলি বাছা বাছা নাট্য ও কাব্যে রাধাকমল বাবু-কথিত পবিত্রতার বা হিন্দুসমাজ-নীতির আদর্শ রক্ষা পাইয়াছে কি? রসের মধ্যে যাহা আদি সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই যে

অনাদি বা চিরন্তন রস। মানব সাহিত্যেও তাহাই বটে।

তার পর বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে পুনরায় কিছু লেখা দরকার হইবে। মোটের উপর এখানে একটি কথা বলিতে চাই এই যে, ঐ পদাবলী গোড়া হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মকে আশ্রয় করে নাই—সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বারা ঐ পদগুলির কি অর্থান্তর ঘটে, তাহা সাহিত্যিকের দেখিবার কথা নয়। ইউরোপীয় Troubadourগণ এক সময়ে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেরই মত রাগাত্মিকা পদাবলী অর্থাৎ মিথুন-রাগাত্মিকা পদাবলী রচিয়া দেশ বিদেশে গাহিয়া বেড়াইতেন। তখন তাঁদের পদাবলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক অর্থ কেহই বাহির করে নাই। ক্রমে দেখা গেল যে, রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের স্পর্শে সেই পদগুলির অর্থের বদল ঘটিতে লাগিল এবং তারা দেখিতে দেখিতে মিথুন-রাগাত্মক না হইয়া 'আধ্যাত্মিক' হইয়া উঠিল। Cambridge University Press হইতে প্রকাশিত The Troubadour নামক গ্রন্থটি পাঠ করিলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঠিক সেই Troubadourদের মত বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদগুলিও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ায় তাদের অর্থ সোজাই ছিল—তারা অত্যন্ত সহজ মিথুন-রাগের কাব্য ছিল। তারা যে ছিল না, একথা জোর করিয়াই বলা যায়।

তারপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর? তারপর মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য? তারপর—আর বোধকরি তারপরের প্রয়োজন হইবে না। কেননা, তারপর যাঁদের নাম আসিবে, তাঁরা "আদিম বর্ব্বরতা হইতে আধুনিক সভ্যতায় পদার্পণ" করিয়াছেন বলিয়া, অর্থাৎ তাঁদের মিথুন-রাগের সাহিত্য আদিম সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি মার্জ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন বলিয়া লেখক তাঁদের উপর বেশি খাপ্পা। কালিদাসের মেঘদূতের ও কুমারসম্ভবের স্থানে স্থানে একালের রুচিহিসাবে যে অশ্লীলতার নমুনা পাওয়া যায়, তাহা বরং তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন, কেননা তাহা "ভারতীয় জ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠ সঙ্গতি", এই তাঁর ধারণা। কিন্তু হালের অত্যন্ত মার্জ্জিত রুচির সাহিত্যে সে রকমের অশ্লীলতা না থাকিলেও তাঁর মতে এসব সাহিত্যের 'নীতি ও রীতি' 'পবিত্রতার আদর্শ' হইতে বিচ্ছিন্ন—অতএব—'জীবনের বিরোধী'। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, আমি কোন নৈতিকতার সংকীর্ণ আদর্শের মাপকাঠির দ্বারা সে সকল প্রাচীন সাহিত্যের বিচার করিতে চাই না। কেন না, এ কালের রুচির দ্বারা সে কালের রুচির বিচার চলেনা।

সম্পাদকের টিপ্পনির শেষ অংশটুকু চমৎকার। তাহা উদ্ধার করিতেছি:—

চণ্ডী, চৈতন্য ভাগবত অথবা বৈষ্ণব পদাবলী লোকে দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করিয়া থাকে। কলেজের শেক্‌স্‌পীয়ার অথবা গেয়েটে বা রবিবাবুর কাব্যসাহিত্যের পাঠের মত নহে।"

কুমারসম্ভব আমার কাছে সম্প্রতি নাই। 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে অকাল বসন্তের বর্ণনা—'দৈনিক জীবনের সাধনার অঙ্গরূপে' নিত্য পাঠের ব্যবস্থা যদি হইল, তবে মেঘদূত বাদ গেল কেন? পূর্ব্ব মেঘের ৪২টা শ্লোকও নিত্য পাঠের মধ্যে পড়িবে ত?—সেটা এখানে উদ্ধার নাই করিলাম। আর কুমারসম্ভব ও মেঘদূত যদি 'স্ত্রী'পুরুষ সকলেরই জীবনের 'সাধনার' সহায় হয়, তবে শৃঙ্গার-তিলকম্ চৌরপঞ্চাশিকা প্রভৃতি কি দোষ করিল? অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে গীতগোবিন্দও পড়ে। যে অর্থেই গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণব পদাবলী পড়া যাক্ না কেন, ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র তাহাতে এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, সে সকলপদ নিত্য পাঠের দ্বারা ঐ সমাজ-নৈতিক "পবিত্রতার আদর্শের" কোন ব্যত্যয় ঘটিতেই পারে না। আমরা বলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের' 'দানখণ্ড'ও দৈনিক জীবনে সাধনার অঙ্গরূপে নিত্য পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এ পর্য্যন্ত জানিতাম যে কালিদাস প্রভৃতির কাব্য লোকে কাব্যামোদের জন্যই পড়ে; অতঃপর শুনা গেল যে, ঐ সকল কাব্য লোকে দৈনিক জীবনের সাধনার অঙ্গ ঐ সকল কাব্য পাঠে অত্যন্ত কৃত্রিম সংস্কার-গণ্ডিবদ্ধ পবিত্রতার আদর্শও নাকি রক্ষা পায়!

কোন ভাল কাব্য পাঠে পবিত্রতার আদর্শ যে নষ্ট হয়, এটা অবশ্য আমাদের বিশ্বাস নয়। নদীর জলে যতই আবিলতা থাক্ না কেন, তাহা পবিত্র; কারণ তাহাতে স্রোত আছে। জীবনের গতিবেগই জীবনের মলিনতাকে ভাসাইয়া লইয়া চলে, তাহা কোথাও জমিতে পায় না। এই তত্ত্বটিই বুঝাইবার জন্য মহাকবি গ্যয়টে "ফাউষ্ট" লিখিয়াছিলেন। কাব্য-উপন্যাসে জীবনের গতিবেগ আছে বলিয়াই, তাহা সকল আবিলতা সত্ত্বেও পূতসলিলা ধারার মত।

বাঙ্গলার গীতি-কবিতা

'বাঙ্গলার গীতি-কবিতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 'নারায়ণে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। লেখক নাম দেন্ নাই। বোধ হয় ইহা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের রচনা।

লেখকের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ-পালার মধ্যে একটি-মাত্র ধুয়া এই যে, 'বাংলার প্রাণ'কে ধরিতে হইবে; কারণ একালের 'ফেরঙ্গ সাহিত্যে'র আবির্ভাবে সেকালের চারপাঁচশো বৎসর আগেকার বাংলার প্রাণটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া বড়ই আপ্‌শোষের কারণ হইয়াছে। অতএব, সেই শিলা-রূপী প্রাণটাকে 'ফেটিশ্' করিয়া তার কাছে শাঁকঘণ্টা বাজাইয়া যদি এ কালের প্রাণবান্ সাহিত্য-টাকে বলি দেওয়া যায়, তবেই বাংলার প্রাণ-

আমরা ত জানি যে, সকল বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আধুনিক Comparative method বা তুলনামূলক প্রণালীর প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু লেখক তাকে আমল দিতে চান্ না বলিয়া বোধ হয়। কেননা, তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে বিলাতী Lyric কবিতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পার্থক্য এমনি গুরুতর যে, বিলাতী সংস্কার একেবারে মুছিয়া না ফেলিলে বাংলার প্রাণরূপ বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে না। অর্থাৎ বাংলার সেকালের প্রাণটাও এমনি অদ্ভুত 'বিশ্ব'ছাড়া খাপ্ছাড়া প্রাণ যে, আর কোন দেশের বা সভ্যতার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে তার সারূপ্য মেলে না।

তিনি লিখিতেছেন :—

"বিলাতী গীতি-কবিতায় কবি বিশ্বের সকল পদার্থকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লন্। তাহাই প্রাণের ভাব-রসে সিক্তি করিয়া প্রকাশ করেন। সে প্রকাশে তাঁহাদের নিজত্বের ছাপ দিয়া দেন্। তাহাতে হয় এই যে, প্রত্যেক রূপই কবির নিজের ভাবের ছাঁচে গড়া হয়।...... কিন্তু এই যে গীতি-কবিতা, ইহা আমাদের দেশীয় নয়।...

"আমাদের দেশে চণ্ডিদাস হইতে রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালারা কেহই এই গীতি-কবিতা লেখেন নাই। তাঁহারা রচিয়া গেছেন গান, সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা। দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হইয়া আনন্দরস ভোগ করিতেছেন।...... ইহাই হইল বাঙ্গলা গীতি-কবিতার বা গানের প্রাণ।"

অর্থাৎ লেখকের মতে রাধাকৃষ্ণের নামে বেনামী করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখিলে তাহা খাঁটি বাংলা গীতি-কবিতা হইবে; বেনামী না করিয়া লিখিলেই তাহা বিলাতী লিরিক্ হইবে। দেশী ও বিলাতী গীতি কবিতায় মোটের উপর এই তফাৎ।

'দুজনের প্রাণের খেলায়' কবি যদি শুধু হন্ 'দর্শক', তবে সে প্রাণের খেলা বা লীলাকে অপ্রাকৃত লীলাই বলিতে হয়। এই অপ্রাকৃত প্রেমলীলার কাব্যও যে ইউরোপীয় সাহিত্যে নাই তাহা নহে; দান্তের প্রসিদ্ধ কাব্য Vita Nuova বা Paradisoই এই অপ্রাকৃত প্রেমের কাব্য। তাছাড়া খৃষ্টান মধ্যযুগীয় মিষ্টিক বা মরমী কবিতায় এবং মধ্যযুগীয় ট্রুবাদোর-গায়কদের প্রেমের গানের আধ্যাত্মিক রূপান্তরে, ঐ অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বৈষ্ণব গানের ঝুড়ি ঝুড়ি সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু বৈষ্ণব সাধনাকে অপ্রাকৃত সাধনা শুধু আমিই বলিনা। আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার 'নারায়ণে' বিপিন বাবু তাঁর 'বুদ্ধিমানের কর্ম্ম' নামক প্রবন্ধে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন দেখিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের, রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে, এ সংসারের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সম্বন্ধসকল যে সেই নিত্যরসলীলার নিত্য রস-সম্বন্ধের আদর্শেই প্রকাশিত হইতেছে, ভগবানের এই জাগতিক লীলায় আমরা প্রত্যেকে যে তাঁর লীলা-পরিকর—এ সকল কথা (বৈষ্ণবেরা) ধরিতে ও বুঝিতে পারিল না। ইহারাও ভগবানের প্রত্যক্ষ জাগতিক লীলাকে মায়িক ও অলীক বলিয়া বর্জ্জন করিয়া, সংসারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-সকলের প্রতি উদাসীন হইয়া, "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে" তাঁর "অপ্রাকৃত লীলা" ধ্যান ও কীর্ত্তন

করিতে লাগিল। এইরূপে এই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত তত্ত্বাঙ্গে সংসার ও পরমার্থের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়াও, সাধনাঙ্গে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না। বৈদান্তিকের কৈবল্যধামের স্থানে বৈষ্ণবের ব্রজধামের প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক ও অলীক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছিলেন, ভক্তবাদী বৈষ্ণবও তাহা করিতে লাগিল।"

আমি অবশ্য মনে করি যে, বাংলার প্রথম পদকর্ত্তারা অর্থাৎ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি নিজেদের অভিজ্ঞতার কথাই বেনামী করিয়া লিখিয়াছেন, কেননা তখনো গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই —অপ্রাকৃত লীলার তত্ত্ব, দর্শক ভাবে দেখিবার কথা প্রভৃতি তখনো ফোটে নাই। বেনামী করিবার কারণ আর কিছুই নয়—রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীটাকে তাঁরা আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় Troubadour গায়কগণ যেমন প্রথমে ইন্দ্রিয়-লালসার গান রচনা করিতেন (কেহ কেহ প্রেমের উপরের সপ্তকের সুরও ধরিতে পারিয়াছিলেন)—তেম্‌নি ভাবেই বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের গানও এক সময়ে আমাদের দেশে জাগিয়াছিল। তার পর Troubadour-দের গান রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয় সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যেমন আধ্যাত্মিক রূপকে রূপান্তরিত হইল, পদাবলীও তেম্‌নি গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক রূপকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পরে অন্য প্রবন্ধে আমি আলোচনা

বাংলার প্রাচীন গীতি-কবিতার মত কবিতা ভূভারতে নাই, এর মত হাস্যকর কথা আর কিছুই হইতে পারে না। কবীর, নানকের গানও গান, তাহাতেও 'দুজনের প্রাণের খেলা'র কথা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে রস ও তত্ত্ব দুইদিক্ হইতেই বিচার করিলে তাহা উৎকৃষ্টতর, একথা কাব্য-রসজ্ঞ মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুফী কবিদের গানও গান, তাহাতেও 'দুজনের প্রাণের খেলার কথা আছে, এবং সে কাব্যও বৈষ্ণব পদাবলীর কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-ভোগের বর্ণনাপূর্ণ গানের চেয়ে কাব্যহিসাবে শ্রেষ্ঠতর।

সকল রসের 'সমরস', দেহে প্রাণে মনে 'একাত্ম অনুভূতি,' বা অচিন্ত্য দ্বৈতা-দ্বৈতলীলা প্রভৃতি বৈষ্ণব তত্ত্ব যে খুব গভীর, তাহা এ দেশের তত্ত্বশাস্ত্র যাঁরা কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু এসব তত্ত্বের বাষ্পও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীর ভিতরে ত কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কবিতাকে এই সব তত্ত্বের দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যা অনেক সময়ই গায়ের জোরের ব্যাখ্যা হয়। তখন পদাবলীর স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়—তার যে প্রাণ পুরুষটাকে উদ্ধার করিবার জন্য লেখক ব্যস্ত, তারই প্রাণ-দণ্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। কবীরের কবিতা পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষীয়

পরিচয় ছিল—কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্যে অথবা জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাসের পদাবলীতে কোন তত্ত্বের নাম গন্ধও কোথাও নাই। ইন্দ্রিয়লালসাকে এবং সময় সময় অতীন্দ্রিয় প্রেমকেও তাঁরা খুব উজ্জ্বল বর্ণে, মধুর ভাষায় ও ললিত ছন্দে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিশেষ তাকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে বলিয়াই যে সেই ধর্ম্মের চশমাতেই ঐ সকল কাব্যকে দেখিতে হইবে, এমন কথা আমি মনে করি না। Troubadour-সাহিত্য রোমান্‌ক্যাথলিক কি চক্ষে দেখিয়াছিল তাহা জানিবার দরকার নাই; সাহিত্যের তরফ হইতেই তাকে পড়িতে ও বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব কাব্যকেও কাব্য হিসাবেই দেখিব, কোন ধর্ম্মের Hymnology হিসাবে নয়।

অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীকে সাহিত্যের দিক্ হইতে পড়িলে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় বলিয়াই যে তাহা কাব্য নয়, এমন কথা আমরা বলি না। কেননা, কাব্যের প্রধান বিষয়ই passion বা রাগ এবং বিশেষভাবে Sex-passion বা মিথুনরাগ। সুতরাং "ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত্ গাঁথা যায় কি?"—এ প্রশ্নের কোনই সার্থকতা দেখি না। কারণ, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়কে পূর্ণভাবে স্বীকার করা চলে। সেইজন্য পৃথিবীতে যে সকল ভাগ্যবান কবি সেইভাবে ইন্দ্রিয়ের সুখকে গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁরা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের ভিতরে অরূপ অগন্ধ অস্পর্শ চিন্ময় সত্তার উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁদের কাব্যকে আমরা উচ্চ আসন দিয়া থাকি। তাঁদের মিথুন-রাগ পাশব মিথুন-রাগ নয়; তাহা ভাগবত মিথুন-রাগ, তাহা এক আশ্চর্য্য জিনিস। শেলি, ব্রাউনিং, হুইটম্যান্, ভিক্তর হুগোর কাব্যে এই ভাগবত মিথুন-রাগ ফুটিয়াছে বলিয়াই তাঁদের কাব্যের এত আদর। অন্য পক্ষে, গোতিয়ে, কীট্‌স্, হাইনে, বার্ণস্, মূর, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখকেই চরম করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া কবি-হিসাবে তাঁদের আসন নীচে। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দুই চারিটি পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হইবার যোগ্য; অবশিষ্ট পদ বার্ণস্, হাইনে প্রভৃতিদের কবিতার মত। একথা বলিলে ইন্দ্রিয়কে 'অস্বীকার' করা হয় না—সুতরাং "খৃশ্চানী নীতিকথা"র সঙ্গে এ কথার সাদৃশ্য যে কোথায় তাহা লেখক মহাশয়ই বলিতে পারেন।

সাহিত্যালোচনায় লেখক যেমন তুলনামূলক প্রণালী (Comparative method) মানেন না, তুলনামূলক সমালোচনার (Comparative criticism) প্রয়োজন স্বীকার করেন না, তেম্‌নি ঐতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির প্রয়োজনও খুব বেশি স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে আর মহাপ্রভুর আমলের বৈষ্ণব কবিতার যে কোন ভাবগত পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথার আঁচ তাঁর লেখায় কোথাও পাওয়া যায় না। বরং উল্টা দেখি, তিনি

এক জায়গায় লিখিতেছেন, "কত বিপদ, কত সংঘাত ও বিপ্লবের মধ্যেও চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া বাঙ্গলার পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তিটিকে নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি—যেন তাঁদের দুজনের সাধনা একই রকমের ছিল কিম্বা তাঁরা যেন সমসাময়িক ব্যক্তি।

অতএব, সাহিত্য-সমালোচনার কোন canon বা রীতিরই যিনি ধার ধারেন না, শুধু সকল বিষয়েই 'Sir oracle' হইয়া দম্ভসহকারে বলিতে থাকেন,—"হে বাঙ্গালী, জানিও, তাহা ছাড়া (অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি তাহা ছাড়া) আর কোন পথ নাই,—নাই।...গ্রহণ কর! গ্রহণ কর!" ..."জানিও ইহাই বাঙ্গলার অভয় বাণী" ইত্যাদি, তাঁর সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক, কেননা তর্কের পদ্ধতিকে ত তিনি খাতির করেন না। শুধু একটি কথা নিবেদন করিতে চাই যে, প্রকৃত Seer বা prophet-এর মুখে যে কথাটা শোভা পায়, নকল্-প্রফেটের মুখে সেই কথাটাই অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া উঠে।

বাংলা সাহিত্যের এই নূতন হঠাৎ-নবী বাংলার গীতি-কবিতার আলোচনার উপ-সংহারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিতে-ছেন ঃ—

"কিন্তু এই যে ফেরঙ্গ কবিতা বাঙ্গলার এবং মানুষের (?) খাঁটি মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গুরু রামমোহন রায়। "জবরদস্ত মৌলবী" রামমোহন বাল্য হইতে আরবী পারসী পড়িয়া যে ছাপ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ছাপে বাঙ্গলার ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া সমাজ-সংস্কারক রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মসমাজ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা একসঙ্গে যেমন নমাজ পড়ে, সেই অনুকরণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিক-তার উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর অযথা অন্যায় বিচার করিলেন।... ...

"তাই আমার মনে হয় যে, রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গলার প্রাণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। কেন না বাঙ্গলার নিজস্ব যে বৈষ্ণব ভাব যাহা বাঙ্গলার প্রাণকে ধর্ম্মকে জাতিকে সমাজকে সকল রকমে বাঙ্গলার সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন—মায়াবাদী বেদান্ত ও কোরাণের সঙ্গে হিন্দুর শাস্ত্রকে বেশ করিয়া গুলাইয়া দিলেন। অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী রামমোহন তাহার বুদ্ধির অসামান্য প্রতিভার ঘোরতর মল্লযুদ্ধ দেখাইয়া গেছেন একথা অস্বীকার করিতে পারিব না। তবে এই কথা বলিতে আমি বাধ্য হইব যে, খ্রীষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে হিন্দুর হইয়া তিনি যতই তর্ক করুন না কেন, এই ফেরঙ্গ আসিত না,—কখনই আসিত না, বাঙ্গলার ভাষাকে ইংরাজী করিতে পারিত না, বাঙ্গলার ভাবকে কখন ফেরঙ্গ করিতে পারিত না,—যদি তিনি, আমাদের দেশের সাধনাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেন ও করিয়া ইংরাজি সভ্যতা সাধনা এমন করিয়া দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন।"

রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এই স্পর্দ্ধিত উক্তিকে ছেলেমানুষি বা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। যুক্তিরও ইহাতে একান্ত অভাব। রামমোহন রায় ইংরাজি শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তন করিয়া 'ফেরঙ্গ' যুগ আনিয়াছেন ও 'ফেরঙ্গ' সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তার ফলেই না আজ বাংলা সাহিত্য ইউরোপের কাছে জয়মাল্য পাইয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্যে তার

গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে? এবং তার ফলেই না বিজ্ঞানে, দর্শনে শিল্পে, সমাজে—সর্ব্বত্র—ভারতীয় প্রতিভা বহু শতাব্দী পরে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে?—ইহা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য যে ইহাকে যিনি গায়ের জোরে অস্বীকার করেন, তিনি যে ডালে বসিয়াছেন সেই ডালই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন তাহাতো দেখাই যাইতেছে। রামমোহন রায় যদি "ইংরাজী সভ্যতা সাধনা দুই হাতে বরণ করিয়া গৃহে না তুলিতেন," তবে লেখকের পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে এই সব নূতন ব্যাখ্যা ও আলোচনা করাও আজ সম্ভবপর হইত না। তাঁর সাধের চণ্ডীদাসের যুগে বা রাম-প্রসাদ সেনের যুগে গানের উৎস যেমনি উচ্ছ্বসিত হোক্ না কেন, চিন্তার উৎস যে এযুগের মত নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের শত ছিদ্রমুখে উৎসারিত হয় নাই, এটা তো সুনিশ্চিত? এ সব হাস্যকর কথার উত্তর দিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

"আরব, পারস্য ও তুরস্কের মুসলমানী, দাক্ষিণাত্যি সভ্যতা ও বেদান্তমিশ্রিত খিচুড়ীর উপর ফেরঙ্গ ভাষা ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী রামমোহনকে" বুঝিবার স্পর্দ্ধা লেখকের থাকিতে পারে, কেননা তাঁর লেখা পড়িয়াই বোঝা যায় যে তিনি ঐ সব সভ্যতার কোন খোঁজই রাখেন না এবং বেদান্ত সম্বন্ধেও কিছুই জানেন না—অন্ততঃ অমন প্রকাণ্ড হিমালয়-সমান প্রতিভার পরিমাপ করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। রামমোহন রায়কে সকল দিক হইতে বুঝিতে পারেন এমন একজন সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিতের লেখা হইতে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া আমি লেখকের উক্তি যে কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত ও হাস্যকর তাহা প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করি। সে পণ্ডিত আর কেহই নহেন—তিনি আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনাচার্য্য। সকলেই জানেন যে, তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যেমন বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এমন আর কেহ করিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। রোমনগরে আহূত Congress of the Orientalists মহাসভায় তিনি Vaishnavism and Christianity সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। ১৮.৬।২৭এ সেপ্টেম্বরের Queen পত্রে প্রকাশিত রাম-মোহন রায় সম্বন্ধে তাঁরই রচিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমি কয়েকটি অংশ উদ্ধার করিব। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন:—

"For a right understanding and estimate of the Raja's thought and utterance, it is necessary to bear in mind the *two* essentially distinct but equally indispensable parts which the Raja played on the historic stage. There was Raja Ram Mohan Roy the cosmopolite, the Rationalist thinker, the representative man with a universal outlook on human civilization and its historic march; a Brahmin of the Brahmins, a hierophant moralising from the commanding height of some Eiffel Tower on the far seen vistas and outstretched prospects of the world's civilisation

... ... For him, all idols were broken and the parent of illusions, Authority, had been hacked to pieces. ... ... For him, the veil of Isis was torn ; the temple had been rent in twain and the Holy of Holies lay bare to his gaze ! ... ...

"But there was another and equally characteristic part played by the Raja—the part of the Nationalist Reformer, the constructiue practical social legislator—the Renovator of National scriptures and Revelations. ... ... Yes, the Raja *carried on Singlehanded the work of Nationaeist Reform and Scripture Renovation and interpretation for three such different cultures and civilisations as the Hindu, the Christian and Mahomedan.*

... ... To this cosmopolitan or universalistic department of the Raja's work belongs the founding of the Brahmo Somaj which by its trust-deed was to be a meeting-house of *the worshippers of the one God, whether members of Hindu, Mahomedan, Christian or other communities.* The Raja's Somaj was a meeting-house, a congregation of worshippers, but had no direct social significance whatever".

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তির সারমর্ম্ম এই :—

রাজা রামমোহন রায়কে ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তাঁর মধ্যে যে দুটো দিক্ ছিল তাহা মনে রাখা চাই—এক, তাঁর সার্ব্বজাতিক দিক্ ; আর এক, তাঁর স্বাজাতিক দিক।' সেখানে রাজা সার্ব্বজাতিক, সেখানে তিনি সর্ব্বসংস্কারমুক্ত, ব্রাহ্মণোত্তম, সেখানে তিনি যেন এক সমুচ্চ ঈফেল স্তম্ভের চূড়ায় উঠিয়া তাঁর দৃষ্টির সাম্‌নে দিকে দিকে প্রসারিত নিখিলবিশ্বমানব-সভ্যতার সুদূরব্যাপী দৃশ্য ও সম্ভাবনার সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য রহস্যবিৎ পুরোহিতের মত বলিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু রাজার আর একটি বড় দিক্ তাঁর স্বাজাতিক দিক্—সেখানে তিনি শাস্ত্রের শাসনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, সামাজিক বিধিবিধানকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। এ কাজ যে শুধু হিন্দুশাস্ত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধেই করিয়াছেন তা নয়—মুসলমান ও খৃষ্টান শাস্ত্র ও সভ্যতা সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কাজ তিনি করিয়াছেন।

আচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তাঁর সার্ব্বজাতিক দিকের কাজের মধ্যে তাঁর ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের যে ট্রষ্টডীড্ তৈরি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, একটা স্বতন্ত্র 'সমাজ' করিবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, তিনি তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপন্থীদের একটা সাধারণ সম্মিলনের স্থান করিতে চাহিয়াছিলেন—তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, বা খৃষ্টানই হোক্ না কেন।

অতএব, রাজা হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের 'খিচুড়ি' পাকান্ নাই ; তিনি ঐ তিন ধর্ম্মেরই তত্ত্ব, সাধন, আচারাদির বিশিষ্টতার মধ্যেই সার্ব্বভৌমিক আদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও এক মহা মিলন-মন্দিরে সকল

ধর্ম্মের লোকই মিলিতে পারে ভাবিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন—মুসলমানদের নকলে নয়। তিনি কোন ধর্ম্মকেই ভাঙেন নাই।

তারপর, রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বোঝেন নাই, সুতরাং বাংলা দেশকেও বোঝেন নাই,—বলা হইয়াছে। রাজা 'গোস্বামীর সহিত বিচারে' ভাগবত শাস্ত্র যে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নয়, এবং নিখিল হিন্দুশাস্ত্রেই, এমন কি ভাগবতেও, যে সাকার উপাসনার চেয়ে নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, গোস্বামীর মতের বিরুদ্ধে এই সকল কথা প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই বিচারে তিনি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রই হোক, পুরাণই হোক্ যখন ইহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তখন বুঝিতে হইবে যে, "এ সকল অধিদৈবত শাস্ত্র, ইহাতে যখন যে দেবতাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর অন্যদেবতার অপ্রাধান্য কহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা কেবল প্রতিপাদ্য দেবতার এবং গ্রন্থের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য্য হয়।"

রাজা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রকে কি ভাবে বিচার করিয়াছেন তাহা না জানিলে তিনি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষের প্রতি সুবিচার করিতে পারিয়াছেন কি পারেন নাই, তাহা বলা চলেনা। সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যেরই তুল্য মূল্য নয়; কোন্ শাস্ত্রকে কি ভাবে মানিতে হইবে এবং কতটা মানা চলে বা চলেনা তাহা রাজার শাস্ত্রমীমাংসা ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। কিন্তু যিনি নিখিল হিন্দু শাস্ত্রের কোন শাস্ত্রই জানেন না, 'ফেরঙ্গ' সংস্কারে যিনি আপাদমস্তক জড়িত, এবং 'ফেরঙ্গ' স্বাদেশিক অহঙ্কার যাঁকে হিন্দুর ধর্ম্মের উদার মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথে বাধা হইয়া আছে, তিনি কেমন করিয়া বুদ্ধ-শঙ্কর-রামানুজের এযুগের উত্তরাধিকারী রামমোহনের শাস্ত্রমীমাংসা বুঝিবেন? হিন্দু সভ্যতা ও সাধনা সম্বন্ধে আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু অজ্ঞ—কিন্তু সে অজ্ঞতা লইয়া দম্ভ করিতে ত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই?

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন :—

"Not only the Vedas, but also the Smritis, Puranas and Tantras are employed as sacred authorities by the Raja quite in accordance with the Hindu canons of scriptural interpretation. While express Hindu doctrines such as Avatara (Incarnation and Partial Incarnation) are recognised and sacred authors admitted for the well-known Puranas etc, the Raja interprets them all so as to make them compatible with the purest rationalism. For example, incarnation is shown by Shastric authorities to be inapplicable to God, but only to the created and perishable gods and goddesses, and belief in the existence of the latter as higher degrees of finite beings is deprived of all religion or spiritual significance and thus reduced to harmeessness. A handbock of Hin-

duism, according to the Raja, giving the substance of his redactions of all Hindu scriptures (including Puranas and Tantras) his proofs and authorities and his interpretations, would prove extremely useful in the present age and may be prepared on the basis of his works."

তারপর আর একটি মাত্র কথা বলিয়া চুকিতে চাই। হিন্দুসভ্যতার বর্ণমালা-জ্ঞান যার আছে, সে কখনই একথা বলিতে পারেনা যে, হিন্দুর ধর্ম্মে জ্ঞানের পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা অথবা ভক্তির মার্গই শ্রেষ্ঠ মার্গ। অথবা শঙ্কর ভ্রান্ত কিম্বা রামানুজ ভ্রান্ত। হিন্দু সকল মার্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছে। মুক্তির পথকে সে বিচিত্র বলিয়াই জানে—খৃষ্টানের মত dogmatism হিন্দুর ধর্ম্মের প্রকৃতিগত নয়। তা যদি হইত, তবে গীতাশাস্ত্রের উদ্ভব এদেশে হইতেই পারিত না। সুতরাং "প্রাণের অনুভূতির কাছে তর্ক বিচার ও শাস্ত্রমীমাংসা গোষ্পদের সঙ্গে তুলনীয়" এ কথা খৃষ্টানী কথা, হিন্দুর কথা নয়। এদেশকে যে ব্যক্তি কিছুমাত্র বোঝে নাই, হিন্দুর সভ্যতার মর্ম্ম যে একেবারেই ধরিতে পারে নাই, একথা তারি কথা হইতে পারে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, এ,এফ,এস,এস, এফ, আর, ই, এস বিরচিত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি সংক্ষিপ্ত জীবনী-গ্রন্থ। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় মুখবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন; ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, "রাজা দক্ষিণারঞ্জন সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর শিষ্য।… সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ।" তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন প্রধান সভ্য ও বেথুন স্কুল স্থাপনে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। "সিপাহীযুদ্ধের পর অযোধ্যায় দুর্ব্বিনীত ভূম্যধিকারিগণকে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে লর্ড ক্যানিঙ, ডাক্তার আলেকজাণ্ডার অকের পরামর্শে দক্ষিণারঞ্জনকে উক্ত প্রদেশে একখানি তালুক প্রদান করেন।… তিনি লক্ষ্ণৌএ ক্যানিঙ কলেজ স্থাপন ও ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন ও নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সমাচার হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সংবাদ-পত্র-প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য কার্য্যদ্বারা উক্ত প্রদেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন।… কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি ধর্ম্মনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে রাজার মনের তেজস্বিতা, হৃদয়ের উদারতা, বর্ণনার সমীচীনতা ও আলোচনার দূরদর্শিতা সর্ব্বথা অনুকরণীয়। তিনি বহুবিধ বাধা বিঘ্ন ও আন্দোলনের মধ্য দিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে উৎপীড়নের অবহেলায় ভয় উপেক্ষা করিয়া কিরূপে" জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, এই জীবনী গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণারঞ্জনের জীবন যেমন বিচিত্র তেমনি কর্ম্মময়; লেখকের রচনার গুণে জীবনীখানি উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বাজে গল্প বা

কিম্বদন্তীর আশ্রয় না লইয়া প্রাচীন কাগজ-পত্রের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যেক ঘটনার সত্যাসত্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া লেখক যে-সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেগুলির আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। জীবনী-লেখকের পক্ষে সংযম ও নিরপেক্ষতা প্রধান গুণ; সে গুণের পরিচয় এ গ্রন্থে আমরা পাইয়াছি। একদিকে উপাদান-সংগ্রহে লেখকের যেমন প্রভূত পরিশ্রমও অধ্যবসায়, অপরদিকে তেমনি সত্য-নির্দ্ধারণও নির্ব্বাচন-ক্ষমতারও পরিচয় এ গ্রন্থে বহুস্থলে পাইয়াছি। দক্ষিণারঞ্জনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণারঞ্জনের জীবন-কথায় সেকালের একটি ছবিও বেশ পরিপূর্ণ সুন্দর রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানির কলেবর দীর্ঘ নহে; অল্প পরিসরে বহু জ্ঞাতব্য কথাই সুশৃঙ্খল ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। গ্রন্থে দক্ষিণারঞ্জনের ও বিস্তর প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি বহিরবয়বও সুন্দর।

✓ চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মণিকা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। জাতিভেদ বা চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে গুণ-কর্ম্মানুযায়ী, মানুষেরই সৃষ্টি,—এই সত্য-প্রচার কল্পে এ গ্রন্থের সৃষ্টি। মানুষ নিজের চিত্তবৃত্তি লইয়াই কেহ ছোট, কেহ বড়। এই ছোট বড়'র নির্দ্দেশক আর সব মাপ-কাঠির কোনই মূল্য নাই—মানুষকে মানুষ বলিয়া মানাতেই মনুষ্যত্ব,—এই সকল সত্য নানা যুক্তি ও শাস্ত্রমতের সাহায্যে লেখক বুঝাইয়াছেন। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মিল আছে। উপবীত-ধারী নির্গুণ ব্রাহ্মণ উপবীতের জোরে সমাজে তরিয়া যাইবার আর বড় সুযোগ পাইতেছে না; গুণের সমাদর মানুষ করিতে শিখিয়াছে—তবে অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির আবর্জ্জনা এখনও পাহাড়-প্রমাণ সমাজের বুকে দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে হঠাইতে গেলে—একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সংস্কৃত শ্লোক চায়, শাস্ত্র চায়—বিবেকের বাণী এশ্রেণীর লোককে এতটুকু নাড়া দিতে পারে না—সেই শ্রেণীর লোকদিগের চোখ ফুটাইতে এ গ্রন্থের প্রয়োজন। লেখক শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই প্রমাণ করিয়াছেন, "অতি পুরাকালে ভূমণ্ডলে একমাত্র জাতি ছিল। সেই এক জাতি হইতে গুণ-কর্ম্ম-অনুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস ও অবস্থান-জন্য বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।" "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥" ইহলোকে বর্ণের ইতর-বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়, মানবগণ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। "সসর্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ চ চতুর্ম্মুখঃ। সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে॥" ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসোদ্রিক্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার বলবীর্য্য-সঞ্চার ও সাত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা-বিধানে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় উপাধি লাভ করিলেন। যাঁহারা কৃষি, গোরক্ষা, সুজল ধন ও ধান্সের উপায় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, তাঁহারাই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন; এবং যাহারা স্বভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি-সামর্থ্য-হীন, যুদ্ধে অপারগ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ-উপার্জ্জনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অক্ষম, তাহারা শূদ্র হইল অর্থাৎ তাহারা আর্য্যগণের পরিচর্য্যা ও সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। শাস্ত্র হইতে লেখক আরও প্রমাণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণ-কর্ম্মগত নয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণত্ব-প্রাপ্তির বিস্তর দৃষ্টান্ত তিনি দিয়াছেন। "যে গায়ত্রীদ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের সন্তান নহেন—ক্ষত্রিয়; তপস্যা-বলে উনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গাল, মুদ্গালের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" এমনি বিস্তর শাস্ত্রপুরাণোক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ লেখক করিয়াছেন।

এই সকল যুক্তি-তর্কের শেষে লেখক সমস্ত জাতিকে বলিয়াছেন, মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার কর—এক ভগবানের পুত্র বলিয়া ভ্রাতৃ-জ্ঞানে সকলকে বুকে টানো। এ গ্রন্থ-সঙ্কলনে লেখক যে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় করিয়াছেন, তাহা সার্থক হৌক্,—ইহাই আমাদের কামনা। তাহাতে দেশের মঙ্গল জাতির মঙ্গল—মনুষ্যত্বের মঙ্গল।

গিরিশচন্দ্র। বা গিরিশ-প্রসঙ্গ ও গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-তালিকা-সম্বলিত গিরিশ-গীতাবলী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই পাঁচ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের রচিত কয়েকটি গীত, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ কথা, তাঁহার রচনাবলীর সময়-নির্দ্দেশ-তালিকা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির মূল্য আছে। প্রকাশক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে গিরিশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখক প্রচুর উপাদান পাইবেন।

নিবেদিতা। শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, ২নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই গ্রন্থ প্রথম যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহার প্রশংসা করিয়াছিলাম। এ গ্রন্থে রচনা-ভঙ্গী ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মনোজ্ঞ সমাবেশ দেখিয়া প্রকৃতই আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আজ আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। বাঙালীর গৌরব, ভারতের গৌরব যে, নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়াও আমাদের আপন জন। প্রাচ্য জ্ঞান, প্রাচ্য সভ্যতা, প্রাচ্য আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবতী এই বিদেশিনী মহিলাকে পাইয়া আমরা সে আদর্শ, সে জ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিতে শিখিয়াছি। প্রাচ্য আদর্শ বজায় রাখিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে নিবেদিতা এদেশীয় বালিকা ও নারীগণের শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের গৌরবের সামগ্রী, আশার মন্দির। এই গ্রন্থে নিবেদিতার কর্ম্ম-জীবনের বিচিত্র কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় মনোজ্ঞ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙালী মাত্রেরই উচিত, এ গ্রন্থ পাঠ করা। এ গ্রন্থের সমগ্র আয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সেবায় প্রদত্ত।

স্বেচ্ছাচারী। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি উপন্যাস; 'ভারতী'তে গত বৎসর ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে এ উপন্যাসখানি যখন বাহির হয়। তখন অনেকেই ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। উপন্যাস খানির কয়েকটি চরিত্রে একটু নূতনত্ব আছে। কার্ত্তিকের স্বেচ্ছাচারিতা, অন্ধ বালিকা সরোজ ও সুকুমারীর প্রেম—উপভোগ্য হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের আলোচনায় লেখক নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তবে মণিশঙ্করকে লইয়া লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন—তাহার চরিত্র ফুটাইতে গিয়া অনেক স্থলে লেখক ছেলেমানুষীর পরিচয় দিয়াছেন—কার্ত্তিকের চরিত্রও মধ্য পথে হেঁয়ালির আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে—এই ত্রুটিটুকু স্বতন্ত্র গ্রন্থ-প্রকাশ-কালে পরিবর্জ্জন করিলে উপন্যাসখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময় লেখক এ কথাটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে



ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। হোলি-খেলা।

ভারতী

৪১শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৪ [১২শ সংখ্যা

"পাথর ফ্যট্ কর্ দরিয়া ছুটে !"

(ক)

রমেশের মতে গরম যখন চরম হইয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ বাতাস না-পাইয়া প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়ি খাঁচা-ছাড়ি করিতে থাকে, বিকালে তখন গড়ের মাঠের 'কার্জন-পার্কে' গিয়া হা-করিয়া হাঁপ্ ছাড়াই, বাঁচিবার পক্ষে সব-চেয়ে প্রশস্ত এবং সহজ উপায়। অতএব, তারা কয়বন্ধুতে প্রত্যহ এই প্রশস্ত এবং সহজ উপায় অবলম্বন করিত।

সেদিনও তারা 'কার্জন-পার্কে' গিয়া জমিয়াছিল।

রমেশ ঘাসের উপরে উড়ানি বিছাইয়া শুইয়াছিল, যোগেশ একটা মৌরির বিঁড়ি বারংবার নিবিয়া যাইতেছে দেখিয়া ক্রমেই চটিয়া উঠিতেছিল, সুরেশ একমনে একখানা বিলাতী ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িতেছিল এবং উমেশ সকৌতুকে দূরের এক বেঞ্চের দিকে স্থিরচক্ষে তাকাইয়াছিল;—সেই বেঞ্চখানার উপরে দু-জোড়া সাহেব-মেম বসিয়াছিল—তার মধ্যে যে সাহেবটি তাকিয়ার মত মোটা তাঁর মেমটি বাঁখারির মত রোগা, আর যে সাহেবটি বামনের মত বেঁটে তাঁর মেমটি প্রায় জিরাফের মত ঢ্যাঙা—এমন বিসদৃশ চার-চারটি চেহারা এক জায়গায় দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য, বড় দুর্লভ !

হঠাৎ পিছন হইতে চেনাগলায় একজন বলিল, "ওহে, আমি যে তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম !"

সবাই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া দেখিল, পরেশ। অমনি একসঙ্গে প্রশ্ন হইল, "কিহে, তুমি না পুরী গিয়েছিলে ?" "কবে ফিরলে হে ?" "জায়গাটা কেমন লাগল ?" "আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?"

পরেশ আগে সকলকার মাঝখানে আসিয়া বসিল। তারপর কোঁচানো উড়ানি-খানি খুলিয়া সাবধানে কোলের উপরে

রাখিয়া বলিল, "ভাই, আমি চতুর্ম্মুখ নই, সুতরাং একসঙ্গে তোমাদের চার-চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একে একে বলচি শোন। হ্যাঁ, আমি পুরী গিয়েছিলুম। আজ সকালে ফিরেছি। জায়গাটা ভালই লাগল—দোষের মধ্যে আমাদের কালো রং সেখানকার জল-হাওয়ায় ঘোরতর হয়ে ওঠে। পুরী থেকে আমি কণারকে গিয়েছিলুম—"

রমেশ চম্‌কাইয়া বলিল, "অ্যাঁঃ, কণারকে!"

—"ওকি, কণারকের নামে তুমি অমন চম্‌কে উঠলে কেন?"

—"না, না, ও কিছু নয়, তুমি যা বলছিলে বল!"

—"সে হবে না! আগে বল তুমি চম্‌কালে কেন?"

—"সে অনেক কথা!"

—"তাহোক্—বল!"

—"শুনলে তোমরা বিশ্বাস করবে না!"

—"যদি ভাল লাগে আর মাসিকপত্রের ছোটগল্পের মত চর্ব্বিতচর্ব্বণ না-হয়, তাহলে আমরা উনিশবার জেল-ফের্‌তা দাগী চোরের কথাও বিশ্বাস করতে রাজি আছি!"

—"কিন্তু—কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি বড় বেশী ল্যাজে খেলচ রমেশ!"

অগত্যা বাধ্য হইয়া রমেশ তার কথা সুরু করিল:—

(খ)

"অনেকদিন আগেকার কথা; আমরা কয় বন্ধুতে কণারক দেখতে গিয়েছিলুম।

কণারকের মন্দিরের কথা তোমরা অনেকেই জান, সুতরাং আমি আর মন্দিরের কথা বলতে চেষ্টা করব না।

কণারকের আশেপাশে মাঝে-মাঝে দু-চারখানি ছোটখাট গাঁ আছে; এ-সব গাঁয়ে লোকজন খুব কম, যারা থাকে তারা হচ্ছে চাষাভুষো ও গয়লা শ্রেণীর।

কণারক থেকে যেদিন আমাদের আসবার কথা, সেইদিন বৈকালে আমরা অম্‌নি একখানি গাঁয়ের ধার দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিলুম।

কৌতূহলী চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে আসছি, হঠাৎ একটা গাছতলায় পুতুলের মত কি-একটা নজরে ঠেকল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই এক পাথরের মূর্ত্তি—তার নীচের দিকটা বালিতে পুঁতে গিয়েছে।

মূর্ত্তিটি রমণীর—গড়ন দেখে মনে হোল কণারকের সেকেলে শিল্পীদেরই কেউ এটিকে গড়েছে! কেননা, তেমন রূপে-ভরা দেহ, হাসি-ভরা মুখ, ভাবে-ভরা চোখ বড় যে-সে কারিকরের কল্পনায় সম্ভব নয়,—উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্পের এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

এ-হেন মূর্ত্তি এখানে অযত্নে পড়ে আছে কেন, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমনসময়ে দেখি "আসুছন্তি ব্রজবাসী" বলে গান গাইতে-গাইতে, পাশ দিয়ে একজন গাঁয়ের লোক যাচ্ছে।

তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁরে, এ পুতুলটা এখানে পড়ে আছে কেন?"

উড়িয়া-ভাষায় সে যা বললে তার মর্ম্ম বুঝলুম এই যে, গাঁয়ের মধুসূদন [illegible]

বাড়ীতে এ মূর্ত্তিটা আগে ছিল, কিন্তু সে মরে যাবার পর তার ছেলেরা এটাকে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

—"ফেলে দিয়ে গেছে ? কেন রে ?"

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে লোকটা বললে, কেন সে তা জানে না! তার মুখ দেখে মনে হোল, সে যেন কি লুকোচ্ছে !

—"আচ্ছা, তুই এই পুতুলের গা থেকে বালিগুলো সরিয়ে ফ্যাল্ দেখি! বখ্‌শীষ পাবি।"

লোকটা কেমন শিউরে উঠে তিনহাত পিছিয়ে গেল। তারপর, দংশনোদ্যত সাপের দিকে লোকে যেমন করে তাকায় তেমনি ভীরু চোখে মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বললে, সে পারবে না!

থামকা লোকটা আঁৎকে উঠল কেন? মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে দেখলুম, আমার দিকে তার পাষাণ নয়ন তুলে সে যেন করুণ হাসি হাসছে; আপনার নীরব ভাষায় যেন বলছে, 'আমাকে উদ্ধার কর—এই আসন্ন সমাধি থেকে আমাকে উদ্ধার কর!'

লোভে আমার মনটা ভরে গেল। অপূর্ব্ব শিল্পের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যদি কলকতায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার বাড়ী আলো হয়ে উঠবে।

ফিরে দেখি, পিছনে সে লোকটা আর নেই, হন্‌হন্ করে তাড়াতাড়ি সে গাঁয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।

বন্ধুরাও আমাকে ফেলে অনেকদূরে এগিয়ে গেছেন, চেঁচিয়ে ডাকতে সবাই ফের ফিরে এলেন।

সকলে মিলে বালি সরিয়ে মূর্ত্তিটিকে আবার টেনে তুললুম। সেটি একটি নর্ত্তকীর নগ্ন মূর্ত্তি; এতক্ষণ তার আধখানা বালির ভিতরে ঢাকা ছিল বলে তার অপরূপ রূপ ভাল করে বুঝতে পারি-নি, এখন তার সবটা দেখতে পেয়ে আমাদের চোখে যেন তাক্ লেগে গেল! কী সুন্দর তার দাঁড়াবার ভঙ্গী, কী অপূর্ব্ব তার হাত-পায়ের শ্রী-ছাঁদ! আর পাথরের মূর্ত্তি যে এতটা জীবন্ত হোতে পারে, আমি তা জানতুম না; মনে হোল, শিল্পী আর-একটু চেষ্টা করলেই এর মৌনব্রত ভঙ্গ হয়ে যেত!

ভেবেছিলুম, মূর্ত্তিটিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে, গাঁয়ের লোকে নিশ্চয়ই উড়িয়া-ভাষায় যৎপরোনাস্তি রুদ্ররস প্রকাশ করবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কেউ টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না!

(গ)

"সন্ধ্যার পর আমরা কণারকের কালো দেউলের কালো ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে, সীমাহীন বালুকা-সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালুম!

আমরা চারখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করেছিলুম। অন্য তিনখানা গাড়ীতে দু-জন করে লোক উঠল, কিন্তু আমার গাড়ীতে সেই মূর্ত্তিটি ছিল বলে আমি ছাড়া আর কারুর জায়গা হোল না।

অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘুমন্ত সেই অনন্ত বালু-প্রান্তরকে চাকার শব্দে জাগ্রৎ করে, গরুর গাড়ীগুলো ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে চলতে লাগল। উপরে আকাশ, নীচে সেই ধূ-ধূ মরুভূম—চারিদিকে আর কিছুই নেই—না গ্রাম, না মানুষ, না গাছপালা!

সারাদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেহ-মন দুই কেমন এলিয়ে পড়েছিল—আস্তেআস্তে গাড়ীর ভিতরে দেহটাকে ছড়িয়ে দিলুম; আর, আমার পাশেই, নর্ত্তকীর সেই পাষাণ মূর্ত্তিটা, স্তব্ধ মৃত দেহের মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইল।...

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম ...... সেই পাষাণী নর্ত্তকী যেন প্রাণ পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! টানা টানা বিদ্যুৎভরা চোখ তুলে আমাকে তার পাশে দেখতে পেয়ে, কুন্দদন্তে অধর চেপে সে ফিক্ করে হেসে ফেললে, তারপর সামনের দিকে ধীরে-ধীরে তার দু-হাত বাড়িয়ে দিলে—আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে!

সেই জীবন্ত পাষাণীর আলিঙ্গন থেকে তাড়াতাড়ি যেমন সরে আসতে যাব—অম্‌নি চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ কচ্‌লে উঠে বসে দেখি, পাথরের প্রতিমূর্ত্তিটা গাড়ীর ভিতরে পাত্‌লা অন্ধকারে আবছায়ার মত দেখা যাচ্ছে; হঠাৎ দেখলে মনে হয় সে মূর্ত্তি যেন এক ঘুমন্ত মানুষের! বাইরে, মড়ার মত হল্‌দে আধ-খানা চাঁদ একরাশ এলমেল কালো মেঘের উপরে স্তম্ভিত হয়ে আছে। গভীর রাত্রি অত্যন্ত স্তব্ধ;—কেবল, খুব দূর থেকে চিরজাগন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত হাহাকার বাতাসের ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভেসে-ভেসে আসছে!

হঠাৎ আমার কাণে একটা শব্দ গেল। গাড়ীর ভিতরে কে ফোঁশ করে একটা নিশ্বাস ফেললে! প্রথমে ভাবলুম, আমার ভ্রম। কিন্তু তারপর ভাল করে শুনে বুঝলুম,—না, ভ্রম নয়, ভিতর থেকে নিশ্চয় কারুর নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে!

গাড়োয়ান-ছোঁড়াটা তখন নেমে গাড়ীর আগে-আগে হেঁটে চলছিল।

প্রতিমূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সে তেমনি স্থিরভাবে পড়ে আছে।—

ধাঁ-করে মনে হোল, কণারকের সেই গেঁয়ো-লোকটার রহস্যপূর্ণ আচরণ। বখ্‌শীষের লোভেও সে এই মূর্ত্তিটার গায়ে হাত দিতে রাজি হয়-নি! ...... এ মূর্ত্তিটাকে নিয়ে কিছু গোলমাল আছে নাকি? নইলে, দেখতে যাকে এত সুশ্রী, তাকে গাছতলায় অমন-করে ফেলে-দেওয়া হয়েছিল কেন?

নিশ্বাস তখনো উঠছে, পড়ছে! শুধু তাই নয়—গাড়ীর ভিতরে বিছানার তলায় খড় বিছানো ছিল—সেই খড়গুলো হঠাৎ খড়্‌খড়্ করে উঠল—কে যেন এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে শুল।

আমি ভূত মানি না। কিন্তু তবু কেন জানি না, আমার বুকের কাছটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে উঠল! গাড়ীর ভিতরপানে চাইতে আর ভরসা হোল না,—খালি মনে হোতে লাগল, যেন কার দু-দুটো পাথুরে চোখের থম্‌থমে চাহনি ধারালো ছুরির কন্‌কনে ফলার মত ক্রমাগত আমার পিঠের উপরে এসে বিঁধছে আর বিঁধছে! শেষটা এমনি অস্বস্তি হোতে লাগল যে, আমি আর কিছুতেই সেখানে তিষ্ঠতে পারলুম না,—এক-লাফে সে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে অন্য এক গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম! সেখানে আমার দুই বন্ধু শুয়ে

ঘুমোচ্ছিলেন; গুঁতোগুঁতি করে কোনগতিকে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলুম।

... ...

... ...

ভোর হোল। প্রান্তর তখনো শেষ হয়-নি।

নিজের গাড়ীতে ফিরে আসতেই দেখি, আমার বিছানার উপরে একটা কুকুরছানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে, নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছে!

কাণ ধরে সেটাকে তুলে বাইরে ফেলে দিলুম। ছানাটা কেঁউ-কেঁউ করে উঠতেই গাড়োয়ান-ছোঁড়া ছুটে এল। বললে, "বাবু, মের-না মের-না, ও আমার কুকুর!"

—"তোর কুকুর!"

—"হ্যাঁ বাবু, ওর মা মরে গেছে—তাই ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ীতেই থাকে!"

বুঝলুম, গেল রাত্রে গাড়ীতে কার নিশ্বাস শুনেছিলুম! কিন্তু, তবু—

(ঘ)

"কলকাতায় এসে নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটিকে আমার বাইরের ঘরের একটি ছোট টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

আমার স্ত্রী তাকে দেখবার জন্যে একদিন বাইরের ঘরে নেমে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাকে দেখে তিনি মতপ্রকাশ করলেন, "একে বাইরের ঘরে রাখা চলবে না!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কেন?"

—"কেন আবার! ওর পরোনে যে কাপড় নেই! মাগো, কি লজ্জা!"

—"ওঃ, তাই! কিন্তু রমা, তুমি কি জানো যে বড় শিল্পীরা যে-সব রমণীর মূর্ত্তি গড়ে নাম কিনেছেন, তার বেশীরভাগেরই গায়ে কাপড়-চোপড় নেই?"

—"কেন, তোমার বড় শিল্পীরা কি স্ত্রীলোককে এতই বেহায়া বলে মনে করেন?"

—"তা নয় রমা, তা নয়! অনাবৃত সৌন্দর্য্য যেমন স্বাভাবিক হয়, তেমন—"

—"থাক্ কথক-ঠাকুর, থাক্, তোমাকে আর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে না, ও-সব হচ্ছে ভুয়ো কথা!"—এই বলে রমা আবার নর্ত্তকীর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর ভঙ্গিভরে ব্যঙ্গ করে তার দিকে চেয়ে বললে, "মরে যাই, পরোনে কাপড় নেই—কালামুখীর দাঁড়াবার আবার ঢং দ্যাখ না—দি ঠাস্ করে গালে এক চাপড়!"—রমা মূর্ত্তির গালে সকৌতুকে একটি চড় বসিয়ে দিলে!

—কিন্তু সেইসঙ্গেই সে আর্ত্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেল! আমি অবাক হয়ে দেখলুম, তার মুখ একেবারে পাঙাশ হয়ে গেছে!

—"কি হোল রমা, অমন করে উঠলে কেন?"

—"আমার হাতে ও কাম্‌ড়ে দিয়েছে!"

—"কাম্‌ড়ে দিয়েছে! ক্ষেপে গেলে নাকি?"

—"ওকে চড় মারতেই ও-যেন আমাকে কটাস্ করে কাম্‌ড়ে দিলে! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, হাত দিয়ে আমার রক্ত পড়ছে!"

তাইত, রমার হাত দিয়ে সত্যিই রক্ত

গড়াচ্ছে যে! হতভম্বের মত মূর্ত্তির দিকে চাইলুম—কিন্তু তখনি বুঝতে পারলুম আসল ব্যাপারটা কি! নর্ত্তকীর নাকের ডগাটি শিল্পী অত্যন্ত সূক্ষ্ম করে কুঁদেছে, রমার হাত তার উপরে গিয়ে পড়াতেই আঁচ্‌ড়ে গেছে আর-কি!

কিন্তু রমা বিশ্বাস করলে না। আমার মুখে সে আগেই শুনেছিল, এ মূর্ত্তিকে আমি কি-করে কেমন অবস্থায় পেয়েছিলুম। সে বললে, "একে যখন লোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, তখন এ আপদকে ঘাড়ে করে বয়ে তোমার বাড়ীতে আনবার দরকার কি?"

স্ত্রীলোকদের কী কুসংস্কার! আমি হেসে বললুম, "যাও, যাও, আর পাগলামি করতে হবে না—হাতে জল দাও-গে যাও!"

ভয়ে-ভয়ে নর্ত্তকীর দিকে তাকাতে-তাকাতে রমা ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

আমিও কিন্তু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নর্ত্তকীর দিকে চেয়ে রইলুম! রূপের-গরবে-ভরা হাসিমুখে, আমার দিকে দুখানি নিটোল বাহু বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে,—যেন কার অভিশাপেই সে আজ নিশ্চল পাষাণে পরিণত হয়ে নিস্তব্ধ, নইলে ঐ মুখের কলহাস্যরোলে এবং ঐ চরণের রুণুরুণু নূপুরনিক্কণে এখনি আমার এ ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত!

(৬)

"বিনোদকে তোমরা সকলেই জান বোধ হয়। এখন তার যে ভয়ানক দশা হয়েছে, তার জন্যে দায়ী কে জান? নর্ত্তকীর ঐ প্রতিমূর্ত্তিটা! বিনোদ যদি ঐ নর্ত্তকীর প্রতিমা না-দেখত, তাহলে ভাল আঁকিয়ে বলে দেশ-বিদেশে আজ তার নাম ছড়িয়ে পড়ত—সে একজন মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠত!...... বিনোদের শোচনীয় পরিণাম তোমাদের কারুর অজ্ঞাত নেই, কিন্তু তার আসল কারণ খালি আমিই জানি।

বিনোদ কলকাতায় থাকত না। কলকাতায় যখন আসত তখন আমার বাড়ীতেই এসে উঠত। আমি ছিলুম তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

সেবারে কলকাতায় এসে দেবদাসীর এই মূর্ত্তিটা দেখে, সে আনন্দে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল। উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, "রমেশ, এ যে অমূল্য রত্ন! বন্ধু, তুমি লাখটাকা পেলেও আজ আমি এত খুসী হতুম না।"—বিনোদ কাছে দূরে আশপাশ সুমুখ ও পিছন থেকে নানারকমে ঘুরে-ফিরে প্রতিমূর্ত্তিটা দেখলে। তারপর তার গায়ের পরে আপনার হাত রেখে আবার বললে, "এ সেই অতীতের বিশ্বকর্ম্মার গভীর সাধনার ফল, এ যুগের সাধ্য কি এমন প্রতিমা গড়তে পারে! দেখ বন্ধু, এর পাষাণ-দেহে কি অপূর্ব্ব সুষমা, হাত-পায়ের কি বিচিত্র ভঙ্গিমা!...... আমি যদি সম্রাট হতুম আর এ যদি মানুষ হোত, এর একটি চাহনির জন্যে আমি সাম্রাজ্য বিকিয়ে দিতুম! হায়, এ হচ্ছে পাষাণী—একে ভালবাসলেও প্রতিদানে এর প্রেম ত আমি পাব না! তবু দেখ, এই পাষাণেও শিল্পীর হাতের

মায়াস্পর্শ পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যেন এই কঠিন পাথরের আড়ালে-আড়ালে প্রাণের লুকানো ধারা চুপি-চুপি বয়ে যাচ্ছে —হাত দিলে যেন হাতে তার উত্তাপ পাওয়া যায়!"—

এই বলে বিনোদ সেই প্রতিমার বুকের উপরে হাত দিলে—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুতাহতের মত হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

আচম্‌কা তার এই ভাবান্তর দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "কিহে, ব্যাপার কি?"

বিনোদের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হোল না। তারপর একবার সেই মূর্ত্তির দিকে, আর-একবার আমার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে চেয়ে আম্‌তা-আম্‌তা করে বললে, "একি সত্যি?"

—"কি সত্যি হে?"

—"দেখ রমেশ, এই মূর্ত্তির বুকে যেমনি আমি হাত রাখলুম অমনি আমার কি মনে হোল জান? মনে হোল ওর বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা দুপ্‌দুপিয়ে নেচে উঠল!"

আমি উচ্চস্বরে হেসে বললুম, "মূর্ত্তিটা দেখে তোমার এত আনন্দ হয়েছে যে তুমি একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসে আছ!"

বিনোদ প্রতিমার বুকে আবার হাত দিয়ে একটু হেসে বললে, "তাই বটে— আমারি ভ্রম। কৈ, এখন ত আর তা মনে হচ্ছে না—এ বুক এখন স্তব্ধ, স্থির, মৃত্যুর মত শীতল!" তারপর থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললে,

"হায়রে, পাষাণকে কি বাঁচানো যায়! তা যদি পারতুম, তাহলে আমরা,—শিল্পীরা, আজ শত শত নিখুঁত আদর্শ মানুষ গড়ে সমস্ত সংসারকে সুন্দর করে তুলতুম!"

(চ)

"আমার একটি বদ্ অভ্যাস আছে। রাত অন্তত দেড়টা-দুটো না বাজলে সহজে আমার ঘুম হয় না। প্রথম রাতটা আমি বই-টই পড়ে কাটিয়ে দি।

সে রাত্রে যখন পড়া সাঙ্গ করে উঠলুম, ঘড়িতে তখন দুটো বাজতে দশ মিনিট। আলো নিবিয়ে শুতে যাচ্ছি, এমনসময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেলুম।

এত রাত্রে জেগে কে? একটু আশ্চর্য্য হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিনোদ। বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত সে অস্থিরভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সে রাত্রে গরমটা পড়েছিল কিছু অতিরিক্ত; ভাবলুম, গরমে বোধহয় তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই সে বাইরে বাতাস পাবার জন্যে বেরিয়ে এসেছে। এই ঠিক করে তাকে আর না-ডেকেই আমি শুয়ে পড়লুম।... ...

পরদিন সকাল-বেলায় বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হোল, বললুম, "কিহে, কাল ভাল করে ঘুম হয়-নি বুঝি?"

সে বিস্মিত স্বরে বললে, "তুমি জানলে কি করে?"

আমি বললুম, "কাল রাত দুটোর সময় তুমি যখন বারান্দায় এসেছিলে আমি তখন জেগেছিলুম।"

বিনোদ আমার কাছে সরে এসে খুব মৃদুস্বরে বললে, "ভাই, কাল এক আশ্চর্য্য স্বপন দেখেছি।"

—"কি-রকম ?"

—"নর্ত্তকীর মূর্ত্তিটার একটা নকল তুলতে-তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখলুম, জানো ? দেখলুম, প্রতিমা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল—যদিও তার দেহ যেমন ছিল তেমনি পাথরেরই রইল। এক-পা এক-পা করে আমার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে-হাসতে সে বললে, 'তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও,—না' ? আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।—'তাহলে আমিও তোমাকে ভালবাসব, আর কখনো ছাড়ব না'—এই বলে সে আমাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করলে! তার সেই শক্ত পাথরের হাতের চাপে আমার দম যেন আট্‌কে আসতে লাগল। আমি জোর করে যেমন তার হাত ছাড়াতে যাব অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপর কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সেই বিদ্‌কুটে স্বপ্নের কথা কোনমতেই আর ভুলতে পারলুম না—সেটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে মাথাটা এমনি গরম হয়ে উঠল যে, শেষটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কাল সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে।"

কণারকের প্রান্তরে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেটাও অনেকটা এই ধরণের। আমার বুক কি-এক বিপদভয়ে গুর্‌গুর্ করে উঠল। তবে কি সত্যসত্যই এ একটু উত্তেজিত স্বরে বললুম, "বিনোদ, ও ঘরে আর তুমি শুয়ো না!"

আমার স্বরে চম্‌কে উঠে বিনোদ বললে, "কেন বল দেখি ?"

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললুম, "তুমি ও মূর্ত্তিটার কথা বড় বেশী ভাবছ। হয়ত আজও তুমি ওকে আবার স্বপ্নে দেখবে।"

বিনোদ হাসতে-হাসতে বললে, "দেখলুমই-বা, তাতে হয়েছে কি!—স্বপ্ন ত সত্য নয়!"

তাকে আমি আর-কখনো হাসতে দেখি-নি, সেই হাসিই তার শেষ হাসি!

(ছ)

"তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি—যে রাত্রির কথা আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

সে রাত্রেও আমি টেবিলের সামনে বসে একখানা বই পড়ছিলুম। রাত তখন একটার কাঁছাকাছি। চারিদিকে স্তব্ধতা যেন থম্‌থম্ করছে।

কোথাও কিছু নেই,—হঠাৎ একটা ভারি জিনিষ-পড়ার শব্দ হোল—সঙ্গেসঙ্গে ভয়ানক এক আর্ত্তনাদ!—সে কী চীৎকার,—চারিদিকের গভীর নীরবতার মধ্যে সে আর্ত্তনাদ যেন আকুল ভাবে ঝাঁপ দিয়ে কোথাও থৈ না পেয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ডুবে গেল!

একলাফে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম।

আমার স্ত্রীও ধড়্‌মড়িয়ে জেগে, বিছানায় উঠে বসে সভয়ে বললে, "ও কী গো,

আবার আর্ত্তনাদ! এবার তত জোরে নয়—কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণাভরা! এ যে বিনোদের স্বর!

আমি আর দাঁড়ালুম না, ঝড়ের মত বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে ছুটে গেলুম।

বাইরের ঘরের দরজা ঠেলতেই দড়াম্ করে খুলে গেল, ভিতরে ঘুট্‌ঘুট্ করছে অন্ধকার—মনে হোল, সে অন্ধকার হা-করে আমাকে গিল্‌তে আসছে!

শুনলুম, সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে অতি কষ্টে গোঁঙিয়ে-গোঁঙিয়ে বিনোদ বলছে, "ছাড়্, ছাড়্,—ওরে পিশাচী, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—ছে—" আর কথা বেরুল না,—কেউ যেন তাকে এত জোরে চেপে ধরলে, যে তার স্বর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল!

তোমরা বুঝবে না—সে যে কি-এক মহা ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ নেতিয়ে পড়ল; পারলে, তখনি আমি ছুটে পালাতুম—কিন্তু সে শক্তিও আমার ছিল না, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে-কাঁপতে মাটির উপরে আমি ভু-হাতে ভর্ দিয়ে বসে পড়লুম! অন্ধকার ঘরের ভিতরে কেমন একটা অস্পষ্ট ঝট্‌পটানি শব্দ হোতে লাগল—কেউ যেন কারুর সঙ্গে যোঝাযুঝি করছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ করতে পারছে না!... ... ক্রমে ক্রমে সেই ঝট্‌পটানি শব্দটা থেমে এল—তারপর, সব চুপচাপ! আর-একটু তেমন ভাবে থাকলেই আমি নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে যেতুম, কিন্তু বাড়ীর যে যেখানে ছিল সবাই জেগে উঠে আলো দেখে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে গেল।... ... ...

আড়ষ্ট চোখে দেখলুম, নর্ত্তকীর সেই প্রতিমূর্ত্তিটা টেবিলের উপর থেকে মাটিতে উপুড় হয়ে সটান্ পড়ে আছে, আর তারই তলায়, বিনোদের দেহ নিথর-নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে, পাথরের সেই ভারি মূর্ত্তিটা বিনোদের উপর থেকে তুলে ফেললুম। বিনোদের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, সে বেঁচে আছে।

তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হোল।

* * * *

সেই মূর্ত্তিটার চাপে বিনোদের দেহ আষ্টেপৃষ্ঠে থেঁৎলে গিয়েছিল; অনেক কষ্টে সে প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। এখন তার কাছে গেলে সে ক্রমাগত বলতে থাকে, পাষাণীর সঙ্গে প্রেম করে বুক তার পাষাণ হয়ে গেছে!"

(জ)

রমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ শ্রোতারাও কেউ কোন কথা কহিল না।

তারপর যোগেশ আপনার নিবন্ত বিঁড়িতে খুব-একটা জোর-টান মারিয়া বলিল, "সে লক্ষীছাড়া মূর্ত্তিটার কি হোল?"

রমেশ বলিল, "তাকে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়েছি।"

সুরেশ বলিল, "সেটা নিশ্চয় ভৌতিক মূর্ত্তি, নইলে—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিল, "না, আমি

—"তাহলে বিনোদের অমন দশা হোল কেন ?"

—"মূর্ত্তিটা বোধহয় কোন গতিকে তার ঘাড়ের উপরে পড়ে গিয়েছিল। এর-মধ্যে ভৌতিক কি আছে ?"

—"তবে সেটাকে ভাঙ্গলে কেন ?"

—"তারই জন্যে আমার বন্ধুর অমন অবস্থা হোল, সেই রাগে। ... ... কিন্তু মূর্ত্তিটাকে ভাঙ্গবার সময়েও আর এক কাণ্ড ঘটে। চাকররা যখন হাতুড়ি দিয়ে মূর্ত্তিটার উপরে ঘা মারছিল, তখন হঠাৎ তার গা থেকে একখানা ভাঙ্গা পাথর ঠিক্‌রে একটা চাকরের কপালে গিয়ে এমনি জোরে লাগে যে, সে তখনি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়।"

উমেশ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, "কি ভয়ানক! তবু তুমি বলতে চাও, এটা ভৌতিক ব্যাপার নয় ?"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, আমি ভূত মানি না।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব

কণারকে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা Antiquities of Orissa গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয়ই বোধ হয় প্রথম তুলিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ ষ্টার্লিং প্রণীত উড়িষ্যার ইতিহাসে কণারক বিষয়ক প্রবন্ধে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে ধউলি বা ধবলগিরি পর্ব্বতের গাত্রে অশোক-অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। প্রাচীন কলিঙ্গমণ্ডলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিস্তৃতির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইউয়েনচঙ্গ বা হুয়েন্‌সঙ্গ্ ভারতের এই অংশে তীর্থ ও দেবালয়াদি দর্শন করিতে আসিয়া Wou-yeau বা রাজা অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রায় দ্বাদশটি স্তূপ দেখিতে পান; ইহার সকলগুলিই নাকি তৎকালে অলৌকিক দৈবশক্তির বিকাশ-বাহুল্যে সবিশেষ প্রভাবান্বিত ছিল। (১)

তখন এ প্রদেশে শতসংখ্যক সঙ্ঘারামে প্রায় একহাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিত। সদ্ধর্ম্মী ও বিধর্ম্মীগণ একত্রেই বসবাস করিত। Stanislaus Julien প্রণীত ইউয়েনচঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বোধ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই প্রকাশিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁহার গ্রন্থে এ পুস্তকের ব্যবহার যথেষ্টই করিয়াছেন।

---

(১) "Hiouen Thsang found a dozen Stupas built by Wou-yeau (Asoka) on which were often-times refulgent the most extraordinary prodigies...hundred monasteries containing ten thousand monks who study the great translation—the heretics and

তার পর ফা-হি-য়ান প্রণীত Foe-ku-ki (ফো-কু-কি) গ্রন্থের মসিয়ে Reumsat Klaproth ও Landresse কৃত ফরাসী-অনুবাদের ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতায় ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়; সুতরাং ১৮৭৫ ও ১৮৮০ খৃঃ অব্দে Antiquities of Orissa গ্রন্থ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইবার সময় দেশীয় ঐতিহাসিকগণ ভালরূপেই এ পুস্তকের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে চৈনিক পরিব্রাজকবর পাটলিপুত্রে বৌদ্ধগণের রথযাত্রা দেখিয়া ভারতবর্ষে আগমন-কালে খোটানে পরিদৃষ্ট বৌদ্ধ রথোৎসবের সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। (১) বোধ হয়, এই বৃত্তান্ত-পাঠেই তদানীন্তন প্রাচ্যবিত্তাবিদ্‌গণ রথযাত্রামাত্রকেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কণারকে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। লোকের বিশ্বাস ছিল, "অর্কক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শন লাভ ঘটে।" রথযাত্রার উদ্ভব যে করিয়া বা যে ভাবেই হৌক না কেন, খৃঃ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে হিন্দুর বিস্তর আচার-অনুষ্ঠানে রথযাত্রার প্রচলন দেখিতে পাই। অগ্নিপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে পুস্তক-প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—"রথেন হস্তিনা বাপি ভ্রাময়েৎ পুস্তকং নরৈঃ।"

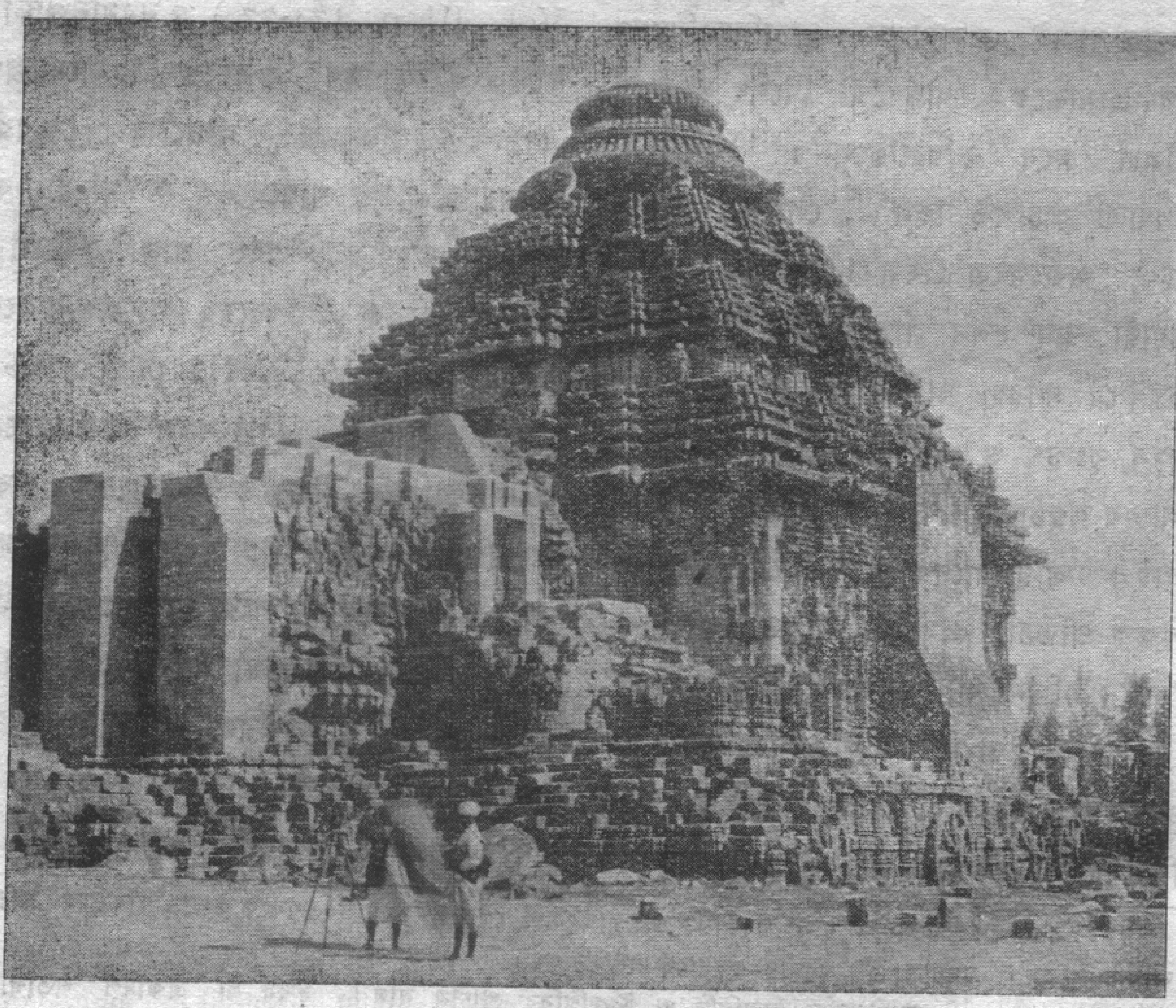
রথযাত্রা এখন জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ধবলগিরি হইতে বড়জোর দুই তিন দিনের পথ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সূর্য্যমন্দিরেও যে বৌদ্ধ প্রভাব আরোপিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্ব হইতে কোন বিশেষ ধারণার বশবর্ত্তী থাকিলে একদেশদর্শিতা সহজেই আসিয়া পড়ে; তখন যেটুকু নিজমতবাদের সমর্থন করে কেবল সেইটুকুকেই মূল্যবান মনে করিয়া হয় বাকী অংশটুকু বর্জ্জন করিতে হয়, নতুবা স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া সোজা কথার বিকৃতার্থ-গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না! ধউলির সান্নিধ্য-বশতঃ একসময়ে খণ্ডগিরির গুহাগুলিও বৌদ্ধ কীর্ত্তিরূপে প্রচারিত হইত; পরে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় অব্দের হস্তি-গুম্ফাস্থ নৃপতি খারবেলের খোদিত লিপির (Actes d Sixieme congr. or. Vol III. p. 174-77) ও নবমুনিগুম্ফায় জনৈক জৈন শ্রমণ শুভচন্দ্রের নামোল্লেখ এবং মঞ্চপুরি ও ললাটেন্দু কেশরী গুম্ফায় খোদিত খারবেলের অগ্রমহিষী বা প্রধানা মহিষীর এবং রাজা উদ্যোত কেশরী দেবের লিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার-ফলে (Ep. Indic. Vol. XIII. p. 160-166) এক্ষণে প্রাচীন কীর্ত্তি-বহুল খণ্ডগিরিতে জৈন প্রাধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে। রাজা অশোকের অভ্যুদয় খৃঃ পূঃ তৃতীয় অব্দে; তাহার এক শতাব্দী পরে খৃঃ পূঃ ২য় অব্দ হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই এগার-বারো শত বৎসর ধরিয়া ধৌলীর অদূরবর্ত্তী কুমার ও কুমারী পর্ব্বতে (২) জৈন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাদের স্থাপত্য-কলা ও

(১) কেহ কেহ বলেন, প্রব্রজ্যা-গ্রহণের পূর্ব্বে রাজকুমার গৌতম রথারোহণপূর্ব্বক উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। রথযাত্রা এই ঘটনার স্মরণার্থে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) কুমার ও কুমারীপর্ব্বত খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির প্রাচীন নাম; দশম বা একাদশ শতাব্দীতে

ভাস্কর্য্যের স্থায়ী-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল হইতে দুই-এক শতাব্দীর মধ্যেই যদি এরূপ একটি ভিন্ন ধর্ম্ম নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ অব্দে হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কণারক মন্দিরেই যে সর্ব্বপ্রকারে বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান থাকিবে ইহা কখনও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ফার্গুসন সাহেবের গ্রন্থোক্ত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-প্রণালী প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের কল্পিত শ্রেণী-বিভাগ আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় জৈন স্তূপও দেখা যায় এবং জৈনগণের ভুগ্নতা-বিশিষ্ট (curvilinear) মন্দিরাদির ন্যায় হিন্দু মন্দিরাদিরও অভাব নাই। তাই শিল্পকলা বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, "Works of art and architecture should be classified with regard to their age and geographical position and not according to the creed." অর্থাৎ শিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনাদির শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে ধর্ম্মমতাদির উপর নির্ভর না করিয়া যুগ, কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের কথাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে কণারকের নাম হইতেই আরম্ভ



কণারক-মন্দির ; উত্তরদিক

করা যাক। রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেব প্রভৃতি গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে "কোণা কোণ" এই নামটি পাওয়া যায়; (J. A. S. B. 1896. p. 251) ইহা হইতে কোণার্ক শব্দ সাধারণতঃ 'কোণা'র অর্ক (সূর্য্য) এই অর্থেই গৃহীত হইয়া থাকে। (Vincent Smith's History of Fine Art in India and Ceylon. p.28. Foot-note) কিন্তু বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিতে চান যে বুদ্ধদেবের অপর একটি নাম কোনা-গমন বা কোনাকমন; এবং ইহারই অপভ্রংশে কোণা কোণা শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। (Bishunswarup's Konarak p. 85) 'কমন' বা 'গমন' শব্দ একবারে হ্রস্ব হইয়া 'কোণায়' পরিণত হওয়া কতদূর সহজ, তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাই বলিতে পারেন; তবে একেবারে পূরামাত্রায় "বৌদ্ধ" মতবাদ প্রতিপন্ন করার জন্য অমরকোষ অভিধানে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের নামান্তর অর্কবন্ধু শব্দের "বন্ধু" ফেলিয়া "অর্ক" টুকু কোণা-গমনের 'কোণা'র সহিত জুড়িতে গেলে ছেলেবেলাকার সেই "কামারের মারে ফেলে" ইত্যাদি বালসুলভ হেঁয়ালির কথাই মনে পড়ে!

ইঁহারা কিন্তু বলিতে চান, যখন বুদ্ধের দুইটি বিভিন্ন নাম কাটিয়া তাহার দুইটিরই "মুড়া" মাত্র "জোড়া" দিয়া কোণার্ক পাওয়া যায়, তখন কণারক যে প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থান, তাহা প্রমাণের আর বাকী রহিল কি? ইহার উপর দ্বিতীয় প্রমাণ—"রথ"। কণারকে রথযাত্রা ত হইতই, তাহার উপর আবার মন্দিরটিও চক্রসংযুক্ত রথাকৃতি! যদি বলিতে চান, "সূর্য্যদেব ত সপ্তাশ্ব-সংযুক্ত রথেই বাহিত হন"(১) তাহাতেই বা আর আসিল-গেল কি? ইঁহারা তর্কে পরাভূত না হইয়া বলিবেন, সপ্তাশ্ব যে



অশ্বমূর্ত্তি

(১) "সসপ্তাশ্বে সৈকচক্রে রথে সূর্য্যো দ্বিপদ্মধৃক্" অগ্নিপুরাণ, ৫১—১।

পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত হয় নাই, প্রাচীন কালে যে চারিটি মাত্র অশ্বই বিদ্যমান ছিল না, এ-কথাই বা কে বলিল? পরবর্ত্তী-কালে এই সকল প্রস্তরময় অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা-পরিবর্ত্তন-বিষয়ক কোনরূপ সন্তোষ-জনক প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া উল্টা পদ্ধতিতে প্রমাণের ভার প্রতিপক্ষের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই নিরস্ত হইতে হয়!

কিন্তু আজিকার কালে সকলেই facts লইয়া ব্যস্ত, তাই ঐতিহাসিক বিতণ্ডায় শুধু কল্পনার দৌড়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। লোকে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "আচ্ছা মহাশয়, বৌদ্ধ তীর্থই যদি হইল, তাহা হইলে ভাস্কর্য্য নিদর্শনে তাহার প্রমাণ কোথায়?"

বৌদ্ধপ্রভাব পোষকতা-কারিগণের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ইহার চারি-পাঁচটি উদাহরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রমাণ এই যে মন্দিরের সর্ব্বত্র অসংখ্য হস্তীমূর্ত্তিই দেখা যায়; এমন কি গর্ভ-গৃহের রত্নবেদীটিও হস্তী-চিত্র হইতে নির্ম্মুক্ত নহে। সুতরাং ইহাদের মতে (১) প্রাচীন বৌদ্ধস্থাপত্য নিদর্শনে দৃষ্ট এ-জাতীয় জান্তব চিত্র যে বৌদ্ধ প্রাধান্যেরই পরিচয় দিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? খৃঃ ১১১৭ হইতে ১২৫৮ অব্দে নির্ম্মিত হৈশলেশ্বর মন্দিরেও গজ-আলম্বন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে কারণে কেহই এ দেউলটিকে প্রাচীন "বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত উপাসনার স্থান" বলিয়া প্রচার করেন নাই। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহের মন্দিরেও হস্তীমূর্ত্তি বিরল নহে। বুদ্ধদেব নাকি পূর্ব্বজন্মে হস্তিপকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতাও নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেন এক শ্বেত হস্তী তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিতেছে! সুতরাং আর যায় কোথা? বেদীনিহিত একটি বালক ও একটি হস্তীর চিত্র অসঙ্কোচে জাতক-কাহিনী-সংক্রান্ত চিত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জাতক কাহিনীর চিত্রাবলীর মধ্যে যে কোন প্রকার পারম্পর্য্য রক্ষিত হইবে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং বরবুদুর প্রভৃতি স্থানের চিত্রগুলিও এই মতেরই সমর্থন করিতেছে। বেদীর একটি চিত্রকে শাম্ব ও সূর্য্যের মিলন বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী অপর একটি ফলকের চিত্রটিকে জাতক কাহিনী-সংক্রান্ত বলিয়া প্রকাশ করিলে স্বভাবতঃই মনে সন্দেহ জন্মে। মন্দিরস্থিত সুবৃহৎ গজসিংহ মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সেগুলি নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী কেশরী-রাজগণের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) গয়ার বরাবর পাহাড়ে লোমশ ঋষির গুহার প্রবেশ-দ্বারের facade বা সম্মুখভাগে গজ আলম্বন দেখিতে পাওয়া যায়। (P. 20 History of Fine art in India and Ceylon), কঠিন quartzose gneiss প্রস্তরে পালিস করা গুহার দেওয়ালগুলি নির্ম্মাতাগণের বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। এই গুহা-শ্রেণী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে "আজীবিক" সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ম্মিত হয়। (V. A.

হৈশলেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শার্দ্দূল আলম্বনে বহুবিধ শার্দ্দূলের চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ হৈশল বল্লালগণের লাঞ্ছন-স্বরূপ শার্দ্দূলচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ বাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কণারকে যেরূপ হস্তী-শ্রেণীর ন্যায় নরশ্রেণী বা সাদী সৈন্যশ্রেণী দেখা যায়, হৈশলেশ্বর মন্দিরেও সেইরূপ অশ্বশ্রেণী ও নরশ্রেণী বিদ্যমান, তাই Vincent Smith মহোদয় শার্দ্দূলগুলিকে emblem বা লাঞ্ছন বলিয়া স্বীকার না করিয়া "canonical scheme of decoration" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ডাঃ ফ্লিট-প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আনুমানিক খৃঃ একাদশ শতাব্দীর যযাতি-কেশরী বা মহাশিবগুপ্ত এবং জন্মেজয় বা মহাভবগুপ্ত এই দুইজন ব্যতীত মাদলাপঞ্জীর বংশাবলী-বর্ণিত অপর কেশরী-রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। (Ep. Indic Vol. III. p. 324. 336et. seq.) সুতরাং সোমবংশীয় নৃপতি-গণের লাঞ্ছনরূপে না হউক (১) অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত স্থাপত্য-বিষয়ক অলঙ্কার-রীতির অনুযায়ী বলিয়া হংস আলম্বনের ন্যায় (goose frieze) গজসিংহ মূর্ত্তিগুলিও উড়িষ্যার মন্দিরাদিতে স্থান পাইয়াছিল। বড় ঝাঁজি নামক যে জলজ উদ্ভিদের চিত্র কণারক মন্দিরের Pilasters বা উদ্গত স্তম্ভাদির গাত্রে পদ্ম-পত্রাদির অলঙ্কারের ন্যায় উৎকীর্ণ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার স্থাপত্যেও সেইরূপ লক্ষ্য করিয়াছেন ; (M. Ganguli's Orissa. p. 100) কিন্তু ইহাতে এইটুকুমাত্র বুঝায় যে মকর-চিহ্ন প্রভৃতির ন্যায় এই জাতীয় স্থাপত্য-প্রণালীও বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিয়া ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দেশের হিন্দু-মন্দিরাদিতেও স্থান পাইয়াছে। অশোকস্তম্ভে হংস-আলম্বন বা হস্তীর চিত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সকল স্থলেই যে তাহা বৌদ্ধভাব জ্ঞাপন করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? কেহ কেহ মন্দির-গাত্রস্থ একক বা আলিঙ্গন-বদ্ধ এবং লীলায়িতপুচ্ছ (scroll work) রূপে অঙ্কিত নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কাশ্যপ-সন্তান সহস্র-সংখ্যক নাগগণের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বে বর্ণিত আছে। (M. Ganguly's Orissa p. 177-178) যক্ষ রাক্ষসের ন্যায় তাহারাও প্রায় demi-gods শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মনসা-পূজাকালে অনন্ত বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ প্রভৃতি অষ্ট নাগের নামও যথাক্রমে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। নাগগণ হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে নাগদিগের উল্লেখ দেখা যায় বলিয়া এবং

---

(১) মহাশিবগুপ্ত বা যযাতির মরঞ্জমুরা তাম্রশাসনে যে seal বা মুদ্রা দেখা যায়, তাহাতে গজলক্ষ্মী বা কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি-অঙ্কিত শার্দ্দূলের চিহ্নমাত্র নাই। (J. B. O. R. S. March 1916) জন্মেজয়ের তাম্রশাসনে অঙ্কিত মুদ্রায় "a man in a squatting posture" বা উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তিমাত্র দেখা গিয়াছে। (Mr. B. C. Mozumdar's article in Ep. Indic Vol XI p. 93

সাঞ্চী ভারহুত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ স্থাপত্যে নাগমূর্ত্তি দেখা যায় বলিয়া যে হিন্দু মন্দিরের নাগমূর্ত্তিগুলিও বৌদ্ধধর্ম্ম-পরিচায়ক বলিয়া ঘোষিত হইবে, ইহা খুব সঙ্গত মনে হয় না। অবশ্য প্রাচীন রীতির বৌদ্ধ নাগমূর্ত্তিগুলির সহিত মধ্যযুগের (later Brahminical period) হিন্দু নাগমূর্ত্তির যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। (M. Ganguly's Orissa p. 178) আমাদের বঙ্গদেশে একশ্রেণীর প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখা গিয়া থাকে। বৌদ্ধ স্তূপের গাত্রেও এরূপ চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশীয় এ শ্রেণীর কোন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে এরূপ চিত্র দেখিয়া দেবালয়টি শিবপূজার্থ ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধস্তূপ রূপে বিদ্যমান ছিল, এরূপ ধারণা করিলে যে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, জাতক-কাহিনীতে উল্লেখ-হেতু কণারকে নাগ বা হস্তীচিত্র দেখিয়া বৌদ্ধপ্রভাব-বাদীরাও সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়। খোদিত চিত্রের নিম্নদেশে প্রাচীন শিল্পীগণ চিত্রের বিষয় বা নিজেদের নামধাম কিছুই লিখিয়া রাখিতেন না, তাই অনেক সময়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও বুঝিবার ভুল ঘটিয়া থাকে। আধুনিক কালে তাই দেখিতে পাই যে যে-চিত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-শিক্ষা-দান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ডাঃ কুমারস্বামীর ন্যায় বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় শ্রেণীর মূর্ত্তিতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত এখন তাহাই বৈষ্ণবগুরুর চিত্র বলিয়া মতপ্রকাশ করিতেছেন। (Vishwakarma, part VII. plate 72) চিত্রটির যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহা কেবল বৌদ্ধ চিত্রেরই নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।



শিক্ষাদান

অপর একটি চিত্র লইয়াও এইরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এটি স্থানীয় পাণ্ডাগণ পরশুরামের শরক্ষেপণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পক্ষান্তরে পণ্ডিত বিষণস্বরূপ; বলেন, ইহা শরভঙ্গ নামক জাতক কাহিনীর চিত্র। বুদ্ধদেব শর-সন্ধান ও লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতায়

বিনা-শিক্ষায় অপর ধনুর্দ্ধরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইহাই না কি এ চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরশুরাম যে শরনিক্ষেপ করিয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সে কথা হিন্দু শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত আছে, সুতরাং যে মন্দিরের গাত্রে সীতার বিবাহ, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত ছিল, যেখানে বিষ্ণু, বালগোপাল, বৃহস্পতি ও গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুদেব-দেবীগণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেই মন্দিরেই যে বৌদ্ধ জাতক কাহিনীর চিত্রাবলী অসংলগ্ন, পারম্পর্য্যবিহীনভাবে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইবে, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ



বিষ্ণুমূর্ত্তি—কণারক

হয় না। এটি পরশুরামের চিত্র বলিয়া স্বীকার করায় আপত্তি থাকিলে শরক্ষেপণ-পারদর্শিতার secular চিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা বাধা কি? কোণার্ক মন্দির-গাত্রে সেরূপ secular শীকার-চিত্রেরও অভাব নাই।

আর একটি 'দণ্ডায়মান' মূর্ত্তির শিরোদেশে বিততফণ সর্পমূর্ত্তি দেখিয়া সেটিকে মুচলিন্দ বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি দুইটিকে শ্রেষ্ঠী পত্নী সুজাতা ও তাঁহার দাসী পুন্না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় কণারক প্রবন্ধে আমি এ মূর্ত্তিটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। ১৯০৩অব্দে যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সর্পরাজ মুচলিন্দের সহিত একত্র-অবস্থিত যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল, (Catalogue—No. 6290) তাহার সহিত এ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। সে নমুনায় বুদ্ধদেব মুচলিন্দের শিরোদেশে উপবিষ্ট। শুধু সর্প-চিহ্ন দেখিয়া বৌদ্ধ বা জৈনমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। এ চিত্রটি টি, গোপীনাথ রায় মহাশয়ের Iconography গ্রন্থে বর্ণিত মধ্যম ভোগস্থানক শ্রেণীর লক্ষ্মী ও পৃথ্বী দেবীর সহিত একত্র দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। কণার্ক মন্দিরের (plinth) পীঠভাগে গাছের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং ক্লোরাইট পাথরের সুন্দর চৌকাঠটির একাংশে মহালক্ষ্মীর শ্রীদেবীর মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছে। গাছের ছবি থাকিলেই

যে তাহা বোধিক্রমের চিত্র হইতে হইবে তাহা নহে এবং খণ্ডগিরির জৈন ভাস্কর্য্যেও রেলিং-দিয়া-ঘেরা বৃক্ষাদির চিত্র দেখা যায়। মহালক্ষ্মী, শ্রী বা গজলক্ষ্মী (১) প্রভৃতি মূর্ত্তি বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুগণের সাধারণ সম্পত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। (Mr. M. Chakravarty's Note on Dhaoli Udaygiri and Khandgiri-caves) সাঞ্চীস্তূপের মত খণ্ডগিরিতেও শ্রীমূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে, আবার পুরুষোত্তমে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত লক্ষ্মী মন্দিরেও শ্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। ১৯০৪ সালের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহোদয় উড়িষ্যার অপর অংশে অবস্থিত নরসিংহনাথ নামক মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য প্রণালী বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে কণারক মন্দিরের জগমোহনের সহিত নবম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে নির্ম্মিত এ মন্দিরটির জগমোহনেরও যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। ইহারও চৌকাঠ কাল পাথরের, সুন্দররূপে খোদাই করা এবং lintel বা সর্দ্দালের গাত্রে চামর-ধারিণী পরিচারিকাসহ পদ্মাসনা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। দুইপার্শ্বে দুইটি গজ শুণ্ডের দ্বারা দেবীর মস্তকোপরি দুইটি কলস ধারণ করিয়া আছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর Fergusson ও Burgess প্রণীত Cave-temples of India গ্রন্থের ৭১ পৃঃ ১নং প্লেট (ছবি) উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কটকের প্রাচীন গুহায় ও দক্ষিণ উড়িষ্যার মন্দিরসমূহেও দ্বারদেশে যে "গজলক্ষ্মী"-মূর্ত্তি আছে, তাহা যে এ মন্দিরেও স্থান পাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? স্বস্তিক প্রভৃতি চিহ্নের ন্যায় শ্রীমূর্ত্তিও শুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্যই মন্দিরাদির ভিত্তিগাত্রে বা দ্বার-দেশে তাহা খোদিত করার প্রথা। এ শ্রেণীর conventional design বা সর্ব্ব-জন-গৃহীত-রীতি কোন সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যে শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্য অনেকে উড়িষ্যার মন্দিরগুলির বিশেষত্ব বলিয়া মনে করেন, কণারকেও তাহার অভাব নাই। কেহ কেহ বলেন, এই বিকৃত রুচিপরিচায়ক মিথুন মূর্ত্তিগুলি বামমার্গাবলম্বী তান্ত্রিক মতের প্রবল প্রভাবের পরিচায়ক। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধগণ যাহাতে মন্দির-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে না চাহেন, সেই জন্যই এই সকল অশ্লীল চিত্রগুলি দেউল-বক্ষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাব-বাদীরা বলিয়া থাকেন যে এই সকল বিভিন্ন ভঙ্গীর যুগলমূর্ত্তি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনের চিত্র। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে যে বজ্রপাতনিবারণার্থ মন্দির-গাত্রে মিথুন-মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট করিবে। উৎকল-খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "বজ্রপাতাদি ভীত্যাদি বারণার্থং যথোদিতং। শিল্পি শাস্ত্রেঽপি মণ্যাদি বিন্যাসং পৌরুষাকৃতি॥" ইহার বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ অগ্নিপুরাণেও দেখা যায়, সৌধাদির শাখাশেষে

(১) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে গজলক্ষ্মী নামে পরিচিত মূর্ত্তিগুলি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তি।

মিথুনমূর্ত্তি-সন্নিবেশ করিবার উপদেশ আছে। "মিথুনৈঃ পাদবর্ণাভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ।" অগ্নি-পুঃ ১০৪-৩০। শ্রীযুক্ত ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মহোদয় তাঁহার সিংহল ও ভারতীয় ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (১) কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রানুযায়ী নবরসের চিত্রাদির মধ্যে আদি রসযুক্ত চিত্রগুলি "আদৌ" বলিয়া কিছু অধিক মাত্রায় স্থান পাইয়াছে। সে যাহা হউক ইহা যে বিশেষভাবে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন, তাহা কখনই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। বিভিন্ন দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মমতাদি আলোচনা করিলে মনে হয়, পণ্ডিতবর Kraft Ebbing যথার্থই বলিয়াছেন, "Sexual feeling is really the root of all ethics and no doubt of æstheticism and religion." (Psycho-Sex. p. 2) মধ্য আমেরিকায় Stephens ও Catherwood সাহেবদ্বয়ের অনুসন্ধান-ফলে অনেক বৃহদাকার সৌধের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির কার্ণিশে ব্রীড়াজনক (membra conjuncta in coitu) চিত্রের অভাব নাই। (Squier's Serpent Symbol. p. 48) Westroph সাহেবও Panuco (পানুকো) প্রভৃতি নগরের মন্দিরে ও সাধারণ স্থানে লিঙ্গচিহ্ন খোদিত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (Primitve Symbolism, p. 33) Squier এই চিত্রগুলি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে শৃঙ্গার ভাস্কর্য্যের ন্যায় এই যুগল মূর্ত্তিগুলিতেও বিবিধ 'বন্ধ' প্রদর্শিত হইয়াছে (like those in India representing in various manners the union of the two sexes). মেক্সিকোতে সূর্য্যই প্রধান উপাস্য দেবতারূপে পরিগণিত হইত এবং এসিয়ার ন্যায় এখানেও সৌরোপাসনা লিঙ্গপূজার সহিত জড়িত ছিল। (Serpent Symbol p. 47). Dulaure পানুকো নগরে যে সকল খোদিত বা আলেখিত চিত্রাদি দেখিয়াছিলেন, Bertram সাহেব তাহার অনুরূপ চিত্রাদি Tlascalla নামক স্থানের দেবমন্দিরাদির (sacred edifices) গাত্রে অঙ্কিত দেখিতে পান। Tlascallaর গ্রীক (Greek) জাতির মধ্যেও সৌরোপাসনা প্রবলভাবেই প্রচলিত ছিল; সুতরাং যে প্রভাব সার্ব্বভৌমিক, তাহাতে কেন যে ধর্ম্ম-বিশেষের মতবাদ আরোপিত হইবে, তাহাও বুঝিতে পারি না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ইতিহাস গ্রন্থের মুখবন্ধে মাননীয় স্যার জে, জি, উড্রফ মহোদয় লিখিয়াছেন, যে ডাক্তার মেটরলিঙ্ক পথিক্ গির্জ্জার (cathedrals) গাত্রে ও স্থানে স্থানে এরূপ চিত্রাদি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উড্রফ মহোদয় বলেন, শুধু ভাবপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে প্রাকৃত (natural) তথ্যের মীমাংসা হয় না। মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে যে কণারকের গর্ভগৃহস্থ সূর্য্য ও চন্দ্র-মূর্ত্তি রাজা

(১) "Such sculptures are supposed to be a protection against evil spirits and

পুরুষোত্তম দেবের পুত্র নরসিংহদেবের রাজত্ব-কালে পুরী বা পুরুষোত্তমে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের সূর্য্য মন্দিরে যে মূর্ত্তি রহিয়াছে অনেকের মতে ইহাই সেই সূর্য্যমূর্ত্তি। ইহার সন্নিকটস্থ মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় বুদ্ধমূর্ত্তি বলিতে চান, কিন্তু Modern World পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হিমাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবগ্রহ-প্রস্তর-নিহিত চন্দ্রমূর্ত্তির সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দর্শন করিয়া এ মূর্ত্তিটিকে চন্দ্রমূর্ত্তি বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। কণারকে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমূর্ত্তিও যে পূজিত হইত এ প্রবাদটিও ইহার পোষকতা করিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সৌরোপাসনা (Heliolatry) ভারতে পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই এবং পরে উহাই শিবোপসানায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল; যেহেতু সূর্য্য, শিবের আটপ্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তিরই অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধপ্রভাব-বাদিগণ এই মতটি স্বপক্ষে প্রয়োগের সুবিধা বুঝিয়া ইহার সমর্থন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন; কারণ সৌরোপাসনা যদি subsidiary cult বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধমন্দির সৌরোপাসনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই মতটির সমর্থনেরও সুবিধা ঘটে। সৌরোপাসনা একসময়ে হিমালয় ক্রোড়স্থ কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড (১) মন্দির হইতে সমুদ্রতীরস্থ কোণার্ক পর্য্যন্ত বিস্তার



কাশ্মীর—মার্ত্তণ্ড-মন্দির

(১) মার্ত্তণ্ডমন্দির খ ৮ম শতাব্দীতে (৭২৪ হইতে ৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে) রাজা ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার gable, trefoil-arch, quasi-doric স্তম্ভশ্রেণী প্রভৃতির চিত্র দেখিয়া মনে হয় যে কোণার্ক মন্দির এ আদর্শে নির্ম্মিত হয় নাই। 'আইন-ই-আকবরী'র গ্রন্থকার আবুল ফজল বোধ হয় ভ্রমাত্মক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

লাভ করিয়াছিল। মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মধ্যভারতে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্য-মন্দিরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। (Report Arch. survey W. India Vol. IX p. 73-74) বঙ্গদেশেও সৌর প্রভাব বড় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেন-বংশীয় রাজা পরমেশ্বর পরম ভট্টারক শ্রীমৎ কেশবসেন বা বিশ্বরূপ সেন আপনাকে "পরমসৌর" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। তাঁহার তাম্রলিপির প্রথম শ্লোকেই "নমো নারায়ণায়" শব্দের পরেই—

"বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকার
কারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তিহেতুং"

প্রভৃতি বচনে সূর্য্য-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছে। সূর্য্য-পূজা নারায়ণপূজায় কি শিবোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা বিচার করিবার স্থান ইহা নহে, তবে এই শ্রেণীর শ্লোক ও সাধারণের মধ্যে "সূর্য্যনারায়ণ" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দ হইতে সূর্য্যোপাসনা নারায়ণোপাসনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার যাদুঘরে (মিউজিয়ম) রক্ষিত শিরোভাগে-পদ্মচিহ্নে-চিহ্নিত সূর্য্য-নারায়ণ-শিলা ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে, মার্ত্তণ্ডমন্দিরে সূর্য্যমূর্ত্তিও বিষ্ণু নামেই স্থানীয় লোকের মধ্যে পরিচিত ছিল; (local name of Vishnu as Sun-God) কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ ব্লক মালদহে একটি আদিত্যমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে অমর-কুণ্ডগ্রামের গঙ্গাদিত্য নামক অশ্বারূঢ় সূর্য্য-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এ মূর্ত্তিটি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। এখনও বাঙ্গলার কোনও কোনও স্থানে সূর্য্যমূর্ত্তি ষষ্ঠী প্রভৃতি নামে পূজিত হইতেছে। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চুঁচুড়ার সূর্য্য-মূর্ত্তি ৯৭ পৃষ্ঠা) পাটনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পট্টনেশ্বরীর মন্দিরের বহিঃ-প্রাঙ্গণে একটি বৃহদায়তন সূর্য্যমূর্ত্তি রক্ষিত আছে দেখিয়াছি। ডাঃ ডি, আর ভাণ্ডারকর মহাশয় রাজপুতানা ভ্রমণ-প্রসঙ্গে সিরোহীর অন্তর্গত খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বসন্তগড়ের সূর্য্যমন্দিরের এবং যোধপুরের অন্তর্গত অসিয়া (Osia) নামক স্থানে অবস্থিত অষ্টম শতাব্দীর অপর একটি মন্দিরের বিবরণ (Progress Report Arch. Survey W. India 1905—6 p. 51—52) পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত করিয়াছেন। দুইটি মন্দিরই বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত। যে সূর্য্য-পূজা এককালে এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা একবারে প্রভাবশূন্য subsidiary cult মাত্র হইলে কাশ্মীর হইতে মধ্যভারত পর্য্যন্ত কখনই এতগুলি সূর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইত না। কোণার্কের মন্দিরও যে সৌরোপাসনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং এখানে সৌরোপাসনা যে রূপান্তরিত রথাকৃতি বৌদ্ধমন্দিরে পরগাছার ন্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া শৈবোপাসনায় পরিণত হয় নাই ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

কণারকের ভাস্কর্য্য-আলোচনা-কালে কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রাদির অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নাই। পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট্যাদিতেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতেও কণারকে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন মূর্ত্তি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। হ্যাভেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয়গণও এ-সম্বন্ধে নীরব। তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও ললিতকলা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে কণারকে বৌদ্ধপ্রভাব-সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র নাই। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচিত তথা-কথিত বৌদ্ধ নিদর্শনগুলিও বৌদ্ধপ্রভাবের নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং যতদিন প্রাচীন লিপি বা লেখ প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত প্রমাণ না আবিষ্কৃত হয়, ততদিন কোণার্কমন্দির বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট বা বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত বলিয়া বিবেচনা না করাই সঙ্গত।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

স্বরলিপি

গান

ওরে আমার, হৃদয় আমার
কখন তোরে প্রভাত কালে
দীপের মত গানের স্রোতে কে ভাসালে!
যেনরে তুই হঠাৎ বেঁকে
শুক্‌নো ডাঙায় বাস্‌নে ঠেকে,
জড়াস্‌নে শৈবালের জালে।

তীর যে হোথা স্থির রয়েছে
ঘরের প্রদীপ সেই জ্বালালো
অচল শিখা তাহার আলো
গানের প্রদীপ তুই যে গানে
চল্‌বি ছুটে অকূল পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে।

ম
II গা মা—ণা। ণা ধা—পমা I মা ধা—া। ধা ধণা—র্সা I ধা র্সা।
ও রে ০ আ মার ০ হৃ দয় ০ আ মার ০ ০ ০

র্স ধ স
ণা।—া—ধা—পা I পর্সা র্সা—া। ণা ধা—া I সা সা—া। রা রা
০ ০ ০ ০ ক খন ০ তো রে ০ প্র ভাত কা লে

ম
। I সা রা ।। গা গা—া I রা গা—া। মা পা—া I গা—া মা।
০ দী পের ০ ম ত ০ গা নের ০ স্রো তে ০ কে ০ ভা

ম ধ
ণা ধ—া I না—া না। না না—া I র্সা—া—া।—া । । II
সা লে ০ কে ০ ভা সা লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধ র্স র্স র্র ণ
II র্মা র্মা—র্গা। র্রা র্সা । I না র্সা—া। না সা—ণা I ধা ণা—
যে ন ০ রে তুই ০ হ ঠাৎ ০ বেঁ কে ০ বেঁ কে

ধ প
ধা। পা পধা—ণা I ধা—া ।।—া—া—া I ণা—র্রা র্সা। ণা ধা
০ বেঁ কে ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ শুক্ ০ নো ডা ঙায়

ম ম ম
পমা I গা—া মা। গা মা—া I গা মা—া। গা মা—া I পা ধা
০০ যাস্ ০ নে ঠে কে ০ জ ড়াস্ ০ নে শৈ ০ বা লের

র্স র্র
। । না র্সা—া I না র্সা—া। না র্সা—া II সা—া সা। রা গা—া I
০ জা লে ০ জা লে ০ জা লে ০ তীর ০ যে হো থা ০

ধ ম ধ
I মা—ধা পা। গা মা—া I মা মা—পা। পা পা—া I পা।—ধা।
স্থির ০ র য়ে ছে ০ ঘ রের ০ প্র দীপ ০ সেই ০ জ্বা

ণ ধ র
ধা পধা—ণা I ধা।—া।—া।—া—া I মা মা—ধা। পা মা—গা I সা
লা লো ০ গো ০ ০ ০ ০ ০ অ চল ০ শি খা ০ তা

ধ র্স
রা গা। গা মা । I র্মা র্মা র্গা। র্রা র্সা—া। না—া র্সা। । ।
হার ০ আ লো ০ গা নের ০ প্র দীপ ০ তুই ০ যে ০ ০

র্স র্স র্স র্র ণ
। I র্মা র্মা—র্গা। র্রা র্সা—া I না।—র্সা I না সা—ণ I ধা ণা

ণ স´
ধা। পা পধা ণা। ধা—া—া। । । । I ণা—র্া সর্া। ণা ধা—
০ গা নে ০ রে ০ ০ ০ ০ • চল্ ০ বি ছু টে

ম ম ম ম ম
পমা I গা মা—া। গা মা—া I গা মা—া। গা মা—া। পা ধা—া
০০ অ কূল ০ পা নে ০ চ পল ০ ঢেউ য়ের ০ আ কুল ০

স´ স´ র´
না সর্া—া I না সর্া—া। না সর্া—া II II
তা লে ০ তা লে ০ তা লে ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঁধিয়া

(গল্প)

আমার এই দুঃখের কাহিনী কাউকে শোনাব বলে' যে লিখতে বসেছি তা নয়। আমার মনের কথা মুখ-ফুটে বলতে না পেরে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দুঃখের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দুঃখ যে দূর হয়না তা সবাই জানে, কিন্তু তবু মানুষ চুপ করে থাকতে পারেনা। আমার কাছে যে কেউ নেই! কাকে বলি? তাই আপনার মনে নিজের কাহিনী লিখতে বসেছি।

মনে পড়ে সেই দিন, যেদিন উৎসবের একটা ঝটকা বাতাস নিয়ে শ্বশুরবাড়ী প্রবেশ করেছিলুম, শাঁখ, ঢাক, শানাইয়ের আওয়াজ আর চেঁচামেচির মধ্যে আমাকে বরণ করে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আমায় ঘরে তুলে নিলে। আমাকে দেখে আমার শাশুড়ীর পছন্দ হল, তিনি বল্‌লেন, বেশ বৌ হয়েছে—

আমার স্বামী আমার বিবাহে একটি পয়সাও নেননি; আর একটি পয়সাও না নেবার মতন লোক এতদিন খুঁজে পাওয়া যায় নি বলেই ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাকে থুবড়ো-আইবুড়ী থাকতে হয়েছিল।

আমার নাম সুরবালা; বাবা আমায় সুরো বলে ডাকতেন। আমি তাঁর বড় আদুরে মেয়ে ছিলুম। বাপের বাড়ী বাবার সঙ্গে-সঙ্গেই গিয়েছে,—এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার শ্বশুরবাড়ী বল্‌তে কিছু আছে কি না?

ছেলেবেলাতেই মা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে না, বাবা একলাই দুজনের স্থান অধিকার করে আমায় মানুষ করছিলেন। তিনি সরকারী চাকরী করতেন; কখনো এখানে, কখনো সেখানে—এমনি করে তাঁকে চারদিকে ঘুরে

পারতেন না। তাঁকে ছেড়েও আমি থাকতে পারতুম না। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাকেও ঘুরতে হত। চাকরী করা ছাড়া তাঁর একমাত্র কাজ ছিল আমায় লেখাপড়া শেখানো আর টাকা জমানো। তিনি বলতেন, "সুরো, তোর এমন জায়গায় বিয়ে দেবো যে—"

বাবার সদা-সহাস্য মুখের সেই কথাগুলো আজও মাঝে-মাঝে মনে পড়ে আর হাসি আসে।

জীবনের ধারা এইরকম শুভ্র, স্বচ্ছ, তরঙ্গহীন গতিতে বেশ একটানা বয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘটনায় বিপরীত তরঙ্গ ছুটল।

একদিন বাবা আফিস থেকে ফিরে আসবার পর, রোজ যেমন যাই তেমনি হাসিমুখে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। দেখলুম তাঁর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ, চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে। আমার হাতদুটো তাঁর হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি গুমরে কেঁদে উঠে বললেন,—সুরো আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে মা—

জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে-ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা থাকত সেটা ফেল হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনেক কষ্টে জমানো টাকা-গুলোর একটা পয়সাও ফিরে পাবার আশা নেই।

তাঁর চোখের জল জীবনে সেই একদিন মাত্র দেখেছি। এর আগে তাঁকে কখন সামান্য বিষণ্ণ হতেও দেখিনি। আমি চিরদিন হাসতেই দেখেছি,—খালি হাসি আমি মানুষ হয়ে উঠেছিলুম, চন্দ্রসূর্য্য, রাত্রিদিন, আকাশ-পৃথিবী চিরকালই আমাকে সহাস্য মূর্ত্তিতেই দেখা দিয়ে এসেছে, দুঃখের সঙ্গে, কান্নার সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। সেদিন বাবার চোখে জল দেখে আমার মনে কি ভাব এসেছিল এত দিন পরে ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারব না, তবে এই ছবিটা এখনো মনে আছে যে আমি যেন দেখতে লাগলুম তাঁর চোখের জলে আমার সেই হাসির রাজ্যটা ভাসতে ভাসতে দূরে মিলিয়ে গেল ;—উপরের নীল আকাশ এমন গাঢ় হয়ে এল যে সে অন্ধকার ভেদ করে কাউকে চিনতে পারবার যো রইলনা, আর সেই অনন্ত অশ্রু-পারাবারের মধ্যে আমি একা—

ওঃ, মানুষের চোখে এত জলও থাকতে পারে !

সমস্ত রাত্রি ভাবনায় কেটে গেল, সে কত-রকমের ভাবনা ! একটা থেকে আর একটা, আবার সেটা শেষ হবার আগেই আর-একটা, এমনি করে যেন একটা চিন্তার পৃথিবী আমার মাথার ভিতর পাক খেয়ে-খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আপন-হারা হয়ে বসেছিলুম, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই চমকে উঠলুম ! মনে হল, সামনে থেকে কে যেন সরে গেল।

তখন বুঝতে পারিনি, সে কে ? আজ মনে হয় সর্ব্বনাশের দূত এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল, শুধু বাবার জন্যে সে সাহস করে ঢুকতে পারেনি।

তখনো একেবারে ফর্সা হয় নি, মুমূর্ষু

সূক্ষ্ম রেখার উপর দোল খাচ্ছে, অবশ পা-দুটোকে কোনরকমে সোজা করে সে দুটোর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি, সামনে বাবা দাঁড়িয়ে।

তিনি বললেন—সারা রাত্রি জেগে এখানে বসে আছিস মা?

আমি আর কোন কথা বলতে না পেরে তাঁর বুকে মুখ রেখে কাঁদতে লাগলুম।

তিনিও আমায় জড়িয়ে ধরলেন; একটা কথা কানে গেল—"টাকাগুলো গেল বুঝি! তোর উপায় কিছু করে যেতে পারলুম না।"

কিছুক্ষণ পরে একটা আশীর্ব্বাদী চুমু আমার মাথার উপর দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বাবা অফিসে গেলেন, বুঝতে পারিনি এই যাওয়াই তাঁর শেষ-যাওয়া। বিকেলবেলায় অফিসের লোকেরা তাঁকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে এল, শুনলুম, তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে। ডাক্তার ডাকা হল। তিনি বললেন এ মূর্চ্ছা ভাঙবে না, আত্মীয়-স্বজন যদি কেউ থাকে ত এইবেলা খবর দিন, বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার বেশী বাঁচবেন না।

সর্ব্বনাশ এত কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ মানুষ তার গন্ধও পায় না!

* * * *

মামার বাড়ীতে আমায় বেশী কষ্টভোগ করতে হয়নি। প্রথমটা একটু কষ্ট মনে হত। তার কারণ কষ্ট কাকে বলে এর আগে একেবারেই জানা ছিল না, আজকের [illegible] সে দিনগুলোর সুখ-দুঃখের জমা-খরচ খতিয়ে দেখলে দেখতে পাই তখন সুখের মাত্রাই বেশী ছিল।

মামা আমার আপনার মামা নন্, মার মাসতুত ভাই। বাবার মৃত্যুর আগে তাঁকে আমি বার-কয়েক দেখেছিলুম মাত্র। তাঁর সঙ্গে বাবার পত্র-ব্যবহার চলত। তিনি আমায় নিয়ে এলেন।

তিনি বেশ দিলখোলসা লোক ছিলেন। সামান্য চাকরী করতেন, যা মাইনে পেতেন তাতে কোনরকমে সংসার চলে। তার উপর আমার মত একটা ধাড়ী মেয়েকে এ-রকম ভাবে আশ্রয় দিয়ে ঘরে নিয়ে আসাতে মামী আমাকে সুনজরে দেখতে পারলেন না। কিন্তু ক্রমে সেটাও আমার সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

মামার বাড়ী আসার মাস কয়েক পরে প্রায় বছর দুই ধরে আমার জন্যে তাঁদের বড় অশান্তিতে কাটাতে হয়েছিল। সেটা হচ্ছে আমার বিবাহ নিয়ে। টাকা না পেলে কেউ বিয়ে করতে চায় না! মামা মনে করেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে, টাকা না হলেও চলবে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর অর্থের জোগাড় করতে না পারলে যে পাত্রের অভিভাবকের মন টলে না, এই অভিজ্ঞতাটা তাঁর আমার উপর দিয়েই হয়ে গিয়েছিল।

মামীর তাড়না আর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন। কিন্তু এত অশান্তির মধ্যেও তাঁকে একটা কটূ কথা বলতে শুনিনি। ধন্য তাঁর ধৈর্য্য! পরের মেয়ের জন্য এতটা সহ্য করতে পারে, এ-রকম লোকও দুর্লভ নয়।

তারপর সেইদিন সত্যি সত্যিই এল। শুনলুম, আমাকে দেখে একজন পছন্দ করেছেন। তিনি এক পয়সাও চান না, তাঁর অবস্থা ভাল, হাতে শুধু দুগাছা রুলি পরিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন এই খবর পেলুম, শুনলুম তিনি এক পয়সাও নেবেন না, শুদ্ধ আমাকেই চান, তাঁর দামটা আমার এই নিঃস্ব মামা বেচারাকে দিতে হবে না, কৃতজ্ঞতায় প্রাণটা তখন কানায় কানায় ভরে উঠল। মনে মনে তাঁকে নতি জানিয়ে বললুম—কে তুমি শুকতারার মত আমার দুঃখের রাত্রিতে এসে দেখা দিলে? তোমায় চিনিনা আমি, কিন্তু তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আমি পেয়েছি। হে দেবতা, আমায় নিয়ে যাও তুমি তোমার মন্দিরে, বড় দুঃখী আমি, ভালবাসার কাঙাল আমি—আমায় ভালবাসো।

আনন্দের আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লুম। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রা, তন্দ্রা, নিদ্রার মধ্য দিয়ে কেমন করে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। সকালে উঠে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে সংসারের কাজে লেগে গেলুম।

স্বামীকে দেখলুম। তিনি পরম রূপবান না হলেও সুশ্রী বটে। ফুলশয্যার দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম কথা হল। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে কথা, সে—যাক্, সেদিনকার কথা আর তুলব না।

শ্বশুরবাড়ী যখন এলুম, তখন প্রকৃতির বীণায় বসন্ত-রাগিণীর পুরোদমে মহড়া ডাকে বাইরে যেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল, বাড়ীখানাও তেমনি নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়ার গোলে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল।

ঘর আর বাহির দুইয়ে মিলে আমায় অভিষেক করে সেবারকার বসন্তের রাণী বলে ঘরে তুলে নিলে।

শ্বশুরবাড়ীতে আমার পদার্পণের পর বাড়ীর চেহারা ফিরে গেল। আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন; শুনলুম বিধবা হওয়ার পর তাঁর মুখে কেউ হাসি দেখেনি, আমি বাড়ী আসার পর তাঁকে সবাই হাসতে দেখলে।

আমার স্বামী সদা-প্রফুল্ল লোক। আনন্দের আস্বাদন আমি জীবনে এই যে প্রথম পেলুম তা নয়, কিন্তু এ যেন নতুন রকম! সামান্য সামান্য ঘটনা আমার প্রাণের মধ্যে একটা আনন্দের ঝড় তুলে দিয়ে যেত। বাতাস লাগলে আমার পা-থেকে মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়াগুলো অবধি শিউরে উঠত। ফুলে এত রংয়ের বাহার, এতদিন ত লক্ষ্য করিনি! দীঘির জল এমন টলটলে জীবনে এর আগে ত তা দেখিনি! সন্ধ্যায় দিগন্তের ধার ঘেঁসে দিনের তরী সোনালি পাল উড়িয়ে অস্ত-অচলের উদ্দেশে চলে যেত, শুক্ল চতুর্দ্দশীর নিটোল গোল চাঁদখানা আমাদের কালো আয়নার মত দীঘিটার বুকের উপর পড়ে নির্জ্জনে নীরব প্রেমালাপ আরম্ভ করত, আমি আত্মহারা হয়ে দেখতুম, আর মনে হত ঠিক এমনধারা

আনন্দের প্রবাহ আমার মধ্যেই যে শুধু প্রবাহিত হচ্ছিল, তা নয়, দেখলুম আমাকে ছাড়িয়ে সেটা গ্রামময় তার রঙিন নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে।

বিকেলবেলায় আমি গা ধুয়ে ছাদের উপর অনেকক্ষণ বেড়াতুম। একদিন দেখি সামনের বাড়ীর একটা ছেলে আমাকে দেখচে। একটু লক্ষ্য করে বুঝলুম আমি যেন তাকে না দেখতে পাই এমনিভাবে একটা জানলার আড়ালে সে দাঁড়িয়েছে। সেই ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারাটা দেখে আমার মায়া হতে লাগল। সে কতদিন যে স্নান করেনি তার ঠিকানা নেই; হাঁ করে তন্ময় হয়ে আমাকে দেখছিল। দুই একদিন বাদে দেখলুম ছেলেটা স্নান করতে সুরু করেছে। আবার কিছুদিন পরে সেও আমার মত ছাদে বেড়াতে আরম্ভ করে দিলে। তার সেই শুয়ার-কুচি চুলে বেশ করে তেল দিয়ে টেরি বাগানো আর গুণ-গুণ করে গান গেয়ে ছাদে বেড়ানো দেখে আমার হাসি পেত।

বাড়ীর পিছনদিকে আর-এক জনেরা থাকত। সে-বাড়ীরও একটা ছেলে হঠাৎ সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করলে। বাপ্ রে বাপ, সে স্বর-সাধনা মনে পড়লে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! দিনরাত্রি জানলার ধারে বসে হারমোনিয়ামে গলা ভাঁজা। নিশ্চয়ই বলতে পারি, যদি তার সাধনা সেই রকম ভাবে চলে থাকে তবে এত দিনে নিশ্চয় সে একজন গুরুগম্ভীর ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

রাস্তার ধারে একটা জানলা ছিল, আমি মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতুম। কিছুদিন যেতে না যেতে দেখি পাড়ার লোকগুলো জানলা-মুখী ব্রত নিলে। এমন তাদের তন্ময়তা যে একদিন সত্যিই একটা লোক গাড়ী চাপা পড়ে প্রাণটা হারাবার যো করেছিল। কিন্তু তবুও বিরাম নেই। উঃ, কী গভীর সাধনা!

কেউ কেউ বেশী সাহসী হয়ে মাঝে মাঝে জানলার ধারে এসে শিষও দিত। প্রথম প্রথম এদের ব্যাপার দেখে আমার বেশ মজা লাগত, কিন্তু ক্রমেই সেটা অসহ্য হয়ে উঠল। একদিকে সেই কদাকার চেহারাটার দিনরাত উঁকি-ঝুঁকি, পিছনদিকে সুর-সাধনার সেই বিকট চীৎকার, আর সাম্‌নে রাস্তার ধারে জানলার কাছে লোকের ভিড় দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। ক্রমেই তারা বেশী সাহসী হয়ে উঠতে লাগল। আমার ইচ্ছে হত বাইরে গিয়ে সব কটাকে ধরে আচ্ছা করে কান মলে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার ত বাইরে যাবার উপায় নেই, আমি যে কুলবধূ!

ঘরের চারদিকের জানলাগুলো আমি দিনকয়েক বন্ধ করে রেখে দিলুম। একদিন আমার স্বামী বললেন, জানলাগুলো বন্ধ রেখে কি দম আটকে মারবে!

জানলা বন্ধ করার কারণ শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই হাসিতে আমি থতমত খেয়ে কিছু বলতে পারলুম না। তিনি নিজের হাতে জানলাগুলো খুলে দিয়ে, আমায় একটা জানলার ধারে বসিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

আমাদের কয়েক ঘর সরিক ছিল, কিন্তু বিনোদ ছাড়া আর-কারো সঙ্গে আমার স্বামীর তেমন বনিবনাও ছিল না। সে সম্পর্কে তাঁর ভাই। বয়স দুজনের প্রায় সমান। বিনোদ যখন-তখন আমাদের বাড়ী আসত। বৌভাতের দিন থেকেই সে আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগল। আমি তার সামনে প্রথমে ঘোমটা খুলতুম না। সে একদিন আমার স্বামীকে বল্লে—"দাদা, বৌদি যদি অমন করে মুখ ঢেকে থাকেন, তাহলে আমি তোমার ঘরে আর আসছি না।" স্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে ঘোমটা খুলতে বললেন। আমি তাঁর ইচ্ছায় ঘোমটা খুললুম, কিন্তু বিনোদের চোখের দৃষ্টি আমার ভাল লাগল না। ইচ্ছে হচ্ছিল আবার ঘোমটাটা টেনে দিই কিন্তু তাহলে স্বামীর মান থাকে না, তাই ঘোমটা খুলেই রইলুম। বিনোদকে দেখে আমার মনে হতে লাগল, স্বামীর পাশে সে যেন একটা কীটাণুকীট!

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যাকে সংসারে অতি তুচ্ছ বলে জানলুম, সেই আমার সব চেয়ে বড় শত্রু হল!

স্বামীর আজ্ঞাতেই বিনোদের সঙ্গে আমি কথা বলতেও সুরু করলুম। কথা আমি কইতুম না, কিন্তু দেখলুম তা না হলে স্বামীর আঁতে ঘা লাগে। আমাদের বাড়ীর কেউ বিনোদকে ভাল চোখে দেখত না, সবাই সন্দেহ করত যে আমার স্বামীটিকে কোন্‌দিন বা সে অধঃপাতে টেনে নিয়ে যায়। সেইজন্য সবাই তাকে বাড়িতে তার এই অনাদরের জন্য স্বামীর মনে ভারি একটা ক্ষোভ ছিল। আমিও যদি তাঁর বিনোদকে অবহেলা করতে সুরু করি তবে সেটা তাঁর বুকে খুবই বাজবে, আমি বুঝলুম। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বিনোদের উপর তোমার এত দরদ কেন? ও কি তোমার যোগ্য?" স্বামী বললেন—"দেখ সুরো, ও লক্ষ্মীছাড়া আমি জানি। কিন্তু ও যে আমার আশ্রয় নিয়েছে। ও বলে, ওর স্বভাবের জন্যে সবাই ওকে ত্যাগ করেছে, এখন আমিও যদি ত্যাগ করি তাহলে ও অধঃপাতের অতলে একেবারে তলিয়ে যাবে। ওর বিশ্বাস, আমাকে অবলম্বন করেই ও উঠে দাঁড়াবে।"

আমার স্বামীর এই দয়া দেখে আমার সমস্ত হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল। আমার মনে হল আমার এমন স্বামী—তাঁর কাজে আমি প্রতিবন্ধক হব?

বিনোদের সঙ্গে আমার এতটা ঘনিষ্ঠতা আমার শাশুড়ীর চোখে ভাল ঠেকেনি। তিনি মধ্যে-মধ্যে রাগ করে বকতে লাগলেন। শাশুড়ীকে অমান্য করবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিতেও আমার প্রাণ কেঁদে উঠত। বিনোদকে নিয়ে আমি মুস্কিলে পড়লুম।

এ ছাড়া আরও মুস্কিল ছিল এই যে বিনোদের হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগত না। তাকে দেখলে মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা ঘিন্‌ঘিনে ভাব আমাকে পীড়া দিত। ঠাট্টার সম্পর্ক বলে সে

তার মুখদর্শন করা উচিত ছিলনা, এবং তার এমন-একটা গায়ে-পড়া স্বভাব ছিল যার জন্য তার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ভাবতুম স্বামীকে সব খুলে বলি। মনে-মনে কথাটা নিয়ে তোলাপাড়া করতুম, তারপর সাজিয়ে-গুছিয়ে কথাটা যা দাঁড় করাতুম তা মনের মধ্যে আবৃত্তি করে এমন জঘন্য শোনাত যে স্বামীর সামনে তা বলতে পারতুম না। তিনি কি এ-সব বুঝতেন না? কে জানে? হয়ত পুরুষ-মানুষ বলে' আমাদের এই নারীবৃত্তি-গুলো অনুভব করবার শক্তি তাঁর ছিলনা। আমি তাঁকে একদিন বললুম—"দেখ, বিনোদ একটু বাড়াবাড়ি করচে না?" স্বামী আমার কথাটা বুঝলেন কি না জানিনা, তিনি সহজভাবে বললেন—"দেখ সুরো, বিনোদ বাড়াবাড়ি করে' করবে কি? তুমি যদি খাঁটি হও তাহলে দুনিয়ায় ভয় কাকে? তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কাজেই বিনোদ কেন, বিনোদের চেয়ে সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর রাক্ষসকেও আমি ডরাই না।"

স্বামীর এই কথায় আমার মনের সমস্ত কুয়াশাটা যেন একমুহূর্ত্তে কেটে গেল। নিজের মধ্যে একটা শক্তির চেতনা অনুভব করতে লাগলুম। সত্যিই ত, আমি যদি খাঁটি হই ত ভয় কাকে! তারপর, আমার উপর স্বামীর কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! আত্ম-অভিমানে আমার সমস্ত হৃদয় ফুলে উঠল। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলুম—হে ভগবান, স্বামীর এই বিশ্বাস যেন চিরদিন অটুট রেখে মরতে পারি, আমাকে এই বর দাও।

আমার স্বামী তখন বাড়ী ছিলেন না, জমিদারীর কাজে তাঁকে বিদেশে যেতে হয়েছিল। তাঁকে বছরের মধ্যে বার-দুই এমনি করে বাইরে যেতে হত। হাতে কোন কাজ নেই, তিনি বাড়ী নেই, তাই ঘরে যাবারও তাড়া নেই। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাবার আগে ছাদের উপর একটু বেড়াতে গেলুম।

সেদিন চাঁদ তার ফিরোজা রঙের ঘোমটাখানা দূরে ফেলে দিয়ে মনের আনন্দে তার সমস্ত কিরণ-কণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পৃথিবী তারই পেলবস্পর্শ আরামে অবশ হয়ে উপভোগ করছিল। বাগানে বড় বড় গাছ আর কামিনীফুলের ঝাড়গুলো পাতায় পাতায় রূপালী দেয়ালী সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেইগুলোর পাশে পাশে রোগা, মোটা নানান আকারের এক-একটা অন্ধকার দৈত্য উপুড় হয়ে বসে আছে—এক-একটা রাজ্যহীন রাজার মত।

চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, কোথাও একটু আওয়াজ নেই, আমি তন্ময় হয়ে চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের এই খেলা উপভোগ করতে লাগলুম।

হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়া কোথা থেকে দৌড়ে এসে এই আধ-ঘুমন্ত পৃথিবীর মাথাটা ধরে বেশ জোরে একটা নাড়া দিয়ে তাকে সজাগ করে তুলে পালিয়ে

গেল। বড় বড় গাছগুলো মাথা নাড়া দিয়ে তাদের মর্‌মর্‌ ভাষায় একবার একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। মনে হল তাদের পাতার রূপোর প্রদীপগুলো পিছলে মাটির উপর গিয়ে পড়ল, ঝোপ-ঝাড়ের পাশে পাশে যে বিকটাকার দৈত্যগুলো এতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল কার ইঙ্গিতে সে-গুলো তাড়াতাড়ি উঠে একবার এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে আবার একজায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে বসে পড়ল। রাত্রির সে নিস্তব্ধ ভাবটা আর ফিরে এল না। হঠাৎ এই রকমভাবে তার শান্তি ভঙ্গ হওয়াতে সে আর স্থির হতে পারলে না। আমি এতক্ষণ আনন্দে যে দৃশ্য দেখছিলুম তার পট পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল, নীচে নেমে এলুম।

শোবার ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখি খাটের উপর মনুষ্যমূর্ত্তি! ঘরের মধ্যে মিট্‌মিট্‌ করে প্রদীপ জ্বলছিল। আমি ভয়ে এমন কাঠ হয়ে গেলুম যেন মাটির সঙ্গে আমার পা দুটো একেবারে গেঁথে গেল! আমার শোবার ঘরে স্বামীর লোহার সিন্দুক থাকত, তাতে জমিদারী থেকে টাকা এলে জমা হত। তিনি এবার জমিদারী থেকে যত টাকা পাঠাচ্ছিলেন আমি গুণেগেঁথে তার মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলুম। তিনি ফিরে এলে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার সবপ্রথম নজর পড়ল সেই লোহার সিন্দুকের দিকে। দেখলুম, সেটার গায়ে এখনো হাত পড়েনি। এখনো সময় আছে ভেবে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে চোর-চোর বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। লোকটা ছুটে এসে দরজা চেপে দাঁড়াল। তার মুখ দেখতে পেলুম—সে বিনোদ!

আমি অবাক হয়ে গেলুম। তাকে বললুম, "তোমার দাদা ত এখানে নেই—তুমি এত রাত্রে কেন?" বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার কাছে এসেছি।" আমি রেগে বললুম—"যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" সে এমন একটা কথা বললে যাতে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠল। আমি একটু এগিয়ে এসে বললুম—"পথ ছাড়, আমি বেরিয়ে যাই।"

বিনোদ দরজার গায়ে সজোরে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে পদাঘাতে ঠেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সেই অন্ধকারে তার চোখদুটো হিংস্র পশুর চোখের মত এমন ভয়ঙ্কর জ্বলছিল যে তার কাছে যেতে আমার ভয় করতে লাগল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে যতই দেখতে লাগলুম ততই একটা আতঙ্ক আমার সর্ব্বশরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাঘের সামনে পড়লে মানুষের কেমন ভয় হয় জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ ভয় যেন সেইরকমের! প্রাণ-সংশয় হলে আত্মরক্ষার জন্য মানুষের মন যেমনধারা হোক একটা অস্ত্রের জন্যে যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, আমিও অন্তর থেকে তেমনি একটা তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠলুম। দেয়ালে স্বামীর অনেকগুলো ছোরা-ছুরি টাঙানো ছিল। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়াতে আমি একখানা বড় ছোরা টেনে নিলুম।

ছোরাখানা হাতে পেয়ে মনে হল একটা

বিপদের মধ্যে, যেন হঠাৎ কোন আত্মীয় বন্ধুর দেখা পেলুম—মনটা একটু আশ্বস্ত হল।

আমি এবার খুব জোরের সঙ্গে বললুম —"যাও ঘর থেকে বেরিয়ে।"

বিনোদ হাসতে হাসতে বললে—"এরি মধ্যে যাব কি?"

আমি রেগে ছোরাখানা হাতে করে উঠে দাড়ালুম। তবু তার ভয় হল না, সে বললে—"জীবনে অমন ছোরা-হাতে মেয়ে-মানুষ ঢের দেখেছি।"

আমার ইচ্ছে হল এখনি ওর গায়ে ছোরাটা বসিয়ে দিই। কিন্তু হাত উঠল না। সে বোধ হয় আমার দুর্ব্বলতা বুঝতে পারলে। ধীরে ধীরে সে হাত-দুখানা বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার সেই বিশ্রী ভঙ্গী দেখে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যে কেমনধারা একটা ঝড় উঠল বলতে পারি না। আমার মনে হল এই ঝড়ে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটা প্রলয় হয়ে গেল। তারপর আমি কি করলুম, কি না-করলুম কিছুই মনে নাই। কেবল মনে আছে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুর্ণির মধ্যে আমার হাত-পা মাথা চোখ সব ঘুরছে।...

সকালে যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি, বিনোদের দেহের রক্তের উপর আমি পড়ে আছি।

* * * *

হাজতে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এল না। মনে করেছিলুম, আমার স্বামী কিন্তু পরে জানলুম, তিনি এসেও আমার জামিনের জন্য চেষ্টা করেন নি।

বিচারে আমি বেকসুর খালাস পেলুম।

তখন শীত পড়েছে, বেলা ছোট। আদালত ভাঙ্‌বার পরেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম, সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে, কি জানি কেন, সাহস হল না, বাগানের খিড়কী দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লুম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এসেছে, আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় একটা ছোট কেরাসিনের আলো জ্বলছিল। ঝীর নাম ধরে ডাকলুম, কারো সাড়া পেলুম না। বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করচে। আরও দুই-তিনবার ডাকাডাকির পর ঝী ঘর থেকে বেরিয়ে এল, শুনলুম বাড়ীতে কেউ নাই, আমার শাশুড়ী তাঁর বাপের বাড়ী চলে গেছেন। স্বামীও নিরুদ্দেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন?"

সে বল্লে—"লোকনিন্দের ভয়ে। তুমি যে কাণ্ড করেচ তাতে কি আর দাদাবাবুর মুখ দেখাবার যো আছে! চারদিকে একেবারে ছি ছি!"

আমি ঝীর কথা কানে তুললুম না। আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু সে ঝী, তাকে কি বলব? তার টিট্‌কারি আমি গ্রাহ্য করলুমনা। কারণ আমার মন এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও একটি আশার প্রদীপকে তখনো জালিয়ে রেখেছিল। "আমি যদি খাঁটি থাকি তবে ভয়

কেন,—এ-জীবনেই যে ভুলতে পারিনি। ভগবানের কাছে যে-বর চেয়েছিলুম তা ত তিনি পূর্ণ করেছেন—স্বামীর বিশ্বাসের উপর ত এতটুকু আঁচ লাগতে দিইনি! তবে আমার ভয় কিসের?

আমি জোর করে বললুম—"আমার ঘরের দরজা খুলে দে!"

দাসী বললে—"ঘরের চাবি ত আমার কাছে নেই।"

আমি বললুম—"তবে আমি থাকি কোথায়?"

দাসী বেশ একটু রুক্ষ স্বরে বল্‌লে—"থাকতে যদি চাও তবে বাগানের মধ্যে আমার এই খোড়ো ঘরটাতে থাক।"

আমি তখনকার মত সেই ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু আমার স্বামী গেলেন কোথা? দিনের পর দিন যায় তাঁর দেখা পাই না কেন? তাঁকে না দেখতে পেয়ে আমার প্রাণ যে আকুল হয়ে উঠল। বাগানে বসে-বসে ঐ শূন্য বাড়ীখানার দিকে চেয়ে কত কথাই ভাবতুম। ঐ ঘর শূন্য করলে কে? কতবার এ প্রশ্ন মনে উঠেছে। কিন্তু এর কোনো জবাব খুঁজে পাই নি।

এই বিজন-বাসে কারো দেখা পেতুম না, কেউ আমার কাছে আসত না, তার জন্যে আমার কোন দুঃখ ছিলনা। কিন্তু স্বামীর দেখা পাচ্ছি না এ যে অসহ্য বেদনা! আমি কেবল তাঁরই প্রতীক্ষা করতুম। কেবলি মনে হত—কেন তিনি আসচেন না?—কেন আসচেন না!

তারপর শীতের শেষ-দিনগুলো বসন্তের গায়ে ঢলে পড়ল। প্রকৃতির মহলে মহলে একটা প্রকাণ্ড উৎসবের আয়োজন পড়ে গেল। চারিদিকেই 'আনন্দ, কেবল দখিনের বাতাস আমাদের বন্ধ বাড়ীখানার কাছে এসে গুম্‌রে উঠত।

এমনি একটা দিনে দেখলুম আমার ঘরের জানলা খোলা হয়েছে। আমি আর চুপ-করে বসে থাকতে পারলুম না। বাড়ীর ভিতরে যাবার খিড়কীর কাছে ছুটে গেলুম। আশ্চর্য্য, সেখানে ত দরজা নেই। ভুল হয়েছে ভেবে মনের আবেগে পাঁচিলটা আঁচড়াতে লাগলুম। কিন্তু কোথাও দরজা পেলুম না। আমার অলক্ষ্যে সেখানে কবে যে পাঁচিল গাঁথা হয়ে গিয়েছে আমি কিছুই জানিনা! আমি ঝীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ওখানে পাঁচিল গাঁথা হল কেন?"

সে বললে—"জানি না।"

আমি বল্‌লুম—"শীগ্‌গির যা, খবর নিয়ে আয়। আমি বাড়ী ঢুকবো কেমন করে?"

ঝী চলে গেল। আমি বসে কত কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল এতদিনে আমার বিরহের অবসান হল। আজ স্বামীর পায়ে একটি প্রণাম দিয়ে তাঁর ধূলো নিয়ে কয়েদখানার সংস্পর্শে আমার এই অশুচি দেহকে পবিত্র করে নেব। এই সব ভাবছি এমন সময় ঝী স্বামীর হাতের ছোট্ট একখানি চিঠি নিয়ে এসে দিলে। আমি তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে তুলে নিলুম। তাতে এইটুকু লেখা ছিল—

—"আমি তোমায় ত্যাগ করি-নি, কিন্তু সমাজ নরহত্যার পাতকীকে গ্রহণ করতে নারাজ। কি করব!"

কি করব!—এই সামান্য একটা কথা যেন বজ্রাঘাতের মত আমার মাথায় এসে পড়ল। আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

স্বামী কেবলমাত্র বলেছেন—কি করব! তাঁর কি আর কিছুই বলবার নেই? আমাকে বলবার তাঁর সব কথা হঠাৎ এমনি-করেই ফুরিয়ে গেল? ওগো আমার দেবতা, তুমি যে মন্ত্র আমায় দিয়েছিলে তার অপমান তো আমি করিনি, তবে তুমি কেন বলেছ, কি করব? তুমি কি না করতে পার? তুমি ত আমার মত অবলা নও—তবে কেন অমন হতাশ হয়ে বল্লে, কি করব? ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, তুমি যা করবে, সে তো তোমারই হাতে। কিন্তু আমি যে তোমা ছাড়া জানিনা—তুমি বলে দাও আমি কি করব? আমার মন যে নিরুপায় হয়ে কেবল এই কান্নাই কাঁদচে—ওগো আমি কি করি?—কি করি?

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

উদারনৈতিক ভারতবাসীদিগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন

(ফরাসি হইতে)

উদারনৈতিক ভারতবাসীর আন্দোলন, উত্তরোত্তর যেরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

প্রথমে, সভয়ে-আরব্ধ চেষ্টার যুগ। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা, এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণ, আচার-ব্যবহার সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন; অন্যদিকে হরিশচন্দ্র মুখার্জি ও রামগোপাল ঘোষ গবর্ণমেণ্টের অন্যায় শাসন হইতে রক্ষিত হইবার জন্য দাবী করেন। কুড়ি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক সভা সংস্থাপিত হয়:—যথা, কলিকাতায় "British Indian Association" (১৮৫১); পুনার "সার্ব্বজনিক সভা" এবং বোম্বায়ের "Presidency Association"।

* *
*

আন্দোলনের দ্বিতীয় অবস্থা।

Cobden, Bright ও Gladstone-এর প্ররোচনা ও উদ্দীপনায়, ইংলণ্ডের উদার-নৈতিক পক্ষ উপনিবেশগুলি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কেননা, কোন উপনিবেশই সাম্রাজ্যিক (Imperial) নীতি-বর্জ্জিত নহে; এবং সাম্রাজ্যিক নীতি, লোকের মনকে সামাজিক সংস্কার হইতে বিমুখ করে, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার লাঘব করে। ভারতবাসীরা জানিতে পারিল, স্বয়ং ইংরেজরাই ভারত-

বাসীদিগকে স্বাধীন করিয়া দিতে সমর্থ ও সমুৎসুক। (১)

সিভিল-সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত M. Cotton ১৮৮৫ অব্দে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

"আমাদের কর্ত্তব্যের সহিত আমাদের স্বার্থের মিল আছে। যত শীঘ্র পারি, আমাদের ভারত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রথমে, য়ুরোপীয়দিগের ধন ও প্রাণ যাহাতে রক্ষিত হয়, যাহাতে ভারতের স্বাধীনতা ও সুশাসন বজায় থাকে তাহা দেখা কর্ত্তব্য...কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত যেরূপ "নাবালক"ত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সেরূপ ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না; ভারতে আমরা যে-সকল কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা লঘুভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার আমাদের অধিকার নাই। যতদুর জানি, এমন কেহ নাই যিনি এখনি আমাদিগকে ভারত হইতে অপসৃত হইতে পরামর্শ দিবেন।

(১) সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রনীতি হইতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া উদারনৈতিক পক্ষ যে সকল ভয় ও সঙ্কোচ অন্তরে পোষণ করিয়াছিল, Spencer সেই সকল ভয় ও সঙ্কোচের রীতিমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

"যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে হইবে—এই চিন্তাটি ইংরেজদের মনোভাবে এই প্রকার পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। প্রথমে, যিনি এই পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন, সেই লুই নেপোলিয়নের সময় হইতে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ভারতের বিদ্রোহ, চীনের যুদ্ধ, আবিসিনীয় ও আশান্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান (আরও কিছুকাল পরে, আফগান, জুলু ও ইজিপসীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) হয়। তাহার পর, আমাদের সামরিক বন্দোবস্তের উন্নতি, এই বন্দোবস্তের দরুণ আমাদের সামরিক ভাবের উদ্দীপন, পররাষ্ট্রেও এই একই ভাবের উদ্দীপন ... ... সমাজের সামরিক আদর্শে ফিরিয়া আসায় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। প্রথমত, দস্যুবৃত্তির দিকে যে প্রবণতা জন্মিয়াছে, আমি তাহার নির্দ্দেশ করিব। প্রত্যেকবার আত্মরক্ষার্থ, আক্রমণের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইতে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে আক্রমণ করিতেও আর বড় বিলম্ব হয় না। এথিনীয়দের মধ্যে, শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য, স্থল-যুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের যে সুব্যবস্থা করা হয় তাহা হইতেই নগর-বিশেষের আত্মপ্রাধান্যের ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছিল। ফ্রান্সের শত্রুর আক্রমণ হঠাইবার জন্য, রেপব্লিকের যে সৈন্য গঠিত হয় সেই সৈন্য বিজয়ী হইলে, তাহারাই আবার পরদেশ আক্রমণে উদ্যত হইল। আমাদেরও সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। চীনে, ভারতে, পলিনেসিয়ায়, আফ্রিকায়, ভারত সন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহে, আমাদের সাম্রাজ্য বাড়াইবার ঠিক্ পূর্ব্বে এই সকল হেতুই (আততায়ীর হেতু প্রদর্শনের অভাব হয় না) প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

পরে, ফিজিদ্বীপ, সামোয়া, শেব্রো, পরক্ প্রভৃতি দখল করিয়া লইবার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, Spencer আবার এইরূপ বলিতেছেন ঃ—

"কি পার্লেমেণ্ট সভায়, কি সংবাদপত্রাদিতে সর্ব্বত্রই এই মনোভাব। সুয়েজ খালের "অংশ" ক্রয়ের বাদানুবাদ-কালে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী, ইজিপ্টের ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজরা সাম্রাজ্যকে বজায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়া, "সাম্রাজ্যের

ভারত যেমন নিজের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সূত্রকে ছিন্ন করিতে পারে না, ইংলণ্ডও তেমনি স্বকীয় অতীত হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। একটি শিশুকে প্রথমে গ্রহণ করিয়া তাহার পর তাহাকে ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যেরূপ, রক্ষণের কোন ব্যবস্থা না করিয়া এখনি ভারত হইতে আমাদের চলিয়া যাওয়াও সেইরূপ। আমি যে রাষ্ট্রনীতি সমর্থন করিতেছি তাহা বহুবৎসর পরে, বহু বংশ অতীত হইলে, তবে হয়ত আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু, আমাদের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য স্বরূপ এই রাষ্ট্রনীতিকেই আমাদের চোখের সামনে সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, প্রাচ্য জাতিদিগের মধ্যে ভারত আবার তাহার পুরাতন পদগৌরব লাভ করিবে। যাহাতে ভারতের মুক্তি সহজসাধ্য হয়, সেইদিকে আমাদের সমস্ত কার্য্যকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

এই প্রকার বাক্য-বিন্যাস, লর্ড রিপণের উদারনৈতিক শাসন-প্রণালী, "ইলবর্টবিল"

এবং এখন আমরা দেখিতে পাই, সামরিক আয়োজন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, দেশবিজয়ের স্পৃহা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে,—এই সকল হইতে ইহাও দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এই সামরিক আদর্শ ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ রাজ্যশাসনে:—নাবিক-সভার কাজ সামুদ্রিক সচিব অধিকার করিয়াছেন; ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব ব্রিটিশ সচিব কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; "কৌন্টি" সমূহের নির্ব্বাচিত মণ্ডলী, ইংরেজ জাতির ক্ষতি করিয়া নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করে; রাষ্ট্রীয় কার্য্যের স্থান সামরিক কার্য্য আসিয়া দখল করিয়াছে; রাজধানীর ও মোফস্বল পুলিসের কর্ত্তারা সামরিক বিভাগের লোক, পূর্ত্তবিভাগে, শিল্পকলা-বিভাগে, সামরিক বিভাগের লোক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়; রেল-পথ-বিভাগে উহারাই পরিদর্শক হয়, ইত্যাদি। তাহার ফলে, শাসনকার্য্যে উপর-ওয়ালার প্রভুত্বের দাবী বেশী হইয়াছে, ব্যক্তির দাবী ক্রমশ খর্ব্ব হইয়াছে।"

Spencer সংক্রামক ব্যাধি-সম্বন্ধীয় ও দরিদ্রের সাহায্য-সম্বন্ধীয় নূতন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন:—

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের কোন সীমা নাই এই তত্ত্বের মৌন স্বীকৃতি হইতে রাষ্ট্রের বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে কাহারও কোন দ্বিধা হয় না—রাষ্ট্রের এই অসীম কর্ত্তৃত্বে ও বিচার-বুদ্ধিতে বিশ্বাস উভয়ই সামরিক আদর্শের নিজস্ব জিনিস্। ব্যক্তির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখাই "টোরী"নীতির মূলতত্ত্ব; এবং রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় রাখাই উদারনৈতিকতার মূলতত্ত্ব। শান্তির সময়ে, উদারনৈতিকেরা কোন বিশেষ ধর্ম্মজনিত অক্ষমতা ঘুচাইয়া দিয়া, অবাধ বাণিজ্যে মত দিয়া, মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত বারণ-বাধামূলক আইন সকল রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রসারিত করেন। কিন্তু এখন দেখ, সামরিক আদর্শ ফিরিয়া আসা অবধি, যাহারা পূর্ব্বে বহু সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল সেই উদারনৈতিকেরাই, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য এবং ব্যক্তির ক্ষমতা কমাইবার জন্য "টোরি" পন্থীদিগের সহিত রেষারেষি করিতেছে" (Principles of Sociology, I. P. 568)। Spencerএর শেষ গ্রন্থ "Fact and Comments"এ Spencer এত দূর পর্য্যন্ত বলেন যে, ইংরেজদের এখন যেরূপ রীতি-নীতি ও মতামত দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনে হয় আধুনিক ইংরেজের মধ্যে আবার বর্ব্বরতা ফিরিয়া

হইতে সমুত্থিত রাষ্ট্রনৈতিক বাদানুবাদ, ইংলণ্ডে উদারনৈতিক পক্ষের লোকপ্রিয়তা, গ্ল্যাডষ্টোনের প্রভাব-প্রতিপত্তি, Home-Ruler আইরিশদিগের প্রচেষ্টা—এই সমস্ত নব-হিন্দুদিগকে মাতাইয়া তুলিল। অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-আয়োজনস্বরূপ ভারতের জন্য, পার্লেমেণ্টের ন্যায় একটা নির্ব্বাচন-মূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইল।

Hume প্রমুখ কতকগুলি ইংরেজ এই আন্দোলনকে যথাপথে চালাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন; ক্রমে এই আন্দোলন কংগ্রেস সংস্থাপনে পর্য্যবসিত হইল। যে-হেতু ইংলণ্ড ভারতকে পার্লেমেণ্ট দিতে অস্বীকার করিতেছেন, অতএব ভারত নিজেই নিজেকে পার্লেমেণ্টের অধিকার প্রদান করিবেন; অবশ্য এই পার্লেমেণ্টের "ভোট", আইনের মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইবে না; তাহা না হইলেও অন্ততঃ ভোটের দ্বারা ভারতবাসীদের দাবী কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যাইতে পারিবে।

কংগ্রেস প্রতিবৎসর এক একটি প্রধান নগরে সম্মিলিত হইয়া থাকে। সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি হইতে, ম্যুনিসিপাল সভা হইতে, জিলার সভা হইতে, বর্ণমণ্ডলী ও ধর্ম্ম-মণ্ডলী হইতে, প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কংগ্রেসে প্রেরিত হয়।

প্রথম কংগ্রেস (৭১ জন প্রতিনিধি) বসিয়াছিল বোম্বাই নগরে (১৮৮৫); সভাপতি ছিলেন W. C. Banerji; দ্বিতীয় কংগ্রেস কলিকাতায়; ৪৩১ জন প্রতিনিধি; প্রসিদ্ধ আন্দোলনকারী দাদা-ভাই নৌরোজি সভাপতি ছিলেন। তৃতীয় কংগ্রেস বসে মান্দ্রাজে; ৬০৭ জন প্রতিনিধি; মুসলমান Hon'ble বদ্রুদ্দিন তয়াবজী সভাপতি ছিলেন (২)। চতুর্থ কংগ্রেস (আহমেদাবাদ)—১২৪৮ জন প্রতিনিধি; কলিকাতার একজন ইংরেজ বণিক M. Yule সভাপতি ছিলেন।

প্রথম সম্মিলনগুলি বেশ উৎরাইয়া যাওয়ায় হিন্দুদের মাথা ঘুরিয়া গেল; তাহাদের বিশ্বাস হইল, পার্লেমেণ্টের ন্যায় নির্ব্বাচন-মূলক রাষ্ট্রীয়-সভা বুঝি গঠিত হইয়াই গিয়াছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক M. Hume দুই চটি বই লিখিলেন; উহা দেশ-ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মজুর ও চাষাদিগকে বিতরিত হইল। উহাদের মধ্যে একটি চটি, একজন উকীল ও একজন গ্রামের মোড়ল—এই উভয়ের কথোপকথনের আকারে লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এইরূপ কতকগুলি বাক্য আছে, যথা:—

"মোড়ল।—আপনি কি বলিতে চান আমরা সরকারের সহিত লড়াই করিব? যদি আমরা সাহেবদিগকে খুন করি তাহা হইলে আমাদের কি দশা হইবে? একেবারেই অরাজকতা হইয়া উঠিবে। অবশ্য ইহা তোমাদের অভিপ্রায় নহে।

উকীল। ভগবান তাহা হইতে আমা-

(২) মুসলমানেরা সাধারণতঃ কংগ্রেসের প্রতিকূল—Life and Work f Syed Ahmed Khan

দিগকে রক্ষা করুন ! \ সে মহাপাপ। এই বেচারা সাহেবদিগকে মারিয়া কি ফল ? তাঁদের মধ্যে অনেকে ভাল লোক আছেন।”

গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডকে মন্দ বলিলেও, বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের কথাটা উত্থাপন করাটাই আর কিছু না হোক্—সুবিবেচনার কাজ নহে। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রতি উদাসীন ছিলেন, এখন হইতে স্পষ্ট বৈরী হইয়া উঠিলেন। ইহা সত্ত্বেও, প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক সঙ্কল্পে (Rsolution) ভোট দিতে নিবৃত্ত হইল না। তন্মধ্যে কংগ্রেসের কতকগুলি সঙ্কল্প ন্যায়সঙ্গত, কতকগুলি অকাল-পক্ক, আবার কতকগুলি উগ্রচণ্ড ও নিতান্ত অসঙ্গত।

এক্ষণে, এই সঙ্কল্পগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, তাহার বিচার-আলোচনা করা যাক।

ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন-মূলক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা।—১৮৯২ অব্দের আইনের দ্বারা এই সঙ্কল্প অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেস এই সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সংস্কার দাবী করেন —যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত পার্লেমেণ্টে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বাচনের প্রণালী স্থির করাই কঠিন কার্য্য। ম্যানিসিপ্যাল সভা ও ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌ সভার জন্য এমন একটা জন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যাহাতে করিয়া অধিবাসি-বর্গের ১/৬ ভাগ বাদ পড়িয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাভুক্ত এই নির্ব্বাচকদিগের অধিকাংশ ভোট দেয় না; এমন একজন বণিক পাওয়া অসম্ভব যে নাগরিক এলাকার প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক হইবে, এমন একজন ভূম্যধিকারী পাওয়া যায় না যে পল্লি-এলাকার প্রতিনিধি হইতে ইচ্ছুক হইবে। (৩)

পঞ্জাব প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট সংস্থাপন।—গভর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবটি আপাতত স্থগিত রাখিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ন্যায় সমস্ত প্রদেশে ভূ-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা।—এই প্রকার ব্যবস্থা রাজস্বমূলক সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধ হইবে।

শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দেওয়া।—এই সংস্কারে আরও ব্যয়বৃদ্ধি হইবে—অন্তত এক্ষণে উহাতে বেশী সুবিধা হইবে কি ?

বিলাতের “প্রিভি-কৌন্‌সিলে”র পুনর্ব্বিচার কার্য্যে উক্ত সভার সদস্যরূপে আইনজ্ঞ ভারতবাসীকে নিয়োগ করা।—কথাটা ন্যায়-সঙ্গত। তবে, এখন বিবেচনা করিতে হইবে, প্রিভি-কৌন্‌সিলে আপীল রহিত করিয়া দিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে ভাল হয় কি না ?

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারত-বাসীকে বাসস্থাপন করিতে অনুমতি দান। —ভারতবাসীরা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সমস্ত অংশে বাসস্থাপন করিবার যে-অধিকার

দাবী করিয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তাহা হইলে উপনিবেশ রাজ্যগুলির সহিত ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ ও মনান্তর উপস্থিত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে ইহার কোন উপায় নাই। (৪)

পুলিসের সংস্কার-সাধন।—সকল পক্ষেরই মতে, এই সংস্কার-কার্য্যটি অপরিহার্য্য।

ইংলণ্ড ও ভারতে এক সময়েই পরীক্ষা গ্রহণে সিভিলসার্ভিসের জন্য কর্ম্মচারী সংগ্রহ করা। এই সংস্কার বাঞ্ছনীয় বলিয়া পার্লেমেণ্ট সভা মত দিলেও, ভারত-সরকার বরাবরই ইহার প্রতিকূল।

ভারতের জন্য এবং ভারতীয় সৈন্য যে সকল অভিযান করে সেই সকল অভিযানের জন্য ইংরেজ সৈন্য রাখিতে ব্যয় হয়, সেই ব্যয়ভার ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য।—এ দাবীটায় নিশ্চয়ই একটু বাড়া-বাড়ি আছে। কারণ, ভারত রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্য যথেষ্ট নহে এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে যে সকল যুদ্ধে ভারত-সরকার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করাই সেই সকল যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতবাসীদিগকে অস্ত্র-ব্যবহারের অধিকার দান। এই অধিকার দিলে বিদ্রোহ ও ঘরোয়া যুদ্ধ বাধিবে।

যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ সামরিক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাদের জন্য সেইরূপ কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করা; তাহা হইলে ইংরেজ সৈনিক-কর্ম্মচারীরা যে-সকল উচ্চ পদে ক্রমশ উন্নীত হয় সেই সকল পদ-সোপানে ভারতীয় সৈনিক কর্ম্মচারীও উঠিতে পারিবে।

তাহার পর, আর্থিক উন্নতির উপায় অবলম্বন করা। এই বিষয় সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাইবে।

বস্তুত, কংগ্রেসের অধিকাংশ সঙ্কল্প কার্য্যে যাহাতে পরিণত হয়, সেদিকে প্রতিনিধিদের তেমন একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। সরকারী ও বে-সরকারী সভা লইয়া যাহাতে কতকগুলি (Commissions) অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হয় মুখ্যরূপে ইহাই তাহারা চাহিতেছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল, যদি তাহারা এই অনুসন্ধান-সমিতিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে এই সুযোগে শাসন-কার্য্যকেও কতকটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিবে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের অনেকগুলি সঙ্কল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও,—পাছে ভারতে এক-প্রকার পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় কমিশন্ গঠনে অস্বীকৃত হইলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৪) Colored races restriction and regulation act দ্বারা (New Wales of the South 1896) ১৮৪৪ অব্দের চীনীয় সংক্রান্ত আইনের সর্ত্ত ও ক্ষমতা, সমস্ত এসিয়াখণ্ড ও আফ্রিকা-

স্বীকার

(৩)

"আমাদের ফেরবার সময় শীত শেষ হয়ে এসেছিল। হরিদ্বারের পথে ও-পাশের রোহিলখণ্ড রেল ধরে ক্রমশ দেশের দিকেই আসছিলাম। অযোধ্যার পর ফায়েজাবাদের ট্রেনে উঠে মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল কর্ত্তে হয়। বেশীক্ষণ সময় নাই, বেলাও শেষ হয়ে আসছিল। রাত্রিটা গাড়ীতে কাটাতে হবে,—বাবুরা খাবার সন্দেশ ও গৃহিণীরা ফল-মূলের সন্ধান করছিলেন; আর সময় পাব না ভেবে আমি একটু সন্ধ্যার উপায় হয় কি না ভাবছি, এমন সময় গাড়ী এসে পড়ল। বাবুরা বল্লেন, "আর না, চলে এস, মেল্ বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। ভিড় হয়ে যাবে, শীগ্‌গির এগিয়ে চল।"

প্রত্যেক কামরার পানে চাইতে চাইতে তিনি খুব জোরে জোরে চলছিলেন; মুখের ঘোমটা তুলে আমি প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম, কিন্তু স্থূলাঙ্গী দিদি ও আরও দুটি ঘোমটা-টানা মেয়ে আমাদের অনেক পেছিয়ে পড়েছিল।

ও-পাশে আরও একখানা গাড়ী লেগেছে, এটার লোক ওটায় চলেছে, কাজেই ভিড়ে অত-বড় প্লাটফর্ম্মখানিও যেন বোঝাই হয়ে গেল। ঠেলাঠেলি, আগে যাবার ঝোঁক, ধাক্কা, পুরুষেরাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মেয়েদের কথা বলাই বাহুল্য!

এমন সময় আমাদের সঙ্গের বিধবা বৌটির অস্ফুট চীৎকার ও সেই সঙ্গে দিদির গলায়—"আ মর্ মিন্সে, তুই কেরে? ওর গায়ে হাত দিস্ কেন? ওরে ও হারাণ, ত্থাখ্ না" ইত্যাদি সভয় ধ্বনি শোনা যেতেই পিছনে চেয়ে দেখলাম—বিশ্রী ব্যাপার! একজন কালো পোষাক-পরা কে—ফিরিঙ্গী কি অমনি-কিছু হবে, সে সেই ছেলেমানুষ বৌটির পিছনে একেবারে গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়েছে, যেন পাশে আর জায়গাই নাই! আমাদের পাড়াগাঁয়ে ছেলেটি তাকে—"বাঃ সায়েব, সরে দাঁড়াও না" বলে ঠেলা দিলেও সে নড়চে না। আমি "ও রায়মশায় দেখুন" বলে ডেকে নিজেও আগাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

এক-পাল মেয়ে, সঙ্গের পুরুষেরা কে কোথায় ভিড়ে মিশে গেছেন, তা দেখতে পেলাম না। "তোমরা ত দু-পা এগিয়ে হাঁট্‌তে জান না, তাইত মানুষে মেয়েমানুষ নিয়ে পথে বেরুতে চায় না। এই সাহেব, দেখতে পাচ্ছনা না কি?" বলে বড়বাবু ফেরবার চেষ্টায় কোনমতে গা-নাড়া দিচ্ছিলেন মাত্র; ভয়ে সরে সরে বৌটি প্রায় রাস্তার ধারে গাড়ীর কাছে এসে পড়েছে, আর একটু হলে পড়ে যায় আর কি—তবু সে পাজি লোকটা সরে যাচ্ছিল না, যেন কতই অন্যমনস্ক—এমনি ভাবে তার গা-ঘেঁসে চলেছিল। ভয়ে লজ্জায় আমার সে বুড়ো বয়সের রক্তও হিম হয়ে গেছল,

আর সে কচি মেয়েটির কথা একবার ভাবুন, বাবা।

কিন্তু সেই সময় একখানা হাত হঠাৎ পিছন থেকে এসে তার ঘাড়ে পড়ল। জোরে টান্, এক হেঁচকানিতে সে ছিট্‌কে সরে গেল। তারপরই—ইংরিজিতে কি সে বকুনি! এমন সতেজ স্বর, এমন প্রবল কথার টান্—যে, ষ্টেশনের অত হৈ-হৈ শব্দ ডুবিয়ে সে বকুনির আওয়াজ সবারি কানে পৌঁছুলো। ফিরিঙ্গীটাও ভয় পেয়ে গোলে কোথায় সরে পড়ল দেখা গেল না।

তিনি একজন বাঙালী, পাশের কামরায় বসেছিলেন, ব্যাপার দেখে নেমে এসেছেন। ইতিমধ্যে আমাদের বাবুরাও জুটে পড়লেন। অনেক কথা, এঁদের ধন্যবাদ, তার জন্য তাঁর বিনয়,—ইত্যাদির মধ্যে আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখছিলাম,—তাঁকে কোথাও আগে দেখেছি কি না?

সন্দেহ বেশীক্ষণ রইল না; গায়ে সাদা জামা, রেশমী উড়ানি, সম্পূর্ণ বাঙালী-বেশ বলেই চিনতে দেরি হয়েছিল। ইনি সেই তিনি, যাঁকে মারাঠীদের সঙ্গে দেখেছিলাম।

তাঁর পরিচয়ে বাবুরা এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত খুসি হয়ে উঠলেন। বৌমা ত তখনো "উনি আর-জন্মে আমার বাপ ছিলেন" বলে ফুলে-ফুলে কাঁদছিল। ভিড় প্রায় চলে গেছে, আমরা আস্তে আস্তে এগুচ্ছিলাম। সেই রোগা লোকটির সম্বন্ধে প্রশ্ন হলে শুনলাম—তার কলেরা নয়, সে মরেনি এবং বোধ হয় মরবেও না। তবে পড়েছে বটে। তার ভাই বাঁদিকুইয়ের পানিপাঁড়ে; ইনি সঙ্গে এসে তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেছেন, ডাক্তারকেও বলে এসেছেন, ইত্যাদি।

দিদি শিউরে উঠে আমার কানে কানে বল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ—শুনলি? ব্রহ্মহত্যা হচ্ছিল!"

সে কথাটা আমার তেমন কাণে গেল না, রায় মহাশয় তখন সালঙ্কারে নিজের পরিচয় শেষ করে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, "নিজ কল্‌কাতাতেই মশায়ের বাড়ী?"

"হাঁ, তবে এলাহাবাদেই থাক্‌তে হয় প্রায়।"

"কি কাজ-কর্ম্ম করা হয়? উকিল, না—?"

"আজ্ঞে না, এই ছেলেদের পড়াই।"

"ওঃ!" বাবুর স্বরে মৃদু অবজ্ঞা। তিনি বল্লেন, "তা ও মারহাট্টাদের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

তিনি একটু হেসে বল্লেন, "তাঁরা আমার বন্ধু, তাঁদের নিমন্ত্রণে আমায় বরোদা যেতে হয়েছিল, তার পর তাঁরা দিল্লী গেলেন—আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম।"

"তার পর এখন বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন—আপনার নাম?"

আমি তখন একটু আশ্চর্য্য হয়েই দেখছিলাম, তাঁর অনেকখানি বয়স, মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা, গঠন সবল হলেও মুখে-চোখে বার্দ্ধক্যের দাগ পড়েছে। কিন্তু নামের কথা উঠতেই সে প্রবীণ মুখে ছেলেমানুষের মত লজ্জার হাসি জেগে উঠল। "আমার নাম? সে আর এমন কি,

যেন সে মানুষই নয়, এমনি মৃদু স্বর, হাল্‌কা ভাব—বাবুও হেসে বল্লেন—"তার আশ্চর্য্য কি ? কলকাতার মানুষ আপনি, আমিও প্রায় সেখানেই থাকি, তা জানা আর বেশী কথা কি ? তবু বলুন দেখি, নামটি আপনার, দেখি, মনে হয় কি না।" বলে তাঁর মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তুলে ধরলেন।

"সাক্ষাৎ হয়-নি, বোধ হয় চিনতে পারবেন না। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ হালদার মশায়ের নাম শুনেছেন কি ? আমি তাঁরই বড় ছেলে, লোকে আমায় শচীন হালদার বলে।"

আমাদের বড় বাবু তাঁর জমিদারী ও ব্যবসা-ছাড়া অন্যদিকে মন, কান ও দৃষ্টি দেবার প্রথম যে অবসরটুকু পেয়েছিলেন, তাতে সুদূর ভবিষ্যৎ পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয়ের আশাতেই এই তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন; বাইরের খবর কিছু রাখতেন না, জান্‌তেনও না। তাই সে নামটি শুনেও চিন্‌লেন না। তাঁর স্মরণ হ'ল, শুধু হালদারদের কথা—"চোরবাগানের হালদাররা কি ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে ছেলে পড়াতে এলাহাবাদে এসেছেন কেন ?"

তিনি হেসে বল্লেন, "এমনি। তাতে সুবিধাও আছে অনেক,—উঠুন, মেয়েদের তুলে দিন,—ঘণ্টা বাজ্‌ল।"

"হাঁ, পাশের কামরায় রইলাম, আবার দেখা হবে।" বলে বিদায় নিয়ে এঁরা আগে চল্লেন, তিনিও হাত জোড় করে নমস্কার দিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

গাড়ী চলতে লাগল। একটু শুয়ে পড়েছিলাম। এতদিন উৎসাহের উত্তেজনায় সর্ব্বাগ্রে খাড়া থাক্‌তাম আমিই,—গুছিয়ে নেওয়া, সাজিয়ে দেওয়া, রাত্রি জাগা—অন্যকে তুলে দেওয়া, এমন কি বাসা ও ট্রেনের সব শেষের সামান্য স্থানটুকুতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকাটিতে পর্য্যন্ত আমার দুঃখের নয়, বরং সম্মানেরই অধিকার ছিল। আজ আমার উৎসাহে কেমন ভাঁটা পড়ে এল। যার জন্য ক্লেশকে ক্লেশ বলে বোধ হয়নি এতদিন, তা শেষ হয়ে গেল বলে,—পথের অবসানে ঘরে ফিরে যাচ্ছি বলে, কিম্বা কি জানি কেন, আর নড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। মাথা ভেঙ্গে যাচ্ছিল, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ অবসাদ। দিদি যত্ন করে আমায় একটা আসন আলাদা ছেড়ে দিচ্ছিলেন, সে বাড়াবাড়িটুকু হেসে উড়িয়ে আমি একপাশে গা গড়ালাম।

খানিক পরে বৌমা আমার পাশে এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—"কোন্ শচীন হাল্‌দার মাসিমা,—সেই তিনি, আমাদের শচীনবাবু না কি ?"

"বোধ হয়,—কি জানি—"

"না, না, ঠিক্ তিনিই, মুখ দেখলেন না ? ঠিক্ তাঁর ফটো—ইদানীংকার ছবির মত যে—?"

ভুল হয়নি, কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছিল যে, শচীন্ বাবুকে আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না কেন ? বৌমা বল্লে, "আমাদের শচীন্ বাবু।" কথাটা ঠিক,—তাঁর নানা ভাবের নানা ছাঁদের লেখা গল্প বিশেষ কবিতা পড়ে পড়ে আমাদের বাংলা দেশটায় এমন

এক প্রকাণ্ড দল তৈরি হয়ে উঠেছিল, যারা যখন-তখন অসঙ্কোচে তাঁকে, "আমাদের শচীন্ হাল্দার" এমন কি "আমাদের শচী" বল্‌তেও একটু দ্বিধা বোধ করত না। ফটোর কথা উঠল বটে, কিন্তু সেটা প্রয়োজন ছিল না। তাঁর মুখ চোখ চেহারা—কেউ ভাব্‌ত না, মান্‌ত না, তবু লেখা পড়ে সেই কবিতার কল্পনার আকারে সবারি মনে তাঁর এমন একখানি ছবি আঁকা হয়ে গেছল, যার তলায় শুধু ঐ নামটি মাত্র লেখা চলে। হাত-পা নাড়া, কথা কওয়া—খাওয়া-শোয়া-বেড়ানো—অন্য আর-কিছু তার সঙ্গে মানায় না। সে শচীন হালদার—সকলেরই শচীন বাবু, এর মধ্যে যে কোন মানুষ আছে—সে স্ত্রী কি পুরুষ, তার হিসাব নেবার ইচ্ছা বা অবকাশও কেউ চাইত না!

আমিও তাঁকে জানতাম—মান্‌তাম, বরং—হাঁ, ছেলেবেলা থেকে নিজের নারীত্বের সম্বন্ধে আমি নিজেই আত্মবিস্মৃত ছিলাম। সত্যি বাবা, সে আমার বেশ একটু গর্ব্বের আর আনন্দের জিনিষ ছিল। লেখক-দলের মধ্যে যাঁর লেখা আমার পছন্দ হত, তাঁকেই মনে মনে বন্ধু বলে ধরে নিতাম। শচীন্দ্রনাথ! তাঁর বয়স কি রূপ কে ভেবে খুঁজে মরে? সুকুমার সুন্দর নামটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের বন্ধুটির মত চিরদিন আমি—"এটা যে আমাদের শচীর"—"শচীনের লেখা পড়ছ?" এমনি অবহেলার বা যাই-হোক্ ভাব ও ভাষা ব্যবহার করে এসেছি।

ফটো ত হাজার বার হাজার রকমের দেখেছি,—তবে? বিস্মিত হচ্ছিলাম—ভাবছিলাম,—হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বড় আলো জ্বলে উঠ্‌ল। এ শুধু ছবি নয়, ছায়া নয়, কল্পনাও নয়,—একজন মানুষ—জাগ্রত জীবন্ত প্রত্যক্ষ প্রকাশিত দিব্য পুরুষ! একটি দিন দেখেই—শুধু আমি একা নই, অনেক পুরুষ অনেক নারীর চিত্তই একসঙ্গে তাঁর সুমুখে মাথা নুইয়ে-ছিল। তাঁরই মূর্ত্তি তাঁরই চিন্তার সঙ্গে—আমাদের সেই আদরের শচীন্,—আঃ, তখনো পর্য্যন্ত যে আমি দুজনের অভেদ কল্পনাকে মনে স্থান দিতে পারছিলাম না! ইনি যে সে হতে পারেন, এমন আভাষ-টুকু পর্য্যন্ত আমার মনে উদয় হয়নি। প্রথমে সেই ট্রেণে ত আমি তাঁকে দেখিনি বল্লেই হয়, তবু এ ষ্টেশনে হঠাৎ দেখে, সেই সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহখানি যে ঠিক তাঁরই, এ আমার চিনতে ভুল হয় নি। যার যত ছবিই দেখা থাক্, কিন্তু সে সবল ঋজু বাহু যে তাঁর ছাড়া আর কারো সম্ভবে, তা আমার মনে আসেনি,—কেন কি জানি!

নরের মধ্যে উত্তম, পুরুষ-সত্তম তিনি। আমাদের কবির কোমল সুন্দর মায়াচিত্র-খানি যেন তাঁর জ্যোতির মধ্যে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। যাক্, আমি বাধা দিলাম না, চোখ বুজে পড়ে রইলাম। খুব অল্পক্ষণ, মিনিট কয়েক বোধ হয়, একটু ঘুমিয়েও ছিলাম। জেগে উঠে বসে দেখি, আঁধার হয়ে গেছে, সুমুখে সন্ধ্যার চাঁদ,

সঙ্গে এত বেশী আমের মুকুলের গন্ধ মিশেছে যে—

তন্দ্রা ভেঙ্গে আমার মনের ভাবটা কিছু ফিরেছে বোধ হল। শচীন্দ্রনাথের কবিতাগুলা যেন এক অখণ্ড মুক্তা-মালার মত চোখের সুমুখে দুল্‌তে দুল্‌তে ঘুর্‌তে সুরু কর্‌লে।

মুক্তার মালা? হাঁ, তারি মত মূল্যবান বটে কিন্তু তার সাদৃশ্য কি শুধু মণি-মুক্তার সঙ্গে হয়? সে যে আমাদের ফুলের মালা! এই বাংলা দেশে যেখানে যত ফুল ফোটে, বাগানের বেল, যুঁই, চামেলী, বনের ভাঁট, ছাতিম, কেয়া—বড় গাছের চাঁপা, ছোট ঝোপের সন্ধ্যামণি, গৃহস্থের উঠানের করবী হতে শর্ষে ক্ষেতের বিছানো সোনাগুলি পর্য্যন্ত,—সবগুলি যেন মিলিয়ে সাজিয়ে নিপুণ শিল্পীর হাতে গাঁথা সে কী বিচিত্র হার!

ফুল, শুধু ফুল! এইবার আমার সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার বিপুল দেহখানি যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে লাগল। মাথায়, গলায়, হাতে,—আর কিছু না, এবার আর কোন ফুল নয়, আমাদের পুরাণ-পুঁথির সেই "অম্লান পঙ্কজ-মালা", সেই "লীলা-কমল", সেই সহস্র-দলমেলা সূর্য্যালোকের ফুল!

সে নিজের হাতে এই ফুল তুলেছে—সাজিয়েছে। আহা, কি সুন্দর ঐ অমল-ধবল আসন-পদ্ম, আর তার চেয়েও কি রাঙা ঐ তার মানস-দেবতার পায়ের তলার হৃদয়-কমলটি! আমার মনে হচ্ছিল—থাক, সে কথার প্রয়োজন নাই।"

রমা একটু থামিলেন। তাঁহার মুখে আবার উত্তেজনার ভাব দেখা দিল। গুরু নীরবে চাহিয়াছিলেন; ক্ষণকাল পরে মৃদু হাসির সহিত রমা কহিলেন,—"প্রয়োজন নাই, তাই বা কে বল্লে? সেই কথাটুকু বল্‌বার জন্যই তো এত হাবড়্-হাটী বকে যাচ্ছি। বাবা, আপনি হয় তো বুঝ্‌তে পেরেছেন? প্রথমটা আমিও খুব চম্‌কে উঠেছিলাম, তারপর অনেক ভেবে অনেক অনুভব করে দেখেছি, আসল হিসাবে আমার তাতে সঙ্কোচের কিছুই নাই। তবে কথা সত্য,—শচীনের নিজের হাতে গড়া আমার মনের সেই রাঙা পদ্মটিতে—আপনি তার লেখা পড়েছেন, বাবা?"

মৃদুস্বরে গুরু বলিলেন, "পড়েছি রমা।"

"তবে মুখ হেঁট করছেন কেন? তার লেখা, তার আদর্শ—ও বাবা, সত্যি বলুন, তবে কি আপনারও ধারণা এই যে আমি যা করেছি, তা পাপ?"

"তুমি ইচ্ছা করে কিছুই করনি মা, সুতরাং পাপ নয়, ভুল।"

"ভুল! সে কি? ভুল মোটে নয় বাবা! আমি জানতাম—কিন্তু সত্যি, প্রথমে আমিও এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। আঃ বাবা, সব-প্রথমটুকু যেন স্বপ্ন—মোহ! তাঁর সঙ্গে একগাড়ীতে চলেছি, সাম্‌নের চাঁদে তাঁরও দৃষ্টি পড়েছে, এই বাতাস তাঁর—

বিশ্রী! মোগলসরাই থেকে হাওড়া, পঞ্জাব মেলের দ্রুতগতি সময়ে ঐ একটি রাত্রির মধ্যে দুটিবার—আমার জীবনের মধ্যে মাত্র দুটি দুর্ব্বল ক্ষণ এসেছিল। একটি

ঐ অতর্কিত আনন্দ, দ্বিতীয়—সে কথাটুকুও বলি।

আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম, একটু তন্দ্রার মত বোধ হচ্ছিল যেন। হঠাৎ দেখি, ট্রেন থেমেছে, দিদি ডাকছেন—"ও রমা ওঠ্‌না, স্থাখ্, হাবু এয়েছে, বিজয় এয়েছে,—জামাই, ও বাড়ীর বট্ঠাকুর, ওঠ্ ওঠ্।"

বুঝলাম, এই বাঁকিপুর। আমাদের অনেকগুলি প্রবাসী আত্মীয় ছেলেপুলে নিয়ে দেখা কর্ত্তে এসেছিলেন। নমস্কার, আশীর্ব্বাদ, প্রসাদ ও ফুল দেওয়া—গাড়ীখানা খুব জম্‌কে উঠেছিল তখন। আমাদের সেই বৌ আর তার বয়সী বালবিধবা মেয়েটি এক পাশের জানালায় ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। হঠাৎ বৌটি এসে বল্লে,—"মাসিমা, শচীন বাবু!"

আমি বল্লাম,—"তাতে কি হল?"

"কিছু না, চা খাচ্ছেন।"

"সে আর আশ্চর্য্য কি!" বল্লাম বটে এ কথা, কিন্তু দৃষ্টি এড়ালো না,—নজর পড়ল, একটু-দূরে তিনি আরও-কয়েকজন লোকের সঙ্গে চা এবং আরও-কি খাচ্ছেন বটে।

ব্যাপার কিছু নূতন নয়! টেবিল চেয়ার পেয়ালা পিরীচ্, খাদ্য পানীয় ও মানুষ, তার মধ্যে আশ্চর্য্য-কিছু ছিল না ত, কিন্তু আমার চোখে সহসা তা কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ল! শচীন হাল্‌দার—না, আমার মনের সেই জ্যোতিঃ-কিরীট-ধারী নমস্য মহাপুরুষ, তিনি যে চোখের সাম্‌নে বসে সাধারণ মানুষের মত পেয়ালা থেকে চা ঢেলে খাচ্ছেন, প্লেট থেকে খাবার তুলে নিচ্চেন, পাশের চাপ্‌রাশির পানে চেয়ে কি কথা জিজ্ঞাসা করছেন—এ সবই যেন তাঁর পক্ষে অনাবশ্যক, অদ্ভুত, সে যেন এক রকম কী—যেন অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হল!

মানুষ, এই আমাদের মতই মানুষ! তিনি শচীন্দ্রনাথই হোন্ আর আমার আদর্শ দেবতাই হোন্—তবু মানুষ বটে! রক্ত-মাংসে গড়া দেহধারী মানুষ! আর তার পর? শুধু মানুষ বল্লেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছেনা ত, যাকে এতক্ষণ আমি তাঁর দীপ্তি বলে, শোভা বলে—দেখে আনন্দ বোধ কর্‌ছিলাম, এখন সেই আলোটাই শিখার মত এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালার স্পর্শ ছুঁইয়ে দিলে। ঐ যে বলিষ্ঠ-হৃদয় বলশালী লোকটি, উনি আর যাই হোন্, কিন্তু তারি সঙ্গে তাঁর প্রধান পরিচয় যে তিনি একজন পুরুষ!

কথাটা মনে হতেই আমার প্রাণ অর্থাৎ অন্তরের নারী-প্রকৃতিটি যেন চম্‌কে শিউরে উঠ্‌ল। একটু পূর্ব্বের সেই সময়-টুকু কি আনন্দে কি অপরূপ কল্পনায় ডুবে গিয়েছিলাম আমি! সাগরকে যারা ভালবাসে, তার নাম, তার বর্ণনা শুনে মনে ছবি এঁকে রাখে; তারা হঠাৎ চোখের সুমুখে সেই সীমাশূন্য নীলিমার অপূর্ব্ব রূপ দেখে যেমন প্রথমটা—"

রমা একটু স্তব্ধ হইলেন। তার পর আবার বলিলেন,—"এখন মনে পড়লে হাসি পায় বাবা, এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটো পরস্পর-বিরোধী ভাব,—সে যেন কি অদ্ভুত! মুহূর্ত্তমধ্যে আমার নিজের ভিতর-

স্কার সমস্ত আগুন আমার নিজের পরেই জ্বলে উঠল। গাড়ীর কামরায় বসে তখন আমার সেখানটাকে নরক তুল্য মনে হতে লাগ্‌ল। নিজের মন, আপনার চোখকেও অবিশ্বাসী বলে ধারণা এসেছিল—সেই রাত্রিটুকুর জন্য। বড় বড় ষ্টেশনে অনেক-ক্ষণ গাড়ী দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু আর সকলকে শোবার ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে আমি গিয়ে একেবারে মেজের উপর শুয়ে পড়েছিলাম। সে রাত্রির মধ্যে আর উঠিনি। চেয়েও দেখিনি যে আমার সঙ্গিনীরা কে কি করছে।

ভোরের আলো দেখা দিতেই গাড়ী হাওড়ায় দাঁড়াল। শেয়ালদার গাড়ী ধরে আমাদের বাড়ী যাবার কথা। আমাদের মধ্যে দু-চার জনের আত্মীয়ের বাড়ী কল্‌কাতায়। তাঁরা দুদিন সেখানে বিশ্রামের কথা বল্লেন। আমি ঝোঁক্ ধরে বল্লাম—"না, আজই যাওয়া চাই আমার।" তখন আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, পারি ত এখনি কাশী চলে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমার সেই কথা শুনে দিদি বল্লেন, "তাই হবে, এর মধ্যে চল্, গঙ্গাস্নানটা সেরে নি।"

আমাদের গ্রামের কাছে গঙ্গা নেই; খুব বিশেষ তাড়া না হলে গঙ্গাস্নানের উপায় হয় না। তা-ছাড়া সত্যি সত্যি আমি আমার এই মা-জননীকে বড় ভালবাসি বাবা। তাই দিদির কথা শোনবামাত্র আমার বিচ্ছিন্ন মনটার উপর যেন একটা সুস্থতার আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে কারো পানে না চেয়ে একেবারে তাঁর সেই অগাধ প্রচুর তরঙ্গায়িত জলরাশির কাছে ক্ষরণ জল! তার পরশ পেয়ে যেন আবার নূতন জন্ম পেলাম আমি—"

রমার স্বর মৃদু হইয়াছিল, একটু বাধা দিবার অছিলায় গুরু বলিলেন, "এই ঠিক্ মা। তোমরা হিন্দুনারী, তোমাদের এই ভাবটিই সত্য। কোন আকস্মিক মোহের ক্ষণিক অন্ধতা, মনের চিরদিনের জ্বলন্ত পুণ্যের ভক্তির আলোতে এমনি করেই কেটে যায় যে। আর যা বল্‌ছিলে, সে সব শুধু কতকগুলো বাজে নাটক-নভেল্ বা তার চেয়েও সাংঘাতিক ঐ-এখনকার বিদেশী ছায়ার উন্মাদক ভাব-মাখা নূতন শ্রেণীর কাব্য পড়ার ফল।"

ব্যাকুলভাবে রমা বলিলেন, "না, না বাবা, না, অমন কথা বল্‌বেন না। আমার দৌর্ব্বল্যকে দোষ দি, তা বলে আর কিছুকে দোষী করা ভুল। তাই তো জিজ্ঞাসা করছিলাম যে শচীনের কাব্য আপনি পড়েছেন কি না? আমার ক্ষুদ্রতার সমস্ত দৈন্য নিয়ে জীবন শেষ করলাম। এবার তো সব গণ্ডী এড়াচ্ছি। শচীন্দ্রনাথের সেই অমৃত-সাগর থেকে পান্থ জল তুলে নিয়ে এখন তাঁরি কাছে যাচ্ছি—যাঁর কাছে সত্যের আনন্দের একটি বিন্দুও উপেক্ষার নয়।"

গুরু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সত্যের বিচার, সে যে বড় কঠিন জিনিষ মা।"

"নিশ্চয় বাবা, নিশ্চয়, তার কোন ভুল নেই। তারি শাণ-দেওয়া ধারের মুখে পড়েই তো সে রাত্রিটা অমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে

ও শিক্ষার সঙ্গে সে সত্য যত-বড় আকার ধরুক না কেন, তার চেয়েও বড়—বিশাল—বিরাট সত্য আরও আছে। সেই দিনই যে আমি তাঁকেও দেখলাম বাবা! আনন্দের সত্য যে স্বয়ং এসে আমার বুকের সব আঁধার ঘুচিয়ে সূর্য্যের মত উদয় হলেন! গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে যখন সেই সকালের সোনালি রোদের মধ্যে মাথা তুল্লাম, চোখের উপর, মুখের উপর, বুকের উপর ভগবানের সেই মূর্ত্তিমান জ্যোতি—জ্বলন্ত সূর্য্য হাস্‌তে লাগলেন—"

রমার চোখে জল আসিল, বহিয়া মুখে পড়িতে লাগিল। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "সেই গঙ্গাজলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল যেন আমার বুকের মাঝের এই ভাঙ্গা-গড়া তোল্‌-পাড়-ব্যাপারের মধ্যে আমার ভালবাসা শতদলের মত ফুটে উঠ্‌ল। সে যেন জলের উপর বহুদিন মাথা তুলে খাড়া ছিল, কিন্তু দলে-দলে আঁটা, চাপ্‌-ধরা—এমনভাবে বন্ধ ছিল যে জলকেও চিনত না, আকাশকেও দেখতে পেত না। আজ যেন সে প্রথম সূর্য্যালোক দেখে—নিজের বুকের গন্ধ নিজে পেয়ে মুক্তির মধ্যে বিকশিত—"

"রমা—"

"চম্‌কাবেন না বাবা, আমি সত্যি বল্‌ছি, সে দিন আমি যে সূর্য্যকে দেখলাম, সে আমার আগের দেখা অচেতন জড় অগ্নি-পিণ্ডমাত্র নয়; আমার মনে হল আমার চিরদিনের দিনমণি এসে ফোটা ফুলটির দলে-দলে, কেশরে-কেশরে তাঁর বর্ণ, তাঁর আভা—"

গুরুর মুখে দারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। সবেগে তিনি বলিলেন,—"এত ভুল বুঝেছ মা?"

রমার স্বর শ্রান্ত হইয়া আসিতেছিল; মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন, "ভুল বুঝিনি, কিন্তু কি বুঝেছি তাও বোধ হয় আপনাকে বোঝাতে পার্‌ব না। আমি কার কথা বলছি, বুঝ্‌চেন না? শিশুকাল থেকে যাঁকে জলে-স্থলে, পাষাণে-পুত্তলে, পূর্ণঘটে আর শূন্য আকাশে—সর্ব্বত্র মাথা নুইয়ে এসেছি, আমি সেদিন তাঁরই দেখা পেয়েছিলাম বাবা—"

"একটু স্থির হও মা, এত কথায় তোমার অনিষ্ট হচ্ছে।"

"হোক্‌, ক্ষতি নেই। একটু শচীনের কথা বল্‌ব কি, বাবা? এই পাঁচ বৎসরে আমি তাকেও অনেকবার ভেবেছি। কত অবিশ্বাস, কত সন্দেহ এসে আমায় পীড়া দিয়ে গেছে! তাই তো এই কাশী পালিয়ে আসা, আপনাকে এত কথা বলা। কিন্তু সত্যি তাকে ত আমি একটুও ঘৃণা করি না। তার কথা মনে করতে আমার আনন্দই আসে এখন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জন্মান্ধের চোখের তারার আবরণ যে চিকিৎসক টেনে তুলে দেন, যাঁর মুখ দেখে কাণা প্রথম-মানুষের ধারণা পায়, সে তাঁর উপর কৃতজ্ঞ থাকে না কি? এই দুর্ভাগ্য নারীজন্ম আমার! স্বামী, সন্তান

ক্ষয় হয় নি! প্রথম-মানুষ বলতে যেখানে একটুখানি ছুঁচ ফুট্‌ল, তার মুখে এত রক্তও কি বেরুল! আমার বুক শূন্য করে—ঝলকে ঝলকে—"

"একটু শান্ত হও মা—মিছে এত অনুতাপ করছ কেন?"

"অনুতাপ! কেন, কি জানি। বুঝি, এ অনুতাপও নয়। তাঁকে আমি চাইতাম, ডাক্‌তাম, তিনি আমার জীবনের কোন খোলা সোজা দরজা দিয়ে না এসে এমনভাবে এলেন কেন, বলুন দেখি? কান্না পায় না বুঝি? চিনেও চেনবার জো নাই, বুঝেও বোঝা যায় না—"

রুগ্নার শ্বাস ক্রমেই উর্দ্ধে উঠিতেছিল। তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠে গঙ্গাজল সিঞ্চন করিয়া গুরু বলিলেন, "আর কি, বল?"

"যদি কিছু দোষ থাকে আমার, আপনার চরণে যে সব নিবেদন করে যাচ্ছি—"

"ইংরাজি ভাবের অনুসরণ করছ মা? আমার কাছে এই ভ্রম-স্বীকার—বেশ, তাতেই যদি তোমার শান্তি হয়, তাই সত্য হোক্।"

"ইংরাজি-সংস্কৃত এখন আমি আলাদা দেখতে পাচ্ছি না যে বাবা। এক তিনি,—আমার সেই তিনি—সমস্ত তীর্থের দেবতা, আমার এই প্রাণ-ফাটা কান্নার—এই ড়ব-বেশী-চাওয়ার দুর্ল্লভ মণি, দেশের বিদেশের যেখান দিয়ে হোক্ যেমন করে হোক্, তাঁকেই আমি চাই,—তাঁকে—বাবা, আমার সেই তাঁকে—"

"সত্যি, মানুষেই ভুল বোঝে। আমি যা বুঝতে পার্‌ছি না, সে প্রহেলিকাও ক্রমে সহজ হয়ে যাবে। তাঁর নামের শক্তি যে অমোঘ, তাঁর নাম কর মা।"

"তাঁর কি নাম, গুরু? পৃথিবীর সমস্ত শব্দ সমস্ত অক্ষর সবই কি তাঁর নাম নয়? আমার প্রাণ যে এই শেষ-কান্নার চীৎকারে চেঁচিয়ে মরছে, এর প্রত্যেক ধ্বনিটুকুও যে তাঁরি নাম, আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর, আমার ত্রিজগদীশ্বর—আমার—আমার সব-কিছুরি ঈশ্বর—"

"মা, মা, বল গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম! বল তারক-ব্রহ্ম-রাম—বল—"

রুগ্নার দৃষ্টি স্থির হইয়া আসিতেছিল, কণ্ঠ মৃদু; তবু স্পষ্ট স্বরে তাঁহার ওষ্ঠে উচ্চারিত হইল—

"যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া
হৃদয় ছাপিয়া ভুবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে।"

সমাপ্ত

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বসন্ত-বিলাস

আজি ফাল্‌গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল ?
কেন কিংশুক ফুল চীন বাস গায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল ?
পিক পঞ্চম গায়,
বয় দক্ষিণ বায়,
নাচে ফুল-হিন্দোল ছন্দের দোল—ঘোম্‌টার জের টুট্‌ল।

হাসে সুন্দর মুখ, খঞ্জন চোখ, জাফ্‌রান্-রঙ্ অঞ্চল ;
নাহি নৃত্যের শেষ, সঙ্গীত-রেশ, ফুল-বাণ সব চঞ্চল।
ওই আন্‌মন্ চম্পায়
মান স্বপ্নের আব্‌ছায়
কার যৌবন লোল হাস্যের রোল, রূপ-দর্পণ ঝল্‌মল্ ?

এল জ্যোৎস্নার রাত, বন্ধুর সাথ নন্দন-ফুল-শয্যা ;
খেল' রঙ্গের ফাগ, চুম্বন-রাগ—লজ্জায় দাও লজ্জা।
মল্লীর সৌরভ
চুমে কুন্তল-গৌরব—
ওরে চায় প্রাণ মন আপ্‌নার জন, বন-ময় ফুল-সজ্জা।

ওরে কঙ্কণ-সুর ঝঙ্কার তোল্, আয় ফুল-মৌ পান কর্,
জাগে বংশীর তান, হর্ষের বান, রাত-ভোর গীত-নির্ঝর ;
খোল্ কাঞ্চীর বন্ধন,
হোক্ উন্মদ ঘূর্ণন,
খসে' যাক্ ওড়্‌নার কাঞ্চন পাড়, কুঞ্জের ঝুল্‌নার 'পর।

ওরে খোল্ অর্দ্ধেক উন্মীল চোখ, অঞ্জন আর কাজ নেই,—
ওলো আল্‌তায় লাল পা'র তল যার মঞ্জীর তার বাজ্‌বেই ;
আজি উৎসব-লগ্ন,
ভুজ- পল্লব নগ্ন,

বুকে তাল দেয় ওই রত্নের হার—ডুব দেয় সব অন্তর,
আঁকি' চন্দন-রস-আল্‌পন আজ ধ্যান কর্ প্রেম-মন্তর,—
সুর- মন্দার-গন্ধি,
প্রিয় পর্শন-বন্দী
ওই সুন্দর মুখ যৌতুক দিক্ উদ্বেল প্রাণ মন তোর।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌজাত্যবিদ্যা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ *

সৌজাত্যবিদ্যা প্রয়োগ-বিদ্যা। জীবতত্ত্ব এবং বিশেষরূপে তাহার শাখা—বংশানুক্রম-তত্ত্বের উপর ইহার ভিত্তি। জীবতত্ত্ব ও বংশানুক্রমতত্ত্ব যে-সকল নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছে—সেইগুলিকে সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই সৌজাত্যবিদ্যার কাজ।

সৌজাত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য জাতির উৎকর্ষ বিধান (race-culture) করা। মানুষই জাতির প্রধান সম্পত্তি। যে-জাতির মধ্যে যথেষ্ট-পরিমাণ দেহ-ও-মনে-সবল মানুষের উদ্ভব হয় সেই জাতিই উন্নতির শিখরে আরোহণ করে; এবং যাহার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির আধিক্য দৃষ্ট হয় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান মানুষ সৃষ্টির উপায় করা দরকার। আধুনিক সমাজসংস্কারকেরা অনেকেই এই কথাটা তলাইয়া বুঝেন না। পরিবেষ্টনী (Environment) ও ক্ষেত্র উভয়ই ভবিষ্যৎ-মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই; কিন্তু আধুনিক বংশানুক্রমতত্ত্বের হিসাব-মতে পরিবেষ্টনী অপেক্ষা ক্ষেত্রের প্রভাব অনেক বেশী।—কার্ল পিয়ার্সন বলেন প্রায় দশ-গুণ বেশী। (১) সুতরাং বিজ্ঞান-অনুযায়ী চলিতে হইলে পরিবেষ্টনী অপেক্ষা ক্ষেত্রের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল-দেশেরই সমাজসংস্কারকেরা যে-সব বিষয় লইয়া সচরাচর আন্দোলন করেন, সেগুলির অধিকাংশই পরিবেষ্টনীর সঙ্গে জড়িত। এমন কি পরিবেষ্টনী সংস্কারের জন্য তাঁহারা যেরূপ উৎসাহ দেখান, ক্ষেত্র সংস্কারের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও মন দেন কিনা সন্দেহ। ফলে অধিকাংশ

(*) ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ "Eugenics"এর বাঙ্গলা "সুপ্রজনন তত্ত্ব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন হইল রবীন্দ্রনাথ ঐ অর্থে "সৌজাত্যবিদ্যা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন্। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ, মনে করিলাম।

স্থলেই তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়।

বংশানুক্রমতত্ত্ব অনেকদিন হইল কতকগুলি নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা জানি যে পিতামাতার গুণসমবায় হইতেই সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর উদ্ভব। যে-যে-গুণ পিতামাতার মধ্যে বর্ত্তমান, সন্তানের তাহাই মূলধন; তাহা অপেক্ষা নূতন-কিছু লইয়া তাহার কারবার করিবার উপায় নাই। কেবল তাহাই নহে। পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী ও তদূর্দ্ধ অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলীও পিতামাতার মধ্য দিয়া সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এ-সব কথা আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে "ভারতী"তে প্রকাশিত দুই-একটি প্রবন্ধে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। যাহাহউক মোটামুটি এই কথার আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে দেহ-ও-মনে-উৎকৃষ্ট সন্তান পাইতে হইলে শুধু যে সেইরূপ উৎকৃষ্ট পিতামাতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা নহে, উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষের উপরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ জীববিজ্ঞানের মতে দুইতিন পুরুষ পরেও কোন কোন গুণ হঠাৎ নিম্নতন পুরুষে দেখা দেয়। (২)

সুতরাং জাতির উৎকর্ষ বিধান করিতে হইলে যখন সর্ব্বাগ্রে দেহ-ও-মনে-উৎকৃষ্ট মানুষ সৃষ্টির দরকার, তখন উহার জন্য চাই দৈহিক ও মানসিক রোগমুক্ত সৎবৃত্তিশালী পিতা-মাতা। কেবল তাহাই নহে, তাহার জন্য পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী প্রভৃতি উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের গুণাবলীর প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। এককথায় ইহাকেই বলে ক্ষেত্র। ভবিষ্যৎ-সন্তানের উপর এই ক্ষেত্রেরই প্রভাব বেশী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টনীর প্রভাবও যে আছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আপাততঃ আমরা সেগুলির কথা কিছু বলিব না ক্ষেত্রের কথা বলাই আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই ক্ষেত্রের সংস্কার করিতে হইলে পিতামাতানির্ব্বাচন—এক কথায় বিবাহের দিকে সমাজকে বেশী করিয়া মনোযোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কোন দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি আছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে—তাহাদের কোন সূচনা উভয় পক্ষের মধ্যে পাইলে বিবাহ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে সদ্বংশ ও বিশুদ্ধ বীজ প্রভৃতির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অর্থ, মান, সম্ভ্রম প্রভৃতি নীচ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিলে সমাজ ও জাতিদ্রোহিতা করা হইবে।

অনেক ভদ্রব্যক্তি এই কথা পড়িয়া হাসিয়া হয়ত বলিবেন যে বিজ্ঞানবিদ্যার এত বাগাড়ম্বর করিয়া এই অতি সাধারণ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; উহা সকলেই জানে ও সকলেই ঐরূপ

(২) See Darwin—The Origin of Species.

করিয়া থাকে। কিন্তু একটু নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিলেই দেখা যাইবে যে মানুষ মুখে যত বড়াই করুক না কেন, নিজেদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিদ্যার সাধারণ নিয়মগুলাও বড়-একটা মানিয়া চলে না। ঘোড়া, গরু, কুকুর, পাখী প্রভৃতি নানাবিধ পোষাপ্রাণী অথবা নানারূপ উদ্ভিদ জন্মাইতে মানুষ বিজ্ঞানবিদ্যার খুবই প্রয়োগ করিয়াছে,—বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া ঐ সকলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; কিন্তু নিজেদের জাতির উৎকর্ষসাধনের জন্য তাহার তুলনায় কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই বলিলেই হয়। এ-ক্ষেত্রে তাহার বিজ্ঞানবিদ্যা অনেকটা পুঁথিগতই রহিয়াছে। তাহা না হইলে আজ মানবসমাজে আমরা এত দুর্ব্বল, রুগ্ন, পঙ্গু, মানসিক-বিকারগ্রস্ত লোকের আধিক্য দেখিতে পাইতাম না। ধন, মান, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতির দোহাই দিয়া, নানারূপ স্বার্থের প্ররোচনায়, কামের তাড়নায় প্রতিনিয়তই ত সমাজে অযোগ্যের বংশবিস্তারের সুবিধা হইতেছে ও সমাজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইতেছে। আজ এই সভ্যতা ও বিজ্ঞানের যুগে আমরা যদি তাহার প্রতিকার করিতে না পারি, তবে বৃথাই আমাদের বিজ্ঞানের বড়াই।

আসল কথা সমাজ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত-স্বার্থকে বলি দিতে এখনও মানুষ অভ্যস্ত হয় নাই। কিন্তু জাতির উৎকর্ষ বিধান করিবার প্রধান উপায় এই স্বার্থ-বলি। নিজের ক্ষুদ্র সুবিধা ত্যাগ করিয়া যাহাতে জাতি ও সমাজের শাশ্বত মঙ্গল হয় তাহাই আমাদের লক্ষ্য হইবে। সেই উদ্দেশ্যে যদি সমাজকে ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় তাহাও করিতে হইবে। যে-বিবাহ এ-যাবৎ প্রায় ব্যক্তিগত ব্যাপারই আছে, তাহাকে সত্যরূপে সামাজিক ব্যাপার করিয়া তুলিতে হইবে। ভবিষ্যতে সমাজই পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন করিবে, উৎকৃষ্ট সন্তানের যাহাতে উদ্ভব হয় তাহার উপায় করিবে। যাহারা যোগ্য তাহাদিগকেই কেবল বংশবিস্তারের অনুমতি দেওয়া হইবে; যাহারা অযোগ্য,—রুগ্ন, দুর্ব্বল, বা বিকারগ্রস্ত—তাহাদিগকে দূষিত বীজের দ্বারা সমাজ ধ্বংস করিতে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত এমনও কল্পনা করিতেছেন যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশে Marriage Board বা বিবাহ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইবে। সেই বোর্ড হইতে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া যাহাদিগকে সার্টিফিকেট দিবেন কেবল তাহারাই সমাজ ও জাতির মঙ্গলার্থে বিবাহ করিবার অনুমতি পাইবে। (৩) অবশ্য এ কল্পনা কার্য্যে কখনো পরিণত হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভবিষ্যতে জাতির উৎকর্ষের জন্য সমাজকে যে এখনকার চেয়ে বেশী-করিয়া বিবাহ-ব্যাপারের উপর দৃষ্টি দিতে হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-সকল সমাজ এই বিষয়ে অমনোযোগী হইবে তাহারাই জীবনযুদ্ধে পিছাইয়া পড়িবে।

Eugenics বা সৌজাত্যবিদ্যার এই সকল উপায় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর আপত্তি শোনা যায়। একটা আপত্তি এই যে যদি বিবাহ সম্বন্ধে সৌজাত্যবিদ্যার এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, তবে তাহাতে জাতির উৎকর্ষ বিধান যতটা হউক আর নাই হউক, সমাজ হইতে মনুষ্যত্ব জিনিষটি লোপ পাইবে। যাহাদিগকে আমরা অযোগ্য বলিতেছি—সেই সকল শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা-গ্রস্ত লোকদিগকে এইরূপ কঠোরভাবে বর্জ্জন করিতে থাকিলে মানব-হৃদয়ের কোমল অংশটি আমরা হারাইয়া বসিব;—দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, অনুকম্পা প্রভৃতি বৃত্তি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে; জাতির দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে এত বেশী দৃষ্টি দিতে গিয়া, ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব-বিকাশের একটি বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিব। পশুপক্ষীপ্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, মানবসমাজে আমরা তাহাকে অত কঠোর করিয়া তুলিতে পারি না। বরং যাহাতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের এই কঠোরতা দূর করিতে পারি, তাহাই আমাদের মনুষ্যত্বের একটি সাধনার বিষয়।

একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এই আপত্তির কোন মূল্য নাই। কারণ সৌজাত্যবিদ্যা অযোগ্যকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে বা তাহাদিগকে যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজে অযোগ্যের উদ্ভব আর না হয় তাহাই কর; যাহাতে অযোগ্যেরা বংশবিস্তারের সুবিধা না পায় তার দিকেই দৃষ্টি রাখ। অযোগ্যদের উপর যে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, অনুকম্পা, ভালবাসা আছে তাহা বর্জ্জন করিতে সৌজাত্যবিদ্যা কখনই বলে না। বরং একটু দূরদৃষ্টির সহিত ঐ সকল বৃত্তির ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়। শুধু বর্ত্তমানের মানবের জন্য নয়, বর্ত্তমান ও অনাগত সমস্ত মানবের যাহা মঙ্গল, তাহার জন্য চিন্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু আর একটি আপত্তি এই হইতে পারে যে নিষ্কামভাবে শুধু সমাজের মঙ্গলের জন্য বৈজ্ঞানিক বিবাহ অসম্ভব। নরনারীর প্রেম বলিয়া একটা কথা আছে। সেই প্রেম সৌজাত্যবিদ্যার বা বংশানুক্রমের ধার ধারে না। সুতরাং বিবাহব্যাপারে এই প্রেমের কথাটিও ভাবিতে হইবে;—শুধু বংশানুক্রম লইয়া মাথা ঘামাইলেই চলিবে না। যেখানে বরকন্যার প্রেম হইবে সেখানে হয়ত সৌজাত্যবিদ্যা সার্টিফিকেট দিবে না; আর যেখানে বংশানুক্রমের নিয়ম মিলিয়া যাইবে সেখানে হয়ত দম্পতীর প্রেমের নামগন্ধও থাকিবে না। আর জীববিদ্যাতেও বলে যে দম্পতীর মনের মিল থাকা উৎকৃষ্ট সন্তান-উৎপাদনের পক্ষে একটি প্রধান কথা। যে দম্পতীর মধ্যে ভালবাসা নাই তাহাদের উৎপন্ন সন্তান দেহ ও মনে ভাল হইতে পারে না।

উপরোক্ত কথাগুলি কিয়ৎপরিমাণে

করিলে বুঝা যাইবে যে, জাতির মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এ সমস্যাও এড়ানো যাইতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই যে বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার প্রেম হয় তাহা নহে। বিবাহের পর পরস্পরের সাহচর্য্যেই অনেক স্থলে প্রেম জন্মায়। যাহাকে আমরা first love বা প্রথম-প্রণয় বলি তাহা যে সকল সময়েই স্থায়ী প্রণয়ে পরিণত হয়, তাহাও নহে। অনেক স্থলে তাহা যৌবনের মোহ মাত্র। সুতরাং জাতির মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি আমরা দেহ ও মনে সুস্থসবল দম্পতীর মিলন ঘটাইয়া দিই, তবে অনেক স্থলেই যে তাহাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইবে ও তাহাতে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এরূপ হইতে পারে যে অযোগ্যদের মধ্যেও অনেক সময় গভীর প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে, বা একপক্ষ অযোগ্য, আর-এক পক্ষ যোগ্য এরূপ নরনারীর মধ্যেও প্রেম জন্মিতে পারে। সে অবস্থায় আমরা কি করিব? সেই প্রেমকে কি আমরা বাধা দিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দিব? কবি ও প্রেমিকের এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে প্রেম ও কাম এক নহে। নরনারীর মধ্যে প্রেম হইলেই যে যৌনসম্মিলন হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যদি অযোগ্য নরনারীর মধ্যে সত্যই প্রেম জন্মিয়া থাকে, বেশত তাঁহারা বিবাহ করিয়া মনের সুখে থাকুন, বৈজ্ঞানিক তাহাতে বাধা দিবেন না। কিন্তু তাঁহারা যেন জাতির অমঙ্গল না ঘটান। তাঁহাদের দাম্পত্যসম্বন্ধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক হউক, দেহের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক না থাকে। কথাটা একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে সভ্য-মানব বিশুদ্ধ প্রেমকে উচ্চাসনে বসাইয়া পূজা করিবার মন্ত্র প্রচার করিতেছেন তাঁহার নিকট হইতে বৈজ্ঞানিকের বোধ হয় এই দাবী করা অন্যায় হইবে না। সভ্যমানব সমাজ ও মঙ্গলের জন্যই সন্তান উৎপাদন করিবেন, কামের বশবর্ত্তী হইয়া করিবেন না, ইহা বোধ হয় বিজ্ঞানবিদ্যাগর্ব্বিত বিংশশতাব্দীতে আশা করা যাইতে পারে।

অনেকে আর-একটা কথা বলেন যে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও মনের সুস্থতা ও সবলতার জন্য অত ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই,—ওটা বাড়াবাড়ি! জাতির প্রধান সম্পত্তি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি। এই প্রতিভা প্রায়ই অতি সাধারণ পিতামাতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। আবার নানারূপ দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ হয়। এমন কি, প্রতিভা জিনিষটাই ধরিতে গেলে একটু অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতির ফল। নিতান্ত স্বাভাবিক দেহ ও মন যাহাদের, এমন লোকের মধ্যে প্রায়ই প্রতিভার স্ফুরণ হয় না।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে প্রতিভার জন্ম সমাজে অতি বিরল ব্যাপার। সব জাতির মধ্যেই শতাব্দীতে মাত্র দুই-এক জন প্রতিভা জন্মিয়া থাকেন। প্রতিভার

অধিকাংশ লোকই প্রতিভাশালী নহে। এই সকল প্রতিভাহীন কিন্তু সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান লোকের উপরই জাতির ভরসা। তাই প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিয়া জাতির মধ্যে যাহাতে দেহমনে-সুস্থ যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ লোকের উদ্ভব হয় তাহা করাই উচিত। তাহাতেই জাতির উৎকর্ষ ও সমাজের কল্যাণ। সৌজাত্যবিদ্যার উদ্দেশ্য এই জাতীয় উৎকর্ষ ও সামাজিক কল্যাণ বিধান করা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সুরের বন্ধু

(গল্প)

সে ছিল অন্ধ। অন্ধ-ছেলের দ্বারা আর কি কাজ হ'বে? তাই তার বাপ-মা তাকে গান-বাজনা শিখ্‌তে দিলে।

সে খুব আনন্দের সঙ্গে সেতার-শেখা আরম্ভ করলে; কিন্তু ওস্তাদজি বল্লেন—"ছেলে বড় বেহুঁস্‌, বুদ্ধিশুদ্ধি ভারি কম;—? কখনো কিছু শিখতে পারবে না।"

এই শুনে অন্ধর ভারি দুঃখ হ'ল। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন-করে পারি সেতারকে আমি দখল করবই! কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'ল না। ওস্তাদজি বল্লেন, ওর কিছুই হচ্ছে না! সে অবাক হয়ে ভাবত কেন এমন হয়? গুরু যা বলেন সে তো তা মন দিয়ে শোনে, যা দেখিয়ে দেন তা তো হাজার-বার অভ্যাস করে—তবু কেন এমন হয়? বেপর্দ্দা-গুলোকে তো সে বাঘের মতো ভয় করে, তবে তারই গায়ে কেমন-করে গিয়ে হাত ভাব করতে চায়, তবু তারা ধরা দেয় না কেন?

তার সঙ্গে ওস্তাদজির কাছে যারা এক-সঙ্গে শিক্ষা আরম্ভ করেছিল, তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তাকে ছাড়িয়ে অনেক-দূর চলে গেল। নূতন দল এল, তারাও চলে গেল। সে কেবল একলা যেখানে ছিল সেইখানে পড়ে রইল। মধ্যে মধ্যে নূতন সতীর্থ আসে বটে কিন্তু সে দুদিনের জন্য;—কেউ তার সঙ্গী হয়ে থাকে না। অন্ধ তার এই দুর্ভাগ্যের কথা একলাটি বসে-বসে ভাবে, আর তার দুই চোখ জলে ভরে আসে।

একটিমাত্র রাগিণী ওস্তাদ তাকে সাধনা করতে দিয়েছিলেন। সেইটিকে নিয়েই সে পড়েছিল; কিছুতেই তাকে আয়ত্ত করতে পারছিলনা বলে' তার সেই এক সুরের সাধনা সমাপ্ত হচ্ছিল না। ক্রমে এই রাগিণী তার সেই নিঃসঙ্গ-জীবনে একমাত্র সঙ্গিনীর

যে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না;—একটুখানি কাছে এসে ছুটে পালায়, একটুখানি সঙ্গ দিয়ে ব্যাকুলতা জাগিয়ে লুকিয়ে পড়ে!

অন্ধ তার ঐ বন্ধুর জন্যে দিনে দিনে পাগল হয়ে উঠল। পেতে-পেতে পাওয়া হয় না বলে তার পাবার লোভ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। না-পেয়ে তার দুঃখ হ'ত বটে কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে একটি সুখের আবেশ ছিল। কারণ পাবার আশার মধ্যেই যে তার ঐ বন্ধুটি লুকিয়ে ছিল। তা-ছাড়া সে তো অন্য বন্ধুর মতো তাকে একেবারে ছেড়ে চলে যায়নি;—সে কাছাকাছিই আছে—কেবল লুকিয়ে বেড়ায় মাত্র। একদিন-না-একদিন তাকে যে ধরা যাবে এই অপার আনন্দ তার সমস্ত দুঃখটিকে সুখের সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিত।

ওস্তাদজি একদিন বল্লেন—"বাচ্ছা, ও সুর ছেড়ে দে! আমি তোকে একটা নতুন সুর দিই—তুই তারই সাধনা কর।"

অন্ধ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লে—"না গুরুজি, না! আমি ও-রাগিণীটিকে ছাড়তে পারব না—আমি নতুন সুর চাইনে!"

কত সাধ্যসাধনা করে ওস্তাদজির কাছ থেকে নতুন সুর আদায় করতে হয়, তিনি যেচে তাই দিতে চাইলেন, অন্ধ তা নিলেনা দেখে ওস্তাদজি রেগে বল্লেন—"বোকা কোথাকার!"

অন্ধ চুপ-করে রইল। আগে নতুন নতুন-নতুন সুর দিতেন, তাই নিয়ে তারা খেলা করত—বাহবা পেত; এর জন্যে তার মনে কত হিংসাই না হয়েছে। নিজের দুর্ভাগ্য দেখে তার ক্ষোভের অন্ত থাকত না। কিন্তু এখন তার নতুনের প্রতি কোনো লোভ হল না। তার মনে হতে লাগল সে জীবনের মধ্যে এমন-একটি বন্ধুর আভাস পেয়েছে যাকে বুকের আসন থেকে ঠেলে-দিয়ে নতুনকে সেখানে বসাতে প্রাণ কেঁদে ওঠে।

একলাটি সেতার-হাতে বসে সেই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপের জন্যে সে সাধ্য-সাধনা করত। হঠাৎ একটা ঝঙ্কারের মধ্যে যেই সেই বন্ধুর একটুখানি আবির্ভাব হ'ত, তার সমস্ত হৃদয়-মন আনন্দে শিউরে উঠত। মনে হ'ত তার বন্ধ-দৃষ্টি যেন খুলে গেছে। সে চকিতের মতো দেখতে পেত খুব দূর-আকাশের নীল পর্দার ভিতর থেকে যেন কোন্ অপ্সরী-রাজ্যের সাদা আভাটি ফুটে বেরুচ্ছে। সুর-সুন্দরীরা হাওয়ার গায়ে রূপোলি-ওড়না ছড়িয়ে বিচিত্র লীলায় ভেসে চলেছে। তাদের গতির শব্দে নব-নব সুর ঝরে পড়ছে, এবং তার ভঙ্গীতে কত অপরূপ নাচের ছাঁদ ফুটে উঠছে!

এই দেখাটুকু পেত সে মুহূর্ত্তের জন্যে। তার পর আবার যে-অন্ধকার সেই অন্ধকার! তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে সেতারের পর্দ্দায় আঙুল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে তার বন্ধুটিকে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বেড়াত—

এই ডাকে যারা সাড়া দিয়ে উঠত, তাদের মধ্যে কেউ ছিল তার অল্প-পরিচিত, কেউ ছিল একেবারে অপরিচিত। কেউ ধমক দিয়ে বলে উঠত—'মিছামিছি আমার ঘুম ভাঙাও কেন?' কেউ রেগে বলে উঠত—'অসময়ে আমার ডাক পড়ে কেন?'

কেউ তার স্পর্শে খাম্‌কা রাগে গোঁ-গোঁ করতে থাকত; কেউ লজ্জাবতী লতাটির মতো শিউরে-শিউরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত। কেউ তীরবেগে ছুটে চলে যেত, কেউ ধীরে ধীরে ফণা তুলে উঠে তার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করে ধরত। কেউ ছোটো-ছেলের মতো খিল্‌খিল্ করে হেসে পালাত; কেউ যুবতীর চল্‌চলে-লীলার বিদ্যুৎ ছুটিয়ে চলে যেত। কেউ কেঁদে-কেঁদে কি মিনতি জানাত। কেউবা কিছু বলতনা, শুধু দীর্ঘ-শ্বাস ফেলত। এম্‌নিতর কত কি হ'ত। এদের সবাইকে একে-একে ছাড়িয়ে সে বন্ধুর সন্ধানে এগিয়ে যেত। সে বেশী-কিছু পেতনা;—কখনো তার বন্ধুর একটুখানি আঁচোলের ছায়া তার মুখে আসে লাগত, কখনো-বা একটুখানি নিশ্বাস গায়ে এসে পড়ত। তাইতেই সে খুসী হয়ে উঠত।

এমনি-করে তার দিন কাটছিল। একদিন ওস্তাদের বাড়ি সেতার-হাতে সে বসে আছে, হঠাৎ কে এসে ভারি মিষ্টি তরুণ গলায় বল্লে—"অন্ধ, তোমার সেতার আমায় শোনাও।"

অন্ধর মনে হ'ল সেই গলার সুরের আঘাতে সেতারের সমস্ত তারগুলো যেন হাতে বাজেনা—যার সাধনা তার জীবনের ব্রত, সেই রাগিণী যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটে উঠল। অন্ধ বলে উঠল—"দেবী! তুমি কেগো, তুমি কে?"

মেয়েটি বল্লে—"আমি কে তা তো প্রকাশ করতে পারব না। তুমি আমাকে দেখতে পাবেনা, জানতে পারবেনা, তাই তো তোমার সাম্‌নে বার হ'তে পেরেছি।"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, তোমার ঐ গলার সুর তো কখনো শুনিনি—তুমি থাক কোথায়?"

মেয়েটি বল্লে—"অন্তঃপুরে।"

অন্ধ বল্লে—"অন্তঃপুরে? তবে আজ বাইরে এলে যে!"

মেয়েটি বল্লে—"আজ বাইরে এসেছি তোমার গান শুনব বলে।"

অন্ধ বল্লে—"আমার গান? আমি তো গাইতে জানিনা।"

মেয়েটি বল্লে—"তোমার মতন সুরের ওস্তাদ আর-কেউ আছে না কি!"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, পরিহাস করছ? আমি অন্ধ—আমি সঙ্গীতের কিছুই জানি না।"

মেয়েটি বল্লে—"অন্ধ, মিথ্যা বোলোনা। তোমার সঙ্গীত আমি শুনেছি। সঙ্গীতের আমি কিছুই জানিনা, তবু অন্তঃপুরের বন্ধ-দুয়ার ঠেলে তোমার সেতারের ঝঙ্কার আমার কানে গিয়ে লাগে, আমি কাজ করতে-করতে আন্‌মনা হয়ে যাই। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা যখন পা-ছড়িয়ে চুপ-করে বসে থাকি, তখন তোমার ঐ তারের কান্না এসে আমার মনকে উদাস করে দেয়।

সঙ্গে-সঙ্গে তোমার ঐ সুর ভেসে আসে আর আমার মনে হয় আমার বুকের মধ্যে যেন একটি সন্ধ্যা-তারা ফুটে উঠল। আজ সকালে তুমি কী তার টেনেছ বলতে পারিনা, আমাকে অন্তঃপুর থেকে টেনে এনে তবে ছাড়লে!”

অন্ধ বল্লে—“দেবী, এ তুমি কি বলছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

মেয়েটি বল্লে—“এখন কথা রাখো; সেতার শোনাও। আমার বেলা বয়ে গেল।”

অন্ধ বল্লে—“আমি একটিমাত্র সুর পেয়েছি, তাও আমার এখনো অভ্যাস হয়-নি। তোমায় আমি কি শোনাব?”

মেয়েটি বল্লে—“তাই শোনাও!”

অন্ধ তখন সেতার ধরলে। তার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—“ওগো আমার বন্ধু, তুমি এসে আমায় এই বিপদ থেকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।”

প্রথম তারটির গায়ে আঙুল ছোঁয়াতেই অন্ধ যেন শুনতে পেলে কে বলে উঠল, ‘আমি এসেছি বন্ধু, এসেছি।’ অন্ধ তখন তারের গায়ে আঙুল সরিয়ে-সরিয়ে বলতে লাগল, ‘কই বন্ধু, তুমি কই?’ সুর বলতে লাগল, ‘এই যে, আমি এই যে!’ এমনি-করে বিচিত্র সুরের ভিতর দিয়ে, বন্ধুর নাগাল পাবার জন্যে, অন্ধ ছুটে চলতে লাগল। সেতারের অঙ্গ বেয়ে সুরের বৃষ্টি ঝরে-পড়তে লাগল। অন্ধ তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে, মেয়েটি তন্ময় হয়ে শুনছে;—মনে হতে লাগল পৃথিবীর আর-সব শব্দ যেন থেমে গেছে,

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—“অন্ধ, ধন্য তুমি ধন্য!”

হঠাৎ অন্ধর মনে হল তার বন্ধ-দৃষ্টি যেন খুলে গেছে;—আজ আর দূর-আকাশের গায়ে সেই অপ্সরারাজ্য নয়, আজ তার চোখের সাম্‌নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! অন্ধ সেতার থামিয়ে চীৎকার-করে বলে উঠল—“বন্ধু, তুমি এত সুন্দর! এমন রূপসী তুমি!”

মেয়েটি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—“এ কি! তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না কি?”

অন্ধ বল্লে—“পাচ্ছি বন্ধু, খুব পাচ্ছি। চোখ-ভরে দেখতে পাচ্ছি।”

মেয়েটি বল্লে—“ছি ছি ছি, কি লজ্জার কথা!”—বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

অন্ধর সমস্ত দৃষ্টি আবার অন্ধকার হয়ে এল। মেয়েটি যেখানটিতে বসেছিল সেই জায়গাটা হাতড়ে-হাতড়ে দেখে যখন দেখলে শূন্য, তখন তার উপর আছাড়-খেয়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল।

অন্ধর চোখের জল শুকিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মনের কান্না থামল না। সে যখনই সেতার হাতে করে বসে, তার আঙুলগুলো কেঁদে-উঠে সমস্ত সেতারটাকে কাঁদাতে থাকে। একদিন সে আপন-মনে বসে-বসে এমনি-করে সেতারটাকে কাঁদাচ্ছে, এমন সময় মেয়েটি এসে দূর থেকে বল্লে—“ওগো অন্ধ, তোমার ঐ কান্না থামাও। চোখের জল যে আর ধরে-রাখা যায় না!”

অন্ধ সেতার থামিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে বলে উঠল—“এস বন্ধু, এস, কাছে এস।”

“ছি ছি ছি!

এ কি লজ্জার কথা! লোকে শুনলে নিন্দা করবে যে!"

অন্ধ অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

মেয়েটি বল্লে—"তুমি কি জাননা আমি এখানে লুকিয়ে আসি? আমার যে বাইরে আসবার যো নেই—আমি যে অন্তঃপুরে থাকি!"

অন্ধ বল্লে—"দেবী, তুমি এখানে কার কাছে আস? কেন আস?"

মেয়েটি বল্লে—"তোমার কাছে আসি।"

অন্ধ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"আমার কাছে? তবে কি তুমি আমার বন্ধু?"

মেয়েটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"তোমার বন্ধু আমি কেমন-করে হ'ব?"

অন্ধ বল্লে—"আমার বন্ধু নও, তবে যে আমার কাছে আস?"

মেয়েটি বল্লে—"সে তুমি অন্ধ বলে। তুমি আমায় দেখতে পাওনা, তাই কোনো লজ্জা নেই, তাইত আমি আসতে পারি!"

অন্ধ বল্লে—"যদি তাই হয় দেবী, তবে আমার এই অন্ধতা আজ সার্থক হল।"

মেয়েটি বল্লে—"আচ্ছা অন্ধ, তুমি যে বল্লে সেদিন আমায় দেখেছ—সে কেমন দেখেছ বল দেখি?"

অন্ধ বল্লে—"অপূর্ব্ব সুন্দরী!—তেমন কখনো দেখিনি!"

মেয়েটি বল্লে—"সত্যি? আচ্ছা বর্ণনা কর দেখি!"

অন্ধ ব্যাকুল হয়ে বল্লে—"দেবী, সে রূপ কি করে বর্ণনা করব? কিসের সঙ্গে তুলনা করব? আমি যে কিছুই দেখিনি!"

মেয়েটি বল্লে—"তবে তুমি সত্যাই অন্ধ?"

অন্ধ বল্লে—"হ্যাঁ দেবী, আমি সত্যাই অন্ধ!"

মেয়েটি তখন চুপিচুপি বল্লে—"একটা কথা কাউকে বলবেনা বল?"

অন্ধ বল্লে—"না!"

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে—"বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু!"

অন্ধর মনের অলিগলির ভিতর এই কথাটি কেঁপে-কেঁপে ঝঙ্কার তুলতে লাগল। মেয়েটি চলে গেলে সে সেতার নিয়ে বসল। তার আঙুলগুলো আজ যেন নৃত্য করে উঠল। তার হাতের সেতার আজ আকাশে-বাতাসে আনন্দলহরী তুলতে লাগল।

মেয়েটি ফিরে এসে বল্লে—"বন্ধু, এ কি! এ নতুন-সুর তুমি কোথায় পেলে? এ সুর ত কখনো শুনিনি!"

অন্ধ বল্লে—"এ কি তোমার ভালো লাগল?"

মেয়েটি বল্লে—"বন্ধু, ভালো লাগল কি-না বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার প্রাণে গিয়ে লেগেছে, তাই আমি ছুটে এলুম!"

অন্ধ বল্লে—"তবে শোনো।"

মেয়েটি একটু শুনে বল্লে—"অন্ধ, তুমি যে আশ্চর্য্য করলে! এ নতুন সুর তোমায় কে শেখালে? এমন সুর তো কখনো শুনিনি!"

অন্ধ বল্লে—"বন্ধু, এ সুর কেউ তো শেখায়নি। এ-সুর যে তুমিই আমার মনে বাজিয়ে দিয়ে গেলে!"

মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—"সত্যি?"

অন্ধ বল্লে—"হ্যাঁ দেবী, সত্যি!"

মেয়েটি বল্লে—"দেখ বন্ধু, তোমার সেতার শুনে আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সুরটি আমিও গলা-খুলে গাই, কিন্তু—"

অন্ধ বল্লে—"কিন্তু কি দেবী?"

মেয়েটি বল্লে—"লোকে তাহলে নিন্দে করবে!"

অন্ধ বল্লে—"নিন্দে করবে কেন?"

মেয়েটি বল্লে—"আমি যে অন্তঃপুরে থাকি। আমার কি গলা-খোলবার যো আছে!"

মেয়েটি চলে যাচ্ছে দেখে অন্ধ ব্যাকুল-হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বন্ধু, আবার কখন্ আসবে?"

মেয়েটি বল্লে—"কখন্ আসব তা তো বল্‌তে পারিনা বন্ধু—আমায় যে লুকিয়ে আসতে হয়।"

অন্ধ বল্লে—"আমি যখন তোমায় ডাকব, তুমি এস।"

মেয়েটি শিউরে-উঠে বল্লে—"ছি ছি ছি! অমন কাজ কোরোনা। তোমার গলা অন্তঃপুরে গেলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে!"

অন্ধ বল্লে—"বন্ধু, সে ভয় কোরোনা। আমি সেতারের সুর দিয়ে তোমায় ডাকব।"

মেয়েটি বল্লে—"সে বেশ হবে! তোমার সেতারের ডাক আমার ভারি ভালো লাগে। কিন্তু বন্ধু, তুমি ত ডাকবে, আমি উত্তর দেব কি করে?"

অন্ধ বল্লে—"তাইত বন্ধু, তুমি উত্তর দেবে কি করে?"

মেয়েটি দুঃখিত হয়ে বল্লে—"আমি পারবনা।"

দিন কাটতে লাগল। অন্ধ কখনো মেয়েটির দেখা পায়, কখনো পায়না। কখনো তার বুকফেটে কান্না উঠতে থাকে, কখনো তার হৃদয় আনন্দে গলে যায়। কখনো সে সেতারটিকে কাঁদায়, কখনো আনন্দের স্রোতে ভাসায়। এমনি করে তার দিন কাটে।

ওস্তাদজির সমস্ত শিষ্য ক্রমে-ক্রমে নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ে হয়ে উঠতে লাগল। কেবল অন্ধ একলা একদিকে পড়ে রইল; কেউ তার খবরও করলেনা। সে আপন-মনে আপনার মনের সুর সেতারে বাজাতে লাগল;—একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, এম্‌নি-করে তার নিজের সুর শাখা বিস্তার করতে লাগল—মধ্যে রইল সেই মেয়েটি। সে আসে-যায়, বাজনা শোনে, বাহবা দেয়। কখনো চুপ-করে চোখের জলটি ফেলে উঠে যায়, কখনো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে থাকে, কখনো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে থর্ থর্-করে কাঁপতে থাকে। অন্ধ এই সব ছবি তার সেতারে তুলে নেয়—তার আর সুরের অভাব হয় না।

একদিন ওস্তাদজি একটা জল্‌সা করলেন। তাতে নানা দেশের গুণী নিমন্ত্রিত হ'লেন। তাঁর শিষ্যরা কেউ সেতার, কেউ বীণ, কেউ তানপুরো নিয়ে বসল। অন্ধরও সেখানে ডাক পড়েছিল। হাজার হোক সেও তো একজন শিষ্য বটে!

একে একে সমস্ত শিষ্য নিজের নিজের বিদ্যা দেখালেন—সকলেই বাহবা পেলেন। ওস্তাদজির সুখ্যাতি চারিদিকে উঠতে লাগল—অমন গুরু না হলে এমন শিষ্য হয়!

অন্ধ এক-কোণে চুপটি করে বসেছিল। সব-শেষে ওস্তাদজি বল্লেন—"অন্ধ, তুমি যা জানো এইবার শোনাও।"

অন্ধ বল্লে—"ওস্তাদজি, আমি যে কিছুই শিখতে পারিনি। কি শোনাব?"

ওস্তাদজি বল্লেন—"তুমি যা জানো, তাই শোনাও।"

অন্ধ ভয়ে-ভয়ে সেতার তুলে নিলে। তার মনে-মনে এই আশা জেগে উঠল যে, বন্ধু যখন তার বাজনার এত তারিফ্ করে তখন তার ভয় কিসের! সে ধীরে-ধীরে পর্দার উপর হাত ঠেকালে। সেতার গুম্‌রে উঠলো। সবায়ের মনে হল যন্ত্রে বেসুরো তান উঠেছে। শ্রোতারা মুখ-টিপে-টিপে হাসতে লাগল। ওস্তাদজি দাঁতে দাঁত চেপে হিস্‌হিস্‌-শব্দে বলে উঠলেন—ছি! ছি! ছি!

অন্ধর কানে সেই তীব্র শব্দ গেল। তার সমস্ত হৃদয়টা লজ্জায়, দুঃখে কাঁপতে লাগল। তখন তার আঙুলগুলো কাঁপতে-কাঁপতে তার সেই কান্নার তারের উপর গিয়ে আছাড়-খেয়ে পড়ল। তার পর তার মন যত কাঁদে, সেতারের তারগুলোও তত কাঁদে!

শ্রোতারা পরস্পরের মুখ-চাওয়া চাওয়ি করে বলতে লাগল—"এ কি, পাগল না-কি! যা-খুসি তাই বাজায়—কোনো হিসেব নেই।"

ওস্তাদজি রেগে বলে উঠলেন—"থাম্ থাম্। —তোর আর বাজাতে হবেনা। ছি-ছি-ছি, তোকে কেন আমি সাগরেদ্ করেছিলুম। তুই আমার নামের উপর একটা কলঙ্ক দেগে রাখলি!"

অন্ধ সেতার থামিয়ে পথ-হাতড়ে-হাতড়ে সভা ছেড়ে চলে গেল। তার পর তার সেই নির্জ্জন জায়গাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল।

—"একি অন্ধ, তুমি কাঁদচ?"—বলে মেয়েটি এসে সেইখানে দাঁড়াল।

অন্ধ কোনো কথা কইলেনা—ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটি বল্লে—"বন্ধু, তোমার সেতার কৈ?"

অন্ধ বল্লে—"চুলোয় যাক্ আমার সেতার! সেতারে আমার কি হবে! আমার সেতার কে শুনবে!"

মেয়েটি বল্লে—"সে কি বন্ধু! আমি শুনব বলে যে আশা-করে বসে আছি!"

অন্ধ মাটি-ছেড়ে উঠে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"সত্যি!"

মেয়েটি বল্লে—"আমি কি তোমায় মিথ্যা বলি!"—বলে সেতারটি কুড়িয়ে এনে অন্ধর হাতে তুলে দিলে।

অন্ধ সেতারটা নিয়ে তার ছেঁড়া তারগুলো আবার বাঁধতে সুরু করলে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রম-বিভাগ

(ক্রপটকিন হইতে)

ধনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমাদের মতের প্রভেদ বিস্তর। এতদিন তাঁরা যে ভিত্তির উপর তাঁদের মতগুলি গড়ে তুলে-ছিলেন তা যে নিতান্ত কাঁচা তা প্রমাণ করবার সময় এসেছে। যে নতুন আলোয় সমাজের সমস্ত আবর্জ্জনা আমাদের নজরে ধরা পড়েছে, সেই আলো আমরা এর উপরেও ফেলতে চাই—ভিতরের যা গলদ আছে তা প্রকাশ করবার জন্যে।

অর্থশাস্ত্রের যে-কোন বই পড়লে দেখা যায় যে সেটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথম উৎপাদন বা ফসল নিয়ে আলোচনা—এখানে অর্থসৃষ্টির নানা উপায়ের সবিস্তার বিবৃতি আছে; তাছাড়া শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতি ও তৎসাহায্যে অধিক পরিমাণে শিল্পদ্রব্য-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এবং মূলধন সম্বন্ধে নানা কথা আছে। বইয়ের শেষে খরচ-সম্বন্ধে আলোচনা —অর্থাৎ কেমন করে লোকের দরকার মেটে, অধিকন্তু অর্থসঞ্চয় ও অধিকার-প্রমত্ত প্রতিদ্বন্দ্বীরা কি-ভাবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন, এই সব ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ আছে।

অনেকে এই কথাটাই যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে করেন যে দরকার-বোধের আগে জিনিষগুলো তৈরি করা চাই; নইলে অভাব মেটাব কেমন করে? কিন্তু আমরা ... জিনিষ তৈরি করা আর ... আছে কিনা সেটা সব-আগে দেখা দরকার। অসভ্য মানুষ যে শীকারের পিছনে ছুটত এবং ক্রমশ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির আবাদ ও যন্ত্রনির্ম্মাণ এবং নানারকমের কল-কারখানা তৈরি করলে সে ত এই দরকারেরই দায়ে! দরকারের বোধটা অভাব-মেটাবার জিনিষ-তৈরীর চেয়ে আগেই দরকার। প্রথমে প্রয়োজনীয়তার অভাব-বোধ এবং পরে সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যে জিনিষ তৈরীর উপায়-আলোচনা আমরা সবচেয়ে প্রশস্ত ও যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি বলে মনে করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই প্রণালীর অনুসরণ করব।

ধনবিজ্ঞান, নামে বিজ্ঞান হলেও এতদিন কিন্তু তার সেই নামের কোন সার্থকতা ছিল না। আমাদের নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে বিচার করলে এটির অর্থ একেবারে নতুন হয়ে দাঁড়ায়—কতকগুলো তত্ত্বের অর্থহীন সমষ্টি হবার পরিবর্ত্তে এটি সত্য একটা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এখন এর সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে—মানুষের দরকারের বিশিষ্ট আলোচনা এবং যতদূর সম্ভব মানবীয়-শক্তির কম অপচয়ে সেই দরকার মেটাবার উপায়। উদ্ভিদ বা জীবতত্ত্বে শারীর-বিজ্ঞানের যে কাজ, সমাজতত্ত্বে ধন-বিজ্ঞানের সেই কাজ; অর্থাৎ অভাবের অনুধাবন এবং তা মেটাবার উপায় নির্দ্দেশ। এইখানেই এর বিজ্ঞান

মানুষের অভাব আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত দেখি যে সকলেই বেশ স্বাস্থ্যকর ঘরের মধ্যে বাস করতে চায়;—ছোট অপরিষ্কার কুঁড়ের উপর তাদের কিছুমাত্র টান নেই, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা। সকলেই চায় কমবেশী আরাম-দায়ক মজবুত ঘর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রত্যেকে এমন ঘর কেমন-করে পেতে পারে এবং পাবার পথে বাধাই বা কি? বলা বাহুল্য আমরা গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্চি যে প্রত্যেকেরই শক্তি আছে, কেউ অক্ষম বা দুর্ব্বল নয়।

আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে আসল ব্যাপার খুব জটিলও নয়, অদ্ভুতও নয়—কয়েক দিনের পরিশ্রমে সকলেই নিজের মনের মত ছোট ছোট বাড়ী তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু শতকরা নব্বইজন লোক এমন বাড়ী যে কোনদিনই পায়নি, তার কারণ মনিবের ছোট-বড় অভাব মেটাতে সাধারণলোকে সব সময়ে এমনি ব্যস্ত যে, নিজের মনের মত বাড়ী তৈরির তার না আছে অর্থ, না আছে অবসর। যতদিন বর্ত্তমান বন্দোবস্ত চলবে ততদিন তারা এই সুখের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং কুঁড়ের মধ্যে থেকে নিজের সুখের স্বপ্ন দেখেই সন্তুষ্ট হবে।

অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এইখানেই;—তাঁরা প্রতিবৎসর তৈরি-বাড়ীর হিসাব করে বলেন যে, যা আছে তাতে সকলের অভাব মেটানো অসম্ভব; এতে শতকরা দশজনের স্থান-সঙ্কুলান্ হতে পারে। কাজেই নব্বই জনকে কুঁড়ে ঘরে থাকতে হবেই। অথচ ঘর-তৈরির সমস্ত পরিশ্রম এই নব্বই জনকেও করতে হয়েছে!

এবার অন্নসংস্থানের কথা আলোচনা করা যাক। শ্রম-বিভাগের নানাগুণের প্রশংসা করে' অর্থনীতিবিদেরা উপদেশ দেন যে শ্রম-বিভাগ বজায় রেখে কাউকে মাঠে আর কাউকে কারখানায় কাজ করতেই হবে। তারপর কৃষিলব্ধ ফসল, কারখানায় তৈরি যন্ত্র ও শিল্প-সামগ্রী এবং পরিবর্ত্ত-প্রণালীর আলোচনা, বিক্রয়ের উপায়, লাভালাভ, মজুরি, রাজকর প্রভৃতি লক্ষ রকমের হিসাব-নিকাশের মধ্যে তাঁরা ডুব দেন এবং উপদেশের পরিণাম-সম্বন্ধে কোন কথাই মনে রাখেন না। তাঁদের সঙ্গে এ-সবের আলোচনা করে কোন ফল নেই। কারণ যতবারই তাঁদের প্রশ্ন করা যায় যে এত লোক থাকতে এবং এত লোকের সারাজীবনের হাড়ভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও লোকের অন্নাভাবের কারণ কি? তাঁরা মোটা-সরু নানা সুরে এই শ্রম-বিভাগ প্রভৃতির দোহাই দেন বটে কিন্তু তাঁদের মোদ্দা কথাটা দাঁড়ায় এই যে অভাব মেটাবার পক্ষে উৎপন্ন ফসল যথেষ্ট নয়। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু এতে আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তরই মেলে না। নিজের অন্নের অভাব, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের পরিশ্রমে ঘোচাতে পারে কি-না এবং না-পারবার পক্ষে বাধাটা কি?—এইটেই দেখতে হবে।

বোধ করি সাধারণ লোকের মোটামুটি অভাবটা কি তা সকলের জানা আছে! এখন দেখতে হবে তারা সে অভাব ঘোচাতে পারে কি না এবং সে অভাব মিটিয়ে শিল্প-বিজ্ঞান-চর্চ্চা ও আনন্দ-উপ-

ভোগের উপযুক্ত অবকাশ তারা পায় কি না? এ-সবের যথেষ্ট আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করেছি কিন্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্য এবং বাধার আলোচনা করি-নি বলে এটা কম দরকারি ভাবলে ভুল হবে।

মানুষের অত্যাবশ্যক জিনিষ তৈরি করবার ক্ষমতার অভাব নেই; সকলেই তা জানেন। কিন্তু সে শক্তি বাড়াবার আবশ্যক আছে কি না এ কথা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাতে চায় না। আমরা বলি ফসল উৎপাদনের পথে মানুষের শক্তি বাড়ালে ক্ষতি নেই, কিন্তু গলদ এড়িয়ে কাজ কি? আমাদের গলদ হচ্ছে এই যে, মানুষের উৎপাদন-শক্তি মানুষের আসল প্রয়োজনের কথা ভুলে অন্য সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত আছে। এ বিষয়ে আমাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল পথে গেছে। উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাব মেটানো,—তা ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই।

একটা কথা নিয়ে অর্থতাত্ত্বিকেরা ভারি গোল করেন—কথাটি হচ্ছে 'ফসলের-বাহুল্য' অর্থাৎ এক-এক সময়ে প্রয়োজনের জিনিষ এত বাড়তি হয় যে আবশ্যকের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কথাটা কি সত্য? বাস্তব জীবনের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে অভাবের অনুযায়ী উৎপাদন কোনদিনই হয়নি—বাহুল্য ত স্বপ্ন-কথা! ঘরের কোণে বসে বাইরের খবর লেখার মধ্যে সত্যের যথেষ্ট অপলাপ থাকতে বাধ্য। নিতান্ত অন্ধ না হলে এমন-ধারা কথাটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব হ'ত না।

নয়। কর্ম্মীজনের জীবনে এ কথাটা বিশেষ করে খাটে। দেশের অভাব মিটিয়ে বেশী যা থাকে আগে আগে তাই অন্য দেশে দেশে পাঠান হ'ত কিন্তু এখন এ নিয়ম বদ্‌লে গেছে—এখন বাইরের মুখ চেয়েই জিনিষ-পত্র তৈরি হয়; কারণ কর্ম্মীজনের নিজেদের তৈরি জিনিষ কেনবার সঙ্গতি নেই, তার উপর আবার নানারকম কর, আর সুদ দিতে তার হাত খালি হয়ে যায়!

আমাদের জীবন-যাত্রার চালটা যে ক্রমেই বাড়ছে তা অস্বীকার করি না কিন্তু মজুরি করে যারা কোনরকমে দিনগুজরাণ করে, দিন কাটাবার মত অশন-বসনের অভাবেই সে কাতর; বাবুয়ানির কথা তোলাই একটা মস্ত অসঙ্গতি! অথচ বিজ্ঞেরা এই অতিরিক্ত ফসলের কথা নিয়ে ভারি ব্যস্ত! প্রকৃতপক্ষে এ জিনিষটার কোন অস্তিত্বই নেই—অভাব মিটিয়ে বেশী থাকা দূরে থাক্, অভাব যে কোনদিন সম্পূর্ণভাবে মিটবে তার কোনই সম্ভাবনা নেই।

আর একটা কথা আছে। অর্থশাস্ত্রে একটা সুপ্রমাণিত সত্য এই যে,—নিজের যা আবশ্যক তার চেয়ে মানুষ বেশী উৎপন্ন করে। একটা কৃষক-পরিবারের বছর-খানেকের পরিশ্রমে ও যত্নে উৎপন্ন ফসলে অনেক পরিবারের অভাব মেটে। কথাটা সত্য কিন্তু বিজ্ঞেরা এ অর্থ করেন না; তাঁরা বলেন তার যা ন্যায্য খরচ তার চেয়ে কৃষক বেশী ফসল ফলায় এবং আত্মসাৎ করে। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। বরং এই কথা বলা উচিত যে শাসন-

দিয়ে নিজেদের মত কৃষাণের কিছুই থাকে না। অর্দ্ধাশন অনশনের সঙ্গে লড়াই করে তারা বেঁচে আছে এই মাত্র। আমরা ত রোজই দেখছি যে বর্ত্তমান শ্রম-বিভাগের ফলে মজুর-দল অশন-বসনের যে সংস্থান করছে মনিবের দল জোর করে তা ভোগ করছে—কর্ম্মীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে'। এ আশ্চর্য্য শ্রম-বিভাগের গুণগান করতে হলে অমানুষ হতে হয়!

আমরা যে-পথে অগ্রসর হতে চাইছি, তাতে সর্ব্বসাধারণের প্রধান প্রধান অভাব মেটাবার বন্দোবস্ত আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য করা হবে। উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য অভাব মেটানো, অলস মনিবের বাবুয়ানার ইন্ধন যোগানো নয়। মূলধনী মহাজনেরা নিজেদের সুবিধার জন্যে মজুর-দলকে খাটিয়ে নিচ্ছেন আর অর্থ-তাত্ত্বিকের দল তার ফল দেখে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ এবং প্রচার করছেন; কোন দিন তাঁরা এর যথার্থ বিচারের দিকে মন দেন নি।

কাজেই ফসলের বন্দোবস্তের সঙ্গে-সঙ্গে এই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষা ও সংস্কার প্রভৃতির মূলোচ্ছেদের বিশেষ দরকার আছে। শ্রম-বিভাগ বলে যে তত্ত্বটার উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞেরা বই লেখেন, সে জিনিষের বিচার করবার সময় এসেছে। অর্থতাত্ত্বিকের একদেশদর্শিতা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের একটা বিশিষ্ট উদাহরণ এই শ্রম-বিভাগ।

অর্থনীতিবিদেরা উপদেশ দেন যে লোকের শক্তি নানা দিকে বিক্ষিপ্ত (!) [illegible]

করা উচিত, তাতে কাজের খুব সুবিধা হয়। যেমন পেরেক গড়তে অনভ্যস্ত কামার যদি কোন দরকারে পেরেক গড়তে বসে, তবে দিনে দু'তিনশ' পেরেকের বেশী সে গড়তে পারে না; কিন্তু যদি সে এ-কাজে নিযুক্ত থাকত তবে দিনে দু'তিনহাজার পেরেক গড়তে তার কষ্ট হত না। কাজেই তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে প্রত্যেককে এক-একটা বিশেষ কাজে নিপুণ হতে হবে। বিশেষজ্ঞ হওয়া ধনাগমের যে একমাত্র উপায় এই কথাটা তাঁরা শেষপর্য্যন্ত সার্থক করে তুলতে চান, যেন শ্রম-বিভাগ না হলে সব শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে! সব কাজেই শ্রম-বিভাগের দরকার। পেরেক গড়তে হলে কেউ-বা তার মাথা গড়বে, কেউ-বা তলা গড়বে। কিন্তু যে বেচারা শুধু মাথা গড়বে, সে-কাজটা কিছুদিন পরে তার কাছে একঘেয়ে ও নিরানন্দময় হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। এবং অন্য কাজ না-শেখার দরুণ তাকে কারখানা-ওয়ালার অধীনে এবং মর্জ্জি-অনুসারে চলতেই হবে। তারপর এ-সব কাজে লোকের অভাব হবে না, কাজেই মজুরিও দিন-দিন কমতে থাকবে। অর্থতাত্ত্বিক কোনদিন এ-সব বাস্তব ব্যাপারের ধার ধারেন না; কর্ম্মীজনের সুখ-দুঃখের কোন খবরই তিনি জানেন না। জানলে শ্রম-বিভাগ সম্বন্ধে চীৎকারটা বহুদিন পূর্ব্বেই থেমে যেত।

এতদিন পরে তাঁরা এই সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা চলেছে। শ্রম-বিভাগের ফল এই দাঁড়িয়েছে [illegible]

সহানুভূতি-হীন হয়ে উঠছেন এবং মজুর-দল আরও বোকা, জীবনীশক্তি-হীন এবং কপর্দ্দকহীন হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ হওয়ার ফলে জীবনের আর-সব পথ তাদের পক্ষে এক-রকম বন্ধ এবং বৈচিত্র্যের অবকাশ না থাকায় তাদের জীবন কল বা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

এই কথাটা ব্যক্তি-হিসাবে যতখানি সত্য জাতি-হিসাবেও ঠিক তাই। এক-একটা জাতি যেন এক-একটা বিশেষ কারখানার মজুর। কোন দেশ কাপড়, কোন দেশ ধান-চাল, আর কোন দেশ স্কুলমাষ্টার, ধাত্রী প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। কেবল দেশে দেশে নয়, সহরে সহরে দলে দলে এই বিভাগ চলছে—কাপড়ের তৈরি নানা জিনিষ নানা সহরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সবাই ভেবেছিলেন যে এমনি করে সব জিনিষ দেশ বা জাতি-বিশেষের একচেটে হয়ে গেলে অর্থাগমের পথ একেবারে প্রশস্ত হবে; কিন্তু শিল্পশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে তাঁদের এ-সাধে বাদ পড়েছে, তাঁদের আশা* ধূলিসাৎ হয়েছে। এখন সব-দেশে বিভিন্ন কারখানায় নানা রকমের জিনিষ তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে, বিনা-কারণে পরের মুখ আর চাইতে হয় না।

শ্রম-বিভাগের মত fetish-এর সংখ্যা বর্ত্তমানে বড় কম নয়—সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্পে এই সমস্ত সংস্কারের সমূল উচ্ছেদ-সাধন না হলে আমরা পরিবর্ত্তন-সাধনে সফলকাম হতে পারব না। তরবারির আঘাতে বা বন্দুকের জোরে নয়—মানুষের কষ্ট-সঞ্চিত বিদ্যা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার শক্তিই আমাদের প্রধান সম্বল। শুধু কথায় কাজ হয় না বটে, কিন্তু কথা না হলেও কাজ চলে না—আমাদের হাতে যেমন কাজ করতে হবে, মুখেও তেমনি প্রচার করতে হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

আহ্বান

(হুগলীতে)

আজকের এই সভায় যারা উপস্থিত আমি তাদের সকলেরই অপরিচিত, অজানা, অচেনা। আমি আজ নূতন লোক হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আজ এই সভা আহূত হয়েছে সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার সংযোগ নূতন নয়। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এই কাজের সূত্রপাত বঙ্গশক্তি

আজ তোমাদের বীরত্বে উত্তেজনা দিতে এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এ সভা আহূত হয়েছে—ডাক্তার মল্লিক প্রভৃতি উদ্যোগীরা তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করতে এসেছেন এবং আমার মুখ দিয়ে সেই আহ্বানবাণী উচ্চারিত করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছেন। কেন? কারণ আমার আহ্বান আজ হঠাৎ আহ্বান নয়। যতদিন আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত

হয়েছে ততদিন থেকে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। আর সে আমারও আহ্বান নয়। আমার দ্বারা চিৎরূপিণী জগজ্জননী শক্তির আহ্বান। যিনি অখিলের আত্মা, সৎ অসৎ যা-কিছুর মধ্যে যে শক্তি তা যিনি, সেই শক্তির শক্তি মহাশক্তি বাঙ্গালী জাতিকে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ দিয়ে আহ্বান করছেন।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ঐ
সবাই এসেছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙ্গালী কৈ!

দশদিক্‌রূপিণী আদ্যাশক্তির দশহস্তে দশখানি অস্ত্রময়ী মূর্ত্তি চিত্তপটে নিয়ে এস। সে অস্ত্রগুলির যে শক্তি তাও তিনি, সে অস্ত্র যে ধারণ করবে তোমরা বাঙ্গালী যোদ্ধারা, তোমাদের শক্তিও তিনিই হবেন। যে শক্তি মহামায়া এতদিন তোমাদের মায়ায় মোহে ভয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন সেই শক্তিই আজ তোমাদের মোহমুক্ত করবেন, রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা করবেন।

বাঙ্গালী, বাঙ্গালী, বাঙ্গালী! বাঙ্গালী বল্‌তে কি ভাবে তোমাদের মন মাতে? তোমাদের স্বরূপ কি? শুধু কি তোমরা বইয়ের কীট! শুধু এগ্‌জ্যামিন পাশ করতে জান আর কলম পিশে দুটি ভাত গিল্‌তে জান? এই কি বাঙ্গালীত্ব? তোমরা কি মানুষ নও? মানুষের সব রকম আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, দুরাশা তোমাদের পেয়ে বসে না? ইউনিভার্সিটির মেডেল নিতে চাও, Victoria Cross নিতে তোমাদের সাধ হয় না? তাতে বেদনা বোধ হয়—হোক্‌গে। কোষের ভিতর কোষ, কোষের ভিতর কোষ—তারও ভিতরে সূক্ষ্ম কোষে যে আসল সূক্ষ্ম প্রাণীটি রয়েছে, সে সব স্থূল-কোষের আলস্য মোহ, ভয় ও বেদনা বন্ধ ভেদ করে অসাধ্য সাধন করতে ছুটবে। সহস্র ধারে বর্ষমান মেশিন-গানের গোলারাশির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বিচরণ করে কুশল ক্ষিপ্রতায় মৃত্যুর কবলস্থ সঙ্গীকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌বে। তবে ত জগৎকে জানাবে যে বাঙ্গালীও মানুষ, যেমন পঞ্জাবী মানুষ, যেমন রাজপুত মানুষ, যেমন মারহাট্টা মানুষ! ছিলে ত মানুষ তোমরাও—অতি প্রাচীন কালের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম—কিন্তু এই ক' পুরুষ আগে প্রতাপাদিত্য ও তাঁর উনিশ বছরের ছেলে উদয়াদিত্য মোগলদের সঙ্গে সম্মুখসমরে মরেছে। আরও কতজনের নাম শোনাব? গৃহাগত শত্রুর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা সবাই করেছে, তোমাদের আগে কেউ ত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নি!

ইংরেজ আমল পড়তেই তোমরা বইয়ের ভারে ডুবে গেলে। কৃষীর ছেলেও হাল ছেড়ে বই ধরে, শিল্পীর ছেলেও আইনের পাশ দিতে ব্যস্ত, ব্রাহ্মণের ছেলে আধ্যাত্মিক সাধনা ভুলেই গেল, খালি পড়ে,—আর ক্ষত্রিয়ের জাতধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতটাই লোপ পেয়ে গেল।

বাঙ্গালা দেশে নাকি ক্ষত্ররক্তের টিক-টিকিটা পর্য্যন্ত আর নেই। অথচ আশ-পাশেই ষোলকলায় সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান।

খালি খাস বঙ্গেই অভাব। যা আছেন দু-এক ঘর বর্দ্ধমান ও রঙ্গপুরের রাজা ও তাঁদের কুটুম্বরা, তাঁরা নাকি অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মাত্র বীরভূমি পঞ্জাব থেকে এদেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব কর্ম্মে না হোক নামে আজ পর্য্যন্ত ধুয়ে যায় নি। আর বাকী সবাই প্রতাপাদিত্য সীতারাম প্রভৃতি বারোভুঁইয়ার বংশধরেরা সেকালে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হলেও এখন কায়স্থ-সাগরগর্ভে লীন, কেননা তাঁরা আর অসি-জীবী নন মসীজীবী। বঙ্গের যে সেন-রাজার বংশধরেরা পঞ্জাবে রাজ্য স্থাপনা করায় আজও ক্ষত্রিয়, * তাঁদের বাঙ্গালী জ্ঞাতি সেনেরা—বল্লাল সেনের বংশধরেরা বদ্যি হতে পারেন, কায়স্থ হতে পারেন, সব হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ক্ষত্রিয় আর কিছুতেই বলা হবে না—তাঁরাও খালি বই পড়ছেন আর কলম চালাচ্চেন।

আপৎকালে ছাড় ভাই সবাই একবার বই—একবার জীবনের রাজপথে বেরিয়ে এস। দেখ সেখানে মনুষ্যত্বের কত নতুন দিক! ঘরে বসে যমের ভয় সত্যি ভয়। আজ টাইফয়েড, কাল যক্ষ্মা, পরশু কলেরা, তরশু বসন্ত—আবার তরশুর পরেও নিস্তার নেই—কেননা নরশুতে বোধ হয় বা প্লেগ। এই ত ভারতবর্ষকে আস্তে আস্তে আবার প্লেগ-দেবী ঘিরে ফেলছেন। বাঁকীপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, পঞ্জাব, করাচী, বম্বে, পুণা, যোধপুর, বিকানীয়র, নাগপুর, ইন্দোর ঘুরে ঘুরে পাকে পাকে এগিয়ে এগিয়ে আসছেন—আর এবার নাকি বড় বিষাক্ত টাইপ—বারো ঘণ্টার মধ্যে সন্নিপাত!—কখন্ বাঙ্গালাকে নাগপাশে জড়ান কি বলা যায়? তাই বলছি, ঘরে বসে মৃত্যু-ভয় সত্যিই ভয়, কেননা এখানে যমদূতেরা বেঁধে মারে। কিন্তু যে রণক্ষেত্রে কালের কাল মহাকাল স্বয়ং লীলা করছেন সেখানে ত মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। ক্রিকেট ফুটবল ত ঢের খেলেছ ভাই—একবার মহাকালকে আম্পায়ার বানিয়ে যুদ্ধের খেলাটা খেলে এস দিকিন। দেখ তুমি জয়ী হও, কি মৃত্যু জয়ী হয়। এ খেলায় মজা এই যে হারজিৎ দুয়েতেই লাভ আছে,—এক একটা লটারির মত, যে নম্বরটাই তোল কিছু না কিছু পাওয়া যায়। যদি হও তুমি জয়ী, তবে তোমার ও তোমার মার গলায় মর্ত্ত্যের যশোমালা পড়বে, আর যদি মৃত্যু জয়ী হয় তবে স্বর্গের অমৃত ও নন্দনহার তোমার জন্যে তৈরি রয়েছে।

যে সময় আমি ভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলুম তখনকার দিনে আমার সম্পাদকীয় নোটবুক থেকে মসলা সংগ্রহ করে বিদেশী ঘুষি বনাম দেশী কিলের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলুম।

সেদিন তোমাদের দেশী কিলটি পাকিয়ে তোলাবার জন্যে তখনকার প্রয়োজনমত ব্যবস্থাও করেছিলুম—বক্সিং গৎকা লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি সব রকম বীর্য্যোদ্বোধক

* [illegible]

খেলা শেখাবার ক্লাব স্থানে স্থানে খুলে দিয়েছিলুম।

এখন জার্মানের ঘুষি ভারতের কিনারায় এসে পৌঁচেছে। আমার মুষ্টিযোগে তোমাদের কিলটি মজবুত হওয়ার যেটুকু অভাব ছিল, আজ রাজবৈদ্য স্বয়ং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেটুকু পূরণ করে দিচ্ছেন—তোমাদের যুদ্ধবিদ্যা ও তোমাদের হাতে যুদ্ধাস্ত্র দান করছেন। ভেবোনা ইংরেজেরা স্বার্থপরবশ হয়ে স্বতন্ত্রতায় এই কাজ করছেন। তাঁরা স্বতন্ত্র নয়, ব্রিটিশজাতিও সেই মহাশক্তি-পরতন্ত্র, তাঁদের ভিতরেও যে শক্তি কার্য্য করছেন সে সেই জগৎনিয়ন্ত্রী আদ্যাশক্তি। সেই শক্তির দান আজ গ্রহণ করে ধন্য হও। মানুষ-হওয়ার সুযোগ নাও। জগতের সভায় মানের আসন পাওয়ার যোগ্য হও। রবীন্দ্রনাথ দেশের জন্য মান এনেছেন কাব্য দিয়ে, জগদীশ বসু মান এনেছেন গবেষণা দিয়ে। তুমি আমি সবাই অমন কবিতার রত্নে পসরা ভরাতে পারব না, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অত ধৈর্য্য ও অবসর সবায়ের হবে না। তবে তোমাদেরও যেদিকে পথ খোলা আছে সেইদিকে সার দিয়ে চল। সন্তানদের বীরত্বের গৌরবের জন্যে বঙ্গভূমি এখনও বুভুক্ষিতা—শুন তাঁর ক্রন্দন "ময় ভুখাহুঁ"!

চিতোরের রাজপুত্রদের মত নগরলক্ষ্মীর ক্ষুধা মেটাবার জন্যে বেরিয়ে পড় সমর-প্রাঙ্গণে। এই হুগলী নগরের কজন সন্তান মার ক্ষুধার সামগ্রী আহরণে আজ ব্রতী হবে!

কে উঠিবে আজ
কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ?

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮।

(কাশীপুরে)

দুশো বাঙ্গালী যোদ্ধার জন্যে নাকি আজ নগরে নগরে ফিরতে হচ্ছে? আজ যদি বেঙ্গলি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরোত যে অমুক কোম্পানির আফিসে একটা কেরাণীর পদ খালি আছে, এণ্ট্রেন্স ফেল্, এল্ এ ফেল হলে চল্বে—অমনি সাতশ দরখাস্ত একদিনে বড়বাবুর টেবিলে স্তূপাকার হত। গোলামী পেশায় প্রভূত আস্থা, আর প্রভুত্বের স্বাধীনতার আস্বাদে একেবারেই রুচিহীন! এমন উল্টা বুঝলি রাম!

এই সেই দেশ যেখানে চণ্ডীর পূজা আবহমান কাল থেকে চলে আস্‌ছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শক্তিমন্ত্র, অথচ সে মন্ত্র কার্য্যকালে একেবারে ব্যর্থ? ধিক্ সে পুরোহিতকে, ধিক্ তার পৌরোহিত্যে যার নিজের অন্তর সাগ্নিক না হওয়ায় এই এতকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে অন্ততঃ কিছুকোটি যজমানের অন্তরে অগ্নি জ্বালাতে পারে না।

দুতিন পুরুষ আগেও ত এই শক্তিমন্ত্র-বলে একভাগ বাঙ্গালী ডাকাতি করেছে আর আর-একভাগ ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছে।

ইউনিভার্সিটির কেতাবের নীচে তা চাপা পড়ে গেল? আর সেই গুরুচাপের নীচে পড়ে গুরুঠাকুরের চাল ও কদলীর মাত্রা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গুরুমন্ত্রের তেজটুকুও লোপ পেয়ে গেল।

যে ইউনিভার্সিটি তোমাদের সুধু পোড়ো বানায়, কেজো বানায় না, যে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের বিশ্বে বেরোবার দীক্ষা দেয় না, কোণে লুকিয়ে থাকার ডিগ্রী দেয়, তাকে বিদ্যালয় বলতে পারিনে, তা ঘোর অবিদ্যার আখড়া।

এই অবিদ্যার নেশায় ভোঁ থেকো না, একবার মনুষ্যত্বের আখড়ায় নাব, দুরূহকে দোসর কর, বিপদের সম্মুখীন হও, কঠিনকে আলিঙ্গন কর। সহজেতে তৃপ্ত থেকো না।

যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের অপৌরুষতার নেশা ধরিয়েছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টই আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। আজ তোমাদের হাতে শুধু কলম নয়, বন্দুক দিতে প্রস্তুত। লও সেই ভূষণ, পুরুষালী সাজে সাজ, আমরা তোমাদের মায়েরা বোনেরা তোমাদের দেখে চক্ষু জুড়াই।

দেখ পঞ্জাবের একজন শিখকে তার বিদেশ-প্রত্যাগত বন্ধু জিজ্ঞেস করেন—"তোমার কয় ছেলে?"

শিখ উত্তর দিলেন—"চার ছেলে।"

বন্ধু বল্লে—"শুনেছিলাম নাকি পাঁচটি!"

শিখ বল্লেন—"চার ছেলের পর আর একটা সন্তান হয়েছে—কিন্তু সে খালি পড়াশুনা নিয়ে থাকে—তাকে ব্যাটাছেলে

শুধু পঞ্জাবের নয়, সব দেশের সব কালের মনের ভাবটিই ঐ। ব্যাটাছেলের যে একটা মাপকাঠি আছে, শুধু পড়িয়ে হলে সে মাপে অনেক খাটো থেকে যেতে হয়।

খাটো থাকবে কি প্রমাণ-মাপের ছেলে হবে ভাইরা সব?

একটা পুরাণ কাহিনী শুনাই।

"একবার কৃষ্ণ ও বলরামের অনুপস্থিতিকালে যদুকুলারি সৌভপতি শাম্ব, প্রভৃত মনুষ্য হস্তী ও সৈন্যগণের সহিত দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। যদুকুমারগণ শাম্বরাজার সৈন্য আগত দেখিয়া বহির্নির্গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের পুত্র, সমরস্থ, মহাবাহু, বীর প্রদ্যুম্ন শাম্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহে কণ্ঠমূলে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় অবসন্ন হইলেন। প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক সৈন্যসকল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং শত্রুপক্ষীয় সকলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল। সুশিক্ষিত সারথি প্রদ্যুম্নকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বেগবান অশ্বদ্বারা রণভূমি হইতে অবসৃত করিল। রথ অতি দূরে অপগত না হইতেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া প্রদ্যুম্ন সারথিকে কহিলেন, "সূতপুত্র! তুমি কি হেতু রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিতেছ? বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের ত যুদ্ধ বিষয়ে এরূপ ধর্ম্ম নয়। তুমি কি মহা সংগ্রাম মধ্যে শাম্বকে দেখিয়া ভয়ে মোহিত হইয়াছ, না যুদ্ধ দর্শন করিয়া তোমার বিষাদ জন্মিয়াছে, তাহা সত্যরূপে আমাকে বল।"

সারথি কহিল—"হে জনার্দ্দন-নন্দন! আমি মোহিত বা ভীত হই নাই, পরন্তু শাম্বকে পরাজয় করা আপনার পক্ষে অতিশয় ভার বোধ করিয়াছি। হে বীর! পাপিষ্ঠ শাম্ব আপনার অপেক্ষা বলবান, এই নিমিত্ত আমি আপনাকে লইয়া রণভূমি হইতে মন্দগতিতে নিঃসৃত হইতেছি। রথী শৌর্য্যসম্পন্ন হইলেও যদি [illegible] মোহিত হন, তবে তাঁহাকে

আমাকে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ; সেইরূপ আপনি রথী, আপনাকেও রক্ষা করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়াই আমি সংগ্রামস্থল হইতে অবসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহু রুক্মিণীনন্দন! আপনি একক, দানবেরা অনেক, অনেকের সহিত একের যুদ্ধ করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমি রণাঙ্গন হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

প্রদ্যুম্ন সারথির এই উত্তর শুনিয়া অমর্যভরে বলিলেন—"রথ ফিরাও! আমি জীবিত থাকিতে কদাপি এরূপ আমাকে রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া গমন করিও না। যে ব্যক্তি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, 'আমি তোমার' এইরূপ কথনশীল, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, বিরথ, বিক্ষিপ্ত বা ভগ্নাস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত করে, সেই ব্যক্তি কখনই বৃষ্ণিবংশজাত নয়। হে সৌতে! যেহেতু তুমি বৃষ্ণিকুলের যুদ্ধবিষয়ীয় আচার-ব্যবহার সমদায়ই জান, সেই হেতু পুনর্ব্বার যুদ্ধস্থল হইতে কোন ক্রমে এরূপ অপগমন করিও না।

দুরাধর্ষ মাধব আমাকে যুদ্ধভূমি হইতে অপগত, পৃষ্ঠে হত, রণপলায়িত জানিয়া কি বলিবেন?

কেশবাগ্রজ মদোৎকট বলদেব সমাগত হইয়া আমাকে কি কহিবেন?

মহাধনুর্দ্ধর পুরুষসিংহ সাত্যকিই বা আমাকে রণপলায়িত জানিলে কি কহিবেন?

শাম্ব, সমিতিঞ্জয়, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ, মহারাজ অক্রুর, ইহাঁরাই বা কি বলিবেন?

বৃষ্ণিবীরদিগের স্ত্রীগণ আমাকে শূর ও সতত পুরুষাভিমানী বলিয়া জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বা সকলে একত্র অবস্থিত হইয়া আমার প্রতি কি বলিবেন? তাঁহারা বলাবলি করিবেন, এই প্রদ্যুম্ন মহাযুদ্ধে ভীত হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছে, ইহাকে ধিক্!

তাঁহারা এই কথা ভিন্ন আর সাধুবাদ করিবেন না! সৌতে! তাঁহাদের ধিক্কার বাক্য ও পরিহাস মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। আমি ভীত রণ হইতে পলায়িত ও পৃষ্ঠভাগে শরসমূহে আহত হইয়া কোন-ক্রমেই জীবনধারণ করিব না। ফিরাও! ফিরাও! শীঘ্র রথ ফিরাও!"

এই সেই বালক আধুনিক ক্রিকেট-ফুটবল-ম্যাচ-ক্রীড়কদিগের পূর্ব্বপুরুষ। বঙ্গের বালকগণ! এই যদুকুমারগণ, কুরুকুমারগণ, রঘুকুমারগণ তোমরাই! আত্মানং বিদ্ধি!" *

শ্রীসরলা দেবী।

২৪শে ফেব্রুয়ারি,
১৯১৮।

মাসকাবারি

"পত্র"

মাঘের সবুজপত্রে সম্পাদক মহাশয় তাঁর এক পত্রে গত একশত বৎসরের পীতপত্রী-বাংলা-সাহিত্যকে বিলকুল ঝরাইয়া দিয়া সবুজপত্রী-ভাবী-সাহিত্যের নবোদ্গমের আশার ও আনন্দের কথা বলিয়াছেন। তিনি গত একশত বৎসরের বাংলা-সাহিত্যের একটা নিরিখ লইয়াছেন। বাস্তবিক, একশত বৎসরব্যাপী সাহিত্যের

---

* ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের 'ভারতী'র "বাঙ্গালী [illegible]

বিচিত্র ধারাকে একটি ক্ষুদ্র "পত্র"-পুটের অঞ্জলির মধ্যে ধরিবার শক্তি তাঁর মত লেখকের পক্ষেই সম্ভবে; কেননা তাঁর দৃষ্টির "লেন্সে" বহুদূরের জিনিসও নিকট হইয়া দেখা দেয় এবং বিক্ষিপ্ত জিনিসও সংহত সীমায় ধরা দিয়া থাকে।

গত একশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ধারার বাঁকে বাঁকে ও ঘাটিতে ঘাটিতে নানা ভাবের হাট বসিয়াছে ও নানা রসের মেলা জমিয়াছে। ইহার মধ্যে কত বিচিত্র আন্দোলনের ইতিহাসই রহিয়া গেছে। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দ—ইঁহারা কেহই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্র নন্, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটা বড় বড় আন্দোলনের নায়ক—এক একটা যুগধর্ম্মের উদ্বোধক। দেশের বড় বড় ভাব-যজ্ঞে সাহিত্যিকেরা যেমন উদ্গাতা মাত্র হন্, ইঁহারা তা নন্—ইঁহারা হোতাও বটেন। সেই জন্যই বিশুদ্ধ আর্টের আদর্শ-নিকষে ইঁহাদের সৃষ্টিকে যদি কষা যায়, তবে বোধ হয় ইঁহাদের বারোআনা সৃষ্টিই 'আর্টিষ্টিক' নয়, ইহা প্রতিপন্ন হইবে। বিশুদ্ধ আর্টের অনুশীলন যে অবস্থায় সম্ভব হয়, সেই অবস্থায় নিজেদের মনকে স্থাপিত করিবার অবসর ইঁহারা পান্ নাই—দেশের নানান্ সমস্যা ও নানান্ প্রয়োজন ইঁহাদের সমস্ত মনোযোগ দাবী করিয়াছে।

অথচ সৌন্দর্য্যকলা নিত্যকালের সামগ্রী—সাময়িক প্রয়োজন যখন অত্যন্ত গুরু নিত্য রসের অনুভূতিটা ম্লান হইতে বাধ্য হয়। খুব আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যেও ইহার প্রমাণ-পরিচয় পাই। এ সাহিত্য ঠিক রসসাহিত্য নয়, এ সাহিত্য সমস্যা-সাহিত্য। এ কালের নানা জটিল সমস্যা এ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আপনার মীমাংসা খুঁজিতেছে। উপন্যাস, নবন্যাস, নাটক, এমন কি গীতিকবিতাতেও সমস্যাই গিজ্ গিজ্ করিতেছে; মানব হৃদয়ের নিত্যরসের কোন রূপ ক্বচিৎ ফুটিতেছে।

কিন্তু ইহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। প্রমথবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন যে, "জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ দৈন্যের প্রতি অন্ধ হ'য়ে কাব্যরচনা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব।" শুধু এ দেশে নয় বিদেশেও—নবজাতি ও নবসভ্যতা সংগঠনের বিরাট্ আয়োজন চলিতেছে। সেই বৃহৎ সৃজন-ব্যাপারে রাষ্ট্রবিৎ ও সমাজতত্ত্ববিদের সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদেরাও যোগ দিয়াছেন। সেইজন্যই একালে "আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্"—আর্ট আর্টেরই জন্য—এ নীতি টিঁকিবে কিনা সন্দেহ। কেননা আর্ট-সৃষ্টি ঐ বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টি বা সমাজ-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ কালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলিকে যখন কতকটা নির্লিপ্তভাবে দূরে স্থাপন করিয়া সমগ্র দৃষ্টিতে আর্টিষ্ট দেখিতে পারিবেন, তখনই আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে নিত্যরসের আভাস জাগিবে। সেই পরিপ্রেক্ষণটি (perspective) না থাকার জন্য এ কালের অধিকাংশ

কিন্তু রসের অখণ্ডতা নাই। কিন্তু তার কারণই এই যে আর্টের পরিধিটা হঠাৎ বিস্তৃত হইয়াছে; এ যুগে আর্ট-সৃষ্টি বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্টের চর্চ্চা এখন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের এ যুগের গুরু রামমোহন রায়ের রচনাবলীতে সেই বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টিরই আভাস পাই। সাহিত্যিক বলিলে যাহা বুঝায়, রামমোহন রায় তাহা ছিলেন না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে জড়াইয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সভ্যতাসৃষ্টির নক্‌সা তৈরি করিয়াছেন, তার বিচিত্র মালমসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দু সভ্যতাটাকে তার বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তার স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রকে সেই বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া লইয়াছেন; তারপর সেই ভিৎটাকে একালের উপযোগী করিয়া প্রশস্ত ও সংস্কারমুক্ত করিয়া গড়িয়াছেন। তার পর অর্থনীতি, ব্যবহারতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি নব নব মানব-বিজ্ঞানগুলির (humanities) উর্ণকরণের দ্বারা সেই ভিতের উপর নব সভ্যতার হর্ম্ম্য তৈরির দিকে মন দিয়াছেন। এম্‌নিতর ভাবেই, হিন্দু-সভ্যতার মতন খৃষ্টান ও মুসলমান সভ্যতারও নব সংগঠনের নক্‌সাও তাঁকে তৈরি করিতে হইয়াছে। এইতো তাঁর সৃষ্টি। এ সৃষ্টি কলাসৃষ্টি নয়, অনাসৃষ্টিও নয়—এ সৃষ্টি হাজার হাজার নূতন নূতন কলাসৃষ্টিকে সম্ভাবিত করিবার শক্তি রাখে। আর হইয়াছেও তাই। রামমোহন রায় প্রভৃতি, যে বড় সভ্যতা-সৃষ্টির আভাস দিয়া গেছেন, এ কালের সাহিত্য তাকেই বিচিত্র কলাসৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। তাঁরা যেসব সমস্যাকে তত্ত্বের দিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন, আর্টে সেই সব সমস্যাই আবার নূতন নূতন রূপ লাভ করিতেছে। অতএব তাঁদের রচনা "আর্টিষ্টিক" না হইলেও তাহা আর্টকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এই কথাটুকু মনে রাখা দরকার।

এই কারণেই প্রমথবাবু গত একশত বৎসরের সাহিত্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি সায় দিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন:—

"প্রথমেই নজরে পড়ে যে সে-সাহিত্য নিরানন্দ। আজ একশ' বৎসর ধরে আমরা আমাদের সকল লেখায় সকল কথায় প্রকাশ করে এসেছি—শুধু অসন্তোষ। এর কারণ—আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য, আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন জিনিসই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন হীনতা আমাদের বুকের ভিতর অষ্ট-প্রহর কাঁটার মত বিঁধছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে শুধু আক্ষেপ ও আক্রোশের সাহিত্য। এ সাহিত্যে অবশ্য বৈরাগ্যেরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সব হয় মিছে, নয় বাজে।"

* * * *

"তার পর নজরে পড়ে যে এ সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়।

এর কারণ এ সাহিত্য মুখ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। গত একশত বৎসর ধরে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যে একমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে

রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা সকলেই স্বজাতিকে মনে ও চরিত্রে শক্তিশালী কর্‌তে, রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ কর্‌তে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমৃদ্ধি-শালী কর্‌তে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছেন, এ কথা বল্‌লে নেহাৎ বাজে কথা বলা হবে না। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ত সর্ব্বলোকবিদিত। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জবানিতেই কবুল করেছেন যে স্বজাতির উন্নতিকল্পেই তিনি লেখনী ধারণ করেন; অর্থাৎ লেখা জিনিসটে এঁদের সকলের কাছেই ছিল জাতি-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র। সাহিত্যকে এঁরা একটা means হিসেবেই দেখতেন, end হিসেবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরোপকার, গৌণ উদ্দেশ্য কাব্যসৃষ্টি। ফল যদি তার উল্টো হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাত দিয়ে যা বেরিয়েছে তা যদি মুখ্যতঃ সাহিত্য হয়ে থাকে ত তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের অবাধ্য প্রতিভা তার সঙ্কীর্ণ সংকল্পকে অতিক্রম করে।"

প্রমথবাবুর প্রথম নজরটার সঙ্গে আমার নজরের অন্ততঃ, কতকটা পার্থক্য ঘটিতেছে—গত একশত বৎসরে বাংলাসাহিত্যে শুধুই নিরানন্দ ও অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা মানিতে আমি রাজি নই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত যাঁরা ইহার লালনের ভার লইয়াছিলেন, তাঁদের বরং আশা ও উৎ-সাহের অন্ত দেখি না। রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের মধ্যে এই উৎসাহের প্রাচুর্য্যটাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া এতটা উৎসাহ বোধ করিবার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার তাই মনে হয় যে, সে উৎসাহের মূল কারণ একটা নূতন-কিছু-রচনা করিবার আনন্দ। তখনকার কালে কোন জিনিসই অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হইবার সময় পায় নাই—দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই নব নব সম্ভাবনা দেশের মনস্বীদের মনকে কেবলি উদ্দীপ্ত করিয়াছে এবং নব নব সৃষ্টি ও উদ্যোগের দিকে প্রেরণ করিয়াছে। সেই-জন্য তখন বাস্তবিকই "আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য ও আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা" সম্বন্ধে এখনকার মত আমরা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। তখন আমরা দৈন্য বুঝিলেও এবং সেজন্য বিলাপ করিলেও, সেটা সত্য দৈন্যবোধ ও সত্য বিলাপ হয় নাই—সেটা একটা ভাবুকতার অছিলা মাত্র ছিল।

অসন্তোষের সাহিত্য বরং এখন দেখা দিয়াছে। তার প্রকৃত আরম্ভ বঙ্কিমের পর হইতে, তার উৎকর্ষ রবীন্দ্রনাথে। জার্ম্মাণ দেশের Sturm und Drang অথবা storm and stress—ঝঞ্ঝাময় সাহিত্যের মত, একটা ভাবালোড়নময় অশান্তির সাহিত্য এইত সেদিন জন্মলাভ করিয়াছে। এ অসন্তোষ শিবের প্রলয়ের মত—এযে নব সৃষ্টিরই পূর্ব্ব সূচনা। তাই এ সাহিত্যে বেণুবীণার ঝঙ্কারের চেয়ে পাঞ্চজন্যের ভৈরব সঙ্গীতই অধিকতর ধ্বনিত। এ সাহিত্যের

সঙ্গে তাই পূর্ব্ব সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলনা চলেনা। এর আনন্দ, 'ভাঙ্বারই আনন্দরে'।

ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথবাবুর দ্বিতীয় কথাটাকে অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়, সেই কথাটাকে—আমি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই যে, যে প্রলয় সাহিত্যের কথা একটু আগে বলিলাম, তার ভূমিকাই এতকাল ধরিয়া তৈরি হইতেছিল। এতকাল ধরিয়া জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রটার পরিমাণ-পরিমাপ চলিয়াছে। এবং সেই কারণেই অসন্তোষ আজ এমন প্রবল ভাবে জাগিবার অবকাশ পাইয়াছে। এই বাণীই "নববাণী" এবং সাহিত্যের মর্ম্মের মধ্যেও এই বাণীই আজ ধ্বনিত যে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমা ছাড়া অল্পে আর আমাদের সুখ নাই, ভূমাকেই এখন হইতে জানিতে চাই।

বাংলাসাহিত্যের দরজায় তাই এখন আর দেশের সমস্যা নয়, বিশ্বসমস্যা কর হানিতেছে। ভূতপূর্ব্ব গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ, ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ, এমন কি বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধাদিতে যে সব সমস্যার আলোচনা ছিল—সে আলোচনার সংকীর্ণ সীমায় বাংলাসাহিত্য আজ আর বদ্ধ নাই। এখন হইতে আধুনিক সাহিত্যে আমরা—

"Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act;
Fancies that broke thro' language
and escaped"—

এমন সকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছি যেগুলিকে কোন সংকীর্ণ কর্ম্মের কোটরের মধ্যে ঠাসা যায় না, এবং এমন সকল ভাব ও কল্পনাকেও প্রকাশ করিতে বসিয়াছি, ভাষা যাহার নাগাল পায় না।

আমি মনে করি, সেই কারণেই পূর্ব্বের চেয়েএখনকার সাহিত্যে 'আর্ট' দেখা দিতেছে। কেননা, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাকে প্রকাশ করিবার ভারই আর্ট লইয়া থাকে। ভাবনার মধ্যে যাহা অভাবনীয়, বচনের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাকেই ত আর্টের দরকার—সেই বাড়্তি জিনিস লইয়াই ত আর্টের কারবার।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

পরাজয়

শীতকাল। শনিবারের সন্ধ্যা। দিন ফুরাইয়াছে, সপ্তাহ-ও শেষ হইয়াছে। মনে হইতেছে যেন ইহার মধ্যেই রবিবার আসিয়া পড়িয়াছে। সহরে অফিসের বাবুরা একদিন নিশ্চিত বিশ্রাম পাইবার আশায় স্ফূর্ত্তি করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। কেহ পকেটে পয়সা আছে দেখিয়া পোস্তা হইতে কপি, কলাইশুঁটি, কমলালেবু কিনিতেছেন। ছেলেদের ও বুড়াদের কাল মহানন্দে খাওয়া চলিবে। অফিসের তাড়ায় রবিবার-ভিন্ন ত

আর কোনদিন আরাম করিয়া আহার হয় না। ধীরে-সুস্থে রহিয়া-বসিয়া ইচ্ছামত বেলা করিয়া আহার ও তৎপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়ানো, বাঙ্গালী কেরাণী-জীবনের এই বিশেষ দুর্ল্লভ ব্যাপারটি কেবল রবিবারেই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন অল্পবয়স্ক কেরাণী বেলফুলের মালা-ক্রয়-রত ছোকরা-বাবুদের মতই উল্লসিত। আজ থিয়েটারে যাইতে হইবে। নূতন নাটকের আজ প্রথম অভিনয়-রজনী।

বাগবাজারের উত্তরে, গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড এক পাটের কল। মজুরেরা সাতদিন-অন্তর শনিবারে-শনিবারে সেখানে মাহিনা পায়। কলিকাতার রাস্তাগুলির মত সেখানে বিদ্যুৎ বা গ্যাসের আলো নাই, অফিস-প্রত্যাগত বাবুদের ও সান্ধ্যবায়ুসেবী যুবক-দের ভিড় নাই। শকটের শব্দে রাস্তাও কাঁপিতেছে না। কিন্তু কারখানা হইতে মাহিনা পাইয়া প্রফুল্লচিত্ত মজুরের দল ভিড় করিয়া বাহির হইতেছে। কারখানার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গলি মজুরের দলে ভরিয়া গিয়াছে; তাহাদের কোলাহল, বিদ্রূপচ্ছলে অশ্লীল গালি, কৌতুকচ্ছলে পরস্পর-মারামারি প্রভৃতির বিচিত্র শব্দে স্থানটি মুখরিত। মদের দোকানে লোক ধরে না।

মজুরদের এই ভিড়ের মধ্য দিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণকায়া এক রমণী অগ্রসর হইতেছিল। এই দারুণ শীতেও তাহার অঙ্গে উপযুক্ত আচ্ছাদন নাই। একটা অতি মলিন ঘাগ্‌রার উপর একটা ওড়না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে সে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার গমনের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, সে যে চলিতেছে এ কথাটাও যেন সে গোপন করিতে চায়। সে যেন লজ্জা ও দুঃখের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! কি তাহার উৎকণ্ঠা!

তাহার ব্যাকুল নয়ন ও দ্রুত-পদবিক্ষেপে তাহার মনের ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, যেন সে কেবল ভাবিতেছে 'ঠিক সময়টিতে পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি।' চারিদিকে মজুরের দল তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে; তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রসিকতা করিতেছে। অধিকাংশ মজুরেরাই তাহাকে চিনে। সে কুৎসিত বলিয়া সকলে তাহার নাম দিয়াছে, "বাঁদরী!" তাহাকে দেখিয়া মজুরেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "দেখ্‌-দেখ্‌, বাঁদরী তার স্বামীকে আন্‌তে যাচ্ছে।" এই বলিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিতেছে। তাহাতে রমণী তাহার গতিবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

টিটকারিরও অভাব ছিল না। "ইস্‌-ইস্‌! তাকে আর এখন পাবে মনে করেছ না কি? সে এতক্ষণে হয়ত একেবারে সেইখানে—কি হয়ত সে-ই-খানে!"

অনেকটাপথ জোরে চলিয়া আসাতে তাহার অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে কারখানার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সে স্থান জনশূন্য। কারখানার ফটক বন্ধ। কল থামিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ীর চিম্‌নি হইতে ধোঁয়া উঠার মত কারখানার কল হইতে হুস্‌-হুস্‌ করিয়া বাষ্প বাহির হইতেছে। উঁচু চিম্‌নিগুলির উপর হইতে এখনও একটু-একটু ধোঁয়া উঠিতেছে।

মজুরদের খাটুনি থামিয়াছে, কিন্তু স্থানটির উত্তাপ এখনো জুড়ায় নাই বলিয়া মনে হইতেছে যেন জনহীন কারখানাটির জীবনী-শক্তির স্পন্দন এখনো একটু আছে। দরজা-জানলা সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল মাহিনা দিবার ঘরে বৃদ্ধ কেসিয়ারবাবু চোখে চশমা আঁটিয়া বাতির আলোকে প্রকাণ্ড হিসাবের খাতা খুলিয়া সে দিনের ক্যাস মিলাইতে ছিলেন। তাঁহার কাজও শেষ হইয়াছে। রমণী কারখানার সম্মুখে পৌঁছিতেই কেসিয়ারবাবু খাতা মুড়িয়া চসমা খুলিয়া চাপকানের প্রান্তে তাহা মুছিয়া খাপে ভরিয়া বাতি নিভাইয়া দিলেন। তাঁহার বাড়ী যাইবার সময় হইয়াছে।

রমণীটির দেরী হইয়া গিয়াছে!

সমস্ত মজুরেরা মাহিনা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে এখন কি করিবে? তাহার স্বামীকে কোথায় পাইবে? এক সপ্তাহের সংসার-খরচ এইবেলা না লইতে পারিলে ত সমস্তই মদের দোকানে যাইবে।

টাকা-পয়সার যে বিশেষ দরকার। ঘরভাড়া বাকী আছে,বাড়ীওয়ালী শাসাইতেছে। ছেলেদের পরণে কাপড় নাই। চালও ফুরাইয়া গিয়াছে। আজ শোধ দিবে বলিয়া এক টাকা ধার করিয়াছিল . ...

রমণী আর ভাবিতে পারিল না। গঙ্গার ধারে উঁচু পোস্তার উপর রাস্তার পাশে সে বসিয়া পড়িল। তাহার নড়িবার আর ক্ষমতা ছিল না। শূন্য-দৃষ্টিতে সম্মুখের কলনাদিনী গঙ্গার অপর পারে কুয়াসায়-ঘেরা গাছগুলির মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান একটি আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল।

কারখানার কাছাকাছি মদের ও চাটের দোকান তখন খুব জাঁকাইয়া খোলা হইয়াছে। মদের দোকান আলোকময়। সেখানে আমোদের স্রোত বহিতেছে। কারখানা নীরব, জনশূন্য। তাহার প্রাণ এখন মদের দোকানে স্পন্দিত হইতেছে। নরকের গহ্বর-সদৃশ মদের দোকান মজুরে ভরা। সামনে কাঠগড়া। তাহা এককালে বার্ণিস্ করা ছিল। এখন তাহাতে নানা স্থানে দাগ ধরিয়াছে; বার্ণিস্ কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর থাকে-থাকে সজ্জিত নানা-প্রকার মদের বোতল। পথ হইতে চীৎকার, গান, গালাগালি, অশ্লীল রসিকতা, টাকা-পয়সার ঝন্ঝনানি, মদের গেলাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে অসাড় হাতে ভর দিয়া তক্তাপোষের উপর মজুরেরা বসিয়াছে। কেহ বা কাঠগড়ায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে; হতভাগারা ভুলিয়া গিয়াছে, যে এই দারুণ শীতে তাহাদের ঘরে ভাত চড়ে নাই, স্ত্রী-পুত্র শীতে কাঁপিতেছে।

মদের দোকানটির আলো সাম্নের রাস্তাটিকে পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। পাশের বাড়ীগুলির জানালা-কবাট বন্ধ;—সেগুলির সম্মুখবর্ত্তী পথ অন্ধকার ও জনহীন। এই অন্ধকারের আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রমণী ভয়ে-ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দারুণ অশান্ত উদ্বেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।

ঐ যে তাহার স্বামী,—বিশালকায়, একটা ছিটের তুলা-ভরা জামা গায়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মুখের আশে-পাশে পড়িয়াছে। শারীরিক বলের গর্ব্বে সে উদ্ধত। সঙ্গীরা

তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে ;—তাহার কথা শুনিতেছে। সে এমন সুন্দর কথা কয়, এমন মজার-মজার হাসির গল্প বলে। তার উপর আবার তার দরাজ হাত ; কেহ মদের পয়সা দিতে না পারিলে নিজেই দিয়া দেয়।

অভাগিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছিল। মদের দোকানের উজ্জ্বল আলোয় তাহার স্বামীর ভাবভঙ্গী সে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিল। চারিদিকে সুরাপানে উন্মত্ত মজুরের দল, তার মধ্যে বসিয়া তাহার স্বামী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল। নিজের কথায় যেন সে নিজেই মাতোয়ারা। মজুরেরা আসিতেছে, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কেহ বা তক্তাপোষ চাপড়াইয়া গান ধরিয়াছে। তাহার স্বামী দেখিতে পাইল না যে ঐ সামনের পথে দুইটি বিষাদভরা ক্ষীণ পাণ্ডু নয়নের সাগ্রহদৃষ্টি তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার দৃষ্টিপাতের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে!

রমণী দোকানে ঢুকিতে সাহস করিল না। প্রকাশ্য মদের দোকান—তার উপর সঙ্গীদের সহিত তাহার স্বামী বসিয়া রহিয়াছে। সে যে রমণী!

... ...

কি কুৎসিত সে! কিন্তু চিরদিন সে এরূপ ছিল না। তাহার পিতা কলিকাতার পুলিশের কন্‌ষ্টেবল্ হইতে জমাদার পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিল। সে তাহার পিতার একমাত্র কন্যা। মা তাহার শৈশবেই মারা যায়। বাপের সে বড় আদরের মেয়ে। পাড়ায় বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ী সে

স্কুলে পড়িত। তাহার আচার-ব্যবহার, হাবভাব সব বাঙ্গালীরই মত হইয়া পড়িয়াছিল। সাড়ী-সেমিজ-পরা ঢলঢলে কচি সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তখন কে বলিবে, যে সে খোট্টার মেয়ে?

তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। তাহার শ্বশুর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের সর্দ্দার ছিল। তাহতে সে বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়াছিল। তাহার বিবাহে সে কি ধূমধাম! বাঙ্গালী বাবুদের বিবাহের মত একদল ইংরাজী বাজনা ও গ্যাসের আলো জ্বালাইয়াই বর আসিল। সে আজ দশ বৎসরের কথা।

তাহার পর তাহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল। সঞ্চিত হাজার দু'য়েক টাকা—পাম্প সু, পাঞ্জাবী কিনিতে ও কুসংসর্গ-কুপ্রবৃত্তির সাহায্য করিতে অল্পদিনেই উড়িয়া গেল। শেষে এক বিস্তৃত খোলার চালের 'মাঠ্‌-কোটা'র একখানি ঘরে সে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার কোলে একটি ছেলে। পিতা পরলোকগত।

চারিদিকে ছোটলোকের বাস। পাশের ঘরগুলি ছোটলোকে ভরা। দিনরাত কলহ চীৎকার, অশ্লীল গালি। কেহ মদ খাইয়া আসিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছে। তাহার স্বামী মাতালের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপান করিতে শিখিয়াছে। মজুরি করে, কোনদিন টাকা আনে, কোনদিন মদের দোকানেই তাহা উড়াইয়া আসে। প্রতিবেশিনীদের দেখা-দেখি অভাগিনী কেবল নীরবে কাঁদে। দুঃখ-কষ্টের আঘাতে মনের দুশ্চিন্তায় তাহার

... ...

এখনও ছায়ামূর্ত্তিটি পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পথের আবর্জ্জনারাশির উপর তাহার পা পড়িতেছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেগে বায়ু বহিতেছে। শীতে তাহার হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার কাসি আসিতেছে। কতক্ষণ,—আরও কতক্ষণ সে অপেক্ষা করিবে!

দুই-তিনবার দোকানে ঢুকিবে বলিয়া সে অগ্রসর হইল; কিন্তু পা উঠিল না। শেষে মনে পড়িল তাহার সন্তান অনাহারে,—সপ্তাহের সমস্ত উপার্জ্জন বুঝি-বা মদের দোকানেই যায়! তখন আর সে থাকিতে পারিল না। মরিয়া হইয়া দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

দোকানের চৌকাঠও পার হয় নাই, এমন সময় এক বিকট হাসির শব্দে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। "ওরে দেখ্, দেখ্, বাঁদরী এসেছে রে!"

সত্যই সে অতি-কুৎসিত, বৃষ্টিতে তাহার ওড়না ভিজিয়া গিয়াছে, পায়ে কাদা। উপেক্ষায় অনাদরে বদন পাণ্ডুর, গালদুটি পাংশু। সত্যই সে রূপহীনা। লজ্জায়, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হতভাগিনী নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

"দেখ্ দেখ্, বাঁদরী এসেছে রে।"

তাহার স্বামী লাফাইয়া উঠিল। নীচসংসর্গে মিশিলেও তাহার পুর্ব্বসংস্কার এখনো একেবারে দূর হয় নাই। 'জানানা'র সম্ভ্রম-রক্ষায় এখনও সে উদাসীন হইতে পারে নাই। "কি? এত বড় আস্পর্দ্ধা! 'জানানা' হয়ে এখানে আসা! দশজনের সামনে এই কুৎসিত মূর্ত্তি নিয়ে আমাকে অপমান কর্‌তে আসা! আমার মাথা হেঁট করবার মৎলব! আচ্ছা, দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!" সুরায় ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাহার স্বামী ঘুসি বাগাইয়া তাহার দিকে ছুটিল। অভাগিনী প্রাণভয়ে পিছাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল, পলায়নের চেষ্টা করিল। মজুরেরা উপহাসের উচ্চধ্বনি তুলিয়া তাহাকে টিটকারি দিতে লাগিল।

সে দুই পা যাইতে না যাইতেই তাহার স্বামী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

চারিদিক অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই। হায়রে হতভাগিনী!

... ...

না, না। সামনা-সামনি হইতেই স্বামী তাহার চোখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া গেল। কি নৈরাশ্যপূর্ণ, আত্ম-সমর্পণের সে দৃষ্টি! তাহার স্বামীর দৃঢ়-মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। সে এখন তাহার বশীভূত, অনুতপ্ত। রমণী তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রমণী মৃদুকণ্ঠে দুই-একটি কথা বলিতে লাগিল। সে ধ্বনি কোমল, বিষাদময়, ঈষৎ অস্পষ্ট।

প্রকৃতি গাঢ় তমিস্রার আবরণে তাহাদের চারিদিক ঢাকিয়া দিল। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* আল্‌ফন্‌স্ দোদের ফরাসী গল্পের আভাসে।

সমালোচনা

তরুতীর্থ। শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা। বিউটি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি গল্পের বহি। সাতটি ছোট গল্প এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে "তরুতীর্থ," "অসমা" ও "মুস্কিল আসান" এই তিনটি চমৎকার। ছোট গল্পের আর্ট সেগুলিতে বজায় আছে। "তরুতীর্থে" করুণ রসটুকু বেশ উথলিয়া উঠিয়াছে; তাহা একেবারে মর্ম্মে আঘাত করে—এতটুকু পীড়া দেয় না। 'অসমা' গল্পে সংসারের খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়া কাহার-ভৃত্য ও তাহার পত্নীর ছবিটুকু সুন্দর ফুটিয়াছে। 'মুস্কিল আসান' গল্পটিও বেশ উপভোগ্য। ষ্টেশনের কলরবের মধ্যে লেখিকা যে কন্যাদায়-গ্রস্ত বিপন্ন পরিবারের সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের সুখ-দুঃখের ধারা রেলগাড়ীর নানা কথাবার্ত্তায় ও ঘটনা-বৈচিত্র্যে পাঠকের চিত্তে বেশ দোল দিয়া গিয়াছে; এবং এই পরিবারের দুঃখে সহানুভূতি অত্যন্ত সহজভাবেই জাগিয়া উঠে। রচনায় কোন পল্লবিত আয়োজন নাই, বাগাড়ম্বর নাই; তিনটি গল্পেরই রচনায় লেখিকা সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। 'রাম কবচ' গল্পে বদ্ধ কুসংস্কারের মূলে যে আঘাতটুকু দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিপুণ; অথচ গল্পটী মাটী হয় নাই। "গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে," "ভ্রষ্টোভ্রষ্ট", "দুধ-মা" এ তিনটি গল্পে তেমন বিশেষত্ব নাই। ছোট গল্পের আর্টও ইহাতে বজায় আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। লেখিকার ভাষা সরল—বাজে উচ্ছ্বাসের হুঙ্কার কোথাও নাই। তবে মাঝে মাঝে সংস্কৃত-বাঙলা ও প্রাকৃত-বাঙলা একত্র মিশিয়া স্থানে স্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে। বাঙালী ও বেহারী নর-নারীর চিত্তের হর্ষবেদনা লেখিকা বেশ নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; বাঙলা সাহিত্যে সেটুকু উপভোগ্য। বহি-খানির ছাপা-কাগজ বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

আকার ইঙ্গিত। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ময়মনসিং ব্রাহ্মপল্লী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা স্বর্ণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এ গ্রন্থে গ্রন্থকারের রচিত যে-সকল প্রবন্ধ 'সময়ে সময়ে সাপ্তাহিক এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত' হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই সামাজিক—তবে বড় সংক্ষিপ্ত; এত সংক্ষিপ্ত যে বহুস্থলে লেখকের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এ গ্রন্থে মহিলাদের সম্বন্ধে অনেক-গুলি প্রবন্ধ আছে—বঙ্গমহিলার সাহিত্যচর্চ্চা, বঙ্গমহিলা—মানসিক, আধ্যাত্মিক, মহিলা-মঙ্গল, বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি। 'বঙ্গমহিলা—মানসিক' প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, 'স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষায় অধিক যত্নবান হইতে হইবে; 'বঙ্গমহিলা-শারীরিক' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'বঙ্গমহিলার শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতির ভবিষ্যৎ আশা লুপ্ত হইবে"—ইত্যাদি। কথাগুলা ঠিক, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই; কিন্তু কি করিয়া কি হইবে লেখক তাহার কোন পন্থা নির্দ্দেশ করেন নাই। বহুস্থলেই প্রবন্ধগুলি উচ্ছ্বাসমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ-সব সত্ত্বেও লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়; কারণ এ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেকের এ-দিকে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি জাগিতে পারে।

মা। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি গানের বহি। অনেকগুলি গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—গানগুলি 'প্রসাদী পদচ্ছায়ায়' রচিত; ভাব আধ্যাত্মিক। রচনায় বিশেষত্ব নাই।

অঞ্জলি। চারুহাসিনী দেবী প্রণীত। বগুড়া, শ্রীহিরণ্ময়মোহন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলি-কাতা, কটন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ।

প্রদীপ ও চেরাগ। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। প্রকাশক, র, রহমান, 'দি মুসলমান' বুক এজেন্সি, কলিকাতা। নিউ এজ্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি গল্পের বহি। "প্রদীপ ও চেরাগ", "মসজিদ ও মন্দির" এবং "দুষমন ও দোস্ত" এই তিনটি গল্প ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সব গল্পগুলিতেই হিন্দু-মুসলমানকে সর্ব্বপ্রকার জাতিগত বিশেষ পার্থক্য ত্যাগ করিয়া এক-মনুষ্যত্বের গণ্ডীভুক্ত করিবার দিকে ইঙ্গিত আছে, সর্ব্বপ্রকার conventionalityর বিরুদ্ধে মৃদু শ্লেষবর্ষণ আছে। ছোটগল্পের আর্ট না থাকিলেও গল্পগুলি মোটের উপর মন্দ নয়। "প্রদীপ ও চেরাগ" গল্পের নায়ক মুসলমান, নায়িকা বালবিধবা এক দরিদ্রা বেহারী রমণী। কোন-রকম আজগুবি রসের আশ্রয় না লইয়া লেখক এ গল্পে স্বাভাবিকতাটুকু রক্ষা করিয়াছেন—তবে গল্পটি এমনি দীর্ঘ পল্লবিত হইয়াছে যে ছোটগল্পের আর্ট ত ইহাতে নাইই—তাহার উপর রসভঙ্গ-দোষও ঘটিয়াছে। "মসজিদ ও মন্দির" গল্পে হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেরই ধর্ম্মের-মুখোস-পরা ভণ্ডের ছবি লেখক সুদক্ষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—প্লটটিও ভাল। "দোস্ত ও দুষমন্" গল্পে ধর্ম্মের আইন-কানুনের বাধাবন্ধহীন এক দরিদ্র মুসলমান বালকের সহিত ধনী হিন্দুগৃহের এক শিশুর সখ্য লেখক চিত্রিত করিয়াছেন; তবে এ গল্পেও ছোটগল্পের আর্ট সুরক্ষিত হয় নাই। লেখকের ভাষা ভাল —রচনায় তেজ আছে, প্রাণ আছে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মুসলমানী বাঙ্‌লা বেখাপ্পা বসিয়া সুর কাটিয়া দিয়াছে। ব্যঙ্গে লেখকের হাত আছে। ছোটখাট দোষ-ত্রুটি সংশোধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধনা করিলে এই নবীন মুসলমান সাহিত্য-সেবীর রচনা ভবিষ্যতে সার্থক হইবে বলিয়া আশা করি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আপেল। শ্রীযুক্ত পাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, ৩৫-৬-২ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। দাম একটাকা। এখানি গল্পের বই—ইহাতে গল্প আছে চৌদ্দটি। লেখকের ভাষা ভারি পরিষ্কার ঝরঝরে, হাল্‌কা ও মিষ্ট—পড়িতে-পড়িতে কোথাও বাধিয়া যায় না; ছোটগল্পের ভাষা কেমন-ধারা হওয়া উচিত লেখক তাহা জানেন এবং বুঝেন। গল্পগুলির ভিতরে, আমাদের সব-চেয়ে বেশী ভালো লাগিয়াছে—"মাষ্টার"। শেষের দিকে না-ঠেলিয়া এটিকেই প্রথম স্থান ছাড়িয়া দেওয়া উচিত ছিল; কারণ, অন্য-সব গল্পের চেয়ে এটির ভিতরেই খাঁটি ছোটগল্পের রসমাধুর্য্য অধিক পরিমাণে আছে। হতভাগ্য মাষ্টারের চরিত্রেও বেশ-একটি নূতনত্ব ও জীবন্তভাব আছে এবং লেখার গুণে এর-মধ্যে করুণ রসও যতদূর জমিবার, জমিয়াছে। "তিনসরিক"—ঠিক ছোটগল্প না-হইলেও, সরস এবং উপভোগ্য। "হাঁচ্যাতঙ্ক," "শরতের মেঘ", নির্লজ্জ", "ভাগ্যচক্র" ও "বৌদিদি" নামে গল্পকয়টি চলন-সৈ মাঝারি রকমের রচনা। "বিষধর" ও "ভাই" গল্পের প্লট্ এমনি পচা যে, মনের উপরে একটুও দাগ কাটিতে পারে না! "বন্ধু", "স্মৃতির আদর" ও "পুনর্মুষিক",—এ গল্প-তিনটি জমিলেও জমিতে পারিত, কিন্তু লেখকের নিজের দোষে এগুলি কেমন-একরকম খাপ ছাড়া-গোছের হইয়া গিয়াছে। "বৈজ্ঞানিক বনাম কবি" ও "বাকীপূরণ" একেবারে অচল। এই গল্পপুস্তকে অনেক দোষ থাকিলেও, এ-কথা আমরা মানিতে বাধ্য যে, ছোটগল্পের আর্টের দিকে লেখকের দৃষ্টি আছে, আর-একটু মনোযোগী হইলে ভবিষ্যতে গল্পলেখায় তাঁহার হাত বেশ খুলিতে পারে।

Twelve Portraits বা বারোখানি মূর্ত্তি-চিত্র। শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে-অঙ্কিত এবং মাননীয় বিচারপতি স্যর জন জি, উড্রোফ মহোদয়-লিখিত ইংরেজী ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমল হোম, ২০-১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এখানি ছবির বই; ইহাতে স্যর আশুতোষ, স্যর জগদীশচন্দ্র, স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন, প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর গুরুদাস, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, অবনীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ, এই বারোজন বিভিন্ন বিষয়ে বিখ্যাত বাঙালীর বড়বড় মূর্ত্তি-চিত্র

আছে। এ-ধরনের ছবির বই বাঙ্‌লাদেশে আর-কখনো বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। চিত্রকর শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে ভারতীয় চিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এই ছবির বইএ তাঁহার আর-একটি নূতন শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। য়ুরোপে ও আমেরিকায় Etching বা নক্‌সার অত্যন্ত আদর। মুকুলচন্দ্র আমেরিকা হইতে আর্টের এই বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন—সুতরাং এদেশে এ-রকম নক্‌সা এই প্রথম। কাহারও মূর্ত্তি-চিত্র আঁকিতে হইলে, আদর্শের আকৃতি-সাদৃশ্য অপেক্ষা স্বভাবের স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারাই শিল্পীর পক্ষে যথার্থ গৌরবের কার্য্য। মানুষের হাড়ে-মাংসে গড়া বাহিরের দেহটাকে যাঁহারা দেখিতে চান, ফোটোগ্রাফার তাঁহাদের মনের আশ মিটাইতে পারে। কিন্তু ফোটোগ্রাফার মানুষকে দেখায়, মানুষের মনুষ্যত্বকে দেখাইতে পারে না;—সেইজন্যই আজ-পর্য্যন্ত আর্টিষ্টের অন্ন কেউ মারিতে পারে নাই। অবশ্য এমন উচ্চশ্রেণীর আর্টিষ্ট হওয়া সহজ কথা নয়; কেননা, মানুষের ভিতরের গোপনতাকে প্রকাশ করিতে হইলে অসাধারণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির দরকার এবং সেইসঙ্গে চাই হাতের বিশেষ নিপুণতা। এই শক্ত কাজেও মুকুলচন্দ্রের হাত ও চোখ যে কতটা রপ্ত, সমালোচ্য ছবির বইখানি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রফুল্লচন্দ্র, গুরুদাস, সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ও বিপিনচন্দ্রের ছবিগুলিতে আদর্শের স্বরূপ এবং প্রকৃতিগত বিশেষত্ব যতদূর ফুটিবার, ফুটিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া অন্য ছবি-গুলিও চমৎকার হইয়াছে। আঁকা-হিসাবে সমস্ত ছবিই দেখিবার মত। শেষদিকে চিত্রিত ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকাতে অনেকেরই সুবিধা হইবে।

শ্রীহঃ—

অভিজ্ঞান

কামিনী ফুলের গাছ দুয়ারের ধারে,
ঘন পল্লবের ভারে ভরা একেবারে;
কবে এল নবীন যৌবন,
সে কথা তখনো তার জানে নাই মন,
শ্যাম বাসে বাঁধি বুক ছিল মূক হয়ে,
ফুল-ভাষে মনো আশা ওঠে নাই কয়ে!

দিনে-দিনে-ভরে-ওঠা সুধা চাঁদখানি,
বহু অমা-নিশীথের বহি মর্ম্মবাণী,
আকাশের নীলিমা সাগরে,
ধীরে বাড়াইয়া মুখ হরষের ভরে,
আলোকের শতদল করি উন্মীলন
দেখা দিল প্রভাতের পদ্মের মতন!

সুদূর সে আকাশের আলোর পরশে,
কামিনী শিহরি উঠি, জাগিল হরষে,
কি সৌরভে ভরে গেল মন,
অজানারে জানাইতে করে আয়োজন,
ফুটায়ে কোমল শুভ্র কুসুম-আবলি,
প্রতি পর্ণপুটে তার ধরিল অঞ্জলি!

প্রভাতে ডুবিল চাঁদ; সুনীল আকাশ
রাঙা হয়ে, বেদনারে করিল প্রকাশ
কামিনীর সারা অঙ্গ ভরি,
পুলকের ফুলসাজ কাঁপে থরথরি!
চিরিয়া পেলব প্রাণ, বিলায়ে সৌরভ,
অমল ফুলের দল ঝরে গেল সব!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।